পারুল চিরায়ত কথাসাহিত্য

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্বাচিত গল্পসংগ্রহ

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

পা রু ল

মুহূর্তকথা
অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্বাচিত গল্পসংগ্রহ

মু হূ র্ত ক থা

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্বাচিত গল্পসংগ্রহ

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

পা রু ল

রঞ্জিত রায়চৌধুরীকে

প্রা ক ক থ ন

মুহূর্তকথা অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্প সংগ্রহ-এ আছে এক জীবনের অনেক কথা। গল্পগুলির ঘ্রাণে আছে লেখকের নিজস্ব বোধ, ঐতিহ্য এবং অহমিকা। এই সব গল্পে লেখককে চেনা যায় আলাদা এক বিশ্ব থেকে। গল্পগুলির এই গুণই পাঠককে আলাদা বিশ্বদর্শনে, মুগ্ধতায় বিস্মিত করতে পারে। 'নির্বাচিত' এই শব্দ ব্যবহারে সেভাবে আলাদা কোনো ব্যঞ্জনা তৈরি করে না, আবার কখনও কখনও মনে হতে পারে লেখকের অন্তর্গত দাহ থেকে এই সব গল্পের জন্ম।

সূচি

অন্নপূর্ণা

প্রণাম করো। তোমার দিদিশাশুড়ি। ভিড় থেকে আত্মীয়-পরিজনের কে কথাটা বললেন চাঁপা বুঝতে পারল না। প্রায় অন্ধকার ঘরে তিনি শুয়ে আছেন। ঘরে ওষুধের গন্ধ। ডেটলের গন্ধ কিংবা ফিনাইলের গন্ধ, ঠিক কীসের গন্ধ সে বুঝতে পারছে না। সারা রাস্তায় ট্রেনের ধকল গেছে, বিয়ের পাট চুকতে হোমের কাজ শেষ করতে প্রায় রাত কাবার। সারারাত ঘুমোয়নি। সকালেও বান্ধবীরা ছেড়ে যায়নি, ঠাট্টাতামাশায় তাকে উদব্যস্ত করে রেখেছিল। ট্রেনে সামান্য ঝিমুনি, ঘুম বলতে এইটুকু।

শেষে এই বাড়ি।

বাবা বলছেন, এখন থেকে আমরা আর তোমার কেউ না। বাবাজীবনের হাত ধরে বলেছেন, দ্যাখো বাবা ভুলত্রুটি হলে শুধরে নিও। বেয়াইকে বলেছেন, আমার ঘর খালি হয়ে গেল, আপনার ঘর ভরে গেল। আপনি ভাগ্যবান।

এমন সব নানা কথাই মনে পড়েছিল তার। শেষ পর্যন্ত প্রায় অন্ধকার ঘরে কারা তাকে যে নিয়ে এল! পাশে রূপক আছে এই রক্ষা। সে এখনও কাউকেই নিজের মনে করতে পারছে না। অপরিচিত মানুষজন যে যা বলছে করে যাচ্ছে।

রূপক বলল, দাঁড়িয়ে থাকলে কেন। প্রণাম করো। আমার ঠাকুরমা।

বৃদ্ধা উঠে বসার চেষ্টা করছেন। তারপর কেমন মিনমিনে গলায় বললেন, কাপড়টা পরতে দে বাবা। বোধহয় এতই কাহিল, সারাদিন এই ঘরটা থেকে নড়তে পারেন না। অস্থিচর্ম সার এই বৃদ্ধাকে প্রণাম করার সময় কেমন একটা অস্বস্তি হচ্ছিল। চোখ কোটর গত। চুল শণের মতো, নাতবউকে একজোড়া বালা দিয়ে আশীর্বাদ করলেন। রূপকের সম্পর্কে এক পিসি বালাজোড়া পরিয়ে দিল। সে তো কিছু বলতে পারছে না। বুড়ি ঠাকুমার দিকে তাকাতে পর্যন্ত ভয় পাচ্ছে। বুকের হাড়-পাঁজর দেখা যায়, কতক্ষণে বের হয়ে আসবে।

এই বাড়িতে তাকে থাকতে হবে। তিনি যদি ঘরের বার না হতে পারেন অস্বস্তি কম হবে। যদি বের হতে পারে, সারাদিন প্রায় যেন, তবে চামড়া দিয়ে ঢাকা একটা কঙ্কাল তার সঙ্গে ছায়ার মতো ঘুরে বেড়াবে। কেমন আতঙ্ক ধীরে ধীরে তাকে গ্রাস করছিল।

রাতে রূপক বুকে টেনে নিলে বলল, তোমার ঠাকুমার কী অসুখ?

অসুখ হবে কেন। বয়সের ভার।

চলাফেরা করতে পারেন?

পারেন। তবে বিছানা থেকে একা নামতে পারেন না। ধরতে হয়। দেয়াল ধরে হাঁটেন। বিছানায় পড়ে থাকলে বেডসোর হতে পারে। বাবাকে যমের মতো ভয় পান। সকালে বাবা ধরে নিয়ে যান, বারান্দার ইজিচেয়ারে বসিয়ে দেন। যেখানে বসিয়ে দেবেন, আর নড়বেন না।

চাঁপা বলল, জান আমার না ভয় করে।

কীসের ভয়।

কী, ভয় বুঝতে পারছি না।

সে বলতে পারছে না, বাথরুম কিংবা কোনো কাজে একা পড়ে গেলে, তিনি যদি হেঁটে এসে সামনে দাঁড়ান, তার সাহস নেই সামনে দাঁড়িয়ে থাকার।

বাড়িটাতে অবশ্য লোকজন কম না। শ্বশুর শাশুড়ি ননদ জা এবং তাদের ছেলেমেয়ে, দুই মেয়ের জামাই, বাড়িটায় অনেকগুলি ঘর, ঘরের মতোই মানুষজনেরা গিজগিজ করছে। ছোটো দুই দেওর ঠাকুমাকে টেনে তুলে দাঁড় করিয়েছে। বুড়ি রসিকতায় বেশ তুখোড়, কি লা কোমরে জোর আছে তো। দেখিস মিনসের চাপে তুবড়ে যাস না।

অশ্লীল কথাবার্তা। সে তো একমাত্র মেয়ে, বাবা রেলে কাজ করেন। কত দেশ তারা দেখেছে, ঘুরেছে। মা বাবা আর সে। স্কুলের বাসে ফিরেছে। কোয়ার্টারের লনে ব্যাডমিন্টন খেলেছে। সাদা ফ্রক গায়, পায়ে কেডস। তারপর তার নিজের টেবিল, জটায়ুদা এক গ্লাস দুধ নিয়ে হাজির—দুধ দেখলেই তার মাথা গরম, কত সাধ্যসাধনা, এবং সে কখনো কোনো বুড়ো মানুষ বাড়ির আত্মীয়স্বজনদের মধ্যে দেখেনি। এমন অস্থিচর্মসার তো নয়ই। তার দাদুমণি ঠাকুমা, দিদিমা দাদু বেড়াতে এসেছেন, কিন্তু কী সবল আর হাসিখুশি! মানুষের মুখ তোবড়ানো টিনের মতো হয়, আর দেখলে ভিতরটা এত ঠাণ্ডা মেরে যায় রূপকের ঠাকুমাকে না দেখলে বিশ্বাসও করতে পারত না। কী বিকট চোখ মুখ। ঠোঁট দুটো সাদা। ঠোঁটের কশে ঘা। দাদুমণি মারা গেলে বাবা একা গেলেন। ঠাকুমার এখন-তখন, বাবা সবাইকে নিয়ে দেশের বাড়িতে গেলেন। সেও কাটোয়া ইস্টিশনে নেমে ছোটো লাইনে, তারপর কিছুটা গোরুর গাড়ি এবং হাঁটা পথে। সে যে খুব বিরক্ত বাবা ফিরে এসে ভালোই টের পেয়েছিলেন। তবে বাবার জ্ঞাতিগুষ্টির কেউ বুঝতে পারেনি, গাঁয়ের বাড়িতে চাঁপার দম বন্ধ হয়ে আসছে। ময়লা, নোংরা জামাকাপড়, হাঁটুর ওপর ধুতি, গালে দু-

পাঁচদিনের বাসি দাড়ি, দরকচা মারা সব মানুষজন, আলাদা বাথরুম নেই, আলো নেই, পাখা নেই—সে হাঁপিয়ে উঠেছিল।

এই বাড়িটায় সব আছে। একতলা বাড়ি, বিশাল ডাইনিং স্পেস। ছেলেদের আলাদা ঘর। শেষদিকের দুটো ঘরে রূপকের বাবা মা থাকেন। সে রূপকের বাবাকে এখনও বাবা বলে ডাকতে পারছে না। তবে রূপকের মাকে মা ডাকতে সংকোচ হচ্ছে না তার। সে সারাদিনই মা মা করছে। বাড়িটার সব এত সুন্দর, কেবল বিকট ভূতুড়ে বুড়িটা বাড়িটাকে হত কুৎসিত করে রেখেছে। একদম বেমানান।

বউভাত হয়ে যাবার পর বাড়ি খালি হয়ে গেল।

চাঁপা এখনও কাজে হাত দেয়নি। মা বলছেন, তোমরাই তো করবে। আমার তো বয়স হয়ে গেল। আর পেরেও উঠি না। কাজের লোকের হাতে রান্না কেউ খেতে চায় না। তৃপ্তি পায় না। নিজের মানুষদের জন্য রান্নাবান্নায় আনন্দ আছে চাঁপা। আনন্দটা খুঁজে নিতে হয়। যতদিন পারব, করব। তারপর তোমরা ছাড়া কে করবে।

চাঁপা দরজার পাশে হেলান দিয়ে সব শোনে।

নাও। তোমার ঠাকুমার ঘরে চা দিয়ে এস। ব্যস শরীরে জ্বর এসে যায়। বুড়ি কীভাবে পড়ে আছে কে জানে। ঘরটায় ঢুকতেই তার ভয় হয়। সারা গা চুলকায়। মরামাস ওঠে। হাঁটুতে দগদগে ঘা। মলম লাগানো বলে ঘা আরও কুৎসিত দেখায়। ঘরে ঢুকলে পচা গন্ধও পায়। পা দুটো অস্বাভাবিক ফোলা। যেন টিপে দিলে পুঁজরক্ত বের হয়ে আসবে। মাথার চুল কাগে বগে ঠুকরে নিয়েছে।

মা, ঠাকুমা সকালে চা খায় বুঝি?

খায় পেলে। বুড়ো মানুষ, মাথাও ঠিক নেই। সবাই খেলে তাঁকে দিতে হয়। খান না-খান দেখি না। খুশি থাকলে খাবেন, অখুশি থাকলে কিছুতেই খাওয়ানো যাবে না। তোমাকে দেখে খুব আহ্লাদ হয়েছে। গুনগুন করে গান গাইছিলেন। তোমার বাবাকে ডেকে বললেন, নতুন বউকে আমার পাশে বসে থাকতে বলো।

মা।

কী!

আমার বাথরুম পেয়েছে।

ঠিক আছে যাও। আমি দিয়ে আসছি।

বউমা তুমি! নাতবউ কোথায়।

ও বাথরুমে গেছে।

আমার নাতবউ কী সুন্দর! ঘর আলো করে রেখেছে। ও কাছে থাকলে বড়ো আনন্দ হয়।

চাঁপা বাথরুমে ঢুকে অক অক করে বমি করল। কেন ওক উঠে এল বুঝতে পারছে না। তারপর মুখ মুছে আয়নায় মুখ দেখল। বড়ো সিঁদুরের ফোঁটা কপালে, সিঁথিতে সিঁদুর রক্তবর্ণ ধারণ করে আছে। সে যে সত্যি ঘর আলো করে আছে আয়নায় নিজেকে দেখলে আরও বেশি টের পায়। ভুরু প্লাক করা। চোখে আইল্যাশ। সকালে ঘর থেকে বের হবার সময়, একেবারে পরিপাটি হয়ে বের হয়েছে। ঘরে ঘরে অ্যাটাচড বাথ। রূপক ঘরে নেই। ঘরে ঢোকার আগে দরজা বন্ধ করে দিয়েছিল।

বাড়িটা এত সুন্দর, আর এই বৃদ্ধা বাড়িটাতে কেন যে আছে! না থাকলে কি ক্ষতি ছিল! বাড়ির এক কোণায় পড়ে থাকলেও যেন এক কদর্য অনুভূতি সারা বাড়িটায় ছড়িয়ে রেখেছে।

তোমাকে ডাকলাম, সাড়া পেলাম না। কোথায় ছিলে।

না মা, আমি শুনতে পাইনি। ঘরেই ছিলাম।

আতঙ্ক আবার সেই অন্ধকারে মৃতপ্রায় এক রমণীর কাছে তাকে গিয়ে না দাঁড়াতে হয়। মা বললেন, ভয় কীসের। যা কিছু দেখছ সবই তাঁর দয়ায়। তিনি ছিলেন বলে এই সংসার। তোমার বাবারা চার ভাই দু-বোন। কেউ ফেলনা নয়। তিনি তো গাছের মতো আছেন। কত সকালে ফুল ফুটেছে, ফল হয়েছে তারপর হাওয়ায় বীজ উড়ে গেছে কখন, তিনি নিজেও জানেন না। বীজ এখন গাছ হয়ে গেছে। নতুন গাছে নতুন ফুল। ফল। সব কিছু। তাঁকে ভয় পাবার কি আছে। তিনি তো ন্যাড়া গাছ।

শাশুড়িমা ঠিক ধরে ফেলেছেন। সে ঘরটায় যেতে অস্বস্তি বোধ করছে।

বরং নিজের মতো বউমা কাজ খুঁজে নেয়। ঘরে ঢুকে টেবিল চেয়ার, ঝাড়ন দিয়ে পরিষ্কার করে। গ্রিলের ময়লা ন্যাকড়ায় মুছে দেয়। এক দণ্ড যেন তার বসে থাকার উপায় নেই। আসলে তিনি কখন কী বেশে থাকবেন তাও বলা যায় না। সর্বাঙ্গ খালি। কেবল কোমরের নীচে কোনোরকমে কাপড়টুকু গুঁজে রাখেন। গায়ে কিছু রাখতে পারেন না। বুক শুকিয়ে স্তন দুটি জরুলের মতো হয়ে গেছে। চামড়া কুঁচকে অসাড় হয়ে গেছে। মানুষকে তো আর মেরে ফেলা যায় না যতদিন আছে সেবা শুশ্রূষা করে যেতেই হবে।

চাঁপা সারাক্ষণ এ-ঘর ও-ঘর করে। শুধু ওই ঘরটার দিকে তাকাতে পারে না। খেতে বসলেও অস্বস্তি। কখন না বের হয়ে এসে পাশে দাঁড়ান—মাথায় হাত রেখে নাতবউকে আদর করেন। পারতপক্ষে সে একা খেতে বসে না। খাওয়া তো নয় গেলা। তারপর

নিজের ঘরে সারা দুপুর দরজা বন্ধ করে থাকা। রূপকের মোটরবাইকের শব্দ পেলেই সে উঠে বসে। জানালা খুলে মুচকি হাসে। ধড়ে তার প্রাণসঞ্চার হয়।

ওই ঘরটা এড়িয়ে চলার বিষয় ধীরে ধীরে সবার নজরে পড়ে গেছে। চাঁপা অপরাধী মুখে সবার সঙ্গে কথা বলে। শ্বশুরমশাই ঘরে তখন শাসাচ্ছেন, কাপড় খুলে ফেলছ কেন? চল বারান্দায় বসবে।

শরীরে কী আর কাপড়ের দরকার আছে বাবা। কাপড় যে রাখতে পারি না। এখন থাক সময় হলে না হয় কাপড় দিয়ে সারা শরীর ঢেকে দিস।

বাবা বোধহয় জোর করে শায়া পরিয়ে দিচ্ছে।

বুড়ির চিলচিৎকার, আরে অধম্মের বেটা, আমাকে তুই মেরে ফেলতে চাস। শরীরে কিছু না থাকলে কী হয়!

চাঁপা জানে বাবা নিজেই বুড়ির কাপড় শায়াতে গুঁজে, সারা শরীর কাপড়ে ঢেকে, ধরে ধরে বারান্দায় এনে বসিয়ে রাখবেন। যতক্ষণ পারা যায়, ঝিম মেরে বসে থাকেন আর বিড়বিড় করে বকেন। শাপশাপান্ত করেন কি না সে জানে না। কারণ বুড়ি যেদিকটায়, সে তার বিপরীত দিকে। চোখে পড়ে যাবে ভেবে সে এখন সোজা তাকিয়ে হাঁটে না।

দেখলে বমি উঠে আসে।

মানুষ তো না কঙ্কাল। রাতের বেলা ঘরে একলা ঢুকতেও ভয়। রূপক কিছুক্ষণ তার ঠাম্মার ঘরে বসে মজা করে। অন্য দুই দেওর মন্টু ও রন্টুও ঠাম্মাকে নিয়ে রঙ্গেরসে মেতে যায়। তার তখন রাগ হয়। ঘেন্নাপিত্তি নেই।

রূপক ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে জড়িয়ে ধরতে গেলেই এক কথা—না। আমার কিছু ভালো লাগছে না। হাত পা ভালো করে ধুয়ে এসো। তারপর চোখের জলে ভাসায়। বাপের বাড়ি দিয়ে আসতে বলে। এত আতঙ্ক আর অস্বস্তি নিয়ে সে এই সংসারে আর লেপটে থাকতে রাজি না। বুড়ির শেষ খবর পেলে সে আবার ফিরে আসবে। তবে মুখে কিছু বলে না। মাঝে মাঝে বাপের বাড়ি যাবার জন্য বায়না ধরে ঠিক, কিন্তু সবাই বুঝিয়ে বললে, নিজেকে কেন জানি বোকা লাগে। রূপককে ছেড়ে থাকতেও তার এখন কষ্ট। কী যে করে।

সারাদিন আজ সে ওদিকে মাড়ায়নি। সে আজ বেশ খুশি। জানালায় তার মুখ—যে যায় সেই বলে ধীরাজবাবুর পুত্রবধূ লক্ষ্মী প্রতিমা। কী সুন্দর। চোখ আছে ভদ্রলোকের। সে তখন আয়নায়, সে তখন বাথরুমে, নিজেকে দেখতে দেখতে কেমন অভিভূত হয়ে পড়ে। পুষ্ট স্তন, উরুমূলে বিজলি বাতির প্রভা, কালো মেঘের মতো চুলের ঢেউ, আর শরীরে আশ্চর্য সুষমা। বড়ো হতে হতে টের পেয়েছে, শরীরে একটা ফোসকা পড়লেও কষ্ট।

দামি লোশন, এবং বাজারের সব বিজ্ঞাপনের ছবির মতো তার বাড়িটায় উড়ে বেড়াতে ভালো লাগে। কেবল ওই ঘরটার দিকে চোখ গেলেই হিম হয়ে যায় শরীর।

সাঁঝবেলার আগেই ছাদ থেকে সে সবার জামা প্যান্ট শাড়ি শায়া নামিয়ে আনে। রবিবার বলে রূপক বিছানায় আটকে রেখেছিল, সারা দুপুর বিকেল সে শরীরের সর্বস্ব দিয়ে রূপকের সঙ্গে মেতেছিল—তারপর বাথরুম এবং আয়না, পাতায় আইল্যাশ, চোখের নীচে নীলাভ রঙের পালকের স্পর্শ সেরে যখন বের হয়ে এল একেবারে অপ্সরা।

ও বউমা ছাদ থেকে জামাকাপড় নামিয়েছ? এ-কাজটা এখন সে বাড়ির করে থাকে। জিভ কেটে দৌড়ে সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠে গেল। আশ্চর্য আকাশ মাথার ওপর, নীল নক্ষত্র আকাশে ভাসমান, বসন্তের শীতল হাওয়া—তার ছাদ থেকে নেমে আসতে ইচ্ছে হচ্ছে না। আর তখনই মনে হল, এই বাড়ির এক কোণে জ্যান্ত এক নরকঙ্কালের বাস। সঙ্গে সঙ্গে ভয়। ছুটে তার থেকে সব টেনে পড়িমরি করে নেমে আসতেই সে দেখল চাতালের অন্ধকারে কিছু নড়াচড়া করছে। সে কাছে যেতে সাহস পাচ্ছে না। তবু নামতে হবে। সিঁড়ির পাশে কেউ—কে সে! অন্ধকারে দেখল, বুড়ি খুট খুট করে ট্রাঙ্কের ভিতর চাতালের নীচে কী খুঁজছে।

শরীর তার হিম হয়ে গেল। বেহুঁশ। কোনোরকমে দেয়াল ধরে বসে পড়ল। তারপর গোঙানি।

এই ঘটনার পর পরই বউমাকে ধীরাজবাবু বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দিলেন। তারপর যা হয়—বর্ষা নামতেই বাড়ি ফাঁকা করে তিনিও চলে গেলেন। শরীর তাঁর সাদা চাদরে ঢেকে দেওয়া হল।

খবর পেয়ে আত্মীয়স্বজন, চাঁপা এবং তার বাবা মা ভাই বোন সবাই এল। সবারই কৌতূহল, সিঁড়ির চাতালের নীচে কী দেখে ভিরমি খেয়েছিল বউমা!

ঠাকুমা চাতালের নীচে কী খুঁজছিল।

কী করে হয়! মাকে ধরে না নিয়ে গেলে কখনো যেতে পারেন না।

আমি যে দেখলাম বাবা।

ধীরাজবাবু বললেন, ওখানে আছে তো কটা ভাঙা ট্রাঙ্ক। মা ফেলে আসতে চাননি দেশের বাড়ি থেকে। সঙ্গে নিয়ে এসেছেন।

সিঁড়ির চাতালের নীচটা পরিষ্কার করতে গিয়ে চাঁপা সুন্দর কারুকাজ করা একটা কাঠের বাক্স পেয়ে গেল একদিন। সে গোপনে ঘরে নিয়ে বাক্সটা খুলল। কিছুই নেই।

সাদা ন্যাকড়ায় জড়ানো একটা খাম। খুব যত্নের সঙ্গে রাখা। খামে আশ্চর্য সুন্দর এক টুকটুকে নতুন বউয়ের ফোটো।

সে ছুটে গেল বারান্দায়।

ধীরাজবাবু চা খাচ্ছিলেন।

কী ব্যাপার! হাঁপাচ্ছ কেন!

দেখুন দেখুন। কী সুন্দর না দেখতে নতুন বউটি! ছবিটি দেখে ধীরাজবাবু বললেন, আমার মার ফোটো। যেই বাড়িতে আসত, বলত, হ্যাঁ অন্নপূর্ণাই বটে। কী সুন্দর চোখ মুখ। ছবিটা মা কিছুতেই হাতছাড়া করত না। কোথায় পেলে! আমরা কিছু বললে, বলতেন, কোথায় রেখেছি মনে করতে পারছি না। মা বোধহয় সেদিন সিঁড়ির চাতালের নীচে ছবিটা খুঁজতে গেছিলেন। নিজের ছবির সঙ্গে মানুষের শেষ ছবির তফাত কত খুঁজে দেখছিলেন বোধহয়।

টটনের কুকুর

টটনের বাবা খুব গরিব। কিছু জমিজমা, পুকুর ছাড়া টটনের বাবা মনমোহন বলতে গেলে ফকির। টটনের ভাইবোন মেলা। মা-ঠাকুমা তো আছেনই। জমিজমায় চলে না। প্রথমে কোপটা পড়ল টটনের ওপর। ওর লেখাপড়া বন্ধ। জমির কাজে লেগে গেলে সংসারে দু-পয়সা আসে। গোরু-বাছুর সামলালে মনোমোহনের কাজ হালকা।

টটনের বাবা গরিব বলে, তাকে সবাই 'ফকিরের ব্যাটা' বলে। গাঁয়ে আত্মীয়স্বজনের বাড়িতে গেলেও ফকিরের ব্যাটা। অবশ্য টটনের দোষও আছে। যে কেউ ভালোমন্দ খেলে তার খেতে ইচ্ছে হয়। সে হাত পাতে। টটনকে দেখলেই তারা খাবার লুকিয়ে ফেলে।

টটন টের পায়।

এই যেমন নব, ওর বাবার চায়ের দোকান। দোকানে নবও মাঝে-মাঝে বসে। বসলেই লজেন্স-বিস্কুট সরায়। পালিয়ে খেতে দেখলেই টটন ছুটে যাবে, কী খাচ্ছিস রে? তাড়াতাড়ি পকেটে যাই থাকুক লুকিয়ে ফেলার চেষ্টা করে নব।

কিন্তু টটন ছাড়বার পাত্র নয়।

তখন নব বলবে, আন, এক বালতি জল।

সে জল নিয়ে আসে এক বালতি।

তারপর বলবে, কাপ-প্লেটগুলো ধুয়ে রাখ।

টটন খুশিমনেই কাপ-প্লেট ধুয়ে দিলে হয়তো দুটো লজেন্স দিয়ে বলবে, ভাগ ফকিরের ব্যাটা!

এতে সে কিছু মনে করে না। তার বাবা ফকির, গরিব আর ফকিরের তফাতই বা কি? তা ফকিরের ব্যাটা বললে সে খুশিই হয়।

খুশিতে সে আরও দু-একটা ফাউ কাজ করে ফেলে।

পাড়াপ্রতিবেশীরাও টটনকে দেখলে ফাউ কাজ করিয়ে নেওয়ার তালে থাকে।

গাছ থেকে আম পাড়।

সে আম পেড়ে দেয়।

একটা আম হাতে দিলেই খুশি।

সাইকেলটা সাফ কর। কাদা মুছে ফেল।

টটন সাইকেল ন্যাকড়া দিয়ে ঝকঝকে করে ফেললে—দশটা পয়সা। হাত পেতে নেবে আর দেখবে। কোথায় যে রাখবে! জামা নেই গায়ে। প্যান্টের পকেট ছেঁড়া। যা রাখে সবই পড়ে যায়। সেই টটন একদিন জমিতে বাপকে ভাত দিয়ে ফেরার সময় এক কাণ্ড। কোথা থেকে একটা কুকুরের বাচ্চা ল্যাংচাতে-ল্যাংচাতে বাবুর অনুসরণ করছে।

সে রেগে যায়। সে গাল দেয়, ফকিরের ব্যাটা আমার লগ ধরলি! যা। আমার পকেটে কিছু নেই।

টটনের ধারণা, কুকুরের বাচ্চাটা সেয়ানা। খাবারের লোভে তার লগ ধরেছে। পকেটে যে কিছু নেই, তাও নয়। লেড়ো বিস্কুটটি সে পেয়েছে পীতাম্বরের দোকান থেকে। একটা বিস্কুট দিয়ে তাকে মেলা ফাউ কাজ করিয়ে নিয়েছে। এতে সেও খুশি, পীতাম্বরও খুশি। তার সেলাই-কলের দোকান। ঘর ঝাঁট দেওয়া থেকে খাবার জল কল থেকে তুলে দিয়ে এসেছে।

বাচ্চা কুকুরটা ঠিক টের পেয়েছে। সে যেমন টের পায় তাকে লুকিয়ে কে কখন কী খায়। সে তো মাত্র একবার লেড়ো বিস্কুটের খানিকটা ভেঙে নিয়েছে, তারই ভেতর নজর পড়ে গেল! ভাইবোনেরা পর্যন্ত টের পায় না। পেলেই ছেঁকে ধরে। আর তুই কোথাকার ফকিরের ব্যাটা টের পেয়ে গেলি! ধাঁই করে একটা লাথি কষাল। কুকুরটা ফুটবলের মতো কিছুটা উড়ে গিয়ে পড়ে গেল। কুঁই-কুঁই করছে। সঙ্গে সঙ্গে টটনের মনে হল, পা-টা কে যেন খামচে ধরেছে! পা-টা সরিয়ে নিল। টটন বেশ ঘাবড়ে গেছে।

সে হাঁটা দিল। আমবাগানের ভেতর থেকে দেখল, কুকুরটার লজ্জা নেই। আবার পায়ে-পায়ে ল্যাংচাতে-ল্যাংচাতে হাঁটছে। তার পিছু নিয়েছে। আর পারা যায়! বিস্কুটের খানিকটা ভেঙে দিয়ে বলল, নে। খবরদার আর পা বাড়াবি না। নুয়ে সে পা দেখল। পায়ে দুটো দাঁত ফোটাবার দাগ। কীসের দাগ, বুঝল না। কে শোনে কার কথা! কুকুরটা ল্যাংচাতে-ল্যাংচাতে ফের তার পিছু-পিছু আসছে। যত দেয়, তত কুকুরটা ল্যাংচায়। আর কুঁই-কুঁই করে। টটনের মহা মুশকিল। বাড়ি গিয়ে উঠলে মায়ের তেজ, নিজের খেতে ঠাঁই নেই শঙ্করাকে ডাকে!

মায়ের দোষ নেই। বাবা না আনতে পারলে দেবেন কোত্থেকে। তবে একবার বোঝাতে পারলে, তার মায়ের মতো মা হয় না। যদি বুঝে যান—তখন মা নিজেই ডাক খোঁজ করবেন। আরে নিজে খেলি, কুকুরটাকে দিলি না। ভগবানের দান, যাবে কোথায়!

তা কুকুরটাকে দেখে মাও কেমন খুশি। বাবা জমি থেকে ফিরে বললেন, কুকুরটার ঠ্যাং ভাঙল কে? ল্যাংচাচ্ছে। তোমার ছেলের কাজ নয় তো!

টটন রাস্তায় দাঁড়িয়ে সব শুনতেই দৌড়ে গেল। বাবার মেজাজও কুকুরটিকে দেখে অপ্রসন্ন নয়। বাবা-মা খুশি থাকলে সেও খোশমেজাজে থাকে। সে বলল, কী পাজি এটা, মাঠ থেকে লগ ধরেছে। কিছুতেই যাবে না। আমার সঙ্গে বাড়ি উঠে এল। লাথি মারলাম। তাও না। অবশ্য লাথি মারার সময় কে যেন খামচে দিয়েছিল। সে-কথা বলল না।

খামচে দিয়েছিল, না কামড়ে দিয়েছিল—সে তা ঠিক মনে করতে পারছে না। তবে গোড়ালির জায়গাটা লালায় ভেজা মনে হয়েছিল। দাঁতের কামড়ও। তবে শুধু দাগ। কামড় জোরে বসায়নি রক্ষে।

কে যে কামড়াল! কুকুরের কামড়ের মতো। অবশ্য এ-নিয়ে ভাবে না। কোথাও ছিল, ঝোপজঙ্গলে পালিয়ে গেছে। তবে বাচ্চা কুকুরটা নয়। কারণ এটা তো ধানের জমিতে ছিটকে পড়েছে। বললে, তরাস লেগে যাবে। মা বলবেন, আরে বলছিস কী! কই দেখি আয় তো। চেঁচামেচি শুরু করে দেবেন।

ছোটোভাই মটর বলল, দাদা, কী সুন্দর না দেখতে। কুকুরটার নামও সে দিয়ে দিল। টুটু।

মটরের মাথা সাফ। বাবা তার স্কুলের পড়া গজব করেননি। টটন এজন্য রাগ পুষে রাখেনি। তার যখন হবে না, আর তার তো বই দেখলেই রাগ ধরে যায়—এত খোলামেলা বাড়ি, গাছপালা, গোরু-বাছুর, জমিতে ফুলকফি-বাঁধাকপির চাষ, এক হাতে বাবা সামলাতেও পারেন না। সে বাবার কাজে লেগে গিয়ে ভালোই করেছে। সংসারের সাশ্রয়। তার নাম টটন, কুকুরের বাচ্চাটার নাম টুটু। টটনের কুকুর টুটু।

বাচ্চাটাকে বাংলা সাবান দিয়ে স্নান করাবার সময় দেখল একটা পায়ে বেশ বড়ো ক্ষত। মাকে দেখাল। মা চুন-হলুদ গরম করে লাগিয়ে দিতেই কুকুরটির আরাম বোধ হচ্ছে টের পেল টটন।

পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠেই মনোমোহন দেখতে পেলেন, একজন কাপালিক গোছের লোক, গাছের নীচে বসে আছেন।

মনোমোহন উঠোনে দাঁড়িয়ে সবে সূর্যপ্রণাম করছেন।

আমার কুকুরটা?

মনোমোহন তাকালেন। কাপালিক মানুষকে সবাই ভয় পায়, সে কাছে গিয়ে বলল, ‘কিছু বলছেন ঠাকুর?’

আমার কুকুরটা?

কুকুরের কথা শুনে সবাই উঠোন পার হয়ে গাছতলায়।

মটর বলল, এখানে কোনো কুকুর নেই।

আছে। একটা বাচ্চা কুকুর। কালো রং। এক পা খোঁড়া।

আরে টুটুর কথা বলছেন? সে দৌড়ে ঘরে ঢুকে বলল, দাদা, টুটুকে নিতে এসেছে।

কে? টুটুকে কে আবার নিতে এল!

টুটু কিছুতেই কোল থেকে নামবে না। মা চেঁচাচ্ছেন, দিয়ে দে বাবা? কার মনে কী আছে কে জানে।

মা ঠাকুর-দেবতাকে ভয় পান, সাধুসন্তের ভয়ে কাবু থাকেন। টটন জানে, যার কুকুর তাকে দেওয়াই ভালো। কি না আবার অনাসৃষ্টি শুরু হবে। সে কুকুরটাকে নামিয়ে দিলেই কুঁই-কুঁই করতে লাগল। যাবে না। কাপালিক গোছের লোকটি যেই না টুটুকে খপ করে ধরতে গেলেন, কী হল কে জানে, ওরে বাবা এ তো আগুন রে বাবা। লোকটা ধপাস করে পড়ে গেলেন, না কিছু দেখে ঘাবড়ে গেলেন, বুঝল না। লোকটা চিমটে, ত্রিশূল থলে নিয়ে দৌড়োতে লাগলেন। যেন কেউ ঠেলে ফেলে দিয়েছিল তাঁকে।

সবাই তাজ্জব।

বাবা বললেন, কী হল, পড়িমরি করে ছুটে পালাল কেন? যেন কেউ ঠেলে দিল লোকটাকে। কোনোরকমে প্রাণে বেঁচে গেছে।

টটন বলল না, তারও মনে হয়েছে। পায়ে কীসে কামড়ে দিয়েছিল। তবে দাঁত ফোটায়নি। তাই রক্ষে।

টটন বলল, লোকটা মিছে কথা বলছে বাবা। কুকুরটাকে আমি তো নীলপুকুরের পাড়ে পেয়েছি।

সে যা হোক, কুকুর নিয়ে আর কেউ পরে কথা চালাচালি করেনি। জবরদস্ত কাপালিক কোন সুবাদে বাড়িতে হাজির, কী করেই বা জানলেন, টুটু মনোমোহনের বাড়ি গিয়ে উঠেছে তাও তারা বুঝল না। তবে কুকুরটার মধ্যে কিছু একটা আছে। মা তো একেবারে চুপ। বাবা বললেন, দ্যাখ, যেন পালিয়ে না যায়। কী আবার বিপদে পড়ব বুঝতে পারছি না।

টুটুকে নিয়ে শীতকালটা মজারই ছিল। ভালো খেতে পেয়ে নাদুসনুদুস, গড়িয়ে-গড়িয়ে হাঁটে। সর্বক্ষণ টটনের সঙ্গে। সে জমিতে গেলে টুটু জমিতে, সে ঝোপজঙ্গলে ঘুরে বেড়ালে, সঙ্গে টুটু। সে যা পায় সবই দুজনে ভাগ করে খায়।

একদিন এক ছাগলের ব্যাপারী বাড়ি হাজির। সেও বলল, তার কুকুর হারিয়েছে। এই বাড়িতেই আছে।

বাবা রেগে গিয়ে বললেন, 'কুকুর হারালেই আমার বাড়ি! এ তো আচ্ছা ঝামেলা।' সোজা জবাব, না, এখানে কুকুরটুকুর নেই।

আছে। আপনি জানেন না। মিছে কথা বলছেন।

আরে, মিছে কথা বলব কেন! বলছি কারো কুকুর আমার বাড়ি আসেনি। আমাদের কুকুর ছাড়া অন্য কোনো কুকুর আমাদের বাড়িতে নেই।

ওটাই আমার। দেখান। বলে পাঁচনখানা বগল থেকে নিয়ে হাতের ওপর ঘোরাতে থাকল।

টটন কোথা থেকে এসে শুনেই খাপ্পা। সে টুটুকে বগলে তুলে গাছতলায় দৌড়। ব্যাপারীকে বলল, এটা?

হ্যাঁ, এটা। এটাই আমার কুকুরের বাচ্চা!

আর যায় কোথায়। পাঁচনটাচন ফেলে লোকটা চিত হয়ে পড়ে গেল। আর্ত ডাক, বাঁচান কর্তা। আমারে খেয়ে ফেলল। যেন লোকটাকে কেউ আক্রমণ করছে। পা ছুঁড়ছে, হাত ছুঁড়ছে—গড়াগড়ি খাচ্ছে। এক হাতে কাপড় সামলাচ্ছে, অন্য হাতে পাঁচন দিয়ে আক্রমণ—যেন সামাল দেওয়ার চেষ্টা করছে।

টটন, তার বাবা, মা এমনকী, দু-একজন প্রতিবেশীও হাজির। আর দেখল, লোকটা প্রাণভয়ে দৌড়োচ্ছে। বলছে, ওরে বাবা রে, আমাকে কামড়ে দিল রে!

টটন, বাবা, প্রতিবেশীরা অবাক। লোকটার পা থেকে রক্ত চুঁইয়ে পড়ছে।

মনোমোহনের মাথা ঘুরছে।

কুকুরের বাচ্চাটার দিকে মনোমোহন তাকালেন। ওটা তো টটনের কোলেই আছে। কেমন ত্রাসে পড়ে গেলেন। বাচ্চাটাকে রাখা উচিত-অনুচিতের কথাও ভাবছেন। কিন্তু মুখ ফুটে কিছু বলার সাহস নেই।

মনোমোহনের ছেলেকে প্রশ্ন না করে পারলেন না, নীলপুকুরের কাছে কোথায় পেলি?

জমিতে। ওই সেখানে করদের জমিতে। পাশটায় হোগলা বন আছে, বন থেকে বের হয়ে এল।

মনোমোহন জানেন, নীলপুকুরের বেলগাছটা ভালো না। দোষ পেয়েছে। ওঁর ধারণা ছিল যদি বেলগাছটার নীচে কুকুরের বাচ্চাটাকে পায়, তবে গাছের দোষ কুকুরেও বর্তাতে

পারে। রাতেবিরেতে কেউ বড়ো গাছটার নীচ দিয়ে আসে না। গাছটায় নীরদা গলায় ফাঁস দিয়েছিল। কিন্তু জমিতে পাওয়া গেলে গাছের দোষ দেওয়া যায় না! খুব বেশি বলাও মুশকিল। কে আবার অদৃশ্যলোক থেকে তাকেই না আক্রমণ করবে। কিংবা কামড়াবে। ব্যাপারী তো ছুটেই পালাল, সবাই দেখেছে গোড়ালি থেকে, হাঁটুর নীচ থেকে চুঁইয়ে রক্ত পড়ছে। কুকুরে কামড়ালেই এমনটা হওয়ার কথা।

কিন্তু বাচ্চাটা তো টটনের কোলেই ছিল। কামড়াবে কি করে! বাচ্চা কুকুর কামড়াতেও জানে না। লোকটারই বা দোষ কী। তার কুকুর যদি হয়, সে বলতেই পারে, কুকুরটা আমার। আমার বাচ্চা কুকুরটাকে টটন চুরি করে এনেছে। টটন আনতেও পারে। মারের ভয়ে সে কখনো সত্যি কথা বলে না। কিন্তু নিজের চোখের ওপর দেখার পর টটনের গায়ে হাত তোলা তো দূরে থাক, তোষামোদের বাড়াবাড়ি শুরু হয়ে গেল।

টটনের দিকে তাকিয়ে মনোমোহন বললেন, সত্যি বলছিস, জমিতে পেয়েছিস!

বা রে, মিছে কথা বলি কখনো!

না, তুই মিছে কথা আর কবে বললি। ধর্মপুত্তুর, মুখে এসে গিয়েছিল, তবে বললেন না। কারণ কীসে কোন আপদ সৃষ্টি হবে, তা তিনি নিজেও জানেন না। খুবই বিনয়ের গলায় বললেন, বলছিলাম, যার কুকুর তাকে দিয়ে দেওয়াই ভালো।

মাও বললেন, আমি ভেবেছিলাম, পরপর যা হচ্ছে, তাতে কিন্তু কুকুরটাকে সুবিধের মনে হচ্ছে না।

টটনের এক কথা, কুকুরটা কি তোমাদের কামড়ায়, না রাতে ঘেউ-ঘেউ করে? তোমাদের ঘুমের কি ব্যাঘাত হয়, বলো!

না, তা অবশ্য করে না। তোর বুকের কাছে শুয়ে থাকতে পারলেই নিশ্চিন্তি। চোর-ছ্যাঁচোড়ের ভাবনা তার নেই। ডাকাডাকির বিষয়টা কুকুরটা জানেই না। কখনো তো দেখলাম না ঘেউ-করতে। কেবল লেজ নেড়ে এটা-ওটা শুঁকে বেড়ায়। খাবার পেলে লাফায়। তোকে দেখলেই লাফিয়ে কোলে উঠতে চায়।

তবে! টটনের এক কথা। যার কুকুর তাকে দিয়ে দিতে বলছ কেন? আমি জানিই না কার কুকুর! আর কে নেবে? যে আসে সেই তো পালায়। বলো দেবটা কাকে?

এরপর আর কী বলা যায়, মনোমোহন ভেবে পেলেন না। এবারে শীতের ফসল খুবই ভালো হয়েছে। মা লক্ষ্মী তাঁকে ঢেলে দিয়েছেন। এক কেজি, দেড় কেজি মুলোর ওজন। বাজারে দরও ভালো যাচ্ছে। মনোমোহন এত পয়সার মুখ কোনো শীতের মরসুমে দেখেননি। কুকুরটা আসায় তাঁর যেন ধনে-জনে লক্ষ্মীলাভ।

মানুষের হাতে পয়সা এলে যা হয়, খাওয়াপরার লোভ বাড়ে। মনোমোহনও সেই লোভে শহরে রওনা হবেন। ছেলেমেয়েদের জামা-প্যান্ট, পরিবারের একখানা ভালো শাড়ি, নিজের দুটো লুঙ্গি, গেঞ্জি, একটা শার্ট কেনার জন্য শহরে যাবেন।

বাবা শহরে গেলে ভালো মিষ্টিও নিয়ে আসেন। টটন-মটর দুজনেই বাবাকে বাস রাস্তায় এগিয়ে দিতে গেল। মোড়ের বটগাছটার নীচে বাস লোকজন তুলে নেয়। বাবাকে তুলে দিয়ে ফিরে আসবে।

অবাক, কুকুরটা কিন্তু সেই থেকে কুঁই-কুঁই করছে কোলে। কেন করছে বুঝছে না। টটনের বুকে লেপটে থাকতে চাইছে না। টটন ছেড়ে দিল। ছেড়ে দিলেই বাড়িমুখো ছুটতে চাইছে। এত দূর থেকে পথ চিনে না-ও যেতে পারে। বাচ্চা কুকুর ছেড়ে দিতেও ভয়। কোথায় কোন কাপালিক, কিংবা ব্যাপারী ওঁত পেতে থাকবেন কে জানে! কুকুরটাকে জোরজার করেই যেন নিয়ে যাচ্ছে টটন-মটর।

আর বাসে ওঠার সময়ই মনে হল মনোমোহনের, তাঁর কোঁচা ধরে কে টানছে। তিনি পা-ঝাড়া দিলেন। বললেন, কে রে? কেউ তো নেই। কাছেই টটন-মটর দাঁড়িয়ে আছে। বাচ্চাটাও টটনের কোলে। কেবল কুঁই-কুঁই করছে। ছটফট করছে।

আবার পা ঝটকা দিলেন। তাঁর কাপড় ধরে কেউ টানছে। মনে হল, কোঁচা ধরে টানছে। ভারি তাজ্জব ব্যাপার তো! তিনি নেমে পড়লেন। মনে সন্দেহ। বাস কণ্ডাক্টর বললেন, 'আরে উঠবেন তো উঠুন।' কিন্তু উঠতে গেলেই কোঁচা ধরে কে যেন টানছে। যেন এবার কিছুতে পা কামড়ে ধরল। মনোমোহন নেমে গেলেন বাস থেকে। চারপাশে তাকালেন। কেউ নেই। কে তবে পায়ে এত জড়াজড়ি করছে।

বাসটা ছেড়ে দিল।

বিকেলে খবর পেলেন, বাসটা দুর্ঘটনায় পড়েছে। বাসসুদ্ধ লোক নয়ানজুলিতে। সকালেই খবরের কাগজে পড়লেন, বাস দুর্ঘটনায় পঁয়ত্রিশজনের মৃত্যু। ভাগ্যিস মনোমোহন বাসে যাননি। তিনি কুকুরটার দিকে তাকিয়ে রইলেন। মাকে ফিসফিস করে বাবা কী বললেন, টটন বুঝল না।

দুদিনও পার হয়নি। টটন জমিতে বাবার ভাত দিতে গেছে। সঙ্গে কুকুরের বাচ্চাটা।

ফেরার সময় ঝোপজঙ্গলে ঢুকে যাওয়া তার স্বভাব। এদিকটা খুবই শুনশান। বড়ো বড়ো সব গাছ আর জঙ্গলে ভরতি। শিশু গাছই বেশি। রাজরাজড়ার পতিত জায়গা। জঙ্গল খুব বাড়ছেই। তবে শীত শেষ হয়ে যাচ্ছে বলে, ঝোপজঙ্গলের পাতাও ঝরে গেছে। গরিব মানুষেরা কাঠকুটোর জোগাড়ে জঙ্গলে এবারে ঢুকে যাবে। সেও কতবার মরা ডাল, শুকনো ডালপাতা মাথায় করে বাড়ি নিয়ে গেছে। জঙ্গলটা ঘুরে দেখার একটা মোহ আছে। সেই

মোহে পড়ে এমন একটা তাজ্জব কাণ্ড দেখবে সে আশাই করেনি। দুজন ষণ্ডামার্কা লোক কী নিয়ে টানাহ্যাঁচড়া করছে। মারামারি করছে। একজন অন্যজনকে ছোরা দেখিয়ে ব্যাগ কেড়ে নিতে চাইছে। ধুন্ধুমার কাণ্ড। জঙ্গলের মধ্যে অকারণ ব্যাগ নিয়ে মারামারি তার পছন্দ না। আর দেখল, তখনই লম্বামতো লোকটা বেঁটে মতো লোকটাকে মাটিতে ফেলে গলা টিপে ধরেছে। ব্যাগটা পড়ে আছে একপাশে।

সে বুঝল, তাকে দেখতে পেলে রক্ষে নেই। সে দৌড়ে পালাল। কুকুরের বাচ্চাটাও তার পিছু ধরেছে। সড়কে উঠে বেমালুম তাজ্জব বনে গেছে। কাউকে কিছু বলারও সাহস নেই, বাড়িতে নালিশ হবে এবং বাবা ধরে পেটাবেন। ‘আবার জঙ্গলে ঘোরাঘুরি! বলেছি না, জায়গাটা ভালো না।’

সে বাড়ি এসেও চুপ। সে জঙ্গলে ঢুকলেই মা খাপ্পা হয়ে যান।

কিন্তু পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠেই মনোমোহনের মাথায় হাত। বারান্দায় ব্যাগ। কার ব্যাগ, কী আছে, চেঁচাতেও পারছেন না। কার মুণ্ডু কেটে ব্যাগে ভরে রেখে গেছে তাও জানেন না। যা দিনকাল, খুনখারাপি জলভাত। কোনোরকমে ব্যাগের মুখ খুলে উঁকি দিতেই মাথার ঘিলু হজম। তাঁর চোখ ছানাবড়া। জড়োয়া গয়নায় ভরতি ব্যাগ। দামি পাথরটাথরও আছে।

মনোমোহন মাথায় হাত দিয়ে বসে আছেন। তারপর কিছুটা মন শান্ত হলে ডাকলেন, ওগো শুনছ! ওঠো। আমার যে এবার সব যাবে। দ্যাখো কী কাণ্ড! কী করি এখন!

মা দেখলেন। টটনও দেখল। কারও মুখে রা নেই।

মা বললেন, যার ব্যাগ সে ঠিক নিতে আসবে। রেখে দাও। যার জিনিস তাকে ফেরত দেওয়াই ভালো। গরিবের কপালে সুখ সয় না।

বাবা বললেন, সেই ভালো।

টটনও বলল, সেই ভালো।

কিন্তু আতঙ্ক, আবার ব্যাগ নিতে এসে যদি পালায়। তখন তিনি যাবেন কোথায়! থানা পুলিশকে যমের মতো ভয় পান মনোমোহন। আর সেই রাতেই, রাত তখন অনেক। দুজন লোক বাড়িতে হাজির। টর্চ জ্বেলে বলল, মনোমোহন!

মনোমোহন দরজা খুলে বাইরে বের হলেন না। চুপি দিয়ে বললেন, আপনাদের কিছু হারিয়েছে?

হারিয়েছে মানে! তোমার পুত্র ব্যাগ নিয়ে পালিয়ে এসেছে। দাও। কিছু খোয়া গেলে পরিবারের কেউ বেঁচে থাকবে না। খবর ফাঁস হলেও খুন!

মনোমোহন বললেন, আজ্ঞে না। আমরা কিছু ধরিনি। বলে ব্যাগটা তুলে হাতে দিতে গেলেই, ওরে বাবা রে বলে দৌড়।

কোথায় গেল! মনোমোহন, টটন, মটর হ্যারিকেন নিয়ে লোক দুজনকে খুঁজছে। যত তাড়াতাড়ি ব্যাগটিকে ধরিয়ে দেওয়া যায়। না, কোথাও পাওয়া গেল না। এখন এই ব্যাগ নিয়ে উপায়! কার কাছে যাবে। কাউকে বললেই দশ কান—নানা ঝামেলা। চুরির দায়ে জেল! কী দরকার, যার ব্যাগ তাকেই ফেরত দেওয়া ভালো। কিন্তু লোক দুজন বেপাত্তা। তিনি ডাকলেন, কোথায় গেলেন দাদারা? অগত্যা ফিরে আসতে হল। রাতে কারো ভালো ঘুম হল না।

সকালে শোনা গেল, সড়কের ধারে দুজন লোক মরে পড়ে আছে। গলার নলিতে কোনো জন্তুর কামড়।

বিপাকে পড়ে কুকুরের মালিকের খোঁজে বের হয়ে গেলেন মনোমোহন। কুকুরটা আসার পর থেকে বাড়িতে নানা উপদ্রব। পীতাম্বরই খবর দিলেন, আরে, এই বাচ্চাটা! এটার মা-টা তো লরি চাপা পড়ে মরেছে। রাস্তার কুকুর। বাচ্চাটা নিয়ে এধার-ওধার ঘুরত। বাচ্চাটাই চাপা পড়ত, তবে মার পরান বোঝোই! নিজে ঝাঁপিয়ে পড়ে বাচ্চাটাকে বাঁচিয়েছে। কেন, কী হয়েছে?

না, কিছু না! তারপর মনোমোহন বললেন, আচ্ছা, ওর জন্য পিণ্ডদান করলে কেমন হয়!

‘কার? কুকুরের!

পীতাম্বর শুনে অবাক। বললেন, কুকুরের আবার পিণ্ডদান কী?

তোর কি মাথাখারাপ?

তার পরদিন মনোমোহন আরও তাজ্জব। কুকুরের বাচ্চাটা বাড়িতে নেই। কোথাও নেই টটন সারাদিন ডেকে বেড়ায়, টুটু, তুই না বলে-কয়ে চলে গেলি! কোথায় গেলি?

কোনো সাড়া পাওয়া যায় না। সাড়া আর পায়ওনি।

ফুলের বাস

গল্পের কোনো কোনো চরিত্র আমাকে কুহকে ফেলে দেয়। গল্পে সে কিছুতেই ঠিকঠাক উঠে আসে না। তাকে ঠিক ধরা যায় না। কাহিনি হয়, কিন্তু সত্য প্রকাশ হয় না। আমার সৃষ্ট চরিত্র বাদশা মিঞা মাঝে মাঝে এভাবে তাড়া করে। তখনই মনে হয় গল্পে তার প্রতি এতটা নিষ্ঠুর না হওয়াই ভালো ছিল। বাদশা আমার সঙ্গে একই জাহাজে সমুদ্র সফরে বের হয়েছিল। তবে আমার নতুন সফর। জাহাজে তার সফরের সংখ্যা গোনাগুণতিতে শেষ ছিল না। কখনো কড় গুনে বেলত দেড় কুড়ি আবার সোয়া কুড়ি—তবু আন্দাজে বুঝেছিলাম, বিশবাইশ সফর সে করেছে।

আমার তখন বয়েস কম। বাড়িঘর ছেড়ে খুব বেশি একটা বাইরে যাইনি। কলেজে সবে ঢুকেছি—অভাব-অনটনের সংসারে কলেজে পড়া বিলাসিতার পর্যায়ে পড়ে ভাবতেই রুজিরোজগারের আশায় বাড়ি থেকে নিখোঁজ হই।

কপাল-ফেরে আমার চাকরিজীবন শুরু জাহাজে। কী করে, কেমন করে তার গল্প এখন নয়। বলা অকারণ হবে বলেই বাদ দিচ্ছি।

সেসব কবেকার কথা। আবছা সব মনে পড়ে। বাদশার বয়েসটাকে প্রায় ধরে ফেলেছি। এ-বয়েসে চুপচাপ বসে থাকলে দেখতে পাই জাহাজটা যেন নিরবধিকাল ধরে চলছে। মালবাহী জাহাজের নাবিক আমরা।

আমরা এখন নেমে গেছি, যে যার বন্দরে। ঘরসংসার করছি—অথচ জাহাজটা যায়, আমার নির্জন একাকীত্বের মধ্যে টের পাই জাহাজটা সমুদ্রে ভেসে যায়। কেমন তখন ঘোরের মধ্যে পড়ে যাই। সব স্পষ্ট মনে করতে পারি।

লেখালেখি-জীবনে এসে প্রথমেই বাদশা মিঞাকে নিয়ে পড়েছিলাম। গল্পটার কী যে খামতি থেকে গেল, জমল না।

আবার লিখলাম, মনে হল বাদশাকে অপমান করেছি গল্পটা লিখে। মূল কাহিনি থেকে যাচ্ছে ঠিক, কিন্তু শুধু কাহিনি তো গল্প হতে পারে না। কিছু গোপন ইঙ্গিত অথবা আভাস থাকে, অথবা কোনো রহস্যময়তা, যা আলো এবং সলতের ফারাক। সলতেটা কাহিনি,

আলো লেখকের হাতে। জ্বেলে দিলেই চলবে। সলতেটা বার বার তুলছি, কিন্তু আলো জ্বালা যাচ্ছে না। সলতেটা পর্যন্ত কাহিনি, আলো জ্বলে উঠলে গল্প।

এবারের চেষ্টা, আলো জ্বালার। নিজের দিকে তাকালে বুঝি বাদশা সত্যি নিরপরাধ। জাহাজে তাকে কত না ধিক্কার দিয়েছি। ফুল কে না ভালোবাসে!

এক লজঝড়ে জাহাজে বের হয়ে পড়েছিলাম। দেশে আবার কবে ফিরব জানি না। জাহাজে ওঠার সময় আমরা আলাদা সব মানুষ। কেউ পূর্বপরিচিত না। অথচ জাহাজে থাকতে থাকতে কী করে যে এত ঘনিষ্ঠ হয়ে গেলাম সবার!

বাদশা ছিল আমার অকৃত্রিম সুহৃদ।

বয়েসের ফারাক ছিল অনেক। একজন তরুণ যুবা, অন্যজন প্রৌঢ়।

বাদশা ছিল এনজিন-রুমের ছোটো টিণ্ডাল। তার ‘পরী’তেই আমার কাজ। জাহাজে এনজিন-ক্রুদের চার ঘন্টা করে ওয়াচ। জাহাজিরা ওয়াচ বলত না। বলত ‘পরী’। মানুষটা দিলখোলা। পান জর্দা আর দোক্তাপাতা ছাড়া অন্য কোনও নেশা ছিল না। অবশ্য আর একটা নেশা ছিল—বাদশার অন্তরঙ্গ না হলে তা জানা যেত না। এখন নিজের প্রায় প্রৌঢ় বয়েসে বুঝি নেশাটা না থাকলে মানুষের বেঁচে থাকা অর্থহীন। তাই নিয়ে এই গল্প।

মানুষটা শুধু দিলখোলা বললে ভুল হবে, প্রচণ্ড ধর্মভীরু। পাঁচওয়াক্ত নামাজ কাজের ফাঁকে সেরে নিত।

সেই কবে থেকে জাহাজে সফর করছে ঠিকঠাক বলতে পারে না। তবে যুদ্ধের আগে থেকে করছে এটা বলতে পারত। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে, ডারবানের কাছে কিছুদিন আটক ছিল এমনও খবর দিয়েছে। হেন বন্দর নেই যেখানে সে যায়নি। ক্ল্যান লাইন, সিটি লাইন সব লাইনেই সে কাজ করেছে।

সেবারে সে আমার সঙ্গে ব্যাঙ্ক লাইনের জাহাজে উঠে এসেছিল। আমাদের জাহাজটার নাম এসযএস টিবিড ব্যাঙ্ক। সে আমার ওয়াচের টিণ্ডাল। ওয়াচে স্টিম ঠিক রাখার দায়িত্ব তার। মোষের মতো খাটতে পারে। ঝড়ের সমুদ্রে এনজিন-রুমে স্টিম নিয়ে মারমার কাটকাট অবস্থা—স্টিম নেমে যাচ্ছে, টন টন কয়লা হাঁকড়েও বয়লারের স্টিম ঠিক রাখা যাচ্ছে না। তখন বাদশা মিঞা কেমন পাগলের মতো ছোটাছুটি করত। ফায়ারম্যানদের গালিগালাজ করত। উপরে সিঁড়ি বেয়ে কয়লার বাঙ্কারে ঢুকে যেত। কয়লা সুটে ফেলে দম নিতে পারছি না, হড় হড় করে কয়লা নেমে যাচ্ছে। তখন বাদশা ছিল আমার কাছে ঈশ্বরের মতো। সে বেলচায় কয়লা তুলে বলত, যা নিয়ে যা। মেডিসিন-কার ভরতি করে দিত কয়লায়। আমি ঠেলে নিয়ে সুটে ফেলতাম। ঝড়ে জাহাজ টালমাটাল—দাঁড়াতে পারছি

না, টলছি, কখনো উপুড় হয়ে পড়ে যেতাম, বাদশা টেনে তুলত আমাকে। সে আমার হয়ে সুটে কয়লা ফেলত। বলত, ঊঁইগুসোলের নীচে বসে হাওয়া খা। গতরে জোর পাবি।

আবার নীচে ছুটত। ফার্নেসে গনগনে আঁচ। স্লাইস মেরে কিংবা র্যাগ ঢুকিয়ে কয়লা উলটে- পালটে দিয়েও রেহাই নেই। হাওয়া ভালব ছেড়ে দিয়ে এক দৃষ্টে তাকিয়ে থাকত স্টিম গ্যাজের দিকে। পলক পড়ত না চোখে। জাহাজে ওঠার সময় বাদশাকে পাত্তা দিইনি। মাস্তারে দাঁড়িয়েছি। সবে ভদ্রাজাহাজে ট্রেনিং-এর পর সি ডি সি হাতে এসেছে। জাহাজে ওঠার ছাড়পত্র। কিন্তু ছাড়পত্র থাকলেই জাহাজে ওঠা যায় না। টের পেলাম দিনের পর দিন মাস্তারে দাঁড়িয়ে। সিপিং অফিসের লাগোয়া রাস্তা পার হয়ে বড়ো বড়ো টিনের চালা প্ল্যাটফর্মের মতো। সামনে সবুজ ঘাসের মাঠ। কিছু গাছপালা। এপ্রিল মে-র মাঝামাঝি সময় দুপুরের ঠাঠা রোদ্দুরে গিয়ে দাঁড়াই। শিপিং অফিসের বোর্ডে কে লিখে যায়, ক্ল্যান লাইনের জাহাজের নাম।

রিক্রুট হবে।

বোর্ডে নাম দেখে সবাই দৌড়োয়। এবং লাইনে গিয়ে দাঁড়ালে দেখতে পায়, জাহাজ থেকে সাহেবসুবো মানুষ নেমে এসেছেন। নুয়ে নলি (সি ডি সি) দেখছেন। কার কত সফরের অভিজ্ঞতা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছেন। কে কোন পদে ক-টা সফর দিয়েছে জাহাজে, ‘নলিতে’ সব উল্লেখ থাকে। জাহাজের কাপ্তান কিংবা চিফ ইঞ্জিনিয়ার নলি দেখেন, অভিজ্ঞতা দেখেন, শরীর দেখেন, তাগদ কত আছে লক্ষ করেন—তারপর পছন্দ হলে লাইনে চিরকুট ধরিয়ে দেন, পছন্দ না হলে দেন না।

জাহাজের নাম কখনো বোর্ডে সপ্তাহকাল আগে লিখে দেওয়া হত। শিপিং অফিসে ঘোরাঘুরি। কখন কোন জাহাজে কোন অফিসার খুশি হয়ে চিরকুট ধরিয়ে দেবেন সেই আশায় ঘোরাঘুরি।

আমিও ঘুরছি।

রোজ বেলেঘাটা থেকে সকালে হেঁটে চলে যাই। ফিরি বিকেলে।

কেউ আমাকে পছন্দ করে না। জাহাজ পাই না।

বলতে গেলে জাহাজে কুলিকামিনের কাজ—একজন ভদ্রঘরের সম্ভ্রান্ত মুখচোখের আঠারো- উনিশ বছরের তরুণকে সাহেবদের মনে ধরতে নাই পারে। পারবে না। বড্ড হাড্ডাহাড্ডি। কয়লার জাহাজ হলে তো আরও কঠিন। জাহাজে উঠে শেষে এটা হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছিলাম।

এনজিন জাহাজিদের কাজ কয়লা মারা, স্টিম ঠিক রাখা। সারেঙ, বড়ো টিণ্ডাল, ছোটো টিণ্ডালের ওয়াচ। চার ঘন্টা করে দিনে আট ঘন্টা ‘পরী’।

জাহাজ আর পাই না। রোজ মাস্তারে দাঁড়াই। পোশাকে-আশাকে ভদ্র একজন তরুণকে কে নেবে কুলিকামিনের কাজে।

ছোটো টিণ্ডাল বাদশা মিঞা লাইনে দাঁড়াল আর হয়ে গেল। তার পোশাকের কথা এখনও মনে আছে। সে পরেছিল খোপকাটা লুঙ্গি। ফুলহাতা কাচা শার্ট। গলায় গামছা মাফলারের মতো। পায়ে বুটজুতো তালিমারা। এত খারাপ লাগছিল। মনমরা হয়ে গাছতলায় বসে আছি।

দেখি বাদশা আমার দিকেই আসছে। মুখভর্তি পান জর্দা। আর পিক ফেলছে যখন তখন। মাথার চুল ছোটো করে ছাঁটা। একটা সিগারেট ধরিয়েছে। জাহাজ পেয়ে যাওয়ায় সে সিগারেটের বিলাসিতা দেখাচ্ছে আমাকে।

আমার মন খারাপ।

রোজ লাইনে দাঁড়াই। সবাই জাহাজ পেয়ে যায়। আমার কপালে জাহাজ জোটে না। মন তো খারাপ হবেই। কোনো কম্মের না। হাতে সি ডি সি, দেখতেও মন্দ না। বেশ দীর্ঘকায়ও বলা যায়। তবে রোগাপানা—এটাই হয়তো অপছন্দের কারণ।

সে যা হোক, আমিও নাছোড়বান্দা। জাহাজে সমুদ্রসফরের কোনো উল্লেখ না থাকলে নয়া আদমি লাইনে ভাবতেই পারে। জাহাজে কী মারমার কাটকাট—তাও ঠিক জানি না। তবে বুঝে ফেলেছি এ আমার কম্ম নয়। আমাকে জাহাজে তুলে লাভ নেই। তখনই দেখলাম বাদশা মিঞা আমার পাশে এসে গাছতলায় বসল। বলল, কি রে জাহাজ পাইলনি!

বললাম, 'না চাচা। তোমার তো হয়ে গেল।' তখনও আমি বাদশার নাম জানি না। তার কী কাজ জানি না। জাহাজে নতুন উঠলে কোলবয়ের কাজ পাব জানি। ছোটো টিণ্ডাল, বড়ো টিণ্ডাল সারেঙ থাকে জাহাজে তাও জানি। ভদ্রাজাহাজে ট্রেনিং-এর সময়ই বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে, কী কাজ করতে হবে জাহাজে। কয়লার এনজিন হলে, কয়লা টানতে হবে। তেলের জাহাজ হলে এনজিন-রুমের প্লেট মোছামুছির কাজ। শিরিষ কাগজ মেরে রেলিং সিঁড়ি ঝকঝকে রাখার কাজ। তবে বরাত জোরে ফায়ারম্যানও হয়ে যেতে পারি। সফরে কেউ না কেউ পালায়। বন্দরে নেমে আর ফিরে আসে না। তখন কপাল খুলে যায়।

কত কথা ভাবছি।

আর তখনই বাদশা মিঞা বলল, ফালতু হইবা।

সব শুনেছি, কিন্তু জাহাজে ফালতু বলে কোনো কাজ আছে জানতাম না। ফালতু বিষয়টা কী! মনে মনে আঁচ করার চেষ্টা করছি। তখন গাছ থেকে একটা কাক আমার

মাথায় হেগে দিল।

বাদশা বলল, যা গেল তোমার জামাখানা গেল।

সে তার গলার গামছা দিয়ে পিঠ থেকে ময়লা মুছে দিল। তারপর কল থেকে জল এনে জামার সেই নোংরা অংশ ধুয়ে দিল। বাদশাকে পাত্তা দিচ্ছিলাম না। লোকটা এত নিজের বুঝতে পারিনি। আগেও দেখেছি শিপিং অফিসের ক্যান্টিনে গুলতানি মারছে। টুলে পা তুলে বসে বিড়ি টানছে। বাদশার আচরণ আমার পছন্দ হত না। কত কিসিমের মানুষজন যে থাকে! অথচ এতদিন মাস্তার দিচ্ছি, জাহাজ পাচ্ছি না, কেউ কোনো খোঁজখবর করেনি, কেবল ভদ্রাজাহাজ থেকে আমাদের যে ব্যাচটা বের হয়ে এসেছে তারাই আমার সুহৃদ ছিল। সবাই একে একে জাহাজও পেয়ে গেছে। একমাত্র আমার কপালেই জাহাজ জোটেনি।

খারাপ লাগে না! কত না আশা! মাস গেলে প্রথম সফরে নববই টাকা মাইনে। খাওয়া থাকা পোশাক-আশাকের খরচ কোম্পানির। একটা সফর দিয়ে ফিরতে পারলে, হাজার বারোশো টাকা হয়ে যাবে। কত কিছু কেনাকাটা করব ভেবে রেখেছি, মাসে মাসে বাবার নামে মাসোহারা যাবে। বাবা টের পাবেন তাঁর নিখোঁজ পুত্র এখন জাহাজে। কোনো বন্দরে নেমে চিঠি লিখব ভেবেছি। বাবা অবাক হয়ে যাবেন, তাঁর পুত্রটি তবে বহুদূরের কোনো বন্দর থেকে তাঁকে চিঠি দিয়েছে। তিনি প্রতিবেশীদের খবর দেবেন, খোঁজ পাওয়া গেছে। জাহাজের চাকরি নিয়ে তাঁর পুত্র এখন দেশান্তরী। ফিরলে হয়! নানা রোমাঞ্চকর স্বপ্ন যখন মনে ঘোরাফেরা করছে, তখন মাস পার হয়ে যাওয়ায় একেবারেই ভেঙে পড়েছিলাম।

বাদশা বলেছিল, জাহাজ পাইলা না ব। ফালতু হইতে রাজি? সারেঙসাব ফালতু খুঁজছেন? যদি রাজি হও জাহাজে উঠতে পার।

বলেছিলাম , ফালতু আবার কী?

হায় আল্লা, ফালতু বোঝ না! জাহাজে কাম করতে আইছ!

মনে নানা আশঙ্কা। জাহাজে সমকামিতার রোগ থাকে। ফালতু তুলে নেওয়া কেন। প্রথমে বিরক্তই হয়েছিলাম। এমনকী পারলে বাদশাকে তেড়েও যেতাম। কিন্তু জাহাজ না পেয়ে এতই বিচলিত যে যা থাকে কপালে, ফালতু, ফালতুই সই। কোল বয় না, ফায়ারম্যান না, সব আশা আকাঙ্ক্ষা ভেঙে চুরমার।

বললাম, বলবেন তো চাচা, ফালতুটা কী আবার। আমাদের ট্রেনিং-এ ফালতু বলে কিছু ছিল না।

আরে সারেঙসাবের পান তামুক সাজাইবা। গরমজল কইরা রাখবা। সারেঙসাবের ফোকসাল ঝাট দেবা। কাম কিছু বেশি না। আরাম আছে।

কপালে মানুষের যে কী লেখা থাকে, নাহলে ফালতু হতেই বা রাজি হয়ে গেলাম কেন!

আর কী করতে হবে।

জামাকাপড় সারেঙসাবের কাচাকাচির কাজ। তবে বাবুর্চির কাজ করতে হবে না জানি। গ্যালিতে সবার রান্না হয় একসঙ্গে। সব জাহাজেই তিনটে গ্যালি থাকে। এনজিন-রুম-জাহাজিদের গ্যালি, ডেক-জাহাজিদের গ্যালি। সবচেয়ে ইজ্জতের গ্যালি চিফ কুকের। জাহাজের অফিসারদের খাবার তৈরি হয় চিফ কুকের গ্যালিতে। সে যাহোক রাজি হয়ে গেলে বাদশা বলল, লেখাপড়া জানা আছে!

লেখাপড়া দিয়া কি হইব!

আরে ব্যাডা বাঙ্গালিবাবু তুমি, লেখাপড়া জান না!

তা কিছু কিছু জানি।

খত লিখতে পারবা ত।

কার খত।

সারেঙসাবের। আমার, বড়ো টিণ্ডালের একজন লিখাপড়া আদমি না থাকলে খত লিখব কেডা কও!

লেখাপড়া জানলে কদর বাড়বে জেনেই যেন বলা 'তা আর বেশি কি! ও লিখে দিতে পারব।'

ব্যাস, কাম ফতে। ওঠ। পাকা কথা হইয়া যাউক।

বাদশা আমাকে সারেঙের কাছে টেনে নিয়ে গেছিল। তিনি বসেছিলেন জেটির ধারে। তাঁর সাঙ্গপাঙ্গদের সঙ্গে। একই জাহাজে সফর করবে। টিবিড ব্যাঙ্ক জাহাজের সারেঙ। এ-সফরে তিনি এনজিন-জাহাজিদের মাথা। তাঁর সঙ্গেই কাজ কাম নিয়ে জাহাজের সেকেণ্ড ইঞ্জিনিয়ারের কথা হবে। তিনি তাঁর লোকজনদের দিয়ে কাজ তুলে দেবেন। যতদিন সফর ততদিন মজুরি। জাহাজ দেশে ফিরে এলে কিংবা সফর শেষ হলে মজুরি খতম।

সারেঙসাব বেশ মৌজে আছেন। দেশ থেকে এসে জাহাজ সঙ্গে সঙ্গে মিলে যাওয়ায় খুশি। কিছুটা দরাজ দিলেরও মানুষ। পরে তা টের পেয়েছিলাম।

সাদা দাড়ি, মাথায় নামাজি টুপি। লেসের কারুকাজ করা। ফিনফিনে আদ্দির পাঞ্জাবি গায়ে। নীচে কালো রঙের গেঞ্জি। গলায় তাবিজ। বয়েস বাদশা মিঞার কাছাকাছি।

আমাকে সামনে দাঁড় করিয়ে বলল, দ্যাখেন মিঞাসাব পছন্দ!

সারেঙসাব আমাকে দেখছিলেন, তারপর বলেছিলেন, পারবা, বাঙ্গালিবাবুরা ক্যান যে ঝাঁকে ঝাঁকে জাহাজে আসছে বুঝি না। আরে মুসলমানের জান চাই, গোস্ত না খাইলে জানে কুলাইব না। বাদশা বলল, জববর লেখাপড়া জানে। খত লেখার অসুবিধা থাকব না।

তবে সারেঙসাব বোধহয় জানতেন, বাঙ্গালিবাবুরা লেখাপড়া জানা আদমি। আমি যে খত লিখতে পারব—তাতে কোনো অবিশ্বাস নেই। কিন্তু মনের মধ্যে কোনো সংকোচ কাজ করলে যা হয়—বললেন, নাম কীরে ব।

'ব'টা হলগে লজ্ঞ। কথার শেষে 'ব' আগে 'ব'। তখন সবে দেশভাগ হয়েছে। কলকাতা বন্দরের জাহাজিরা সবাই পূর্ব-পাকিস্তানের। যে-কোনো সময় বন্দর অচল করে দিতে পারে ভেবেই সরকার ভদ্রাজাহাজে জাহাজি ট্রেনিং দিয়ে হিন্দু ছেলেদের ছেড়ে দিচ্ছে। আমিও সেই দলের। তিন মাসের ট্রেনিং। তিন সাল ধরে চলছে। আমি সবে ট্রেনিং শেষে বের হয়েছি।

অবশ্য জাহাজে উঠে সারেঙসাবই একদিন ডেকে বললেন, জাহাজে আইছ, কাম কাজ না শিখলে হইব কি কইরা! ফালতু থাকলে নসিব খুলব না। যাও পরী দাও গা। বাদশার পরীতে কাম করবা।

সেই থেকে বাদশা আমার ওপরওয়ালা। খত লিখে দেবার সময় আমি তার সব। এমন সব গোপন খবর খত না লিখলে জানতেও পারতাম না। বাদশা যে এত রসিক, তাও জানতাম না। ওর বিবিকে নিয়ে ইয়ার্কি ফাজলামিও কম করিনি। সেই থেকে ভাব। এবং বাদশার এত সব গুহ্য কথা জেনে ফেলায় দুজনের মধ্যে তুইতোকারি সম্পর্কও গড়ে উঠল।

সেই বাদশা মিঞা আবার স্টকহোলডে বাঘের মতো তেড়ে আসত। সেই আবার ফোকসালে আমাকে বাঘের মতো ভয় পেত। এনজিন-রুমের তিনটে দৈত্যাকার বয়লারের পাশে বাদশা আর এক ছোটোখাটো দৈত্য। কাজ কামে সামান্য ত্রুটি থাকলেই তেড়ে আসত। চিৎকার করে বলত, 'ক্যাডা কইছিল তরে জাহাজে আইতে। কয়লার সুট খালি, চিৎ হইয়া পইড়া আছস! ভরব ক্যাডা শুনি!' আর ফোকসালে ফিরে এলে সেই বাদশা দরজায় টোকা মেরে বলত, 'অ ব্যানার্জী মেহেরবানি হইব! আর একখানা যে কথা আছে!' কখনো এনজিন-রুমের রাগ পুষে রাখতাম। তার জের পোহাতে হত বাদশাকে। বলতাম, না হবে না। পারব না। আমি এখন ঘুমোব। তর আর একখানা কথা শোনার সময় নাই।

তখন হাহা করে হেসে উঠত সে। অরে ব্যানার্জী, জাহাজ হইল গিয়া ইবলিশ। বোঝলা কিছু! ইবলিশ কারে কয় বোঝ? শয়তান! শয়তানের পেটে আমরা ঢুইকা গেছি। গরমে মাথা ঠিক রাখতে পারি না। হাড্ডাহাড্ডি লাইগাই থাকে। কাজে কামে গাফিলাতি হইলে

কসুর হয় রে ব্যানার্জী। বোঝস না ক্যান? দে খতখানা লিখা। জবাব আসে না ক্যান বুঝি না? আর একখানা কথা লিখা দে।

নিরক্ষর মানুষটির জন্য তখন আমার কেমন মায়া হত। দেশে বিস্তর জমিজমা, পুকুর, দুই বিবি। গালমন্দ করলেই সে ব্যাজার হয়ে যায়।...'তর লজ্জা করে না, বুড়া বয়সে শাদি করতে। একটা নাবালিকার জীবন নষ্ট করে দিলি! তুই মানুষ?'

তখনই সে বলত, পরানডা বড়ো কান্দে রে! কবে যে দেশে ফিরমু! ছোটো বিবি আমারে পাগল কইরা দিছে।

ব্যানার্জী লিখা দে, আমরা বুনোসাইরিস যাইতেছি। সেখানে গিয়া বিবি তর খত না পাইলে মরমে মইরা যামু। লিখা দে ব্যানার্জী দিল আমার আনচান করে। পুকুরঘাটে তুই বইসা থাকস, চক্ষে তর কান্দন ঝরে, আমি ফিরা গেলে দুনিয়া উপুর কইরা দিমু তর কইলজার ভিতরে।

এই নিয়ে পরপর দু-খানা খত গেছে কলম্বোর ঘাটে। তৃতীয় খতটি লিখলাম কেপটাউনের ঘাটে। বাদশা চিঠিখানা গোপনে পোস্ট করে আসত। কারো হাতে দিত না। বাদশার এই কুকীর্তির কথা আমিই জানি। দু-হাত জড়িয়ে ধরে বলেছে, কাউরে কইস না। নসিব আমার। শেষ বয়সে মাইয়াখানের মিষ্টি মুখ দেইখা দিলে যে কি হইল রে ভাই! জমিজমা লিখা দিছি, দেনমোহরের টাকা দিছি। অর বাপের ভিটায় ঘর তুইলা দিছি। কি করি নাই ক! এক একটা বাক্য শেষ করে থম মেরে বসে থাকত বাদশা।

কী হল!

না, আর একখানা কথা আছে। লিখা দে ছোটো বিবিরে, দেশে ফিরা গিয়াই আববুর শাদি দিমু।

আববুটা আবার কে?

আমার ছোটো পোলা। শেষ কাম। পোলার শাদি দিলে আল্লার কাছে মোনাজাত করা ছাড়া আর কিছু কাম থাকব না! চিঠিটা তারপর হাতে দিতে গেলে সে নিল না। বলল, সবটা পড়। শুনি। সবটা পড়ার পর সে কী ভাবল কে জানে—বলল, আর একখানা কথা বাকি আছে।

তোমার মুণ্ডু আছে। থাকল তোমার চিঠি! এ কি রে শেষ হয় না। আর একখানা কথা বাকি আছে? বাদশা তোমার কথা ইহজীবনে আর শেষ হবে না! কে তোকে মাথার দিব্যি দিয়েছিল, বুড়া বয়সে বালিকার মুণ্ডু চিবাতে তোর বিবেকে বাঁধল না!

‘অরে ব্যানার্জী, মাথা গরম করিস না। ফুলের বাস কে বা না নেয় রে ব্যানার্জী! আমার ইজ্জত নিয়ে টানাটানি করিস না, দোহাই আল্লার—শুনতে পাইব কেউ।’ আমার কেন যে মাথা গরম হয়ে গেল সহসা বুঝি না। আসলে এই বয়েসে বাদশার এক বিবি থাকতে আবার শাদি করা অনুচিত কাজ হয়েছে ভেবে মনে মনে কি আমি তার প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে গেছি। সেই বালিকাবধূর ছবি চোখ বুজলে আমিও যেন দেখতে পেতাম। এক পাল মুরগি তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে, পায়ে মল, কানে মাকড়ি, নাকে নোলক। এক গ্রাম্য বালিকা গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে সবুজ শস্যখেত মাড়িয়ে, কোথাও যেতে চেয়েছিল। বাদশা তাকে জবাই করেছে। সে চিঠির জবাব দেবে কেন! আমার মনে হত ক্ষোভে জ্বালায় সে অস্থির।

বাদশা আমার বাঙ্কের পাশে মাথা নীচু করে বসে আছে। সে জাহাজে ওঠার আগে দেশে শাদি করে এসেছে আমি বাদে জাহাজের কেউ জানে না। সে জানে, এই গোপন খবর ফাঁস হয়ে গেলে তার ইজ্জত থাকবে না। ইমানদার মানুষ ভাববে না।

তবু কেন যে ওর সরল সাদাসিধে মুখ দেখে আমার মায়া হল বুঝি না। বললাম, দে। বল, আর কী লিখতে হবে।

সে বলল, ‘লেখ। কথা মোতাবেক দেনমোহরের টাকা তর বাপের কাছে গচ্ছিত আছে। কথা মোতাবেক তিন কানি জমি লিখা দিছি। কথা মোতাবেক দেশে ফিরা আর অ তিন পদ গহনা দিমু।’ তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বলল, ‘বাদশা কথার খেলাপ জানে না বুঝলি!’

‘তোর কি মায়া দয়া নেই। কথার খেলাপ হয়। তার কাছে তোর কথার দাম কী! সে তো শেষ হয়ে গেছে।’

বাদশার চোখ ছলছল করে উঠল। বলল, মায়া দয়া আমার নাই! পরানডা বুড়া বয়সে তবে কান্দে ক্যান ক।

বুঝলাম, কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। বললাম, আর তো কথা নাই!

সে চুপ। বুঝলাম ওর আরও একখানা কথা আছে। সে কীভাবে তা প্রকাশ করবে বুঝতে পারছে না। একটা চিঠি তার দু-একদিনে শেষ হতে চায় না। হয়তো এখন চিঠিটা নিয়ে উঠে যাবে,—আবার কী মনে পড়বে, অথবা প্রকাশের ভাষা খুঁজে পাবে, তখন তরতর করে নীচে নেমে আসবে। এলও ঠিক। পরদিন সকালে এসেই বলল, অ ব্যানার্জী কথা আছে দু-খান।

বল, এবারে দু-খান কথা!

হ। লেখ, তুই আমার বুকের ছিনা।

লিখে বললাম, বল। সে বলল, লেখ তুই আমার বুকের লৌ। ছিনা বুঝি না লৌ বুঝি না, না পেরে বললাম, লৌ মানে!

লৌ বুঝিস না? তুই কী করে! তুই না কলেজ পাস? তুই লৌ কারে কয় জানস না?

না জানি না। বড্ড জ্বালাতে পারিস!

'ইবলিশ জানস না, লৌ কারে কয় জানস না! তুই কি পাস তবে!' আমি চুপ করে থাকায় সে খানিকটা দমে গেল। তারপর অপরাধী মুখে বলল, 'লৌ হইল ছিনার রক্ত। বিবির বাপজান কইল, টিণ্ডাল সাব আমার মাইয়াডার শাদি দিবার বাসনা হইছে। আপনে এলেমদার মানুষ সাব। যদি তিন কানি জমি লিখা দ্যান আপনের লগে শাদি দেই।'

আর তুই রাজি হইয়া গেলি?

রাজি না হইয়া পারি রে ব্যানার্জী। লৌ জল করা টাকা। আট বেটা বিটি। কেবল দেও দেও। বেটারা ওৎ পাইতা আছে—কবে বাজানের ইন্তেকাল হইব। আমার কথা কেউ ভাবে না রে!

বুড়ো হলে লোক ফালতু হয়ে যায় বুঝিস না?

আমি ফালতু!

ফালতু ছাড়া কী? চিঠির জবাব, পরের ঘাটেও পাবি না। মাথা কুটে মরবি।

বিবির মুখের মিষ্টি হাসিখান দেখলে অ-কথা মুখে তর আইত না। পেটি মাথায় রওনা হলে তার কি কান্দন। আমারে কার কাছে রাইখা গ্যালেন মিঞাসাব!

এরপর কথা বলা বৃথা।

'তবে লিখা দে, বুনোসাইরিসের ঘাটে বিবি তর খত না পাইলে পরান আমার উড়াল দিব।' আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'জানের ভয় থাকলে ঘাবড়াইয়া যাইতে পারে। কী কস। চিঠি না দিয়ে থাকতে পারব না। কী কস?'

না, বাদশা মিঞা বুনোসাইরিসের ঘাটে চিঠি পায়নি। কার্ডিফেও না। পোর্ট অফ জার্সিতেও না। ঘাটে জাহাজ ভিড়লে সে সবার আগে দৌড়োয়। এজেন্ট অফিস থেকে সবার চিঠি দিয়ে গেছে। সবার চিঠি আসে—তার চিঠি আসে না। সে চিঠির আশায় সারেঙের ঘরে ঢোকে সবার আগে, ফেরে সবার শেষে।

প্রতি ঘাটেই তার এই চিঠি লিখে দেওয়া ছিল আমার কাজ। তবে তার কাছ থেকে একটা খবর গোপন করে গেছি। চিঠি এসেছিল। সারেঙসাব আমাকেই দেন, চিঠি বিলি করতে। চিঠি পড়ে দিতে। বাদশা মিঞার নামেও চিঠি এসেছিল। আমার কেন যে মনে হয়েছিল, এ-চিঠি কোনো দুঃসংবাদ বয়ে এনেছে। চিঠি আগে পড়ে দেখা দরকার।

দেখলামও। মিলে গেছে। তার বালিকাবধূ আর ছোটোবেটা নিখোঁজ। জানি না কেন তাকে চিঠিটা দিতে সাহস পাইনি। বাদশা পৃথিবীতে যে তবে সত্যি ফালতু হয়ে যাবে। আমার এই প্রবীণ বয়সে বার বারই মনে পড়ে, ফুলের বাস কে বা না ভালোবাসে। বয়স বড়ো তীর্যক গতি। তার ক্ষমতা ফুরোয়, তবু ফুলের বাস কে বা না ভালোবাসে। বাদশাকে কত গালাগালি করেছি। তাকে খুনি বলেছি। এখন ভাবলে বড়ো খারাপ লাগে। যা সহজে এবং নিয়মের মধ্যে লেখা থাকে, এবং যতই বয়স হোক, মানুষের এই প্রতিক্রিয়ার শেষ নেই। বাদশাকে সেদিন ফালতু ভাবতে পারি। এখন কেন যে মনে হয় বাদশার কথাই ঠিক, ফুলের বাস কে বা না ভালোবাসে। ভাবলে আজকাল আমারও মন খারাপ হয়ে যায়। ফুরিয়ে আসছে সব।

ট্রেন বে-লাইন হলে

স্কুল ছুটি হয়ে গেছে অথচ সে ফিরে যায়নি। বনলতা বিড়বিড় করে বকছে। কেমন হিম হয়ে গেছে শরীর। দারোয়ানকে রিকশা ডেকে দিতে বলার জন্যও যে শক্তির দরকার তাও সে হারিয়েছে। অংশু তো কোথাও যায় না। স্কুল ছুটি হয়ে গেছে, সে গেল কোথায়! কেমন বিবর্ণ হয়ে যাচ্ছে তার চিন্তাভাবনা! কী করবে! কোথায় যাবে—কাকে ফোন করবে। মাথাটা ঝিমঝিম করছে, পড়েই যেত—কারণ, যেভাবে রোজকার কাগজে রোমহর্ষক মর্মান্তিক ঘটনার খবর বের হয়, তেমনি কোনো খবর যদি অংশু হয়ে যায়, তার পড়ে যাওয়া ছাড়া আর কি করার থাকবে।

আসলে বনলতা কিছুই ভাবতে পারছে না। কেমন শুধু অন্ধকার দেখছে। তার যে আরও কিছু প্রশ্ন করা উচিত ছিল, সে বোধও হারিয়ে ফেলেছে। প্রধান শিক্ষক আছেন কি না, তিনি যদি কিছু জানেন, কিংবা কাউকে কোনো খবর দিয়ে যদি সে কোথাও যায়, দারোয়ানকে বলে গেলে সে অবশ্য বলেই দিত—তবু কিছুটা হেঁটে এসে রাস্তায় দাঁড়ালে প্রথম যে করণীয় কাজ, ওর বাবার অফিসে ফোন, অংশু বাড়ি ফিরে যায়নি।

এতটা উদভ্রান্ত যে রাস্তা পার হতে পর্যন্ত পারছে না—রিকশা নেই, ট্যাক্সি যদি পাওয়া যায়—কিছুটা আলগা জায়াগায় স্কুল, ট্যাক্সি বড়ো আসে না। স্কুল ছুটির সময় কিছু রিকশা মোড়ে দাঁড়িয়ে থাকে। কিন্তু এই মুহূর্তে দুজন ঢ্যাঙা লোক সেখানে দাঁড়িয়ে গল্প করছে ছাড়া কোনো দৃশ্য ভেসে উঠছে না। একটু এগিয়ে গেলে ওর সহপাঠী কুন্তলকে পাওয়া যেতে পারে। এটা তো তার আগেই মনে হওয়া উচিত ছিল। আসলে সে তার স্বাভাবিক বুদ্ধি হারিয়েছে। কেমন মাথা ঘুরছে, দাঁড়াতে পারছে না সে। রোজই অংশু বাড়ি না ফেরা পর্যন্ত বার বার ব্যালকনিতে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে—উঁকি দেয়, আর আতঙ্কে ডুবে যেতে থাকে—আজ সেই অদৃশ্য আতঙ্ক তাকে সত্যি জড়িয়ে ফেলেছে, আগে ফোন করা দরকার, না, কুন্তলদের বাসায় খোঁজ নেবে! যদি সেখানে যায়—সামনে টেস্ট, দুজনের মধ্যে খুব ভাব। হয়তো গিয়ে দেখবে সেখানে সে বসে আছে। অফিস থেকে সাতটার আগে বের হতে পারে না মানুষটা। অযথা দুশ্চিন্তায় ফেলে দিয়ে কী লাভ! আগে কুন্তলদের বাড়ি। বাড়ি গিয়ে দেখল, দরজা-জানালা বন্ধ। সদরে তালা দেওয়া। পাশের ফ্ল্যাটে একজন মুখ বাড়িয়ে বলল, ওরা দুদিন হল নেই।

বনলতা প্রায় টলতে টলতে নেমে এল। ট্যাক্সি পেয়ে গেল সামনে। সোজা যে রাস্তায় অংশু বাসে করে ফেরে সেই রাস্তা ধরে গেল। কোথাও কোনো জটলা, কিংবা দুর্ঘটনা—ঘন্টা খানেকের তফাত—কিছু হলে বাস-রাস্তায় সে জানতে পারবে—এই ভেবে ট্যাক্সি থেকে মুখ বাড়িয়ে চারপাশ লক্ষ করছে। শরীরে প্রচণ্ড অস্বস্তি—সঙ্গে সঙ্গে কেন যে মনে হল অযথা দুশ্চিন্তা করছে। বাড়ি গিয়ে দেখবে, অংশু দরজায় দাঁড়িয়ে আছে। মাকে দেখলেই বকাবকি শুরু করে দেবে। দু-একবার সে রাত করে ফিরেছে, তবে স্কুল ছুটি হলে সোজা বাড়ি, তারপর তার বের হওয়া। ছুটির দিনে ক্রিকেট ব্যাট লাল বল, কিংবা হাতে ব্যাডমিন্টনের র্যাকেট—তার প্রিয় খেলা আর প্রিয় সঙ্গী বই, সে তার এক নতুন জগৎ তৈরি করে নিচ্ছে বনলতা বুঝতে পারে। কখনো ভালো ইংরিজি বই দেখে। তবে কখনো সে না বলে কয়ে কিছু করে না।

কিন্তু, না অংশু ফিরে আসেনি। সে এবার আর পারল না। দাদাকে ফোনে জানাল, অফিসে অংশুর বাবাকে পেল না। মেজদার ফ্ল্যাটে ফোন করল। পিসির বাড়িতে—সবাই জেনে গেল অংশু আজ বাড়ি ফেরেনি। বনলতা ধীরে ধীরে দেখল, মানুষজনে ভরতি হয়ে যাচ্ছে। একতলা দোতালায় সব আত্মীয়স্বজন। দেয়াল ঘড়িতে রাত বাড়ছে। কাগজের অফিসে চলে গেল মেজদা।

হ্যালো মেডিক্যাল কলেজ—কোনো দুর্ঘটনার খবর। হ্যালো নীলরতন, আর জি কর, পি জি—না কোথাও কোনো দুর্ঘটনার খবর নেই।

সে স্কুলে আজ গেছে কি না এটাও জানা দরকার। অমলকে ফোনে পেয়ে গেল। সে বলল, অংশু ওর সঙ্গে টিফিনের পর বের হয়েছে। বাস ধরবে বলে বড়ো রাস্তার দিকে গেছে।

সুতরাং এসব ক্ষেত্রে যা যা করণীয় অংশুর আত্মীয়স্বজনরা করে যাচ্ছে—থানা-পুলিশ, সর্বত্র খবর হয়ে গেল, আবার একজন স্কুলের ছাত্র বাড়ি ফেরেনি।

আশ্চর্য, বনলতা কাঁদতে পারছে না। বড়ো বড়ো চোখে শুধু দেখছে। সে থরথর করে কাঁপছে। আর অজস্র প্রশ্নের জবাব দিচ্ছিল।—বকাবকি করেছিলে?

না।

কিছু বলে যায়নি?

না না না। রোজকার মতো গেছে। রোজকার মতো ফিরে আসবে—কিন্তু ফিরে এল না কেন?

অংশুর বাবা ওপাশের ঘরে ইজিচেয়ারে লম্বা হয়ে পড়ে আছে।

কেন ফিরে এল না! বনলতা কেন যে তার পাপের কথা ভেবে ফেলল—ঠাকুর দেবতা সবার কাছে মানত করার সময় মনে হল—কোনো দূরবর্তী উপত্যকায় কে একজন হেঁটে যাচ্ছে। সেই কি নিয়ে গেল! শত্রুতা!

সিঁড়ি ধরে কেউ উঠছে, কেউ নেমে গেল—বনলতার এক কথা, ওকে এনে দাও। আমি আর কিছু চাই না।

দ্রুত ট্রেন চলে যাচ্ছে। ট্রেনের দরজায় কেউ দাঁড়িয়ে। বনলতা যেন তাকে চেনে। সে মুচকি হেসে যেন বলে গেল, তাহলে এই। কেমন লাগছে!

কখনো কোনো পাপবোধ বনলতাকে তাড়া করেনি। অংশু ফিরে না আসায় সে যে কী সব ছাইপাঁশ ভাবছে। এখানে-সেখানে খুঁজছে কিছু—যদি অংশু যাবার আগে চিঠি রেখে যায়। ওর মাসির বাড়ি যদি যায়—কিংবা এই বয়েসটা বড়ো দুর্ভোগের বয়স। কে জানে, ঠিক তার মতো কোনো নারীর ছলনায় অংশু পড়ে গেল কি না।

এই প্রথম মনে হল সে ছলনা করেছে। সুদত্ত যে আত্মঘাতী হল কেউ জানে না, এমনকী সুদত্তের মাও জানত না কেন সুদত্ত আত্মঘাতী হল।

জানত একমাত্র বনলতা। ঠিক জানত বললে ভুল হবে, সে বুঝতে পেরেছিল, ভালোবাসা সূর্যের চেয়েও ব্যতিক্রম। আলোর উৎস নেমে আসে, অবগাহন চলে—সাদা জ্যোৎস্নায় ছবি হয়ে থাকে দুজন—এমন সব দৃশ্য বনলতার চোখে ভাসছে।

বনলতা খুঁজছিল। অংশুর ঘরে ঢুকে ওর বিছানা, টেবিল, নিজস্ব দেরাজ যা কিছু আছে। খাতা, ওয়ার্ক এডুকেশনের লাল নীল রঙের কার্ড বের করে সে পাগলের মতো খুঁজছে। কেমন বেহুঁশ। কেউ উঁকি দিয়ে দেখে যাচ্ছে, কেউ এলে বনলতা দৌড়ে সিঁড়ির রেলিং-এ ছুটে যাচ্ছে, যদি কোনো খবর। ফোন বেজে উঠলে টলতে টলতে গিয়ে কেউ ধরার আগেই ধরে ফেলছে।

হ্যালো!

সুদত্ত বলছি। কেমন আছ!

বনলতা কাঠ হয়ে গেল। ঝন ঝন করে রিসিভারটা পড়ে গেল নীচে। পড়েই যেত। পাশে পিসিমা ছিলেন বলে রক্ষে। ধরে ফেলেছেন। সবাই ছুটে এসেছে। বনলতার বাবা বললেন,

এ-ঘরে এনে শুইয়ে দাও।

বনলতা কেমন এক গভীর আচ্ছন্নতার মধ্যে ডুবে যাচ্ছে। সেই দূরবর্তী উপত্যকায় কি সত্যি কেউ থাকে!

বনলতা চোখ মেলে দেখল, বাবা-মা সবাই তার পাশে বসে। জিরো পাওয়ারের আলো জ্বলছে। পাশের বাড়ির জানালা বন্ধ করার শব্দ পেল। সিঁড়িতে আর কোনো পায়ের শব্দ নেই। কোনো খবরই কেউ দিয়ে গেল না। অংশু কোথায় গেল! অভিমান বড়ো সাংঘাতিক অসুখ। কিংবা বিনুর মেয়েটার সঙ্গে যদি ওর কিছু হয়! সহসা মনে হল, আরে সেই মেয়েটার খোঁজ নিলে হয়। ধড়ফড় করে উঠে বসলে বাবা বললেন, কোথায় যাবে! এত অস্থির হলে চলে। ঈশ্বরকে ডাক। আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করব। কালই বিজ্ঞাপন যাচ্ছে টিভিতে। নিখোঁজ—অংশু নিখোঁজ। এত উতলা হলে চলে!

ছাড় আমাকে, ছেড়ে দাও।

বনলতার বেশবাস ঠিক নেই। আঁচলটা ওর মা কাঁধে তুলে দিয়ে বুক ঢেকে দিল। স্তনের মধ্যে রয়েছে মাতৃদুগ্ধ। বনলতা স্তন ঠিক রাখার জন্য সন্তানকে মাতৃদুগ্ধ খাওয়ায়নি। স্তন সুডোল এবং নিস্তেজ। শিরা-উপশিরা সব এখন ম্রিয়মাণ—পুরুষ আত্মীয়স্বজনের চোখে মা চায় না কন্যার এই পুষ্ট স্তন ভেসে উঠুক। এমনও হতে পারে স্তনের আছে এক আশ্চর্য গাম্ভীর্য। যা এখন যতই পরিস্ফুট হোক—বাসি ফুলের মতো অর্থহীন।

বনলতা তার স্তন সম্পর্কে এ মুহূর্তে আর সচেতন নয়। বিবর্ণ মুখ। চুলে এলোমেলো ঝড়ের দাপটে গ্রাহ্যহীন—ছুটে যাবার সময় আঁচল আবার পড়ে গেছে—একবার দেওয়াল ঘড়ির দিকে ঘোরের মধ্যে চোখ বুলিয়ে মুখ আরও ফ্যাকাশে। ফোন করতে গিয়ে হাত কাঁপছে। ছোটো বোন ধরে নিয়ে এসেছে ফোনের কাছে। বনলতা উবু হয়ে বসল। কিন্তু ডায়াল ঘোরাতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হবার মতো বসে থাকল বনলতা।

কাকে ফোন করবে?

বিনুকে।

বিনুকে করবে! আমরা করছি। উঠে এস।

কোনো রকমে বনলতা যেন উঠে দাঁড়াল। পাশে প্রায় শয্যাশায়ী সেই মানুষ—যে তার গভীর প্রপাতে অহরহ অবগাহন করতে অভ্যস্ত। এ মুহূর্তে সে মানুষ নীরব হয়ে গেছে। বুদ্ধিভ্রংশ হলে মানুষের এমন হবার কথা। বনলতার কি বুদ্ধিভ্রংশ হয়েছে! বিনুর মেয়েটা তেরো চোদ্দো। এবং তেরো চোদ্দো বছরে কী কী হয়। নতুন উপসর্গ দেখা দেয়, তলপেটে ব্যথা হয়, আর কী হয়, জানালায় কোনো তরুণ হেঁটে যায়। যার চোখ বিহ্বল থাকে—আর সব রহস্য, কিংবা কৌতূহল জেগে থাকে—যেন এই পৃথিবীর ঘাস মাটি উর্বর হয়ে আছে, দরকার কোনো দক্ষ চাষবাসের মানুষ। মাটি চষে ফেলবে, ফালা ফালা করে দেবে সব।

এ কি বনলতা এ মুহূর্তে সুদত্তের সেই কথাগুলিই যে আওড়াচ্ছে!

বোসো না!

বসতে পারি। হাত দেবে না। ছবি আঁকছ, আঁকো। তোমার ভারি খারাপ স্বভাব।

গোপনে চলে আস কেন তবে!

তোমাকে দেখব বলে। সারাদিন না, কী যে লাগে!

সোনা আমার। সুদত্ত চুমো খেল।

শরীর ঘেমে যায়। রোমকূপ সব অগ্নিবর্ণ হতে থাকে। আর প্রপাতে অস্পষ্ট ধারা। কোনো বনভূমির মধ্যে সে হাঁ করে আছে, প্রত্যাশার আগুন শরীরে, অথচ সচেতন সে তার পুষ্ট স্তন সম্পর্কে। তাকে সুন্দর করে বনফুলের মতো গোপনে ফুটতে দেওয়া ভালো। নাভির নীচে অগ্ন্যুৎপাত এবং শরীর অবশ হয়ে গেলে সুদত্তকে বলা, তোমাকে ছাড়া আমি কিচ্ছু সত্যি জানি না।

চাষবাসে ফালা ফালা করে দেবার ব্যাপারে কোনো আপত্তি থাকত না বনলতার।

তবে দেখাও।

কী দেখাব?

কেন সেই—ওই যে, তুমি জেনেও এমন করো!

না বলতে হবে কী দেখাব!

আরে নরখাদক বাঘিনিটাকে। দেখাও না। কেমন সে গোপনে লুকিয়ে আছে গভীর বনে। দারুণ, দারুণ।

আবার অসভ্যতা শুরু করলে?

সোনা আমার। লক্ষ্মী। বলেই জাপটে ধরা। এবং আশ্চর্য নীরব এক প্রবহমান সংগীত বেজে উঠতে থাকে শরীরে। কী যে হয়! যেন কোনো অতলে হারিয়ে যেতে যেতে জেগে যেত বনলতা। শাড়ি সামলে উঠে বসত। কিছুক্ষণ চুপচাপ হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজে বসে থাকা। আর সুদত্ত সুচারু ভঙ্গিতে তুলির ছবি টেনে দিচ্ছে। মাত্র কয়েকটা রেখায় বনলতা ছবির মধ্যে জীবন্ত হয়ে থাকত।

ধর বিনু বলছে।

ফোনটা এগিয়ে দিতেই বনলতা কোনোরকমে বলল, অংশু আজ বাড়ি ফেরেনি। তোদের কাছে গেছিল!

বিনু বলল, বাড়ি ফেরেনি! কোথায় গেছে!

জানি না, কিছু জানি না। অপুকে দে!

অপু!

হ্যাঁ অপু। ওর সঙ্গে আমার কথা আছে।

আমি মাসিমা।

তুই! অংশু তোকে কিছু বলেছে?

না মাসিমা। ও তো কিছু বলেনি।

আজ গেছিল?

না মাসিমা।

মিছে কথা বলছিস! বল, ঠিক করে বল, তুই ওকে কিছু বলেছিস কি না!

অংশুও কি বলেছিল, দেখাও সেই নরখাদক বাঘিনিকে। কারণ বনলতা জানে, অংশু সিনেমা ম্যাগাজিনে গোপনে সব নায়িকাদের ছবি দেখে থাকে—আজ বনলতার মনে হচ্ছে একটা চিতাবাঘের মতো ছুটছে কেউ—সে এক নারী, শিকারি চিতাবাঘ যেমন হয়ে থাকে। সহসা বনলতা চিৎকার করে উঠল, অংশুর কিছু হলে কাউকে ক্ষমা করব না, কাউকে না। কাউকে.....।

কাকে এই তিরস্কার! পাশাপাশি মানুষজন হতচকিত। মাথাটা খারাপ হবার বোধ হয়

উপক্রম! বনলতার মা বলল, এত উতলা হস না মা। ভগবানকে ডাক। কাকে ক্ষমা করবি না বলছিস!

বনলতা ছেড়ে দিল ফোন। হেঁটে গেল—যেন সব সে হারিয়েছে। এই হারানোর ব্যাপকতা এত অসীম যে সে অন্ধকার দেখছে। শুধু অন্ধকার—গভীর নীল অন্ধকার—এবং দূরে আবার সেই মানুষ হেঁটে যাচ্ছে। হাতে অতিকায় তুলি, আকাশের দেওয়ালে বড়ো বড়ো ছবি এঁকে চলেছে।

এই দেখ বনলতা, আহা বসো না, ঠিকঠাক হয়ে বসো। ঘাড় একটু বাঁকাও। ঊরু সামান্য তুলে দাও। হ্যাঁ ঠিক আছে। না, না দুই উরুর ভাঁজ স্পষ্ট থাকুক। আমার বাঘিনিকে দেখতে দাও। ছবি দেখ। জংঘা এবং নাভিমূলে আছে অনন্ত রহস্য। আমরা পুরুষেরা ছুটছি, ঈশ্বরের সৃষ্টি রক্ষা হচ্ছে। বাঘিনি বললে তুমি, তুমি এত ব্যাকুল হয়ে পড়ো কেন! তুমি নিস্তেজ হয়ে পড়ো কেন?

আসলে বনলতা টের পায় সঙ্গে সঙ্গে, একজন তরুণ যুবকের সান্নিধ্য অতিশয় মনোরম।

বাবার এক কথা, না, বাউণ্ডুলে ছেলে, ওর সঙ্গে মিশবে না।

কবে মিশলাম!

শুনেছি, তুমি ওর সঙ্গে চৌরঙ্গি দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলে! তুমি ওর বাড়িতেও যাও। আমার মান-মর্যাদার কথা ভাব!

আবার ফোন। কে! কে!

কাগজের অফিস থেকে। ওরা আসছে। সব খবর নেবে। রিপোর্ট করবে। অংশুর ছবি বের করে রাখো। পাশপোর্ট সাইজের ছবি দরকার। মেজদা দরজায় উঁকি দিয়ে কথাগুলি বলছে!

সব বলবে। কখন বাড়ি থেকে বের হয় কখন ফেরে, কোথাও বিকেলে কিংবা সন্ধেবেলায় যায় কি না!

খবরওয়ালারা এল, চলে গেল। বড়ো দ্রুত যানবাহনের মতো গতি নিয়ে আসে যায় সব কিছু, তারপর অদৃশ্য হয়ে যায়, ছবি ভাসে শুধু—কেউ ফিরে আসে না। দরজায় খুট খুট শব্দ, হৃৎপিণ্ড লাফিয়ে ওঠে। বনলতা জানালায় বসে আছে। আকাশ আজও নীল এবং গভীর বেদনার প্রতিচ্ছায়া। কোনো এক করুণাময় যেন তুলি বুলিয়ে দিচ্ছে। তুমি সুদত্ত এভাবে প্রতিশোধ নিও না। আমার মতো অপুও বলছে, যায়নি। অংশু যায়নি। সে কিছু জানে না। আমি কি জানতাম, তোমার এই চলে যাওয়া শেষবারের মতো—আমি কী করব বল! কেউ চাইত না, আমি যাই।

আর কেন যে বাঘিনি এই শব্দ এত প্রতীকময় হয়ে যেত তার কাছে—শরীরের কোশে কোশে অগ্নিশিখা জ্বলে উঠলে কে না নষ্ট হয়ে যায়! আমি গোপনে নষ্ট হয়ে গেছিলাম। আমার ছলনা টের পেলে, বুঝলে আসলে শরীরসর্বস্ব হয়ে আছি, আমার সব আকাঙক্ষা এবং কৌতূহল নিবৃত্ত করা ছাড়া, তোমার কাছে চাইবার মতো কিছু নেই। তোমার অন্ধ মা, মানে মাসিমার সেই আর্ত চিৎকার কানে বাজে। একই ভাবে ফোন এসেছিল, বনলতা, সে তোমাকে কিছু বলে যায়নি—বনলতা, কেন যে সে রাতে ফিরে আসেনি—আমি ওর খোঁজ কোথায় করব! কোথায় যাই!

না না না! বনলতা দুহাতে মুখ ঢেকে ফেলছে। সে অতীতের কোনো আর্ত চিৎকার শুনতেই রাজি না।

বনলতা ভাবতে পারছে না।

অকারণ এক যুবকের লাশ দেখা গেল রেলের ধারে পড়ে আছে। সুদত্ত নামে এক যুবকের লাশ যদি পড়ে থাকে—কেন পড়ে আছে, কী কারণ, এমন সব প্রশ্ন উঁকি দিতেই পারে। দিয়েও ছিল। মৃত্যুরহস্য উদঘাটনে পুলিশ আর খবরের কাগজগুলি সেদিন তোলপাড় করে ফেলেছে। অথচ কেউ জানে না সে এসেছিল তার নারীর কাছে, কিংবা

নারী তার কাছে গিয়ে বলেছিল, সুদত্ত বাড়ি থেকে পাত্র দেখছে। তুমি কিন্তু আমার উপর বিশ্বাস হারিও না।

সুদত্তের চোখ নির্বোধের মতো দেখাচ্ছিল অথবা স্থির এবং নিষ্পলক—মানে তুমি, তুমি সত্যি কী চাও আমি জানি না। এতদিন তবে এ ভাবে আমাকে জড়িয়ে রাখলে কেন? বিশ্বাস হারাবার প্রশ্ন আসে কী করে?

আমি জানি, সুদত্ত আমার মঙ্গল অমঙ্গল সব তোমার কাছে গচ্ছিত। কোনো অপকারই তুমি করতে পার না। আমি যদি হারিয়ে যাই, তুমি আমাকে খুঁজে বেড়িও।

সুদত্ত বলেছিল, বুঝতে পারছি না, কিছুই বুঝতে পারছি না। আমার জন্য তুমি কী রেখে যাবে তবে। স্মৃতি! বিশ্বাসভঙ্গ আমি করব না। কোনো এক অতীত থেকে উঠে আসা স্মৃতি বনলতাকে তোলপাড় করে দিচ্ছে। সে হাতড়াচ্ছে—হেতু সেই জানত—পাত্রপক্ষ যেদিন দেখতে এল, সেদিনও সে এতটুকু বিচলিত বোধ করেনি। বরং এমন সুপাত্র এবং দীর্ঘকায় সুন্দর পুরুষ তার হাত ধরে সংগোপনে কিংবা বন্য বাঘিনিকে পোষ মানাবার জন্য কী কাতর তার চোখমুখ! অংশুর বাবার চোখে আশ্চর্য ধার। তার শরীরের রোমকূপ আবার অগ্নিবর্ণ হয়ে গেলে, সে এক বিকেলে নীলার বাড়িতে যাবে বলে বের হয়ে পড়েছিল।

কে? দরজার বাইরে কে দাঁড়িয়ে?

আমি বনলতা। তোমার কাছে মার্জনা চাইতে এলাম।

মার্জনা? কীসের মার্জনা! নাটকের সংলাপ যে! তুমি কী বলছ বুঝতে পারছি না! আমি কেন আর আগের মতো ঠাট্টা পরিহাস কিছুই করতে পারছি না। আমি জানি, সেই হিংস্র নরখাদক বাঘিনির কথা বললেই ব্যাকুল হয়ে উঠবে। গভীর প্রতীকী কথাবার্তা তুমি এমন করে বুঝতে, অথচ সেই তুমি আর অকুণ্ঠচিত্ত নও। ছলনা শেষে এ ভাবে মানুষকে ভারাক্রান্ত করতে পারে আমি জানতাম না। এগুলো সম্ভবত সুদত্তের সেদিনের ভাবনা।

সুদত্ত কোনো কথা বলেনি। মাথা নীচু করে বসেছিল। সে তার মুখ তুলে দেখেছে, চোখে জল। তার কোনো ভাষা ছিল না। নারী ছলনাময়ী টের পেয়ে সে নীরব হয়ে গেছিল। বালকের মতো অবোধ চোখে তাকিয়েছিল শুধু।

আমি যাই সুদত্ত।

এস। সে উঠে এসেছিল। বারান্দা পর্যন্ত এগিয়ে আবার ফিরে গেল। বনলতা ফিরে তাকায়নি। তাকালে কী হত জানে না। বিশ্বাসের দায় সঁপে দিয়ে চলে এসেছিল।

এই বিশ্বাসের দায় সুদত্ত অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছে। সে হঠকারী যুবকের মতো যদি সত্যি কিছু ফাঁস করে দেয়, তবে তার তুলির টানে কিশোরী আর ছবি হয়ে যাবে কী করে! সে ঠিক অন্য দিনের মতো বিকেলে বের হয়ে গেছিল। কাঁধে ব্যাগ। কেউ জানত না সে ভিতরে ভিতরে অস্থির। বাস-স্ট্যাণ্ডে দাঁড়িয়েছিল। কোন বাসে উঠতে হবে সে যেন বুঝতে পারছে না। কোথায় যাবে সে জানে না। আচ্ছন্ন এক যুবকের এই বেশবাস, চাউনি, মৃত মাছের মতো চোখ যার, হৃদয়হীন হয়ে আছে—কেউ জানে না, সুদত্ত সেদিন আর বাড়ি ফেরারও আগ্রহ বোধ করছে না। সে সব হারিয়েছে। সে বুঝে উঠতে পারেনি, বাসটা তাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে। যেন এমন কোথাও এক অজ্ঞাত জায়গার খোঁজে আছে সে যেখানে নিজেকে চিরদিনের মতো আড়াল করতে পারবে।

বনলতা শুনেছে, সুদত্তর লাশ পাওয়া গেছিল মসলন্দপুর স্টেশনের কাছে।

কেউ বলেছে, গাড়ি থেকে পড়ে গেছে।

কেউ বলেছে, দুর্ঘটনা। আর কিছু নয়। সুদত্ত মাঝে মাঝে ছবি আঁকার জন্য বের হয়ে পড়ত। কোনো শস্যখেতের পাশে বসে থাকত একা। চাষি রমণীর মুখ আঁকত। কিংবা শস্য রোপণের দৃশ্য। দূরের সেই আকাশ, কিছু গাছ কিংবা পাখি এ সবই ছিল তার ছবির বিষয়। পরম যত্নে স্কেচগুলি তার ঝোলায় ভরে, উঠে দাঁড়াত। বড়ো সুন্দর মনে হত তার কাছে মানুষের জীবনযাপন। এবং আগ্রহ আছে এক নারীর—যার আসার কথা, সে আসবেই, তার টেবিল ঘেঁটে বের করবে মনোরম সব ছবি—দেখে বলবে, কী দারুণ হাত! আর আশ্চর্য বনলতা দেখত, সব ছবিতেই আছে রমণীর মুখ, নানা রকমের, যেমন সুদত্ত তাকেই নানা বয়সে সব নারীর মধ্যে ধরে রাখার জন্য পাগল।

সুতরাং দুর্ঘটনা ঘটতেই পারে। অন্য কোনো কারণ থাকতে পারে, কেউ আবিষ্কার করতে পারেনি।

বনলতা সকালবেলায় কাগজে সুদত্তর খবর পড়ে বিমর্ষ হয়ে থাকত। কেউ এলে চকিতে উঠে দাঁড়াত। তারপর সেই সহজ ভঙ্গি, ইস সুদত্ত একটা পাগল। কী বোকা! ছবি আঁকার নামে এত ঘোর ভালো না। ঠোঁট উলটে বলত, এত অন্যমনস্ক হলে হয়! কারণ সুদত্তের বন্ধুবান্ধবেরাও দেখা করতে আসত। তারা তারও সহপাঠী। বোকা সুদত্তকে নিয়ে হাসি মশকরা পর্যন্ত শুরু হলে বনলতা বলত, আমি বলেছিলাম না তোদের, বাসে সে কখনো না দৌড়ে গিয়ে উঠবে না। ট্রেন ছাড়লে দৌড়ে ওঠার অভ্যাস। এত সতর্ক করেছি, শেষে যা ভেবেছিলাম, তাই হল।

সুদত্তের অপমৃত্যু নিয়ে গায়ে একটা মাছি বসলেও সে টোকা দিয়ে উড়িয়ে দিত।

তোর সঙ্গে কবে শেষ দেখা?

অনেকদিন আসেনি আড্ডায়।

তুই তো ওর বাড়ি যেতিস, কিছু বুঝতে পারিসনি।

বাড়ি আবার কবে যেতাম! মাসিমা একবার যেতে বলেছিলেন, সুদত্ত বার বার বলত, মা তোমার কথা খুব বলে, তুমি গেলে মা খুশি হবেন, এসো, সেই একবার যাওয়া।

কারণ বেফাঁস কথাবার্তা বলে সে এই অপমৃত্যুর সঙ্গে নিজেকে জড়াতে যায়নি। গোপনে সে যে বারবার গেছে, ভিতর বাড়িতে মাসিমা, সে বাইরের ঘরে, সামনের বারান্দা পার হয়ে বড়ো কাঁঠাল গাছের ছায়ায় সুদত্তের ঘর—একা নিবিষ্ট মনে তার ছবি আঁকা, কিংবা মাঝে মাঝে যে চা দিয়ে যেত, বনলতা গেলে তা দেবার হুকুম ছিল না। ভিতরের দিকে দরজা বন্ধ থাকত। বাইরের দিকে জানালা-দরজা খোলা, তারপর পাঁচিল, এবং সামনে এক পরিত্যক্ত নিবাস ছাড়া কেউ সাক্ষী ছিল না তার উপস্থিতির।

বনলতা ঘড়ি দেখল।

অংশু কি অপুর কাছে পালিয়ে যায়! অংশু যদি কোনো কারণে বেফাঁস কিছু করে বসে, এবং যদি অপু বলে, দাঁড়াও না, তুমি এত অসভ্য, মাকে বলে দেব—কারণ অপুর পড়ার ঘর নীচে। গোপনে অংশু যেতেই পারে—অথবা সহসা সেও কি হিংস্র নরখাদক বাঘিনির পাল্লায় পড়ে গিয়ে হতচকিত—কিংবা অস্থির হয়ে উঠেছিল—সে জানে গোপন অভিসারের মধ্যে আছে কীটের বাসা।

কে জানে সেই কীট-দংশনে অংশু বেহুঁশ হয়ে বের হয়ে পড়েছে কি না! যদি বের হয়ে যায়, কিংবা সুদত্তর মতো কোথায় যাবে স্থির করতে না পারে, তবে অন্য কোনো দূরবর্তী ট্রেনে চেপে যে বসেনি কে বলবে! মাথা ঠিক থাকে না। পাগল পাগল লাগতেই পারে এবং পারিবারিক মর্যাদা নষ্ট হবার ভীতি যদি পেয়ে বসে তাকে—তবে সে একটা কিছু করে বসতেই পারে। অংশু সতেজ গাছের মতো বেড়ে উঠেছে। চারপাশে ডালপালা পুঁতে বড়ো করে তোলা হচ্ছিল, যেন কোনো কারণে আগাছায় জড়িয়ে না ফেলে। কোনো পরগাছা তার শরীরে বাসা না বাঁধে—কী প্রাণান্তকর সেই চেষ্টা—সব অংশু ব্যর্থ করে দিয়ে শেষে নিখোঁজ ।

বনলতার কী মনে হল কে জানে, যেন এখনও সময় আছে হাতে—বের হয়ে পড়া দরকার, সে কিছু জানে না, যদি অপু জানে, তার একমাত্র এখন করণীয় সোজা অপুর কাছে চলে যাওয়া।

করজোড়ে বলবে, বল অপু, বল। অংশু কোনদিকে গেছে। তুই একমাত্র অংশুর খবর দিতে পারিস। তোর ওয়ার্ক এডুকেশনের খাতায় আমি যে চিঠি পেয়েছি। এমনি চিঠি, কিংবা চিঠিতে তোর কোনো সংকেত ছিল কি না, যা একমাত্র অংশু বুঝতে পারে—তোর

সেই খাতার সাদা পাতাগুলি কোনোটাই সাদা নয়। হাজার হাজার অক্ষরের কিংবা বর্ণমালার সমষ্টি। যেমন আমার মুখ দেখে মা-বাবা টেরই পায়নি, সুদত্তের অপমৃত্যুর ব্যাখ্যা দিতে পারি একমাত্র আমি।

তোর মুখ কী সাদা পাতার মতো শূন্য—কোনো ভাষাই পড়া যায় না—আমাকে লুকোবি, ঘরপোড়া গোরু আমি—দ্যাখ কী করি, বলেই বনলতা উঠে সোজা সিঁড়ির দিকে নেমে যেতে গেলে, বাড়িসুদ্ধ লোকজন ছুটে গেল। মাথা ঠিক রাখতে পারছে না। তাকে আটকে দেওয়া হল। আর তখন চিৎকার, ছাড়, ছাড়, বলছি! আমাকে যেতে দাও! শেষ খবর সেই দিতে পারে। আমার অংশুর এক আলাদা সত্তা, আমি জানব কী করে। সে তো আমার কথা তার বাবার কথা ভাবল না। বলে সে হাঁটু মুড়ে বসে পড়ল।

আর গভীর রাতে দেখা গেল বনলতা কখন নিজেই নিখোঁজ হয়ে গেছে। কোথায় গেল কেউ জানল না! এমনকী অংশু ফিরে এসেও জানতে পারেনি। মা কেন বোকার মতো তাকে খুঁজতে বের হয়ে গেছে! সে ট্রেনে চড়ে মসলন্দপুর যাবে বলে রওনা হয়েছিল—ওখানে কে আছে জানে না, তবু সেই স্টেশনে একবার তার যাওয়া দরকার বোধ করেছিল। ট্রেন বে-লাইন হয়ে যাওয়ায় সে ফেরার রাস্তা হারিয়ে ফেলে।

আততায়ী

আজও টাকাটা নিয়ে ফেরত আসতে হল। এক টাকার একটা নোট তার মাথার মধ্যে এভাবে আগুন ধরিয়ে দেবে দু-দিন আগেও টের পায়নি। যেন নোটটা যতক্ষণ মানিব্যাগে থাকবে ততক্ষণই তাকে বিচলিত করবে। উত্তপ্ত রাখবে এবং অস্বস্তির মধ্যে দিন কাটাতে হবে। সামান্য একটা এক টাকার নোট এভাবে বিপর্যয়ের মধ্যে ফেলে দেবে সে ভাবতেই পারেনি। আজকাল এক টাকার দামই বা কী! কিচ্ছু না। কিন্তু এক টাকার নোটটা যেন তার সঙ্গে বাজি লড়ছে। নোটটা এবং সে।

আসলে জীবনে একজন প্রতিপক্ষ সবসময় এসে তার সামনে দাঁড়ায়। প্রতিপক্ষটি প্রথমে খাটো থাকে—ক্রমে সে হাত-পা বিস্তার করতে থাকে এবং একদিন এই প্রতিপক্ষই জীবনে চরম শত্রু হয়ে দাঁড়ায়। দু-দিন ধরে এই নোটটা তার প্রতিপক্ষ, এটাকে বাজারে চালাতেই হবে।

সকালে বাজার করতে গিয়ে হাফ পাউণ্ড পাঁউরুটি কেনার সময় ব্যাগ থেকে খুঁজে নোটটা বের করে দিয়েছিল। আর তক্ষুনি দোকানির কাতর গলা, না স্যার চলবে না। কিছু নেই।

নেই মানে!

মাঝখানটা একেবারে সাদা। ন্যাতা হয়ে গেছে। কে দিল?

কে দেবে! বাসের কনডাক্টর। এক টাকার নোট পাওয়াই যায় না। নেবে না কেন? এক টাকার নোট অচল হয় না। আমি তো ঘরে বসে ছাপিনি! নেবে না কেন?

না বাবু, বদলে দিন।

দেব না। নিতে হবে। এক টাকার নোট অচল হয় না।

আপনি পাঁউরুটি ফেরত দিন। অচল কি না জানি না। আমি নিতে পারব না।

মাথা তার গরম হয়ে যাচ্ছিল। সেও দোকানির মতোই বলেছিল, ভাই কনডাক্টর নোটটা পালটে দাও। ছেঁড়া।

কিছু নেই।

কী হাসি!

কী বলছেন দাদা, কিছু নেই! না থাকলেও চলে। ছাপ থাকলেও চলে। বাজারে এক টাকার নোট পাওয়াই যায় না, আপনার লাক ভালো।

লাক ভালো বলছ!

হ্যাঁ, তাই বলছি। নিতে হয় নিন, না হয় চেঞ্জ দিন। কোথাকার লোক আপনি, বাসে ট্রামে চড়েন না।

বাসে ট্রামে চড়ি কি না তোমাক কৈফিয়ত দেব না। চলবে না! পালটে দাও। আমার কাছে চেঞ্জ নেই।

ধুস নিতে হয় নিন, না হয় নেমে যান।

এক কথায় দু-কথায় বচসা শুরু হতেই বাসের লোকজন মজা পেয়ে গেছিল। একজন বলল, কী হল দাদা! এক টাকার নোট আজকাল অচল হয় না জানেন। দু-পয়সা, পাঁচ-পয়সা উঠেই গেল। আপনি দেখছি আজব লোক মশাই।

বাস বাদুড় ঝোলা হয়ে ছুটছে। তার সামনে দুজন যুবতী, ফিক ফিক করে হাসছে। তার মনে হয়েছিল, সে একটু বেশি বাড়াবাড়ি করে ফেলেছে। সামান্য এক টাকার একটা নোট নিয়ে। এত কথা বলা উচিত হয়নি। অনেকে সিট থেকে উঁকি দিয়ে তাকে দেখেছে। এমন বিপাকে যেন সে জীবনেও পড়েনি। সত্যি তো এক টাকার নোটের বড়ো ক্রাইসিস। কীই বা দাম! নোটটা নিয়ে আর সে কোনো কথা বলেনি। জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে ছিল। আজকাল মানুষ সামান্য বিষয়ে কত মজা পায়! সে সব বাস-যাত্রীদের মজার খোরাক হয়ে গেল। তাকে নিয়ে দু-একজন বেশ ঠাট্টা রসিকতাও চালিয়ে যাচ্ছে। অর্থাৎ সে বুঝতে পারছে, কনডাক্টরের পক্ষ নিয়েছে সবাই!

তার এভাবে মাথা গরম হবার কারণ বাড়ি গেলে আবার এক ধকল যাবে। ছবি বলবে, কে আবার অচল টাকা গছিয়ে দিল তোমাকে! যেমন মানুষ তুমি—ঘরে দুটো পাঁচ টাকার নোট, একটা দশ টাকার নোট, গোটা তিনেক দু-টাকার নোট অচল হয়ে পড়ে আছে। ছবির এককথা—দেখে নেবে না! তুমি কী! যে যা দেয় নিয়ে নাও! লোক ঠিক চিনেছে।

বাড়ি ফিরে নোটটা নিজের কাছেই রেখে দিয়েছে। বরং বলা যায়, নোটটা ছবির চোখ এড়িয়ে লুকিয়ে রেখেছে। দু-দিন ধরে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, যদি চলে যায়। কিন্তু চলে যাচ্ছে না। সে তবে ঠিকই ধরেছিল, চলবে না। নোট অচল।

কিন্তু বাসের সবাই বলেছে, এক টাকার নোট অচল কবে হল আবার! চেনা গেলেই হল —হ্যাঁ এক টাকার নোট। এই তো সরকারের টিপ ছাপ আছে বোঝা যায়। বোঝা গেলেই

হল।

এই যে বাবু।

হ্যাঁ, আমাকে ডাকছ?

চলে যাচ্ছেন যে।

কী করব! দাঁড়িয়ে থাকব?

নোটটা চলবে না। বদলে দিন।

দুটো মর্তমান কলা কিনে নোটটা দিয়েই হাঁটা দিয়েছিল সে।

আর টাকা নেই। আমি তো বানাইনি।

না থাকে কাল দেবেন। এটা নিয়ে যান।

রেখে দাও। পরে পালটে দেব।

না বাবু। কালই দেবেন। নিয়ে যান।

রাখলে দোষের কী? ছোঁয়াচে নাকি!

তা বাবু বলতে পারেন।

সে অগত্যা নোট ফিরিয়ে নিয়েছে। কাছে টাকা থাকতেও দেয়নি। দিলে যেন প্রমাণ হবে ঠগ, জোচ্চোর। অচল টাকা চালিয়ে বেড়াবার স্বভাব।

তারও মাথা গরম হয়ে যায়। যেন পারলে সেই বাস কনডাক্টরের মাথার চুল ধরে ঝাঁকিয়ে বলে, বেটা তুমি সাধু। আর আমি শালা চোরের দায়ে ধরা পড়েছি।

ঘরে বাইরে সব জায়গায়।

বাজার থেকে ফিরেই সে গুম হয়ে বসে থাকল কিছুক্ষণ। ছেলেরা স্কুলে যাবে। বাস এসে গেছে। ছবি রান্নাঘরে ওদের টিফিন হাতে নিয়ে ছেলে দু-জনকে বাসে তুলে দিতে যাচ্ছে। সে দেখেও দেখল না। মাথার মধ্যে বুড়বুড়ি উঠছে, লোকটাকে ধরতে হবে। টাকাটা নিয়ে সে এত হেনস্থা হবে অনুমানই করতে পারেনি। একটা এক টাকার নোট যেন পকেটে থেকে মজা লুটছে। তোমার মজা বের করছি, দাঁড়াও।

ছবি ফিরে এসে বলল, কী ব্যাপার? এত সকালে কোথায় বের হবে?

কাজ আছে।

কী কাজ বলবে তো। কিছুই রান্না হয়নি।

যা হয়েছে দাও।

সে বেশি কথা বলতে পারছে না। যেন সবাইকে তার চেনা হয়ে গেছে। বাজার করতে গেলে সে ঠকে, বাসে মিনিবাসে সে ঠকে, অফিসে পদোন্নতি নেই, স্বভাব-দোষে সর্বত্র সে অচল। ঘরেও। বাজার করে দিয়ে রেজকি ফেরত দিলেই ছবির এককথা, এটা নিলে! চলবে!

আরে এখন সব চলে। রাখো তো, ভ্যাজর ভ্যাজর করবে না।

তার অফিস বিকেলবেলায়। কাগজের অফিসে কাজ করলে যা হয়! এত সকালে বের হবে শুনে ছবি চমকে গেছে। রান্নাঘরে তার মেজাজ চড়া!—এ কী লোকরে বাবা, আগে থেকে কিছু বলবে না। এখন কী দিই!

বলছি না যা হয়েছে তাই দাও।

শুধু ভাত হয়েছে।

ওতেই হবে। ফ্রিজে কিছু নেই!

না।

ডিম ভেজে দাও। একটু মাখন দাও। ওতেই হবে যাবে।

কোথায় যাচ্ছ বলবেতো!

বলছি না কাজ আছে।

সেটা কী রাজসূয় যজ্ঞ!

তাই বলতে পার।

কথা বাড়ালে খাণ্ডবদাহন শুরু হয়ে যাবে। সে আর কথা বাড়াল না। চুপচাপ খেয়ে বের হয়ে গেল।

রাস্তায় এসে দাঁড়াতেই পাশ থেকে একজন চেনা লোক বলল, দাদা এত সকালে এখানে দাঁড়িয়ে আছেন?

একটু কাজ আছে।

কত নম্বর বাস? দু-শ এগারো?

দরজায় দেখল, না সে লোকটা নেই।

আবার দু-শ এগারো।

এটাতেও নেই।

বেলা বাড়ে সেই লোকটাকে সে কিছুতেই শনাক্ত করতে পারে না।

লোকটা কী উধাও হয়ে গেল।

ঝাঁ ঝাঁ রোদ্দুরে ফিরে এসে সে শুয়ে পড়ল। সেদিন আর অফিসে বের হল না। মাথায় পেরেক ফুটিয়ে লোকটা উধাও হয়েছে। শুয়োরের বাচ্চা তুমি কত বড়ো ঠগ আমি দেখব। চেঞ্জ দিতে পারেন দিন, না হলে নেমে যান।

পরদিন সকালে ফের এককথা।

বের হচ্ছি।

এত সকালে!

কাজ আছে বলছি না।

কী কাজ!

রাজসূয় যজ্ঞ শুরু হয়েছে। বুঝলে!

ছবি বলল, সারাজীবনই তো রাজসূয় যজ্ঞ করলে, এ আবার কী নতুন যজ্ঞি শুরু হল তোমার!

ছবি খোঁটা দিয়ে কথা না বলতে পারলে আরাম পায় না। এতদিনে ছবি বুঝে গেছে, সত্যি অচল মাল নিয়ে তাকে কাজ করতে হচ্ছে। দুনিয়ার লোক মুখিয়ে আছে, লোকটাকে ঠকাবার জন্য। বাজারে, কাজের জায়গায়, বন্ধুবান্ধব সবাই যেন জেনে ফেলেছে, তার কাছে এলে ফিরে যাবে না। সে ধার দিয়ে ঠকেছে, সে বিশ্বাস করে ঠকেছে, জমি কেনার সময় দালালি বাবদ অনেক টাকা গচ্চা দিতে হয়েছে, বাড়ি করার সময় ঠিকাদার মাথায় হাত বুলিয়ে বেশ ভালো রকমের টুপি পরিয়ে দিয়ে গেছে। দরজা সেগুনের দেবার কথা, দিয়েছে গাম্বার কাঠের। একটু বাতাস উঠলেই খড়খড় করে নড়ে ওঠে। কোনো দরজা বৃষ্টি হলে ফুলে ফেঁপে যায়, লাগাতে গেলে হাতি জুতে টানাটানি নাকি করতে হয়। সব অভিযোগই ছবির। রান্নাঘরের দেয়ালের দুটো টাইলস খসে পড়েছে। তা পড়বে না, যেমন মানুষ! কথায় যে চিঁড়ে ভেজে তাকে দেখে নাকি ছবি সেটা সত্যি টের পেয়েছে।

এবারে আর ভিজতে দেবে না।

কী দাদা দাঁড়িয়ে আছেন! এত সকালে।

দাঁড়িয়ে আছি তো তোর কীরে ব্যাটা! সারাদিন দাঁড়িয়ে থাকব। আমার খুশি। সে এমন ভাবল।

কি পেলেন?

কাকে?

সেই লোকটাকে।

তুমি জান কী করে?

না যে-ভাবে ক-দিন থেকে রোজ দাঁড়িয়ে থাকছেন!

সে কী পাগল হয়ে যাচ্ছে! তাকে দেখেই কী টের পায়, একজন ঠগ জোচ্চোরকে সে খুঁজতে বের হয়েছে। চোখে মুখে কী তার কোনো আততায়ীর মুখ ভেসে উঠছে।

সে বলল, এমনি দাঁড়িয়ে আছি।

বাস-স্টপে এসে এমনি সারা সকাল কেউ দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না! মাথায় কোনো গণ্ডগোল সত্যিই কী দেখা দিয়েছে! আমি দাঁড়িয়ে থাকি, খুশি! তোর কীরে শুয়োরের বাচ্চা! অবশ্য সে প্রকাশ করল না। মাথা তেতে আছে। সবার সঙ্গে সে দুর্ব্যবহার শুরু করে দিয়েছে। লোকটাকে শনাক্ত করতে না পারলে সে কী সত্যি পাগল হয়ে যাবে!

আবার দু-শ এগারো।

না নেই।

তীর্থের কাকের মতো দাঁড়িয়ে আছে।

দুটো দরজায় যারা ঘন্টি বাজায়, দেখে। তাদের কারও মুখ মেলে না।

এবারে ভাবল, না, এভাবে হবে না। সে উঠেই পড়ল। বাস-স্ট্যান্ডে গিয়ে খোঁজ করল। নেই। সে আবার একটা বাসে উঠে পড়ল। কিছু দূরে গিয়ে নেমে পড়ল। না নেই।

আসলে সে যেন সবার মুখেই সেই একজনের মুখ দেখতে পায়। কে যে আসল ধুরন্ধর তা টের পায় না। ধরতে পারলেই মুখে ঘুসি মেরে বলত, নে শুয়োরের বাচ্চা, তোর টাকা রাখ। আমার টাকা ফেরত দে।

একদিন এভাবে সারাদিন এই করে সে যখন বুঝল, আসল আততায়ীকে ধরা যাবে না, যায় না, তখন একটা গাছের নীচে বসে পড়ল। পার্স থেকে নোটটা বের করে দেখল! হাজার অপমানের কথা মনে পড়তে থাকল। টাকাটা আবার দেখল। উলটেপালটে দেখতে দেখতে কী ভাবল কে জানে, সে নোটটা কুচি কুচি করে ছিঁড়ে ফেলে হাওয়ায় উড়িয়ে দিল। সঠিক আততায়ীকে খুঁজে বের করা জীবনে কঠিন। বাতাসে নোটের কুচি উড়ে যেতেই সে একেবারে হালকা হয়ে গেল। কী আরাম। বাড়ি ফিরে সে আবার অনেকদিন পর ঘুমোল। সকালে উঠে দেখল, গাছপালা, পাখি, ঘরবাড়ি, মানুষজন সব আবার তার কাছে সুন্দর হয়ে গেছে।

হরিচরণবাবু

ঈশ্বর যখন আছেন, তখন ভূতও থাকবেন। হরিচরণবাবু আমাকে এমন বলতেন। আমরা একসঙ্গে তখন একটা কারখানায় কাজ করি। হরিচরণবাবুকে কারখানায় আমি কাজ দিয়েছিলাম। মাথায় টাক, বয়স হয়েছে, বেকার ছিলেন, বাবা ডাকসাইটে ফুটবলার ছিলেন এবং বলতে গেলে আমার কাছে চাকরির উমেদারিতে যখন দেখা করতে আসেন, তখন ওঁর বাবার নাম শুনে চাকরিটা না দিয়ে পারিনি। এত বড়ো ফুটবলার, বলতে গেলে কিংবদন্তী, এমন মানুষের একজন পুত্র বেকার থাকবে ভাবতে কষ্ট হয়েছিল। প্রথমে ভাউচার লিখতেন, কারখানার বিল আদায় করতেন, পরে কারখানার প্রোডাকশনের দিকটা সামলাতেন।

হরিচরণবাবু বিয়ে থা করেননি। বয়স পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ—এই বয়সে প্রথম তাঁর চাকরি, তা ছাড়া আমাদের কারখানার অবস্থাও বিশেষ ভালো না, আজ ওঠে তো, কাল উঠে যায়—এহেন পরিস্থিতিতে তাঁর বিয়ে করা চলে না—এমন বলতেন। পাওয়া ছুটিছাটা নেবার কোনো আগ্রহ তাঁর ছিল না। কেবল অমাবস্যা এবং বিশেষ বিশেষ শনিবার বাদে।

মাঝে মাঝেই তিনি বলতেন, স্যার যাবেন, চলুন না। আমি বলতাম, কোথায়? তিনি বলতেন, চলুন, দেখতে পাবেন, আপনি তো ভূতটুত বিশ্বাস করেন না। আমার বিশ্বাস, একটা রাত আমার সঙ্গে কাটালে বিশ্বাস হবেই।

আমি বলতাম, বিশ্বাস করি না কখন বললাম! বলেছি, আমি নিজে ভূত দেখিনি। ভূতটুতের বিষয়টা আসলে সংস্কার। যেমন ঈশ্বর আছেন—এটা একটা সংস্কার। মন্দির দেখলে মাথা যে ঠুকি—তা সংস্কার থেকেই।

হরিচরণবাবু বলতেন, না তেনারা আছেন। এবং এটা হত, যখনই হরিচরণবাবু আমার ঘরে ঢুকতেন, এ-কথায় সে-কথায় ভূতের প্রসঙ্গ টেনে আনতেন। বলতেন, দেখুন, আমার ঠাকুমার একটা পোষা ভূত ছিল।

পোষা ভূত শুনে চমকে গিয়েছিলাম!

বিশ্বাস করুন। আমাদের পরিবারের কোনটা শুভ অশুভ—সেই পোষা ভূতটা এসে ঠাকুমাকে সাবধান করে দিয়ে যেত।

কী জানি মশাই, এমন আজগুবি কথা আমি শুনিনি!

হরিচরণবাবু ততোধিক উৎসাহের সঙ্গে বলতেন, আমার দাদু, বুঝলেন না, তিনি ঠাকুমার পোষা হবেন না! অকালে মারা গেলেন—ঠাকুমা বাবা-কাকাদের বড়ো করেছেন, তাঁরই নির্দেশে। আমার পিসি এল বেড়াতে, ঠাকুমা দেখলাম হত্যা দিয়েছেন ঠাকুর মণ্ডপে। কী ব্যাপার! সারাদিন জলগ্রহণ করলেন না! সাঁঝবেলায় বললেন, নীহারকে আজ একটু বেশি মাছ মাংস খেতে দে। আমার বাবা শুনে অবাক। ঠাকুমার এককথা, নীহারের বর কালই মরে যাবে। তিনিই বলে গেছেন। পরে আমরা সব জেনেছিলাম।

তিনি মানে?

আমার দাদু, মানে ঠাকুমার পোষা ভূত। আমার বাবা যে ডাকসাইটে ফুটবলার হবেন, ঠাকুমা আগেই জানতেন। বলতেন, ও পড়াশোনা করছে না তো কী হয়েছে। যা করতে চায় করতে দাও। খেলার দৌলতে বাবা ইস্টার্ন রেলের বড় চাকরি পেয়ে গেলেন।

সুতরাং যাদের বাড়িতে পোষা ভূত থাকে তারা ভূতে বিশ্বাসী হবে বিচিত্র কী। হরিচরণবাবুও নাকি ঘোর অমাবস্যায় ঠাকুমার আসনে বসলে টের পান, পোষা ভূতটি বাড়ি ছেড়ে যায়নি। তাঁর যে চাকরি হবে আমার সঙ্গে দেখা করলে, এটাও নাকি তাঁর ঠাকুরদারই নির্দেশ।

আমাকে শুনতেই হত। কারণ অবিশ্বাসের কথা বললে, নানারকমের যুক্তি, আচ্ছা আপনি, পড়েছেন! বলে একজন ভূত বিশেষজ্ঞের বইয়ের এমন সব কাহিনি উল্লেখ করতেন যে, আমি খুবই বিস্মিত হতাম।

যেমন, একবার হরিচরণবাবু বলেছিলেন, একটা ছবি দেখাব।

ছবি!

হ্যাঁ। দেখবেন ছবিটা। দেখলেই বুঝতে পারবেন! বলে তিনি সত্যি একটা ছবি একদিন এনে আমাকে দেখালেন। একজন বিধবা মহিলা, আর তার পাশে তিন ছেলে দুই মেয়ে। পেছনে আরও একজন কেউ দাঁড়িয়ে আছেন, ছায়ার মতো—খুব স্পষ্ট নয়।

তিনি ছবিটা দিয়ে বললেন, আগে ভালো করে দেখুন।

বললাম, দেখছি।

ভালো করে দেখুন।

বলছি তো ভালো করে দেখেছি।

তিনি এবারে উঠে এসে আমার পাশে দাঁড়ালেন। এই যে দেখছেন, পেছনে দাঁড়িয়ে আছেন, তিনি ভদ্রমহিলার স্বামী।

ভদ্রমহিলাটি কে?

আমার সেই পিসি!

অঃ।

আমার পিসেমশাইয়ের মৃত্যুর তিন মাস পরে তোলা। ছবিটাতে দেখা যাচ্ছে, আমার পিসেমশাইও আছেন। মৃত্যুর পরও মানুষ তার আত্মীয়স্বজন ছেড়ে যে যেতে চায় না, এটা তার জ্বলন্ত প্রমাণ। আপনার এখনো বিশ্বাস করতে কষ্ট হয় ভূত নেই! ভূতটুত আসলে সংস্কার, ঈশ্বর আসলে সংস্কার এ রকম ভাববেন না।

সেদিন আমি বলেছিলাম, এটা যে আপনার পিসেমশাই জানলেন কী করে!

জানব না! তাঁকে আমি চিনব না!

ছবিটা স্পষ্ট নয়। আপনার পিসিমা কী বলেন!

পিসি কী বলবেন! মরে যাবার পরও মানুষটা ঘরবাড়িতে ঘুরে বেড়ায়, এমনকী ছবি তোলার সময় পর্যন্ত তিনি স্থির থাকতে পারেননি, শত হলেও স্ত্রী-পুত্র-কন্যার পাশে দাঁড়িয়ে ছবি তুলতে কার না শখ হয়। শখের জন্যই শেষ পর্যন্ত ধরা পড়ে গেলেন। পিসিমা তো ছবিটা দেখার পর বাড়িতে রক্ষাকালীর পূজা, চণ্ডীপাঠ সব করালেন। গয়াতে গিয়ে প্রেতশিলায় পিণ্ডদান করালেন। তারপর আবার ছবি তুললেন সবাইকে নিয়ে। দেখা গেল, না আর পেছনে কেউ দাঁড়িয়ে নেই। কেউ দাঁড়িয়ে থাকত না।

সেই যা হোক, হরিচরণবাবুর সঙ্গে এক কারখানায় আমার আর বেশিদিন কাজ করা হল না। শ্রমিকদের দাবিদাওয়া বাড়তে থাকল, অথচ প্রোডাকশন বাড়ল না—বেশি প্রোডাকশনের দাবিতে চুক্তি হয় ; পরের বছর চুক্তি ফেল করে। ওভারটাইম নেবে, অথচ কাজের সময় কাজ করবে না। হরিচরণবাবু বলতেন, এও এক রকমের ভূত স্যার। মাথায় ভূত না চাপলে, কাজ করব না, পয়সা নেব ঠিক কখনো হয়! সবই হলোগে সেই ভূত রহস্য। হরিচরণবাবু সবটাতেই অদৃশ্য এক ভূতের হাত দেখতে পেতেন! আমার হাসি পেত। একদিন নাছোড়বান্দা হয়ে আমাকে তাঁর বাড়ি নিয়ে গেলেন। পৈতৃক সম্পত্তির একখানা ঘর ভাগে জুটেছে। শোভাবাজারের এক এঁদো গলির মধ্যে দোতলা বাড়ি। বাড়ির শেষ কোণের ঘরটায় তিনি থাকেন। কাকা জ্যাঠাদের সঙ্গে খুব ভালো একটা সম্পর্ক আছে মনে হয় না। আলো না জ্বাললে ঘরের কিছু দেখা যায় না। একটা ঘুলঘুলি দিয়ে সামান্য আলো আসে। প্রায় পা টিপে টিপে তাঁর ঘরের দিকে এগোলাম। দিনের বেলাতেও কেমন গা ছমছম করে। বাড়ির লোকজন এদিকটায় বড়ো একটা আসেন না, এটাও টের পেলাম। ঘরের দেয়ালে সেই পিসির গ্রুপ ছবি। তাতে সিঁদুর দেওয়া নীচে তক্তপোশ, মাদুর, ময়লা তোষক বালিশ। একটা হরিণের ছাল। এটাতে বসেই হরিচরণবাবুর ঠাকুমা

তাঁর দাদুর সঙ্গে কথা বলতেন। তক্তপোশের নীচে অজস্র শিশি বোতল, পেতলের বাটি, আলতার শিশি।

আলতার শিশি দেখে বলেছিলাম, ও দিয়ে কী হয়! হরিচরণবাবু কেমন কিছুটা ধরা পড়ে গেছেন, ভেবে বলেছিলেন, আমার ঠাকুমা বিধবা হলেও সধবার বেশে থাকতেন। মাছমাংস খেতেন, সিঁদুর পরতেন, আলতা পায়ে দিতেন। আমার দাদুই নাকি বলেছেন, আমি তো আছি। থান পরা দেখলে কষ্ট হয়—তুমি ওভাবে থাকবে না। হরিচরণবাবু আরও বলেছিলেন, শুধু এই আসনটার জন্য তিনি পৈতৃক সম্পত্তির সব ছেড়ে দিতে রাজি ছিলেন —কিছু নেনওনি। তবু তাঁর ছোটোকাকা বাড়ির ছেলে ফুটপাথে গিয়ে উঠবে ভেবে শেষের দিকের একতলায় এই পরিত্যক্ত ঘরটা ছেড়ে দিয়েছিলেন।

আমি কিন্তু আলতার শিশিটাই দেখছিলাম।

হরিচরণবাবু কী ভাবলেন, কে জানে। বললেন, আমি আসনটায় বসলে অনেক কিছু টের পাই। বিশ্বাস করুন, আমাদের ছাদের কার্নিশে শকুন উড়ে এসে বসবে আগেই টের পেয়েছিলাম। গেরস্তের বাড়িতে শকুন বসা খুব অশুভ ব্যাপার। সকালের দিকেই সেদিন ছাদে উঠে গেছিলাম, ঠিক দেখছি উড়ে আসছে। ভাইপো-ভাইঝিদের নিয়ে সারাদিন ছাদে শকুন দুটোকে তাড়া করলাম। ওরা বসবেই—যেন এক খণ্ডযুদ্ধ বেধে গিয়েছিল আর কী !

বললাম, বসলে কী হত!

কারও অপমৃত্যু হত!

সেটা কে!

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলেছিলেন, সম্ভবত আমি নিজেই। কথাটাতে কেমন গা শিরশির করে উঠেছিল।

হরিচরণবাবু বলেই চলেছেন, ঘোর অমাবস্যায় আসনটায় বসলে, ঠাকুমা ঠাকুরদা, যে-কোনো আত্মার সঙ্গে আমি কথা বলতে পারি। আপনি বিশ্বাস করবেন না, এক একজন এক এক ধাপে থাকে। অনেকের নামতে কষ্ট হয়। ঠাকুমাই দেখছি কেবল রাগ করেন না। আপনি বসবেন একদিন! নিয়মকানুন আছে, লাল পাড় গরদের শাড়ি পরতে হবে। পায়ে আলতা, কপালে সিঁদুরের টিপ—একেবারে একজন নারীর বেশে বসতে হবে। না হলে হবে না।

আলতা-রহস্য টের পেয়ে মুচকি হাসলে তিনি খুব গম্ভীর হয়ে গেছিলেন। বলেছিলেন, এদের নিয়ে তামাশা ঠিক নয় স্যার।

এমন একজন এ-বাড়িতে থাকে, ভাইপো-ভাইঝিরা পর্যন্ত কাছে আসে না, উন্মাদ নয় তো! কী জানি, এতটা বিশেষণের আমার কোনো প্রয়োজন ছিল না। পৃথিবীতে কত বিচিত্র লোক আছে—যে যার বিশ্বাস নিয়ে বড়ো হয়, বাঁচে, তারপর একদিন মরেও যায়। হরিচরণবাবুর বিশ্বাসে আঘাত দিতে আমার ইচ্ছে হয়নি।

বছর দশেক হল ওঁর সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে আমার। কারখানা সত্যি উঠে গেল। তিনি বেকার হলেন। আমিও। তবে সঙ্গে সঙ্গে একটা কাগজে চাকরি পেয়ে আমি থিতু হয়ে বসতে পেরেছিলাম। আমার বাড়িঘরও হয়েছে। দোতলা বাড়ি। কেষ্টপুর খালের ধারে আমার বাড়িটা। সকালে লিখতে বসেছি, দেখি হরিচরণবাবু হাজির। কেমন সামান্য কৃশকায়—লম্বা ছ-ফুট মানুষটা যেন কিছুটা অস্বস্তির মধ্যে পড়ে গেছেন। এসেই বললেন, স্যার এলাম। আপনার ছোটো ছেলে এবার ডাক্তারিতে ভরতি হয়েছে। ও একটা কঙ্কাল এনেছে। ওটা আমার দেখার শখ হয়েছে, তাই চলে এলাম, কিছু মনে করবেন না।

হরিচরণবাবুর এসব কথা জানবার নয়। বছর চারেক ধরে তাঁর সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই। তবু এতটা খবর রাখায় আমি ভারি অবাক হয়ে গেছিলাম। হয়তো কৃতজ্ঞতাবশে তিনি আমার সব খবরই রাখতেন। আমি তাঁর কোনো খবর রাখার উৎসাহ বোধ করিনি।

নীচের ঘরে কথাবার্তা হচ্ছিল। জিজ্ঞেস করলাম—কী করছেন? কেমন আছেন? শরীরটা তো দেখছি বেশ ভেঙে গেছে। কতদিন পর দেখা!

বাড়ির কাজের মেয়েটি আমাদের জন্য চা রেখে গেল, কিছু খাবার।

হরিচরণবাবু বললেন, আমি এত সকালে কিছু খাই না। কঙ্কালটা দেখে চলে যাব। একটা বড়ো বেতের বাসকেটে কঙ্কালটা নিয়ে এসেছে।

তিনি এত খবর পান কী করে?

হরিচরণবাবু বললেন, দোতলার ঘরে ছেলের খাটের নীচে আছে।

হরিচরণবাবুর অদ্ভুত চরিত্র আমার জানা। অন্য যে-কারও মুখে এমন কথা শুনলে চোখ কপালে উঠে যেত, কিন্তু হরিচরণবাবু বলেই চোখ কপালে উঠল না। আসনটায় বসলে তিনি তো সবই টের পান। পরলোক রহস্য আমরা আর কতটা জানি। টেবিল টার্নিং-এর কথা তাঁর কাছেই প্রথম জানতে পারি। ওপার থেকে যাঁরা মাঝে মাঝে পৃথিবীতে নেমে আসেন, যেমন দানিকেনের বইগুলি আমার পড়া আছে—বিশ্বাসও করতে পারি না, আবার অবিশ্বাসও করতে পারি না। বললাম, চলুন দেখবেন।

ছোটো ছেলে বাড়িতেই ছিল। তার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলাম। বললাম, উনি হরিচরণবাবু। তোমরা ওঁকে ছেলেবেলায় দেখেছ। আমার বাসায় মাঝে-মাঝে যেতেন। উনি

তোমার কঙ্কালটা দেখতে চান।

ছেলে দেখাবে কী, তিনি নিজেই বাসকেটটা টেনে বের করলেন। হাড়গোড় সব মাটিতে ফেলে সাজাতে বসে গেলেন। আমার ছেলে হরিচরণবাবুর আচরণে কেমন ঘাবড়ে গেছে। সে তাঁকে শুধু দেখছিল।

করোটিটা হাতে নিয়ে দেখতে থাকলেন।

তারপর মেরুদণ্ডের আলগা হাড়গুলি—বুকের পাঁজরের হাড়। আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, আপনার কখনো মনে হয় ঠিক এরকম একটা কুৎসিত কঙ্কাল আপনি বয়ে বেড়াচ্ছেন! আপনার ভেতরেই আছেন তিনি।

আমার কেমন জ্বর আসছে। মুখ মাথা গরম হয়ে গেল। সত্যি তো এটা আছে, অথচ বিশ্বাস করতে পারি না ছালচামড়া তুলে নিলে আমিও এই। খুবই নিষ্ঠুর সত্য।

হরিচরণবাবু অনেকক্ষণ ধরে অপলক দেখলেন কঙ্কালটা। তারপর বললেন, করোটির একটা হাড় কম।

ছেলেও দেখছি সায় দিল। বলল, হ্যাঁ। অকসিপিটালের পাশের দুটো হাড়ের একটা নেই. প্যারাইট্যাল একটা।

হরিচরণবাবু ছেলেকে বললেন, ওটা খুঁজে আনবে। যার কাছ থেকে এনেছ, তার বাড়িতেই এটা পড়ে আছে। খুঁজলেই পাবে! খুঁত রাখবে কেন! এই বলে তিনি নেমে গেলেন। নামার সময় বলে গেলেন, দেখে গেলাম স্বচক্ষে।

তিনি চলে গেলে আমি কিছুক্ষণ কেমন বিমূঢ়ের মতো বসেছিলাম। মানুষটা সত্যি যোগসিদ্ধ এমন মনে হল আমার। এর কী ব্যাখ্যা আছে জানি না।

আর তার ক-দিন পর সহসা স্ত্রীর চিৎকারে ওপরে উঠে গেলাম। স্ত্রী বললেন, দেখগে ছাদের কার্নিশে, সব শকুন বসে আছে। আমি কেমন অশুভ সংকেতে ঘাবড়ে গেলাম। হরিচরণবাবুর আসা, কঙ্কাল দেখা, শকুন উড়ে আসার মধ্যে সারা বাড়িটা এক ভৌতিক ষড়যন্ত্রের মধ্যে বুঝি পড়ে গেছে। যেন হরিচরণবাবু শিক্ষা দিতে চান, কেমন বিদেহী আত্মায় বিশ্বাস নেই, দেখুন এবারে মজা!

সকালেই ভাবলাম, না, ক্ষমা চেয়ে নিতে হবে। বলতে হবে, তেনারা আছেন। আপনি আসনে বসে জেনে নিন, আমার বাড়িটি অশুভ প্রভাবের হাত থেকে কী ভাবে রক্ষা পেতে পারে। সকালেই সামান্য চা খেয়ে বের হয়ে পড়লাম। ওঁর বাড়ি যেতে সময় লাগে না। কিন্তু আজ কেন জানি মনে হল অনেক দূরে হরিচরণবাবু থাকেন।

বাড়িতে কড়া নাড়তেই, এক ভদ্রমহিলা দরজা খুলে দিলেন। বললাম, হরিচরণবাবু আছেন?

ভদ্রমহিলা বললেন, আপনি কোত্থেকে আসছেন?

সব বললে, তিনি জানালেন, সে কী তিনি তো আজ চার বছর হল নিখোঁজ। তিনি আপনার বাড়ি গেলেন, অথচ নিজের বাড়ি ঘুরে গেলেন না! তাজ্জব!

এক লণ্ঠনওয়ালার গল্প

সেদিন আমার সহকর্মী এসেই বললেন, কী, আপনার সেই পাখিরা কোথায়?

আমার বাড়িতে তার পাখি দেখতেই আসা। কারণ সহকর্মী এবং বন্ধু মানুষটি প্রায়ই আক্ষেপ করতেন, বোঝালেন, ছেলেবেলায় কত রকমের পাখি দেখেছি। আজকাল আর বুঝি তারা নেই। বসন্ত বউড়ি পাখি দেখেছেন? আমাদের বাগানে তারা উড়ে বেড়াত।

পাখি নিয়ে যখন তাঁর সঙ্গে আমার কথাবার্তা হয়, তখন আমি সবে এ অঞ্চলে বাড়ি করছি। ফাঁকা জায়গা। গাছপালা বা জঙ্গল সবই আছে। ফাঁকা মাঠ আছে। পুকুর বাগান সব। বাড়ি করার সময় যেসব পাখি ছিল, ক-বছর পরে তাদের আর দেখা গেল না। তবু পাশের জঙ্গলে একজোড়া ডাহুক পাখি থাকত বলে, রাতে তাদের কলরব শুনতে পেতাম। ক-দিন থেকে তাদেরও আর সাড়া পাওয়া যায় না।

বন্ধুটি এলেন ঠিক, তবে তখন পাখিরা আর নেই, বনজঙ্গল নেই, মাঠ নেই, গাছপালা নেই—কেবল ইটের জঙ্গল বাদে এখন আর কিছু চোখে পড়ে না।

পাখি নিয়ে অফিসে কথা উঠলেই, সহকর্মীটির এককথা, ঠিক চলে যাব একদিন। একরাত থাকব আপনার বাড়িতে।

কথাবার্তা শুনলে মনে হবে—আমি যেন কোনো সুদূর রেল স্টেশন পার হয়ে এক নির্জন জায়গার বাসিন্দা। আমার বাড়ি তাঁর বাড়ি থেকে বাসে ঘন্টাখানেক লাগে না। কলকাতা শহর বাড়ছে। আগে দক্ষিণে বাড়ত, এখন সল্টলেক ধরে উত্তরের দিকটাতে বাড়ছে। দশ-বারো বছরের মধ্যে ফাঁকা ধানের মাঠ সব ঘরবাড়িতে ভরে গেছে। আসব আসব করে তাঁর এতদিন আসা হয়নি। কবি মানুষ হলে যা হয়। শেষে যখন হাজির তখন তাঁকে আমার আর কাক-শালিক বাদে কোনো পাখি দেখাবার উপায় নেই। তাঁকে বললাম, ওরা সব চলে গেছে।

কবিবন্ধুটির প্রশ্ন, কোথায় যায় বলেন তো!

আমরা দোতলার ব্যালকনিতে বসেছিলাম। বললাম, কোথায় যায় বলতে পারব না, নিশ্চয়ই যেখানে বনজঙ্গল আছে তারা সেখানেই যায়।

কবিবন্ধুটির আবার প্রশ্ন, বনজঙ্গল কি আর থাকবে। যেভাবে মানুষ বাড়ছে! এভাবেই বন্ধুটির কথা বলার অভ্যাস। একটু ফাঁকা জায়গা বনজঙ্গল পাখি প্রজাপতি দেখলে তাঁর আনন্দ হবারই কথা। শোভাবাজারের দিকে অত্যন্ত এক সরু গলির অন্ধকারের একতলা বাসা থেকে বের হলেই তাঁর বোধহয় পাখি প্রজাপতি দেখার শখ হয়। অবশেষে সেই দেখতেই আসা। আমরা মুখোমুখি বসে। বললাম, এই যে পাশের ডোবাটা দেখছেন, এখানে এই ক-দিন আগেও একজোড়া ডাহুক পাকি দেখেছি। আপনি আগে এলে দেখতে পেতেন। ক-দিন থেকে দেখছি তারাও নেই।

বন্ধুটি বললেন, যখন দেখা হল না, তখন পাখি নিয়েই গল্প হোক। আপনি কী কী পাখি দেখেছেন?

বুঝতে পারছি আমরা আজ বেশ মুডে আছি। ছুটির দিন। রাতে থাকবেন বন্ধুটি। খাবেন। সারা বিকেল, সন্ধে এমনকী গভীর রাত পর্যন্ত চুটিয়ে আড্ডা মারা যাবে। সংসারী মানুষের পক্ষে এগুলো খুব দরকার। হাঁপিয়ে উঠতে হয় না বুঝি। সময় করে তাই কবিবন্ধুটি আজ আমার এখানে চলে এসেছেন। একটাই শর্ত, পাখি ছাড়া আমরা আর অন্য কোনো গল্প করব না।

বন্ধুটি বললেন, আমি লায়ার পাখির নাম শুনেছি। দেখিনি।

আমি একজন পাখি বিশেষজ্ঞ বলে তিনি মনে করেন। আমার লেখাতে তিনি অনেক পাখির নাম জেনেছেন। বোধহয় লায়ার পাখিরও। এককালে জাহাজে কাজ করতাম বলে পৃথিবীটা ঘুরে দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল। বললাম, ও-পাখি অস্ট্রেলিয়ায় দেখা যায়। জিলঙে দেখেছি।

তাঁর স্বাভাবিক প্রশ্ন, জিলঙ কোথায়?

বললাম মেলবোর্ন থেকে শ-দুই মাইল পশ্চিমে। খুবই ছোটো বন্দর। ওখান থেকে গম রপ্তানি হয়। আমরা গম নিতেই গেছিলাম। লায়ার পাখি আকারে বেশ বড়ো। চওড়া পালক। পাখা মেলে দিলে লায়ারের মতো দেখতে লাগে।

—লায়ারটা কী?

—ওটা একটা বিলেতি বাদ্যযন্ত্রের নাম। গায়ের রং মেটে। গলার দিকটা লাল। লেজের দিকটা সাপের ফণার মতো। খুব লাজুক পাখি। দেখলে বড়ো মায়া হয়। ঘাসের জঙ্গলে লুকিয়ে থাকার স্বভাব।

এভাবে আরও অনেক পাখির কথা উঠল। সদা সোহাগি, শা’ বুলবুলি, নীল কটকটিয়া, ভীমরাজ, ওরিওল, রেন, বেনেবৌ, ভাট শালিক, গাং-শালিক, মুনিয়া, দোয়েল, বুলবুলি, ছাতার পাখি, টিয়া, হাড়িচাঁচা কত আর বলব।

স্ত্রী চা ডালমুট রেখে গেল। দুজন সোফায় গা এলিয়ে বসে। পাখির কথা উঠতেই আমরা দুজনেই আমাদের শৈশব কালে চলে গেলাম। দুজনেরই শৈশব ওপার বাংলায় কেটেছে। জন্মেছি, বড়ো হয়েছি, সেখানে। দেশভাগ না হলে আমাদের দুজনের দেখা হবারই কথা ছিল না। দেশের নস্টালজিয়ায় পেয়ে বসেছে দুজনকেই।

বন্ধুটির আপশোস, বললেন, ইস্টিকুটুম পাখি এখানে এসে দেখেছেন?

বললাম, বাড়িঘর করার সময় এ-অঞ্চলে অনেক পাখি ছিল। ইস্টিকুটুম আমার ছাদের কার্নিশেই একবার উড়ে এসে বসেছিল। ছেলেরা এসে বলল, বাবা দেখো এসে, দুটো সুন্দর পাখি আমাদের ছাদে এসে উড়ে বসেছে। উপরে উঠে দেখলাম। বললাম, এরা হল ইস্টিকুটুম। দেশের বাড়িতে এরা ডাকলেই মা জেঠিমারা বলতেন, কুটুম আসবে। বন্ধুটির দিকে তাকিয়ে বললাম, জানেন, সত্যি দু-একদিনের মধ্যে কুটুম চলে আসত বাড়িতে। একবার তিনুকাকা এলেন, ঠাকুমা বললেন, ইস্টিকুটুম ডেকে গেছে বাড়িতে, তুই আসবি জানতাম।

বন্ধুটির প্রশ্ন, পাখিদের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক কতটা?

আমি বললাম অনেক। ধরুন, আমার বাড়িটা যদি আরও বড়ো হত, গাছপালা লাগাতে পারতাম, তবে কিছু পাখি এসে থাকতে চাইত। আমার বাবা জানেন, দেশ থেকে এসে বিঘে পাঁচেকের মতো জমি কিনে কোনোরকমে থাকবার মতো টালির ঘর করলেন। ঠাকুরঘর বানালেন। রান্নাঘর। কাঠা চারেকের মধ্যে সব। বাকি জায়গাটায় কত রকমের যে ফলের গাছ লাগালেন! আবাদ করার জন্য কোনো জমি রাখলেন না। মা গজ গজ করত, গাছ তোমাকে খাওয়াবে।

বাবা হাসতেন।

মা আরও রেগে যেত। বলত, জমি চাষ-আবাদ করলে সংসারের অভাব মিটত।

বাবা হয়তো স্নান করে ফিরছেন কালীর পুকুর থেকে—দেখি বাবা আকাশের দিকে তাকিয়ে আছেন। একঝাঁক পাখি উড়ে আসছে। বাবা বলতেন, কেন আসছে জানো? ওরা বুঝেছে। এই গাছপালায় তাদের আমি বসার জায়গা করে দিয়েছি। বাসা বানাবার জায়গা করে দিয়েছি। ফল-পাকুড় হবে, তোমরা খাবে, ওরা খাবে না—সে হয়!

চায়ে চুমুক দিয়ে কেমন অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছি। বন্ধুটি বললেন, কী ভাবছেন?

ভাবছি গাছপালা, পাখপাখালি না থাকলে বাড়ির সৌন্দর্য বাড়ে না। কত রকমের পাখি এসে উড়ে বসত। বাবা বলতেন, চেনো!

আমরা জানি, বাবা পাখিদের নাম বলবেন। বাবাই আমাকে কোনটা কী পাখি, তার স্বভাব চরিত্র, কোথায় বাসা বানায়, ক-টা করে ডিম পাড়ে সব বলতেন। আমরা ভাইবোনেরা ভারি কৌতূহল নিয়ে শুনতাম। ফল-পাকুড়ের সময় পাখির উপদ্রব বেড়ে যেত। মা গজগজ করত। দ্যাখ গাছে টিয়ার ঝাঁক বসেছে। সব কামরাঙ্গা সাফ করে দিচ্ছে।

বাবা ইশারায় আমাদের বারণ করতেন। তখন মা নিজেই কোটা নিয়ে ছুটত। পাখিদের তাড়াত। বাবা হাসতেন।

মা রেগে গিয়ে বলত, হাসছ কেন?

হাসছি এমনি।

তুমি এমনি হাসার মানুষ! কেন হাসলে বল!

বাবা ঠাকুরঘরে হয়তো যাচ্ছেন। গৃহদেবতার পূজার সময় হয়ে গেছে। ঘরে ঢোকার আগে বলতেন, ওরা জানে বাড়ির মালিক তাদের পছন্দ করে। তুমি যখন দিবানিদ্রা যাবে ওরা তখন আসবে। আমি বলে দিয়েছি, সময় বুঝে আয়। যখন তখন এলে চলে! দেখছিস না বাড়ির মাঠান রাগ করে!

কবিবন্ধুটি বিস্ময়ে বললেন, ওরা আসত।

ঠিক আসত! মা দিবানিদ্রা গেলেই ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে আসত। বাবা বলতেন, পাখি প্রজাপতি, গোরুবাছুর অর্থাৎ তিনি প্রাণীকুলের কথাই বলতে চাইতেন—না থাকলে মানায় না। জানেন, যদি টাকা থাকত, আর দু-চার কাঠা জমি রাখতে পারতাম—বাবার মতো আমার বাড়িতেও গাছপালা লাগিয়ে দিতাম। গাছপালা লাগানোর মধ্যেও বড়ো একটা আনন্দ আছে। বাড়িতে গাছপালা না থাকলে, পাখি প্রজাপতি উড়ে না এলে বাড়ির জন্য মায়াও বাড়ে না।

বন্ধুটি কী ভেবে ডাকলেন, বউঠান আর এক রাউণ্ড চা। আমরা এখানে জমে গেছি। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন, তাহলে কি আমাদের দেশবাড়ির জন্য যে নস্টালজিয়া, তা এই গাছপালা, পাখি প্রজাপতির জন্য?

বললাম, তার বিস্ময় সে প্রকৃতির মধ্যে বড়ো হয়ে উঠেছে। এঁদো গলিতে যে জন্মায়, বড়ো হয়ে তার কিছু থাকে না। শহরের ঘরবাড়ির জন্য মানুষের এ-কারণে টান কম।

কবিবন্ধুটি বললেন, আমাদের কিন্তু আজ কথা ছিল পাখি ছাড়া অন্য কোনো কথা হবে না। পাখি দেখাবেন বলে এনেছেন। দেখছি জায়গাটা যা হয়ে গেছে, তাতে কাক-শকুনের উপদ্রব বাড়তে পারে। আসল পাখি সব উধাও।

স্ত্রী চা রেখে গেল। একটা সিগারেট ধরালাম। ছুটির দিন, প্রসন্ন মেজাজ। বন্ধুটির কথায় রাগ করা গেল না। আসলে সেই কবে বলেছিলাম, যখন সবে বাড়িঘর বানাতে শুরু করি তখন। বন্ধুটি প্রায়ই বলতেন, জায়গাটা কেমন? গাছপালা মাঠ আছে? বিশাল আকাশ দেখতে পান? নির্জন নিরিবিলি? পাখি প্রজাপতি আসে?

আমি বলেছিলাম, আসে।

তাহলে তো একদিন বেড়াতে যেতে হয়।

আসুন না।

বললাম, আসব আসব করে দশটা বছর পার করে দিলেন। কলকাতার আশেপাশে কোনো ফাঁকা জায়গা পড়ে থাকবে না। একটু ফাঁকা জায়গায় থাকব বলে, এখানে বাড়িটা করি। দেখছেন তো জায়গাটা কী হয়ে গেল! ওই যে সামনের ঘরবাড়ি দেখছেন, সেখানে সব ধানের জমি ছিল। ওই যে ও-পাশের রাস্তা দেখছেন, সেখানে গেলে এক বুড়ো লণ্ঠনওয়ালাকে দেখা যেত। সে দূর দূর গাঁয়ে যেত সকালে, ফিরত সন্ধ্যা হলে। লণ্ঠনবাতি নিজে বানাত। গাঁয়ে গাঁয়ে বিক্রি করত। আমার সঙ্গে লোকটির খুব বন্ধুত্ব হয়ে গেছিল। বলেছিল, হুজুর, আপনি এমন পাণ্ডববর্জিত এলাকায় বাড়ি করলেন।

ওকে বলেছিলাম, একদম হুজুর হুজুর নয়। তুমি আমার সঙ্গী। এ জায়গা ছেড়ে তোমার কোথাও যেতে ইচ্ছা হয়?

না মরে গেলেও যেতে পারব না।

কেন না!

সে বলতে পারব না। গাছপালা পাখি এই ফসলের মাঠ নিয়ে বেঁচে আছি বাবু। কোথাও ভালো লাগবে না। আমার সঙ্গে তার বিচিত্র সব গল্প হত। সে কোথায় লণ্ঠনবাতি বিক্রি করতে যায়, রাস্তায় যেতে যেতে কার দাওয়ায় বসে, কোথায় একটা ছোট্ট মশলাপাতির দোকান আছে, সেখানে বিড়ি পর্যন্ত পাওয়া যায়। এসব খবরই দিত। এই যে পাশের খাল দেখছেন, সারা বর্ষাকাল ধরে খড়ের নৌকা যেতে দেখেছি। এসব দেখাব বলেই আসতে বলেছিলাম।

বন্ধুটি বললেন, দুর্ভাগ্য। আপনার পাখি প্রজাপতি দেখা হল না। খড়ের নৌকাও দেখা গেল না। সেই লণ্ঠনওয়ালার কাছে চলুন না। সন্ধেটি বেশ কাটবে।

সে তো আর এখানে নেই। জমিটুকু বেচে দিয়ে আরও ভেতরে চলে গেছে। সে নাকি অনেক দূরে। ভালোই আছে সেখানে। বাসে যাওয়া যায়। বাস থেকে নেমে মাইলখানেক

হাঁটতে হয়। জমির খুব ভালো দাম পেয়ে গেল, আমায় এসে বলল, বুঝলেন, থাকা যাবে না। আপনি এসেই জায়গাটার বারোটা বাজালেন।

অবাক আমি! সে বলল, তাই। আপনার দেখাদেখি সব ভদ্দরলোকেরা আসতে শুরু করে দিলেন। জমির দর বেড়ে গেল। এত টাকা একসঙ্গে জীবনেও দেখিনি বাবু।

বন্ধুটি বললেন, আসলে আমরা তাকে উৎখাত করেছি।

তাই বলতে পারেন।

সে যাকগে।

আমি বললাম, না যাকগে নয়। শুধু তাকে উৎখাত করিনি, তার স্বপ্নের পৃথিবী থেকে বনবাসে পাঠিয়েছি।

বন্ধুটি হেসে বললেন, সে সেখানেও নিজের মতো স্বপ্নের পৃথিবী বানিয়ে নেবে। ও নিয়ে আপনাকে ভাবতে হবে না।

সে হয়? সে রোজ গাঁয়ে গাঁয়ে গেছে, সে সারাজীবন তার নিজের মানুষের সঙ্গে বড়ো হয়েছে, গাছপালা মাঠ সবই তার অস্তিত্ব, সে টাকার বিনিময়ে সব হারিয়ে চলে গেছে। একজন লণ্ঠনওয়ালা এখন হয়তো কোথাও একটা চা-বিড়ির দোকান করেছে। কিন্তু বাড়ির পাশ দিয়ে হেঁটে যাওয়া, গাঁয়ের কোনো সুন্দরী বউয়ের ডাক, এই লণ্ঠনওয়ালা তোমার কুপির দাম কত গো, একটা দিয়ে যাও না! বউটির সঙ্গে কুপির দর নিয়ে কষাকষি, একটু বসে জিরিয়ে নেওয়া, কিংবা সংসারের দুটো সুখ-দুঃখের কথা, এসব সে আর পাবে কোথায়? তার বাড়িতে ছিল দুটো নারকেলগাছ, একটা আমগাছ, লেবু করমচা, সবই সে লাগিয়েছিল। এরা তার জীবনের সঙ্গে সঙ্গে বেড়েছে। সে তাদের ভুলবে কী করে! টাকার লোভে একজন লণ্ঠনওয়ালা সব বেচে দিয়ে চলে গেল।

ঠিক এসময় বন্ধুটি স্মরণ করিয়ে দিলেন, আমাদের কিন্তু আজ শুধু পাখির গল্প। লণ্ঠনওয়ালার জন্য দুঃখ করলে পাখিরা সব উড়ে যাবে।

হামি হাসলাম।

আসলে বাড়িটা করার সময় এই নির্জন মাঠে এতসব বিচিত্র পাখি দেখেছি যে, অফিসে গিয়ে সবার কাছে গল্প না-করে পারিনি। কারণ গাঁয়ে জন্মালে মানুষের বোধহয় এই হয়। শহর মানুষের অনেক মমতা নষ্ট করে দেয়। প্রকৃতির উদার আকাশ, বিশাল ধানের মাঠ, দিগন্তে কোনো বড়ো লাইটপোস্টের ছবি এবং নীল সমুদ্রের মতো রাশি রাশি মেঘ যখন বাড়ির মাথার উপর দিয়ে ভেসে যেত তখন আমার শৈশব এসে জানালায় উঁকি মারত। আমি স্থির থাকতে পারতাম না। অফিসে জায়গাটা নিয়ে খুব গল্প করতাম।

বন্ধুটি বলল, কোনো কোনো জাতের পাখি খুব হিংস্র হয় শুনেছি। এদের জন্য তো মায়া হবার কথা না।

বললাম, হিংস্র বলছেন কেন! বাঁচার তাগিদে সব। তবে একটা পাখির গল্প বলি শুনুন। আজকালকার ছেলেমেয়েরা মাইলখানেক রাস্তা হাঁটতে হলেই গেল। বাস স্ট্রাইক হলে, মাথায় হাত। চার-পাঁচ মাইল হেঁটে গেলেই বাড়ি, অথচ মুখ দেখলে মনে হবে কত বড়ো সর্বনাস হয়ে গেছে। বাড়ি ফেরা বুঝি হবে না।

আর আমরা রোজ চার মাইল রাস্তা হেঁটে স্কুল করেছি। গাঁয়ের পনেরো-ষোলোজন ছাত্র একসঙ্গে বের হতাম। ফিরতাম একসঙ্গে। সারাটা রাস্তা আমাদের কাছে কতরকমের কৌতূহল নিয়ে জেগে থাকত। গ্রীষ্মের প্রখর রোদে হাঁটছি—পথে কারও আমবাগান, লিচুবাগান, পেয়ারার গাছ, কুলের গাছ, কোথায় কী গাছ সব আমাদের জানা, কোথায় কোন গাছে কখন কী ফল হবে সব জানা। কেউ-ফল, গোলাপজাম, ঢেউয়া কতরকমের গাছই ছিল আমাদের জীবনের সঙ্গী। চুরি করতাম, ছুটতাম, খেত থেকে ক্ষিরাই চুরি করে খেতাম। গ্রাম মাঠ বিল পার হয়ে এক আশ্চর্য তীর্থযাত্রা ছিল প্রতিদিন।

বন্ধুটি আজ যেন আমার নস্টালজিয়াকে আক্রমণ করতেই এসেছেন। তিনি বললেন, এতে পাখির গল্প কোথায়?

‘দাঁড়ান বলছি। বলে উঠে বাথরুমের দিকে গেলাম। আসলে সাঁজ লেগে আসছে। রাতে বন্ধুটি খাবে। ঘরে কী আছে না আছে খবর রাখি না। একবার অন্তত জানা দরকার, রাতে কী হচ্ছে। স্ত্রীকে নীচে সিঁড়ির মুখে পেয়ে গেলাম। বললাম, গৌরাঙ্গবাবু কিন্তু আজ রাতটা এখানে কাটাবেন। রাতে খাবেন।

স্ত্রীর এক কথা, তোমাকে ভাবতে হবে না।

বাড়িতে বাজার, কেনাকাটা স্ত্রীই করেন। এমনকী রান্নাবান্নাও করা হয়ে আছে বোধহয়। শুধু গ্যাস জ্বেলে গরম করে নেওয়া। কাজেই ফের উঠে এসে বললাম, জামাকাপড় ছাড়ুন। পাখির গল্পটা না হয় রাতে খেতে বসে শুনবেন।

বন্ধুটির এককথা, খাওয়ার সময় কোনো হিংস্র পাখির গল্প বললে, গল্পটা জমতে পারে, খাওয়াটা জমবে না।

আমি জানি, গৌরাঙ্গবাবু ভোজনরসিক। খেতে ভালোবাসেন। কোনো এক কবি সম্মেলনে গিয়ে তিনি কুড়িটা ডিমই খেয়েছিলেন, সেসব গল্প কানে এসেছে। এক ফাঁকে স্ত্রীকে বললাম, ইনিই সেই কুড়িটা ডিম।

ইনিই সেই কুড়িটা ডিম শুনে স্ত্রী কেমন সামান্য ঘাবড়ে গেল। তারপর কী ভাবল কে জানে, বলল, কুড়িটার জায়গায় ত্রিশটা—এর বেশি তো লাগবে না। আমি আনিয়ে রাখছি।

তুমি কী রাতে!

সব আছে। তোমার তো মনে থাকে না। সেদিন সকালে বললে না, রোববারে আমার এক সহকর্মী আসতে পারেন। থাকতে পারেন। খেতে পারেন। খেতে খুব ভালোবাসেন।

ভুলেই গেছি।

আমি উপরে উঠে এলাম। গৌরাঙ্গবাবু ব্যালকনিতে পায়চারি করছেন। আমাকে দেখেই বললেন চলুন ছাদে যাওয়া যাক। আমরা ছাদে কিছুক্ষণ পায়চারি করলাম। অনেক দূরের

ঘরবাড়ি চোখে পড়ছে। কিন্তু গাছপালা কম। বলতে গেলে সামনের দিকটায় একসময় বনভূমি ছিল। এখন আর তার চিহ্ন নেই। বাড়ির পেছনটায় কয়েকটা গাছ লাগিয়েছি। গাছগুলো বড়ো হচ্ছে। সবই ফুলের, শেফালি, কামিনী এবং স্থলপদ্মের গাছ।

গৌরাঙ্গবাবু ঝুঁকে দেখলেন। বললেন, এগুলি বুঝি আপনার সান্ত্বনা?

বললাম, বলতে পারেন।

গৌরাঙ্গবাবু বললেন, চলুন ওই গাছগুলোর নীচে গিয়ে বসি।

নীচে নেমে এলাম। বেশ ঘন অন্ধকার। বললাম, আলো জ্বেলে দি। ঘাসের উপর চেয়ার পেতে দিয়ে গেল কাজের লোকটা। প্রায় অন্ধকারে বসে গৌরাঙ্গবাবু বললেন, এখানে মনে হয় আপনার হিংস্র পাখির গল্পটা জমবে।

বললাম, দেখুন পাখিটা অতিকায়।

কী পাখি?

কী পাখি প্রশ্নের জবাব এড়িয়ে গেলাম। তারপর কী ভেবে যে বললাম, সাপটা আরও অতিকায়।

তার মানে। পাখি সাপ!

আসলে আমাদের সমাজজীবনে শুধু এই পাখি এবং সাপের খেলা চলছে।

বুঝলাম না।

আমি কাউকে দোষ দিই না। নিজেকে শুধরে নিলাম।

গৌরাঙ্গবাবু খুবই অধৈর্য হয়ে পড়ছেন—সোজাসুজি বলুন না।

তখন চৈত্র মাস। স্কুল থেকে ফিরছি। জমি উরাট। গ্রাম থেকে নামলেই ফসলের মাঠ, পরে গোপের বাগ বলে একটা গাঁ। গাঁ ছাড়ালেই বিশাল বিলের জায়গা। ওটা পার হয়ে গেলে খংশারদির পুল। পুল পার হয়ে গেলে পোদ্দারদের প্রাসাদের মতো বাড়ি, বাগান,

তারপর গঞ্জের মতো জায়গায় আমাদের স্কুল। এতটা রাস্তা আমাদের রোজ হাঁটতে হয়। যাবার পথে, ফেরার পথে কখনো মনে হয়নি স্কুলটা আমাদের খুব দূর।

গৌরাঙ্গবাবু বললেন, পাখি গেল কোথায়?

আসছে, এবারেই আসবে। বললাম না, চৈত্র মাস। সারা মাঠে চাষ-আবাদ নেই বললেই চলে।

নীচু জমিতে ক্ষিরাইর চাষ। ক্ষিরাই, বাঙ্গি, তরমুজ ফলে আছে। জানেন তো, বড়ো তরমুজের নীচে খড় দিতে হয়। উপরেও দিতে হয়। যাতে চোখ না লাগে সেজন্য খড় দিয়ে তরমুজ ঢেকেও রাখা হয়। কিন্তু আমাদের চোখকে ফাঁকি দেয় কে! একটা আস্ত বড়ো তরমুজ চুরি করে গাছতলায় বসে খেয়ে, তার ছালবাকল আবার সেখানেই রেখে আসার মধ্যে, আমাদের একটা মজা ছিল। মজা করতে গিয়েই তাড়াটা খেয়েছিলাম।

কে তাড়া করল? জমির মালিক?

ধুস! একটা শাদা খরিস।

খরিস!

সে না দেখলে তার বিশাল ফণা কত বড়ো হতে পারে বিশ্বাস করতে পারবেন না। হাত দুই দূরে ফণা তুলে আমার মুখের সামনে দুলছে। আমি চোখ খুলে আছি। সারা অঙ্গ অবশ। দূরে পালাচ্ছে সবাই। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। যেন বলছে, কি, আর চুরি করবে?

গৌরাঙ্গবাবু বললেন, যান মশাই, ও সময় এসব কথা মনে হয়! মস্তিষ্কের ঘিলু তো গলে যাবার কথা!

জানি না, এটাই আমার মনে হয়েছিল, বাস্তু সাপটাপ নাকি এমন করে! শুধু বিড় বিড় করে বলছি, দোহাই আস্তিক মুনি। জানি একটু নড়লেই আমার মাথায় ছোবল বসাবে। নড়ছি না আর তখনই কী না....

কী তখন?

দেখলাম কোত্থেকে একটা বিশাল পাখি উড়ে এল! একটা বাজপাখি। এসেই গলার কাছে সাপটে ধরতেই আমি ছুটে পালাব ভাবলাম। কিন্তু এ কি! সাপটা বিশাল লেজ দিয়ে পাখিটার পা পাখা সব জড়িয়ে ধরেছে। খণ্ডযুদ্ধ। আমার সব বন্ধুদের ডাকছি। দেখছি কেউ নেই। দূরে দাঁড়িয়ে দেখছি বাজপাখির হিংস্র চোখ জ্বলছে। সাপের হিংস্র চোখ জ্বলছে। পাখিটা কিছুতেই গলার কাছে লেজ আনতে দিচ্ছে না। গলা বাঁকিয়ে ফণায় মাথায় ঠুকরে সাপের মগজ থেকে ঘিলু তুলে নিতেই বিশাল সেই দানব এলিয়ে পড়ল। এবারে পাখিটার শরীর থেকে সব প্যাঁচ খুলে গেল। পাখিটা সাপটাকে নিয়ে অনায়াসে উড়ে যাচ্ছে। এমন

ভয়ংকর দৃশ্য আমি জীবনে দেখিনি। এমন ভয়ংকর সৌন্দর্য জীবনে অনুভব করিনি! বিশাল আকাশের নীচে অবলীলায় উড়ে যাচ্ছে।

গল্পটা শোনার পর গৌরাঙ্গবাবু বললেন, আদিমকাল থেকেই এটা চলছে। সবলেরা বেঁচে থাকে। দুর্বলেরা চলে যায়।

আমি শুধু বললাম, এজন্য লণ্ঠনওয়ালার খোঁজে আর আমি যাইনি। সে যখন বাড়ি জমি বিক্রি করে দেখা করতে এসেছিল, আমি তার সঙ্গে দেখাও করিনি। কারণ সব নষ্টের মূলে আমি। ওর উৎখাত হওয়ার মূলে আমি। আমার স্ত্রীকে বলে গেছিল একসঙ্গে এত টাকা নাকি সে জীবনেও দেখেনি।

গৌরাঙ্গবাবু বললেন, আপনি না এলেও তাকে উৎখাত হতে হত। পৃথিবীতে সবসময় একজন আর একজনকে তাড়া করছে।

ভাগু

চিরুনিটা আর খুঁজে পাওয়া গেল না।

মুখ ব্যাজার নীতির। মানস দোতলায় গুম মেরে বসে আছে। মাথা আর আঁচড়াবে না। রেগে গিয়ে বলেছে, মাথা ন্যাড়া করে ফেলব। জন্মে যেন আর চিরুনি কিনতে না হয়।

নীতি বলেছে, কোথাও আছে। খুঁজে দেখব। আমারটা নাও।

মানস বলেছে, তার মানে? কোথায় যায়? এই তো সকালে চুল আঁচড়ে গেলাম। আমার চিরুনি কে ধরে! এ কি রে বাবা, একটা জিনিস ঠিক জায়গায় থাকে না।

বাড়িতে তিনজন মানুষ, দুজন কাজের লোক। অফিস থেকে ফিরে হাত মুখ ধুয়ে মানস আয়নার সামনে চিরুনিটা খুঁজতে গিয়ে দেখছিল, নেই। নেই তো নেই। শুধু এই একবার না এই নিয়ে তিনবার এ-বাড়িতে চিরুনি উধাও হয়ে গেছে এক বছরের মধ্যে। নীতির কিছু ঠিক থাকে না। তারটা দু-বার গেছে। তৃতীয়বার তার চিরুনিতে হাত। কার কাজ, এটাও সে অনুমান করতে পারে। প্রথমেই সেই সন্দেহভাজন মেয়েটিকে ডেকে বলেছিল, তুই নিয়েছিস।

মেয়েটি মুখ নীচু করে দাঁড়িয়েছিল। রোগা। মাগুর মাছের মতো গায়ের রং। অন্ধকারে দাঁড়ালে একেবারে অদৃশ্য হয়ে যায়। চোখ দুটোই সার। ডাগর চোখ এবং নাক মুখ মিলে কি যেন একটা বুনো সৌন্দর্য মেয়েটার মধ্যে আছে. খুব চেঁচামেচির পর নিজেরই কেমন খারাপ লাগে। মানস বলেছিল, তোর কাজ তুই নিয়েছিস। তোর চিরুনি সেদিন কিনে দিলাম।

আমি নিইনি।

তুই নিসনি তো যাবে কোথায় চিরুনিটা। আমারটা আর কে ধরবে! তারপর মনে হয়েছিল মুম্বাই ধরতে পারে। কিন্তু সে তো আগে কলেজে বের হয়ে গেছে। এখনও ফেরেনি। তেমনি সামনে মাথা নীচু করে রেখেছে ভাগু। মাথা তুলে তার দিকে তাকাচ্ছে না। মাথার চুল পরিপাটি করে বাঁধা। খোঁপায় গোঁজা বড়ো জবাফুল।

মেয়েটার এক মাথা কোঁকড়ানো চুল। ঘন এবং গভীর। সচরাচর এত ঘন এবং গভীর চুল মেয়েদের মাথায় আজকাল দেখা যায় না। ভাগুর সঙ্গে চুলেরও কেমন একটা গভীর সম্পর্ক আছে। চুল কোঁকড়ানো বলে জট থাকে খুব। এজন্য তাকে বেশ শক্ত দেখে চিরুনি কিনে দিয়েছে নীতি। মাস তিনেকও হয়নি।

মেয়েটির কোনো কিছু চাইবার স্বভাব নেই। কোনো কাজে না করে না। সারাদিন ঘরবাড়ি পরিষ্কার রাখার জন্য উপর নীচ করে বেড়ায়। তার এই একটিই কাজ। বাড়িতে যে তার বাবার নামে মানস টাকা পাঠায়, তাও একবার জিজ্ঞেস করে জানতে চায় না— সত্যি পাঠিয়েছে কি না! কেউ তাকে চিঠি লেখে না। ভাগুর বাবা-মার সঙ্গেও মানসের পরিচয় নেই।

মানসকে তার এক মাসিমা দেশের বাড়ি থেকে ভাগুকে এনে দিয়েছিল। ছেঁড়া ফ্রক, এক মাথা উসকো-খুসকো চুল। কতকাল চিরুনি এবং তেল না পড়লে এমন অবস্থা হয় মানস সেটা বোঝে। বোঝে বলেই নীতিকে প্রথম দিন বলে দিয়েছিল, কী সুন্দর চুল দেখ। কী অবস্থা করে রেখেছে। একটা শক্ত দেখে চিরুনি কিনে দিও। যা চুল গোরুর খোঁটা পর্যন্ত ভেঙে যেতে পারে।

নীতি বলেছিল, ওর বয়সে আমারও কম ছিল না।

মানস দোতলায় ব্যালকনিতে গুম মেরে বসে আছে। বিকালের জলখাবারও খায়নি। তার মনে হয় নীতির জন্যই সংসারটা এত অগোছালো। জায়গারটা জায়গায় পাওয়া যায় না। স্কুলে কাজ করে বলে কি, সংসার ঠিক থাকবে না! আজকাল মধ্যবিত্ত পরিবারে দুজনে কাজ না করলে চলে!

নীতি পাশে দাঁড়িয়ে বলল, নাও না! বলছি তো এবার ঠিক চোখ রাখব।

দু-দুবার গেল, অথচ তুমি একবারও খুঁজে দেখলে না, কে নিয়েছে!

কে নেবে ভাগুরই কাজ।

সেবারে অবশ্য ভাগুর পক্ষ হয়ে মানস লড়ে গেছে। ভাগুর কখনো সাহস হবে তোমার চিরুনি ধরার। অযথা একটি নির্বিরোধ অসহায় মেয়েকে দায়ী করছ, কোথায় রেখেছ দ্যাখ। বরং মানসের রাগই হয়েছিল ভাগুর নামে অভিযোগ করায়।

ভাগুরই কাজ। কথাটা শুনেও কোনো জবাব সে দেয়নি। ভাগু সংসারে সব অপমান মাথা পেতে সহ্য করতে এসেছে, এমন মনে হয়েছিল তার। ওর বাবা-মার উপরে রাগ হয়েছিল। কী রে বাবা, খেতে দিতে পারবি না, জেনেও জন্ম দিয়ে বসে থাকলি! তারপরই মনে মনে হেসেছিল, সংসারে সবাই কি অঙ্ক কষে সব কিছু করে। সেও কি অঙ্ক কষে, এতটা এগিয়ে এসেছে।

তার মাথায়ও ঘন চুল। কোঁকড়ানো। খুব শক্ত হাড়ের চিরুনি না হলে তারও চলে না। সপ্তাহে একবার শ্যাম্পু না করলে জট বেঁধে যায়। চুলের প্রতি সেও এক সময় খুব যত্ন নিয়েছে। এখন আর তেমন ঘন নেই, পাতলা হয়ে আসছে মাথা। তবু মজবুত চিরুনি না হলে তার চলে না। বেশ দাম দিয়েই নীতি সবসময় তার চিরুনি কেনে। এ-ব্যাপারে তার পছন্দ-অপছন্দ নিয়ে নীতি সবসময় মাথা ঘামায়। সোনালি বর্ডার দেওয়া এবং বেশ উজ্জ্বল রঙের চিরুনিটা দেখে সে নীতিকে বলেছিল, বা বেশ তো দেখতে। কোথা থেকে কিনলে। নীতি বলেছিল, শ্যামবাজারের মোড় থেকে এটা কিনেছে। খুব বড়ো দোকান। কত ভ্যারাইটি। আট-দশ দিনও হয়নি। নতুন চিরুনিটা উধাও ।

মানস বলল, রাখ তোমার চিরুনি, আমারটা ঠিক খুঁজে বের করব। বলে সে উঠে গেল। নীচে সিঁড়ির ঘরে জল তোলার পাম্প যেখানটায়, সেখানটায় খুঁজল। সিঁড়ির ঘরে ভাগু আর বাসন্তীর বিছানা, ফ্রক-প্যান্ট থাকে। বাসন্তী রান্নাঘরে নীতির এটা ওটা এগিয়ে দেয়। নীতি স্কুলে চলে গেলে রান্নার বাকি কাজগুলো সেরে রাখে। ভাগু, বাসন্তী প্রায় সমবয়সি। বাসন্তী কিছু বোধহয় ছোটোই হবে। বছরখানেক হল এখানে এসে উঠেছে। একতলার একটা ঘরে একই বিছানায় শুত। পরে বাসন্তী একদিন বলেছিল, আমি আর শোব না ভাগুর সঙ্গে।

কেন কী হল!

ওর মাথার উকুন আমার মাথায় এসেছে।

বাসন্তীর পাতলা চুল। ঘাড় পর্যন্ত। সে মাথা চুলকে বলেছিল, ইস ঘা হয়ে না যায়! কী চুলকায়।

উকুনের ব্যাপারে নীতির ভারি এলার্জি। বলিস কী! সঙ্গে সঙ্গে মাথা চুলকে বলেছিল, তাই আমার মাথা এমন করছে। এমনটা কী বুঝতে কষ্ট হয়নি মানসের। নীতি সঙ্গে সঙ্গে সরু চিরুনি নিয়ে বসেছিল—এবং দুটো বেশ বড়ো উকুন পেয়েও গেল। —অ মা কি হবে বলে সেদিন তার কী চিৎকার! এবং সঙ্গে সঙ্গে চেঁচামেচি—তাই বলি, হঠাৎ হঠাৎ চিরুনিটা হাওয়া হয়ে যায় কেন। ঠিক ভাগুর কাজ। ওই সরায়।

মানস জানে, সে যতটা ভাগুকে নিরীহ ভাবে, ভাগু বোধহয় সত্যি ততটা নিরীহ নয়। কারণ ভাগু সবসময় আড়ালে-আবডালে থাকতে ভালোবাসে। এমনকী রাতে ভাগুকে ডাকাডাকি না করলে খুঁজে পাওয়া যায় না। কেন এই আড়াল-আবডাল সেদিন মানস এবং নীতির কাছে পরিষ্কার হয়ে গেছিল। আসলে, সবার সামনে সে মাথা চুলকায় না। মনেই হবে না ভাগুর মাথায় উকুন আছে। মেয়েদের মাথায় উকুন থাকলে মানস ভিড়ের বাসেও টের পায়। আলতো করে চুলের মধ্যে আঙুল চালালে, যত সুন্দরী নারীই হোক না সে

বোঝে সুন্দরীর মাথায় উকুন বাসা বেঁধেছে। কী আশ্চর্য ভাগুও এ-বাড়িতে এসে টের পেয়েছে। না আগেই, কে জানে।

উকুন আবিষ্কারের পর নীতি তার চিরুনি লুকিয়ে রাখত। কিন্তু সবসময় তো আর পারা যায় না।

মানস বলেছিল, অত সাহস হবে না।

সাহস হবে না মানে? আমার মাথায় তবে উকুন আসে কী করে! এবং সঙ্গে সঙ্গে ভাগুর তলব। এই দেখি মাথা।

ভাগু তার মাথা দেখাল।

সত্যি উকুনের বাসা যাকে বলে। প্রতিটি চুলের গোড়ায় মরা উকুনের বাচ্চা। হঠাৎ ওক উঠে এসেছিল নীতির। মানসকে বলেছিল, কালই উপেনকে ডেকে দুটোরই মাথা ন্যাড়া করে দেবে।

বিষয়টা যে সত্যি এত গুরুত্ব পেয়েছে নীতির কাছে মানস টের পায়নি। পরদিনই নীতি বলেছিল—কি বলেছিলে!

কি বলব!

নাপিতকে আসতে বলবে।

মানস রেগে গিয়ে বলেছিল, আমি পারব না। উকুন মারার ওষুধ এনে দেব, তাই দিয়ে দিও। তুমি মাথা ন্যাড়া করে দিতে চাইলেই ওরা রাজি হবে কেন!

বাসন্তী বলেছে, মাথা ন্যাড়া করবে।

ভাগু?

ওকি কোনো কথার জবাব দেয়! একটাই তো কথা জানে। কিছু বললেই 'বেশ'। 'বেশ' ছাড়া আর কোন কথা জানে!

এও ঠিক, ভাগু জবাবে একটা কথাই বলে।

এই ভাগু, সিঁড়িতে জল পড়ে আছে। মুছে দিয়ে আয়।

ভাগুর উত্তর, বেশ।

এই ভাগু, ধনেটা বেটে দে আগে।

বেশ।

এই ভাগু, ছাদ থেকে জামাকাপড় নিয়ে আয়।

বেশ। বলেই সিঁড়ি ধরে উপরে উঠে যাওয়ার শব্দ।

মানস তন্ন তন্ন করে খুঁজছে তখনো। ভাগু ঠিক পালিয়ে রেখেছে চিরুনিটা। চিরুনির উপর বোধহয় জন্মগত লোভ আছে ভাগুর। যেদিন এ-বাড়িতে ভাগু আসে, চুল একেবারে তার যেন বাবুইর বাসা। কতকাল চুলে তেল না দিলে মাথা না আঁচড়ালে এমন হয় সে জানে না। মাথার চেয়ে খোঁপা বড়ো। নীতি ওর একটা পুরোনো চিরুনি দিয়েছিল, সাবান সোডা দিয়েছিল এবং নারকেল তেল দিলে আশ্চর্য হাসি ফুটে উঠেছিল মুখে। ভাগু নারকেল তেল নিয়ে ছাদে উঠে গেছিল। সারা বিকেল ওকে আর নীচে দেখা যায়নি। চুল পরিপাটি করে নেমে আসার পর মনে হয়েছিল, জীবনে তার আর কোনো দুঃখ নেই। তাকে সারাদিন খাটালেও সে আর ব্যাজার হবে না। একসঙ্গে এত জীবনে সে কোনোদিন বুঝি পায়নি।

মানস ফের ভাগুকে ডেকে বলল, কে নেবে! তুই না নিলে কে নেবে! কে ধরবে। তবু একবার বাসন্তীকে ডেকে বলল, তুই নিয়েছিস?

বাসন্তী অবাক হয়ে বলল।—আমি আপনার চিরুনি দিয়ে কী করব!

সত্যি তো—বাসন্তীর চিরুনির দরকার নেই। মাস দু-এক আগে মাথা ন্যাড়া করায় চুল খুবই ছোটো। সজারুর কাঁটার মতো চুল তার দাঁড়িয়ে থাকে। ছোটো হাত-চিরুনিই ওর যথেষ্ট। সে এত বড়ো চিরুনি দিয়ে কী করবে।

সহসা মনে হল, ভাগু সব পারে। যতই মেনি বিড়ালের মতো থাকুক, ভেতরে কূট বুদ্ধি খুব। নইলে মাথা ন্যাড়া করার দিন ভাগু মাথা ব্যথায় চিৎকার করবে কেন। কিছুতেই কলপাড়ে নিয়ে যেতে পারেনি নীতি। কত বুঝিয়েছে, তোর এমন সুন্দর চুল দেখবি ন্যাড়া করে দিলে আরও কত সুন্দর হবে। কতভাবে বুঝিয়েছে তারপর রেগে গিয়ে বলেছে, তোর হাতে আমার খেতে পর্যন্ত ঘেন্না করে। তুই তবু ফেলবি না।

ভাগুর মুখ দিয়ে সেদিন 'বেশ' কথাটি কিছুতেই বের করা যায়নি।

নীতি বলল, তুমি কি ক্ষেপে গেলে নাকি! সব ছুঁড়ে-ফুঁড়ে ফেলছ।

হ্যাঁ ক্ষেপেছি। একশোবার ক্ষেপব। কোথায় যায় চিরুনি আজ দেখব।

সব ঘরে আলো জ্বেলে দেওয়া হয়েছে। ভাগুর পাত্তা নেই। ঠিক ছাদে গিয়ে বসে আছে। ভাগুর সঙ্গে বাড়ির যে ঘরগুলির বেশি সম্পর্ক সেখানে খোঁজা হল। পাওয়া গেল না।

একটা চিরুনি নিয়ে মানুষটা এমন ক্ষেপে যেতে পারে নীতি ভাবতেই পারেনি। সে সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠে দেখল, অন্ধকারে একা দাঁড়িয়ে আছে ভাগু। আকাশ দেখছে মনে হয়। বকলেও ভাগুর মুখের রেখা পালটায় না। যেন এটা এমন কিছুই নয়। জন্মাবার

পরেই জেনেছে বুঝি সংসারে সে বাড়তি মানুষ। নীতি কাছে গিয়ে বলল, এই তুই যদি নিয়ে থাকিস বল। পছন্দের চিরুনি কিনে দেব। বের করে দে। দেখছিস না কী করছে!

ভাগু কিছু বলল না। জ্যোৎস্না উঠেছে। ভাগুকে বিচলিত দেখাচ্ছে না। এটা সত্যি বাড়াবাড়ি মানুষটার। ভাগু নাও নিতে পারে। তবু এক বছরের মধ্যে তিনটে চিরুনি হাওয়া হয়ে গেল ভাবতে অবাক লাগে। মুম্বাই তো চিরুনি কখনো ঠিক জায়গায় রাখে না।

হঠাৎ নীচ থেকে মানস চিৎকার করে ডাকল, এই ভাগু, ভাগু।

নীতি বলল, শীগগির নীচে চল।

ভাগু নীচে নেমে সিঁড়ির অন্ধকারে গিয়ে দাঁড়াল—তোর চিরুনি কোথায়! তোরটা আগে বের করে দেখা।

ভাগু সিঁড়ির চাতালের দিকে উঠে যেতে থাকল ফের। পেছনে বাসন্তী, নীতি, মানস। ভাগু একটা পুরোনো মিট-সেফ খুলল। বাতিল মিট-সেফ। বাতিল টিন, ভাঙা বোয়েম এবং ফ্লাস্ক এসবে ভরতি। সে নীচ থেকে টেনে কী বের করল একটা। মানস দেখল, ছোট্ট একটা আয়নার ভাঙা টুকরো। চিরুনি বের করে দেখাল।

নীতি সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করে উঠল, ও মা! এটা তো আমার সেই চিরুনিটা।

বাসন্তী ভাগুর দোষ ধরতে পারলে খুব খুশি। বাসন্তী বলল, আমি বলেছি না মাসিমা, ভাগুরই কাজ।

নীতি বলল, আসলটা বের কর। আজ যেটা নিয়েছিস।

ভাগু আবার কেমন হয়ে গেল। কথা নেই।

তোর এত সাহস ভাগু! নীতি সমানে বকে যাচ্ছে।

মানস দেখছিল, দ্বিতীয়বারের চুরি যাওয়া চিরুনিটাতে একটা দুটো কাঠি লেগে আছে। গোরুর খোঁটার মতো শক্ত চিরুনি না হলে ভাগুর চুল সব হজম করে দেবে।

নীতি ফের বলল, সেদিন যে তোকে চিরুনিটা কিনে দিয়েছি, সেটা বের কর।

ভাগু ভিতর থেকে কী টেনে বের করতে গিয়ে একটা হরলিকসের খালি শিশি নীচে পড়ে গেল।

ভাঙলি তো।

ভাগু তখনও খুঁজছে।

মানস দেখছিল, ভাগুর খোঁপায় জবাফুল গোঁজা।

নীতি বলল, বের কর বলছি, তুই কি চিরুনি খাস! তুই কি রাক্ষস! বের কর!

এদিক ওদিক খুঁজে, ওটা বের করল। ডাড়ার একটা কাঠিও নেই।

নীতি এবার মানসের দিকে তাকাল।

মানস ধীরে ধীরে নীচে নেমে যাচ্ছে। একটা কথাও বলছে না।

নীতি চিৎকার করে বলল, কি, কিছু বলছ না যে। ওই নিয়েছে। বের কর বলছি। তুমি যাবে না। এত সাহস তোর মেসোমশাইর অমন সুন্দর চিরুনিটা লুকিয়ে ফেললি!

মানস বলল, সেই কখন থেকে কিচ্ছু খাইনি। এক কাপ চাও এ-বাড়িতে পাওয়া যায় না।

নীতি এবারে তরতর করে নেমে এল। কী ব্যাপার একটা কথা বললে না তুমি! তোমার জন্যই এরা আসকারা পায়। ভাগু ছাড়া কে নেবে!

মানস হেসে বলল, নিতে দাও। ও তো কিছু চাইতে শেখেনি। কাল আমার জন্য আর একটা না হয় কিনে এনো। তারপর ভাবল, ছাদে দাঁড়িয়ে ভাগু যখন চুল আঁচড়ায়, তখন কি সে মেঘবরণ রাজকন্যার কথা ভাবে!

শেকড়

সে আজকাল টের পায় সূর্য তার আকাশে আর মধ্যগগনে নেই—হেলে পড়েছে। এই বয়সে উপদ্রব কমবার কথা—কমছে না। বরং বাড়ছে। পোকামাকড়ের উৎপাতে সে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। জীবনে বোধহয় এমন সব উৎপাত সব মানুষকেই কামড়ায়। অহরহ সে জ্বলছে। কোনো উৎপাত থাকবে না জীবনে তাই বা হয় কী করে। তবু তার মনে হয় সবাই তাকে পেয়ে বসেছে। সংসারের সব দুর্ভোগের দায় তার। জায়া থেকে জননী সবারই অভিযোগ তার বিরুদ্ধে। সে কাউকে খুশি করতে পারেনি।

চিঠিটা পাবার পরই এমন সে ভাবছে।

অভিযোগ, তোমাকে আমি পেটে ধরিনি। সেই কবে পুজোর সময় বাড়ি ঘুরে গেলে, আর এ-মুখো হওনি। আমি বেঁচে আছি কি মরেছি তার খোঁজখবর পর্যন্ত নাও না। আমি মরে গেলে তোমরা রক্ষা পাও বুঝি। ভগবান কেন যে আমাকে নেয় না!

আসলে আট-দশ মাস হয়ে গেল, কিছুতেই বাড়ি ঘুরে আসার সময় পাচ্ছে না সে।

দু-পাঁচদিনের ছুটি নিয়ে বাড়ি ঘুরে এলে মা খুশি হবে সে জানে। বেশি তো দূর না। ট্রেনে পাঁচ ছ-ঘন্টাও লাগে না। বাড়ি যেতে পারছে না বলেই ক্ষোভ। শীতের সময় ভেবেছিল যাবে। কিন্তু যাওয়া হয়ে ওঠেনি। এত ঠাণ্ডায় কষ্ট পাবে বলেই ঝুনু রাজি হয়নি। তার ঠাণ্ডার ধাত আছে। অসুখবিসুখ বাধিয়ে ফিরলে কে দেখবে!

সংসারে সে টের পায়, সবার সব কিছু হতে পারে, কেবল তাকে নীরোগ থাকতে হবে। স্বাস্থ্য অবশ্য তার অটুট। গত বিশ-ত্রিশ বছরের মধ্যে সে কোনো অসুখে ভুগেছে মনে করতে পারে না। তার একটাই অসুখ—ভাইবোন স্ত্রী-পুত্র সবাই ভালো থাকুক। সবাই সুখে থাকুক। কেউ সুখে নেই চিঠি পেলে সে অস্থির হয়ে ওঠে। তার এই দুর্বলতা সবাই টের পেয়ে গেছে। বড়ো পুত্রটিকে নিয়ে পুজোর পর থেকে বড়ো রকমের ঝামেলায় পড়ে গেছিল। তার ছোটাছুটির শেষ ছিল না। কোথায় হায়দরাবাদ, সেখানে বদলি। বড়ো পুত্রটি আজ দু-তিন বছর ধরেই একটা না একটা ঝামেলা সৃষ্টি করে চলেছে। বোকারোতে পোস্টিং। জুনিয়ার একজিকিউটিভ ট্রেনিং। ট্রেনিং শেষ হতে না হতেই মারাত্মক জণ্ডিস। তাকে বাড়ি নিয়ে আসা, চিকিৎসা এবং আরোগ্য লাভের পর ডাক্তারের পরামর্শ মতো

বিয়ে। কোথায় থাকবে, কী খাবে, এই দুশ্চিন্তায় সে অস্থির ছিল। অনিয়ম অত্যাচার থেকে রিলাপস করলে ভোগান্তি। বিয়ে দিয়ে পাঠিয়ে দিন। পাঠিয়ে দিয়েছিল—দু-পাঁচ মাসও পার হয়নি, বৌমা অন্তঃসত্ত্বা। আর বাচ্চা হবার দু-তিন মাস বাদেই হায়দরাবাদে ছ-মাসের জন্য অস্থায়ী বদলি।

অস্থায়ী বদলির ক্ষেত্রে স্ত্রীকে নিয়ে যাওয়ার নিয়ম নেই। কিন্তু বড়ো পুত্র কেমন নিরুপায় তার। সে একা থাকতে ভয় পায়। অতিরিক্ত মাত্রায় ইনট্রোভার্ট। অপরিচিত জায়গায় সে নির্বান্ধব অবস্থায় থাকতে রাজি নয়, ফ্ল্যাট ভাড়া করে চিঠি, বউমাকে দিয়ে যাও। চিঠি পেয়ে মাথা গরম—বন্ধুবান্ধবরা ঠিকই বলেছে, এত অল্পবয়সে বিয়ে দেওয়া তোমার ঠিক হয়নি। ম্যাচিওরিটি গ্রো করেনি। তা তেইশ-চব্বিশ বছরে কে আজকাল আর ছেলের বিয়ে দেয়!

কিন্তু তার যে গলায় কাঁটা। এমন স্বভাব, পুত্রটি নিজে কিছু করে নিতে শেখেনি। ট্রেনিং পিরিয়ডে মেসে ছিল। তারপর বাসা নিয়েছে। কাজের লোক পাঠাও। কাজের লোক গেল। তারপর ব্যাধি। অন্তত তার পুত্রটির ভালোমন্দ দেখার কেউ থাকুক সে এটা চাইত। বিয়ে দিলে দুশ্চিন্তার হাত থেকে নিস্তার পাবে এটাও ছিল এক ধরনের স্বস্তি।

ছোটো। কী আর করা!

বউমা নাতি আর সে প্লেনে সোজা হায়দরাবাদ। ঘন্টা দুই লাগে ঠিক, তার আগে টিকিট কাটা থেকে, সংসার করতে অতি প্রয়োজনীয় টুকিটাকি জিনিস, তালিকা মিলিয়ে নেওয়া—কতটা নেওয়া যাবে, ওজনের প্রশ্ন আছে, নাতির কাঁথা বালিশ ফিডিং বোতল এবং ছোটো স্টোভ, এ-ধরনের কিছু জিনিসপত্র কেনাকাটা করে এয়ারপোর্ট থেকে ট্যাক্সিতে শ্রীনিবাসনগর কলোনিতে দোতলায় ফ্ল্যাটে উঠে অবাক। মাত্র একটা ক্যাম্প খাট আর ভি আই পি সুটকেস ছাড়া ঘরে কোনো আসবাব নেই। জল নেই। একদিন অন্তর জল, এমন বিপাকে মানুষকে পড়তে হয় সেই প্রথম টের পেল। পুত্রটির ধারণা, বাবা আছেন।

তক্তপোশ বিছানার দরকার—বাবা আছেন।

রান্না-বান্নার ইউটেনসিল—বাবা আছেন।

তার মাথা গরম হয়ে গেছিল। দু-তিন মাসের শিশুকে নিয়ে যে এভাবে থাকা যায় না, সে বোধটুকু পর্যন্ত পুত্রের নেই। ফ্ল্যাটে বেসিন, বাথরুম সব ঠিকঠাক। জল আসে না। জল আসে, ঝি আসে না—এটা যে দেখে নেওয়া দরকার অসংসারী পুত্রের মাথায় তাও কাজ করেনি। যেন বউমা গেলেই তার কল থেকে জল গড়গড় করে পড়বে—তার সকালের টিফিন ঠিকঠাক হয়ে যাবে, অফিসে লাঞ্চ, রাতে ফিরে দেখবে খাওয়ার টেবিলে সব ঠিকঠাক আছে। এগুলোর জন্য যে বন্দোবস্ত রাখতে হয়, সেটা বোধহয় পুত্রের

মাথাতেই ছিল না। তার ব্রহ্মতালু জ্বলে উঠেছিল, কিন্তু বউমা খারাপ ভাবে ভেবে পুত্রটি কত অবিবেচক তাও প্রকাশ করতে পারেনি। গ্যাস থেকে আরম্ভ করে সবকিছুর বন্দোবস্ত করে ফিরে আসতে তার প্রায় দু-হপ্তা লেগে গেছিল।

একবার শুধু বলেছিল, তুই কী রে! সামান্য বোধ-বুদ্ধিটুকুও নেই। কিছু ঠিকঠাক না করে হুট করে লিখে দিলি বউমাকে দিয়ে যাও।

তার জবাব শুনে সে থ।—আমি লিখলেই তুমি পাঠাবে কেন! অসুবিধা হবে যখন জানতে, নিয়ে এলে কেন। ও পারবে কেন? তোমারই উচিত ছিল না নিয়ে আসা। পুত্রটি যেন বুঝিয়ে দিতে চাইল কাণ্ডজ্ঞানের অভাব কার বোঝো!

এরপর আর কী কথা বলা যায় মাথায় আসেনি। সে কোনোরকমে প্রায় নরকবাসের মতো ক-টা দিন কাটিয়ে দিয়েছিল। নিজের উপর প্রতিশোধ নেবার জন্য ইস্টকোস্ট ট্রেনের দ্বিতীয় শ্রেণির কামরায় উঠে বসেছিল। নিজেকে নির্যাতন করার মধ্যেও কোনো ক্ষোভ লুকিয়ে থাকে, ফেরার সময় সেটা সে টের পেয়েছিল।

সে তার ক্ষোভ থেকেই সহসা কেন যে স্থির করে ফেলল, বাড়ি যাবেই। যত গরমই হোক, যত লু-এর হলকা চলুক সে যাবেই। বাড়ির নামে ঝুনু তটস্থ হয়ে থাকে।

পঁত্রিশ-ত্রিশ বছরে ঝুনু তার স্বভাব পালটে দিয়েছে। শহরবাসের ফল। নিজের বাড়িঘর, দোতলা বাড়িতে তিনটে প্রাণী—সে ঝুনু আর ছোট ছেলে। রান্নার লোক, ঠিকে ঝি উচ্চবিত্ত পরিবারে যা যা থাকবার সবই আছে তার। স্ত্রীর কলেজ, তার অফিস, ছোটো ছেলে সি-ই-এস-সি-র ম্যানজমেন্ট ট্রেনি, তবু ঝুনুর নাই-নাই বাতিক। সে বাড়ি যাবে বললেই ঝুনুর মুখ গোমড়া—ঠিক অসুখবিসুখ বাধিয়ে ফিরবে, এই ভয় নিরন্তর। গাঁয়ের বাড়িতে আলো পাখা নেই। বাথরুমের অবন্দোবস্ত, জানলা ছোটো, ঘরে হাওয়া ঢোকে না, মাটির ঘর, চারপাশে গাছপালা, ঝোপজঙ্গল, সাপের উৎপাত আছে, কিছু একটা হলে কে এসে পাশে দাঁড়াবে। বাড়ি যাব বললেই ঝুনুর তিক্ততা বেড়ে যায়।

এসব কারণে সে ইচ্ছে হলেই যেতে পারে না। গেলে আর ফিরে আসবে না এমনও আতঙ্ক থাকে ঝুনুর। সে কত বুঝিয়েছে, ওখানে আমি বড়ো হয়েছি, আমার অভ্যাস আছে, পাখা আলো না থাকলেও অসুবিধা হবে না। অবশ্য সে জানে অসুবিধা তার ঠিকই হয়। কিন্তু ভাইবোনদের মধ্যে কয়েকদিন কাটিয়ে আসতে পারলে আশ্চর্যরকমের মুক্তির স্বাদ পায়। তার যেন আয়ু বাড়ে। ঝুনু তার এই অমল আনন্দ থেকে যতদিন পারে বঞ্চিত রাখার চেষ্টা করে। শেষে সে মরিয়া হয়ে উঠলে, ঝুনুর সেই এক বস্তাপচা উপদেশ, জল ফুটিয়ে দিতে বলবে। বাসি খাবার খাবে না। রাতে টর্চ নিয়ে বের হবে—ইত্যাদি ইত্যাদি।

বয়স যত বাড়ছে, তত তার ক্ষোভ পাহাড় প্রমাণ হয়ে উঠছে। মনে হয় সবাই অবিবেচক। মণিটা এত অমানুষ, চিঠিতে ভয় দেখিয়েছে, যা অবস্থা তাতে তোমার ভাইকে জনমজুর খাটতে হতে পারে। আসলে মাসোহারা সে যা দেয় তাতে সংকুলান না হবারই কথা। মা-ও মাঝে মাঝে চিঠি দেবে, আর ক-টা টাকা বেশি দিস। বাজার দিনকে দিন গরম, এতে চলে কী করে! দারিদ্র্য কাকে বলে বাড়ি গেলে সে টের পায়। মা আলাদা। মণি আলাদা। বড়দা আলাদা। বড়দা রিটায়ার করে, পাশেই আলাদা বাড়ি করেছেন। রিটায়ার করার পর পেনশন, প্রভিডেন্ট ফাণ্ড মিলে যা সঞ্চয় অভাব থাকার কথা না। দাদা বউদি মেয়ে দুই ছেলে তার। তারও নাই নাই ভাব। পাছে মাকে উপুড় হস্ত করতে হয়, যতটা না অভাব তার চেয়ে বেশি ছদ্মবেশ। মাঝে মাঝে সে উত্তপ্ত হয়ে উঠলে না বলে পারে না, তুমি মাকে কিছু দিতে পার না! দিলে মা কত খুশি হয়!

কোত্থেকে দি অময়। আমার তো ঘাড়ের উপর শমন। নামাতে পারছি না, রাতে অনিদ্রায় ভুগি, বল কি করে দিই।

মণি, তুই বিয়ে করে বসে থাকলি! বউ ছেলেমেয়ে নিয়ে আমার ঘাড়ে চেপে বসলি। নিজে কিছু করার চেষ্টা কর। আমি আর কতদিন। কেবল মিলুর সচ্ছল সংসার। মিলুর ইস্কুলে চাকরি, তার বর সরকারি চাকুরে, এক ছেলে—বাড়িঘর নিজের। এরা তার এককালে কাছেপিঠে ছিল। এখন কেমন সবাই ভিন্ন গ্রহ তৈরি করে নিয়েছে। বাড়িতে গেলে এইসব পোকামাকড়ের উপদ্রবের মধ্যেও তার মনে হয় সে আবার তার কৈশোর যৌবনে ফিরে এসেছে।

মার খুব ইচ্ছে ছিল, বাড়িটা শহরে না করে দেশে করলে সবাই দেখত, কত লায়েক তার ছেলে—কিন্তু ঝুনুর এককথা, আমি এত টানতে পারব না। থাকব এখানে, আর বাড়ি করবে দেশে। ইচ্ছে হয় কর, কিছু বলব না। সেখানে তুমি ভাইবোনদের নিয়ে সুখে থাকো, আমার কপালে যা আছে হবে।

কলকাতায় যার বাড়ি, সংসারে যার চারজন প্রাণী এবং সবাই উপার্জনশীল, তার কাছে সবার প্রত্যাশা একটু বেশি পরিমাণে—অময় তা বোঝে। কিন্তু যে যার রোজগার মতো মর্যাদা বাড়িয়ে নেয়। ঝুনুকে বললে, এককথা, কি আছে, বাড়ি করেছ, গ্যারেজের কোনো ব্যবস্থা রাখোনি। তোমার ক্ষমতায় না কুলায়, ছেলেরা তো আছে। গ্যারেজ না থাকায় বাড়িটা কেমন দাম হারিয়ে ফেলছে দিনকে দিন। বাড়িতে গ্যারেজের ব্যবস্থা না থাকায় কখনো অশান্তি হয় সে আগে জানত না।

তার এই প্রাণপাতের মূল্য কেউ দেয় না। সে এত কষ্ট করে বাড়িটা করেছে, অথচ এখন দেখছে খুঁতের অন্ত নেই। ঝুনুকে সে কিছুতেই খুশি করতে পারে না, গ্যারেজের

বন্দোবস্ত নেই। বললে কথায় কথায় খোঁটা, যেমন মানুষ, তার তেমন বাড়ি। অথচ সস্তায় জমিটা পেয়ে যাবার পর অময় ভাবতেই পারেনি, কখনো-সেখানে তার বাড়ি উঠবে। মানুষের ঘরবাড়ি এক বয়সে যে জীবনের স্বপ্ন হয়ে দাঁড়ায় বাড়িটা করার সময় সে টের পেয়েছে।

অময় বলল, কালই বাড়ি যাচ্ছি। সে টাইম টেবিল দেখল। বারোটায় ট্রেন আছে একটা। নতুন চালু হয়েছে। সকাল সাড়ে আটটার ট্রেনে ভিড় হয়।

ঝুনু ও-ঘর থেকে বলল, তোমার কী মাথা খারাপ! এই গরমে কেউ বের হয়! এত দূরে কেউ যায়! এক ফোঁটা বৃষ্টি নেই, চারপাশে আগুন জ্বলছে, তিনি বাড়ি যাবেন।

আমার কিছু হবে না।

তোমার হবে না, আমাদের হবে।

ছোটো পুত্রটি বোঝে লেগে গেল দুজনে। সে বলল, ক-টা দিন পরে গেলে কি হয় বুঝি না!

ক-টা দিন পরে গেলে মানে, বৃষ্টি বাদলা হলে এত গরম থাকবে না। একটানা কতকাল থেকে যেন আকাশ দিনের বেলা আগুন হয়ে আছে। কালবৈশাখী পর্যন্ত টের পাওয়া গেল না। দুপুরে দরজা জানালা বন্ধ করে না দিলে গরমের হলকায় শরীর পুড়ে যায়। কেবল ঠাণ্ডা জল, তেষ্টা বাড়ে, দরদর করে ঘাম, লোডশেডিং হলে বাড়িতে প্রায় মড়াকান্না শুরু হয়—হেন ধুন্ধুমার যখন চলছে তিনি বাড়ি যাবেন!

অময় বলল, ওখানে কি মানুষজন থাকে না? ওখানে কি আমার মা বেঁচে নেই, ভাইবোনেরা বেঁচে নেই?

ঝুনু বলল, বেঁচে আছে। ওকে বেঁচে থাকা বলে না।

মাথায় দপ করে আগুনটা ছড়িয়ে পড়ে। আত্মপর মনে হয় ঝুনুকে। অময় আর ঝুনুকে কিছু না বলে অফিসে বের হয়ে গেল।

পরদিন সকাল সকাল উঠে পড়ল অময়। ফোনে কথা বলল, দু-একজনের সঙ্গে। এখন এসে লাভ হবে না এমন জানাল। সে বাড়ি থাকছে না। দেশে যাচ্ছে। রান্নার মেয়েটাকে বলল, এগারোটায় বের হবে।

ঝুনু সব শুনছে। কিছু বলছে না। দিন দিন কেমন জেদি একগুঁয়ে হয়ে উঠছে—এত জেদ ভালো না, ভালোর জন্যই বলছি, অভ্যাস নেই, গরমে কিছু একটা হলে গাঁজায়গায় কে কি করবে! ঝুনু খুবই ক্ষেপে গেছে। তার কথার কোনো দাম থাকে না সংসারে। খুশিমতো চলে। সময় অসময় বুঝবে না। মার চিঠি পেয়ে উতলা। মা জানে না, ছেলের

কষ্ট হবে। কি অবুঝ মা! এমন মা সংসারে থাকে ঝুনুর কিছুতেই মাথায় আসে না। নিজের দিকটা ষোলো আনা, নিজের জেদ ষোলো আনা—কিছুতেই এখানে এসে থাকবেন না। তা আমার সংসারে ভালো লাগবে কেন! নিজের সংসার ফেলে এখানে থাকবেন কেন! কিছুতেই দু-পাঁচদিনের বেশি থাকতে চান না। সে নিজেও চিঠি লিখেছিল, এত গরমে আপনার কষ্ট, গরমের সময়টা এখানে কাটিয়ে যান। চিঠির উত্তরই দেননি। যেমন মা, তেমন তার ছেলে, বেশি ভালো হবে কোত্থেকে!

ঝুনু না পেরে বলল, যাবেই ঠিক করেছ?

দেখতেই তো পাচ্ছ।

ঝুনু বুঝতে পারছে, বাবুর গোঁ উঠেছে। তার সাধ্য কি, ধরে রাখে। সারাদিন প্যাচপ্যাচে গরমে তারও মাথা ঠিক নেই। তবু যখন যাবেন বাবু, যাক। মজা বুঝে আসুক। কপালে যা আছে হবে।

সে এক বোতল বরফ ঠাণ্ডা ফোটানো জল দিল। রাস্তার টিফিন দিল। বার বার বলে দিল, রাস্তার কিছু খাবে না। যেন বাবুটি খুবই ছেলেমানুষ—একবার মার কথা মাথায় চেপে বসলে কেমন দিগভ্রান্ত হয়ে যায়। সংসারে মা-ই সব, ক্ষোভে অভিমানে সে যে জ্বলছে বুঝতে দিচ্ছে না।

ছাতা নাও সঙ্গে।

লাগবে না।

তবু অ্যাটাচিতে জোরজার করে ছাতা ঢুকিয়ে দিল। টর্চলাইট, জলের বোতল, রাস্তার টিফিন কোথায় রেখেছে বলে দিল। ট্যাক্সি এলে অময় উঠে বসল। ঝুনু গেটে দাঁড়িয়ে আছে। একসময় ট্যাক্সিটা চোখের উপর থেকে অদৃশ্য হয়ে গেলে ঝুনু ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল।

এই ক্ষোভ কত মারাত্মক হতে পারে অময়ের মুখ দেখলে টের পাওয়া যায়।

অময় ভিতরে ভালো নেই। মাঝে মাঝে মনে হয়, সুখ সচ্ছলতা মানুষকে অমানুষ করে দেয়।

তার বাবার চাষবাস, জমিজমা, গৃহদেবতা, গোরুবাছুর এই ছিল সম্বল। মাটির ঘরে সে জন্মেছে, বড়ো হয়েছে। পড়াশোনা করেছে, আবার জনমজুরদের সঙ্গে দরকারে জমিতে নিড়ি দিতে বসে গেছে। বাবার সঙ্গে থেকে চাষবাসের যে আলাদা একটা মাধুর্য আছে সে টের পেয়েছিল। দরকারে ভাইবোনেরা মিলে পাট কেটেছে, খালের জলে পাট জাব দিয়েছে —চাষবাস থাকলে সংসার যেমনটা হয়ে থাকে আর কি? গোরুর দুধ দোয়ানোর কাজটা

সেই করত। কলেজ থেকে ফিরে অনেকদিন সে গোরু নিয়ে জমির আলে আলে ঘাস খাইয়েছে। এর মধ্যেও আশ্চর্য মাদকতা আছে। কাঁচা ঘাস খাওয়ালে দুধ ঘন হয়, কাঁচা ঘাস খাওয়ালে দুধ বেশি দেয় এসব সে নিজের হাতে করে দেখেছে। প্রকৃতির মধ্যে গোরুর দড়ি ধরে হেঁটে যাওয়া, সবুজ ঘাসের খোঁজে থাকা, অনেক কিছুর মধ্যে নিরন্তর এই আগ্রহের খবর ঝুনু জানেই না।

আসলে সে যে বাড়ি যায়, মার চিঠি পেলে স্থির থাকতে পারে না, রক্তে সেই স্বাদ সুপ্ত হয়ে আছে বলে। কেমন এক মুক্তির স্বাদ। বাবাকে দেখে বুঝেছিল, জড়িয়ে থাকা যেমন জীবনের লক্ষণ আবার প্রয়োজনে উপেক্ষা করার মধ্যেও আছে মুক্তির স্বাদ।

সে স্টেশনে গিয়ে দেখল, জম্মু-তাওয়াই এক্সপ্রেস প্ল্যাটফরমে দাঁড়িয়ে আছে। ওটা ছেড়ে দিলেই লালগোলা প্যাসেঞ্জার প্ল্যাটফরমে ঢুকবে।

গরমে অময় দরদর করে ঘামছিল। এত ভিড় যে পাখার নীচে গিয়েও দাঁড়াতে পারছে না। সে তার অ্যাটাচিটা একটা বেঞ্চিতে রেখে ঠাণ্ডা হাওয়া খাওয়ার জন্য উঠে দাঁড়ালে কেন জানি মনে হল—না ঠিক না। সেই সুখ তাকে আবার তাড়া করছে। এক দঙ্গল যুবতী ভিড়ের মধ্যে ঝুঁকে পাখাওয়ালার কাছে গিয়ে ঘিরে দাঁড়াল, সবাই একটা করে তালপাতার জাপানি পাখা কিনে ফেলল, যেন স্টেজে উঠে এক্ষুনি তারা নাচ শুরু করবে—শরীরে সুবাস তাদের, দূরে থেকেও এই সুবাস সে টের পাচ্ছে। তারপর যুবতীরা কে কোথায় নিমেষে হারিয়ে গেল। সে দেখল, মানুষের ছোটাছুটির শেষ নেই, ব্যস্ততার শেষ নেই। তার আজ কোনো ব্যস্ততা নেই। জলের বোতলটার কথা মনে হল, তেষ্টা পাচ্ছে, পাশে বেঞ্চে ছোট্ট শিশু নিয়ে বসে আছে চাষি বউ। নাকে নথ। ঘোমটায় কপাল ঢাকা। মেয়েটা কাঁদছিল। ছোট্ট ফ্রক গায়। জল তেষ্টা পেতে পারে, লোকটা জলের ফ্লাস্ক দরদাম করছে, এই গরমে কাঁধে হরেক রকম প্লাস্টিকের জলের বোতল নিয়ে ঘুরছে ফেরিওয়ালা। ডাবল দামে বিক্রি হয়ে যাচ্ছে সব। গরিব মানুষের হিসাব সহজে মেলে না। জলের বোতল কিনতে তার সাহস হয়নি, গুচ্ছের টাকা দেবার ক্ষমতা নেই—অময়ের কি হল কে জানে, সে ব্যাগ থেকে জলের বোতলটা বের করে বলল, নিন।

লোকটা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল। না না বাবু আপনার চলবে কি করে। কি গরম! গলা শুকিয়ে যাচ্ছে! অময় হাসল, চলবে। আমি একা মানুষ, কোথাও খেয়ে নেব। সে ইচ্ছে করে বোতলটা ছোট্ট শিশুর পাশে রেখে হাঁটা দিল। জলের কল থেকে জল খেল। যেমন সে পঁচিশ ত্রিশ বছর আগে এই লাইনে, কতবার টাকার অভাবে টিকিট না কেটেই গেছে —আর তখন লকোচুরি খেলা।

একবার মনে আছে, কলকাতায় ইন্টারভিউ দিতে এসে ফেরার পয়সা ছিল না। কাশিমবাজার স্টেশনে নেমে রাতের অন্ধকারে ধরা পড়ে গেল। নীল বাতি নিয়ে পয়েন্টসম্যান দাঁড়িয়েছিল শেষ মাথায়। ধরা পড়ার ভয়ে গেট দিয়ে ঢোকেনি, কোনোরকমে লাইন পার হয়ে আমবাগানে ঢুকে গেলেই আর পায় কে! আর কোত্থেকে ভূতের মতো পয়েন্টসম্যান ফুস করে উঠে দাঁড়াল। সে পালাতে গেলে তার কাঁধের ঝোলানো ব্যাগ চেপে ধরেছিল। সে ব্যাগ ফেলেই ছুটেছিল, আঠারো-উনিশ বয়সে বোধহয় মানুষ বেশি দুঃসাহসী হয়, ব্যাগ ফেলে ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়। সামনের বনজঙ্গল পার হয়ে মিলের রাস্তায় পড়ে নিশ্চিন্তি।

এমন একটা খেলা শুরু করলে কেমন হয়! এই বয়সে খেলাটা জমলে মন্দ হয় না। সে তার সেই আগেকার জীবনে ফিরে যেতে চায় বলেই ত, বছরে এক দু-বার তার বাড়ি না গেলে মেজাজ ঠিক থাকে না।

জম্মু-তাওয়াই এক্সপ্রেস ছেড়ে গেলেই প্ল্যাটফরম ফাঁকা হয়ে গেল। লালগোলা প্যাসেঞ্জার ঢুকছে। ভিড় নেই বললেই হয়। ভিড় থাকলেও সে ছোটাছুটি করত কিনা জানে না। দাঁড়িয়ে কতবার কতটা রাস্তা ট্রেনে গেছে! রানাঘাটে কিছুটা খালি হয়। কৃষ্ণনগর গেলে আরও খালি—বসার জায়গার অভাব হয় না। কিন্তু আজ দেখছে, বেশ খালি কামরা। সে একদিকের একজনের আলাদা সিটে জানালার কাছে বসে গেল। ট্রেনটা প্ল্যাটফরম ছেড়ে যেতেই বুঝল, গরম বাতাস ঝাপটা মারছে। যেন লু বইছে। ঘরবাড়ি ইলেকট্রিকের তার ইস্পাতের মতো চকচক করছে। কাক- শালিখের ওড়াওড়ি গরমের ত্রাস থেকে। তার কেমন মজা লাগছিল। সে কেমন তার নিজের কাছে ফিরে যেতে পারছে। অফিসে এ-সময়টায় সে তার এয়ারকণ্ডিশান ঘরে বসে থাকে। এখন সে বসে আছে নিরন্তর এক দাবদাহ সঙ্গে নিয়ে। দমদমে গাড়িটা থামবে। ভিড় বাড়ছে। ব্যারাকপুর এলে, আরও। দু-একজন দাঁড়িয়ে আছে। একজন ষণ্ডামার্কা লোক তার দিকে এগিয়ে এসে বলল, সরে বসুন।

সে মাঠ দেখছে। এরাই সেইসব লোক, যারা তার গোত্রের। এদের সুবিধাভোগী লোক বলা হয়। সুযোগ পেলেই অন্যের সুখ কেড়ে নেয়। নিজের সুখ তৈরি করে।

কি বলছি শুনতে পাচ্ছেন!

সে শুনতে পেল না।

সরে বসতে বলছি। দুজন হয়ে যায়।

হয় না। একজন বসতে পারে। অময় না তাকিয়েই বলল। অময় কঠিন মুখে যুবকটিকে দেখল। তার হাতের কবজি শক্ত। লোমশ বুক। চোখে জ্যৈষ্ঠ মাসের খরতাপ। টের পেয়েই

যুবকটি কাকে যেন ডাকতে গেল। কতটা হুজ্জোতি হতে পারে অময়ের কেন জানি আজ দেখার আগ্রহ। আর তখনই দেখল, একজন বুড়ো মতো মানুষ ওদিকটায় দাঁড়িয়ে আছে। সে ডাকল, শুনুন। কাছে এলে বলল, দাঁড়িয়ে আছেন কেন, বসুন না। বলে সে সরে বসে বুড়ো মানুষটিকে জায়গা করে দিল। পাঁচ-সাতজন জড়ো করে সেই যুবক এসে দেখল, লোকটা রোদের মধ্যে গরম বাতাসের হলকায় পুড়ছে। পাসে একজন বুড়ো মানুষকে বসিয়ে রেখেছে। নিতান্ত হতদরিদ্র, গালে বাসি দাড়ি। গায়ে প্যাচপ্যাচে ঘামের গন্ধ। যুবক দাঁত শক্ত করে বলল, একজনের সিট বলছিলেন।

অময় তাকাল না।

অময় জানে, এরা ট্রেনের নিত্যযাত্রী। এরা গাড়িটাকে পর্যন্ত নিজের বাপের মনে করে। শুয়োরের বাচ্চা সব।

শুনতে পাচ্ছেন?

না।

অময় মাঠ দেখছে।

এখন দু-জনের সিট হল কী করে?

অময় জবাব দিল না। বুড়ো লোকটিকে সে বলল কোথায় যাবেন!

রেজিনগর নামব। ওখান থেকে দু-ক্রোশ পথ।

এই রোদে হেঁটে যেতে পারবেন?

যুবকটি এবার তার সাঙ্গপাঙ্গদের বলল, কি রে কি বুঝছিস! ধরব নাকি!

অময় ভ্রূক্ষেপ করল না। গম্ভীর গলায় বলল, ট্রেনের জানালায় আজকাল রড দেওয়া থাকে দেখছি।

যুবকটি রুমাল দিয়ে ঘাড় গলা মুছে পা ফাঁক করে দাঁড়াল—মশায়ের কোথায় যাওয়া হবে।

অময় বলল, এতটা রাস্তা রোদে হেঁটে যাবেন, কষ্ট হবে। ছাতাটা নিন। সে ছাতাটা বের করার সময় কালো একটা কী বের করে প্যান্টের ভাঁজে লুকিয়ে রাখল।

যুবক চমকে গেল। পুলিশের লোক! পুলিশের বড়োকর্তা হতে পারে। বেশি রং সহ্য নাও করতে পারে। সে গা ঢাকা দেবার জন্য তাড়াতাড়ি ভিড়ের মধ্যে মিশে গেল। অময় হাসল। বুড়ো লোকটি বলল, না না ছাতা আমার লাগবে না। আমার অভ্যাস আছে। মাথায় রোদ লাগে না।

অময় বলল, আপনি না নিলে, জানালা দিয়ে ফেলে দেব। দেখবেন। বলে সত্যি সে ছাতাটা তুলে ফেলতে গেলে কেমন অবাক চোখে তাকিয়ে থাকল বুড়োমানুষটি। ভাবছে তার মাথা খারাপ নয় ত। কিন্তু আচরণে কোথাও বুড়োমানুষটি তা টের পায়নি। বলল, ছাতা ফেলে দেবেন কেন?

তারপরেই মনে হল অময়ের, নাটক হয়ে যাচ্ছে, আশপাশের যাত্রীরা তাকে দেখছে। সে এটা চায় না।

সে একসময় ভাবল, থাক ছাতাটা। বাড়ি গিয়ে মণিকে দেবে। টিফিন বের করে সে খেল না। থাক, বাড়ি ফিরে মণির ছেলেমেয়েদের খেতে দেবে। সে চিনাবাদাম কিনে খেল। শোনপাপড়ি খেল। কলের জল থেকে জল খেল। ঘামে জামা-প্যান্ট ভিজে গেছে! ভালো লাগছে—এটাই সে চাইছে। বাড়ি গিয়ে পৌঁছোল সাড়ে পাঁচটায়। মা গাছের নীচে দাঁড়িয়ে। প্রচণ্ড গরমে সে হেঁটে এসেছে স্টেশন থেকে। রিকশা পর্যন্ত নেয়নি। মা বলল, তোর কি মাথা খারাপ! এই রোদে হেঁটে এলি! অসুখবিসুখ হলে কে দেখবে বাবা!

অময় বলতে পারত, অনেকদিন পর মা আমি আবার আমার মধ্যে ফিরে আসতে পেরেছি। ফিরে আসার এই মজা যে বোঝে সে বোঝে।

সে মাকে গড় করার সময় বলল, কোনো কষ্ট হয়নি। অনেকদিন পর নিজের সুখ কাকে বলে টের পেলাম মা। তুমি কেমন আছ! আর সবাই?

মণি তখন তার গোরুটাকে মাঠের মধ্যে রোদে ঘাস খাওয়াচ্ছে। দাদাকে দেখেই সে ছুটে আসছে। সবাই। এই বাড়ির গাছপালা বনজঙ্গল সব তার শৈশব কৈশোর এবং যৌবনের কথা বলে। সে এখানে এলেই মুক্তির স্বাদ পায়। মা গাছের নীচে মাদুর বিছিয়ে দিলে সে হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ল, বলল, আঃ কি আরাম!

ঝোড়ো হাওয়ায় পাতা উড়ে গেল। পাখিরা ডালে এসে বসল। পরিচিত মানুষজন বলল, কে অময়? সদরে কোনো কাজ ছিল? গাড়িতে না ট্রেনে?

সে বলল, ট্রেনে কাকা। সেই ট্রেনে—জলের বোতল নেই, ছাতা নেই, টিকিট নেই। সেই ট্রেনে আমি আবার আজ ফিরে আসতে পেরেছি! সে আর যা বলতে পারত, আমার জীবনের প্রথম এবং শেষ ট্রেন ওই একটাই। অন্য ট্রেনে চেপে বসলে বড়ো অস্বস্তি।

এক হাত গণ্ডারের ছবি

চার্চের ঠিক সামনে এক পাগল। সে হাঁকছিল, ‘দু-ঘরের মাঝে অথৈ সমুদ্দুর।’ ওর হাতে লাঠি এবং লাঠিতে পাখির পালক বাঁধা। মাথায় লাল রুমাল। দূরে বেরন হোটেলের পর্দা উড়ছে। পাগল চার্চের সদর দরজা থেকে বেরন হোটেলের দরজা পর্যন্ত ছুটে আসছিল বার বার আর ডিগবাজি খাচ্ছিল। সে কোনো যানবাহন দেখছিল না, সে এক পাগলিনির জন্য যেন প্রতীক্ষা করছিল কারণ পাগলিনি অন্য পারে ঠিক পেচ্ছাবখানার পাশে এবং কিছুদূর হেঁটে গেলে অনেক কাপড়ের দোকান, ছায়া স্টোরস অথবা হরলালকা আর গ্রীষ্মের দিন বলে প্রখর উত্তাপে পাগলিনী নগ্ন এবং বধির, পাগলিনি পথের উপর বসে পড়ল।

ঠিক তখন চার্চের দরজার সামনে শববাহী শকট। সোনালি ঝালরের কাজ করা কালো কফিনে মৃত পুরুষ এবং কত ফুল। শোকের পোশাক পরা যুবক যুবতীরা, বৃদ্ধেরা সদর দরজা ধরে ভিতরে ঢুকে যাচ্ছে। সকাল হচ্ছে। সূর্য দেখা যাচ্ছে না। বড়ো বড়ো গাছের মাথায় সূর্য অকারণ কিরণ দিচ্ছে। তখন পাগল হাঁক দিয়ে সকলকে যেন ডেকে বলছিল, কে আসবি আয়, সংক্রান্তির মাদল বাজছে আয়। অথবা নানারকমের অশ্লীল আলাপ, যা শোনা যায় না, যার জন্য পথে হাঁটা দায়। তখন পথ ধরে কোটিপতি পুরুষের স্ত্রী দামি গাড়িতে নিউ মার্কেট যাচ্ছে। পথে দেবদারুগাছ এবং গাছের ছায়া পাগলিনির মুখে। পাগল ঊর্ধ্ববাহু হয়ে পাখির পালক ওড়াচ্ছে আকাশে। পাগলিনি বসেছিল, আর উঠছে না। এইসব দৃশ্য এ-অঞ্চলে হামেশাই ঘটছে, পুলিশের প্রহরা এবং তীর্যক সব দৃষ্টির জন্য যানবাহন থেমে থাকছে না। বড় নোংরা এই অঞ্চল। দেয়ালে দেয়ালে বিচিত্র সব নগ্ন দৃশ্য চিত্রতারকাদের এবং রাজাবাজার পর্যন্ত অকারণ অশ্লীলতা। হামেশাই পথে ঘাটে নগ্ন যুবতীরা পাগলিনি প্রায় শুয়ে থাকছে। সব অসহ্য।

এবং মনে হয় এরা সকলে রাতে ফুটপাথে নিশিযাপন করেছিল। এখন এরা নিজেদের ছেঁড়া কাঁথার সঞ্চয় ছেড়ে রোজগারের জন্য বের হয়ে পড়বে। পাগল তার সঞ্চয় সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে ঘুরছিল। কিছুই ফেলা যায় না। সে নারকেলের মালা এবং সিগারেটের বাক্স দিয়ে মালা গেঁথে গলায় পরেছিল। পিঠে পুরাতন জামার নীচে পচা ঘায়ের গন্ধ। সে শুধু এখন হাসছিল। পথে লোকের ভিড় বাড়ছে, ট্রাম বাসের ভিড় বাড়ছে। মানুষের মিছিল

সারা দিনমান চলবে। পাগল হেসে হেসে সকলকে উদ্দেশ করে বলছিল, দু-ঘরের মাঝে অথৈ সমুদ্দুর। সে এখন অন্য কোনো সংলাপ আর খুঁজে পাচ্ছিল না।

গ্রীষ্মের প্রখর উত্তাপ এবং ছায়াবিহীন এই পথ। ফুটপাথে অথবা গাড়ি বারান্দায় যারা রাত যাপন করছে, যারা ঠিকানাবিহীন, যাদের সব তৈজসপত্র ছেঁড়া, নোংরা এবং প্রাচীনকাল থেকে সব সংরক্ষণ করছে—নগরীর সেইসব প্রাচীন রক্ষীরা এখন অন্নের জন্য ফেরেববাজের মতো ঘোরাফেরা করছে। ছেঁড়া সব তৈজসপত্রের ভিতর এক অতিকায় বৃদ্ধ, মুখে দাড়ি শণপাটের মতো এবং সাদা মিহি চুল আর অবয়বে রবীন্দ্রনাথের মতো যে, কপালে হাত রেখে গ্রীষ্মের সূর্যকে দেখার চেষ্টা করছে।

অন্য ফুটপাথে পাগল ঊর্ধ্ববাহু হয়ে আছে। ওর এই পাগলকে যেন কতকাল থেকে চেনা। বড়ো স্বার্থপর—বৃদ্ধ এই ইচ্ছাকৃত পাগলামির জন্য একদিন রাতে তখন নগরীর সকল মানুষেরা ঘুমিয়ে পড়েছে, তখন হাসপাতালের বড়ো আলোটা পর্যন্ত নিভে গিয়েছিল, রাজবাড়ির সদর বন্ধ হচ্ছে এবং যখন শেষ ট্রাম চলে গেল, যানবাহন বলতে পথে কোনো কপর্দক পড়ে নেই.......সব নিঃশেষ, শুধু কুকুরের মাঝে মাঝে আর্ত চিৎকার তখন পাগল ওই পাগলিনির পাশে শুয়ে নোংরা তৈজসপত্রের ভিতর থেকে ছোটো ছোটো উচ্ছিষ্ট হাড় (আমজাদিয়া অথবা বেরন হোটেল থেকে সংগ্রহ করা) দুজনে চুষছিল , রাতের দ্বিপ্রহরে ওদের উদরে মাংসের রস যাচ্ছে', ওরা সারা দিনমান পাগলামির জন্য ফের প্রস্তুত হতে পারছে—বৃদ্ধ হাঁ করে দেখতে দেখতে বলেছিল, এই সরে বোস, এটা পাগলামির জায়গা নয়। ঘুমোতে দে। রাজ্যের সব নোংরা এনে জড় করেছিস?'

পাগল কিছুক্ষণ ড্যাব ড্যাব করে তাকিয়ে থাকল। কথাটা বোধগম্য হয়নি। কিন্তু পাগলিনি সুলভ রমণীর মতো কাছে এসে বলল, 'তোর বাপের জায়গা!' ঠিক ভালো মানুষের মতো, ঠিক সুলভ রমণীর মতো এবং দিনের জন্য অভিনয়টুকু তখন আর ধরা পড়ছে না, পাগলিনি গলাটা খাটো করে বলল, তোর মুখে চুনকালি পড়বে।

পাশে তেরো বছরের সুমি চিৎকার শুনে উঠে বসেছিল। রাতে পিতামহের হাত ধরে ফুটপাথের অন্য প্রান্তে চলে গিয়েছিল। ওরা পাগলিনির ঝোলাঝুলির ভিতর পচা গন্ধ পাচ্ছিল কারণ এই ঝোলাঝুলি বরফ ঘরের মতো—সবই দুর্দিনের জন্য সংরক্ষণ করা এবং কত রকমের সব উচ্ছিষ্ট খাবার। পাগলিনি চিৎ হয়ে শুয়েছিল। মাংসের হাড় অনবরত চোষার জন্য গালের দুধারে ঘায়ের মতো সাদা দাগ। শরীরে দীর্ঘদিনের ময়লার পলেস্তারা মুখের অবয়বকে নষ্ট করে দিয়েছে। চেনা যাচ্ছিল না ওরা জন্মসূত্রে কোনো গ্রাম্য গৃহস্থের ঔরসজাত না অন্য কোনোভাবে অথবা কোনো অলৌকিক ঘটনার নিমিত্ত এই ফুটপাথ সংলগ্ন ডাকবাক্সের মতো পাতলা অস্থায়ী প্লাইউডের বাড়িতে বসবাস করছে।

পাশের বাড়িটা চারতলা এবং নীচে ফুটপাতের উপর ছাদের মতো গাড়িবারান্দা। সামনে হাসপাতাল এবং রাজবাড়ি, সদর দরজার উপর একটা এক হাত লম্বা গণ্ডারের ছবি ঝুলছে। সময়ে অসময়ে বৃদ্ধ ছবিটার নীচে কয়েকজনের নাম উচ্চারণ করে পড়ার সময় ‘নাট্যকার’ এই শব্দটি ভয়ংকরভাবে কষ্ট দিতে থাকে। আর হাসপাতালের বাড়িটা দীর্ঘদিন খালি পড়েছিল, শুধু কাক উড়ত ছাদে এবং পাঁচিলের পাশের পেয়ারা গাছটাতে একজোড়া ঘুঘু পাখি আশ্রয় নিয়েছিল। ইদানীং চুনকাম হবার সময় মোষের মতো এক ইতর ছোকরা কিছু চুনগোলা জল ছাদ থেকে নালির ফুটোর উপর ফেলে দিয়েছিল। সেই মোষটা হালফিলে সকল খবর নিয়ে গেছে এবং চেটেপুটে রেখে গেছে সুমিকে। চুনগোলা জলের জন্য ঘুঘু পাখিরা উড়ে চলে গেল। তারপর একদিন যেন মনে হল ফের এম্বুলেন্স আসতে শুরু করেছে, ফের এই বাড়িতে আলো জ্বলে উঠল এবং ট্রাম ডিপোতে ফের ঘন্টি বাজছে।

আর এই বাড়িটার জন্যই ভোরের দিকে সূর্যের উত্তাপ ছাদের নীচে যেন পৌঁছোতে পারে না অথবা লম্বা হয়ে যখন সূর্য হাসপাতালের মৃত মানুষের ঘর অতিক্রম করে পেয়ারাগাছের মাথায় এসে পৌঁছোয় তখন ছাদের ছায়া বৃদ্ধ ফকিরচাঁদকে রক্ষা করতে থাকে। এই জন্যই অভ্যাসের মতো এই স্থান বসবাসের উপযোগী। সুমি পাশে নেই, কোথাও আহারের জন্য অন্নসংস্থান করতে গেছে। সে নিজে একটা শতচ্ছিন্ন চাদর ফুটপাথে বিছিয়ে তার পাশে কিছু গোটা অক্ষরে, তার জীবনের বিগত ইতিহাস, পরাজিত সৈনিকের মতো মাথা হেঁট করে ধিক্কৃত জীবন এবং গ্লানিকর জীবনের জন্য করুণা ভিক্ষা করছিল।

গ্রীষ্মের উত্তাপ প্রচণ্ড। দীর্ঘদিন থেকে অনাবৃষ্টি। সব কিছু রোদের উত্তাপে পুড়ে যাচ্ছে। পথের গলা পিচে করপোরেশনের গাড়ি বালি ছিটিয়ে গেছে। তখন পাগল পিচগলা পথে, মাথায় দুপুরের রোদ, লাঠিতে পাখির পালক বাঁধা—হাঁটছে। ইতস্তত সব ডাস্টবিনের জংশন এবং সেখানে হয়তো সুমি পোড়া কয়লা, কাগজ অথবা লোহার টুকরো খুঁজছে। ফকিরচাঁদ উঠে এক মগ চা সংগ্রহ করল। রাতের আহারের জন্য খড়কুটো অথবা পাতলা কাঠ সংগ্রহ করতে হয়—ফকিরচাঁদ আকাশ দেখল, আকাশ থেকে গনগনে আঁচ ঝরে পড়ছে, সে এই রোদে বের হতে সাহস করল না। সে হাত বাড়াল রোদে—যথার্থই হাত পুড়ে যাচ্ছে যেন, শুধু রাজবাড়ির সদর দেউড়িতে এক হাত গণ্ডারের ছবিটা এই রোদে চিক চিক করছিল।

বৃদ্ধ ফকিরচাঁদ এবার পা দিয়ে নিজের সুন্দর হস্তাক্ষর মুছে দিল। পাঁচিল সংলগ্ন ওর ছোটো প্লাইউডের সংসার—বসবাসের উপযোগী নয়, শুধু তৈজসপত্র রাখার জন্য পাতলা প্লাস্টিকের চাদর দিয়ে সব ঢাকা। ফকিরচাঁদ সব টেনে বের করল—মেটে হাঁড়ি পাতিল, ছেঁড়া কাঁথা, ভাঙা জলের কুঁজো সবই সুমির সংগ্রহ করা, মেয়েটার সারাদিন ঘুরে ঘুরে

ওই এক সংগ্রহের বাতিক এবং সুমিই একদা শেয়ালদা স্টেশন থেকে এই বাড়ি সংলগ্ন গাড়িবারান্দা আবিষ্কার করে ফকিরচাঁদের হাত ধরে চলে এসেছিল। সেই থেকে অবস্থান এবং সেই থেকে দিনগত পাপক্ষয়। সে এ-সময় ভালো করে চারদিকটা দেখল। মগের চা কিছু খেয়ে কিছু রেখে দিল, পাশে পাগল পাগলিনির আস্তানা। দুজনই সারাপথে অভিনয়ের জন্য বের হয়ে গেছে। দুজনই হোটেলের উচ্ছিষ্ট খাবার রাতের জন্য সংগ্রহ করছে।

প্রখর উত্তাপের জন্য পথ জনবিরল। দোতলায় মসজিদ এবং সেখানে মোল্লার আজান। ফকিরচাঁদ এবার চিৎকার করে ডাকল—সু......উ.......মি। ফকিরচাঁদ কপালে হাত রেখে দেখল ট্রামডিপোর সামনে ডাস্টবিন এবং সেখানে সুমি উপুড় হয়ে কী খুঁজছে। সে কোথাও আজ বের হল না ভিক্ষার জন্য, ফকিরচাঁদ মনে মনে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। ক্ষোভে দুঃখে ফের বড়ো বড়ো সুন্দর হস্তাক্ষরে ফকিরচাঁদ ফুটপাথ ভরিয়ে তুলল। সামনের বড়ো বড়ো বাড়িগুলোর দরজা জানালা বন্ধ। ট্রাম ফাঁকা এবং বাসযাত্রী উত্তাপের জন্য কম। সে সুন্দর হস্তাক্ষরের উপর থুথু ফেলল তারপর রাগে দুঃখে মাদুর বিছিয়ে শুয়ে পড়ল। সুমি আসছে না, ওর গলার আওয়াজ প্রখর নয়, সুতরাং সুমি ফকিরচাঁদের কথা শুনতে পাচ্ছে না। ফকিরচাঁদ নিজেকে বড়ো অসহায় ভাবল—এই দুর্দিনে সে যেন আরও স্থবির হয়ে যাচ্ছে, চলৎশক্তি হারিয়ে ফেলছে, ক্রমশ জীবন থেকে সোনার আপেলের স্বপ্ন ফুরিয়ে যাচ্ছে। এত বেলা হল, এখনো পেট নিরন্ন, সামনের হোটেলটাতে এখন গিয়ে দাঁড়ালে সুমি নিশ্চয়ই কিছু পেত, কারণ শেষ খদ্দের ওদের চলে যাচ্ছে। ফকিরচাঁদ অভিমানে নিজেই উঠে যাবার জন্য দাঁড়াতে গিয়ে প্রথম পড়ে গেল, পরে হেঁটে হেঁটে রেস্তোরাঁর সামনে যখন উপাসনার ভঙ্গিতে মাথা হেঁট করে দাঁড়াল, যখন করুণাই একমাত্র জীবনধারণের সম্বল এবং আর কিছু করণীয় নেই এই ভাব—তখন সে দেখল সব সোনা রুপোর পাহাড় আকাশে। আকাশ গুড়গুড় করে উঠল, মেঘে মেঘে ছেয়ে যাচ্ছে আর বাতাস পড়ে গেল, দরজা জানালা খুলে গেল এবং বৃষ্টির জন্য সর্বত্র কোলাহল উঠছে।

আর তখনই চার্চের দরজাতে শববাহী শকট মাঠের মসৃণ ঘাস পার হয়ে অন্য এক ইচ্ছার জগতে উঠে যাচ্ছে। ফুটপাথ ধরে অজস্র যাত্রী—গুনে শেষ করা যায় না, ফকিরচাঁদ অন্তত সময়ের প্রহরী হিসাবে গুনে শেষ করতে পারছে না। বাসস্ট্যান্ডে যারা দাঁড়িয়েছিল তারা পর্যন্ত কয়েক ফোঁটা বৃষ্টির জন্য অপেক্ষা করল, কারণ দীর্ঘ সময় এই অনাবৃষ্টি........ফলে এই নগরীর দূরতম প্রান্ত আর দূরের মাঠ ঘাট সবই ক্লিষ্ট—সকলে জানালা খুলে বৃষ্টির জন্য প্রতীক্ষা করতে থাকল। ফকিরচাঁদ একটু বৃষ্টিতে ভেজার জন্য পথে গিয়ে বসল। আজ অফিস পাড়ায় এই বৃষ্টি উৎসবের মতো। সকলে কয়েক ফোঁটা বৃষ্টির জন্য মাঠে এবং ফুলের ভেতর ছুটোছুটি করছিল। এবং পাগল যে শুধু হাঁকছিল, 'দু-ঘরের মাঝে অথৈ সমুদ্দুর', যে শুধু হাঁকছিল, 'কে আসবি আয়, সংক্রান্তির মাদল বাজছে

আয়'—সে এখন কিছু না হেঁকে শান্ত নিরীহ বালকের মতো অথবা কোনো কৈশোর জীবনের স্মৃতিকে স্মরণ করে আকাশে মেঘের খেলা দেখছিল। আর পাগলের পাখির পালক তখন লাঠি থেকে উড়ে গেল—পাগল পালকের জন্য ঝড়ের সঙ্গে ছুটছে।

পাগলিনি নিভৃতে ট্রামডিপোর বাইরে লোহার পাইপের ভিতর শুয়ে বৃষ্টির খেলা দেখছিল। সে নখে দাঁত খুটছে। পাগলকে ছুটতে দেখে খপ করে পাগলের পা চেপে ধরল, এবং বলল, 'দ্যাখ কেমন বৃষ্টি আসছে।'

'হায় আমার পাখি উড়ে গেল, বৃষ্টি দেখে পাখি উড়ে গেল....' পাগল হাউহাউ করে কাঁদছে।

দীর্ঘদিনের উত্তাপ, অনাবৃষ্টি বৃষ্টির জলে ভেসে গেল। পাগল বৃষ্টি দেখে পালকের কথা ভুলে গেছে। বড়ো বড়ো ফোঁটায় বৃষ্টির জল ওদের শরীরে মুখে পড়ল। বড়ো বড়ো ফোঁটায় বৃষ্টি হচ্ছিল। সুমি ওর ক্লিষ্ট চেহারা নিয়ে কোনো রকমে দৌড়ে ফকিরচাঁদের কাছে চলে এল। বৃষ্টির ফোঁটা হিরের কুচির মতো ভেঙে ভেঙে যাচ্ছে। পথের যাত্রীরা যে যার মতো গাড়িবারান্দায়, বাসস্টপের শেডে এবং দোকানে দোকানে সাময়িক আশ্রয়ের জন্য ঢুকে গেল—ওরা সকলেই যেন প্রাচীন কাল থেকে কোনো বিস্তীর্ণ কবরভূমি হেঁটে হেঁটে ক্লান্ত—ওরা সবুজ শস্যকণা এই বৃষ্টির জলে এখন ভাসতে দেখল।

পরদিন ভোরে খবরের কাগজের প্রথম পাতায় বড়ো বড়ো হরফে 'কলকাতায় বছরের প্রথম বর্ষণ' এই শীর্ষকে প্রবন্ধ এবং ঠিক প্রথম পাতার উপরে বড়ো এক ছবি, আর যুবতী নারী জলের ফোঁটা মুখে চন্দনের মতো মেখে নিচ্ছে। অথবা ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গের ছবি, দুর্গের বুরুজে জালালি কবুতর উড়ছে।

বৃষ্টি সারারাত ধরে হয়েছে। কখনও টিপটিপ কখনও ঘোর বর্ষণ এবং জোরে হাওয়া বইছিল। ভোরের দিকে যখন কর্পোরেশনের গাড়ি গলা জলে নেমে ম্যানহোল খুলে দিচ্ছিল, যখন ট্রাম-বাস বন্ধ, যখন বৃষ্টির জন্য ছাতার পাখিরা কলকাতার মাঠ পার হয়ে গঙ্গার পাড়ে, অথবা হুগলি নদীর পাড়ে পাড়ে সব চটকলের বাবুরা বাগানে ফুলের চারা পুঁতে দিচ্ছিল তখন বৃদ্ধ ফকিরচাঁদ কলকাতার বুক জল থেকে আকাশ দেখল। পাশে সুমি। সে পেটের নীচে হাত দিয়ে রেখেছে—ভয়, নীচে যে সন্তান জন্মলাভ করছে, ঠাণ্ডায় ওর কষ্ট না হয়।

পাতলা প্লাইউডের ঘর এখন জলের তলায়। মরা ইঁদুর ভেসে যাচ্ছিল জলে। জানালায় যুবক যুবতীরে মুখ—ওরা বৃষ্টির জলে হাত রেখে বড়ো বড়ো হাই তুলছিল। কিছু টানা-রিকশা চলছে, ট্রাম-রাস্তার উপরে যেখানে জল কম, যেখানে একটা মরা কুকুর পড়ে আছে, টানা-রিকশাগুলো সেই সব পথ ধরে প্রায় হিক্কা তোলার মতো এগুচ্ছে। এই বর্ষায়

পিচের পথ সব ভগ্নপ্রায়, মাঝে মাঝে ভয়ানক ক্ষতের মতো দাগ, সুতরাং রিকশা চলতে গিয়ে ভয়ংকর টাল খাচ্ছে। বর্ষার জলে পথ ভেসে গেছে বলে সুখী লোকেরা কাগজের সব নৌকা জলে ভাসিয়ে দিয়েছে। সুমি এবং বৃদ্ধ ফকিরচাঁদ সারারাত জলে ভিজে ভিজে শীতে কাঁপছিল। অন্য ডাঙার সন্ধানে যাওয়ার জন্য ওরা জলে নেড়ি কুকুরের মতো সাঁতরাচ্ছিল। ওরা আর পারছে না। গভীর রাতে যখন বর্ষণ ঘন ছিল, যখন কেউ জেগে নেই, যখন পথের সব আলো মৃত জোনাকির মতো আলো দিচ্ছে....সুমি অসীম সাহস বুকে নিয়ে ডাঙা জমির জন্য সর্বত্র বিচরণ করতে করতে সামনের চার্চ এবং রাজাবাজারের ডিপোতে অথবা জলের পাইপগুলো অতিক্রম করে অন্য কোথাও....সুমি পরিচিত সব স্থান খুঁজে এসেছে, ডাঙা জমির কোথাও একটু সে ছাদ খুঁজে পায়নি।

ওরা জল ভেঙে ওপারে এসে উঠতেই দেখল বৃষ্টি ধরে আসছে। আকাশের গুমোট অন্ধকারটা নেই এবং কিছু হালকা মেঘ দেখা যাচ্ছে। এ-সময়ে সেই পাগল পুরোপুরি নগ্ন। ভিজে জামাকাপড়। গায়ে রাখতে সাহস করছে না। সুমি পাঁচিলের সামনে শরীর আড়াল করে কাপড় চিপে নিল এবং ফকিরচাঁদের কাপড় চিপে দিল। ফকিরচাঁদ শীতে ক্রমশ আড়ষ্ট হয়ে যাচ্ছে। পাগলিনি জলের পাইপের ভেতর শুয়ে থেকে শুকনো হাড় চুষে চুষে শীতের কষ্ট থেকে রেহাই পাচ্ছে। ওর সব বসনভূষণ পাইপের ভিতর যত্ন করে রাখা। কিছু কাগজ সংগ্রহ করে মুণ্ডমালার মতো কোমরের ধারে ধারণ করে যেন কত কষ্টে লজ্জা নিবারণ করছিল। আকাশে হালকা মেঘ দেখে এবং আর বৃষ্টি হবে না ভেবে ঠিক টাকি হাউসের সামনে বাঁ হাত কোমরে অথবা সামনে....তেরে কেটে ধিন এইসব বোলে পাগল হামেশাই নাচছে—কলকাতা বৃষ্টির জলে ডুবে গেল, আমার পাখি উড়ে গেল বাতাসে। পাগল এইসব গান গাইছিল।

সুমি পাগলের পিছনে গিয়ে দাঁড়াল এবং একটু ঠেলে দিয়ে বলল, এই তুই ফের নেংটো হয়েছিস! তুই ভারি অসভ্য। বলে খিলখিল করে হেসে উঠল, ফকিরচাঁদ পাঁচিলের গোড়ায় বসে রয়েছে। সে হাসতে পারছে না। থেকে থেকে কাশি উঠছে এবং চোখ ক্রমশ ঘোলা দেখাচ্ছিল। আকাশের মেঘ হালকা, হয়তো আর বৃষ্টি হবে না। ফের ট্রাম বাস চলতে শুরু করবে অথবা এইসব সারি সারি ট্রাম বাস উটের মতো মুখ তুলে 'দীর্ঘ উ টি আছে ঝুলে' বলে সারাদিন মুখ থুবড়ে থেমে থাকবে। ফকিরচাঁদ শীত তাড়াবার জন্য কাতরভাবে শৈশবের 'অ'য় অজগর আসছে তেড়ে, আমটি আমি খাব পেড়ে, ইঁদুর ছানা ভয়ে মরে—যা বৃষ্টি শালা কোনো ইঁদুরের ছানাকে আর বেঁচে থাকতে হচ্ছে না। সে দেয়ালে এসময় কী লেখার চেষ্টা করল কিন্তু বাতাসে আর্দ্রতা ঘন বলে কোনো লেখা ফুটে উঠল না।

ফকিরচাঁদ রোদের জন্য প্রতীক্ষা করতে থাকল। ফুটপাথ থেকে জল নেমে যাচ্ছে। ট্রাম বাস ফের চলতে শুরু করেছে এবং দুপুরের দিকে আকাশ যথার্থই পরিষ্কার—মনে হচ্ছে

বৃষ্টি আর হবে না, যেন শরৎকালীন হাওয়া দিচ্ছে। বৃদ্ধ এ-সময় সুমিকে পাশে নিয়ে বসল। রোদ উঠবে ভেবে সে সুমিকে জীবনের কিছু সুখদুঃখের গল্প শোনাল। ভিজে কাপড় শরীরে থেকে থেকে শুকিয়ে যাচ্ছে। রাস্তায় জল কমে গেছে—বৃদ্ধ এবার উঠে দাঁড়াল এবং এক মগ চা এনে পরস্পর ভাগ করে খেল। বৃষ্টি আর আসছে না, বৃদ্ধ অনেকদিন আগের কোনো গ্রাম্য সঙ্গীত মিনমিনে গলায় গাইছে। তার স্থাবর অস্থাবর সব সম্পত্তির ভিতর থেকে একটা ভাঙা এনামেলের থালা বের করে রেস্তোরাঁ অথবা কোনো হোটেলের উদবৃত্ত এবং উচ্ছিষ্ট অন্নের জন্য বের হয়ে গেল। জীবনটা এভাবেই কেটে যাচ্ছে—জীবনটা রাজবাড়ির সদরে ঝুলানো এক হাত গণ্ডারের ছবির মতো—মাথা সবসময় উঁচিয়েই আছে।

কিন্তু কীসে কী হল বলা গেল না। সমাজের সব ধূর্ত শেয়ালদের মতো আকাশ মেঘে মেঘে ছেয়ে গেল। ফের বৃষ্টি—বর্ষাকাল এসে গেল। বৃষ্টি ঘন নয় অথচ অবিরাম। ফকিরচাঁদের বসবাসের স্থানটুকু ভিজে গেছে। পাগল-পাগলিনিকে আর এ-অঞ্চলে দেখা যাচ্ছে না। ফকিরচাঁদ উচ্ছিষ্ট অন্ন খেতে খেতে হাঁ করে থাকল—কারণ আকাশের অবস্থা নিদারুণ, আজ সারাদিন বৃষ্টি হবে....উত্তাপের জন্য ওর ফের কান্না পাচ্ছিল।

সুমি পাঁচিলের পাশে ফকিরচাঁদকে টেনে তুলল। এই শেষ শুকনো ডাঙা। ওর ভিতরে ভিতরে ভয়ানক কষ্ট হচ্ছিল। তলপেট কুঁকড়ে যাচ্ছে এবং ভেঙে যাচ্ছে। সুমি নিজের কষ্টের কথা ভুলে গেল এবং যে-কোনোভাবে ফকিরচাঁদের শরীরে উত্তাপ সঞ্চয় হোক এই চাইল। ফকিরচাঁদ শীতের কথা ভেবে মড়া কান্নায় ভেঙে পড়ছে। ফকিরচাঁদ খেতে পারছে না—কত দীর্ঘদিন থেকে যেন বৃষ্টি আর থামবে না—শীতে শীতে বছর কেটে যাবে। ফকিরচাঁদ বলল, সুমি আমাকে নিয়ে অন্য কোথাও চল।

কোথায় যাব রে! আমার শরীর দিচ্ছে না রে! তেরো বছরের সুমি তলপেটের দু-পাশে দু-হাত রেখে কথাগুলো বলল।

ফকিরচাঁদ পুনরাবৃত্তি করল, আমাকে কোথাও নিয়ে চল রে সুমি।

সুমি এনামেলের থালা থেকে বাসি রুটি এবং ডাল খাচ্ছিল। ভিজে জবজবে কাপড়। ভিতর থেকে ওর-ও শীত উপরে উঠে আসছে। এবং মনে হচ্ছে জরায়ুর ভিতর যেন কেউ গাঁইতি মেরে গভীর ক্ষত সৃষ্টি করার চেষ্টা করছে। সুমি নিজের এই কষ্টের জন্য রুটি মুখে দিতে পারছে না এখন এবং ফকিরচাঁদের কথার জবাব দিতে পারছে না।

বাস ট্রাম যাবার সময় কাদা জল উঠে আসছে ফুটপাথে। ফুটপাথ কর্দমময়। ফকিরচাঁদের এখন উঠে দাঁড়াবার পর্যন্ত শক্তি নেই। সে ক্রমশ স্থবির হয়ে পড়ছে। এখন সর্বত্র যেন বরফের মতো ঠাণ্ডা এবং কাকগুলো বিজলির তারে বসে বসে ভিজছে। থেকে

থেকে ট্রাম বাস চলছে এবং ছাতা মাথায় যারা যাচ্ছিল তারা ছাতার জলে আরও ভয়াবহ করে তুলছে ফুটপাথ—সুতরাং ফকিরচাঁদ কিছু বলতে পারছে না, ফকিরচাঁদ বৃদ্ধ, সুন্দর হস্তাক্ষর ছিল হাতের, পণ্ডিত ছিল ফকিরচাঁদ—প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পণ্ডিত, তারপর ফকিরচাঁদ পুত্র এবং পরিবারের সকলকে হারিয়ে দীর্ঘসূত্রতার জন্য ফুটপাথের ফকিরচাঁদ হয়ে গেল। ফকিরচাঁদের সংগ্রহ করা শতচ্ছিন্ন গেঞ্জি এবং আবরণ এখন কর্দমময়। সে শীতে ফের কাঁপতে থাকল এবং ফের কথা বলতে গিয়ে দেখল দাঁতমুখ শক্ত, শরীর শক্ত এবং অসমর্থ। সে যেন কোনোরকমে নিজের হাতটা সুমির দিকে বাড়িয়ে ধরল।

এখন দিন নিঃশেষের দিকে। সুমি একটু শুকনো আশ্রয়ের জন্য গোমাংসের দোকান অতিক্রম করে রাজাবাজারের পুল পর্যন্ত হেঁটে গেছে। সর্বত্র মানুষের ভিড় এবং এতটুকু আশ্রয় সুমির জন্য কোথাও পড়ে নেই। সকল ফুটপাথবাসী অথবা বাসিনীরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভিজছে। সকলেই মাথার উপর ভাঙা ছাদ পেলে খুশি আর সর্বত্র ওলাওঠার মতো মড়কের শামিল পথঘাট। সুতরাং সুমি ফিরে এসে হতাশায় ফকিরচাঁদকে কিছু বলতে পারল না। সে ফকিরচাঁদের পাশে চুপচাপ বসে পড়ল। ঠাণ্ডা লাগার জন্য শীতে এখন সে কাঁপছে।

ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে। ঠাণ্ডা হাওয়ায় বৃষ্টির ছাঁট সর্বত্রগামী। বৃদ্ধের চুল দাড়ি ভিজে গেছে। রাস্তার আলো বৃদ্ধ ফকিরচাঁদের মুখে, দাড়িতে বিন্দু বিন্দু জল মুক্তোর অক্ষরের মতো—যেন লেখা, আমার নাম ফকিরচাঁদ শর্মা, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পণ্ডিত, নিবাস যশোহর—ফকিরচাঁদ উদাস চোখে বৃষ্টির শব্দ শুনতে শুনতে এসব ভাবছিল। চোখ ঘোলা ঘোলা ওর, সুমি এই বৃষ্টিতে বসেই এনামেলের থালা থেকে ঠাণ্ডা অড়হরের ডাল এবং রুটি ফকিরচাঁদের মুখে দিতে গেল। সে মুখে খাবার তুলতে পারছে না। ঠাণ্ডায় মুখ শক্ত। সে শুধু উত্তাপের জন্য হাত দুটো সুমির হাঁটুর নীচে মসৃণ ত্বকের ভিতর গুঁজে দিতে চাইল।

সুমি বলল, ‘দাদু তুই ইতর হয়েছিস?’ বলে হাতটা তুলে দিতেই দেখল, ফকিরচাঁদের চোখ যেন ঘোলা ঘোলা—ফকিরচাঁদ যেন মরে যাচ্ছে।

সে চিৎকার করে উঠল ‘দাদু! দাদু!’

ফকিরচাঁদ ঈষৎ চোখ মেলে ফের চোখ বুজতে চাইল।

সুমি তাড়াতাড়ি একটু আশ্রয়ের জন্য হোক অথবা ভীতির জন্য হোক উঠে পড়ল। বৃষ্টি মাথায় একটু আশ্রয়ের জন্য দোকানে দোকানে এবং ফুটপাতের সর্বত্র এমনকী গলিঘুঁজির সন্ধানে সে ছুটে ছুটে বেড়াল। বৃষ্টি ক্রমশ বাড়ছে। ফুটপাথে ফের জল উঠতে আরম্ভ করেছে। আর অধিক রাতে সুমি যখন ফিরল, যখন ফের তলপেটে ঈশ্বর কামড়ে ধরছে, শরীরটা নুয়ে পড়ছিল, জলের জন্য ভিতরে ভিতরে ঈশ্বর মোচড় দিচ্ছে এবং ট্রাম বাস

চলছে না, ইতস্তত দূরে দূরে কিছু ট্যাক্সি কচ্ছপের মতো ভেসে আছে এবং হোটেল রেস্তরাঁর দরজা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, কেউ বৃষ্টিতে ভিজে জেগে থাকবার জন্য বসে নেই—সুমির তখন ক্লিষ্ট চেহারা বড়ো করুণ দেখাচ্ছিল। সামনে অপরিচিত অন্ধকার, চার্চের সামনে হেমলক গাছ—লোহার রেলিং টপকে গেলে ছোটো ঘর এবং সেখানে কাঠের কফিন মাচানের মতো করে রাখা। হেমলক গাছের বড়ো বড়ো পাতার ভিতর জলের শব্দ আর সামনে সব কবরভূমি—চার্চের ভিতর কোনো আলো জ্বলছে না....সুমি নিঃশব্দে লোহার রেলিং টপকে কফিনের ভিতর শুয়ে সন্তান প্রসবের কথা ভাবতেই ফকিরচাঁদের কথা মনে হল—আবার এই পথ এবং জলের শব্দ, সুমি ফুটপাথের জল ভেঙে ফকিরচাঁদকে আনার জন্য ধীরে ধীরে রাজবাড়ির সদর দরজায় ঝোলানো এক হাত গণ্ডারের ছবির নীচে দাঁড়াল। ওর অদ্ভুত এক কান্না উঠে আসছে ভিতর থেকে। জন্মের পর এই বৃদ্ধকে সে দেখেছে আর সেই মোষের মতো পুরুষটা যাকে সে তার ভালোবাসা দিতে চেয়েছিল, যে চুন গোলা জল ফেলে ঘুঘু পাখিদের উড়িয়ে দিয়েছে.....সদর দরজায় এক হাত গণ্ডারের ছবির নীচে দাঁড়িয়ে সুমি কাঁদতে থাকল। বৃষ্টির ঘন ফোঁটা, গাছগাছালির অস্পষ্ট ছায়া অথবা সাপ বাঘের ডাকের মতো ব্যাঙের ডাক আর নগরীর দুর্ভেদ্য স্বার্থপরতা সুমির দুঃখকে অসহনীয় করে তুলছে। সুমির শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। এমনকী পাগলেরাও এই বৃষ্টিতে বের হচ্ছে না, পুলিশ কোথাও পাহারায় নেই। সুমি এত বড়ো শহরের ভিতর এখন একা এবং একমাত্র সন্তান যে মুখ বের করবার জন্য ভিতরে ভিতরে প্রাণপণ চেষ্টা করছে। তখনই সুমি দেখতে পাচ্ছে পাগল জলের ভিতর হেঁকে হেঁকে যাচ্ছে 'দু-ঘরের মাঝে অথৈ সমুদ্দুর'। পিছনে পাগলিনি। আজ এই রাতে দুজনের হাতেই লাঠি। লাঠির মাথায় পাখির পালক উড়ছে।

সুমি ফকিরচাঁদের হাত ধরে কফিনের ভিতর ঢুকে প্রসব করার জন্য কাঠের দোকানগুলো অতিক্রম করে গেল। ফকিরচাঁদ দেখল ওদের কাপড়জামা জলে ভিজে সপ সপ করছে। শীত সেজন্য ভয়ংকর। ওরা দুজনে প্রথম জামাকাপড় ছেড়ে ফেলল—এখন ফকিরচাঁদই সব করছে। সুমি অতীব দুঃখে এবং বেদনায় একটা খুঁটি ধরে দাঁড়িয়েছিল। ওদের শরীরে কোনো আবরণ ছিল না। মাচানের নীচে সুমি ঢুকে যেতে চাইল। কিন্তু কফিনের ভিতরে কে যেন ফিসফিস করে কথা বলছে। 'কে! কে!' ফকিরচাঁদ চিৎকার করে যুবকের মতো রুখে দাঁড়াল।

কফিনের ডালা খুলে মুখ বের করতেই বুঝল সেই পাগল, পাগলিনি। ওরা আশ্রয়ের জন্য এখানে এসে উঠেছে।

ফকিরচাঁদ বলল, তোরা সকলে মিলে সুমিকে ধর। সুমির বাচ্চা হবে।

ফকিরচাঁদ এবং পাগল হেমলক গাছটার নীচে বসে থাকল। পাগলিনি মায়ের মতো স্নেহ দিয়ে সুমিকে কোলে তুলে চুমু খেল একটা। তারপর কফিনের ভিতর সন্তানের জন্ম হলে পাগলিনি গ্রাম্য প্রথায় তিনবার উলু দিল। সেই শব্দের ঝংকারে মনে হচ্ছিল সমুদ্র কোথাও না কোথাও আপন পথে অগ্রসর হচ্ছে, মনে হচ্ছিল—এই সংসার হাতির অথবা গণ্ডারের ছবির ভিতর কখনো-কখনো লুকিয়ে থাকে। শুধু কোনো সৎ যুবকের সংগ্রাম প্রয়োজন। পাগল হেমলক গাছের নীচে শেষবারের মতো চিৎকার করে উঠল—'কে আসবি আয়, সংক্রান্তির মাদল বাজছে আয়। 'ফকিরচাঁদ ধূসর অন্ধকারের ভিতর সুন্দর হস্তাক্ষরে শিশুর নতুন নামকরণ করে অদৃশ্য এক জগতের উদ্দেশে নিরুদ্দেশ হয়ে গেল।

['দু-ঘরের মাঝে অথৈ সমুদ্দুর' এবং 'সংক্রান্তির মাদল বাজছে আয়' কবি বিমল চক্রবর্তীর কবিতা থেকে সংগৃহীত]

বুলুর শেষ লুডোখেলা

সিঁড়িতে পা দিতেই অমলেশ টের পেল বিজু এসেছে। বিজুর স্লিপার বারান্দার এক পাশে, ঠিক দরজার মুখে এবং চৌকাঠের বাঁদিক ঘেঁষে থাকে—কারণ এটা স্বভাব বিজুর, সে এলেই তার হলুদ রঙের স্লিপার দরজার বাঁদিক ঘেঁষে রাখবে। অমলেশ দেখল এপাশে বিজুর হলুদ রঙের স্লিপার। দড়িতে ওর মীর্জাপুরি শাড়ি। এসব দেখলেই অমলেশ যেন ভিতরে ভিতরে অস্থির হয়ে ওঠে।

এ-সপ্তাহে বিজুর আসার কথা নয়। বিজু আসছে সপ্তাহে আসবে এমন কথা ছিল। চিঠিতেও তেমন লিখেছে। অথচ সহসা এই চলে আসা, এলেই একটা বিস্ময় নিয়ত খেলা করে বেড়ায়, যেন বিজু তার জন্য গ্রাম মাঠ থেকে নানারকমের ফসল সংগ্রহ করে এনেছে। ছেলে দুটো ঘুমিয়ে পড়লেই সে তার সব সংগ্রহ খুলে দেখাবে।

যা হয় অমলেশের—ওর তখন রা-রা করে গান গাইতে ইচ্ছা হয়। গলা জড়িয়ে চুমু খেতে ইচ্ছা হয়। অথচ সে এখন কিছুই পারছে না। যতক্ষণ না টুলু বলু ঘুমোয়, ততক্ষণ সে চুপচাপ, যেন তার আর তর সয় না, সে যে কী করবে ভেবে পায় না, রান্নার লোকটাকে তাড়াতাড়ি ছেড়ে দিয়ে সে বিজুর পিছু পিছু তখন কেবল ঘুরে বেড়ায়।

অমলেশ বারান্দার একপাশে দাঁড়িয়ে থাকল। বিজুর গলা পাওয়া যায় কিনা শোনার চেষ্টা করল। ভিতরে কোনো সাড়া শব্দ নেই।

অথচ বিজু এলে এমনটা হয় না। চারপাশের যা কিছু অগোছালো, যেমন টুলু বুলুর টেবিল, তার টেবিল, নোংরা ঘরদোর, বিজু এলেই সব পরিপাটি করে সাজিয়ে রাখে। যে ক-দিন থাকে ঘরদোর কী তকতকে ঝকঝকে ! আর বিজু চলে গেলেই সংসার বড়ো অগোছালো হয়ে যায়। ওর পিয়ন এসে দুই ছেলেকে স্কুলে রেখে আসে। বিকেলে সে বাড়ি এসে দুই ছেলেকে নিয়ে পার্কে যায় এবং রাত্রিতে ফিরে এসে ছেলেরা ঘুমিয়ে পড়লে সে একটা ক্রাইম নভেলে মুখ ডুবিয়ে পড়ে থাকে। ঘরদোর সাফসুতরোর ব্যাপারে সে কেমন উদাসীন হয়ে যায় তখন।

আর বিজু এসেই ঘরদোরের অবস্থা দেখে দু-পা ছড়িয়ে ছেলেমানুষের মতো কাঁদতে বসে। তোমাদের এত বলেও পারি না। লোকজন এলে কী ভাবে!

অমলেশের তখন সত্যি হুঁশ হয়—ওদের পড়ার টেবিলটা সত্যি অগোছালো। যেখানে যা থাকবার কথা সেখানে তা নেই। কোনো বই টেবিলের নীচে, কোনোটা খাটের ওপর ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে আছে। পড়ার পর তুলে রাখার কথা ওদের মনে থাকছে না। বুড়ো মাসির পক্ষে এত দেখাশোনা করা কষ্ট। বিজু চলে গেলে সংসারের সবাই কেমন বাউণ্ডুলে হয়ে যায়। আলনাতে জামাকাপড় ভাঁজ করে রাখে না কেউ। কোনো কোনো দিন অমলেশ ভয়ে ভয়ে নিজের টেবিলটার দিকে তাকাতে পারে না পর্যন্ত। বিজু এবার তাকে নিয়ে পড়বে। সে যেন ভয়েভয়েই তখন কতকটা নিজের টেবিলের বইপত্র, লেখার প্যাড সব সাজিয়ে রাখতে গেলে দেখতে পায়, বিজু তেড়ে আসছে—হয়েছে থাক। আর কাজ দেখাতে হবে না, যতক্ষণ আছি করে যাব।

একবার অমলেশের সঙ্গে বিজুর এই নিয়ে কথা কাটাকাটি হয়েছিল। বিজু চলে গেলে অমলেশ এবং টুলু বুলু মিলে খুব সাবধানে থাকল। টেবিল, আলনা, বইপত্র যেখানে যা থাকার রেখে দিল। যেদিন আসবে সেদিন সকালে আর একবার গুছিয়ে রাখল সব।

আর বিজু এসেই দেখল, একেবারে চারপাশটা ঝকমক করছে। কোথায় সে এসব দেখে খুশি হবে, তা না, সে ভয়ংকর দুঃখী মানুষের মতো মুখ করে ফেলল। সে যেভাবে সব রেখে গেছে সব প্রায় তেমনি গুছোনো। বিজুর মনটা টনটন করে উঠল। সে এতটা শাস্তি আশা করেনি। সে সারাক্ষণ কাজকর্ম ছাড়া বাঁচে না। কাজকর্ম করতে করতে একটু বচসা করা ওর স্বভাব। দুই দামাল ছেলে, ঠিক দুজন নয়, ওর কাছে ওরা তিনজন, কারণ সে এ-সময় কখনো অমলেশকে স্বামী বলে ভাবতে পারে না, যেন ঘরে সে তিন দামাল ছেলে রেখে গেছে—ওরা হুটোপুটি করে সব অগোছালো করে না রাখলে তার হাতে কাজ থাকে না—সে চুপচাপ বসে থাকলে মনে হয় বেড়াতে এসেছে এখানে, সে অমলেশের কাছে বেড়াতে এসেছে। সে এ-সংসারের কেউ নয়।

বিজু এসেই সে রাত্রে আর অমলেশের সঙ্গে কথা বলেনি।

কি ব্যাপার! অমলেশ প্রশ্ন করেছিল। এসেই একেবারে মুখ গোমড়া করে বসে থাকলে।

কোনো কথা না বলে বিজু বাথরুমে চলে গিয়েছিল। সে ঘাড়ে গলায় জল দিয়েছিল। অন্যদিন সে যেমন এসেই আয়নায় মুখ দেখে সেদিন সে তাও দেখেনি। হাত-পা ধুয়ে একটা চাদর গায়ে সে পাশ ফিরে শুয়ে পড়েছিল।

অমলেশ বলেছিল, আরে হয়েছে কি তোমার?

বিজু জবাব না দিলে অমলেশ কেমন উদবিগ্ন গলায় বলেছিল, তোমার শরীর খারাপ! ডাক্তার ডাকব।

বিজু আর চুপ করে থাকতে পারেনি। সে ফেটে পড়ল। আহা, বাবুদের চোখে ঘুম নেই। বাস ট্রেন করে এতদূর আসা—বিজুর কি কষ্ট! সব কাজ ওর আমরা করে রাখি! বিজু এবার উঠে বসল। সে তার বড়ো ছেলেকে ডাকল, এই টুলু তোরা সবাই মিলে যে খুব সংসারী হয়েছিস!

ঠিক আছে আর কিছু করব না। তুমি এসে বোকার মতো খাটবে।

বিজুর একটা অদ্ভুত অভিমান আছে ভিতরে। কিছু কথা কাটাকাটি হলেই বিজু বলে, সংসার থেকে তাকে ইচ্ছা করে দূরে সরিয়ে রাখা হয়েছে, যেন ইচ্ছা করলেই অমলেশ তাকে এই বড়ো শহরে নিয়ে আসতে পারে। আনে না, অমলেশের ইচ্ছা নেই তাকে নিয়ে আসার। অমলেশের প্রভাবশালী বন্ধুবান্ধবের অভাব নেই। একটু অনুরোধ করলে কে তেমন মানুষ আছে তাকে অবহেলা দেখায়।

অমলেশ তখন চুপচাপ থাকে। বিজু রেগে গেলে ভীষণ ভয় করে তার। সে কিছুতেই বোঝাতে পারে না, অনেক চেষ্টা করছে কিন্তু সে কিছু করতে পারছে না। সুতরাং আজ এসেই আবার বিজুর তেমন কিছু হল কিনা—কারণ সব চুপচাপ, টুলু বুলুর পর্যন্ত সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না, অমলেশের চোখে-মুখে অস্বস্তির ভাব ফুটে উঠছে। সে ঘরে ঢুকে দেখল পরদাটা নড়ছে হাওয়ায়। এ-ঘরে কেউ নেই। সে দেখল ক্যালেন্ডারে এসেই বিজু একটা দাগ দিয়েছে, আবার সে কবে আসতে পারবে তার নির্দেশ। সে আর মুহূর্ত দেরি করতে পারল না। পরদা ঠেলে শোবার ঘরে ঢুকতেই দেখল, নিবিষ্টিমনে মা এবং দুই ছেলেতে কী যেন করছে। টেবিলের উপর চেয়ার রেখেছে বিজু। টুলু বুলু চুপচাপ টেবিলের পাশে। দু-হাতের ফাঁকে কিছু একটা লুকিয়ে রেখেছে এবং বিজু চেয়ারের উপর দাঁড়িয়ে টুলুর হাত থেকে সেটা নেবার সময় দেখল পিছনে অমলেশ। যেন ধরা পড়ে গেছে এমন সংকোচে সে তাড়াতাড়ি ওটা উপরে রেখে দেবার সময় শুনল অমলেশ বলছে পড়ে গেলে বুড়ো হাড় জোড়া লাগবে না। যেন এসব কথা বিজুকে বলছে না, এই ঘরের দেয়াল, খাট আলনা এসবের উদ্দেশে বলছে।

বিজু কোনো উত্তর করছে না দেখে সে টেবিলের পাসে এসে দাঁড়াল। বলল, নাগাল পাচ্ছ না। দাও আমি রেখে দিচ্ছি।

বিজু যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। বলল, দেখো যেন পড়ে না যায়।

এত মায়া তোমার!

অমলেশ যে এমন একটা খোঁচা দেবে সে যেন জানত। কারণ চড়াই পাখি দুটো যখন প্রথম এ দেয়ালে এসে বাসা বাঁধে, বিজুর কী রাগ। সে এসেই যতবার দেখেছে মেঝেতে চড়াই হেগেমুতে একেবারে যাচ্ছেতাই করে রেখেছে, তখন সে যে কতবার রাগে দুঃখে

পাখি দুটোকে তেড়ে গেছে, আর বলিহারি যাই পাখি দুটোও কী বেহায়া। বিজুকে সারা ঘর ছুটিয়ে মেরেছে, কিন্তু ঘর ওরা ছেড়ে দেয়নি। বিজু প্রতিবার এসেই চড়াই দুটোর বাসা ভেঙে দিত। আর বিজু চলে গেলেই চড়াই দুটো আবার বাসা বানিয়ে নিবিষ্টমনে সুখে-স্বচ্ছন্দে এ-ঘরে উড়ে বেড়াত।

আর এ-ব্যাপারেও বিজু অমলেশকে দায়ী করত। এরই কাজ। যেন অমলেশ শলাপরামর্শ করে বিজুকে এভাবে বার বার জব্দ করছে পাখিদের দিয়ে। সুতরাং বিজু ভেবেছিল, চড়াইর ছানাটাকে অমলেশ আসার আগে আগেই তুলে রাখতে হবে। যাতে অমলেশের কাছে সে ধরা না পড়ে। এবং বিজু এবারই প্রথম বাড়ি এসে সব সাফসুতরো করার সঙ্গে পাখিটার বাসা ভেঙে দেয়নি। সে বরং দেখল পাখির একটা ছোট্ট বাচ্চা নীচে পড়ে আছে। বুলু খেলতে যায়নি। সে সারাক্ষণ বাচ্চাটাকে পাহারা দিয়েছে। কারণ পাশের ফ্ল্যাটের বেড়ালটা ওৎ পেতে আছে, কখন বুলু উঠে যাবে এবং সে খপ করে বাচ্চাটাকে গিলে খাবে।

বিজু তখন এসে দেখল বুলু খেলতে বের হয়নি, যখন দেখল বুলু বলছে দ্যাখো মা বাচ্চাটা এখানে পড়ে আছে, আমি সারাক্ষণ বসে আছি, বাবা এলে বলব তুলে দিতে তখন বিজুর এই ঘরসংসারের মতো বাচ্চাটার উপর চড়াই পাখি দুটোর উপর কেমন মায়া পড়ে গেল!

বিজু টেবিলটার একপাশে দাঁড়িয়েছিল। অমলেশ কতটা যত্ন নিয়ে পাখির ছানাটাকে উপরে রাখছে লক্ষ্য করছে। এতক্ষণ ওরা যা গোপন করতে চেয়েছিল, কারণ বুলু যেন ছানাটাকে রেখে দেবার ভিতর টের পেয়েছিল মা সংগোপনে কাজটা করে ফেলতে চায়। সেও মার মতো বাবা এলে একেবারে সব চাপতে চেয়েছিল। মা এলেই বুলু কেন জানি মাঝে মাঝে আজকাল বাবাকে প্রতিপক্ষ ভাবে। অথবা সে যদি বলে দিত, বাবা পাখির ছানাটা পড়ে গেছে, মা তুলে রাখছে, তবে যেন মা বলবে, তুমি বলে দিলে কেন বুলু? যা রেগে যাবে। রেগে গেলেই মা তাকে পাশে নিয়ে শোবে না। বলবে বুলু আমি আজ বাবার সঙ্গে শোব। তোমার সঙ্গে শোব না। সুতরাং বুলু এতক্ষণ খুব মনোযোগ দিয়ে মার এই কাজ সমর্থন করে যাচ্ছিল। সে বাবাকে দেখেও কিছু বলেনি। মা-কে কেন্দ্র করে বুলুর প্রায়ই তার বাবাকে প্রতিপক্ষ মনে হয়। প্রায় বছর হতে চলল, মা তাকে এখানে রেখে গেছে। আগে বুলু থাকত মার কাছে। কিন্তু এখন সে বড়ো হয়েছে। তাকে পড়াশোনা করতে হবে। বুলু এখন বাবার কাছে থাকে। বুলু এবং টুলু এক বিছানায়—বাবার আলাদা বিছানা, মা এলে কার সঙ্গে শোবে, ওদের সঙ্গে না বাবার সঙ্গে—বুলুর ঘুম আসে না, মা যতক্ষণ না ওকে পাশে নিয়ে শোবে ততক্ষণ সে ঘুমোবে না।

বিজু এলেই বলবে বুলু, মা তুমি কার সঙ্গে শোবে?

তোমার সঙ্গে।

কিন্তু বুলু টের পায় যেন গভীর রাতে বাবা তার প্রতিপক্ষ। তখন চোখে তার ঘুম আসে না। পাশে হাতড়ায়। মা নেই। মা বাবার কাছে পালিয়ে বনবাসে চলে গেছে। সে তখন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে।

তখন অমলেশেরও কেন জানি মনে হয়, ছেলে তার প্রতিপক্ষ। সে বিরক্ত এবং অস্বস্তিতে বলে ওঠে, দ্যাখো তোমার ছেলের কাণ্ড। যেন ঠেলে ফেলে দিতে চায় বিজুকে। বিজুকে সে তুলে দিয়ে নিজে একটা নীল রঙের আলো জ্বেলে বসে থাকে। আর তার ঘুম আসে না। সে তখন একটা ট্রেনের শব্দ পায়। যেন কোনো দূরবর্তী স্টেশনে একটা ট্রেন আটকে গেছে। বার বার ট্রেনটা হুইসল বাজাচ্ছে।

মাঝে মাঝে অমলেশ খুব ছেলেমানুষের মতো বুলুকে বলবে, তোমার মা কতদূর থেকে আসেন। তোমাদের পাশে শুলে ওর ঘুম আসে না। তোমরা ঘুমের ভিতর মাকে বড়ো বেশি হাত-পা ছুঁড়ে মার। তখন বুলু যেন কিছুই শুনতে পায় না। কেবল ওর মনে হয় সবুজ বনের ভিতর একটা লাল রঙের পাখি তাকে উড়ে উড়ে কোথাও চলে যেতে বলছে। সে মাকে ছেড়ে দিতে ভয় পায়। অথচ অমলেশ, বিজুর এমন সুন্দর শরীর, মসৃণ ঘাড় এবং কোমল মুখ দেখে আর স্থির থাকতে পারে না।

অমলেশ বলল, বাচ্চাটার ডানা গজিয়েছে। রাখছি ঠিক, কিন্তু বাচ্চাটা আবার উড়ে পালাবে।

না পালাবে না। তুমি রাখো। বিজু গোড়ালিতে উঁকি দিয়ে দেখল ঠিকমতো অমলেশ রাখছে কি না—ওটা ওর বাপের কাণ্ড।

তুমি জানো খুব। অমলেশ বলল।

ঠিক জানি। বাপটা ঠুকরে ফেলে দিয়েছে।

ফেলে দিয়েছে ত ভালো করেছে। কতদিন আর খাওয়াবে। বাপটা চাইছে, আর কতদিন! এবার উড়ে খাওগে।

ভালো করে উড়তে পারছে কই!

ঠেলে ফেলে না দিলে কেউ উড়তে চায় না।

বাজে বকো না। বলে সে অমলেশের চেয়ারটা শক্ত করে ধরল।

অমলেশ এবার ভয় দেখাবার জন্য বলল, বরং কাল পাখিটাকে পাতাবাহারের গাছটায় রেখে আসব। সে ঠিক নিজের মতো উড়ে চলে যাবে কোথাও।

বুলু এবং বিজু একসঙ্গে প্রায় কান্না জুড়ে দেবার মতো।—তুমি কি পাগল। ভালো করে উড়তে শিখল না এখনো, ওটাকে তুমি ছেড়ে দিয়ে আসবে!

বিজু বাচ্চাটা উড়বার জন্য হাতের মুঠোয় পাখা ঝাপটাচ্ছে। ছেড়ে দেব নাকি! বলে সে বাসাটার ভিতর উঁকি দিল, দেখল, মেয়ে চড়াইটা ওর দিকে তাকিয়ে আছে। এতটুকু ভয় পাচ্ছে না। কিংবা উড়ে যাচ্ছে না। সে এবার বিজুর দিকে তাকাল। একটা শর্তে সে পাখিটাকে তুলে দেবে এবং এখন বিজু চোখের দৃষ্টিতে শর্তটা যেন পড়তে পারছে।

বিজু বুঝতে পেরে বলল, সে হবে।

অমলেশ বলল, হবে বল ঠিক, কিন্তু কিছু হয় না। শুয়ে পড়লেই ভোঁসভোঁস করে ঘুমাও।

বিজু চোখ টিপল। টুলু সব বুঝতে পারবে এমন একটা মুখ করে বাসাটার দিকে তাকাল।

হাতের মুঠোয় পাখিটা রেখে এবার অমলেশ বুলুকে বলল, বুলু তুমি বড়ো হয়েছ।

বুলু বাবার কথায় মার দিকে তাকাল। সে বড়ো হয়েছে কি না মা ঠিক বলতে পারবে।

অমলেশের মাথায় জিদ চড়ে গেছে। সে বলল, তুমি ক্লাস থ্রিতে পড়। ক্লাস থ্রিতে পড়লে মার সঙ্গে আর শুতে নেই।

বুলুর চোখ ছলছল করে উঠল। সে এখন কিছু বলবে না, অথচ ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদবে। বিজুর মনটা তখন ভারি হয়ে আসে। সে যে কার সঙ্গে শোবে ঠিক যেন এ-মুহূর্তে বুঝতে পারে না। কারণ সে সারাক্ষণ ট্রেনে একটা ফসলের মাঠ দেখেছে। এক পাশে দেখেছে একটা সাদা রঙের বাড়ি। বড়ো একটা জানালা খুললে সে দেখেছে দুই ছেলের হাত ধরে মানুষটা দাঁড়িয়ে আছে। তার ভালোবাসার বউ আসছে ফসলের মাঠ ভেঙে। মানুষটার চোখমুখ দেখে বিজু নিজেও স্থির থাকতে পারে না তখন।

বিজু বলল, রাখো। দাঁড়িয়ে আছ কেন?

অমলেশ বিজুর কথা যেন শুনতে পেল না। সে বুলুকে ফের বলল, কি রেখে দেব, না ছেড়ে দিয়ে আসব?

রেখে দাও বাবা।

অমলেশ এখন বুলুকে ভয় দেখাতে পারলে যেন বাঁচে। ভয়, এই যে পাখির ছানা হাতের ভিতর, ছানা ধরে আছি, এখন ছেড়ে দিয়ে আসব তাকে। জঙ্গলে সে উড়ে গেলে, তুমি বুলু কাঁদবে। অথবা অমলেশ বলবে কী না ভাবল, বুলু এসো আজ আমরা আবার বাজিতে বসি।

বুলু আবার বলল, বাবা তুমি রেখে দাও পাখিটা। বুলু, মা কার সঙ্গে শোবে এখনও বলছে না। এবার অমলেশ শেষবারের মতো তার সেই খেলাটার কথায় এল। বলল, ঠিক আছে তবে লটারি হবে।

বুলু অন্য দিন এমন শুনে হাত পা ছুঁড়ে বলত, ঠিক আছে। সে বাবার সঙ্গে লুডো খেলতে বসবে। যে জিতবে, সেই মাকে পাবে। ওর মুখ খুশিতে ভরে উঠত।

ওরা খেলতে থাকল। টেবিলের ও-পাশে দাদা, এ-পাশে মা আর মুখোমুখি সে এবং তার বাবা। ওরা দুই প্রতিপক্ষ। তখন সেই নীল রঙের আলোটা জ্বেলে দেওয়া হয় ঘরে। জানালাটা খোলা থাকে। ঠাণ্ডা বাতাস এলে বিজু কোনো কোনোদিন জানালাটা বন্ধ করে দেয়। কী করুণ দেখায় তখন অমলেশের মুখ। খেলার সময় সে জোরে জোরে হাঁকে ছক্কা পাঞ্জা। সে তার বয়সের কথা ভুলে যায়। ভিতরে ভিতরে মনে হয় শীতে কাঁপছে অমলেশ। বিজু তখন একটা চাদর এনে শরীর ঢেকে দেয় অমলেশের এবং গোপনে হাতে চাপ দেয়। যেন বলার ইচ্ছা, তুমি খেলতে খেলতে এমন ছেলেমানুষের মতো হয়ে যাও কেন! বুলু জিতছে, জিতুক না। বুলু ঘুমোলে আমি ঠিক তোমার কাছে চলে আসব।

সকলের আগে বুলু টেবিলে এসে বসেছে আজ। সে লুডোর ছক খুলে আজ নিজেই গুটি সাজিয়েছিল। মা এবং বাবা খাচ্ছে। টুলু হাত মুখ মুছে তৈরি হচ্ছিল। কারণ সে বাবার পক্ষে চেঁচায়। মা চেঁচায় বুলুর পক্ষে। হারার মুখে টুলু বাবাকে উৎসাহ দেবে। ছক্কা পাঞ্জা, যেন ওরা পাশা খেলায় বসবে এবার। যেন কুরুপাণ্ডবের সভায় পণ রেখে খেলা হচ্ছে, ভালবাসার পণ, মা কাকে বেশি ভালোবাসে, বাবাকে না তাকে। মা এসে বুলুর পাশে সুন্দর শাড়ি পরে বসবে। পাট ভাঙা শাড়ি। মুখে পাউডার। কপালে বড়ো টিপ। মা তার মাথায় হাত রাখলে সে কেমন সাহস পায়। কেউ তাকে হারাতে পারবে না এমন মনে হয়।

বিজু বলেছিল, প্রথম দান বুলুর।

টুলু বলল, সে কেন হবে। রোজ রোজ বুলু আগে খেলবে কেন! প্রথম দান বাবার।

আচ্ছা ঠিক আছে, তোমার। বলে বিজু অমলেশের দিকে তাকাল।

অমলেশ ছকের উপর ঢেলে দিল—ছক্কা।

বিজু দেখল চৌকো উঠেছে। সে বলল, ফুঁঃ।

বুলু খুব সন্তর্পণে চেলে দেখল পাঞ্জা উঠেছে। আবার পোয়া। ছক্কা পড়ছে না গুটি বের হচ্ছে না। অমলেশ পর পর তিনবার কোনো ছক্কা ফেলতে পারল না। বুলু এবার পর পর তিনটা ছক্কা এবং একটা পোয়া পেয়েছে। অমলেশ হাঁ করে বুলুর খেলা দেখছে। মাথার উপর চড়াই পাখি দুটো ঝুঁকে আছে। নীল রঙের আলো। চারটি মাথা টেবিলে ঝুঁকে

আছে। বিজু বুলুকে উৎসাহ দিচ্ছে, টুলু অমলেশকে। মাকে পণ রেখে বাপ-ছেলেতে খেলা হচ্ছে। বেশ খেলছে। কী নিদারুণ খেলা, কী অসীম উত্তেজনা, কারণ ঘাম দেখা যাচ্ছে অমলেশের মুখে। অমলেশ হেরে যাচ্ছে।

কিন্তু শেষ দিকে কী হয়ে গেল। অমলেশ পর পর তিনটে পাকা গুটি বুলুর ঘরে ফিরিয়ে দিল। এবং শেষ পর্যন্ত বুলু হেরে গেলে, অমলেশ বলল, তুমি কাঁদবে না বুলু। এখন কাঁদতে বসবে না। মা তোমার সঙ্গে শোবে। আমি জিতে গেছি ত কী হয়েছে। যেন অমলেশ কত মহান আর উদার। জিতে গিয়েও পণ ফিরিয়ে দিতে রাজি।

বুলু কিছু বলল না। সে উঠে গেল নিজের খাটে এবং শুয়ে পড়ল।

বিজু বলল, তুমি সরে শোবে। আমার জন্য জায়গা রাখবে বুলু।

অমলেশ বিজুর দিকে তাকাল। বিজু তাকাল না। সে পড়ার টেবিল গুছিয়ে রাখছে। এখন অমলেশের শুধু প্রতীক্ষা। বুলু কতক্ষণে ঘুমোবে। ঘুমোলেই সে পশুপাখির মতো নির্বোধের হাসি হাসতে থাকে। এবং অমলেশ অন্ধকারে আজগুবি এক জগৎ তৈরি করে নেয় এই সংসারে—বিশ্বাসই হয় না পশুপাখির চেয়ে তারা তখন অন্ধকারে বেশি কিছু দেখতে পায়।

বিজু বলল, তুমি ওকে হারিয়ে দিলে!

একটু হারতে শিখুক।

বিজু বলল, আস্তে। বুলু শুনতে পাবে। মশারি তুলে বিজু উঁকি দিতেই বুলু পাশ ফিরে শুল। তুমি সরে শোও। না হলে শোব কী করে!

আমার পাশে তুমি শোবে না। বুলু কেমন শক্ত গলায় বলল।

বিজু ভাবল অভিমান বুলুর। সে ওকে বুকে টেনে শুলে সে হাত ছুঁড়তে থাকল। বুলু তার মাকে কিছুতেই আজ পাশে শুতে দিল না। দু-হাত দু-পা ছড়িয়ে জায়গা দখল করে রাখল। এবং বিজু উঠে গিয়ে অমলেশের বিছানায় শুলে মনে হল বুলু ঘুমিয়ে পড়েছে।

মশারির নীচে অমলেশ এত ক্ষিপ্ত হয়ে আছে যে, তার ইচ্ছা করছিল উঠে গিয়ে ঠাস ঠাস করে চড় কসিয়ে দেয়। এত জেদ কেন হবে। অথচ সে জানে বুলুকে মারলে সারারাত বিজু পাশ ফিরে শুয়ে থাকবে। গায়ে হাত দিতে দেবে না। দিতে গেলেই ছ্যাঁৎ করে উঠবে।

বিজুর ঘুম আসছিল না। সে এক পাশ হয়ে শুয়ে আছে। বুলু না ঘুমিয়ে এখন যদি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদত তবে সে যেন ওকে পাশে নিয়ে ঘুমোতে পারত। নদীর পারে কোনো রেল স্টেশনের মতো বুলু ওর কাছ থেকে ক্রমে সরে যাচ্ছে। বুলু বুঝি টুলুর মতো

বড়ো হয়ে গেল। ওর ঘুম আসছিল না। কেমন ফাঁকা ফাঁকা মনে হচ্ছে। এবং বিজুর কেন জানি কেবল এ-সময় কান্না পাচ্ছে।

অমলেশ বলল, কাছে এসো।

বিজু বলল, আমাকে বিরক্ত করবে না। আমি এখন ঘুমোব।

বিজু অমলেশের দিকে পাশ ফিরতেই লেপটা তুলে দিল অমলেশ। জানালা খোলা—টুলু ঘুমোচ্ছে টের পাওয়া যাচ্ছে, বুলু বুঝি এখনো ঘুমোয়নি, তবে না ঘুমোলে সে কথা বলতে পারছে না, না ঘুমোলে বুলু পা নাড়ে, মশারি কাঁপছে এবং এই কাঁপুনি থামলেই অমলেশ বুঝতে পারবে বুলু ঘুমোচ্ছে। সে তখন জোনাকির আলো জ্বালতে বসবে।

বিজুর কিছুই ভালো লাগছিল না। শেষ পর্যন্ত সে আলগা হয়ে শুতে চাইল। অমলেশও কোনো জোর করল না আর। পাশাপাশি দুজন শুয়ে আছে অপরিচিতের মতো। কোনো কথা না। পথে কোনো অসুবিধা হল কি না, ওদের কলেজের সুধাদির কী খবর এবং যা হয়ে থাকে, কিছু না কিছু কথা, খেতে বসে, খেয়ে উঠে, মুখ ধুয়ে এবং বিছানায় শুয়ে—কথার শেষ থাকে না। অথচ আজ চুপচাপ।

শেষ রাতের দিকে অমলেশ টের পেল বিজু ওর পাশে নেই। অমলেশ ধকফড় করে উঠে বসল। বিজু গেল কোথায়! সে বুলুর বিছানা দেখল, না বিজু নেই।

সে যে এখন কী করবে ভেবে পাচ্ছে না। অথচ বারান্দায় এসে দেখল দরজা খোলা।

সে কেমন ভয় পেয়ে ডেকে উঠল, বিজু! বিজু! তারপর সে চিৎকার করবে ভাবতেই দেখল, বিজু পাতাবাহার গাছটার নীচে দাঁড়িয়ে মোমবাতি জ্বালিয়ে কী যেন খুঁজছে।

তুমি কী খুঁজছ বিজু।

পাখিটাকে।

পাখিটা মানে।

সেই বাচ্চা পাখিটা। বাথরুমে যাব বলে আলো জ্বেলেছি। পাখিটা এসে আমার মাথায় বসল। ধরতে গেলাম উড়ে জানালা দিয়ে গাছটায় এসে বসল।

সে ত ভালো হল। উড়তে শিখে গেছে।

অন্ধকারে কোথায় যাবে বলত! ও-তো বেশিদূর উড়ে যেতে পারে না। গাছটার কোনো ডালে বসে আছে কি না খুঁজে দেখছি। বলে বিজু এ-ডাল ও-ডালের ফাঁকে মোমবাতিটা তুলে ধরে বলছে, দ্যাখ তো আছে কি না!

অমলেশ ম্লান হাসল—এসো, ঘরে যাবে। মোমবাতির আলোতে পাখিটাকে খুঁজে পাবে না। কিন্তু বিজু এতটুকু নড়ল না।

ওরা এবার পরস্পর মোমবাতির আলোয় নিজেদের মুখ দেখল। মনে হল ওরা এক দূরবর্তী রেল স্টেশনে দাঁড়িয়ে আছে। একটা ট্রেনের জন্য ওরা অপেক্ষা করছে। এই চেনা মুখ বড়ো অচেনা মনে হচ্ছে বিজুর। বিজু বেশিক্ষণ সেজন্য তাকাতে পারল না। ভয়ে চোখ বুজে ফেলল। বাঁ হাতে মোমবাতি জ্বলছে বিজুর এবং গলে গলে অন্ধকার ওর চার পাশে জোনাকির মতো উড়ছিল। বিজু পাতার ভিতর মুখ লুকিয়ে রেখেছে। মুখটা পাতার ভিতর মোমবাতির আলোতে কাঁপছে। অমলেশ আর স্থির থাকতে পারল না। বিজুকে গাছের নীচে জোর করে সে চুমু খেল। বিজু অমলেশকে চুমু খেল। মোমবাতির আলোতে আর পাখি খোঁজা হল না। বিজুর চোখে জল এসে গেল।

মানিকলালের জীবনচরিত

এতক্ষণে সে নিশ্চিত হল। ঘাম দিয়ে ওর জ্বর সেরে গেল।

কিছুক্ষণ আগেও সে থরথর করে কাঁপছে। এখন কপালে তার বিন্দু বিন্দু ঘাম। যারা ওকে তাড়া করেছিল সে তাদের পিছনে ফেলে চলে এসেছে। সে বার বার পেছন ফিরে তাকিয়েছে—কপালে তার চোখ উঠে গেছে, ওরা ছুটে আসছে। ওরা ওকে ঘিরে ফেলবে। রাস্তার এই জনতা ওর গাড়ি ঘিরে ফেললে, গাড়িটা এবং সে মরে যাবে। অথবা সে এবং গাড়িটা পুড়ে যাবে। পুড়ে গেলে সে আকাশ দেখতে পাবে না, ফসলের মাঠ দেখতে পাবে না। খিস্তি খেউড়, জীবন যে মহান—সে চলার সময় আর কোনোদিন, তা টের পাবে না।

ওর কপালের বিন্দু বিন্দু ঘাম এখন শুকিয়ে যাচ্ছে। লক-আপের বড়ো তালাটা ঝুলিয়ে গোঁফ চাড়া দিচ্ছিল দফাদার। এত ভালো লাগল যে সে পয়সা থাকলে দু-আনার তেলেভাজা অথবা আলুকাবলি কিনে দিত, শক্ত তালা দিয়ে সেপাই তাকে আগুনের হাত থেকে রক্ষা করে গেল। এত বড়ো তালা, লোহার গরাদ এবং শক্ত দেয়াল ভেদ করে ওদের সড়কি অথবা আগুনের উত্তাপ তার গায়ে লাগবে না। ওর কেমন কষ্ট হচ্ছিল ভিতরে। সিপাই চলে যেতেই মনে হল ওর জলতেষ্টা পেয়েছে। গলা শুকনো, মুখে থুথু পর্যন্ত উঠছে না। জিভ দিয়ে ঠোঁট চেটে সে জলতেষ্টা নিবারণের চেষ্টা করল। কেউ কাছে নেই দেখে সে দু-হাতে গরাদ ধরে ঝাঁকি দিল—কতটা শক্ত, ক-টা মানুষের ঠেলাঠেলি সহ্য করতে পারবে দেখার সময় মনে হল, চারপাশে তার অন্ধকার নামছে। পেছনের দিকে যে জানালাটা আছে সেখানে এখনই একটা কি দুটা নক্ষত্র উঁকি মারবে। আকাশে নক্ষত্র উঠে এলেই সে পাশের বেঞ্চে শুয়ে ঘুম দেবার চেষ্টা করবে। যেন সে কতকাল না ঘুমিয়ে আছে। মনে হয় মাস কাল বৎসর কেটে গেছে সে না ঘুমিয়ে আছে। আহা জীবন কী সুস্বাদু। সে কিছুক্ষণ আগেও ভেবেছিল মরে যাবে—সকলে তাকে পিটিয়ে কিংবা পুড়িয়ে মেরে ফেলবে।

ঘটনাটা ঘটে যাবার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের চিৎকারে তার হুঁশ ফিরে এসেছিল। চাকার নীচে সেই মুখ—করুণ মুখখানি। দু-হাত রাস্তার উপর দেবীর মতো ছড়িয়ে দিয়েছে। চাকাটা পেটের উপর উঠে গেছে। শালা আমি এক নম্বরের হারামি। সে নিজেকে গাল

দিল। টের পেলাম না, চাকার নীচে তিনটে বাচ্চা হামাগুড়ি দিয়ে নদী পারাপারের খেলা খেলছে।

সে লক-আপের ও-পাশে নিবু-নিবু আলোটার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল। দেখল হাতে নাগাল পাওয়া যায় কি না লম্ফটা। সে ফুঁ দিয়ে লম্ফটা নিভিয়ে দেবার চেষ্টা করল। ওরা যদি এতক্ষণে এতদূর পর্যন্ত ছুটে আসে, শালা কুত্তার বাচ্চা থানায় দ্যাখো কেমন চুপচাপ লক-আপে বসে আছে, দে, ছুঁড়ে দে, লম্ফটা ভিতরে, কুত্তার বাচ্চা আগুনে পুড়ে মরুক—লম্ফটা নিভিয়ে দেবার জন্য সে প্রাণপণ গরাদের ফাঁকে মুখ রেখে ফুঁ দিতে থাকল। লম্ফটা ছুঁড়ে দিলে ভেতরে তেলের সঙ্গে আগুন মিশে অগ্নিকাণ্ড ঘটাতে পারে। লম্ফটা নাগাল পেলে সে যে করে হোক নিভিয়ে দিতে পারত—যা কিছুর ভিতর মৃত্যুভয় লুকিয়ে আছে সে দু-হাতে দূরে সরিয়ে দিতে পারলে যেন বাঁচে এখন।

সে বেঞ্চটা টেনে অন্য দিকের দেয়ালে নিয়ে গেল। যেন গরাদের ফাঁকে হাত ঢুকিয়ে অথবা বর্শা মেরে কেউ খোঁচা না দিতে পারে। সে যতটা পারল বেঞ্চটাকে পিছনের দিকে ঠেলে দিল। কারণ সে যত দ্রুত গাড়িটা নিয়ে থানার ভিতর ঢুকে পড়েছে তত দ্রুত রাস্তার জনতা এখানে ঢুকে যেতে পারবে না। ওকে ধরার জন্য চারজন লোক সাইকেল চালিয়ে আসছিল। ওরা গাড়ির পেছনে বেগে ধেয়ে আসছে। সে কিছুতেই ধরা পড়বে না। ওরা যদি লাফ দিয়ে বাসটার ভিতর ঢুকে যায় তবুও না। কারণ সে তার সবরকমের কৌশল খাটিয়ে মা জননীরা, মাসিমারা আপনারা নামুন গাড়ি থেকে, গাড়ির চাকার নীচে তাজা প্রাণ, এবার আমাকে দ্রুত পালাতে হবে, এত মানুষজনের যখন ভিড়, যখন আমাকে আপনারা সকলে পুড়িয়ে মারবেন স্থির করেছেন, তখন সবটা শুনুন, গাড়িটাকে সাইড করতে দিন, এই সাইড করার নাম করে সে খালি গাড়ি নিয়ে একেবারে সোজা থানায়—কারণ সে কিছুতেই জনতার হাতে ধরা পড়বে না, ওরা লাফ দিয়ে যদি ভিতরে ঢুকে যায় তবু না। সে কেবল তার সামনের আয়নাটা দেখছিল। চারটা মানুষ যেন সাইকেলে আসছে না, পাখি হয়ে বাতাসে উড়ছে। আয়নার ভিতর ওরা উড়ে উড়ে কেমন বড়ো মাঠে এক সময় অদৃশ্য হয়ে গেল। সে বুঝতে পারল ওরা ওর কাছে হেরে গেছে। সে এবার বেঁচে যাচ্ছে, সে বেঁচে যাচ্ছে। সে স্টিয়ারিঙে শক্ত হয়ে বসেছিল। হাওয়ার আগে গাড়ি ছুটিয়ে সে লোকগুলোকে বেমালুম বোকা বানিয়ে দিয়েছে। রাস্তা শেষ হলেই থানা। সে থানায় গেলে আজ হোক কাল হোক ওরা ওকে শহরে পৌঁছে দেবে।

আহা সে বেঁচে যাচ্ছে। সামনে থানার কাঁটাতারের বেড়া। দুটো একটা প্রজাপতি উড়ছে লতায় পাতায়। এখন শীতের আকাশ নয়। বসন্তের আকাশ। রাস্তায় শুকনো পাতা উড়ছে। সে বেঁচে যাচ্ছে—কী সুস্বাদু জীবন। সে জিভ চেটে চেটে জীবন কত সুস্বাদু তার আস্বাদন নিতে নিতে দেখল, সিপাই মানুষটি লক-আপের তালা খুলছে।

সে বলতে চাইল, আহা এটা কী করছেন? ওদের চিৎকার শুনতে পাচ্ছেন না? ওরা এলেই সোজা ঢুকে যাবে থানায়? বলবে, কুত্তার বাচ্চাকে বের করে দিন। ওকে মারব। একটা কাঁচা প্রাণকে এইমাত্র চেপটে দিয়ে এসেছে। বড়ো হারামি আছে।

সিপাই মানুষটি একঘটি জল রেখে দিল ভিতরে। তার জলতেষ্টা পেয়েছে, সে ঢক ঢক করে জল খেল। সে মনে মনে হাত জোড় করে বলল দয়া করে এই গরাদ আর টানবেন না। তালা খুলবেন না। আজ রাতটা কাটাতে দিন। কাল সকালে আমার মালিক এলে পুলিশ পাহারায় শহরে চলে যাব। আমি আবার নদীর পারে হেঁটে যাব। গাছের নীচে বসে থাকব। দরকার হলে খিস্তি খেউড় এবং সুবি নামে মেয়েটার সঙ্গে র্ঝালা দেব।

সিপাই চলে গেলে সে নিজেই ফের লক-আপ টেনে টেনে দেখল। না খুব কঠিন জায়গা। ভেঙে কেউ ভিতরে ঢুকে যেতে পারবে না। এ-সময় দারোগাবাবুর রসিকতা শোনা যাচ্ছিল। পুলিশের বুটের শব্দ কানে আসছে এবং ব্যারাক বাড়িতে দুজন সিপাই ঢোল বাজাচ্ছে। সে শুনতে পেল কোথাও গুম গুম আওয়াজ উঠছে। সে কি ভয়ে তাহলে মরে যাচ্ছে। চারপাশে অনবরত বিশ্রী শব্দ, ওর বুকটা মাঝে মাঝে ধড়ফড় করে উঠছে—সে কেন জানি স্থির থাকতে পারছে না। সে সারারাত চেষ্টা করেও বুঝি একটু নিদ্রা যেতে পারবে না। কারণ ওরা এলে ওকে কুত্তার বাচ্চা, হারামির বাচ্চা এইসব বলে গাল পাড়তে পারে। সে এই গাল পাড়তে পারে ভেবে যেন সটান হয়ে শুল না। পাশ ফিরে শুয়ে একটা কান খাড়া করে রাখল, কুত্তার বাচ্চা শব্দটা শুনলেই সে জোড় হাত করে ক্ষমার ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকবে। আমার অপরাধ নেবেন না বাবুসকল। আমি না জেনে ওকে হত্যা করেছি। আমার বিশ বছরের ড্রাইভারি জীবনে এমন কোনোদিন হয়নি। আমি ভালো স্টিয়ারিং ধরতে জানি। হালে সহসা পানি না পেলে মানুষের এমন হয়। কিন্তু আমার হালে পানি না পাওয়ার কিছু ছিল না। কারণ আমি আমার অধীনে ছিলাম। গাড়ি আমার থেমে ছিল। আদৌ দেখিইনি ওরা দুজন কি তিনজন হবে উবু হয়ে গাড়ির চাকা দেখছে, চাকাটা ঘুরছে কী করে, কোন জাদুবলে এত বড়ো অতিকায় দানবটা মাঠ পার হয়ে নদী পার হয়ে চলে যায়—। সব সময় ওদের ভিতর এই গঞ্জের মতো জায়গায় এত বড়ো গাড়িটার এক রহস্য ছিল। আমার গাড়ি, আমি এবং কোনো কোনোদিন আমার কথাবার্তা শুনে ওরা হাসত। হাসতে হাসতে বলত, ড্রাইভার সাব অমাগ তুমি পদ্মার পারে নিয়া যাইবা?

যামু। কবে রওনা দিবা কও। সে ওদের মতো করে কথার জবাব দিত।

তুমি ড্রাইভার সাব কবে যাইবা। গাড়িতে চইড়া পদ্মাপারে যাইতে বড়ো শখ যায়।

দিমুনে একবার একটা পাড়ি দিয়া।

ড্রাইভার সাহেব মানিকলালের তখন মনে হত শোভার কথা। সেও বলেছিল, এডারে বুঝি দ্যাশ কয়। আছিল একখানা দ্যাশ আমার পদ্মার পারে। তুমি ত যাও নাই। গ্যালে তোমারে দ্যাখাইতে পারতাম দ্যাশ একখান কারে কয়।

আমি শোভা তোমার দেশে যেতে পারিনি। আমি এখন এই লক-আপে আছি। শুধু এখন এটুকু মনে করতে পারি তুমি আমাকে কোনোদিন ভালোবাসোনি। মানিকলাল কেমন ঢোক গিলে সুর ধরে বলতে থাকল—তোমার মনে ছিল কত আশা আমি তোমারে ঘর দিমু চান্দের মতো মুখখানাতে চুমা দিমু, কিন্তু পারি নাই। সে কেন জানি জায়গায় জায়গায় আজ শোভার মতো ভাবনাচিন্তায় ডুবে যাচ্ছিল। চুমা দিমু যখন কই, তখন দ্যাখি তুমি মুখটারে ঘুরাইয়া রাখছ। —মুখে তোমার মানিক অষুধের গন্ধ ক্যান?

ওষুধ না খাইলে শোভা গাড়ি চালানো যায় না।

মিছা কথা।

হাচা কথাই কই।

কয়ডা লোখ হাচা কথা কয় কও!

ক্যান কয়না?

তোমার মতো মাইনসে দ্যাশটা ছাইয়া গ্যাছে মানিক। একবার লইয়া যাইতে পারতাম। পদ্মাপারে, নদীর জল, ইলিশ মাছ, দেখাইতে পারতাম তবে দ্যাখতাম তোমার রোগডা থাকে কোনখানে?

মানিকলাল বলত, তোমার দ্যাশে বুঝি কোনো রোগ নাই?

থাকব না ক্যান! তোমার রোগে মানুষ ভোগে না মানিক। মাঠেঘাটে বেড়াইলে, নদী-নালা দ্যাখলে, পদ্মার জলে মাছ ধরলে এই রোগডা মইরা যায়। নদীর জলে ডুইবা গেলে মনটা তোমার ভইরা যায়। অষুধ খাওনের আর কাম লাগে না।

লম্ফটা নিয়ে কেউ চলে গেল। আবার অন্ধকারে ডুবে গেল মানিকলাল। চারপাশের ঘন অন্ধকারে সে কিছু দেখতে পাচ্ছে না। বাইরের চাতালে অনেকগুলো মানুষের চিৎকার চেঁচামেচি—ওরা বুঝি এসে গেছে। সে অন্ধকারের ভেতর ঘাপটি মেরে বসে আছে। কেউ টের পাবে না এখন মানিকলাল কোথায়। আর তখনই মনে হল পেছন থেকে ওর মাথায় কে টর্চের আলো ফেলছে। পিছনে দেয়াল, কে আলোটা ফেলছে—সে ভয়ে ছুটবে ভাবল। ওরা ওকে নিতে আসছে বোধ হয়। আজকাল যা দিন পড়েছে ওকে ফিরিয়ে না দিলে থানা-পুলিশ উড়িয়ে দিতে পারে। সে ভয়ে ভয়ে পেছনের দিকে মুখ ফেরাতেই দেখল, উঁচু জানালা থেকে জ্যোৎস্নার আলো এসে এই ঘরে পড়েছে। কোথাও চাঁদ উঠেছে। মাঠ আছে

হয়ত পিছনে। সাদা মাঠ, তারপর কোনো অশ্বত্থ গাছ। গাছের মাথায় চাঁদটা মরা মানুষের চোখের মতো ঝুলছে। সে এবার আশ্বস্ত হল। আর সেই মুহূর্তে সেই অন্ধকার গলি পথটায়, ওর লক-আপের সামনে কারা দল বেঁধে আসছে। একটা আলো ক্রমে দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হচ্ছে। সে টের পেল ওটা বড়ো টর্চের আলো। স্টিমারের আলোর মতো ওর চারপাশটা একেবারে সাদা হয়ে গেছে। সাদা কাপড়ে মোড়া রক্তাক্ত একটা জীবকে ধরাধরি করে কারা এদিকটায় নিয়ে আসছে। ওরা লক-আপের সামনে ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে। আহত বাঘের মতো ওরা ড্রাইভারকে দেখছে। টর্চের আলোটা নিভে গেল সহসা। অন্ধকার চারপাশে, শুধু সেই এক ফালি জ্যোৎস্না, মরা মেয়েটাকে রাখার জন্য দারোগাবাবু আবার হয়ত লম্ফটা এদিকে ঝুলিয়ে দেবার অনুমতি দিয়েছেন—সেই লম্ফের আলো—ফলে অস্পষ্ট অন্ধকারে মানিকলালের চোখ দপদপ করে জ্বলছিল। এবং দূরে কোথাও মাংসের গন্ধ, দারোগাবাবু বিকালে নদীর চর থেকে তিতির মেরে এনেছেন—তিতিরের মাংস রান্না হচ্ছে। লোকগুলো পাশের লক-আপে সেই সাদা চাদরে মোড়া বনবাসী দেবীর মতো ছোট্ট এক বালিকাকে রেখে গেল। লম্ফটা নিয়ে চলে গেলে, শুধু থাকল অন্ধকার, মরা চাঁদের আলো আর বনবাসী দেবী চিৎপাত হয়ে পুঁটলির ভিতর শুয়ে আছে।

কী বড়ো রাস্তা! দু-পাশে ফসলের মাঠ। সে বাস-ড্রাইভার। তার বউর নাম শোভা। শোভা তার ঘর ছেড়ে চলে গেছে সেই কবে। কেবল কথায় কথায় সে বলত তুমি দ্যাখছনি, পদ্মার পার, নদীর জল, ইলিশ মাছ! শোভার কিছু ভালো লাগত না। মানিকলাল নেশা করে ঘরে ফিরত এবং সুবি নামে মেয়েটার সঙ্গে র্যালা দিত। আর ঘরে তার বউ, উদবাস্তু যুবতী নদীর পারে স্বামী এখনও ফিরছে না বলে নেমে যেত, হিজলের ফুল, শালুক পাতা এবং জোয়ারের জল অন্বেষণ করত, উঁচু টিলায় দাঁড়িয়ে বাসটা বড়ো রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে আছে কি না উঁকি দিয়ে দেখত। বাসটা দাঁড়িয়ে আছে, অথচ মানুষটা এখনও ফিরছে না। বাস থেকে নেমে সে যে কোথায় যায়। তখন ড্রাইভারসাহেব নেশার ঘোরে বউকে নদীর পাড়ে দেখলে, বকত। তুই কি ঢুঁড়ে বেড়াস আমি সব জানি।

আমি কি ঢুঁড়ে মরি!

তুই নদীর জল, ইলিশ মাছ, পদ্মার পাড় ঢুঁড়ে মরিস। আমি তোর সব বুঝি। তুই আমাকে ভালোবাসিস না।

শোভা কিছু বলত না। ড্রাইভারসাব বড়ো রাস্তায় নেমে গেলে সে একটা কদমগাছের নীচে দাঁড়িয়ে থাকত। এবং যতক্ষণ না বাসটা চোখের ওপর থেকে সরে যেত ততক্ষণ সে নড়তে পারত না।

শোভার কথা মনে এলেই এসব কথা মনে হয়। পদ্মার পাড়, নদীর জল, ইলিশ মাছ, সূর্যের আলো এসব ছবি মনের ভিতর উঁকি মারতে থাকে। এখন দারোগাসাবের বউ পানের পিক ফেলে মাংসের গন্ধ শুঁকছে। লম্বা ব্যারাক বাড়ির শেষ মাথায় দারোগাসাবের কোয়ার্টার। ড্রাইভার মানিকলাল অন্ধকারে তা টের পাচ্ছে। বুটের শব্দ আসছে এখনো, কেউ বন্দুকের নলে পৃথিবী পাহারা দিচ্ছে। এবং মানিকলালকে দেখলে টের পাওয়া যাবে ওর চুল খাড়া ; চোখ লাল এবং শরীরে ঘামের গন্ধ। ওর গলা শুকনো। থেঁতলানো একটা মাংসের জীব পাশের ঘরে শুয়ে আছে। চোখ নাক মুখ সমতল। সে স্থান কাল পাত্র পরিবর্তন করে গাজির গীতের চাঁদ পাতার মতো চ্যাপটা। সে নাক টানল। রক্ত-মাংসের আঁশটে গন্ধটা ও-পাশের লক-আপ থেকে আসছে কি না দেখার সময় মনে হল দারোগাসাবের বউ তিতিরের মাংস চেটে চেটে সুসিদ্ধ মাংসের স্বাদ নিচ্ছে। এবার ওর গলা থেকে একটা ওক ওঠে এল। রান্না করা মাংসের গন্ধ তাজা মাংসের গন্ধকে সুরুয়ার মতো গিলে ফেলছে।

আলোটা জ্বালা হোক এবার। লম্ফটা না জ্বেলে দিলে ভয়টা বাড়বে। চারপাশটা নিঝুম। বড়ো মাঠের ভিতর এইখানে জানালায় জ্যোৎস্না দেখে মনে হয় এই পৃথিবীর একাংশে সে এবং আট- নয় বছরের ফসলের মাঠ থেকে উঠে আসা বনদেবী চুপচাপ বসে রাত কাটাবার আশায় আছে। সকাল হলে সে যাবে শহরে। মেয়েটা যাবে মর্গে। এখন এমন অন্ধকারে গোটা লক-আপটা প্রায় মানিকলালের কাছে মর্গের মতো। যেন এবার ফসলের মাঠ থেকে উঠে-আসা বনদেবী ওকে ভয় দেখাতে শুরু করবে। সে ভয় থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্য ডাকল ও মেয়ে আরতি, তুমি জেগে আছ না কি! তারপর যেন সে কেমন কাতর গলায় বলল, আহা তুমি যুবতী হলে না, যুবতী হলে তোমার শরীরে কত রকমের ইচ্ছা খেলা করে বেড়াত। ও মেয়ে জেগে আছ না কি? আমি মানিকলাল, বউ আমার পলাতক। পদ্মার পাড়, নদীর জল, ইলিশ মাছ সে খুব ভালোবাসত। আমি ড্রাইভার মানুষ —ওর মন খারাপ হলেই বুঝতে পারতাম, সে কোথাও যেতে চায়।

বস্তুত মানিকলালের ভয়ে ধরেছে। চোখের উপর দৃশ্যটা ভাসছে। চোখ মুখ নাক গলে গিয়ে সমতল, পেট ফেটে হাঁ করে আছে। সে ভয় থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্য ইনিয়েবিনিয়ে কবিতার মতো করে নাকিসুরে কথা বলছে। একাকী নির্জন রাতে ভয় ধরলে মানিকলাল উচ্চস্বরে গান গাইত। এখন সে ভয়ে কবিতার মতো করে কথা বলছে—অ মেয়ে, সে বড়ো ভালোবাসে বৃষ্টিতে ভিজতে, নদীর পাড়ে হাঁটতে, জ্যোৎস্না রাতে বালির ঢলে চুপচাপ বসে থাকতে। আমাকে নিয়ে শোভা এসব করতে চাইত। আমি মানিকলাল সারাদিন নেশার ভিতর ডুবে থাকি, একবার গাড়ি নিয়ে বের হলে ফেরার নাম করি না। সে কেন আমার আশায় বসে থাকবে বল।

মানিকলাল এবার বলল, বারে বা আমি কার সঙ্গে কথা বলছি তবে। আমাকে ভূতে পেয়েছে তবু লোমকূপে শক্ত দানদার সব হিজিবিজি দাগ কাটা, কে যেন সারা শরীরে হাজার হাজার দাগ কেটে চলেছে। ওর ভিতরটা ভয়ে ফুলে উঠছে এবং শরীরের সব লোমকূপ শক্ত হয়ে উঠছে। আর তখনই মনে হল কেউ যেন ডাকছে তাকে। অনেক দূরে ফসলের মাঠ থেকে কে ডাকতে ডাকতে উঠে আসছে। বেশ মজা দারোগাসাবের। লম্ফ নিভিয়ে দিয়ে তেল বাঁচাচ্ছেন। সে যে অন্ধকারে ভয়ে মরছে এবং এ ভয়টা যে আরও ভয়াবহ এটা কেউ টের পাচ্ছে না। সে নিজেও বুঝতে পারেনি মাটির ঢেলার মতো মাংসপিণ্ডটা ওকে এমন ভয় দেখাতে পারে। সে যেন এতদূর অনর্থক বাঁচার জন্য ছুটে এসেছে। পাশে মৃতদেহ বালিকার—সে যাবে শহরে, মেয়েটা যাবে মর্গে—মেয়ের চোখ দুটো ডাগর ছিল, একটা নীল রঙের ডুরে শাড়ি কোমরে প্যাঁচ দিয়ে পরত। হাত-পা শীর্ণ। নরম মুখ। সে গঞ্জের কাছে বাস থামালেই তার জানালায় লাফিয়ে উঠে আসত মেয়েটি, কার মেয়ে কোথাকার মেয়ে—এই গ্রামেগঞ্জে কে তার খবর রাখে। দুটো পয়সা দেবা ড্রাইভারসাব। মুরকি খাব।

ছোটো থাকতে তার পালিয়ে যাওয়া বউটার মুখ হয়ত এমন ছিল। এ অঞ্চলে ধান হয়, যব গম হয়। ফসলের মাঠ থেকে নানারকমের পাখি উড়ে আসে। মেয়েটার বুঝি কাজ ছিল ফসলের খেতে বসে ঢং ঢং করে টিন বাজানো। বসন্তে অথবা গ্রীষ্মেও ওদের কোনো কাজ থাকে না। তখন রাস্তায় এসে দুটো পয়সা ভিক্ষা। গঞ্জের মতো জায়গাটায় হরেকরকমের চাষবাস, মনিহারি দোকান, পাটের আড়ত এবং চাল ডাল মুসুরির গুদাম নিয়ে বেশ আর্থিক সচ্ছলতা। এখান থেকে পদ্মার পার বেশি দূর নয়। দু-ক্রোশ পথ হেঁটে গেলেই নদী, বালির চর, ইলিশের ঝাঁক এবং নানাবিধ গাছপালা যা বাংলাদেশের সীমানা মানে না। মনে সন্দেহ ছিল মানিকলালের, বাঁজা বউ শোভারাণী নদী পার হবার জন্য পালিয়ে এ অঞ্চলে চলে এসেছিল। সে এবার ভয় থেকে মুক্তি পাবার জন্য বলল, ও মেয়ে আমি যে আমার পালানো বউয়ের খোঁজে এই রুটে শেষে কাজ নিয়ে চলে এলাম। এসব কথা তোকে আমি কতবার বলেছি।

মনে হল এই অন্ধকারে কেউ ফিস ফিস করে কথা বলছে। সে কান খাড়া করে রাখল। দেয়ালের পিছনে কি কোনো গাছ আছে, এই ফুলটুলের গাছ। গাছে পাখির বাসা। পাখিরা নড়ছে। সে খচখচ শব্দ শুনে দেয়ালে কান পেতে রাখল। কেউ যেন বলছে, নদীর চর, বালিহাঁস, কুমিরের চোখ ড্রাইভারসাব এনে দিতে পার? মা আমার বালিহাঁসের ডিম কুড়াতে যাচ্ছে বলে বনের ভেতর ঢুকে যেত। আর ফিরতে চাইত না। সেই বন পার হলে বাংলাদেশের সীমানা। মা সেখানে গিয়ে বসে থাকত, মা কেন যে এত কাঁদত ড্রাইভারসাব!

তোমার মা কোথায়?

জানি না। বালিহাঁসের ডিম আনবে বলে সেই যে বনে ঢুকে গেল একবার আর এল না। অনেকদিন ওর বলার ইচ্ছা হয়েছে—তোর মায়ের মুখ কি আমার বউয়ের মতো দেখতে ছিল!

মেয়েটা যেন বলতে চাইত, সংসারে কি এক রকমের মুখ থাকতে নেই।

সে তখন চুপচাপ কি ভাবত। বাসে প্যাসেঞ্জার উঠবে এই প্রতীক্ষায় সে বাস থামিয়ে গঞ্জের মতো জায়গাটায় বসে থাকত। ওদের সঙ্গে সে গল্পে মেতে উঠত—তা তোরা পথেঘাটে থাকিস, রাতে রাতে বড়ো হয়ে যাবি। আমি যেমন শোভাকে ট্রাকে তুলে নিয়ে এসেছিলাম, তোদেরও কেউ না কেউ তুলে নিয়ে যাবে।

হ্যাঁ বয়ে গেছে মানুষের।

মানিকলাল স্পষ্ট এমন কথা শুনল। ও-পাশের লক-আপে মেয়েটা যেন নাকে নথ পরে ঘোমটা টেনে বসে আছে। পাল্কি এলেই উঠে পড়বে। সে বসে বসে মানিকলালের সঙ্গে মশকরা করছে।

আমার সঙ্গে যাবি তুই?

ড্রাইভারসাব কি যে বলে!

তোকে বালিহাঁস, কুমিরের চোখ এনে দেব। তুই পাখি ওড়াতে গিয়ে একদিন দেখবি বড়ো হয়ে গেছিস। তোর তখন নদী সাঁতরে ওপারে যেতে ইচ্ছা হবে।

ও মাঃ ও কিরে! তোর পছন্দ নয় আমাকে। আমার দুটো-একটা চুল দাড়ি পেকে গেছে। তুই বড়ো হলে আরও পাকবে। তাতে কি আছে। কঠিন হাতে নরম মাছ বেছে খাব। একটু থেমে ঢোক গিলে মালিকলাল এমন বলল।

কোনো জবাব পাচ্ছে না ও-পাশের লক-আপ থেকে। মেয়েটা আবার মাংসের পিণ্ড হয়ে গেছে বুঝি। সে বলল, (কথা শুনলে যদি আবার জেগে গিয়ে বউ সেজে নাকে নোলক পরে বসে থাকে) জরুর নেবে। ফসলের খেতে বড়ো হতে হতে তোরা একদিন নদীর পারে হারিয়ে যাবি।

সহসা মনে হল মেয়েটা হা হা করে হাসছে। ওর কথা শুনে হাসছে। তারপর বিকট একটা শব্দ। বাসের চাকাটা পেটে উঠে গেছে। পেটটা ফেটে গেল। অথবা বাসের চাকা মাথায় উঠে গেছে—ফট করে শব্দ। কী যে শব্দ হয়েছিল, চাকাটা পেটে মাথায় উঠে গেলে মানিকলাল ধরতে পারেনি। সে আন্দাজে শব্দের তারতম্য ধরার চেষ্টা করছে।

ভয়ে মানিকলাল আবোল তাবোল বকছিল। অথবা অদ্ভুত সরল দৃশ্য ভেসে উঠতে দেখল অন্ধকারে। রাত গভীর হচ্ছে টের পাওয়া যাচ্ছে। থালাবাসনের শব্দ আসছিল। কেউ হয়ত খেয়ে বাসন মাজছে। সে নানাভাবে নিজেকে অন্যমনস্ক রাখতে গিয়েও পারছে না। ক্রমে ও-পাশের লক-আপে দুটো হাত লম্বা হচ্ছে। লম্বা হতে হতে সাপের মতো দুলে দুলে দেয়ালে বেয়ে উঠে আসছে ওকে ধরার জন্য। এখন হাত দুটো মাথার উপর নুয়ে পড়েছে। সাপের ফণার মতো দুলছে। ওকে সুড়সুড়ি দেবে বলে আঙুলগুলো ফাঁক করছে। আঙুলে সে ফোঁটা ফোঁটা রক্তের দাগ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে। সে ভয়ে চোখ বুজে আছে। অন্ধকারে চোখ খুললেই যেন দেখতে পাবে সেই সরু হাত, ছোটো ছোটো আঙুল ভীষণ লম্বা হয়ে ওর সামনে কৃমির মতো কিলবিল করছে। হাতটা কঙ্কালসদৃশ। এবং কাচের চুড়িগুলি, নীলরঙের কাচের চুড়ি ঝুমঝুম করে কানের কাছে বাজছে। সে ভয় থেকে পালাবার জন্য গরাদের শিক ফাঁক করতে গিয়ে দেখল, একটা আলো। স্টিমারের বাতির মতো আলোটা সরু লম্বা হয়ে এদিকে নেমে আসছে। সেই বড়ো টর্চ জ্বালিয়ে কেউ হয়ত আসছে এদিকে।

মানিকলাল গেটের মুখে গিয়ে দাঁড়াল। কারণ সামান্য আলো এসে পড়েছে গেটের মুখে। সেই আলোই এখন ওর প্রাণরক্ষার নিমিত্ত বরাভয় হয়ে আছে। সে এবার চিৎকার করে উঠল, কে? কে?

একজন সিপাই, অন্যজন বামুনঠাকুর। দারোগাসাহেব কৃপাপরবশে খাবার পাঠিয়েছে। সে দেখল এক থালা খাবার এবং তিতিরের মাংস। লম্ফটা জ্বেলে দিল সিপাই। সে নেড়েচেড়ে তিতিরের মাংস এবং ভাত দেখল। ও-পাশের একটা অবলা জীবের মাংসপিণ্ড থেকে তাজা মাংসের গন্ধ উঠে আসছে। সে চুপচাপ বসে থাকল সামনে খাবারের থালা নিয়ে। খেতে পারছে না। ভাত মাংস এবং জলের ঘটি—এনামেলের থালা বাসন, ও-পাশে রক্তের চাপ চাপ মাংস, কাঁচা এবং ফেসে গেছে—সে ভাত নাড়তে নাড়তে ওক দিচ্ছিল।

কী হল!

মানিকলাল ফ্যালফ্যাল করে তাকাল। পুলিশের লোকগুলি দেখল একেবারে মৃত চোখ কোনো আশা-আকাঙক্ষা নেই। ঝড়ে মরে পড়ে থাকা পাখির মতো চোখ। বাসি, বাদামি রঙের। চোখে যেন দুটো আস্ত পিঁপড়া হাঁটছে। ওরা বলল, বমি পাচ্ছে কেন? জল খাও। গলা শুকনো থাকলে বমি পায়।

চোখে যার পিঁপড়া হাঁটছে—সে খাবে কী? ওরা যেমন এসেছিল—তেমনি চলে গেল। ওরা যেতে যেতে লম্ফটা ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে দিল।

মানিকলাল শুনতে পেল ঝুমঝুম করে কী যেন বাজছে ও-পাশের লক-আপে। কাচের চুড়ি নীল রঙের। মেয়েটার হাত এখন সাপের মতো চার দেয়ালের অন্ধকারে যেন ঘোরাফেরা করছে। ইচ্ছা করলেই হাতটা মাথার ছাদ ফুটো করে উপরে উঠে যেতে পারে। এবং যা কিছু সুন্দর এই পৃথিবীর অথবা সৌরলোকের, তাবৎ সংসার, এই যেমন গ্রহ-নক্ষত্র সব বিনষ্ট করে দিতে পারে। হাত দুটো লম্বা হতে হতে অনেক যোজন দূর উঠে যেতে পারে এবং ফুল ফল তোলার মতো গ্রহ নক্ষত্র তুলে আনতে পারে। অন্ধকারে নীল রঙের চুড়ি আর তাতে জলতরঙ্গের শব্দ। মানিকলাল এসেছিল নিজের প্রাণরক্ষার্থে। কিন্তু এই অন্ধকার, পাশে মৃতদেহ এবং তার থেকে নানারকমের ভয় ওকে পাগলপ্রায় বানিয়ে রেখেছে। সে যেন নিজের এই ভয়কে জয় করার জন্য এই রাস্তায় কবে কখন প্রথম মেয়েটাকে দেখেছিল মনে করার চেষ্টায় আছে।

তা তোর নাম?

আমার নাম আরতি।

তোর মার নাম।

আরতি হাসত তখন। কিছুতেই সে মায়ের নাম বলত না। মায়ের নাম নিতে নেই। নিলে পাপ হয়। সে অন্য কথা বলত, দে ড্রাইভারসাব দুটো পয়সা দে।

কী করবি পয়সা দিয়ে?

মুরকি খাব।

আরতি দু-রকমের ভাষায়ই কথা বলত। সে যখন আর ড্রাইভারসাবের মন গলাতে পারত না, তখন বলত, আমারে নিয়া যাইবা পদ্মার পারে। ঠিক তখন মানিকলালের শোভার কথা মনে হত। সে স্থির থাকতে পারত না। দুটো পয়সা দিয়ে বলত, মুরকি কিনে সবাই মিলে খাবি। আরতির সঙ্গে আরও তিন-চারটি রাস্তায় ঘুরে বেড়ানো, বাপে খেদানো, মায়ে তাড়ানো বাচ্চা ঘুরে বেড়াত। মানিকলাল না বললেও সে কোনোদিন একা কিছু কিনে খায় না। চেয়েচিন্তে যা পায় সকলে মিলে গাছের নীচে বসে মাঠের ফসল দেখতে দেখতে ওরা আহার করে।

ড্রাইভারসাব কথাটা শুনলেই মানিকলাল ভিতরে গর্ব অনুভব করত। সে তখন বলত, তোর মুখে আমার বউ-এর ছাপ আছে। মানিকলাল মনে মনে এই মেয়েকে তা দিয়ে বড়ো করার তালে ছিল।

আরতি এই ন-দশ বছরে বউ কথাটার মানে ধরে ফেলেছে।

মানিকলাল হাসতে হাসতে বলত কোনোদিন, তুই আমার বউ হবি। আমার বাড়ি নিয়ে যাব তোকে।

আরতি কৃত্রিম রাগে ওর চুল টেনে ধরত।

তবে আর পয়সা পাবি না।

রঙ্গ-রসিকতা এমন হত অনেক দিন। কেবল মেয়েটার কাছে মায়ের নাম জানতে পারেনি। বাপের নাম বলতে পারে না। জারজ সন্তান, বাপের নাম না জানলে পাপ নেই।

মানিকলাল বলত, বড়ো হলে তুই যা হবি না মাইরি!

আরতি লজ্জায় মুখ নীচু করে রাখত। তারপর ফিক করে হেসে দিত।—তুমি যে কি বল ড্রাইভারসাব!

আরতি এবং আরও দু-তিনজন বালক-বালিকা এ-গঞ্জে এ-ভাবে ভিক্ষা করে। কখনো জমিতে গোরু-বাছুর তাড়িয়ে বেড়ায়, কখনও গৃহস্থের ফসল পাহারা দিয়ে জীবন অতিবাহিত করে। আর মানিকলালের বাসটা দূর থেকে দেখলেই মাঠের ওপর দিয়ে ছুটতে আরম্ভ করে। এই গঞ্জে যতক্ষণ মানিকলাল থাকবে ততক্ষণ নানারকম হাসি-মশকরাতে, অথবা দু-পয়সা চার-পয়সার মুড়ি-মুড়কিতে সময়টা কেটে যায় তাদের। গাড়ির জানালায় বসে থাকে কোনো কোনো দিন। গাড়িটা যে মানিকলালের নয়। গাড়িটা আরতি এবং এই তিন বালক-বালিকার। ওরা এই গাড়ির উপরে নীচে লুকোচুরি খেলে বেড়ায়। মানিকলাল গতকাল বলেছিল এই তোরা গেছিস ত! যা যা। সে গাড়ির হর্ন বাজাল। তারপর চালাতে গিয়ে দেখল চাকাটা আরতির পেটে মাথায়। শালা এতদিন ওর দিকে তাকাবার কেউ ছিল না। পেটে চাকা উঠে যেতেই গঞ্জের সব লোকদের হুঁশ এসেছে—এক মহাপ্রাণ, এই বয়স আর কত, নয় দশ, কি তার চেয়ে এক দুই এদিক-ওদিক।

সে টপকে ও-পাশের ঘরটাতে যাবার জন্য ছটফট করতে থাকল। সে তো মৃত। হাত দিলে টের পাবে না। মেয়েটার মুখ দেখতে ওর পালিয়ে-যাওয়া বউয়ের মতো। সে বলত এই আরতি তোর মা আর সত্যি ফিরে এল না।

না ড্রাইভারসাব।

আরতি তারপর গল্প করত। কারণ বাসটা সেখানে থামত বিশ মিনিটের মতো। মানিকলালের কথা বলার লোকের অভাব। সে চা খেত একটা চালাঘরে—বিস্কুট কিনে দিত এবং এই করে সময়টা পার হয়ে যেত এবং একদিন সে বলেছিল, তোর মাকে আর বনের ভিতর খুঁজতে গেলি না?

আরতির চোখ মুখ বড়ো বিষণ্ণ দেখতে হত তখন। সে যেন কিছুই বলতে চায় না, বললে এমন শোনায়, সেই ফসলের মাঠ পার হয়ে গেলে বন, বনে কত রকমের লতাপাতা, ফুল ফল, পাখি এবং গাছপালা। বনের ভিতর সে একবার মায়ের সঙ্গে ঢুকে গিয়েছিল। মা বলত, সে তাদের নিয়ে যাবে পদ্মার পারে। সেখানে ওরা পেট ভরে খেতে পাবে। বনটা পার হলেই পুলিশের ক্যাম্প। তারপর সীমানা চলে গেছে। মা তাদের নিয়ে সীমানার কাঁটাতারের বেড়ার গায়ে বসে থাকত। কতদিন কত বিকেলে ওরা বসে বসে দেখত, ও-পার থেকে কত পাখি এ-পারে আসছে। কত লাল নীল রঙের পাখি ও-পারে চলে যাচ্ছে। মাকে দেখলেই মনে হত, মা যেন ও-পারে এসে কী ফেলে চলে এসেছে।

মানিকলালের মনে হল, ও-পাশে মেয়েটা এখন প্রাণ পেয়ে গেছে। প্রাণ পেয়ে পাখি পুবে যায় পশ্চিমে যায় বলে ঘুরে ফিরে নাচছে। এবং কাচের চুড়িতে সেই ঝুমঝুম আওয়াজ। চোখ ভারী ভারী। যৌবনের ঢল নামছে। আরতি একেবারে শোভার মতো হয়ে গেছে। পদ্মার পারে ঘর। দেশের মা-বাবা এদেশের আত্মীয়স্বজনের কাছে শোভাকে রেখে গেল। আইবুড়ো মেয়েকে ক্যাম্পের জীবনে ঠেলে ফেলে দিয়ে চলে গেল। শোভা তার ধূর্ত আত্মীয়ের পাল্লায় পড়ে শেষ পর্যন্ত রাস্তায় নেমে এল। আর তখনই সে যেন দেখল ফুসফাস মেয়েটা মশা হয়ে ওর ঘরে উড়ে চলে এসেছে। তারপর সাদা কাপড়ে নিজেকে মুড়ে মর্গের মতো মমি হয়ে আছে পায়ের কাছে।

মানিকলাল দ্রুত পালাতে চাইল। সে গরাদের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল। সাদা কাপড়ে মোড়া মাংসের ঢেলাটা থপ থপ করে হেঁটে গেল ওর পাশে। সে ছুটে গিয়ে দক্ষিণের দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়াল। আবার আরতি থপ থপ করে হেঁটে আসছে। যেন আরতির মাথামুণ্ডু কিছু নেই, একটা বালির বস্তা হয়ে গেছে। মানিকলাল ভয়ে চিৎকার করে উঠবে এমন সময় মনে হল ওটা আবার মাছি হয়ে উড়ে ও-পাশে চলে গেছে।

মানিকলাল ভয়ে ক্রমে ঠাণ্ডা মেরে যাচ্ছে। তাকে খুব কাতর দেখাচ্ছিল। ওর ভীষণ জলতেষ্টা পাচ্ছে। সে অন্ধকারে ঘটিটা হাতড়াতে থাকল। জল নেই। ছুটোছুটিতে জলের ঘটিটা উলটে গেছে। সে ভাবল, জলের জন্য চিৎকার করবে, কিন্তু মনে হল ওর স্বর বসে গেছে। সে কেমন বোবার মতো অন্ধকারে একটা বাছুর হয়ে গেল।

সুতরাং মানিকলালের কী যে এখন করণীয়—সে তার কিছুই বুঝতে পারছে না! সে ঘেমে গেছে ভীষণ। ওর শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। এই অন্ধকারে মেয়েটা অযথা ভয় দেখাতে শুরু করল! এখানে পালিয়ে এসেও নিস্তার নেই। সে আবার কথা আরম্ভ করে দিল।—তুই আরতি মরে গিয়ে ভয় দেখাচ্ছিস কেন। সকালটা হতে দে। আমার মালিক রাতে রাতে খবর পেয়ে যাবে। মালিক এলে তুই আমি এক সঙ্গে কাল সকালে শহরে চলে যাব।

কোনো জবাব পেল না বলে বলল, তুই তো বলেছিলি একজন পুলিশের বাবু আসত তোর মার কাছে। বর্ডার পার করে দেব বলত।

এমন বীভৎস অবস্থায়ও ওর মুখ থেকে সব খিস্তি শব্দ বের হয়ে যাচ্ছে। সে নিজের ওপর রাগ করে বসে থাকল। এখন আর যেন মেয়েটা জ্বালাচ্ছে না। বেশ চুপচাপ আছে। সুতরাং আবার সেই অনর্থক ছবি চোখের উপর। সেদিন মানিকলাল কী কারণে অসময়ে বাড়ি ফিরেছিল। ঘরে শোভা নেই। নদীর পারে শোভা চুপচাপ বসে আছে। মনে হচ্ছিল দূরে কে যেন বালির চরে হেঁটে যাচ্ছে। এবং ও-পারের ইস্টিশানে বাজনা বাজছে। সে বলল তুই এখানে!

আমি ঘরে যামু না।

তোর এমন হয় কেন। মাঝে মাঝে তুই নদীর পাড়ে এসে বসে থাকিস কেন?

শোভার চোখে জল পড়ত। বাবা-মা তাকে বনবাসে রেখে চলে গেছে। সুন্দর এক যুবক, বয়স তখন তার বিশ-বাইশ হবে—কলেজে পড়ত আলম, খুব ধীরে ধীরে কথা বলত, বড়ো বড়ো চোখে কলেজে যাবার পথে ওদের আমলকি গাছটার নীচে এলেই খুঁজত শোভাকে, শোভা আতাবেড়ার পাশ থেকে বলত, আলম আমি আমলকি গাছের নীচে নাই। ঘরে আছি। জানালায় বইসা আছি। ওর মুখ মনে হলেই শোভা বড়ো আকুল হত। আলমের সঙ্গে একটা ভালোবাসার ঘটনা ঘটে যাচ্ছে—ভয়ে মা-বাবা শোভাকে এ-পারে এসে রেখে গেল। আত্মীয় মানুষটির মজা লুটে খাবার লোভ বড়ো বেশি। তাকে লুটে খেতে এলেই সে তার বাবা-মাকে চিঠি দিত। কিন্তু চিঠির কোনো জবাব আসত না। সেদিন শোভার কি যে হয়েছিল—সে জীবনের সব কথা চিৎকার করে বলতে গিয়ে হাউ হাউ করে কেঁদেছিল—আর শালা সে ত ড্রাইভার, কোথায় সে শোভাকে ভালোবাসায় জয় করবে, তা না, সে পাছায় লাথি মেরে চিৎকার করে উঠল, মাগি তুই এত বজ্জাত রাস্তায় পড়ে থাকতিস ঘরে নিয়ে এলাম। একটা বাচ্চা বিয়োতে পারলি না!

সে রাতেই শোভা পালিয়েছিল। বর্ডার পার হলেই পদ্মার পার, নদীর জল, ইলিশ মাছ, শালুক ফুল। সুখ, সুখ, অন্তহীন সুখ। তার বউটা বাংলাদেশের সীমানা পার হবার জন্য পাগলের মতো নিরুদ্দেশে চলে গেল।

মানিকলালের কিছুই ভালো লাগছিল না। সে দেয়াল বেয়ে কেন জানি উপরের দিকে উঠে যাচ্ছে। কোথায় যেন মানিকলাল টের পেয়েছে বেঁচে থাকার মানে নেই। নাকি মানিকলালের কাছে এই ভয়াবহ রাতের চেয়ে মৃত্যু বেশি কাম্য। সে ক্রমে দেয়াল ধরে উপরে উঠে যাচ্ছে। সে যেন তার এই লক-আপে পালানো বউকে খুঁজছে এখন।

আরতির মুখে এখন দুটো মশা বসেছে। থেঁতলানো মুখ থেকে রক্ত শুষে খাবে বলে হুল ফোটাচ্ছে। সাদা কাপড়ে বাঁধা তবু দু-বার পাছা উঁচু করে ঠোঁট থেকে রস চুষতে গিয়ে দেখল—একেবারে ঠাণ্ডা। শক্ত। মশা দুটো উড়ে মাঠে নেমে গেল। সাদা জ্যোৎস্না মাঠ। মশা দুটো সাদা জ্যোৎস্নায় উড়ে বেড়াতে থাকল।

আরতি তার রক্ত-মাংসের ভিতরই পড়ে আছে। দেখলে মনে হয় সাদা কাপড়ের একটা পুঁটলি। সকাল হলে মানিকলালের সঙ্গে মর্গে যাবে। কারণ মানিকলাল রাতের আঁধারে নানারকমের ভয়ংকর সব ছবি ফুটে উঠতে দেখেছিল, চারপাশের নানারকমের কিম্ভূতকিমাকার আলোর মায়াজাল, মনে হয়েছিল তার সবই অলৌকিক, জীবনযাপনে কোনো আর মানে খুঁজে পাওয়া যায় না—ঠিক শালা হিন্দি ছবির মতো, মাথামুণ্ডু যার কিছু ঠিক নেই, প্রেম, ভালোবাসা, রাহাজানি, খুনের দৃশ্য, মোটর রেস এবং নীল পতাকা নিয়ে ঘোড়া যাচ্ছে। একজন সুন্দর মতো মেয়ে পাশে পাশে গান গেয়ে চলেছে। মানিকলাল কখনো ঘোড়সোয়ারী পুরুষ, আবার কখনও ঘোড়ার পায়ে ওর ঠ্যাং রজ্জুতে বাঁধা। ঘোড়াটা মাঠের উপর দিয়ে ছুটছে। অথবা যুবতীরা ওর চারপাশে নাচছিল—কত হাজার লক্ষ যুবতী, যাদের কোনো স্পষ্ট মুখ নেই, অবয়ব নেই—গাজির গিদের চাঁদপাতার মতো চ্যাপটা নাক, চোখ মুখ সমতল, হাত পা শরীর কাগজের মতো ফিনফিনে পাতলা—তারা ওর চারপাশে নাচছিল—যেন তারা প্রত্যেকেই এক একজন শোভা। আর কেন জানি মনে হল তার ফসলের খেতে তখন পাখি উড়ছে। বর্ডার পার হবে বলে শোভা বসে আছে। কারা নিয়ে এল সেই যুবতীকে বর্ডার পার করে দেবে বলে। অথচ ফুসলে তাকে এপারেই রেখে দিল —কোথায় আর যাবি? বর্ডার পার হলে পদ্মার পাড়, ইলিশের ঝাঁক আর খুঁজে পাবি না। এই ত আছিস বেশ। ক্যাম্পের ভাত রেঁধে দিবি, মুরকি খাবি। মাঝে মাঝে ঠ্যাং তুলে চিৎপাত হয়ে শুয়ে থাকবি। আমরা পুলিশের বাবুরা তোকে পদ্মার পার, ইলিশের ঝাঁক, নদীর জল সময় হলেই দেখিয়ে আনব।

মানিকলাল এইসব দৃশ্য দেখতে দেখতে কেমন পাগল হয়ে গেছে। সারাক্ষণ গারদের ভিতর সে পাগলের মতো অন্ধকারে ছুটোছুটি করেছে। বনবাসী দেবী তাকে হাত ধরে একসময় কোথায় যেন তুলে নিয়ে এল। একটা ডালে সজীব নীল রঙের লতা—সেই লতার পোশাক তাকে পরতে বলল। এবারে তুই নীচে ঝাঁপ দিবি। দেখবি সাধের জীবন হরেক রকম বাঁশি বাজায়।

বনবাসী দেবীর কথামতো মানিকলাল নীল রঙের লতার পোশাক পরে বড়ো প্ল্যাটফরমে শেষ ট্রেন ছেড়ে দেবার বাঁশি বাজাল।

দেবী দর্শন

আজকাল টের পাচ্ছি, জীবনের সব বিস্ময় কেমন ক্রমে হারিয়ে যাচ্ছে। কিছুই আর অসম্ভব মনে হয় না। অথবা মনে হয় না, এরপর আর কিছু থাকতে পারে না। অহরহ পৃথিবীটা বদলাচ্ছে। আজ যেখানে দাঁড়িয়ে আছি, কাল সেখানে নেই। এক জীবনে মানুষ সব পায়, আর এক জীবনে সে সব হারাতে থাকে। টের পাই আমার হারাবার পালা বুঝি শুরু হয়েছে। ভয় লাগে। নিজের মধ্যেই কে যেন কথা কয়ে ওঠে, জীবন, জীবন রে!

তখন হাহাকার বাজে ভিতরে। শরতের নীল আকাশ, কাশফুলের ওড়াউড়ি, হেমন্তের মাঠ সব যেন বড়ো অর্থহীন। নিজের জানালায় বসে থাকলে আর একটা পৃথিবীর কথা মনে হয়। বড়ো আগেকার ছবি, যেন গত জন্মের ছবি। দূরে দেখতে পাই, কেউ সাইকেল চালিয়ে যাচ্ছে। পেছনে আমরা।

এ সব সেকালের গ্রামবাংলার কথা। আমাদের স্মৃতির কথা। শৈশবের কথা। আমাদের বড়ো হওয়ার কথা।

বাড়ি থেকে নামলেই ছিল গোপাট, দু-পাশে হিজলের গাছ। গ্রীষ্মের দুপুরে হিজলের নিবিড় ছায়ায় ঘাসের উপর কতদিন ঘুমিয়ে পড়েছি। কখনো দূর থেকে আসত গোপাল ডাক্তার। তার সাইকেলের ক্রিং ক্রিং ঘন্টিবাজনা শুনলে আমরা যে যেখানে থাকতাম জেগে যেতাম। হ্যামলিনের বাঁশিওয়ালার মতো মনে হত তাকে। সাইকেলের ঘন্টির শব্দ আমাদের চঞ্চল করে তুলত। যতদূর সাইকেল যায় ততদূর আমরা ছুটি। গোপাল ডাক্তার আর তার সাইকেল গোপাট পার হয়ে নদীর পাড়ে হারিয়ে যেত।

যতক্ষণ দেখা যায় দেখেছি। ধীরে ধীরে অনেক দূরের আকাশের নীচে সাইকেলটা এবং গোপাল ডাক্তার। সাইকেল, গোপাল ডাক্তার ক্রমে ছোটো হতে হতে বিন্দুবৎ হয়ে যেত। চোখের উপর তখন নাচত সেই বিন্দু। আমরা বলতাম, এখনো দেখা যাচ্ছে। কেউ বলত, না, আর দেখা যাচ্ছে না। মিছে কথা। আমি বলতাম, হ্যাঁ দেখা যাচ্ছে। এই নিয়ে তারপর আমাদের মধ্যে মারামারি পর্যন্ত শুরু হয়ে যেত। ফেরার সময় মনে হত গোপাল ডাক্তার আমাদের সব নিয়ে চলে গেল। আমরা ভারি মনমরা হয়ে যেতাম।

আর আসত হরিপদ কবিরাজ। ঘোড়ার পিঠে চড়ে আসত। মাথায় সোলার হ্যাট। ধুতির নীচে শার্ট গোঁজা। ঘোড়ার দুপাশে দুটো পাসিংশো টিনের সুটকেস। তাতে সব ছোটো ছোটো শিশি। হলুদ লাল নীল সব বড়ি। তার আসার খবর পেলে দল বেঁধে পুকুরপাড়ে গিয়ে দাঁড়াতাম। উঁচু ঢিবির মতো জায়গায় উঠে কিংবা গাছের ডালে চড়ে চিৎকার—ওই আসছে।

বাড়ির সামনে যতদূর চোখ যায় ফসলের জমি গ্রীষ্মের উরাট হয়ে আছে। ওর ঘোড়া আসত উরাট জমিনের ধুলো উড়িয়ে। বল্লভদির মাঠে প্রথমে বিন্দুর মতো কাঁপত। তারপর দিগন্তে লাফাত একবার উপরে, একবার নীচে। পর্দায় যেন একটা কালো বিন্দু নাচানাচি করছে। তারপর বিন্দুটা ক্রমশ বড়ো হতে থাকত। যত কাছে এগিয়ে আসত, তত বিন্দুটা একসময় বড়ো হতে হতে হরিপদ ডাক্তার আর তার ঘোড়া হয়ে যেত। আমাদের এমন আবিষ্কারের কথা কোনো বইয়ে লেখা আছে কিনা আজও জানা নেই।

হরিপদ কবিরাজ আমার মামার বাড়ির লোক। সে গ্রীষ্মে বসন্তে তার ঘোড়া নিয়ে বের হত। দূর দূর গাঁয়ে চলে যেত। দশ ক্রোশ বিশ ক্রোশের মহল্লায় সে আর তার ঘোড়া। ঘোড়ার পিঠে বোঁচকাবুঁচকি। রুগীবাড়িতে স্নানাহার। গাঁয়ের কার কী অসুখ সবকিছু খবর নিয়ে ওষুধ দিয়ে স্নানাহার। কখনো রাত হলে নিশিযাপন। সকাল হলে সে আর তার ঘোড়া আবার বের হয়ে পড়ত।

হরিপদ কবিরাজ আমাদের গাঁয়ে বছরে, দুবার আসত। গ্রীষ্মে ঘোড়ায় চড়ে, বর্ষায় নৌকো করে। নৌকোয় দুজন মাঝি। কাঠের পাটাতনের উপর ছোটো জানালা দেওয়া কাঠের ঘর। জানালাটি আরও ছোটো। ভিতরে ইজিচেয়ার, তাতে তার কাজের শেষে বিশ্রাম। একপাশে আলমারি। তাতে কাচের সব বোয়েম। চ্যবনপ্রাশ থেকে ভাস্কর লবণ সব সাজানো। ঝড়জলে কবিরাজের ছোট্ট ময়ূরপঙ্খী নৌকো নদীর জলে ভেসে যাচ্ছে। ঘাটে ঘাটে নৌকো ভিড়িয়ে ওষুধ ও রুগীর খোঁজখবর, পথ্য সব ফিরি করে আবার যাত্রা। নৌকোতেই খাওয়াদাওয়া, ঘুম। মাস দু-মাসের জন্য কখনো পুরো বর্ষাকালটাই বাড়ির বাইরে। সারা পরগনা জুড়ে তার এই ওষুধ ফিরি।

ঘাটে নৌকো বাঁধলেই খবর হয়ে যায়, এসেছে। আমাদের কাজ ছিল তখন বাড়ি বাড়ি খবর পোঁছে দেওয়া। ছোটোকাকা কবিরাজমামাকে বৈঠকখানায় নিয়ে বসাতেন। সাদা ফরাসে তিনি পদ্মাসনে বসে কার কী অসুখ, কী পথ্য হবে, ওষুধের বড়ির সঙ্গে কী অনুপান হবে, সব বলে দিতেন। নাড়ি দেখতেন চোখ বুজে। একটা লোক এলে গাঁয়ের সব রোগ-শোক-জরা কেমন নিমেষে উধাও হয়ে যেত। যারা মরে যাবে কথা ছিল, তারাও হরিপদ কবিরাজের নাম শুনে বিছানায় উঠে বসত। সাক্ষাৎ ধন্বন্তরি। আমাদের নিজের চোখে দেখা, হরিগোপালের বাবাকে তুলসীতলায় রাখা হয়েছে। হেঁচকি উঠছে। ওটা শেষ

হলেই ব্রহ্মপুত্রের পাড়ে নিয়ে যাওয়া হবে। কানে কানে কে বলল, হরিপদ কবিরাজ এয়েছেন। সঙ্গে সঙ্গে কাজ। হেঁচকি বন্ধ হয়ে গেল।

এমন ধন্বন্তরি আমরাই দেখেছি। নৌকোটি চলে যাবার সময় শেষবারের মতো ধন্বন্তরির পরামর্শ। ঘাটে ভিড়। হরিপদ কবিরাজ কী গাছের কোনো মূলে সঞ্জীবনী সুধা আছে, তার খবর দিয়ে যেতেন। বলতেন, ঈশ্বর অসুখবিসুখ দিয়েছে, তার নিরাময়ের ব্যবস্থায় রেখেছেন সব তরুলতা, লতাগুল্ম। যা শুধু মাটিতেই জন্মায়। মধু খেতে বলতেন বয়স্কদের। মধু নাকি রক্ত উষ্ণ রাখতে ভারি সক্ষম। স্বর্ণসিন্দুর পুড়িয়া করে দিতেন বুড়োদের। দীর্ঘ জীবনলাভের এটা নাকি একটা মোক্ষম উপায়। দল বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকত সবাই। কিংবা আমাদের বৈঠকখানায় যে ক-দিন থাকতেন, প্রায় মেলা বসে যেত যেন। মানুষজন নৌকোয় আসছে। ঘাটে শুধু তখন নৌকো আর নৌকো। আর সেসব যে কত রকমের নৌকো। আমরা নৌকোয় উঠে লাফাতাম। একটা থেকে আর একটায় লাফিয়ে যেতাম। কবিরাজমামা বাড়িতে, জলে ডুবে গেলে ভয় নেই, আগুনে পুড়ে গেলে ভয় নেই। অসুখবিসুখ আমাদের বাড়িতে ঢুকতেই সাহস পাবে না। ফলে হরিপদ কবিরাজের মতো বিস্ময়কর মানুষ আর দুটো আছে পৃথিবীতে তখন আমাদের জানা ছিল না।

সেই কবিরাজমামার বাড়ি দেখার জন্য একবার বায়না ধরেছিলাম। পুজোর ছুটিতে মামাবাড়ি গেছি। ছোটোমামাকে বললাম, আমাকে কবিরাজমামার কাছে নিয়ে চলো। ছোটোমামা বললেন, বাড়ি নেই। ওষুধ ফিরি করতে বের হয়েছে শ্রাবণ মাসে। এখনো ফেরেননি। মহালয়ায় ফিরবেন। আমার ত বাড়িটা দেখার ইচ্ছে। মানুষটাকে ত দেখাই আছে। বললাম, চলো না মামা। দেখব। কেমন বাড়িতে থাকেন। এমন সুন্দর মানুষ আমার কবিরাজমামা, এমন বিস্ময়কর মানুষ আমার মামা, তার বাড়িটা না জানি কী! দাদু বললেন, যাবে তো, কিন্তু গিয়ে আবার আটকে না যাও। যা একখানা বাড়ি। হরিপদর নানারকমের গাছপালার বাই। ওটা ত বাড়ি না একখানা জঙ্গল। জঙ্গলে হারিয়ে গেলে খুঁজে পাওয়া যাবে না। দাদুর কথা শুনে আমার আরও কৌতূহল বেড়ে গেল। জঙ্গলে হারিয়ে যাবার ভয়েই হয়ত এতবার মামাবাড়ি এসেছি একবারও ছোটোমামা কবিরাজবাড়ির দিকে নিয়ে যায়নি। ছোটোমামাকে চেপে ধরলাম, চলো না মামা।

ছোটোমামা বললেন, মুশকিল। কামড়ে না দেয়!

কামড়ে দেবে কেন! বাঘ আছে জঙ্গলে।

বাঘই বলতে পারিস। দুটো ডালকুত্তা আছে। সারা বনটায় দাপাদাপি করে বেড়ায়। চোরের উৎপাত খুব। গাছপালা সব কে চুরি করে নিয়ে যায়। কত কষ্ট করে সব সংগ্রহ

করা। কেউ গাছের ছাল তুলে নিয়ে যায়। ছাল দিয়ে সালসা বানালে পরমায়ু বাড়ে। পরমায়ু কার না বাড়াবার ইচ্ছে।

আমরা মামাবাড়ি এসেছি মহালয়ার আগে। মণ্ডপে দুর্গাঠাকুর বানাচ্ছে নবীন আচার্য আর তার ছেলে। খড়বিচলির কাজ কবেই শেষ। এক মেটের কাজও শেষ। দোমেটের কাজ চলছে। আসলে স্কুল ছুটি না হতেই মার সঙ্গে মামাবাড়ি আসার একটাই কারণ। মণ্ডপে ঠাকুর বানানো দেখার বড়ো কৌতূহল। আমরা সেজন্যে এবারে আগেই চলে এসেছিলাম। কত রকমের লোকজন আসছে। দিবাকরমামা দাদুর তালুকের আদায়পত্র করে। তাঁর সারাদিন ছোটাছুটি। আমরা ভাইবোনেরা দঙ্গল বেঁধে বসে থাকি মণ্ডপে। সাদা রং দেবার সময় হলেই নাওয়া-খাওয়ার কথা ভুলে যাই। একটা ঝুড়িতে ঠাকুরের মুণ্ডু সব আলগা করা। মুণ্ডু বসিয়ে দেবার দিন কাকভোরে উঠে পড়তাম। কী জানি যদি মুণ্ডু বসানো দেখা শেষ পর্যন্ত ভাগ্যে না জোটে।

বড়ো উঠোনের একপাশে দোতলা বাড়ি। উঠোনের পুবে আটচালা মণ্ডপ। পশ্চিমে চক-মেলানো টিনের চালাঘর। অতিথি অভ্যাগতরা এলে থাকে। দক্ষিণে একতলা বিশাল একখানা দালান। ওটার একটায় সাদা ফরাস পাতা। মাথায় ঝাড়লণ্ঠন। তাকিয়ায় হেলান দিয়ে দাদু বসে থাকেন। পাশের ঘরটা বৈঠকখানা। নানারকম টেবিল চেয়ার বাতিদান। সব মিলে এক আশ্চর্য আতরের গন্ধ। এত সব বিস্ময়ের মধ্যেই কেন যে কবিরাজমামার বাড়িটা দেখার শখ হল বুঝি না।

ছোটোমামা বললেন, বিকেলে নিয়ে যাব। রেডি থাকিস।

আর তখনই রাঙামাসি বলল, ঠাকুরের শাড়ি পরানো হবে, দেখবি না।

বড়ো দোটানায় পড়া গেল। রং তুলি সব এনে সকাল থেকেই জড় করেছে নবীন আচার্য। যে ক-দিন ঠাকুর বানায়, নবীন আচার্য কারো হাতে খায় না। মণ্ডপের এক পাশে পেতলের হাঁড়িতে আতপ চালের ভাত, ঘি আর সেদ্ধ। নবীন আচার্যের ছেলেই ফুটিয়ে দেয়। বাপ-বেটায় খায়। আজ নাকি তাও হবে না। উপবাস। তিনটে দিন প্রতিমা তৈরিতে বড়ো সতর্ক থাকতে হয়। এক শাড়ি পরানোর দিন, দুই, চক্ষুদানের দিন এবং তিন, গর্জন লেপার সময়। নিয়ম অনিয়ম বলে কথা। কোথায় কখন খাঁড়া আটকে যাবে অনিয়মে সেই ভয়ে তটস্থ সবাই।

ছোটোমামাকে বললাম, শাড়ি পরানো হবে, দেখব না?

তবে তাই দেখ। আমি কিন্তু আর নিয়ে যেতে পারব না। সময় হবে না।

অগত্যা আর কী করা! বিকালেই ছোটোমামার সঙ্গে কবিরাজমামার বাড়ির দিকে হাঁটা দিলাম। মামা বললেন, ঘাবড়ে যাস না। শহরে থাকলে এমনই হয়।

এসব কথা কেন! শহরে থাকলে কী হয়? প্রশ্ন করলাম। আর কারা শহরে থাকে তাও জানতে চাইলাম।

মামা বললেন, কবিরাজদার দুই মেয়ে রাণী ভবানী। শহরে মামাবাড়িতে মানুষ। বাড়িতে জুতো পরে থাকে। ফ্রক গায়ে দেয়। সাদা ফ্রক। আমার দাদুর কথা তুলে বললেন, জানিস ত বাবা আমার সেকেলে। এসব পছন্দ করেন না। ফ্রক পরা দেখে কবিরাজদাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। এটা ঠিক না হরিপদ। তোর মেয়েরা বড়ো হয়েছে। ফ্রক পরা ঠিক না।

দাদু আমার বড়ো রক্ষণশীল মানুষ জানি। কত বড়ো হলে ফ্রক পরতে হয় না এটি আমার তখনো ভালো জানা নেই। এসব নিয়েই বোধ হয় রেষারেষি আছে দুই পরিবারের মধ্যে। কিংবা হরিপদ কবিরাজ দাদুর চেয়েও প্রভাবশালী হয়ে যাচ্ছেন বলে বোধ হয় ভেতরে টান ধরেছে। সে যাহোক,—যেতে যেতে আবার মামা বললেন, জানিস ত মেয়ে দুটো বেড-টি খায়।

বেড-টি? সে আবার কী?

আরে সকালে উঠেই চা খায়।

চা খায়! বল কী মামা! বিস্ময়ে হতভম্ব! দাদুর এত পয়সা, কই চা হয় না তো! সকালে কলা মুড়ি দুধ, ছোটোরা ঘি ভাত আর কৈ মাছ ভাজা আলুসেদ্ধ না হয় পটল ঝিঙে সেদ্ধ। নরম সুগন্ধ আতপ চালের ভাত আর ঘি সে বড়ো সুস্বাদু আহার। এ-সব ফেলে চা খায়! তাও ওরা ছেলে নয়। ছেলে হলে অনেক কিছু মানিয়ে যায়। মেয়ে হয়ে এত বড়ো নেশা করে।

বললাম, কবিরাজমামা কিছু বলে না?

জানিস না কবিরাজদাও চা খায়! দুপতারার বাজারের কৈলাস মুদি নারায়ণগঞ্জ থেকে ব্রুকবন্ডের প্যাকেট আনিয়ে দেয়।

সত্যি দেখছি, আমার কবিরাজমামার বিস্ময়ের অন্ত নেই। আর তখনই মামা বললেন, এসে গেছি। বনটার শুরু।

সত্যি বন বলা যায়। বড়ো বড়ো অর্জুন গাছ, চন্দন গোটার গাছ, হাতির শুঁড়ের গাছ, জায়ফল দারচিনি কি গাছ নেই। বনটার ভিতর দিয়ে যেতে যেতে মামা আমাকে গাছ চেনাচ্ছিলেন। একবার শুধু বললেন, ডালকুত্তা ঘুরছে না কেন! বনটার ভিতর দিয়ে যেতে গা আমার ছমছম করছিল—বাসক গাছের ঝোপ—আট দশটা বড়ো বড়ো শিউলি ফুলের গাছ, পাশে বিঘেখানেক জমি জুড়ে বাসক গাছের জঙ্গল, জায়ফল হরিতকীর গাছ সব প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড। আর সব কাঠবেড়ালি এ-গাছ ও-গাছে। পাখপাখালি কত—কেমন এক তপোবনের মতো জঙ্গলের মধ্যে বাড়িটা উদ্ভাসিত হয়ে উঠলে আমার মুখে রা সরছিল না।

তারপরের দৃশ্যটা দেখে আরও মুহ্যমান অবস্থা। একটা লাল রঙের ঘোড়া, সবুজ লন, দুটো মেয়ে সাটিনের ফ্রক গায়ে দিয়ে ঘোড়া চড়া শিখছে। আমি আর হাঁটছি না। মামা ডাকলেন, এই আয়। দাঁড়িয়ে থাকলি কেন! আমি যে কেন দাঁড়িয়ে আছি মামা বুঝছে না। মেয়ে দুটো নীল রঙের চটি পরে আছে। কী লম্বা মেয়ে দুটো! টকটকে ফর্সা রং। ফ্রক গায়ে দিয়ে আছে যে বোঝাই যায় না। গায়ের রঙের সঙ্গে সাটিনের ফ্রক একেবারে মিশে গেছে। যেন ডানা লাগিয়ে দিলেই এক জোড়া পরি। পরিরা এমনই হয় বোধ হয়। নাকি দাদুর কথাই ঠিক। হরিপদ কবিরাজের বনটায় পরি ঘুরে বেড়ায়। সেখানে ছেলে ছোকরাদের ঘোরাঘুরি ঠিক নয়।

মামাকে দেখেই ওরা দৌড়ে এল। কীরে বোধাদিত্য, তুই!

মামা বললেন, আমার সেজ ভাগ্নে। তোদের বাড়িটা দেখতে এয়েছে।

তাই নাকি আয় আয় বলে আমাকে জড়িয়ে ধরল। কী সুন্দর গন্ধ শরীরে। আমার বড়ো লজ্জা লাগছিল। নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে ছুটতে চাইলাম। কিন্তু ছোটোটা আমার হাত খপ করে ধরে ফেলল। বলল, তোকে আর ছাড়ছি না। কি মিষ্টি দেখতে রে তুই! বুধ ভিতরে যাবি না? বসবি না? এত বড়ো মেয়েরা মামার সঙ্গে এভাবে কথা বলতে পারে আমার মাথায় আসে না। ছোটোমামা বলল, কুকুর দুটো দেখছি না।

ওদের এখন মেটিংয়ের সময়। আকবর ঘরে আটকে রেখেছে।

আমি বললাম, মামা মেটিং কী?

আমার কথা শুনে রাণী ভবানী খিলখিল করে হাসতে থাকল।

মামা মেটিং বিষয়টা আমাকে না বুঝিয়ে অন্য কথায় এলেন। চল দেখবি ভিতরে একটা প্রকাণ্ড শিংয়ালা রামছাগল আছে।

রাণী বলল, সজারু দেখবি?

এত কিছু আছে বাড়িটাতে জানিই না। সজারু দিয়ে কী হয়! বড়ো শিংয়ালা রামছাগল দিয়ে কী হয় কিছুই জানা নেই।

বললাম, তোমরা ওগুলো রাখ কেন!

বারে, বাবার ওষুধে লাগে। কবিরাজি তেলে ওদের চর্বি দরকার হয়।

বাড়িটা সত্যি ছবির মতো। লাল ইঁটের দালান। সামনে বড়ো লন। দাগ কাটা চুন দেওয়া। ব্যাডমিন্টন খেলার জায়গা। পাশে ডিসপেন্সারি। বারান্দায় অতিকায় সব উদূখল। বড়ো বড়ো শীতলপাটিতে গাছের শেকড় ছাল সব শুকানো হচ্ছে। একজন লোক উবু হয়ে হামানদিস্তায় ছাল শেকড়বাকড় গুঁড়ো করছে।

ছোটোমামার কত ছোটো আমার রাঙা মাসি। শাড়ি পরে। মেয়েরা বড়ো হলে ফ্রক পরে না। বড়োরা খারাপ পায় এতে। এত সুন্দরের মধ্যে ওটুকু খুঁত থাকবে কেন ভাবতেই কেন যেন বলে ফেললাম, তোমরা ফ্রক পর কেন? শাড়ি পরতে পার না!

রাণী আমাকে আবার জাপ্টে ধরতে এল। চুকচুক করল ঠোঁটে। বলল, হ্যাঁ পরি। রাতে পরি।

ভারি তাজ্জব কথা। রাতে শাড়ি পরে দিনে পরে না। ভ্যাবলুর মতো তাকিয়ে বললাম, রাতে শাড়ি পর কেন!

আবার খিলখিল হাসি দু-বোনের। ছোটোমামা পাশে হাঁটছে। রাণী ভবানী এমনই মামা যেন জানে। রাণী বলল, আয় পরিজ খাবি। বলে ভিতরে নিয়ে গেলে আরও বিস্ময়। ঘরের টেবিলে ফুলদানি। তাতে রজনীগন্ধা গুচ্ছ। জানালায় ভেলভেটের পর্দা। যেদিকে তাকাই সর্বত্র ছবির মতো এক সৌন্দর্য খেলা করে বেড়াচ্ছে। পরিজ কি জানি না। এত খাবার খেয়েছি পরিজ খাইনি কেন—এসব মনে হচ্ছিল। আর সেই বনটার ভিতর এই দুই মেয়ে ঘুরে বেড়ালে পৃথিবীর কোনো গোপন রহস্য ধরা পড়ে যায় এমন মনে হবার সময় দেখলাম, ভবানী তার মাকে ডেকে নিয়ে আসছে। চা-পরিজ কেক। একেবারে ভিনদেশি খাবার। লজ্জায় খেতে পারছিলাম না। আমার পায়ে জুতো নেই। শুধু হাফশার্ট-হ্যাফপ্যান্ট পরনে। কেমন এক অপরিচিত পৃথিবীতে ঢুকে কেবল বিস্ময়ের পর বিস্ময়ের সম্মুখীন হচ্ছি। হঠাৎ আমার কী হল জানি না, সহসা দৌড়ে ছুটে পালালাম। রাণী চিৎকার করে বলল, কী রে কী হল! কোথায় যাচ্ছিস! আমি বললাম, বাড়ি। আবার শুনতে পেলাম, যাস না বনটার মধ্যে দেখবি কে দাঁড়িয়ে আছে।

আমি বললাম, দুর্গাঠাকুরকে শাড়ি পরানো হবে দেখতে যাচ্ছি।

যাস না। বনটার মধ্যে তোকে দুর্গাঠাকুর দেখাব। তারপর বললে, খেতে দিলে না খেয়ে যেতে নেই।

তোমাদের বনটায় দুর্গাঠাকুর আছে!

থাকবে না। এমন সুন্দর বনে ঠাকুর-দেবতারাই তো থাকে।

বনের মধ্যে ঢুকে আমারও একথা মনে হয়েছিল। শিউলি ফুলের গন্ধে চারপাশ ম ম করছে। সকালবেলায় শিউলি ফুল সাদা হয়ে শতরঞ্চের মতো সেজে থাকে। ভাবলাম মহালয়ার দিন এখান থেকেই ফুল চুরি করে নিয়ে যাব।

আর মহালয়ার দিন রাত থাকতে আমরা ক-ভাই বোন মিলে গেছিলাম সেই শিউলি গাছগুলোর নীচে ফুল তুলতে। আশ্চর্য আবছা অন্ধকারে দেখলাম বিরাট এক জন্তুর পিঠে পা দিয়ে এক দেবী শিউলি গাছে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। অস্পষ্ট আঁধারে মোমের মতো

যেন জ্বলছিল দেবী। আমরা কাছে যেতে সাহস পাইনি। ফুল না নিয়েই দৌড়ে পালিয়েছিলাম। সেই আমার প্রথম ও শেষ সাক্ষাৎ দেবী দর্শন। তারপর সারাজীবন মণ্ডপে মণ্ডপে ঘুরেও আর তার দেখা পাইনি।

টেলিপ্রিন্টার

সে প্রথমে একটা হাই তুলল। তারপর এক গ্লাস জল চাইল রাখহরির কাছে। এসে বসতে না বসতে তিনটি ফোন—একজন জানতে চেয়েছে রাজীব রাজনীতিতে সত্যি আসছে কি না। একজন কাটোয়ার ট্রেন দুর্ঘটনা—অন্যজন বিয়েটা কেমন হবে। তিনটি প্রশ্নই একজন মানুষকে পাগল করে দেবার পক্ষে যথেষ্ট। সে, সে-জন্য পাগল হবার হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য তখনই জবাব দিয়েছিল—জানি না। খবরের কাগজে এমন জবাব দিলে চাকরি যাবার কথা। কিন্তু ফোন তো—কোনো সাক্ষ্য নেই। একজন আবার ত্যাঁদড় বেশ—নাম জানতে চায়। সে এড়িয়ে যাবার জন্য বলেছে আমি একজন সাব-এডিটর। তারপর ফোন ছেড়ে দিয়েছে।

এক গাদা বাসি কাটা খবর টেবিলে ডাঁই করা। আগে একটা মর্নিং শিফট ছিল। সকালে একজন এসে যা গাঁথার গেঁথে দিত, যা রাখার ওয়েট চাপা দিয়ে রেখে যেত। নুন শিফটে ডাকের কাগজ বের হয়। লোড শেডিং বলে একটার আগেই পাতা ছাড়ার নির্দেশ। সে ঘড়িতে দেখল সাড়ে দশটা। মর্নিং শিফট উঠে গেছে, লোকজন কম। কম লোকজন দিয়ে গুছিয়ে কাজ করানোর জন্য, এর চেয়ে ভালো পন্থা ছিল না। সাড়ে দশটার মধ্যে সবাই চলে আসবে। সবাই বলতে আর একজন। চার জনের শিফট। একজনের অফ একজন দেশে গেছে। বলে গেছে আসতেও পারে নাও পারে। ক্রিডে রেপের খবর—আবার কোথায় রেপ! বাকিজন আসার আগে রেপের খবরটি দেখার তার ভারি উৎসাহ জন্মাল। বিহারে বালিকা ধর্ষণ। পুলিশ ফুসলিয়ে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করেছে। বালিকার বয়স সতেরো। সতেরো বছরের বালিকা কথাটার মধ্যেই সে কেমন ধর্ষণের ঘ্রাণ পেল। সতেরো বছর বয়েস মেয়েদের পক্ষে সবচেয়ে বড়ো সুসময়। সুঠাম শরীর এবং গ্রীবা সহ নারীর জ্যান্ত এক ছবি তখন দুলছিল চোখে। এই বয়েসটাও যে নারীর কামুক গন্ধে গলিত শবের মতো পচে থাকে, নিজের বাপকে দেখে সে টের পেত না। তার নিজের মেয়ের বয়স এগারো। ছেলের বয়স কুড়ি। সে ছেচল্লিশ বছরের। সে যখন বিয়ে করে, বউ-এর বয়স ছিল ষোলো। ষোলো আর চব্বিশ—বাবা বলেছিল, খুব মানানসই। এখন তার বিশ বছরের ছেলে বাইরে থাকে। মাননসই এই কথাটায় তার চোখের উপর একটি আখাম্বা ষাঁড় এবং পুষ্ট গাভীর অবয়ব ভেসে উঠতেই আবার ফোন—'সুকেশ বলছ?'

কিছু কিছু গলার স্বর তার ভারি চেনা। ফোন তুললেই বুঝতে পারে কার গলা। শাশুড়ি ঠাকুরুনের ফোন।—'বাবলা বাড়ি এসেছে!'

না তো!

আসেনি!

না তো। এই তো সেদিন গেল। এখন তো ছুটি নেই।

অঃ। তোমরা ভালো আছো?

হ্যাঁ মা, ভালো আছি।

নন্দিতা?

ভালো।

একদিন তোমরা এসো!

যাব। সুকেশ ভুলেই গেছিল, তিনি ভালো আছেন কি না জানা হয়নি। পৃথিবীর সবাই সে ভালো আছে কি না জানতে চাইবে—আর সে কারও ভালো থাকার কথা জানবে না সে হয় না। খুব গাঢ় গলায় বলল, মা, আপনি ভালো আছেন!

হ্যাঁ বাবা চলে যাচ্ছে।

সুকেশের কিছু খারাপ স্বভাব আছে, সে এটা বুঝতে পারে। নন্দিতার মাকে সে যে গাঢ় গলায় কথাটা বলল, সেটা পেরেই কতটা মেকি বুঝতে মনে অসহিষ্ণুতা কাজ করে। আসলে সে তখন নিজেকে যা খুশি তাই গাল দেয়। সে ফোন ছেড়ে দিয়ে বলল তুমি ভণ্ড না পাষণ্ড। তারপর চিক করে সরু রগে কেমন একটা ঝিনঝিন শব্দ শুনতে পেল—কেমন আর্ত প্রশ্ন—বাবলা বাড়ি এসেছে? কেন বাবলার দিদিমার বাবলা সম্পর্কে এমন জরুরি প্রশ্ন! বাসি খবরের কাগজে যে কোথায় এক ছোট্ট চিরকুটের মতো সংবাদ—কার্জন পার্কে নিহত দুজন যুবকের একজনের লাশ এখনও শনাক্ত হয়নি। এখনও মানে—কতদিন! শনিবার পুলিশ কার্জন পার্কে গুলি চালিয়েছে। গেল শনিবার তো! সামনের রিপোর্টারটিকে বলল, গেল শনিবারে পুলিশ গুলি চালিয়েছিল কার্জন পার্কে? রিপোর্টারটি—এইমাত্র এসেছে, জরুরি খবর একটা লিখে দিয়ে আবার বের হয়ে যাবে, চিফ-সাহেবের পাখাটি ভালো ঘোরে। একটু ঠাণ্ডা হয়ে নেওয়ার জন্য বসেছিল। মুখের ঘাম মুছল রুমালে সে। বলল, নতুন কোনো খবর আছে?

না এমনি। কার্জন পার্কে পুলিশ কবে যেন গুলি চালিয়েছিল?

তা দিয়ে কী হবে?

সুকেশ বলতে পারল না, এইমাত্র বাবলার দিদিমা বাবলার খোঁজ করছিল। সে বাড়ি এসেছে কি না জানতে চেয়েছে, বাড়ি না ফিরলে, মানুষ ভাবতেই পারে, লাশ শনাক্ত করা দরকার। সে শুধু বলল, আপনার খেয়াল নেই!

ফাইল দেখুন না!

অত জরুরি নয়। দেখছি না মতো মুখ করে সে বলল, আমরা সবাই কত সহজে সব ভুলে যাই।

কী ভুলে যাই?

এই খবরগুলি, সবাই আমরা। এই সেদিন, পাঁচ-সাতদিনও হয়নি, কার্জন পার্কের সামনে দুটো যুবকের লাশ। কত রকমের অ্যাঙ্গেল থেকে ছবি! কাগজের প্রথম পাতায় ব্যানার। কলকাতা তপ্ত। যুবকের লাশ তদন্ত কমিশন কত কিছুর দাবি। গতকাল কার্জন পার্ক হয়ে এলাম। মনেই নেই এই সেদিন, রক্তের তাজা গন্ধ, নাক টানলে যার ঘ্রাণ টের পাওয়া যায়—তার বিন্দু বিসর্গ মনে উঁকি মারল না। এতটুকু বলার পরই সুকেশ থেমে গেল। আসলে আকাশবাণী থেকে ফেরার সময় এক সুন্দরী যুবতীর সৌন্দর্য উপভোগ করার তাগিদে কে সি দাস পর্যন্ত সে হেঁটে এসেছিল। মনের এই তপ্ত নিদাঘের আকর্ষণ বাবলার মা জানে না, পৃথিবীর কেউ জানে না। যুবকের লাশ একজন যদি....না না, সে হবে কী করে! যুবতীরা কত সহজে যুবকদের লাগাম টেনে রাখে। সে অন্যমনস্ক হতে চাইল।

সুকেশ বলল, এই রাখহরি।

আজ্ঞে যাই।

কাগজের ফাইলটা দে।

কোন কাগজের ফাইল।

সব, সব ক-টা।

নীচ থেকে প্রিন্টার উঠে এসে বলল, কপি পাঠান।

পাঠাচ্ছি। বলে দেরাজ থেকে কিছু উত্তরবঙ্গের কপি বের করল। একসেস থেকে পেয়ে গেল দুটো বিহার এবং ওড়িশার খবর। যাক—! সে বলল, এতেই মনে হয় পাতা ভরে যাবে।

প্রিন্টার হেসে বলল, ভরে যাওয়া নিয়ে কথা।

সত্যি ভরে যাওয়া নিয়ে কথা। সামনে সেই আখাম্বা ষণ্ডটি দাঁড়িয়ে—পুষ্ট গাভির ছবি এই রকমের। প্রিন্টার চলে গেলে ফাইলগুলির একটা টানতেই খবরটা বের হয়ে এল।

গত সোমবার। আজকে শনিবার। সত্যি কলকাতা কী গভীর কল্লোলিনী! সব ভাসিয়ে নেবার জন্য হাঁ করে আছে।

আসলে দুজন যুবকের মৃতদেহ কলকাতার বুকে পুলিশের গুলিতে এত তাড়তাড়ি হাপিজ হয়ে যেতে পারে সুকেশ ভাবতে পারল না। বাবলা কবে বাড়ি থেকে গেছে! রোববার, রোববারই-তো! সে ক্যালেন্ডারের পাতা দেখল মাথার কাছে, তারিখ, দেখল রোববার না সোমবার! মাথাটা যে কী—ঘিলু দিনকে দিন ভারি হয়ে যাচ্ছে। স্বচ্ছ আয়নার মতো নয়। রোববার না সোমবার বাবলা বাড়ি থেকে গেছে! ধুস যত স্নায়বিক দুর্বলতা! বাবলার দিদিমা কি সকালের কাগজে দেখেছে—পুলিশের খবর—লাশ এখনও শনাক্ত হয়নি! বাবলার দিদিমার কি তখন বাবলার কথা মনে পড়েছে। পুলিশ রিপোর্টে আছে ছিমছাম চেহারা, গায়ে ফুলশার্ট স্যাণ্ডো গেঞ্জি। পায়ে কী আছে! চপ্পল না স্যু! বাবলা স্যু পরতে অভ্যস্ত। মাথায় টোকা মেরে মনে করার চেষ্টা করল, স্যু না চপ্পল! বাবলা যাবার সময় সে আর নন্দিতা দরজায় দাঁড়িয়েছিল। যাবার সময় বাবলার সব দেখেছে—অথচ এখন কেমন সব কিছুতেই সংশয়। হাফশার্ট পরে বাবলা, ফুলশার্টও পরে। সেদিন কী পরে গেছে! রাখহরি ফাইলের পাহাড় রেখেছে সামনে। দুজন যুবকের ছবিই বের হয়েছিল কাগজে। একজন চিৎ হয়ে পড়ে আছে, অন্যজন কাত হয়ে। একটা কাগজের ছবি মাথার দিক থেকে তোলা। সে উপুড় হয়ে দেখার চেষ্টা করল। দুজন যুবকের মধ্যে একজনের মুখ বেশ স্পষ্ট। সে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল, না এই মুখ বাবলার নয়। আর একটা ছবিতে কোনো যুবকের মুখই স্পষ্ট নয়। সে একজনকে শনাক্ত করেছে—এটা বাবলা নয়। আর একজনকে শনাক্ত করতে না পারলে বুকের মধ্যে যে দাপাদাপি চলছে এটা কিছুতেই কমবে না। ট্রাংকল করে একবার বাবলার খোঁজ নিলে কেমন হয়, বাড়িতে শুনলে হাসাহাসি করতে পারে, তোমার বাড়াবাড়ি। কার্জন পার্কে বেআইনি মিছিল ঢুকেছিল সোমবার। বাবলা রোববারে বাড়ি থেকে গেছে, সকালের ট্রেনে গেছে, সোমবারে ল্যাব আছে। ল্যাব থাকলে বাবলা কিছুতেই ক্লাস কামাই করতে চায় না। গত তিনটে সেমিস্টারেই বাবলা খুব ভালো নম্বর পেয়েছে। সুকেশ বলে দিয়েছে শুধু ফার্স্টক্লাস ইনজিনিয়ার হলে দাম নেই, অনার্স মার্ক রাখতে না পারলে সঙ্গে সঙ্গে চাকরি পাওয়া কঠিন। বাবলার পক্ষে রোববারে গিয়ে সোমবারে কলকাতায় আসা অবিশ্বাস্য ঘটনা! বাবলা —রোববার গিয়ে সোমবারে কলকাতায় লাশ হবার জন্য ফিরতেই পারে না। সে হুংকার দিয়ে ডাকল রাখহরি, কি করছিস? কপি নামা।

রাখহরি টেলিপ্রিন্টার থেকে কপি নামিয়ে কেটে বেশ কায়দা করে ভাঁজ করে রাখল। তিনটে দুর্ঘটনার খবর, ট্রাক উলটে, বাস দুর্ঘটনায়, জলে ডুবে। এর যে-কোনো একটা একদিন তার নিজের জীবনেই ঘটে যেতে পারে। বিশ-বাইশ বছর ধরে সে যা কিছু

করেছে সবটাই মনে হয় আহাম্মকের কাজ। এই যে ভুতুড়ে ভয়টা মাথার মধ্যে ঢুকে গেল, সেটা বাবলা স্বয়ং হাজির না হলে মিটবে না। চিঠি পেলে বুঝতে পারবে, বাবলার চিঠি। কিন্তু বাবলা যে রোববারে গিয়েই চিঠিটি লিখে রাখেনি কে বলবে। কলকাতায় বাবলার সহসা আসার কী কী কারণ থাকতে পারে? দু-বছর হল বাবলা বাড়ি ছাড়া। বাবলা তাকে না জানিয়ে কলকাতা ঘুরে গেছে মনে পড়ছে না। দু-বার অকারণে ঘুরে গেছিল—কিন্তু তখনও বাড়ি হয়ে গেছে। সে যদি অকারণে বন্ধুবান্ধবের পাল্লায় পড়ে চলে আসে এবং মিছিলের টানে কার্জন পার্কে চলে যায়।—এসব সুকেশ খুব দূরবর্তী ছবির মতো আন্দাজ করার চেষ্টা করল। আসলে মানুষের এত দুর্ভাবনার মূলে সে নিজে।

ঘচাঘচ কপির দুটো একটা রেখে গেঁথে দিল। হরিজন নিগ্রহের খবরটা থাক। পরে আরও খবর আসবে। লিড এলে সাজিয়ে রাখবে। বাইশ বছর আগে বাবলা বলে তার কেউ ছিল না। নন্দিতা ছিল না। লিজি ছিল না। বাইশ বছরে সে যে সংসারে একজন সবচেয়ে বড়ো ক্রীতদাস আজ এটা টের পেল। একটা আস্ত দুর্ভাবনা দুশ্চিন্তার ক্রীতদাস। তার জন্য তাকে আফ্রিকার জঙ্গলে ঢুকতে হয়নি। কেউ তাকে চেন বেঁধে নিয়ে যায়নি— নিজের চেন হাতে গলায় ঝুলিয়ে ষোলো আনা সং সাজা গেছে।

আসলে এগুলো তার নিজের সঙ্গে নিজের তর্ক। দু-একটা কাগজ অফসেটে বের হয়। সেই কাগজগুলির ছবি স্পষ্ট দেখা যেতে পারে। অফসেটে ছাপা মুখ সে চিনতেও পারে। কপি সরিয়ে আবার কাগজে হামলে পড়ল। পায়ের দিক থেকে পেল। যুবকের লাশ দুটি ঘুণাক্ষরেও কি ভেবেছিল, খবরের কাগজ থেকে এত রকমের অ্যাঙ্গেলে ছবি নেওয়া যায়। দূরে পুলিশ ব্যাটন হাতে রাইফেল হাতে, মোচে তা দিচ্ছে। কে জানে কার ছেলে, শেষে হয়ত খবরে বের হবে যে বেটা গুলি চালিয়েছিল তারই সবে ধন নীলমণি। একবার কাছে গিয়ে সবারই দেখা দরকার— কার বাপের ছেলে এভাবে মরে পড়ে থাকল। এখনো পর্যন্ত শনাক্ত হল না, তাজ্জব ব্যাপার। বাপ না থাক, মা দাদা পিসি মাসি দিদিমা কত কেউ থাকতে পারে। একজন যুবক বাড়ি ফেরেনি, অথচ সংসারে সব ঠিকঠাক চলছে ভাবাই যায় না। তার হলে পাগল হয়ে যাবার কথা। থানা পুলিশ, হাসপাতাল ট্রাংকল খোঁজাখুঁজিতে সে তোলপাড় করে দিত সব। সুতরাং যুবকটি এখান থেকে বাড়ি ফিরবে বলে রওনা হয়েছিল, জ্যাম, মিছিল সব মিলে তাকে নিয়তির গ্রাসে ঠেলে দিয়েছে, এ-মুহূর্তে তার কি করা দরকার ভেবে পেল না। বাবলা বাড়ি ফিরেছে। টিট্টিভ পাখির মতো কেউ ডেকে যাচ্ছে অনবরত। কেমন অস্থির হয়ে পড়ছে ভিতরে ভিতরে। একবার বাবলার কঠিন অসুখ হয়েছিল, তখনো বড়ো অস্থির। বাবলার চিঠি পেতে দেরি হলে অস্থির। রাস্তাঘাটে যে-কোনো জায়গায় দুর্ঘটনা ওৎ পেতে থাকে। বাবলা বাড়ি এলে পকেট সার্চ করে দেখা হয় সঙ্গে আইডেনটিটি কার্ড রেখেছে কি না, প্রায়ই রাখে না, তখন সুকেশের

মাথা গরম হয়ে যায়, থম মেরে বসে থাকে কিছুক্ষণ। ছেলে বড়ো হয়েছে মারধোর করা যায় না। শাসনের প্রক্রিয়া নতুন নতুন উদ্ভাবনের দরকার হয়। ইদানীং শরীর ভালো যাচ্ছে না তার, বুকের বাঁ ধারটায় ব্যথা। ডাক্তারের পরামর্শ মতো চলছে। দুশ্চিন্তা দুর্ভাবনা করা বারণ। সেই কথাটাই তুলে শাসনের নতুন প্রক্রিয়া হিসাবে কাজে লাগায়, বাবলা তুই আমাকে আর বেশিদিন দেখছি বাঁচতে দিবি না। দুর্ভাবনায় যত জটিল রোগ জন্মায়, সব সময় উদ্বিগ্ন থাকলে মানুষ বাঁচে! বাবলার এককথা—তুমি অযথা দুর্ভাবনা করলে আমরা কী করব? চিঠি পেতে দু-পাঁচদিন দেরি হলে ছুটে যাবে। সময় মতো চিঠি কে পায়?

সত্যি সময় মতো চিঠি কেউ পায় না। পুলিশের গুলিতে মৃত যুবকেরাও ঠিকমতো চিঠি পায়নি। চিঠি পেলে আগেই সরে পড়ত। যথাসময়ে এই চিঠি পাওয়া নিয়েই মানুষের যত বিড়ম্বনা। সে দেখল এ-সময় এত দুর্ভাবনার মধ্যেও একা শিফট চালিয়ে দিয়েছে। তার এখন ওঠার সময়। বিকেলের শিফটের দু-একজন এসে গেছেন! সে একজনকে বলল, দাদা কার্জন পার্কের লাশটাকে পুলিশ কোথায় রাখতে পারে?

বিষয়টা বোধগম্য হয়নি। কার লাশ?

যাকে শনাক্ত করা যায়নি।

মর্গ ছাড়া আর কোথায় রাখবে?

সেই ত মর্গ ছাড়া আর কোথায় রাখবে। বিপদে মানুষের বুদ্ধিভ্রংশ হয়, তার এ সময়ে বুদ্ধিভ্রংশ স্মৃতিভ্রংশ সবই হয়েছে। তা না হলে বাবলা কবে গেছে, রোববার না সোমবার, নাকি শনিবার কিছুতেই মনে করতে পারছে না কেন। প্রেসিডেন্সি কলেজের পেছনটাতে একটা মর্গ আছে। তার মনে আছে কে একজন যেন চুপি চুপি পথটা পার হবার সময় বলেছিল, জানেন এখানটাতেই চারু মজুমদারকে রাখা হয়েছিল। সে প্রশ্ন করেছিল, এখানটাতে মানে? লোকটা তার জ্ঞানের বহর দেখে হেসে দিয়েছিল। রোজ রাস্তাটা পার হয়ে যান, জানেনই না এখানে একটা মর্গ আছে। মর্গ কেমন হয়। নীলরতন হাসপাতালে একটা মর্গ আছে। সব হাসপাতালেই বোধ হয় থাকে। পাড়ার জলে ডোবা এক যুবতীর লাশ খুঁজতে গিয়ে কী কী দেখেছিল বিস্তারিত একজন একবার তাকে বলেছিল। বড়ো বড়ো সব দেরাজ। টানলেই কিম্ভূতকিমাকার ফোলা ফাঁপা লাশ বিকৃত মুখে বের হয়ে আসে। বাবলারটাকে বের করবে! পাঁচ সাতদিনে সে তো আর বাবলা নেই। জামা প্যান্ট দেখে চেনা যায়। বাবলা ফিরেছে কি না খবরে এমন বুরবক হয়ে গেছে—এখন তাও মনে করতে পারছে না। বরং বাবলা নিখোঁজ হলে মর্গ খুঁজে দেখবে তার মামারা। তার পক্ষে খুঁজে দেখা সম্ভব হবে না। তার আগেই ভিরমি খাবে। এখন মনের মধ্যে তার ওই খোঁজা নিয়ে তোলপাড় হবার সময় দেখলে সে টু-বি বাস স্ট্যান্ডে এসে হাজির। তাকে রোজ

টালিগঞ্জে ফিরতে হয়। এখান থেকে এক বাসে যাওয়া যায় না। যাবার সময় একবার কার্জন পার্কে নেমে গেলে হয়। লালবাজার ঘুরে গেলে হয়। বাড়িতে গিয়ে সে সারাটা সন্ধ্যা অস্বস্তিতে কাটাবে। বাবলা ফুলে ফেঁপে পড়ে আছে। —সে যে কী করে!

চিন্তা বিষয়টা এমন যে একবার মাথার মধ্যে ঢুকে শত সহস্র ফণা হয়ে ভেসে ওঠে। টেলিপ্রিন্টারের মতো সহস্র খবরের একটা কবরখানা হয়ে যায়—অজস্র প্রেতাত্মার ছড়াছড়ি। এই চিন্তার ভিতর সে দেখল কখনো মর্গে দাঁড়িয়ে আছে কখনো শ্মশানে। তবু শনাক্ত করতে পারছে না এই তার বাবলা। একটি আখাম্বা ষণ্ড এবং পুষ্ট গাভির ফসল। বিশ বছর লালন-পালন করার পরও বাবলা তার সঙ্গে মশকরা করছে—বাবা আমাকে তুমি চিনতে পারছ না, আমার আইডেনটিফিকেশানে এত গণ্ডগোল! আত্মীয়স্বজনরাও বলবে এ-কেমন বাবারে—পুত্রের মুখ চিনতে এত বিলম্ব! সে বলল, কী করে জানব মাত্র পাঁচ-সাতদিনে বাবলা আমার ব্লাডারের মতো ফুলে ফেঁপে যাবে। বিশ বছর ধরে প্রোটিনযুক্ত খাবার খাইয়েও যা করতে পারিনি, পুলিশ লাশ বানিয়ে দিয়ে কত সহজে তা করে ফেলেছে।

মাথার মধ্যে অনবরত টেলিপ্রিন্টার—শ্মশান শোকমিছিল মর্গ মেলার ছবি। বাবলা মেলায় গিয়ে নাগরদোলায় চড়তে ভালোবাসত। বনবন করে ঘুরেছে। সে আর নন্দিতা বাবলাকে চেপে ধরে বসে আছে। বাবলা হাত নেড়ে সুখ পাচ্ছিল! বাবলার সমুদ্রতীরে একটা ছবি, সে তার বাবার দিকে ছুটে আসছে। অন্নপ্রাশনে বাবলার হিরের আংটি। বাবলার রুপোর ঝিনুক বাটি কিনতে একবার নন্দিতাকে নিয়ে বউবাজার গিয়েছিল। বাবলার পায়ে মল ঝমঝম করে বাজছে। টেলিপ্রিন্টারের খবর, অজ্ঞাত যুবকের লাশ—বাবলা নামক এক যুবক পুলিশের গুলিতে প্রাণ হারিয়েছিল—সে যে বাবলা, শনাক্তকরণ হয়েছে! বাবলার পিতার নাম সুকেশ। ব্রিলিয়ান্ট ছাত্র। পরীক্ষার ফলাফল দিয়ে বায়োডাটা। শ্মশানেও বায়োডাটা লাগে। টেলিপ্রিন্টারেও লাগে। কাজ পেতে গেলেও লাগে।

এ সময় সুকেশের রাগটা গিয়ে পড়ল ববলার দিদিমার উপর। বাবলা ফিরেছে। একটি মাত্র 'ফিরেছে' শব্দে শনাক্তকরণের কাজ আরম্ভ হয়ে গেছে মাথায়। পাঁচ-সাতদিনের মধ্যে সে একবারও ভাবেনি বাবলার ফিরে আসা দরকার। অন্তত শনাক্তকরণের জন্য দরকার। পুলিশের গুলিতে সে যে মারা যায়নি তার জন্যও ফিরে আসা দরকার। কাল না হয় ছুটি নিয়ে একবার ঘুরে আসবে। যেমন সে চিঠি ঠিক সময় না পেলে মাঝে মাঝেই চলে যায়। একবার রুনুর দোকানে গেলে হয়। ট্রাংকল করলে হয়। কে ধরবে? অফিস বন্ধ। হোস্টেল বাড়িগুলো দূরে দূরে। কোনো যোগাযোগের বন্দোবস্ত নেই। অন্তত এই নির্বোধ অবন্দোবস্তের জন্য এডিটোরিয়াল পাতায় একটি চিঠি লেখা দরকার। টু-বি বাসটা ভরে গেল। ছাড়ছে। পাশেই সুন্দরী মহিলা। দুশ্চিন্তার হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য মহিলার

হাতে ক-টা কাচের চুড়ি আছে গুণতে থাকল। তারপর কানের দুলে ক-টা পাথর। সহজেই অন্যমনস্ক হওয়ার এগুলি তার নির্দিষ্ট উপায়। ও বাবা, এ দেখছি আবার ফুলে ফেঁপে যাচ্ছে। গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা। পেট চিরলে জরায়ুর কাছাকাছি জায়গায় জল পাওয়া যাবে। কত কাছাকাছি কত আলাদা। দুটোই ত্যাগের ক্ষেত্র। একটি সঙ্গে সঙ্গে সরে যায় অন্যটি আজীবন লেপটে থাকে। বড়ো হয়। ঝিনুক বাটি লাগে। দুঃখে হতাশায় হাহাক্কার হাসি এসে যাচ্ছিল। সে চট করে হাসিটাকে চেপে দিল—এর নাম তবে পাগল হয়ে যাওয়া। বিয়ের জন্য পাগল হয়ে যাওয়া, বাবলার চিঠি না পেলে পাগল হয়ে যাওয়া, ঝিনুক বাটি কেনার জন্য পাগল হয়ে যাওয়া, মস্তিস্কে কত সব মন্ত্র পোরা—টেলিপ্রিন্টারে কত আর খবর আসে! জীবন্ত টেলিপ্রিন্টার মাথার মধ্যে অনবরত খবর পাঠাচ্ছে। সুন্দরী মহিলার যোনির ভাঁজও খবরে ভেসে উঠল। সে চমকে গেল। দুশ্চিন্তার মূলে ওই জোনাকি পোকাটি।

সেদিন সুকেশ বাড়ি ফিরেছিল পর্যুদস্ত মানুষ হয়ে। বাড়ি গিয়ে দেখল বাবলা খাবার টেবিলে মনোযোগ দিয়ে খাচ্ছে। নন্দিতা তাকে আর এক টুকরো মাছ দেবে কি না বলছে। সুকেশ কোনো রকমে ভিতরে ঢুকে বলল, তুই! কলেজ ছুটি!

ছুটি!

কীসের ছুটি, কেন ছুটি কিছু বলতে পারল না। কেবল বলল, সঙ্গে আইডেনটিটি কার্ডটা রাখিস তো? ওটা রাখিস। দিনকাল বড়ো খারাপ।

সুকেশ তারপর লম্বা হয়ে গেল বিছানায়। তার ঘুম পাচ্ছে বড্ড।

মীন রহস্য

নিরাময়দাকে কিছুতেই রাজি করাতে পারছিলাম না। তাঁর এক কথা, না। তোমাদের সঙ্গে নিয়ে মরি। ছোটো কর্তার মেজাজ খারাপ। সকাল থেকে শুরু হয়ে গেছে। খবরদার নিরাময় ওদের নিবি না। জ্বর জ্বালা হলে কে দেখবে। জায়গাটাও ভালো না। তোর যে কী মতিভ্রম হয় বুঝি না। ঋতুটাই বিশ্বাসঘাতক।

হেমন্তের মাঝামাঝি সময়। শীত পড়ে গেছে। রাতে কুয়াশা পড়ে। তিনুডাঙার মাঠে এখন ঝানু মাছ শিকারীরা ঘুরে বেড়ায়। আসলে মাঠ না বলে বিল বলাই ভালো। নদীর পাড়ে পঞ্চবটীর শ্মশান। বিল থেকে খাল নেমে গেছে শীতলক্ষ্যায়। এ-সময়টায় বর্ষার জল নেবে যেতে থাকে। মাঠ ঘাট শুকনো হয়ে ওঠে। বিলে যতদূর দেখা যায় শুধু ধানের জমি। ধানগাছের পোকামাকড় খেতে বর্ষার নদী থেকে উঠে আসে নানা কিসিমের মাছ। ধানগাছ যত বড়ো হয়, জল যত বাড়ে তত তারাও বাড়ে। বর্ষার মাছ শিকার, কচ্ছপ শিকার এক নেশা। শরতেই জলে টান ধরে। গ্রাম মাঠ থেকে জল নেমে যেতে থাকে। নালা খাল বিলের জল নেমে যায় নদীতে। ছোটো কর্তা রাজি না।

তা ছোটো কর্তারও দোষ দেওয়া যায় না তার না হয় তন্ত্র মন্ত্র ভরসা, এদের কী ভারসা ! ছোটো কর্তা রাজি হবেন না। তা ছাড়া গত সালে হরি বিশ্বাস মাছ শিকার করতে গিয়ে গায়েব হয়ে গেল। ভূত প্রেতের কাণ্ড। সুযোগ বুঝে এত বড়ো ওঝারও হয়তো ঘাড় মটকে দিয়েছে। কিন্তু আমরা সকাল থেকেই বায়না করছি, নিরাময়দা তুমি একা যাবে কেন, আমরাও যাব। আমাদের বুঝি ইচ্ছে হয় না—আমরা দুষ্টুমি করব না। যা বলবে শুনব।' ‘‘ওই তো মুসকিল’’! হরি বিশ্বাস গায়েব হয়ে গেল। জানের মায়া নেই তোদের' ‘বারে তুমি থাকলে আমাদের ভয় করবে কেন। তুমিতো কত কিছু জান। ভূত উড়ানি মন্তর জান, গন্ধ শুঁকে টের পাও সাপখোপের উপদ্রব আছে কি না, তুমি পার। তুমি বললে কাকা রাজি হবে। গেল বারে যে বললে, এবারে নিয়ে যাবে। বললে কেন বল'! বড়দা ক্ষেপে আছে জান ! তার এক কথা, আমাদের না নিয়ে গেলে, নিরাময়দাকেও যেতে দেব না। কি করে যায় দেখব।

বড়দাকে নিরাময়দা সামলাতে পারে না। হেন আকাম কুকাম নেই বড়দা করতে পারে না। যাবে, যাও। দেখবে ফিরে, কি হয় !

কি আর হবে ! বড়দা গোয়ালের গোরুবাছুর ছেড়ে দেবে। তখন নিরাময়দার মাথায় হাত। লেজ তুলে গোরু বাছুর ছুটবে। বাড়ি, ঘর, উঠোন পার হয়ে একেবারে মাঠে। কোন মাঠে, কার খেতে মুখ দেবে—তারপর এই নিয়ে কথা কাটাকাটি। কে করেছে'! কেউ জবাব দেবে না। নিরাময়দা ফাঁপরে পড়ে যায়। তার জামা নেই, লুঙ্গি নেই। মাদুর হাপিজ। তার ঘরে কে ঢুকল'! কিচ্ছু নেই' !

আমরা সবাই চুপ।

নিরাময়দা জানে, বড়দার কাজ। বড়দা তখন কি ভালোমানুষ। তোমার ঘরে আমরা ঢুকিই না। তোমার গামছা লুঙ্গি কোথায় আমরা কি জানি'! তা ছাড়া কথা দিলে কেন। এ-সালে নিয়ে যাবে বললে কেন' ! কথা দিলে কথা রাখতে হয়।'

অগত্যা নিরাময়দা ছোটো কাকার কাছে আরজি জানাল—যেতে চাইছে যখন......... নিরাময়দার দাপট আছে। বিশ্বাসী মানুষ। এ-ছাড়া আমাদের দ্বিতীয় মনিব। নানা আকাম কুকাম ঠিক নিরাময়দা ধরে ফেলে। কান ধরে হিড় হিড় করে টেনে আনে বাড়িতে।

কাকা বললেন, বলছিস তুই।

তা ওদেরও তো ইচ্ছে হয়। ভয় ডর না কাটলে বড়ো হবে কি করে' ! কাকা বললেন, তা অবশ্য ঠিক।

নিরাময়দা বলল, ঠিক আছে যাবে। হাত লাগাও।

হাত লাগাও বলতে, মাছ শিকারের নানাবিধ কৌশলের কথা বললেন।

এই নাও বানা। পাট করে বেঁধে ফেল। নিরাময়দার সহকারী সুধন্য এবারে যেতে পারছে না। ম্যালেরিয়ায় ভুগছে। ঠিক ছিল সতীশ কর সঙ্গে যাবে। তারও যাবার সখ অনেকদিন থেকে। চন্দ্রকিরণ চাই—অর্থাৎ পূর্ণিমা না হলে 'জো' হয় না। রুপালি মাছেরা চন্দ্রকিরণে আচ্ছন্ন হয়ে থাকে। হাতেই ধরা যায়। রোজ এসে খবর নিয়ে গেছে সতীশ কর—কি কবে যাবে ঠিক করলে' ! 'জো' শুরু কবে?

আমরা যাচ্ছি যখন সতীশ করের দরকার নেই। সকাল বেলাতে আমাদের উঠোনে সতীশ কর আসতেই নিরাময়দা বলল, যাওয়া হবে না। আকাশ মেঘলা দেখছেন না' ! এবারে বোধ হয় 'জো পড়বে না। শিকারে গেলেই মাছ পাওয়া যাবে কথা নেই। ভাগ্য প্রসন্ন না থাকলে খালি হাতেও ফিরতে হতে পারে। তবে ওস্তাদ মাছ শিকারিরা জানে, কবে কখন, যেমন নিরাময়দার কাছ থেকেই আমরা জেনেছি, শনি মঙ্গলবারে গলদা

চিংড়ির জ্বর আসে। কথাটা যে বেঠিক না, জলা দেশে বড়ো না হয়ে উঠলে জানতে পারতাম না। জ্যৈষ্ঠের বৃষ্টি মাঠ ঘাট ভেসে যায়। নদী নালা ভেসে যায়। আষাঢ়ে বাড়ির ঘাটে জল। আমগাছ জামগাছের গোড়ায় জল। কচুর বনে জল। এ-বাড়ি ও-বাড়ি যেতে জল। ঠিক ভাদ্রে জল নামতে শুরু হয়। আর নিরাময়দার কেরামতিও শুরু তখন থেকে।

দেতো ডুলাখানা।

আমরা যাব।

কি করবে গিয়ে। এক ধমক।

নিরাময়দা বাড়ি থেকে বের হলে আমরাও তার পেছনে। পরনে গামছা। খালি হাতে কাঠাখানেক গলদা চিংড়ি তুলতে যাচ্ছেন। কী করে যে বোঝে' ! ঠিক রাজবাড়ির পেছনে জলে জঙ্গলে হেঁটে বেড়ান। খালের পাড়ে পাড়ে হেঁটে বেড়ান। সন্তর্পণে বকের মতো পা ফেলেন। আমরাও বকের মতো পা ফেলি। নিরাময়দা হাতের ইশারায় চলে যেতে বলেন, শুনি না।

দেখি, খপ—। খপ করে জলে ডাঙায় বড়ো গলদা চিংড়ির মাথা চেপে ধরেছেন। নীল রং। কী বাহার তার। কী করে যে বোঝেন। বড়ো বড়ো দাঁড়গুলি নাড়ে। আমরা ছুটে গেলে বিরাশি সিক্কার থাপ্পড়। কাছেও যেতে পারি না। অথচ অদম্য কৌতূহল। কী ভাবে নিরাময়দা এবার বেজায় প্রসন্ন হয়ে গেল, বলল চল, কী করে বুঝবি, দ্যাখ। জলে ডাঙায় কী করে মাছ ধরতে হয় শিখে রাখ।

খালের পাড়ে পাড়ে হাঁটছি।

হঠাৎ হাত তুলে দিলেন। আমরা থেমে পড়লাম। তারপর তিনি ইশারায় ডাকলেন। বকের মতো পা ফেলে জল ভাঙতেই বললেন, ওই দ্যাখ।

কিছু দেখতে পাচ্ছি না।

ফিস ফিস করে কথা বললেন, নিরাময়দা।

দেখতে পাচ্ছিস না'!

জলে টান ধরেছে। জলে পচা গন্ধ। জলজ ঘাস পচছে, মাছেরা পালাচ্ছে—ওই দ্যাখ। পচা জলে মাছ থাকবে কেন? সত্যি, গোড়ালি জলে একটা নীল রঙের বিশাল চিংড়ি পড়ে আছে। বোঝা যায় না। ঘাসের রং জলের রং মাছের রং এক রকমের। নীল হলুদ সবুজ।

নিরাময়দা মাছের পোকা।

আমরা বলি মাছের রাজা। সবাই বলে, হরি বিশ্বাসের চেলা। ডাঙায় মাছ লাফিয়ে ওঠে নিরামরদাকে দেখলে।

সেই শিকারি মানুষ বললেন, ইশারায়, 'পারবি'!

আমি ঘাড় কাত করে বললাম, 'পারব।'

বড়দা আমাকে ঠেলে দিয়ে এগিয়ে গেছিল। আর ধরতে যেই না গেল, ঝপাং করে কোথায় ছিটকে গেল মাছটা। নিরাময়দা ক্ষেপে লাল। হাত প্রমাণ সাইজের মাছটাকে তাড়ালি'! তোদের দিয়ে কিছু হবে না। শনিবার মঙ্গলবার চিংড়ি মাছের জ্বর আসে জানিস'! জলের কিনারায় এসে পড়ে থাকে। সূর্য উঠলে চিংড়ি মাছেরা জলের গভীরে নেমে যায়। তাদের আর দেখা পাওয়া যায় না। সেই থেকে জানি শনি মঙ্গলবারে মাছের জ্বর আসে। দাদা জানে। গুহ্য কথা বলে দিলে আমরাও জানলাম। আবার কিছুদূর হেঁটে গেল।

রাত থাকতেই বের হতে হয়। অন্তত সূর্যোদয়ের আগে জলার চারপাশটা ঘুরে দেখতে হবে। ভোররাতের অন্ধকারে দাদা টের যে পায় কী করে'! গাছ পাতা জলে নড়ানড়ি করলেই নাকি টের পাওয়া যায়, তেনারা উঠে আসছেন। আবার ডাক। কাছে গেলাম।

আমাদের দেখালেন কী করে ধরতে হয়। খুব সন্তর্পণে উবু হয়ে বসলেন। মাথার উপর গাছের ছায়া। দূরে মশার শব্দ। হাতটা ধীরে ধীরে প্রসারিত করে দিচ্ছেন। হাতের থাবায় পাতলা গামছা। এক হাতে গামছার শেষ প্রান্ত ঝুলিয়ে রেখেছেন। হাত ফসকালেও রেহাই নেই। জালি গামছায় বাছাধন আটকা পড়ে যাবে। কিন্তু আশ্চর্য খপ করে মাছের মাথাটি চেপে ঠিক ধরে ফেলেছেন। আমরা সবাই ঝুঁকে পড়েছি।

দেখলি'! কত বড়ো দেখলি'!

তা ঠিক, মুগুরের মতো মাথা। নিরাময়দাকে দেখলেই প্রতিবেশীরা বকত, নেশা বটে, এত রাতে বানা পেতে বসে আছিস'! কিছু পেলি' ! সাপখোপের ভয় নেই'!

হেসে বলেন, না।

কারণ তিনি জানতে দেন না, কোথায় কী মাছ মিলতে পারে। বড়ো ডুলায়, বড়ো বড়ো পাবদা মাছ তুলছেন আর ডুলায় করে ফেলছেন টের পেলেই ভিড় জমে যাবে। বানা পেতে তারাও চেষ্টা করবে আরও মাছ ধরার। নিরাময়দা স্বীকারই করে না, মাছ তার বঁড়শি কিংবা বানায় আটকে যাচ্ছে। মাছের ডুলাখানাও আড়ালে রেখে দেন। দেখলে মনে হবে মানুষটা কেবল বসে বসে প্রহর গুনছে মাছের আশায়। কেউ কেউ বলত, বেটা মাছই তোকে খাবে। সেই নিরাময়দা দামোদরদির হাট থেকে ফিরে কাকাকে বলেছিলেন, কর্তা পূর্ণিমার 'জো' পড়বে। ধানের জমিতে মাছের আওয়াজ পেলাম। দেখা যাক কী মাছ? মনে হয় বিলে আটকা পড়েছে। নেমে যাবার পথ পাচ্ছে না। কাকা বলেছিলেন, গতবারে তো কিছুই পেলি না, সারা রাত মশার আর জোঁকের কামড় খেলি।

নিরাময়দা বললেন, মাছ হল গে আজব জীব কর্তা। তার সঙ্গে লড়ালড়ি। সে ধরা দেবে কেন সহজে। তবে জল নামছে।

ঘাপটি মেরে থাকবে কোথায়'! পোদ্দারদের ঝিলে আর কত ধরবে। কিছু তো জলের টানে নেমে আসবেই।

কাকা হাসেন, নিরাময় মাছের চলাফেরার হাল হদিশ একটু বেশিই জানে।

তুই কী বুঝলি'! কাকার প্রশ্ন।

মনে হয় মন খানেক ওজনের ঢাইন মাছটাছ হবে। ধানগাছ উথালপাতাল। তা সাঁতার জলে নেমে যেতে সাহস পেলাম না। বিলের জল দু-লগি সমান নৌকা নিয়ে ঘোরাঘুরি করলাম। টের পেলাম না। কোথায় যে তলিয়ে গেল।

তা হেমন্তেও সেই বিশাল বিলে গভীর জল এবং পদ্মপাতায় ভরা। তবে খাল ধরে জল নেমে যেতে থাকলে, নদীর মাছ আর বিলে থাকে কী করে। নতুন বর্ষায় মাছের শরীর তাপে ভাপে জ্বলে না। আহা সেই সুমিষ্ট জলের স্বাদ পেতে আনন্দে তারা দিগবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে লেজ নাড়তে নাড়তে ধানের জমিতে, বিলের জলে, খালের জলে ঢুকে যায়। আর পাখনা নাড়ায়। লেজ ওড়ে। বর্ষায় মাছের এই মজা।

কাকা বললেন, গজার মাছটাছ হবে। তা মনে হয় না। গজার মাছের গন্তব্যস্থল বিলের মধ্যে—এ-মাছ নদীতে নামার জন্য আঁকুপাঁকু করছে। পূর্ণিমা রাতে সে নেমে আসতে পারে। জোনাকি পোকা ধানগাছের মাথায় তখন ওড়াউড়ি করে না। পাতায় পাতায় বসে যায়। পোকামাকড়ের তল্লাসে, মাছেরও কম নেশা থাকে না। আমরা রওনা হবার সময় কাকা বললেন, নিয়ে তো যাচ্ছিস। কার বাপের সাধ্যি আছে এদের সামলাতে পারে।

আসলে নিরাময়দা চায়, তিনি কত বড়ো মাছ শিকারি তারা দেখুক।

যাবার সময় আর এক প্রস্থ হিসেব।

কোচ। পাল। বানা। দড়ি। হ্যারিকেন। বস্তা। চাটাই। দেশলাই।

সারারাত কাবার হয়ে যাবে। মুড়ি পাটালি গুড় সঙ্গে।

দুপুর নাগাদ এই করে গেল। খালে নৌকা। নৌকায় তোলা হল সব। এমনকী মুড়ি পাটালি গুড়ও। দরকারে দামোদরদির বাজার আছে। ঘোষের দোকান আছে। ঠাকুরবাড়ির নামে এক পাতিল দই চাইলেও মিলে যাবে।

আসলে কী মাছ তাই সংশয়।

কত বড়ো মাছ নিরাময় দা !

জলের তলায়, আমি কি মেপে দেখেছি।

কেমন করে দেখলে।

ধানের জমিতে জলের পাক। না দেখলে বিশ্বাস করতে পারবি না। সব ধানগাছ নুয়ে পড়েছে। জলের তলায় তাণ্ডব—কিন্তু বুঝি কী করে কা মাছ'!

কুমির নয় তো'!

'তোরা কেন যে এলি'! কুমির ডাঙায় উঠে বিলে পড়ে থাকবে'!

না বলছিলাম, যা বলছ, তাতে হৃৎকম্প না শুরু হয়।

তোদের আসা ঠিক হয়নি। কুমির নদীতে ভেসে আসে'! সেই কবে একবার এসেছিলো'! বাবুরা কুমিরটাকে মারার কম চেষ্টা করেনি। পালের গোরু নিয়ে চড়ায় টানাটানি শুরু করে দিল শেষে। দোষতো দেওয়া যায় না। বেচারা খাবে কী ! মানুষ জলে নামে না, ডাঙায় মানুষ লম্ফ নিয়ে পাহারা দেয়—খাবেটা কী।

তারপর কী হলো'!

গুলি।

কে করলো'!

বাবুরা। ধর্মনাশ বাবু। অবিনাশ বাবু। গুলি পিঠে। গেল পিছলে। কিন্তু জেদ বটে। গোরুর ঠ্যাং কামড়ে ধরে আছে। জলে নিয়ে নামাবে। নদীতে ডুবিয়ে, কুমিরের আস্তানায় তুলে নিয়ে যাবে। কুমিরও কামড় ছাড়ছে না বাবুরাও গুলি করে যাচ্ছে। ফুটছে। পিঠে গুলি লেগে পিছলে যাচ্ছে। বাবুরা সটাসট গুলি করে হয়রান। তাজ্জব হারাণ মিঞা। বলল, দ্যান দেখি বন্দুকখানা। ঠ্যাং কামড়ে আছে বলে কুমিরের চোখে গুলি করছেন না। ভগবতীর গায়ে না আবার গুলি লাগে। চোখে গুলি না করলে কুমির মরে'!

ছোড়দা বলল, কুমিরের খুব শক্ত পিঠ না নিরাময় দা'!

শক্ত মানে। কচ্ছপের দশগুণ। গুলি পিঠ ফসকে আগুনের গোলা হয়ে উড়ে যায়। কিন্তু গুলিবিদ্ধ করা যায় না। নৌকার পাল তুলে দেওয়া হয়েছে। পেরাব, পোনাব পার হয়ে মশাবর খাল। খালে খালে বিল। বিল পার হয়ে আবার খাল। খালে কোমর জল। নিরাময়দার হিসাব অনুযায়ী আজকের রাতটাই সেই কামাল করা মীনের শেষ রাত। যদি না নামে, তবে আর, নামা হবে না। বিলের জলে আটকা পড়ে পচবে নয় ধরা পড়বে। কার ভাগ্যে এত বড়ো শিকার আছে কে জানে'!

বুক জলে নেমে বাঁশের বানা পুঁতে দিল নিরাময়দা। আমরা মুগুর এগিয়ে দিলাম। আমাদের নৌকা নদীর চড়ায় তোলা। সামনে তাকালেই নদী। শেষ জোয়ার এটা। খালে

জল ঢুকছে। এই জোয়ারে যদি নেমে না যায়, আর এ-সালে খালে নদীর জল ঢুকবে না। বর্ষা না পড়লে নদীনালা ভেসে না গেলে অতিকায় মীনের প্রাণনাশ হবে। মাঠে মারা পড়বে—এটাই নিরাময়দার কষ্ট। নিরাময়দার হিসাবও তাই। জলের সঙ্গে মাছের, মানুষের হাড্ডাহাড্ডি লড়াই। বানা পুঁতে দিল খাল বরাবর। বড়দা বলল, মাছটা বানায় এসে গোত্তা মারবে। ভেঙে ফেলবে নাতো। খুব সোজা'! কত শক্ত বাঁশ'! দেখেছিস। মুগুরের ঘায়ে টসকাল না। সামান্য একটা মীন, তা দেড় দু-মনও হতে পারে—যাই হোক, আজ এসপার না হয় ওসপার হবে। হয় আমি থাকব নয় মীন থাকবে।' মেজদা বলল, বানার উপর দিয়ে টপকাবে।

তা কথার মতো কথা। দু-পাঁচ হাত উপর দিয়ে লাফ মারতে পারে। টেঁটাটা দেতো দেখি।

'কী করবে?

টেঁটার তিনটে ফলা। লম্বা বাঁশের মাথায় খাপকাটা খাঁজে ঠেসে দেওয়া। সঙ্গে হাত পঞ্চাশের লম্বা দড়ি।

টেঁটার ধার দেখে নিরাময়দা বলল, ঘচাং করে বিঁধে যাবে। লাফ মারলেই হল। টেঁটাখানা কার হাতে বুঝবি না'! দূরে পঞ্চবটি শ্মশান। তার চালাঘর। ধোঁয়া উঠছে। আমার গা শির শির করতে থাকল ভয়ে। সবে সূর্যাস্ত হয়েছে। মাছেরাও দিনরাত বোঝে। পূর্ণিমা বোঝে। জোয়ার ভাটা বোঝে দিন দুই আগে বিলের সেই অতিকায় মীন দেখে গেছে নিরাময়দা। তা দুক্রোশের মতো বিলটার হয়ে জোয়ার ধরতে সময় লেগে যাবারই কথা। আর বিলের জল তো। কত মাছ, পাবদা, চাপিলা, পুঁটি, ট্যাংরা, কই, শিং, মাগুর—আহার পর্বটি খোশ মেজাজেই চালাচ্ছে। ঠিক করেছে, শেষ জোয়ারে নদীতে নেবে যাবে। জানবে কী করে একজন মনুষ্য টের পেয়ে গেছে, তার গতিবিধি। টের পেয়ে খালের জলে বানা পুঁতে দিয়েছে। যাবে তো যাও, বানা টপকে যাও। যাবে তো যাও টেঁটার কামড় ফসকে যাও। তা ওস্তাদ শিকারি। টেঁটাখানা এখনো হাতে নিচ্ছেন না। নদীর বুক থেকে ঝপাং করে চাঁদ লাফিয়ে উঠে গেলে, আমরা বস্তা পেতে বসে থাকলাম। বানা থেকে খানিকটা দূরে। ঘাসে কুয়াশা জমছে।

হুঁশিয়ার—কথা বলবে না। নিরাময়দা সর্তক করে দিলেন।

হুঁশিয়ার—নজর রাখবে। নিরাময়দা উঠে দাঁড়ালেন। হাতে টেঁটা।

জলের তোড়ে বানা কাঁপছে। খালের এপাড় ওপাড় বানা পুঁতে দেওয়া। বানার কাছে ঘোরাঘুরি শুরু করলেই—জলের ঘাস নড়ানড়ি করবে। জলের উপর ঘাসের লম্বা ডগা

ভেসে আছে। পূর্ণিমার রাত, বুঝতে কষ্ট হয় না—যে দিকে চোখ যায় নির্জন মাঠ। কিছু হাটুরে মানুষ পাড় ধরে যাবার সময় বলল, নিরাময় না?

আজ্ঞে নিরাময় দাস।

মাছের গন্ধ পেয়েছে'!

তা বলতে পারেন।

কী মাছ মনে হয়?

তাতো বলতে পারব না। অগাধ জলের মাছ, মাছ না অজগর। কে জানে। আমরা বললাম, ও নিরাময়দা, অজগর বলছ কেন?

হতেও পারে। কাছে ভাওয়ালের গড় আছে। মুসংয়ের পাহাড় আছে। বন জঙ্গলে কারা ঘুরে বেড়ায় কেউ বলতে পারে।

অজগর সাপ হলে কী করবে?

টেঁটায় গেঁথে ফেলব।

বড়দা বলল, আমি নিরাময়দা নৌকায় চলে যাচ্ছি।

মেজদা বলল, না, ওটা কুমির হতে পারে।

আমি বললাম, বড়দা দাঁড়া আমিও যাব।

মেজদা বলল, তুমি সত্যি করে বল নিরাময়দা ওটা কী?

কুমিরও হতে পারে। দেখা যাক না। বলে একখানা বিড়ি ধরালেন জুত করে।

হরি বিশ্বাসকে কুমিরে খেয়েছে তবে ! বকর বকর করবি না। কুমিরের কম্ম নয় হরি বিশ্বাসকে গিলে খায়। হরি বিশ্বাসকে খেলে কুমির নিজেই হজম হয়ে যাবে।

তা কে বলেছে, হরি বিশ্বাস'! লাস শনাক্ত হয়েছিল।

লাস শনাক্ত করবেটা কে শুনি। ওর আর কে আছে নিয়ে গেল লাস। আমি তো দেখিনি। কে আর দেখতে যায়। চাউর হয়ে গেল হরি বিশ্বাস। আমারও ধারণা, হরি বিশ্বাস। তা মনে করলে, দোষের কী আছে'! যার যেমন বিশ্বাস। ভূতের খবরদারি করলে শেষে এই হয় ! তুমি বুঝি চাও না, হরি বিশ্বাস বেঁচে থাকুক।

কে চায়। প্রতিপক্ষ বাঁচুক কে চায় রে'! বেটার তো হদিশ নাই। হদিশ না পেলে লাস হয়ে যাবে না'! লাস হয়ে গেলে শনাক্ত করে কচু হবে'!

পঞ্চবটি বনে নতুন সাধুর খবর রাখ! কে বলছে!

বারে দু-সাল ধরে নতুন এক সাধুর আমদানি হয়েছে জান না।'

এত বড়ো গুহ্য কথা, সেই তো। বলে নিরাময়দা কেমন ফ্যাকাসে মুখ করে বসে থাকল।

রাত বাড়ছে। জোনাকি পোকা জ্বলছে। বড়দা মেজদা নৌকায় চলে গেছে। আমি নিরাময়দাকে ফেলে যেতে সাহস পাচ্ছি না। হাজার হোক গুনিন সে। তুকতাক জানে। কুমির অজগরের চেয়ে পঞ্চবটি জায়গাটা যে বেশি খারাপ এটা ঠিক মাথায় আছে।

হঠাৎ কে যেন কথা কয়ে উঠল। আরে নিরাময় না! তা খালে এতরাতে লণ্ঠন জেলে আর বসে থাকতে সাহস পাবে। তাই হাঁটা দিলাম। পড়েছে কিছু। নিরাময়দা বলল, আমি তো চিনতে পারছি না।

তা পারবি কি করে! চুলে জটা। মুখে দাড়ি—গায়ে গেরুয়া—বুঝবি কী করে। নদীর পারে শ্মশানে গিয়ে শেষে হাজির। তা পড়ল কিছু'!

আশা করছি। শ্মশানে কেন !

নিরাপদ জায়গা। ভয়ে ডরে কেউ আসে না। গাজা ভাং-এর বড়ো অভাব। মাছ শিকার করে কুলাতে পারছিলাম না। তাই শেষমেশ শ্মশানে।

নিরাময়দা বললেন, বস তবে। বিড়ি খাবা। দে, খাই। বলে বিড়িখানা ঠিক নিল। কিন্তু হারিকেন থেকে আগুন জ্বালার সময় দেখা গেল—সব ফুস ফাস। কেউ নেই। আগুনের কাছে ভূত জব্দ।

নিরাময়দা হঠাৎ লাফিয়ে উঠল। দাঁড়াল। ছুটতে থাকল। কার পেছনে ছুটছে বুঝতে পারলাম না। ডাকছে, ও হরিদা, পালাচ্ছ কেন ! তুমি কি জান ওটা কী মাছ। তুমিতো মাছের রাজা ছিলে !

কোনো সাড়া নেই।

আর তখনই বানা কেঁপে উঠল।

আমার গলা শুকিয়ে গেছে। হাত-পা অবশ। কী করব বুঝে উঠতে পারছি না। কুমির অজগর হলেও এত ভয় পেতাম না। বোধ হয় সংজ্ঞা হারাতাম—তখনই নিরাময়দা বলল, বুঝলি, বাপেরও বাপ আছে। ভয় পাস না। ও টসকে গেল। আমি ভয় পাই। বেটা কী ধান্দায় আছে বুঝতে পারছি না। দেখি কী হয়!

আর কী হয় ! বললাম, আমি নৌকায় যাব। দিয়ে এস।

কেন যে আসিস, বলে বিরক্ত মুখে বানার দিকে তাকাতেই দেখলাম, বেশ প্রসন্ন মনে হচ্ছে। ঠোঁটে আঙুল রেখে বললেন, এসে গেছে।

তারপর বানা তোলপাড় করে উঠলে, মারলেন জোরে টেঁটাখানা। আর মনে হল, সেই চাঁদনী রাতে জল রক্তে লাল হয়ে উঠেছে। আমার কেমন মাথা ঘুরতে থাকল। টেঁটাখানা চেপে ধরে আছেন নিরাময়দা। চোখ জ্বলছে। যেন কতকালের প্রতিশোধ নিচ্ছে—অথবা মীনের চলাফেরায় খুঁজে পেয়েছে অন্য এক প্রতিপক্ষকে—একজন পালাল, অন্যজন জলের তলায় বুড়বুড়ি কাটছে।

টেঁটার ডগা আমার হাতে দিয়ে বলল, শক্ত করে ধর। জলে নেমে যাচ্ছি। এত বড়ো ওজনের মাছ সামলাতে পারব না। নিরাময়দা জলে ঝাঁপিয়ে পড়লেন, আর যা দেখলাম, সেই এক লম্বা শিথিল লেজ তুলে মেঘের রং তার এবং গভীর জলের কোনো অতিকায় জন্তু না অজগর, না কুমির বোঝা গেল না। বানা ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। গড়িয়ে গড়িয়ে নেমে যাচ্ছে। কীসে যেন পেঁচিয়ে ধরেছে নিরাময়দাকে। জলের গভীরে লাল রক্তের সঙ্গে নিরাময়দা ভেসে চলে যাচ্ছে। একবারই দেখেছিলাম, তার দুখানা পা জলের উপর ভেসে উঠেছে।

আমি আর পারলাম না। নদীর কাছে নৌকায় এসে হুমড়ি খেয়ে পড়লাম।

আমার আর কোনো হুঁস ছিল না।

শৈশবকালের অভিজ্ঞতা এটা আমার। এখনো মনে হয়, সব কিছুর মধ্যে কোনো গোলমাল আছে। কাহিনির মাথামুণ্ডু ঠিক যেন নেই। লোকটা কি সত্যি হরি বিশ্বাস। টেঁটায় গেঁথে গেছিল মাছ, না কুমির, না অজগর। জ্যোৎস্নায় চরাচর কেমন এক অলৌকিক রহস্য সৃষ্টি করে ফেলেছিল। বোধ হয় আমার মাথাও ঠিক ছিল না। তবে সপ্তাহখানেক বাদে ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় নিরাময়দা ফিরে এসেছিলেন। জলে ডুবে যাননি। ভাসিয়েও নেয়নি। মুখে শুধু রা ছিল না। কার কাজ জানি না।

ভাবলে সব ব্যাপারটাই আমার কাছে এখনও ভূতুড়ে মনে হয়।

ঈশা

মাথায় কোনো গল্প আসছে না। কী করি? আর তখনই তিনি এসে সামনে দাঁড়ান অর্থাৎ নিরাময়দার কথা মনে হয়, ঈশার কথা মনে হয়। তারা সশরীরে যেন হাজির।

তাদের তো সশরীরে হাজির হবার কথা না। সেই কবে পুব-বাংলার এক জলা জায়গায় তাদের সঙ্গে আমার দেখা—দেখা বলা হয়তো ঠিক হবে না। কারণ তাদের শ্যেন নজর এড়িয়ে কোনো কুকাজ করাই আমাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। নিরাময়দাকে বাড়ির কাজের লোকও বলা যায়, আবার অভিভাবকও বলা যায়। আমাদের শৈশবে নিরাময়দা যে কত সম্ভব-অসম্ভবের গল্প বলে মনমেজাজ ভালো করে দিতেন এবং তার কথা ভাবলেই মগজে নানা গল্প তৈরি হয়। তাকে নিয়ে গল্পও লিখেছি, তবে ঈশার গল্প শেষ হয় না। বাড়িতে ঈশার আসার কথা থাকলেই আমি বড়ো অস্থির হয়ে পড়ি।

যেমন একবার নিরাময়দাকে কিছুতেই রাজি করাতে পারছিলাম না। তিনি ঢাইন মাছ শিকারে নদীতে যাবেন। আমরাও যাব। আমরা বলতে বড়দা, মেজদা আর ছোটদা। যে সে নদী না। মেঘনা নদী—বিশাল বিপুল জলরাশি নিয়ে সে কোথায় যে ছুটছে'! বর্ষায় নদীর দু-পার দেখা যায় না। আর তার তরঙ্গমালার কী বাহার'!

সেই তরঙ্গমালায় পড়ে গেলে প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়। তবু কেন যে দেখার বাহার, বাহার অর্থাৎ জীবনের বাহার—স্টিমার, গাদাবোট, একমাল্লা, দোমাল্লা নৌকা, খাসি নৌকাও মেলা, পাল তুলে দিয়ে কোথায় যে তারা যায়।

গয়না নৌকাও থাকে। কলের গান বাজে—নদী তুমি কোথায় যাওরে। বর্ষায় আত্মীয়জনেরা আসেন। শহর থেকে দূর গ্রাম থেকে, পঁচিশ-তিরিশ ক্রোশ কোনো ব্যাপারই নয়। বড়ো পিসি ছোট পিসি, মামা-মামিরাও আসেন। আর আসে বড়ো পিসির মেয়ে ঈশা। সে আমাদেরই বয়সি।

নদীর পারে আমরা বড়ো হয়েছি।

ঠিক নদীর পারে বলা যাবে না। নদী থেকে এক ক্রোশ দূরে।

আমাদের গ্রামের মাঠ পার হলেই খোপেরবাগ, তারপর আর একখানা মাঠ, সেই মাঠে পড়লেই সংসারদি, তারপরই দামোদরদির মাঠ। সেখানে নদীর পারে ডাঙার মতো জায়গায় শ্মশান এবং বটগাছ—যে সে বটগাছ নয়। বিশাল অশ্বত্থ গাছ বলাই ভালো—তার নীচে জটাজুটধারী এক মহাক্ষেপা পাগল, গৌরবর্ণ, কপালে সিঁদুর, বম বম ভোলানাথ ত্রিশূল হাতে নিয়ে বসে আছেন—নিশুতি রাতে শবদাহ হলে তার কম্বুকণ্ঠে চিৎকার জয় মা জগদম্বা, কারণ গাছের নীচে একটি মন্দিরে তিনি বসবাস করেন। সকালে জগদম্বার অন্নভোগ হয়। ভৈরবী লীলাবতী শুদ্ধ বস্ত্রে খিচুড়ি পায়েস লাবড়ার ভোগ দেন—এবং নিরাময়দার মুখেই সব শোনা—আমাদের অবশ্য সেখানে যাওয়া হয়নি। ঢাইন শিকার উপলক্ষে যদি সেই আশ্রম দেখার সৌভাগ্য হয়।

বাড়ির ছোটোকর্তার মেজাজ খারাপ। সকাল থেকে নিরাময়দাকে শাসাচ্ছেন, কাজকাম ফেলে চললি নদীতে। বড়দির আসার কথা—পূজার ছুটি পড়লেই তারা রওনা হবেন।

তারা মানে ঈশাও সঙ্গে থাকে। শহরের মেয়ে ঈশা। চঞ্চল, কৌতূহলী এবং বন্যপ্রকৃতির। আর আমাদের মধ্যে ঈশা এলে আশ্চর্য এক প্রাণের সাড়া পড়ে যায়। আমরা তিন জনই পানাস হাইস্কুলের উঁচু ক্লাশের ছাত্র। তাকে নিয়ে আমাদের মধ্যে বিচিত্র সব মান-অভিমানের পালাও জমে ওঠে।

তখন তাঁর এককথা, কী করি কন কর্তা'! মাছের নেশা যার আছে সে জানে। শ্রাবণ-ভাদ্রি নদীর উজানে ঢাইন মাছেরা ঝাঁকে ঝাঁকে উঠে আসে। মাছেরা এই 'জো' আগামী পূর্ণিমা পর্যন্ত থাকবে। নদীর অতলে তেনারা উঠে আসছেন।

ছোটোকর্তার শাসানি থামছে না।—কাজকাম সেরে যাবি। খবরদার, অচল ভোলা উমা কেউ যেন আবার নৌকায় গিয়ে বসে না থাকে'! ওদের সঙ্গে নিবি না। জ্বরজ্বালা হলে কে দেখবে। পড়ার ক্ষতি, একবারে তো একটাও পাশ করতে পারে না।

বড়দা তখন আমার দিকে তাকিয়ে বলল, হয়ে গেল। ছোটোকাকা খেপে আছে।

আমরা পশ্চিমের ঘরে পড়ছি, কাকার হম্বিতম্বিও কানে আসছে। পূজার ছুটি পড়ে গেলেই ঈশা স্টিমারে না হয় নৌকায় চলে আসবে।

তখনও নিরাময়দার বিনয়ের শেষ নাই। — আজ্ঞে কর্তা আমি কী পাগল। জল এখন নামছে। বিল খাল থেকে সব জল নদীতে নামছে। পোকামাকড় সব জলে ভেসে যাচ্ছে। মাছেরা গন্ধ পায়, ঢাইন মাছেরা ঝাঁকে ঝাঁকে উঠে আসছে। বড়ো বড়ো হা করে গিলছে সব। পাতালপুরীতে রাজসূয়যজ্ঞ শুরু হয়ে গেছে জানেন'!

কাকা পুকুরে ডুব দিতে যাচ্ছেন। তাঁর সন্ধ্যা-আহ্নিক আছে, ঠাকুর পূজা আছে। কোথায় কোন যজমান বাড়িতে বিবাহ আছে। সকাল থেকেই তিনি ব্যস্ত। কাকিমা জেঠিমারা

হেঁসেলে ব্যস্ত। ঠাকুমার ঘরে ঠাকুরমা পূজার বাসনকোসন বের করে দিচ্ছেন। সবাই নিজের কাজে ব্যস্ত—অথচ আমাদের স্কুল ছুটি, সারাটা দিন কী যে করি'! নিরাময়দা ঢাইন শিকারে গেলে কথা দিয়েছিল আমাদের নিয়ে যাবেন। শুধু তাকে দু-কৌটা আরশোলা ধরে দিতে হবে। এখন তিনি কাকার কাছে কী ভালোমানুষ'! মেজদা ক্ষোভে ফুঁসছে। বইখাতা ছুড়ে ফেলে একেবারে উঠোনে নেমে গেল। মেজদা যে গোয়ারগোবিন্দ বাড়ির সবাই জানে। নিরাময়দাও জানে।

নিরাময়দা তুমি আমাদের নিয়ে যাবে না?

তিনি তখন টোনসুতোয় গাবের কষ খাওয়াচ্ছেন। ঘাটের গাবগাছে সুতোর একমাথা গিঁট দিয়ে বাঁধা। অন্য প্রান্ত বাড়ির উঠোনের অড়হড় গাছের ডালে বেঁধে মৌজ করছেন। বঁড়শির গিঁট টেনে দেখছেন। চার-পাঁচটা বোয়ালে বঁড়শি দশির বাজার থেকে কিনে এনে তাদের দেখিয়েছেন। বঁড়শির কী তেজ'! একবার গিলে ফেললে মাছের আর রক্ষে থাকবে না।

তুমি আমাদের নিয়ে যাবে কিনা বলো। কথার খেলাপ করবে না'!

কোথায়'!

আরে অদ্ভুত কথা বলছে তো'!

বললে যে আরশোলা দু-কৌটা ধরে দিলে আমাদের মাছ শিকারে নিয়ে যাবে!

ছোটোকর্তা রাজি না। তোরা ছেলেমানুষ, মাছ ধরার ধকল সহ্য হবে না। পড়াশোনার ক্ষতি। পাশ না করলে খাবি কী'!

তোমার কথা মতো আমরা দু-কৌটা আরশোলা ধরে দিলাম—

তোরা গেলে আমার কত সুবিধা। তারাপদ সকাল সকাল চলে আসবে বলেছে। সেই নদীর উজানে নৌকা তুলে নিয়ে যাবে। তোরা পারবি না।

বড়দা বলল, আমরা পারব। নৌকায় আমরা স্কুলে যাই। সেও তো কত লম্বা রাস্তা। আমরা পারব না কেন?

ঠিক আছে। তোরা পারবি। তোরা বড়ো হয়ে গেছিস। ছোটোকর্তাকে বুঝিয়ে বললেই হবে। যা তো নৌকার পাটতনে সব সরঞ্জাম তুলে ফেল—চানটান করে নে। যদি পারি তোর পিসিকে ঈশাদিকে ফেরার সময় ঘাটে তুলে নেব।

মেজদা বলল, কাকা খেপে আছে। পিসির পাত্তা নেই। শহর থেকে শাড়ি, সায়া, জামাকাপড় নিয়ে আসে পিসি পিসেমশাই। আর ঈশাদি একাই একশো। পিসি পিসেমশাইর জন্য বাড়ির সবাই অপেক্ষা করে থাকে। তাদের পাত্তা নেই। খেপে তো

থাকবেনই। পূজার জামাকাপড় বলে কথা'! তাকে তুমি রাজি করাতে পারবে না। ফিরে এলে আমাদের সব ক-টাকে পেটাবে।

ঠিক আছে। আমি তো আছি। কর্তা ছাড়া আর কি কেউ বাড়িতে থাকে না'! ঠাইনদিকে বললেই হবে।

ঠাইনদি অর্থাৎ আমাদের ঠাকুরমা। তিনি রাজি হলে কারও কিছু করার নেই। এই মাছ ধরা এক দুঃসাহসিক অভিযান। কোষা নৌকার পাটাতনে বসে থাকা, ঝড়বৃষ্টি আছে এবং ধাপে ধাপে নদীর জল পাগল হয়ে থাকে। মাছ পাগল হয়ে থাকে। বর্ষায় ঢাইন মাছের গর্ভসঞ্চার হয়। কারে খায় কারে রাখে ঠিক থাকে না। এই সময় এক একটা ঢাইন মাছ হাঙরের মতো বিশাল আকারের হয়। রুপোলি মাছ, মুখ সুঁচলো এবং টকটকে গভীর লাল, মাছ যদি বঁড়শিতে লেগে যায়, তাকে কবজা করতেই রাত কাবার হয়ে যেতে পারে। শিকারে গেলেই হয় না, তিথিনক্ষত্র দেখে বের হতে হয়। নিরাময়দা সব কাজই সুচারুভাবে সম্পন্ন করেছেন। কোষা নৌকার গলুইতে বড়ো বড়ো সিঁদুরের টিপ দিয়েছেন, বিশকরম বলে শুধু রওনা হয়ে যাওয়া।

নদীতে যাচ্ছি শুনে বাড়িতেও শোরগোল পড়ে গেল। মা জেঠিমারাও তেতে আছেন। নিরাময় তুই কী পাগল'! এই ভাদ্রমাসের গরমে—রোদে ঝড়বৃষ্টিতে রওনা হলি'!

আমার কী দোষ! ঠাইনদি যে কইল, নিয়া যা, নদীতে সবাই মাছ ধরতে যায়, আমার নাতিরা কী দোষ করল। পূজার ছুটি পড়ে গেছে—ঈশা এলে ওদের মজা কত বোঝ না'!

আর কথা নাই। কথা বললেই সাতকাহন, নিরাময়দা শুধু বললেন, দেরি হইলে চিন্তা কইরেন না। মনে করবেন বঁড়শিতে মাছ আটকাইছে।

ঠাকুরমা বলল, আশ্রমে গিয়া ট্যাবারে কবি বিনোদিনী দিদি পাঠাইছে। সে তো শুনেছি দৈব লাভ করেছে। আমার তিন নাতির মাথায় যেন দেবী জগদম্বার আশীর্বাদী ফুল দেয়। দৈব বলেই জন্ম-মৃত্যু। কার জীবন কে যে নেয়। এত আতুপাতু ভালো না। নাতিরা বড়ো হচ্ছে, কত কিছু বুঝতে শিখেছে, তাদের বাধা দিতে নেই।

বেলা পড়তেই রওনা হওয়া গেল।

এই সময় জলে টান ধরে। চার পাশ এত দিন বর্ষায় মাঠঘাট নদীনালা সব ডুবে ছিল। নৌকা বাইতে বিশেষ কষ্ট ছিল না। জলে টান ধরায় নৌকায় লগি মারতে কষ্ট। নিরাময়দা সাহসী মানুষ, ভূতপ্রেতে বিশ্বাস আছে—তবে তিনি মনে করেন ভূতপ্রেত মানুষের কোনো অনিষ্ট করে না। মানুষই মানুষের অনিষ্ট করে, আবার উপকারও করে। নিরাময়দার এক কথা, আরে পুণ্ডরীকাক্ষ ঠাকুর যার সহায় তার ভয় কীসের।

আসলে ঠাকুমার ট্যাবা এখন শ্মশানে সিদ্ধি লাভ করে যে পুণ্ডরীকাক্ষ হয়ে গেছেন সেকথা আমাদের জানা ছিল না। মেজদাই বলল, বড়ো খটকা লাগছে।

কীসের খটকা।

ট্যাবা বলল কেন ঠাকুমা। ট্যাবা নাম হয় নাকি?

আরে আরে ঠাকুর তো ঠাকুমার দেশের লোক। ট্যাবা যে শেষে পুণ্ডরীকাক্ষ হয়ে যাবেন তিনিও জানতেন না। ঠাকুর তোদের নাকি একবার দেখতে চেয়েছিলেন। বিনোদিনী দিদির নাতিরা কত বড়ো হয়েছে দেখার খুব সাধ। এবারে মাছ শিকারও হবে, ঠাকুরের মনোবাঞ্ছাও পূরণ হবে। বুঝলি কিছু। বললাম, আমার মন ভালো না, ঈশা যে কবে আসবে'! কেমন পাগল পাগল লাগছে। ঠাইনদি এক কথায় রাজি হয়ে গেল। ঠাকুরের আশ্রমে রাত যাপন করব শুনেই ঠাইনদি এক কথায় রাজি হয়ে গেল। —আশ্রমে কোনো বিপদ-আপদ থাকে না জানিস। তা ছাড়া ভৈরবী ঠাকরুন দেখবি তোদের কত আদরযত্ন করে খাওয়ায়। ঠাকুর আবার নদীরও দেবতা—তার প্রিয়জনদের অনিষ্ট হয় এমন কোনো কাজই করতে নদী সাহস পাবে না।

ঈশা এলে আমরা যে তাকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ি, ঈশার পূজার ছুটি হয়তো পড়েনি, গ্রীষ্মের ছুটিতে আসতে পারে না, অনেকটা পথ হাঁটতে হয়। বর্ষায় নৌকা এলে ঘাটে লাগে—বড়োই সোহাগি মেয়ে ঈশা। আমি ঈশার কথাই ভাবছিলাম। কী সুন্দর মেয়ে, ফ্রক গায়ে দেয়। আমরা লম্বায় এখনো সমান সমান। সে এলেই আমার পাশে দাঁড়িয়ে মাপবে। সে কত লম্বা হয়েছে।

আমাদের কোষানৌকা তখন পদ্ম আর শাপলা শালুকের বিলে ঢুকে গেছে। নদীতে সূর্য ডুবছে। এই বিল পার হলেই সংসারদির পুল। তারপরই সেই ডাঙা দেখা যাবে। বড়দা হালে বসে আছে। মেজদা আর নিরাময়দা বৈঠা মেরে পদ্মবন পার হয়ে যাচ্ছে। আমি চুপচাপ বসে আছি পাটাতনে—চারপাশে জলাভূমি আর অজস্র পাখির কলরব। তারা এতক্ষণ বিলের জলে ওড়াউড়ি করছিল। পোকামাকড় এবং মাছ ভেসে উঠলে, যেমন কিছু চিল এবং তার সঙ্গে দু-চারটি ঈগল পাখিও আছে, বিলের জল থেকে একটা ঈগল বিশাল ডানা মেলে জল থেকে ঝুপ করে তুলে নিয়েছে অতিকায় একটা মাছ এবং উড়ছে। জলা জায়গা বলে কোনো গাছপালা চোখে পড়ছে না। দূরের আশ্রমে দেখা যাচ্ছে, সব বড়ো বড়ো বৃক্ষ, এই তাজ্জব করা জায়গায় এসে কেমন একটা আশ্চর্য মোহ তৈরি হয়। পুণ্ডরীকাক্ষ কথাটার অর্থ কী জানতে ইচ্ছে হয়।

নিরাময়দা বললেন, আর বেশি দূর না। সূর্য ডুবতে না ডুবতেই আশ্রমের ডাঙ্গা পেয়ে যাব। কী রে ভোলা, পাটাতনে বসে যে একেবারে ভাবলু বনে গেলি'!

আমি যে ঈশার কথা ভাবছিলাম নিরাময়দা হয়তো টের পেয়ে গেছেন। আমি সোজা হয়ে বসলাম।

বল। মনে হয় কোনো সংশয়ে ভুগছিস?

বললাম, না মানে—

আরে মানে মানে করিস না। সব তাঁরই কৃপা।

কৃপা কেন।

তিনি তো ধরণীর তাবৎ সুখ-দুঃখের অধিকারী।

আচ্ছা কাকা, পুণ্ডরীকাক্ষ কাকে বলে?

বিষ্ণু অবতার।

এত খবর তুমি দাও, এত বড়ো একজন দেবতা নদীর পারে আশ্রম বানিয়ে বসে আছে বলোনি তো। আমার কথাবার্তায় ঈশাকে সম্পূর্ণ আড়াল করে গেলাম।

তোরা ছেলেমানুষ, কেবল স্কুল আর বিদ্যাশিক্ষা আর বছর বছর ফেলমারা। তার বাইরেও এক বড়ো জগৎ বিদ্যমান—সোজা হয়ে বোস। সব ঠিকঠাক আছে, কপালে সব লেখা থাকে। ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর এই তিন অবতার বুঝলি, আমাদের ঠাকুর বিষ্ণুর অংশ। আশ্রমে ঢুকে প্রথমেই তাঁকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত। সব বিপদ কেটে যাবে। আশীর্বাদে তাঁর পরীক্ষায় ভালো ফল করবি। তোদের চড়চড়ে কপালে বিদ্যুৎ রেখা ভেসে উঠবে। তিনি মঙ্গলময়। যত বড়ো মাছই শিকার করি না কেন, তিনি আছেন সর্বত্র। তিনিই আমাদের হয়ে মাছটাকে দেখবি কবজা করে ফেলবেন। মাছ শিকারে আমাদের কোনো বিঘ্ন ঘটবে না।

ঢাইন মাছ ধরার উত্তেজনা তো আছেই, তার উপর ঈশা, আমি ঈশাই ডাকতাম—তুই তুকারিও চলত, তবে ঈশা আমার চেয়ে কিছু বড়ো। ঠাকুমা জেঠিমা সবারই এক অভিযোগ, তুই কীরে, তুই নাম ধরে ডাকছিস? ঈশাদি ডাকতে পারিস না। ঈশাদি বলত, নারে, তুই আমার নাম ধরেই ডাকবি। দিদিফিদি আমার ভালো লাগে না।

নিরাময়দা বললেন, তোর পিসির পাত্তা নেই, তোর ঈশাদিও আসছে না, কী ব্যাপার!

আসলে আমাদের সবারই আগ্রহ আছে ঈশার সম্পর্কে। পূজার ছুটিতে পিসেমশাই সবার জন্য জামাকাপড় নিয়ে আসেন। আজকাল ঈশাই নাকি সব পছন্দ করে কেনে। আমার ওপর বাড়ির সবাই একটু বেশি সদয়। কারণ পরিবারে আমি পিতৃমাতৃহীন। জেঠিমা কাকিমার আদরেই বড়ো হয়েছি। ঈশা এলে সে আমাকে ছাড়া কোথাও এক পা নড়বে না। আমার পিসেমশাইয়ের ঢাকা শহরের বাংলা বাজারে বিশাল গারমেন্টের

দোকান। ঈশা তার বাবা-মায়ের সবেধন নীলমণি। তার আবদার কারও কাছে হেলাফেলার নয়। আর আমি যে বড়ো হয়ে গেছি, বছর দুই আগে ঈশাই বুঝিয়ে দিয়েছিল। সে আমাকে ছাড়াবাড়িতে সাপটে ধেরে টকাস করে চুমু খেয়েছিল।

ঈশা সম্পর্কে নিরাময়দার আসল আগ্রহ, পূজার জামাকাপড় তিনি তার হাত থেকেই পেয়ে থাকেন। ঈশার পছন্দের তিনি খুব প্রশংসা করে থাকেন। ঈশাদির রুচি আছে এমনও বলেন। আর ঈশা যে রহস্যময়ী নারী হয়ে যাচ্ছে গতবারের পুজোয় তা ভালোই টের পেয়েছি। এই করে কেন যে মেয়েটার জন্য আমার এত টান—এবং কখনো মনে হয় আর কেউ না থাকুক ঈশা আছে। সে আরও কিছু চায় আমার কাছে। ঈশার কথা ভাবলেই মন খারাপ হয়ে যায়।

আসলে তরুপিসি ঠাকুমার পালিতা কন্যা। ঠাকুমার কোনো কন্যাসন্তান না থাকায় তরুপিসি এ-বাড়িতে আশ্রয় পান। এবং আমার বাবা-কাকারাই তরুপিসির বিয়েও দেন। এই তো সকালে ঠাকুমাই বললেন, পরের মেয়ে এত করে, তোমরা বউমারা কি তার জন্য এতটুকু ভাব'! তারা আসছে না কেন, খোঁজখবর নিতে হয় না!

বড়ো জেঠি বলল, আপনার ছেলে তো জানে। ডেকে জিজ্ঞেস করুন না।

হ্যাঁরে উপেন তরু কবে আসবে। পূজার ছুটি পড়ে গেছে। ওদের কারও শরীর খারাপ হয়নি তো'!

না না। ভালোই আছে। ঈশার পূজার ছুটি একটু দেরিতেই হয়। জান না'!

আমাদের ছাড়াবাড়িটা প্রকৃতই নিঝুম। আট-দশ বিঘার ছাড়াবাড়িতে নানা ফলের গাছ। আম, আতা, লিচু, কাঁঠাল কী নেই'! সফেদা গাছও আছে। খালের ধারে কিছু জঙ্গলও আছে— আর আছে বড়ো বড়ো শিমুল, নিম, রসুনগোটার গাছ। কত রকমের যে গাছ'! সুপারি গাছও মেলা। ঈশার বড়ো প্রিয় এই ছাড়াবাড়ি। বর্ষায় জলে ডুবে যায় জায়গাটা। ঈশার খুব সাঁতার শেখার শখ। সে আমাকে নিয়ে কিছু ভাবলেই তলব—

এই ছোড়দা চল। ছোটো ভাইবোনেরা ছোড়দা ডাকে। ঈশাও ডাকে—এটা তার আবদার।

কোথায়!

ছাড়াবাড়িতে। আমাকে সাঁতার শেখাবি।

ধেড়ে মেয়ে, আমি পারব না।

ওমা। ধেড়ে মেয়ে বলায় কী রাগ। ফুঁসে উঠেছে।

আমাকে তুই ধেড়ে মেয়ে বললি! ধেড়ে মেয়ে হলেই বা কি! ধেড়ে মেয়েরা কী সাঁতার শিখতে পারে না'!

তা পারবে না কেন? আমি পারব না। বড়দাকে বল।

শোন ছোড়দা, আমাকে তোয়াজ করতে হলেও সে আমাকে ছোড়দা ডাকত।

বড়দাকে দিয়ে হবে না। সে কিছু জানে না। কিছু বোঝে না। কারও কর্তালি আমার সহ্য হয় না। বড়দার এটা আছে।

জান বড়দা আমার চেয়েও সাঁতারে বেশি পটু।

কিন্তু ঈশা নাছোড়বান্দা, সে অগত্যা তার মাকে ডেকে বলল, দ্যাখ মা ছোড়দা আমাকে সাঁতার শেখাবে না বলছে।

আরে যা না। তোকে ছাড়া তো কোথাও নড়ে না। সাঁতার শেখাতে তোর আপত্তি কেন'!

আপত্তি কেন, কী যে বলি। টুকুস করে চুমু খায়, বলে সাপটে ধর, ধর, আরও জোরে, আমাকে পিষে মেরে ফেলতে পারিস না। হস্তপদ নিয়ে গজ হয়ে গেছিস। কিছু কি তুই বুঝিস না। কিছু কি তোর নেই'!

মেয়েটা এত ভালো, অথচ মাঝে মাঝে কী যে হয়। বাড়ির ভালো-মন্দ খাবার সে রান্নাবাড়ি থেকে তুলে এনে ঠাকুরঘরের পেছনে খাওয়ায়। বলে সব স্বার্থপর ছোড়দা। কেউ তোর কথা ভাবে না। বলতে বলতে সহসা ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলে। সে গতবারে একটি ঝরনা কলম দিয়ে বলেছে, আমার জন্য মন খারাপ হলে চিঠি লিখবি কীরে লিখবি তো। আমার কত রকমের ইচ্ছা হয় জানিস। ভাবলে আমার নিজেরই লজ্জা লাগে। চল ছোড়দা। তারপর ফিস ফিস করে বলবে, আমি কিছু করব না। সঙ্গে সঙ্গে আমার মাথা কেমন ঝিম ঝিম করতে থাকে। ছাড়াবাড়িটি সাঁতার শেখার পক্ষে প্রকৃষ্ট জায়গা। বর্ষাকালে কোমর জল থাকে। ডুবে যাবার আশঙ্কা থাকে না। ভাদ্র মাসে পুকুরে এক লগি জল, হাত ফসকে গেলে ডুবে যেতেই পারে। তার কথা ভেবেই শেষে রাজি হওয়া।

কিন্তু মুশকিল সাঁতার শিখতে গিয়ে তার বায়না—এই ছোড়দা আমার হিসি পেয়েছে।

নাম জলে। কেউ দেখতে পাবে না।

ভয় করে। তুই নাম।

কোষা নৌকায় ছাড়াবাড়িতে যেতে হয়। নৌকা থেকে অগত্যা জলে লাফিয়ে নামতে হয়। কীসের সাঁতার শেখা। সে জলে নেমে হুটোপুটি শুরু করে দেয়। আর আমার শরীরের সঙ্গে লেগে থাকতে চায়। আমার মধ্যে অপরাধবোধ কাজ করে। তবু কেন যে এক সময় তার কোমর ধরে বুকজলে দাঁড়িয়ে থাকি। আর তার যে কী হয়, সে আমার

হাত ঠেলে আরও নীচে নামাতে গিয়ে কেমন অস্থির হয়ে পড়ে। তারপর কিছুটা বেহুঁশের মতোই বলে, আমি ডুবে যাব। তুই আমাকে জড়িয়ে ধর। আমি দিশেহারা হয়ে যাচ্ছি।

সে যেহেতু আমার জন্য এত করে, আমিও তার উত্তেজনা লাঘবের জন্য কিছুটা সাহায্য করি। এটাই ছিল ঈশার সাঁতার শেখার প্রক্রিয়া। ধীরে ধীরে সে সাঁতারও শিখে যায়। এবং বুঝতে পারি আমরা সত্যি বড়ো হয়ে গেছি। ঈশা আর আমার দিকে বাড়িতে চোখ তুলে তাকাতে পারে না। কথা বলতে পারে না। চোখের এই ভাষায় বড়ো হওয়ার কথা থাকে, তাও বুঝি। শরীরে ইচ্ছে অনিচ্ছে নানাভাবে বিচ্ছুরিত হতে থাকে। পূজার ছুটি হলেই তার আসার অপেক্ষা করি। এবারেও প্রায় তাই। দূরে দূরে সব জলময় মাঠ। কোনো ছই দেওয়া নৌকা দেখলেই ছুটে যাই। সময় কাটে না।

নিরাময়দা ঢাইন মাছ শিকারে নিয়ে না এলে এক ছন্নছাড়া মানুষের মতো বাড়ির ঘাটলায় চুপচাপ বসে থাকা ছাড়া উপায় থাকে না।

সামান্য বড়ো হয়ে ওঠার মুখেই সে যে কী গন্ধ পেয়ে গেল আমার শরীরে'! আমি হাটে যাব নিরাময়দা সঙ্গে—সেও আমার সঙ্গ নেবে।

খেলার মাঠেও তাই।

সুপুরি গাছে ওঠারও সাধ তার। প্রায়ই বলবে, তুই সঙ্গে থাকলেই আমার কেন যে এত হিসি পায়'! প্যান্টিটা ধর। আমি সুপুরি গাছে উঠব। সুপুরি গাছে চড়া শিখব। সুপুরি গাছে সহজে ওঠা যায় না। কিছুটা উঠলেই হড়হড় করে পড়ে যেতে হয়। প্রকৃতই তার প্যান্ট ভিজা ভিজা থাকে।

কত ছবি হয়ে আছে সেই সব দৃশ্য কিংবা দুই বালক-বালিকা, পুজার সময় প্রকৃতির মধ্যে বড়ো হয়ে উঠছে—এক অষ্টমী পূজায় ঈশাকে কুমারী পূজাও করা হয়। এমন বন্য স্বভাবের মেয়ে যদি দুর্গা মণ্ডপে কুমারী সেজে বসে থাকে, তার পূজাআর্চা হয়, বড়ো বড়ো পদ্মফুলের সিংহাসনে এক দেবীকন্যা, কে বলবে তার মধ্যে পাক খাচ্ছে প্রকৃতির নানা কূটকামড়, পূজা আসলেই আমার এখনো মন খারাপ হয়ে যায়।

নিরাময়দা বলল, এসে গেছি।

আমাদের কোষা নৌকা খুব একটা বড়ো নয়। চারজন আমরা, নৌকা বড়ো হলে নদীর উজানে উঠে যাওয়া খুব কষ্টসাধ্য—নৌকা যত ছোটো হয়, ততই জলে নৌকা ভাসিয়ে নিতে সুবিধে। শত হলেও মাছে-মানুষে লড়াই— কপালে থাকলে দু-মনি, আড়াই-মনি ওজনের মাছও লেগে যেতে পারে। পরিণামে নৌকাডুবি হয়। নদীর তরঙ্গে ভেসে কিংবা পাতালে অদৃশ্য হয়ে যাবার সম্ভাবনাও থাকে। ঠিক হয়ে আছে, রাতে আশ্রমে আহার এবং ঠাকুরের ফুল বেলপাতার আশীর্বাদ, এবং ঠাকুমার সেই ট্যাবা, যিনি এখন নিরাময়দার

পুণ্ডরীকাক্ষ অর্থাৎ বিষ্ণুর অবতার, তার অনুমতি নিয়ে ভোররাতে ভাটার মুখে জয় মা জগদম্বা বলে নদীর বুকে বড়শি ছুঁড়ে দিয়ে বসে থাকা। গভীর জলে বড়শিতে আরশোলা গেঁথে, সেই কোন গভীরজলে ছুঁড়ে দেওয়া।

তারপর গভীর জলের নীচে বড়শি আরশোলার টোপ নিয়ে অপেক্ষা করবে, এবং শয়ে শয়ে নৌকার এই মাছ শিকার এক আশ্চর্য রোমাঞ্চকর ঘটনা। মাছে-মানুষে লড়ালড়ি, মাছ আটকে গেলে মাছে-মানুষে খণ্ডযুদ্ধ। প্রবল সেই রোমাঞ্চ শরীরে শিহরণ খেলে যাবার মতো—ঈশার সেই সাঁতার শেখা কিংবা সুপুরি গাছ বেয়ে ওঠার মতো আশ্চর্য এক স্তব্ধতার অনুভূতি—

তখনই দেখলাম নদীর উত্তর-পশ্চিম কোণে এক প্রগাঢ় খণ্ডমেঘ উঠে আসছে।

বর্ষাকালে প্রবল ঝড় হয়েই থাকে। বহু জনপদ ঝড়ের মুখে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। নিরাময়দা নৌকা থেকে নেমে যাবার সময় বলল ঠাকুরের কৃপায় মেঘ কেটে যাবে'!

আমরাও লাফিয়ে নামলাম। দূরে আশ্রমের হ্যাজাকের আলো জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। বিশাল এলাকার এই ডাঙা জায়গা খ্যাপা নদীর কোনো রোষই প্রত্যাঘাত করতে পারে না। অজস্র বৃক্ষ, এবং এক খণ্ড অরণ্যও বলা চলে, দূরে সেই মহাশ্মশানে আজ কোনো চিতার আগুন দেখা গেল না, ঠাকুর পুণ্ডরীকাক্ষ মন্দিরের গর্ভগৃহে জপতপে বসেছেন, নিরাময়দা কেমন প্রমাদ গুনলেন—আশ্রমের হরি ব্রহ্মচারী দেখাশোনা করছে সব। তিনিই মন্দিরের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে গেলেন।

আশ্রমবাসীর সংখ্যা যথেষ্ট। নানারূপে তাঁরা আছেন। ছোটো ব্রহ্মচারী, বড়ো ব্রহ্মচারীরা নানা কাজে ব্যস্ত। তাদের একজন হরিঠাকুর কী ভেবে বললেন, চলুন অতিথি ভবনে বসবেন। জপ তপ সারতে ঠাকুরের দেরি হবে। ভবনটি বিশাল, মাঘ সংক্রান্তিতে এখানে মেলা হয়। তখন দূর দূর অঞ্চল থেকে এমনকী ঢাকা শহরের গণ্যমান্য পুণ্যার্থীরা এসেও ওঠেন। জাগ্রত দেবী। তাকে অবহেলা করা যায় না। কোনো পাটের আড়তদার ভবনটি জগদম্বার নামে তৈরি করে দিয়েছেন। সারা অঞ্চল জুড়ে ঠাকুরের মেলা শিষ্য। মন্দির, অশ্বত্থগাছ, অতিথি ভবন, আর নদীর বিশাল ঘাটলা তো আছেই। এই সব দেখে আমরা হতবাক, কলাপাতায় তখনই কিছু প্রসাদ চলে এল। প্রসাদ শেষ হতে না হতেই, ঠাকুর স্বয়ং হাজির।

আমার নাতিরা কই?

একেবারে নিকট আত্মীয়ের মতো সাদাসিধে সরল কথাবার্তা।

তারপর বললেন, দিদির নাতিরা আমারও নাতি। দেখি। আমাদের সামনে হাঁটু গেড়ে বসলেন।

জটাজুটধারী এবং শ্মশ্রুমণ্ডিত মানুষটিকে কেন যে আর ভয় থাকল না। খবর পেয়ে লীলাবতী ভৈরবিও হাজির। কই দেখি অচল ভোলা উমারে।

যেন কত কাল আমাদের দেখার জন্য প্রতীক্ষায় ছিলেন। শেষে যে বিনোদিনী দিদি রাজি হয়েছেন, কারণ লীলাবতী বংশের কলঙ্ক, এমনও শুনেছি সামাজিক বাধানিষেধ অগ্রাহ্য করে বিধবা লীলাবতী এক কাপড়ে ট্যাবা ভট্টাচার্যের সঙ্গে পালিয়ে যাওয়ায় বংশের মুখে কালি পড়ে এবং সেই থেকে বিনোদিনীর পরিবার এবং তাঁর আত্মীয়স্বজন পারতপক্ষে এই আশ্রমের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রাখতে চায় না। লীলাবতী মরে গেছে এমনই চাউর হয়ে গেছিল।

সে যাইহোক, বলতে গেলে অনেক কথা হয়।

তিনি অর্থাৎ পুণ্ডরীকাক্ষ ঠাকুর বললেন, নদীতে তো ভাই তোমাদের যাওয়া হবে না। উত্তর-পশ্চিম কোণ থেকে অতিকায় কালো মেঘে নদী আবৃত হয়ে গেছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই নদী ঝড়ে খণ্ডবিখণ্ড হয়ে যাবে। বহু প্রাণহানির আশঙ্কা আছে। নদী শান্ত না হলে তোমাদের ছাড়া যাবে না।

শত হলেও নিরাময়দার পুণ্ডরীকাক্ষ ঠাকুর বাকসিদ্ধ পুরুষ। তার কথাই শেষ কথা।

নিরাময়দা ঠাকুরের পাশে হাত জোড় করে বসে আছেন। শুধু ওঠার মুখে নিরাময়দা বললেন, যে আজ্ঞে বাবাঠাকুর। আর তখনই বাবাঠাকুর খুবই যেন আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে বললেন, ঈশা নারানগঞ্জের স্টিমারে রওনা হয়েছে—অথচ স্টিমারের কোনো পাত্তা নেই। ঝড় কি নদীর মুখে শুরু হয়ে গেল।

তখনই বিদ্যুৎ চমকাল। কোথাও বাজ পড়ল, আর প্রলয় শুরু হয়ে গেল যেন। মহাপ্রলয় কাকে বলে। নদীর জল আশ্রমের ঘাটাল পার হয়ে অতিথিভবনের সিঁড়িতে ঢুকে গেল। এবং নদীর তরঙ্গমালায় নানাপ্রকারের বিদ্যুৎলতা সাপের ফণা তোলার মতো ভেসে যেতে লাগল। নদীর জল ফুলে ফেঁপে উঠছে। আর শোঁ শোঁ আওয়াজ। জানালা-দরজা বন্ধ। চারপাশে অন্ধকার নিস্তব্ধতা। ঈশা স্টিমারে রওনা হয়েছে—আমার ভেতর তোলপাড় শুরু হয়ে গেল ঈশার কথা ভেবে।

নিজের ভিতর নিজেই ছটফট করছি।

আমার পিসেমশায় হয়তো আশ্রমে খবর পাঠিয়েছেন, তাঁরা স্টিমারে রওনা দিয়েছেন, কারণ পূজার ছুটিতে কিংবা ঈশা যদি অন্য কোনো ছুটিছাটায়, অথবা বাড়ির কোনো উৎসবে, কারুর বিয়ে, অন্নপ্রাশন, বাস্তুপূজা এবং নানাবিধ পূজা সহযোগে উৎসব লেগেই থাকে। পিসেমশাই আসতে না পারলে পিসিমা ঈশাকে নিয়ে চলে আসবেনই, সঙ্গে বিশ্বস্ত

কোনো কর্মচারী এবং আশ্রমের ঘাটে স্টিমার নোঙর ফেললে মন্দির দর্শন, ঠাকুরের পায়ে প্রণিপাত এবং রাত্রিবাস করে ফের সকালের নৌকোয় রওনা হওয়া।

ঈশার বন্য স্বভাবের কথা মনে পড়ছে।

মেয়েটা বলত, তুমি আমায় ভালো না বাসলে একদিন দেখবে আমি মরে যাব।

কেন মরবি? মরা কি এত সহজ?

ঠাকুর তো বলেছে, আমার মৃত্যু জলে ডুবে।

আজেবাজে কথা একদম বলবি না।

বলেছে বলছি।

কেন বলল। তুই কী করেছিলি'! তুই তো সাঁতার জানিস?

সে দিনও মেঘনায় সাঁতার কাটছিলাম। বাবার কী মানত ছিল'! দুদিন তিনি আশ্রমে ছিলেন। পাঁঠাবলি হবে শুনে, আমার রাগ, পাঁঠাবলি কেন?

ঠাকুর খুবই কুপিত।

শোনো ঈশা, সবই মা জগদম্বার ইচ্ছা। তিনি যা চান দিতে হয়। গোলমাল করে পূজার বিঘ্ন ঘটিও না।

কে শোনে কার কথা।

ছাগ শিশুটির আত্মরক্ষার্থে কোলে নিয়ে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম। বৈশাখ মাস, নদীতে হাঁটু জল। নদীর ওপারের চরে ছেড়ে দিয়ে এসেছিলাম। জল থেকে উঠে আসার সময় কুপিত হয়ে বললেন, নদীর জলেই তোমার মরণ ঈশা। মা জগদম্বার ইচ্ছার বিরোধী তুমি। তোমার জন্য আমার নিজেরই কষ্ট হচ্ছে। মুখ থেকে কথাটা কী করে যে ফসকে বের হয়ে গেল।

আমি বলেছিলাম, কচু হবে দেখিস'!

তারপরও কিছু করণীয় থাকে।

এবং বাকসিদ্ধ মানুষের এই এক বিড়ম্বনা। কুপিত অবস্থায় একরকম, মন শান্ত হলে অন্যরকম। অনুশোচনায় মাথা খারাপ হয়ে যায় ঠাকুরের। সবই অমোঘ ঈশ্বরবিশ্বাস হেতু। তিনি জানেন তাঁর কথা মিথ্যে হয় না। তিনি দিনের পর দিন অনশনে থাকলেন। মা জগদম্বাকে তুষ্ট করার জন্য হোমের আয়োজন, সারা দিন উপবাস থেকে সেই হোমে অপাবৃত অবস্থায় মন্ত্র উচ্চারণ করালেন ঈশাকে দিয়ে, অঘোরমন্ত্রে দীক্ষিত করালেন, বাক্যদোষ খণ্ডনে শাস্ত্রমতে যা যা করণীয়, কিছুই বাদ দিলেন না।

ঈশা-ই তাকে সব খুলে বলেছে।

ছোড়দা কাউকে বোলো না। বললে মন্ত্রশক্তি নষ্ট হয়ে যায়।

তখনই ঝড়ঝাপটা আর বজ্রপাতের মধ্যে নদীর মাঝখানে স্টিমার চরায় ঠেকে গেছে। আশ্রমের পাশেই হাট, এবং মাছ ধরতে আসা সব নৌকাই ডাঙায় তুলে দিয়ে সবাই এসে আশ্রয় নিচ্ছে আশ্রমে, আর তখনই স্টিমার থেকে বার বার আর্তনাদের মতো ভোঁ ভোঁ আওয়াজ। ভয়ঙ্কর বিপদসূচক বার্তা পাঠাচ্ছে। কেউ স্থির থাকতে পারছে না। ঠাকুর শুধু বললেন, প্রলয়কালে এমনই হয়ে থাকে।

তারপর তিনি, আরও যারা ঝড়ের আতঙ্ক থেকে আত্মরক্ষার্থে আশ্রমের ঘাটে উঠে এসেছিল তারা—নিরাময়দা তো আছেনই, টর্চ হাতে আশ্রম থেকে নেমে গেলেন। জীবন বাজি রেখে আমরাও নেমে গেলাম। আর চারপাশে টর্চ জ্বেলে খুঁজতে থাকলাম, কোনো জলে ডোবা মানুষ যদি নদীর পাড়ে পড়ে থাকে।

নদীর পাড় অনতিক্রম্য। এখানে সেখানে সব গাছপালা পড়ে আছে। ডাল পাতা সব বেগে ধেয়ে যাচ্ছে। ঠাকুর কেবল মা জগদম্বার নাম নিচ্ছেন। তুমিই অগতির গতি। স্টিমারের আলো নিভে গেছে, অন্ধকারে বোঝাই যাচ্ছে না, নদীর কোন চরায় স্টিমারটা আটকে গেল। বিদ্যুৎ চমকালে বোঝা যাচ্ছে, যাত্রীরা প্রাণ হাতে তরঙ্গসঙ্কুল নদীতে ঝাঁপ দিচ্ছে। আর তখনই নিরাময়দা এবং আর কেউ কেউ, এমনকী আমরাও আশ্রমে উঠে এসে নদীতে নৌকা ভাসিয়ে দিলাম। আমার মাথা খারাপ অবস্থা—ডাকছি ঈশা, ঈশা, আমরা নদীতে আছি, তুই কি স্টিমারে? ঈশা, ঈশা। নিরাময়দার চিৎকার থাম থাম। ওই দ্যাখ ভেসে যাচ্ছে, আমরা এক এক করে তুলছি, আর আশ্রমে এনে শুইয়ে দিচ্ছি। জীবিত, মৃত কেউ বাদ যাচ্ছে না। এতগুলি নৌকা একসঙ্গে উদ্ধার কার্যে নামলে যা হয়, ঈশার কথা কেউ আর মনে রাখে না।

ঝড়ের প্রকোপ কমে আসছে।

কিছু মানুষজন সাঁতরে পাড়ে উঠে আসছে।

বৈদ্যেরবাজার থেকে থানার দারোগাবাবু সব সেপাইদের নিয়ে ত্রাণের কাজে নেমে পড়েছেন। বড়ো টর্চের আলোয় নদীতে জলে ডোবা মানুষ খুঁজে বেড়াচ্ছে তারা। আর আমি পাগলের মতো এক নৌকা থেকে আর এক নৌকায় লাফিয়ে পড়ছি। আর ডাকছি, ঈশা। ঈশা। তুই কোথায়'! আর নানা প্রশ্ন, পিসিমা, পিসেমশাই এল না কেন? একা চলে এলি'! তোর সঙ্গে আর কে আছে?

নিরাময়দা সারেঙকে হুইলঘরে পেয়ে গেছেন। ডেকছাদে তাঁরও ছোটাছুটি কম না। জনে জনে লাইফবেল্ট লাইফ বয়া দেওয়া, শিশু, নারীকে আগে বোটে পার করে দেওয়া,

তাঁর লস্করদের নিয়ে তিনি এখানে সেখানে কাজ বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন, ঘুটঘুটে অন্ধকারে কিছু বোঝাও যাচ্ছে না। নিরাময়দার গলা পাওয়া যাচ্ছে।

সারেঙসাব ঈশাদির আসার কথা, সে কোথায়?

সারেঙসাব আর্তগলায় বললেন, ঈশাদি কথা শুনল না। চরায় ধা ক্কা খেয়ে স্টিমার দু-টুকরো। কে কোথায় ডুবেছে, কী ভেসেছে—জানি না। নদীর কঠিন তরঙ্গ দফে দফে ডেকছাদ সাফ করে নিয়ে গেছে। তরঙ্গ উঠে আসার ফাঁকে ছোটাছুটি করছি, ঈশাদির সঙ্গে গগন এসেছে।

গগন পিসেমশায়েরই বিশ্বস্ত কর্মচারী, প্রৌঢ় মানুষ।

কোথায় গেল'!

ঝড়ের মধ্যেই খ্যাপা নদীতে তারা ঝাঁপিয়ে পড়ল।

ঈশাকে সারেঙসাব চিনতেই পারেন। কেবিনের যাত্রী ঈশা। ডেকছাদে মাত্র তিনটে কেবিন। সব কেবিনগুলোর দরজাই ফাঁক হয়ে আছে। আর কড় কড় শব্দ উঠছে। সব কেবিনগুলিতেই উঁকি দিলাম, সব ফাঁকা।

সারেঙসাব ছুটে এসে বললেন, ঈশাদি আমায় বলল, আমি সাঁতার জানি। এই তরঙ্গসঙ্কুল নদীকে সে ভয় পায় না। সামনের আশ্রমে ঠিক সে উঠে যেতে পারবে।

হায় কপাল, তালগাছ প্রমাণ সব ঢেউ, ঈশা তো জানে না তাকে কোথায় ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। সে কারও কথা শোনার বান্দা যে না আমিও বড়ো হতে হতে কতবার টের পেয়েছি। ছোটোদাদু আমাদের দু-জনকে একসঙ্গে দেখলেই ফোকলা দাঁতে হাসতেন।—এই দুপুরের রোদে কোথায় যাওয়া হচ্ছে। তোর মাকে ডাকছি ঈশা।

ডাকো না। সঙ্গে ছোড়দা আছে।

ভিতরে প্রাণসৃষ্টির মধুমালা কুব কুব করে ডাকছে যে, কে আর আটকায় দিদি তোকে।

ইশা তাকায় আমার দিকে।

আমিও। তারপরই ঈশা ছুটে আমার সঙ্গে উঠে যেত ছাড়াবাড়িতে। ছোটোদাদু বলতেন, প্রাণসৃষ্টির পুঁথির পাতাটি খুলে গেছে, কী মজা'!

এই সব কথাই মনে হচ্ছিল। ভিতরে হায় হায় করছিলাম। আমি ডাকছি, ঈশা, ঈশা। ঈশাকে খুঁজে পাওয়ার জন্য পাগল হয়ে যাচ্ছিলাম। ঈশার নানা উপদ্রব আমার কাছে এখন জীবনের মাধুর্য। আমি তখন আর এক খ্যাপা। তরঙ্গ উঠে আসছে নদীর। নৌকার চেয়ে এই তরঙ্গমলায় ভেসে যাওয়া সহজ।

সব তরঙ্গই নদীর কিনারে আছড়ে পড়ছে।

আর আশ্রমে উঠেই শুনলাম, কিছু জলে ডোবা মানুষকে তুলে আনা হয়েছে। কেউ মৃত কেউ অর্ধমৃত। সমস্ত আশ্রম জুড়ে মানুষের কান্না এবং কোলাহল। সব ডে-লাইট জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে।। ঈশাকেও পাওয়া গেছে। নিরাময়দা বললেন, ঈশাকে মন্দিরের বারান্দায় শুইয়ে রাখা হয়েছে। মাথায় তুলে হরি ব্রহ্মচারী তাঁকে ঘোরালেন। কিছুটা জল উগলে দিল। তারপর নিস্তেজ। ঠাকুর পুণ্ডরীকাক্ষ তার নাড়ি ধরে বসে আছেন। আর কালীস্তোত্র জপ করছেন। তোরা গিয়ে ঈশার পাশে বোস। আমার দিকে তাকিয়ে নিরাময়দা সতর্ক করে দিলেন, পাগলামি করিস না। সব ভবিতব্য। ঈশার শিয়রে শান্ত হয়ে বোস। আমি বাড়ি যাচ্ছি খবর দিতে।

এক সময় পুণ্ডরীকাক্ষ ঠাকুরও উঠে গেলেন। লীলাবতী ঈশাকে জড়িয়ে হাউ হাউ করে কাঁদছে। সাদা কাপড়ে ইশার শরীরও ঢেকে দেওয়া হল। আমি ঈশার শিয়রেই বসে আছি। কখন যে দেখি পাশে কেউ নেই। ঝড়ে সাদা কাপড় উড়িয়ে নিয়ে গেছে। কে বলবে, ঈশার সব শেষ, সে তো ঘুমিয়ে আছে, ফ্রক গায়ে দিয়ে ঘুমিয়ে আছে। ঈশার সেই মধুমালা কোথায় গেল? ডাকলে সেই প্রাণের সাড়া পাওয়া যাবে না'! কিংবা সাপটে ধরলে। কেউ তো নেই। সব আশ্রমের বিশাল প্রাঙ্গণে, নদীর পাড়ে উদ্ধার কাজে ব্যস্ত।

প্রাণের সাড়া যদি পাই। আমি তাকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেলাম নির্জন বারান্দায়। উষ্ণতা সৃষ্টি হোক, সে ভিতরে জেগে উঠুক। তারপর আরও নানা চেষ্টা, না, সাড়া নেই। আমি তার মুখের উপর ঝুঁকে ডুকরে কেঁদে উঠলাম। আমার দু-ফোটা অশ্রুবিন্দু তার চোখের পাতা ভিজিয়ে দিতেই সে যেন জেগে গেল। সে চোখ মেলে তাকাল। সে এক আশ্চর্য বিস্ময় ভরা চোখে আমাকে দেখছে।

গন্ধ

কলকাতায় আবার বৃষ্টিপাত আরম্ভ হয়েছে। রাস্তাঘাট এবং সব সবুজ মাঠ যদি কোথাও থাকে প্রায় খালবিলের মতো। উত্তর থেকে হাওয়া এলে জানালা দরজা খুলে দেওয়া হচ্ছে। দক্ষিণ থেকে হাওয়া এলে দরজা জানালা বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে। বৃষ্টিপাতের সময় দক্ষিণের হাওয়া প্রবল। গাড়ি ঘোড়া বাস ট্রাম ভিজতে ভিজতে চলে যায়। কখনো সার সার থেমে থাকে। বিদ্যুৎ চমকায়। আকাশ চুরমার করে দিয়ে বজ্রপাতের শব্দ নেমে আসে। তখন কেউ হুইসকি গলায় ঢেলে বৃষ্টিপাতের শব্দ শুনতে ভালোবাসে। ক্যাবারেগুলোতে মধ্য যামিনীতে উদ্দাম নৃত্যমালা। কলকাতায় যে বৃষ্টিপাত আরম্ভ হয়ে গেল, একেবারেই তখন তা বোঝা যায় না।

দেবদারু গাছটা ল্যাম্পপোস্টের মতো দাঁড়িয়ে ভিজছে। সকাল থেকে বৃষ্টি। সারারাত বৃষ্টি গেছে। রাস্তায় জল জমছে। বাড়ছে। লোকজন হাঁটুর ওপর কাপড় তুলে, মেয়েরা শাড়ি তুলে, ছেলেরা প্যান্ট ভিজিয়ে জল ভেঙে যাচ্ছে। কলকাতার এ-সময়ের চেহারা কেমন পাল্টে যায়। নরকের মতো হয়ে যায়। এবং দেবদারু গাছটার নীচে যে সংসারটা ছিল সেটা থাকে না। কোথাও উধাও হয়ে যায়। এবং জল নামতে শুরু করলে, হাইড্রেন খুলে ফেললে দেখা যায় শহরের ওপর সব কাক উড়ছে। এ-সময়টাতে শহরে বোধ হয় কাকের উপদ্রব বাড়ে।

সকালে বিকেলে এভাবে বৃষ্টিপাতের ভেতর যখন কলকাতা ভিজছিল, যখন রাস্তায় মানুষের ভিড় উপছে পড়ছে এবং যখন সূর্য আর দেখা যাবে না বলে সবাই কোলাহল করছে তখন ফ্ল্যাট বাড়ির জানালায় একটা দুঃখী মুখ দেখা গেল। সে দাঁড়িয়ে আছে। দেবদারু গাছটার নীচে জল উঠে এসেছে। ছেঁড়া নেকড়া, হাঁড়িপাতিল ভাঙা এবং দূরে সে টের পেল গাড়িবারান্দার নীচে সেই সংসারের বুড়ো মানুষটি হাঁটু মুড়ে পরিত্যক্ত রোয়াকে বসে শীতে কাঁপছে।

দুঃখী মেয়েটা বেশ সুখে ছিল। বাবা এই সুন্দর ফ্ল্যাট কিনে চলে এসেছে। না এখন আরও যুবতী হয়ে উঠেছে। সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেলে রোজ সেই দেবদারু গাছ। একেবারে পরিপাটি সংসারের বাইরে বিশ্রী সাংঘাতিক কিছু। সে যে প্রথম দেখছে এমন, সে যে আর

কখনো ভিখিরি অথবা ফুটপাথবাসিনীদের দেখেনি তা নয়। কিন্তু এখানে সে রোজ সকালে উঠে যখন স্কুলে যায় দেখতে পায় বছর দু-বছরের বাচ্চাটা পড়ে থাকে গাছের নীচে। ঘুমোচ্ছে। কিংবা কখনো বসে বসে খেলা করছে। ওর বড়ো বোনটা বসে বসে উকুন মারছে। এবং যখন স্কুল থেকে সে বেণি দুলিয়ে ফেরে, দেখতে পায়, কোত্থেকে সেই মেয়ে এবং মা সংগ্রহ করে এনেছে রাজ্যের পচা পটল, পেয়াজ, কুমড়ো, মাছের পচা নাড়িভুঁড়ি, পাঁঠার মাথার কঙ্কাল। ভীষণ দুর্গন্ধে ওর পেট গুলিয়ে ওঠে। সিঁড়ি ভাঙার সময় সব সুখ কারা এভাবে কেড়ে নেয় তার। সে দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকে বাথরুমে ঠুকে যায়। জল বমি করে ফেলে।

মা দৌড়ে আসে। রানু আবার বমি করছিস।—পেটটা আবার গুলিয়ে উঠল। এভাবেই মেয়েটার অসুখটা আরম্ভ হয়ে যায়। ডাক্তার হাসপাতাল, হাসপাতালে গেলে কমে যায়, এবং বাড়ি ফিরে এলেই আবার কেমন তার অসুখ।—মা তুমি পাচ্ছ না।

কী পাব'!

কেমন একটি গন্ধ!

না তো।

সত্যনারায়ণ বাড়ি ফিরে শুনতে পায়, মেয়েটা আবার খাচ্ছে না। খাবার দেখলেই বমি করে ফেলে।

কী গন্ধরে বাবা'! জানালাটা মা বন্ধ করে দাও।

সত্যনারায়ণ মোটামুটি হিসেবি মানুষ, সামান্য ক্লার্ক থেকে বড়োবাবু, অফিসের। এবং টাকা লেনদেনের ব্যাপারে চতুর। স্ত্রীর অভাব-অনটন সে একেবারেই রাখেনি, যা যা চাই ফ্ল্যাট বাড়ি এবং ফ্রিজ নতুন গডরেজের আলমারি, এবং হিসেবি বলে এক মাত্র মেয়ে রানু। সংসারের কোথাও সে হিসেবের বাইরে নয়। পুত্রসন্তানের যে ইচ্ছে ছিল না, এমন নয়, কিন্তু যা হয়ে থাকে পরীক্ষা-নিরীক্ষাতে সে আর যায়নি। সে একটি হবার পরই সব থামিয়ে রেখেছে এবং গতকাল এই শহরে বৃষ্টিপাতের ঠিক আগে সে দেখে এসেছিল, দেবদারু গাছটার নীচে, বৌটা আবার একটা বাচ্ছা দিয়েছে। এই নিয়ে ক-টা বাচ্ছা। সে ঠিক গুনে বুঝতে পারে না। ওদের ক-টা বাচ্চা, সে টের পায় না। বৌটার সঠিক স্বামী কোনটা। সে দেখতে পায়, তিন-চারজন পুরুষ, পরনে লুঙ্গি, কানে বিড়ি গোঁজা, গলায় তাবিজ, এবং সূর্যাস্তের মুখে তারা কোথায় চলে যায়। আবার সে কখনো দেখে বেশ আরামে বৌটার কোলে মোথা রেখে ঘুমোচ্ছে একটা বুড়ো মতো মানুষ। শহরে বাস ট্রাম তেমনি যায়। রাস্তায় লোকাভাব থাকে না, কলেজ এবং স্কুল ছুটি হলে সব সুন্দর সুন্দর দিদিমণিরা কত সব ফিসফাস কথা বলতে বলতে চলে যায়। সত্যনারায়ণ ভেবে পায় না

এখন বৌটার ক-টা বাচ্ছা। একটা দুটো না দু-সহস্র। এবং যা হয়, সে রাস্তায় কোনো অপোগণ্ড দেখলেই ভেবে ফেলে সেই বৌটার পেট থেকে বাচ্চাটা বের হয়েছে।

সত্যনারায়ণ দরজা জানালা সব বন্ধ করে রাখে। বলে, পাচ্ছিস।

হ্যাঁ বাবা।

কোথা থেকে আসে।

রানু তখন চুপচাপ শুয়ে থাকে। আর কিছু বলে না। এক টুকরো আপেল ক-দানা আঙুর এবং নাসপাতি এনে দেয় মালতী। বলে, খা। খাতো মা। না খেলে বাঁচবি কী করে।

এই খাওয়া নিয়ে সংসারে এখন কত অশান্তি। মেয়েটা কিছুতেই কিছু খেতে চায় না। কেমন ভেতর থেকে তার দুর্গন্ধ উঠে আসে তখন। বাবার এত আয়াস, মার এমন যত্ন, তার কাছে তখন অত্যাচার মনে হয়। সে চিৎকার করে ওঠে কখনো তোমরা সবাই মিলে কেন আমাকে মেরে ফেলতে চাও। আমি কি করেছি।

মালতী আর পারে না। ডাক্তার মজুমদার বললেন, খাওয়াতেই হবে। অসুখটা কি ঠিক তো ধরা যাচ্ছে না। সবই তো করালেন। ট্রপিকেলে রেখে দেখলেন। কোথাও কেউ শরীরে কোনো ত্রুটি খুঁজে পাচ্ছে না।

এবং এভাবে দিন দিন মেয়েটা যখন শুকিয়ে যাচ্ছিল এবং সংসারে সত্যনারায়ণ যখন চতুর কথাবার্তা বলতে আর একদম সাহস পায় না, অথবা কোনো বিল পাশ করে দেবার ব্যাপারে একটা মোটা অঙ্কের টাকা হাতে এসে যায়, সে আর আগের মতো মালতীর হাতে দিয়ে ভরসা পায় না। কেবল মনে হয় কোথাও কোনো দুর্গন্ধ উঠছে, সে ভেতো মানুষ বলে, মালতীর চর্বি জমেছে বলে টের পাচ্ছে না। মেয়েটার ভেতর এখনো সে-সব দুর্গন্ধ জমা হয়নি, বাইরের সামান্য অন্ধকার চেহারা তাকে ভয় পাইয়ে দিচ্ছে। সত্যনারায়ণ বলল, রানু তোমার কিছু হয়নি। ওটা তোমার ম্যানিয়া।

রানু ও-পাশ ফিরে শুয়ে আছে। পাখা ঘুরছে। কোথাও রেডিওতে বিবিধভারতী হচ্ছে, কোথাও কেউ পেট ভরে খেয়ে বড়ো ঢেকুর তুলছে এবং জানালা দিয়ে সেই অতীব গন্ধটা সারা বাড়ি ছেয়ে ফেলছে কেউ টের পাচ্ছে না। ওর হাই উঠছিল। জানালাটা বন্ধ করে দিলে ভালো হত। অথচ বন্ধ করে দিলেই কেমন দমবন্ধ ভাব। সে নিঃশ্বাস নিতে পারে না। কপাল ঘামে। শরীরের শুচিতা কেমন নষ্ট হয়ে যায় তার। তখন চিৎকার করতে থাকে, মা আমাকে কোথাও নিয়ে চল। এ-ভাবে এখানে থাকলে মরে যাব। মালতী হতাশ গলায় তখন বলে, রানু তোমাকে নিয়ে পুজোর ছুটিতে গোপালপুর চলে যাব, আর ক-টা দিন, বাবার ছুটি হলেই আমরা চলে যাব। চলে গেলেই তুমি আর গন্ধটা পাবে না। তুমি নিরাময় হয়ে যাবে।

রানু আবার চুপ করে থাকে। কথা বলে না। এমন সুন্দর মেয়েটা, কি ভারী চোখ তার, আর হাত-পা লম্বা হয়ে যাচ্ছিল, চুল বড়ো হয়ে যাচ্ছিল। শরীরে সব অমোঘ নিয়তিরা বাড়ে দিনে দিনে। তখন কি না একটা অসুখ। কিছুই খাওয়ানো যায় না। যতটা খায় তার চেয়ে বেশি বমি করে দেয়। উগরে দেয় যেন। ভেতরে কোনো দৈত্য বাসা বেঁধেছে। সুখী মেয়েটাকে এমন দুঃখী করে রেখেছে এবং একদিন চোখের ওপর বুঝতে পারে মেয়েটা মরে যাবে।

সত্যনারায়ণ সেদিন দেবদারু গাছটার নীচে এসে থমকে দাঁড়াল। একটা মরা পায়রার ছাল ছাড়ানো হচ্ছে। পায়রা না ডাহুক না কাক, সে আর এখন সঠিক কিছু বুঝতে পারছে না। বাতাসে সব পালক উড়িয়ে নিয়েছে। কেন একটা পচা দুর্গন্ধ এসে নাকে লাগতেই ওপরে জানালায় দেখল রানু দাঁড়িয়ে দেখছে। আর তখনই কেন জানি ওর ইচ্ছে হচ্ছিল, লাথি মেরে এই বৌটির হাঁড়ি পাতিল, ছেঁড়া কাঁথা কাপড়, পলিথিনের বাক্স সব ফেলে দেয়। দুর্গন্ধে টেকা যাচ্ছে না। কতদিন পর ওর চোখের ওপর এই সব বেআইনি ইতর মনুষ্যকুলের নোংরা তৈজসপত্র তাকে গিলে খাচ্ছিল। রানু কোনো দিন বলেনি, বাবা, ওখানে গন্ধটা আছে। তুমি ওদের দূর করে দাও।

আর সত্যনারায়ণের মাথায় কেমন রক্তপাত আরম্ভ হয়ে যায়। সে চিৎকার করে উঠল, রানু তুমি ওখানে দাঁড়িয়ে কী দেখছ যাও ভিতরে যাও'! অথচ সে দেখছে, পাঁচ-সাতটা অপোগণ্ড শিশু সেই ছেঁড়া পায়রার মাংস ভারি যত্নের সঙ্গে ভাঙা এনামেলের প্লেটে কেটে কেটে রাখছে। সাদা ফ্যাকাশে মাংসের টুকরো। পচা গন্ধটা অবিরাম সুখ দিচ্ছিল যেন। সামান্য লঙ্কাবাটা মাখিয়ে একটু আগুনের দরকার, কোথা থেকে প্লাইউডের একটা ভাঙা বাক্স টানতে টানতে নিয়ে আসছে। বুড়ো মানুষটা দা দিয়ে কোপাচ্ছে কাঠ, আর দু-তিনটে ইঁটের ওপর হাইড্রেনের জল তুলে সেদ্ধ করছে বৌটা, ওরা নোংরা শালপাতা এনে বাসি রুটি ভাগ করে বসে আছে। মাংসটা পোড়া সেদ্ধ। পচা গন্ধটা ওদের পেটে। খিদের উদ্রেক করছিল। জুল জুল চোখে তাকিয়ে আছে সব ক-টা জীব। সামান্য হলেই হামলে পড়বে। পোড়া চিমসে মাংস পোড়া গন্ধ। মেয়েটা তখন জানালায় নেই। অবিরাম গন্ধবাহী বাতাস দিকে দিকে ছড়িয়ে যাচ্ছে। প্রায় সে যেন কোনো শ্মশানে। মানুষের পোড়া মাংসের চামসে গন্ধের মতো উঠে এলে একদণ্ড সত্যনারায়ণ আর দাঁড়াতে পাড়ল না। সে সোজা সিঁড়ি ধরে ওপরে উঠে দরজা জানালা বন্ধ করে দেবার সময় দৌড়ে গেল বাথরুমে। তারপর অক করে বমি করে দিল সবটা।

মালতী দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়ে দেখছে। সহসা এই বমি সত্যনারায়ণের, সে কেমন স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে আছে। একটা কথা বলতে পারছে না। রানুর মতো একেবারে সোজা

এমন একটা ঘটনা, ফের আর এক জনকে আক্রমণ করবে এ-সংসারে সে কখনো ভাবেনি।

চোখে-মুখে জল দিয়ে সত্যনারায়ণ বের হয়ে এলে বলল, কী হয়েছে। তুমিও শেষ পর্যন্ত? সংসার কী যে হবে'!

সত্যনারায়ণ বলল, গন্ধ'!

কীসের গন্ধ'!

বারে পাচ্ছ না'!

না তো। ঠিক রাণু যে-ভাবে বমিটমি করে চোখে-মুখে জল দিয়ে দাঁড়াত, কথা বলত, এবং শূন্যতা ফুটে উঠত চোখে, সত্যনারায়ণ ঠিক ঠিক হুবহু একইভাবে কথা বলছে।

মালতী বলল, তোমরা আমাকে পাগল করে দেবে? কীসের গন্ধ—আমি তো পাচ্ছি না।

পাবে। বলে সে বসার ঘরে সোজা ঢুকে ডায়াল করল হ্যালো, সুকুমার আছে?

সুকুমার? আছে ধরুন।

সকুমার বলল, কি দাদা, আমি সুকুমার বলছি।

তোমার দাদাকে একটা খবর দিতে পার? যাতে একটা ব্যবস্থা হয়।

কেন কী হয়েছে?

আর বলো না, নীচে আমাদের দেবদারু গাছটার নীচে যা সব হচ্ছে না! দেশে কি মানুষ নেই! তোমার দাদা তো একজন কর্তাব্যক্তি।

কী হচ্ছে বলবেন তো

পঙ্গপাল

পঙ্গপাল কোথাকার

জানি না। বাড়িতে টেঁকা যাচ্ছে না। আমরা সবাই এবার মরে যাব। হতাশ গলায় বলে যেতে থাকল সত্যনারায়ণ।

এইতো সেদিন কিনলেন। এত তাড়াতাড়ি হুজ্জতি আরম্ভ হয়ে গেল। বুঝিয়ে বলুন না ওদের। কোনো লাভ হবে না। তুমি একবার অবশ্যই আসবে। ব্যবস্থা একটা করতেই হবে।

কী হয়েছে বলবেন তো।

না এলে বলা যাবে না।

সুকুমার এল সন্ধের একটু আগে। সারাক্ষণ সুকুমার আসবে ভেবে সত্যনারায়ণ জানালায় মুখ রেখে দাঁড়িয়েছিল। দেবদারু গাছটার নীচে এখন সেই বৌটা তার পঙ্গপাল নিয়ে বসে রয়েছে। একটা খ'নি বাজিয়ে বুড়ো লোকটা গান ধরেছে। ছোটো দুটো ছেলে বুড়োটার চারপাশে টুইস্ট নাচছে। রাস্তায় গাড়ি রিকশা তেমনি, নির্বিকার মানুষজন, এমন একটা পোড়া চামসে গন্ধ কারো নাকে লাগছে না। ওর তো সেই গন্ধটা সেই যে নাকে লেগে রয়েছে আর যাচ্ছে না। শনিবার বলে সকাল সকাল ছুটি। বেশ বড়োরকমের দাঁও মেরে উল্লসিত, একদণ্ড অপিসে সে দেরি করেনি। সোজা বাড়ি ফিরে মালতীর হাতে গোছা গোছা টাকা দিয়ে কোন একাউন্ট কীভাবে জমা দিতে হবে, এবং মালতীর জন্য আর দুটো নতুন ডিজাইনের অলংকার এ-ভাবে ভেবেছিল, হাতে মুখে চুমো খেয়ে রাতে একটা থিয়েটার সেরে আসবে। রান্নার মেয়েটা বাড়ির পাহাড়ায়। রানু শুয়ে শুয়ে গল্পের বই পড়বে। রানু আজকাল একটু একটু খেতে পারছিল। বেশ নিরাময়ের ছবি আবার যখন ফুটে উঠছিল চারপাশে, তখনই সে একটা পোড়া চামসে দুর্গন্ধে বমি করে দিল। সিঁড়ির গোড়ায় যারা থাকে, অর্থাৎ একতলার ফ্ল্যাটে ওরা গন্ধটা পাচ্ছে না। পেলেও বোধ হয় আসছে যাচ্ছে না খুব একটা। সে সবাইকে জিজ্ঞেস করছিল গন্ধটা আপনারা পাচ্ছেন না'! ওরা কেমন নির্বিকার মুখে তাকিয়ে দেখছিল, সত্যনারায়ণকে। লোকটা অসুস্থ হয়ে পড়ছে। মেয়েটা তার কতদিন থেকে একটা গন্ধ পাচ্ছিল, এবার সে পেতে শুরু করেছে।

সে বলেছিল পাবেন, আপনারাও পাবেন। বাড়ির সামনে এই সব বেওয়ারিশ মাল অখাদ্য- কুখাদ্য এনে জড়ো করছে, না পেয়ে যাবেন কোথায়!

এবং বৌটার খোলা বুকে একটা নতুন বাচ্চা, এই মনে হয় দু-চার দিনও হয়নি, একেবারে বুকের ভেতর মুখ লাগিয়ে রেখেছে। হাত-পা কাঠি কাঠি সবুজ শরীরটা, আজ কি কাল, যেমন রানু হবার সময় সে হাসপাতালে গিয়ে একদিনের বাচ্চা রানুকে দেখেছিল, চামড়া কোঁচকানো, এবং চোখ মেলে তাকাতে পারছে না। আর তখনই জানালার নীচে সুকুমার, সে প্রায় স্বর্গ পাবার মতো চিৎকার করে বলল, এলে সুকুমার'! পাশে দেখেছ?

সুকুমার চারপাশে তাকাল। সে এমন কিছু দেখতে পেল না। কোথাও কোনো গণ্ডগোল নেই, কেউ বাস চাপাও পড়েনি, কোনো মৃতদেহ বাড়ির পাশে কেউ ফেলে রেখে যায়নি, বরং বুড়োটা তার দুই নাতি নিয়ে, দুজন যুবক ছোঁড়া, এবং কিছু বেশি বয়সের দু-তিনটে মানুষ গোল হয়ে কলকাতার আকাশ পরিষ্কার দেখে খ'নি বাজিয়ে গান ধরেছে। পাশে পোস্টাফিসে আলো জ্বালা হয়ে গেছে। আকাশের মাথায় ভাঙা চাঁদ। দেবদারু গাছটা ভারি সজীব। সুন্দর মতো এক যুবতী স্বামীর সঙ্গে পানের দোকানে দাঁড়িয়ে আছে। পান খেয়ে রাঙা ঠোঁট উলটে পালটে দেখছে। কোথাও কিছু সে অস্বাভাবিক দেখতে পেল না।

সত্যদার মেয়েটার ক-মাস থেকে কী একটা অসুখ কখনো ভালো হয়ে যায়, কখনো বিছানা থেকে একেবারে উঠতেই পারে না—এসব খবর সে পেয়েছে। দু-চারবার সে দেখেও গেছে। কী একটা গন্ধ পায় সংসারে। মেয়েটা আসলে ভারি আদরে মানুষ, ন্যাকা। একটুতেই ঘাবড়ে যায়। এমন একটা বয়সে বালিকারা ভারি কৌতূহলী হয়ে যায়। সংগোপনে সব কিছু দেখে বেড়াবার স্বভাব। আর কিনা মেয়েটা রুগ্ন বালিকার মতো জানালায় দাঁড়িয়ে থাকছে'! ভেতরে আসলে সেই অসুখ হয়তো, বড়ো হতে গেলে কিছু অসুখ শরীরে আসবেই—সে এই সব ভেবে সিঁড়ি ভেঙে যত উঠছিল তত মনে হচ্ছিল, সত্যনারায়ণদা, ভারি মুসিববতে পড়ে গেছে।

সুকুমার বলল, কিছু তো দেখলাম না'!

কিছু না?

না তো'!

তোমাদের চোখ নেই'! তোমরা এত ভোঁতা মেরে গেছ।

সুকুমার অবাক। চোখ-মুখ ভয়ংকর রকমের ভীভু, ভূতটুত দেখলে এমন চোখ-মুখ হবার কথা। সুকুমার মনে মনে বলল, তোমার মাথাটা গেছে। চুরি করে ফাঁক করে দিচ্ছ—ধরা পড়ে যাবে ভয়ে শালা তুমি এমন মুখ করে রেখেছ। পাগলামী করলেও রেহাই নেই। এবারে চাঁদ সত্য কথাটা বলে ফেল।

সুকুমার বলল, রানু কেমন আছে দাদা? —দুদিন বেশ খাচ্ছিল, আজ আবার খেতে পারছে না গন্ধ।

অনেক তো করলেন'!

হঠাৎ কেমন অসহায় মানুষের মতো চেপে ধরল সুকুমারের হাত। বলল, তুমি বাঁচাও। তুমিই পার।

সুকুমার বলল, আপনি বসুন তো। উতলা হবেন না। বৌদি বৌদি! সে দরাজ গলায় ডাকলে, মালতী এসে দাঁড়াল সামনে। ওরও চোখ-মুখ কেমন শুকনো। সেই নির্মল হাসিটুকু নেই।

আপনাদের কী হয়েছে?

জানি না ভাই। আর ভালো লাগছে না। সত্যনারায়ণ বলল, থানায় তোমার দাদাকে একটা খবর দিতে হবে।

কেন?

দেবদারু গাছটা সাফ করা দরকার।

গাছে কী হয়েছে?

গাছের নীচে সব পঙ্গপাল। অখাদ্য কুখাদ্য খায়।

খাচ্ছে খাক না। আপনার কী তাতে?

নীচে যা তা সেদ্ধ করে খাবে, আর ওপরে আমরা থাকব। সে কখনো হয়? গন্ধ'! বলেই যেন ছুটে বের হয়ে গেল সত্যনারায়ণ'!

মালতী বলল, বুঝলেন'!

হুঁ বুঝছি। দেখি। এদের সরানো যায় কী না।

সত্যনারায়ণ ফিরে এসে বলল, যা হয় করো একটা ভাই। আমরা না হলে মরে যাব। দুদিন বাদে ঠিক মালতীও বমি করে দেবে। তখন আমরা তিনজন, আমি বলছি, কেউ বাদ যাবে না, পাশের ফ্ল্যাট, নীচে সবাই। আস্তে আস্তে সবাই পাবে। সবাই মরবে। একটা কিছু করো।

সুকুমার প্রথমে ওর দাদার কাছে গেল। ওর দাদা বলল, আইনে নেই। তাড়াবার কোনো আইন নেই। শেষে স্মরণ নিতে হল ছেলেদের।

ওরা বলল, সরে পড়।

কোথায় যাব বাবু!

আমরা কী জানি কোথায় যাবে!

বুড়ো লোকটা বলল, চলে যাব বাবু। সকালে চলে যাব।

এক্ষুনি। তোমাদের জন্য ভদ্রলোকেরা আর শহরে থাকতে পারবে না। সব অকর্ম-কুকর্ম করে বেড়াচ্ছ, আমরা বুঝি জানি না!

ছেলেগুলো সব পোঁটলাপুঁটলি মাথায় নিয়ে ফেলেছে ততক্ষণে। হাঁড়ি-পাতিল বুড়ো মানুষটা। চুল সাদা, কানি পরণে, নাকের ভেতরে বড়ো গর্ত, কান বড়ো এবং লোমে ভরতি। বুড়ো মানুষটা, দু-বছরের বাচ্চাটাকে কোলে তুলে নিলে আরও দু-চারজন এসে ঘিরে দাঁড়াল। এবং যা হয়ে থাকে বেশ সোরগোল পড়ে গেল। আর তখন যায় কোথায়। দৌড়ে পালাতে পারলে বাঁচে। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে ওরা দৌড়ে কোথায় চলে যাচ্ছে। নিমেষে দেবদারু গাছটার চারপাশ কেমন ফাঁকা হয়ে গেল। কিছু ভাঙা হাঁড়ি-পাতিল, পোড়া ইঁট, দুর্গন্ধময় কিছু ছেঁড়া কানি, আর সব পচা জীবজন্তুর উচ্ছিষ্ট হাড় মাংস ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে। সত্যনারায়ণ জমাদার ডেকে জায়গাটা সাফ করে ফেলল, গঙ্গাজলে ধুয়ে দিল। শরীরে এবং চারপাশে যা-কিছু আছে তার ওপর ওডিকোলন ছড়িয়ে এবং রাম রাম বলতে

বলতে সিঁড়ি ধরে ওপরে উঠে গেল। তারপর দরজা-জানালা খুলে দিল সব। রানুকে নিয়ে জানালায় একবার দাঁড় করিয়ে বলল, পাচ্ছিস?

রানু নাক টেনে বলল, না বাবা।

এখানে?

না বাবা।

এদিকে আয়। দ্যাখ তো...?

না বাবা।

তারপর সত্যনারায়ণ ভালো করে ঘর বারান্দা ধুয়ে দিতে বলল, রান্নার মেয়েটিকে। যেখানে যা-কিছু আছে সব তাতেই গন্ধটা লেগে আছে ভেবে জল দিয়ে একেবারে ঝকঝকে তকতকে করে ফেলল। মাছ-মাংস রান্না হল না। নিরামিশ আহার করল সত্যনারায়ণ। সত্যনারায়ণ এবং রানু আজ কত দিন পর যেন পেট ভরে ভাত খেল।

আর আশ্চর্য সে রাতে শুয়ে পড়তেই ঘুমিয়ে পড়ল। এবং নাক ডাকতে থাকল। কিছুক্ষণ পর নাক ডাকা বন্ধ হয়ে গেল। কেউ যেন তাকে ডাকছে। —অমা দেখ এসে কী ব্যাপার। সে উঠে গেল জানালায়'! আবার নতুন কারা আসছে। এবার একজন দুজন নয়। সে দেখল, গাছটার নীচে সবাই ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে আছে। চারপাশ থেকে পঙ্গপালের মতো ধেয়ে আসছে। মাথায় হাঁড়ি পাতিলা, বৌ একটা নয়, একেবারে সার দিয়ে এবং সবার কোলে বাচ্চা। পাঁচটা সাতটা করে অপোগণ্ড, উলঙ্গ প্রায় তারা সব, চুল সনের মতো, এবং অভাবী মানুষ। ওদের সঙ্গে আছে সব পচা শাকসবজি, উচ্ছিষ্ট খাবার। পচা পরিত্যক্ত মাছ-মাংসের হাড়। মাছি ভন ভন করছে। কত দিন চান করে না এরা, যেন এরা ক্রমে শহরের সব কিছু অধিকার করে নিতে আসছে। এবং সে দেখতে পেল, অফিস-কাছারি করতে পারছে না মানুষ, রাস্তা পার হতে পারছে না। ডিঙিয়ে যেতে হচ্ছে। পায়ে হাতে সেই গন্ধ নাকে এসে লাগছে। মানুষেরা চারপাশে যারা আছে অক অক বমি করছে। চোখের ওপর একটা বেড়াল ছানা আগুনে লোহার শিকে সেঁকে নিচ্ছে। আদিম বন্য হিংস্র এক জাতি এসে এমন সুসময়ে কলকাতার সব জুড়ে বসতে চাইছে। রানু, মালতী সে পাশের ফ্ল্যাটে, নীচের ফ্ল্যাটে এবং সর্বত্র সেই অক অক জল বমি। প্রায় মহামারীর মতো সব শহরকে গ্রাস করছে। এক প্রাগৈতিহাসিক জীবের মতো ওদের সার সে রানু মালতীর হাত ধরে শহর লাফিয়ে লাফিয়ে পার হয়ে যাচ্ছে। প্রায় আধমরা হয়ে আসছে। চোখ-মুখ ছিটকে বের হয়ে যাবার মতো। যেন এবার তারা কোণঠাসা করে মারবে তাকে। সব কলকাতা এ-ভাবে পঙ্গপালে ছেয়ে গেল। সে চিৎকার করে উঠল, সুকুমার বাঁচাও।

ওর ঘুম ভেঙে গেল। সে গলা শুকনো বোধ করল। জানালা খোলা। ভয়ে জানালার পাশে যেতে সাহস হচ্ছে না। জিরো পাওয়ারের আলো জ্বলছে। মালতী অঘোরে ঘুমোচ্ছে। ও-ঘরে রানু। সে পা টিপে টিপে এগোতে থাকল। ওরা এখনো ঘুমোচ্ছে। তার চিৎকার পর্যন্ত শুনতে পায়নি। শহরের ফুটপাতে এত মানুষ যাচ্ছে টের পাচ্ছে না। সে কোনো রকমে পা টিপে টিপে জানালায় গিয়ে দাঁড়াল। আশ্বিনের বাতাস। দূরে ঢাকের বাদ্যি বাজছে। আর চাঁদের মরা আলোতে সে দেখতে পেল ভূতুড়ে দেবদারু গাছটা একাকী। নীচে একটা রাস্তার কুকুর শুয়ে আছে। গাছটার নীচে কেউ চলে আসেনি। কলকাতা আবার নিরিবিলি নিজের ভেতর ডুবে আছে। কলকাতা আছে কলকাতাতেই।

কুসুম শুয়ে আছে তার অন্ধকার ঘরে

বছর পঁচিশেক আগে গায়গাটা ছিল জলাজমি ধানের খেত অথবা ভেরির জঙ্গল। যেদিকে চোখ যায় শুধু শূন্য প্রান্তরে ইতস্তত গাছপালা। মাঠ এবং গরিব মানুষের জন্য বসবাসের কিছু ঘরবাড়ি। কাঁচা রাস্তা। গোরুর গাড়ির কোঁ কোঁ আওয়াজ। সারাদিনে দু-চারটে গোরুর গাড়ি বহুদূর বিস্তৃত প্রান্তরে হারিয়ে যাবার জন্য হেলেদুলে যাত্রা করত। সকাল বেলাতেই কিছু সাইকেল আরোহীর আনাগোনা। ঝাঁকা মুটেওয়ালা আর মাছের ব্যাপারী কিংবা আড়তদারদের লোকজনের যাওয়া আসা চোখে পড়ত।

অথচ জায়গাটা বড়ো শহর থেকে দূরেও নয়। পাকা রাস্তা চলে গেছে এয়ারপোর্ট বারাসাত পার হয়ে। এয়ারপোর্ট যাবার ভি আই পি রাস্তাটাই আসলে যত গণ্ডগোল সৃষ্টি করে ফেলল। লোকজন শহরের কাছাকাছি জায়গায় নির্জন এলাকায় চলে আসতে থাকল। শহরের এঁদো গলি থেকে মুক্তি কে না চায়।

বিষয়ী লোকেরা নানা ধান্দায় ঘোরে। তিন-চারশো টাকায় বিঘা মিললে টাকা খাটাবারও সুরাহা হয়। জমি শুধু দেয়, নেয় না কিছুই। তারা ভালোই বোঝে।

তবে অহিভূষণ একটু অন্য ধরনের মানুষ। শহরে সামান্য চাকরি এবং বাড়ি ভাড়া তাকে তাড়া করত। মাথা গোঁজবার ঠাঁই নিয়ে দুশ্চিন্তা। কারখানার অবস্থাও ভালো না। শেষে রাস্তায় গিয়ে দাঁড়াতে না হয়'! সুযোগ মতো তিন চার কাঠা জমি পেলে সে-ও কেনে। বন্ধু নগেনই বলেছিল, কাঠা চারেক জমি রেখে দে। আখেরে কাজে লাগবে।

বন্ধুর পরামর্শেই বলতে গেলে জমি কেনা, আর জমি যে মা লক্ষ্মী বছর দুই না ঘুরতেই সে তা টের পেয়ে গেল। ঘরবাড়ির নেশা কার না থাকে। কুসুম একটা স্কুলে চাকরি পেয়ে যাওয়ায় হাতে দু-পয়সা জমতেও থাকল। অহিভূষণকে বলতে গেলে বাড়ি করার নেশায় পেয়ে বসল। অফিস ছুটির পর বাড়তি কাজের সুবাদেও পয়সা আয় হতে থাকল। এবং দেখতে দেখতে সে তিন কামরার একখানা বসত বাটির মালিক হয়ে গেল। এমন পাণ্ডব বর্জিত এলাকায় তার বাড়িঘর, কারণ যতদূরেই চোখ যায় পাকা বাড়ির হদিশ মেলে না। বাগচিবাবু, সাহাবাবু ছাড়া কেউ ঘরবাড়ি বানাতে তখনো রাজি ছিল না। জমি কেনা-বেচা চলছে ঠিক, তবে তারা সবাই ফাটকাবাজ। জমির দর উঠলে বেচে দেবে। একমাত্র তারাই

তাকে উৎসাহ দিত। মানুষজন হল সেই মশামাছির মতো। বুঝলেন, আপনাদের দেখলেই লোকে বাড়ি ঘর বানাতে সাহস পায়। বাড়িটা দোতলা হয়ে যাওয়ার পর অহিভূষণ লক্ষ্য করল, রাস্তার ধারে দু-চারটে সত্যি নতুন বাড়ি উঠছে। ওর ভালোই লাগত। মানুষজন মৌমাছির মতো। ঝাঁকে ঝাঁকে ওড়ে, ভালো পেলে বসে যায়। আরও উত্তরে। জায়গাটা যে আর পাণ্ডব বর্জিত এলাকা থাকবে না সে ভালোই জানে। নিজেকে যথেষ্ট বিচক্ষণ ভাবতে ভালো লাগে। কথায় কথায় কুসুমকে খোঁটা দিতেও ছাড়ে না!

কী বুঝছ?

কী বুঝব আবার'!

জমি দেখে তো ভিরমি খেয়েছিলে। অ মা তোমার কি মাথা খারাপ। কোমর জল। জমি কোথায়। এখন বুঝছ জমি কোথায়?

কুসুম অবশ্য জমিটা দেখে ভেঙেই গেছিল'! ভি আই পি রোডে উঠে গুম মেরে ছিল। সত্যি টাকাটা বুঝি জলে গেল। জমিতে কুসুমেরও শেষ কপর্দক খরচ। তা বলে কোমর জলে তুমি জমি খুঁজতে গেলে'!

তারও মনে হয়েছিল, জমি নিয়ে সে তো ফাটকা খেলতে বসেনি। জমি ফেলে রাখার জন্যও কেনেনি। মাথার উপর একটুখানি ছাদের আশায়ই তো জমি কেনা। সেই জমি জলের তলায় থাকবে। কুসুম রাগ করতেই পারে। সে কুসুমকে সেদিন কোনো বোঝ প্রবোধ দিতেও সাহস পায়নি। দুদিন বাদে বলেছিল, নগেন তো বলল, খাল কেটে মাটি তোলার সময় সস্তায় মাটি পাওয়া যায়। কত পুকুর ডোবা বুজিয়ে যাদবপুর এলাকায় দেখনি মানুষ ঘরবাড়ি বানিয়েছে। আমরাও না হয়........না মানে নগেন বলছিল, সস্তায় সে মাটির ব্যবস্থা করে দেবে। শ-দুই টাকা বাড়তি খরচা, ঠিক করে ফেলব। জল আর থাকবে না। জমি ভরাট হয়ে যাবে।

ঠিক করেও ফেলল। তিন-চার বছরে, সে দোতলায় উঠে আসতে পেরেছে। একশো পাঁচ টাকা ইটের হাজার, তেরো টাকা সিমেন্টের বস্তা, সেগুন কাঠের কিউবিক ফুট পয়তাল্লিশ টাকা। বাড়ির জিনিসপত্রের দাম হু হু করে বেড়ে গেল। বাগচিবাবু দেখা হলে বলত কত দর নিচ্ছে।

অহিভূষণ বলত, আর বলবেন না একশো পাঁচ টাকা হাজার এক নম্বর ইট। তাও যদি এক নম্বর হত। কী করি বলুন'! পাই কোথা। বাড়ি করতে গিয়ে জেরবার।

বাগচিবাবু চোখ বড়ো করে বলতেন, একশো পাঁচ টাকা। শোনা কথা'! আমার সাহসে কুলোত না। আশি টাকা হাজার গছিয়ে দিয়ে গেল বলে বাড়ির কাজে হাত দিয়েছিলাম। কী যে হচ্ছে। আকাশ ছোঁয়া হয়ে গেল মশাই। বাড়ি আর কারও করতে হচ্ছে না।

অহিভূষণ মজা পেত। হোক। দাম বাড়ুক। তার বাড়িটা হয়ে গেলে যা খুশি দাম বাড়ুক। বছর বছর দাম লাফিয়ে বাড়ছে। এই তো দোতলা করার সময় ইটের দাম একশো ত্রিশ নিল হাজারে। গোবিন্দ বিল্ডার্স বলত আপনি পুরানো খদ্দের। ছাড়ি কী করে। বাজারে চল্লিশ উঠে গেছে।

যাহোক বাড়িটা তার মন্দ না। নীচে দুখানা শোবার ঘর। উপরেও তাই। সামনে ব্যালকনি। কাচ দিয়ে ঘেরা। সে রাতে বাড়ি ফিরলে ব্যালকনিতে বসলে, দূর প্রান্তে গাছপালার ভিতর হাস্যকর আলো দেখতে পেত। তার ঘরে তখনো হারিকেন জ্বলে। গাছপালার ভিতর অন্ধকারে সেই হ্যাজাকের রহস্যময় আলোই একদিন কেন যে তার বাড়িটাকে আরও মহার্ঘ করে তুলল বুঝতে পারল না। অতদূরে কারা থাকে'! সে দিনের বেলাতেও দেখেছে ওখানে একটা লাল রঙের ইটের বাড়ি। অনেকটা জায়গা নিয়ে মনে হয় বাড়িটা। সদর রাস্তা ভি আই পি থেকে নেমে কতদূর গেছে তার তখনো জানা হয়নি। তার বাড়িটা সদর রাস্তায় নয়। কিছুটা মাঠের ভিতর বলে, রাতে বড়োই নির্জন। কত রকমের সব পাখিরা উড়ে বেড়ায়। ঝোপে জঙ্গলে ডাহুক পাখির ছড়াছড়ি। রাতে ডাহুক পাখিরা কলরব তুললে আশ্চর্য এক ধবনি মাধুর্য সৃষ্টি হয়। শহরের বিষাক্ত বাতাস থেকে দূরে থাকার আনন্দও তার তখন কম না। শুধু খোলামেলাই নয়—একেবারে পরিত্যক্ত এলাকায় সে তার সুন্দর বাড়িটি তৈরি করে সুখেই ছিল। কুসুম, সে, বুড়ো জ্যেঠিমা, দুই কন্যা। ভি আই পি বেশি দূরও না। কুসুমের সঙ্গেই ইস্কুলে যায়। বাসে জায়গা পাওয়া যায়। বসেই যেতে পারে। এত সুখ তার। কুসুম তার বুদ্ধিবিবেচনার তারিফ করত তখন খুব।

ছুটির দিনেই হাতে সময়। সে বের হয়ে পড়ত। মাঠে আবার ইট পড়ছে। কার বাড়ি হচ্ছে'! নাম ধাম, আলাদা সবই হয়ে যেত এক সময়। বাগজোলা ক্যাম্পের গরিব মানুষজন—সস্তাই মিলে যেত। ঠিকা কাজে লোক মিলত মেলা। সে হেঁটে যেত খাল বরাবর। ওপাশে সল্টলেকের ধূধূ প্রান্তর। শুধু বেনা ঘাস আর ভরাট জমি। দুটো একটা বাড়ি। বনেজঙ্গলে পাখির বাসায় সাদা ডিমের মতো পড়ে থাকত। একদিন সে আবিষ্কার করে ফেলল, লাল রঙের ইটের বাড়িটাও। হাঁটতে হাঁটতে সে তার বাড়ি ফেলে বেশ অনেকটা দূরেই চলে এসেছিল। সেই গাছপালার ভিতর লাল রঙের বাড়িটা চোখে পড়তেই দ্রুত কেন যে হাঁটতে থাকল বুঝল না। আসলে রাতের সেই হ্যাজাকের আলোর নেশা। বাড়িটা রহস্যময়। কারা থাকে। কারা রাত হলে হ্যাজাকের আলো জ্বালায়! প্রায় পঁচিশ-ত্রিশ বিঘে জমি নিয়ে বাড়িঘর বানিয়ে কারা থাকে এই সবই ছিল রহস্য। দূর থেকেই বুঝেছিল বাড়িটায় নারকেল গাছের ছড়াছড়ি। আম জামও আছে। নিম গাছের ছায়াও পায় বাড়িটা। খালের বাঁধে বাড়িটা যে নীচু জমিতে তাও বোঝা গেল। গাছের ফাঁকে বিশাল সব

খড়ের গাদাও চোখে পড়ত। লোকজন সাইকেল, বড়ো বড়ো টিনের ক্যান ঝুলিয়ে কাঁচা রাস্তায় নেমে সদর রাস্তায় চলে গেল।

কাছে যেতেই বুঝল, বাড়িটা জমির এক প্রান্তে। বড়ো বড়ো টানা প্ল্যাটফরমের মতো দু-চালা টিনের সেড। বিশ-বাইশটা জার্সি গোরু একদিকে। আর একদিকে বিশ-বাইশটা মোষ বাঁধা। চুনি ভূসির বস্তা থেকে টিনে বড়ো বড়ো করে নামাচ্ছে গো খাদ্য। একটা ছেলে, এদেরই কেউ হবে বাঁশিতে ফু দিয়ে সুর তোলার চেষ্টা করছে। কাক শালিক টিয়া পাখির ঝাঁকও দেখতে পেল। মৌটুসি পাখিরা কিচির মিচির করছে। দেয়ালে ঝুমকো লতার নীল ফুলের ছড়াছড়ি। তার মনে হয়েছিল, আসলে বিষয়ী মানুষের কারসাজি—দুধের কারবারি—তা হোক, লোকটার রুচি আছে বলতে হবে। বাড়িটা ভারি সুন্দর দেখতে। গাছপালা নিয়ে তপোবনের মতো হয়ে আছে। বাঁধ ধরে হেঁটে গেলে বাড়িটার সবই চোখে পড়ে। যদিও ইঁটের পাঁচিল ঘেরা বাড়ি। খুব উঁচু পাঁচিল নয়—কোমর সমান। ইচ্ছে করলেই যে কোনো লোক দেয়াল টপকে বাড়িতে ঢুকে যেতে পারে। আর কিছুটা হেঁটে গেলেই লাল ইটের বাড়িটা সামনাসামনি। দুটো জামরুল গাছের ফাঁকে জানালাও স্পষ্ট। ভিতরে সুন্দর একটি পালঙ্ক। এমনকী রাস্তা থেকে বড়ো দেয়াল জোড়া আয়নাও দেখতে পেল।

কারা থাকে?

কৌতূহল স্বাভাবিক।

পালঙ্কটি ময়ূরপঙক্ষী নৌকার মতো যে নানা সাজে সজ্জিত রাস্তা থেকে বুঝতে তার আদৌ কষ্ট হল না'!

বাড়িটা পার হয়ে যেতেই দেখেছিল সুন্দর একটি সরোবর। ঘাটটা বাঁধানো। চুল খুলে এক যুবতী সেখানে বসে আছে। শীতের বিকেলে রোদের উষ্ণতা মেখে নিচ্ছে গায়ে। কিংবা চুল শুকোচ্ছে।

কেন যে সহসা মনে হয়েছিল তার মতো রাজপুত্র রাজকন্যার গল্পে এমন নারীর দেখা পাওয়া যায়। সে এখানে কেন? সঙ্গে সঙ্গে তার বুকটা ছাঁত করে উঠেছিল। মেয়েটি বোধ হয় তাকে দেখতে পেয়েছে। ত্বরিতে সে ঘাট থেকে উঠে বাড়ির ভিতর ঢুকে গেল। এত চঞ্চল তার গতি যে পায়ে নূপুর থাকলে ঝম ঝম করে বেজেও উঠতে পারত। দেবী প্রতিমার মতো মুখ। বিশ বাইশ ত্রিশ যে বয়সেরই হোক—নারী নারীই।

তারপর অহিভূষণ আর দাঁড়ায়নি। বাড়ি ফিরে এলে কুসুম লক্ষ্য করেছিল, মানুষটি কেমন অন্যমনস্ক। সে অভিযোগ তুলেছিল, ছুটির দিনেও ঘুরে বেড়াও। রাত হয়ে গেল ফিরতে! মেয়েদের নিয়ে বসলেও তো পারো'! একটারও পড়ায় মন নেই।

তা পাঁচ-সাত বছরের দুই মেয়ে তো সামান্য তরলমতি হবেই। পড়তে ভালো লাগবে কেন'! শহরের এঁদো গলি থেকে এখানে উঠে আসায় মন ব্যাজার অবশ্য বছর না ঘুরতেই জায়গাটার মায়ায় তারাও জড়িয়ে গেল। পথ পাথালি, ঝোপ জঙ্গল, প্রজাপতি মানুষকে যে সহজেই জড়িয়ে ফেলে ছেলেদের দেখলে অহিভূষণ টের পেত। অফিস থেকে ফিরে তার তখন রোজ এক বাতিক। সে ব্যালকনির ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে দিত। হাত-মুখ ধুয়ে জামা-প্যান্ট ছেড়ে সেই যে বসত আর নড়ত না। চা জলখাবার কাজের মেয়েটা দিয়ে যেত। হারিকেন জ্বলত—এবং সামনে—উদাস মাঠে কখনো জ্যোৎস্না খেলা করে বেড়াত। আকাশে নীল হলুদ রঙের নক্ষত্ররা নাচানাচি করত—দূরে খাল পার হয়ে সবুজ এক যেন অরণ্য জেগে থাকত।

একটু খোলামেলা জায়গায় বাড়ি করে বসবাস করার আনন্দই আলাদা। গাড়ি ঘোড়ার আওয়াজে কান ফুটো করে দিচ্ছে না। রাতের নিস্তব্ধতায় এক সবুজ অরণ্যভূমিতে শুধু হ্যাজাক জ্বলত। বড়ো দূর মনে হত। কেমন স্বপ্নের দেশ মনে হত তার। সেই ময়ূরমুখি পালঙ্কে, সাদা চাদরের বিছানা এবং বড়ো দেয়াল আয়নার সামনে কেউ দাঁড়িয়ে।

চুল আঁচড়াচ্ছে।

চুল নীল। কোমর পর্যন্ত চুলের গোছা। কানে ইয়ারিং পরছে।

মুখে প্রসাধন।

তারপর কোনো গল্পের বই নিয়ে শুয়ে পড়েছে বিছানায়।

পা তুলে দিচ্ছে। শাড়ি নেমে যাচ্ছে।

অথবা কখনো মনে হত অহিভূষণের জ্যোৎস্না রাতে ঘাটলায় বসে আছে মেয়েটি। কী নাম, কী করে সারা দিন তার কাটে সব কিছুই যেন এক রহস্যে ভরা। পরখ অসহ্য ঠেকলে হয়ত রাতে সে সরোবরের ঠাণ্ডা জলে অবগাহন করতে নামে। চোখের উপর কেন যে অদ্ভুত দৃশ্য সব ভেসে উঠত, দেখতে পেত, খোঁপা বেঁধে, শক্ত করে ক্লিপ এঁটে দিচ্ছে। মেয়েরা রাতে চুল ভেজায় না। তবে সাঁতার কাটতেই পারে। দেখতে পেত সে তার শাড়ি সায়া ব্লাউজ ছেড়ে সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়ে জলে নেমে গেছে। বাড়ির ওদিকটায় আর কেউ থাকে বলেও সে জানে না। গোরু মোষের জায়গাটা একেবারেই আলাদা। ভিতরের দিকে কারো ঢোকার হুকুম নাও থাকতে পারে।

নির্জন মাঠের বাড়িতে একা একা বসে এসব চিন্তার মধ্যে তার এক আশ্চর্য অনুভূতি খেলা করে বেড়াত।

আর মাঝে মাঝেই সেই অনুভূতির স্বপ্নভঙ্গ ঘটত। কখনো কুসুম ডাকত, কিগো খাবে না। ব্যালকনিতে চুপচাপ বসে আছ কখন থেকে! কখনো স্বপ্নভঙ্গ—বুকটা ধরাস করে

উঠত। লরি ঢোকার শব্দ। তার হেডলাইট। ইট ফেলার শব্দ।

কাঠ পড়ছে। কাঠ কাটার শব্দ।

কোথাও ছাদের সেন্টারিং হচ্ছে, তার শব্দ।

কখনো লোহার বিম ফেলার শব্দ।

সে এখানে এসেই টের পেয়েছিল, এক এক ঋতুতে এক এক জাতের পাখি উড়ে আসে। লম্বা ঠোঁট নীলরঙের ডানা মেলে তার বাড়ির আম জাম গাছে এসে বসত কী সব পাখি, জল পায়রা না বুনো হাঁস! সে পাখি বড়ো একটা চেনে না। বইয়ে পড়ে পাখির খবর রাখে, ডাহুক, গাঙশালিক, কাকাতুয়া, পায়রা ছাড়া আর কিছু বা পাখি আছে সে চিনতে পারে। সে তো হিমেল শীতের দেশ থেকে পাখিদের আসতে কখনো দেখেনি। ময়ূর কিংবা চড়াই পাখিও সে চেনে। কিন্তু চেনে না বুনো হাঁসেরা কী রকম হয়।

মেয়েটা বুনো হাঁস না জলপিপি। জলপিপি হোক বুনো হাঁস হোক, তার কিছু আসে যায় না। সুযোগ পেলেই সে অপরাহ্ন বেলায় বাঁধ ধরে হেঁটে যেত।

সেই অপরাহ্ন বেলা তার জীবনেও চলে আসবে একদিন জানত না। মেয়েদের বড়ো করতে গিয়ে, সে যখন বুঝল তার চারপাশ সত্যি দমবন্ধ হয়ে আসছে। মেয়েদের বিয়ে হয়ে যাবার পর বাড়িটাও খালি হয়ে গেল। এক সন্ধ্যায় সে দেখল দূরের সেই রহস্যময় বাড়িটাও চোখের উপর থেকে হারিয়ে গেছে। সে নিজেও টের পায়নি। মধ্যে আর ফাঁকা জায়গা নেই। সর্বত্র ইটের জঙ্গল।—কখন কবে কীভাবে চোখের সামনে এত ঘরবাড়ি উঠে গেল তার খেয়ালই নেই। কুসুম আর তার দুই মেয়েকে সুখে রাখতে গিয়ে সে নিজেই জানে না সে সব হারিয়েছে। তারপর একদিন কাজ থেকে অবসরের পালা। বাড়ি ফিরে এল সন্ধ্যার পর। মনে হল তার বাড়িটাও অন্ধকার হয়ে আছে। বাড়িতে কেউ আজ আলো জ্বালেনি। কুসুম শুয়ে আছে তার অন্ধকার ঘরে। চারপাশের ঘরবাড়ির জঙ্গলের ভিতর দিয়ে বাড়ি ঢোকার সময় মনে হল, সেই এক অন্ধকার গলি। পচা ভ্যাবসা গন্ধ নর্দমার। রাস্তা নেই—জল নিকাশি নালা নেই। কিংবা ঝম ঝম করে কোথাও কেউ পায়ে মল বাজিয়ে অদৃশ্য হয়েও যাচ্ছে না।

বিশ-পঁচিশ বছরে জায়গাটা কত বদলে গেছে, আজই যেন টের পেল। কুসুম দরজা খুলে দিলে, তাকে আজ ভারি অবসন্ন দেখাল। কুসুম আলো জ্বেলে দিয়ে দেখল, মানুষটা তার যেন সর্বস্ব হারিয়েছে।

কুসুম খাবার টেবিলে বলল, কী হয়েছে বলত! সারাজীবন কেউ চাকরি করে? অবসর তো একসময় নিতেই হয়।

অহিভূষণ ভাত নাড়াচাড়া করার সময় বলল, সারাটা দিন কাটবে কী করে। কোথায় বসব। বাড়ির চারপাশে এক বিন্দু সাধ নেই। খোলা আকাশ নেই। পাখিরা কোথায় সব চলে গেছে। সেই অন্ধকার গলির বাসিন্দা।

কুসুম মানুষটার কষ্ট বুঝতে পেরে বলল, অভ্যাস হয়ে গেলে আর খারাপ লাগবে না।

আর সকাল বেলাতেই মনে হল, আরে সেই রহস্যময় বাড়িটার খোঁজে গেলেও তো হয়। সে তো তাকে আরও কতবার দেখেছে। বাস রাস্তায় দেখেছে। চোখ তুললেই দেখতে পেত মেয়েটি তার দিকে তাকিয়ে আছে। চোখে চোখ পড়ে গেলে নামিয়ে নিত। লজ্জায়, না, চুরি করে গাছের আড়াল থেকে মেয়েটিকে ঘাটলায় দেখার জন্য—সে বুঝতে পারত না। ভারি লক্ষ্মীশ্রী মুখ। বাড়িটা কখন যে দালান কোঠার আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল, সে টেরও পায়নি। কত বছর আগের কথা।

সে বাড়িটার খোঁজে সকালে বের হবার মুখে কুসুম বলল, কোথায় যাচ্ছ? সে কী বলবে কুসুমকে বুঝতে পারছে না। সকালে তো বাজার যায়, এছাড়া সকালে কোথাও যায় না গেলেও কোথায় যাচ্ছে বলে যায়। অথচ আজ কুসুমকে বলতে পারল না, তাকে খুঁজতে যাচ্ছি!

তাকে? সে কে?

সে যে কে বলে কী করে! সে যে কে নয়, সে যে তার কাছ থেকে বিশ-বাইশ বছর হরণ করে নিয়েছে বোঝায় কী করে।

বিশ-বাইশ বছরে জায়গাটা কত বদলে গেছে কুসুম কী টের পায় না! বিশ-বাইশ বছর মানুষের জীবনে কত বড়ো ফারাক সৃষ্টি করে কুসুম কী জানে না!

বাড়িটা করার সময়, চারপাশে মাঠ। দূরে ওই লালরঙের বাড়িটা ছাড়া। আর তো কোনো লোকালয় ছিল না।

সে ব্যালকনিতে বসে দেখত সব।

বাড়ির ঠিক পাশে জলা জমি, ঝোপ জঙ্গল সবুজ মাঠ, গাছপালাও কম ছিল না। বাঁশের বন, এবং শীতের সময় উড়ে আসত অজস্র পাখি। জলা ভূমি, ডোবায়, ঝোপে জঙ্গলে তারা করব করত।

ডোবার জঙ্গলে এক জোড়া ডাহুক পাখিও সে আবিষ্কার করেছিল। সে বাড়ি তৈরি করে যখন আসে তখন তো তাদের ছানাপোনা, এঁটো-কাটা খেতে বাড়িতেও ঢুকে যেত। মধ্যরাতে ডাহুকের কলরব, জ্যোৎস্নায় মাঠঘাট ভেসে গেলে সে উঠে গিয়ে বসত

ব্যালকনিতে। ডাহুকের কলরবের মধ্যে থাকত এক আশ্চর্য মিউজিক, যে মধ্যরাতে জ্যোৎস্নায় টের পায়নি ডাহুকের কলরব সে জানেই না জীবন কত আশ্চর্যের সব সমষ্টি।

সেই ডাহুকের কলরব নেই। কোথায় যে গেল তারা!

সেই শীতের পাখিও আর আসে না।

শুধু ইট কাঠ আর মানুষ জন, রাস্তায় হাঁটা যায় না। দোকান পাট, বড়ো বড়ো বিশাল অ্যাপার্টমেন্ট, গাড়িতে সুন্দর সুন্দর বালিকারা স্কুলে যায়, দম্পতিরা গাড়ি করে ফ্ল্যাট বাড়িতে ঢুকে যায়, তারা জানেই না এই এলাকার একজন মানুষ পৃথিবীর তাবৎ সৌন্দর্য নিয়ে নির্জন নিরালার খোঁজে এখানে এসে উঠেছিল। আসলে সে যাচ্ছে সেই নির্জনতার খোঁজে।

মাঠ পার হয়ে খালধার ধরে অনেকটা হেঁটে গেলে সেই বাড়ি। সেখানে সে ঘাটলায় আবিষ্কার করেছিল, আর এক কুসুমকুমারীকে। কুসুমকুমারীর খোঁজে সে যাচ্ছে। কুসুমকে সে বলবে কী করে, গোপনে এই প্রকৃতির সৌন্দর্য আবিষ্কার করতে গিয়ে আর এক কুসুমকুমারীকে আবিষ্কার করে ফেলেছিল। বিশ-বাইশ বছর আগে হারিয়ে যাওয়া, বিশ-বাইশ বছর না তারও কম এখন ঠিক হিসাবে খুঁজে পায় না। আসলে কোনো অতীতে যেন সে তাকে আবিষ্কার করেছিল। কুসুমের গলায় ঝাঁজ।

কোথায় যাচ্ছ বলবে না?

আরে এখন মেলা সময় হাতে। কাজ কাম সব শেষ। ঘুরে দেখতে। এতদিন সময় পাইনি।

তাই বলে স ক্কাল বেলায়।

আসলে সে বোঝায় কী করে, তার অখণ্ড অবসরই পাগল করে দিয়েছে তাকে। জীবনের ব্যস্ততা হারিয়ে গেলে সব যে শেষ। কুসুমকে বোঝায় কী করে। সে নতুন জীবনের খোঁজে আছে।

তাকে তো সময় কাটাতে হবে।

বন্ধুবান্ধবও নেই বিশেষ। আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে সম্পর্ক আলগা হয়ে গেছে। কুসুম আর তার মেয়েদের সামলাতে গিয়ে কখন সম্পর্কহীন হয়ে গেছে সে নিজেও জানে না।

যদি সেই বাড়িটার খোঁজে, বের হয়ে পড়তে পারে দেখা যাক না, এটাও তো আবিষ্কারের সামিল হয়ে যাবে। কার বাড়ি, কে করল, কোথায় আগে তারা থাকত, লোকজনের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি করতে পারলে বেঁচে যেতে পারে। সে বলল, খাল ধারে ঘুরে আসি।

এত বেলায়'!

কুসুম যেন মানুষটাকে চিনতে পারছে না। কী করে সে'!

তা হলে বলছ বিকেলে বের হতে।

কুসুম বলল, বিকেলে খালের ধারে বেড়াতে যাবার কী হল'!

ভি আই পি ধরে ঘুরে এস না'! ভালো লাগবে। সেই গাড়ি-ঘোড়া'!

আরে গাড়ি-ঘোড়াই তো মানুষকে ছুটিয়ে নিচ্ছে বোঝো না'!

তা ঠিক। জায়গাটা কী হয়ে গেল'!

আপশোষ।

সকালে পারল না। তবে বিকেলে সে বাড়িটার খোঁজে বের হয়ে গেল। খালের ধার ধরে হেঁটে যেতে থাকল। এখানটায় ছিল একটা অশ্বত্থ গাছ, এখানটায় বাঁশের জঙ্গল, এখানটায় জলাজমি, এখানটায় সবুজ মাঠ। কিন্তু এত বড়ো বড়ো অ্যাপার্টমেন্ট, টেনিস র্যাকেট হাতে বালিকার লন পার হয়ে যাওয়া, সাদা ফ্রক, আর কি সুঠাম শরীর—কেউ না কেউ দেখছে, সে যেমন দেখত বিশ-পঁচিশ বছর আগের সেই কুসুমকুমারীকে। সামনে সব সরকারি ফ্ল্যাট, কো অপারেটিভ করে বাড়িঘর—যতদূর চোখ যায় মানুষের জঙ্গল। সে অনেক খুঁজল। কিন্তু সেই কুসুমকুমারীর বাড়িটা আবিষ্কার করতে পারল না। জার্সি গোরু, একটি ছেলের খড়ের গাদায় শুয়ে বাঁশি বাজানো, হাক ডাক, দুধের ক্যানেস্তারার ঠনঠন শব্দ—কোথাও কান পেতে শুনতে পেল না। ঘাটলাও নেই। কিছুই সে খুঁজে পেল না। তবু কী যে হয় তার, বাড়ির এই রহস্য, কিংবা হারিয়ে যাওয়ার রহস্যের খোঁজেও যদি সে ব্যস্ত থাকে তবে তার আর অখণ্ড অবসরের ভয় থাকবে না। জীবনে সবারই যে একটা রহস্যময় বাড়ি দরকার। খুঁজে দেখা যাক না ঠিক কোথায় সেই বাড়িটা ছিল।

কপালি

কপালি থেকে গেল।

কপালির বাপ কালীপদ বলেছিল, বাবু ভালোমানুষ। থাক। মন টিকে গেলে থাকবি। মন খারাপ হলে বাবু চিঠি দেবে, তখন না হয় নিয়ে যাব। থেকে দ্যাখ। পেটভরে খেতে পাবি। জামাকাপড়ের অভাব রাখবে না। তা ছাড়া দেশের মানুষ। অচেনা নয়।

এর আগেও দেশের মানুষের বাড়িতে কপালি যে কাজ না করেছে তা নয়। তবে তার মন টেকে না। দুদিন যেতে না যেতেই বাড়ির জন্য মন খারাপ। বাড়ি বলতে খালপাড়— ভাইবোনগুলির জন্য মন পোড়ে। ভিটেমাটি বলতে কাঠা দু-এক জমি, সরকারের খাস থেকে পাওয়া। ছিল বিগেখানেক—কমতে কমতে কাঠা দু-কাঠায় ঠেকেছে। খড়ের চাল, মাটির দেয়াল আর যেদিকে চোখ যায় বনজঙ্গল গাছপালা। খালের জল নদীতে গিয়ে পড়ে। নদী থেকে সমুদ্রে।

নদীর পাড়ে দৌড়ে গেলেই হুহু করে হাওয়া উঠে আসে। কপালি ফাঁক পেলেই দৌড়ে বনজঙ্গল পার হয়ে নদীর ধারে চলে যায়—ও-পার দেখা যায় না. নদীর ঢেউ, ভটভটির শব্দ, নীল খোলামেলা আকাশের নীচে সন্ধ্যা তারা কিংবা দূরের বটগাছ, বটগাছের নীচে সাধুবাবার আশ্রম—মেলার সময় কী ভিড়, কী ভিড়!

তার মধ্যে আছে এক প্রকৃতির সুষমা।

বাপ কালীপদ এটা জানে, বোঝে। বনজঙ্গল পার হলেই নদী, ঘরের পাশে খাল, আদিগন্ত মাঠ সামনে—ফসলের দিনে সবুজ গন্ধে বাড়িটা ডুবে থাকে।

বৃষ্টির দিনে কাঠকুটো পাঁজাকোলে করে নিয়ে আসে। ভিজা কাঠে ধোঁয়া। বারান্দায় ভুখা ভাইবোনগুলির জন্য কপালি একদণ্ড বসে থাকে না। মা নেই—সে নামেই বাপ। বাপের কাজ তো কিছুই করতে পারে না। রায়মশায়দের বড়ো শরিকের ছোটোবাবুর পুত্র শহরে থাকে। বিদ্যার জাহাজ। তবে সংসারে শান্তি নেই। রোগভোগে বাবুর পরিবার জেরবার। সে দায়ে, অদায়ে ছোটোবাবুর কাছে যায়। তিনিই বলেছিলেন, বৌমা ছেলেপুলে নিয়ে পারে না। বিশ্বাসী লোকজনের খোঁজ পাসতো জানাবি।

বাবুতো জানে না, কপালি বড়ো হয়ে গেছে। বাবুতো জানে না, কপালি দু-দুবার শহরে কাজ করতে গিয়ে টিকতে পারেনি। একাই একবার চলে এসেছিল। রাস্তাখান তো সোজা না। শ্যামবাজার থেকে বাস। বাসে বারাসাত। আবার বাস। বাসে মহেশখালি। মহেশখালি থেকে ভটভটিতে পা ক্কা দু-ঘন্টা। তারপর ঘাট থেকে নেমে টানা এক ক্রোশ পথ। সকালে বের হলে গাঁয়ে পৌঁছাতে সাঁজ লেগে যায়। বড়োই দুর্গম অঞ্চল। শাকপাতা, বন আলু, খালে বিলে মাছ আর নদী ধরে যায় হাঁড়ি পাতিলের নৌকা। কপালির নেশা—ওই হাঁড়ি পাতিলের নৌকা দেখা। ঘাটে যদি ভিড়ে যায়—টাকা পাঁচসিকেয় সে যা পারে কিনে আনে। শহরে টাকা ওড়ে কালীপদ জানে। সে নিজেও শহরে গিয়ে সুখ পায় না। কপালি চলে এলে কোনো ধন্দ থাকে না। বনজঙ্গলের নেশা। সহজে কাটবার নয়। বাবুরা বুঝিয়েও রাখতে পারেনি। সে কান্নাকাটি করলে রাখেই বা কী করে'! দেশগাঁয়ের লোক পেলে পাঠিয়ে দেওয়া ছাড়া উপায়ও থাকে না।

তা কালীপদ বলেছিল, বিশ্বাসীজন তো ঘরেই আছে বাবু। সে কারো কাঠকুঁটোও সরায় না। তবে ওই এক বদভ্যাস বাবু।

কী বদভ্যাস! কে সে!

আমার কপালি। গতরে খাটি। মেয়েটা ঘর সামলায়। দু দু-বার শহরে পাঠালাম। মন টিকল না।

বদভ্যাসটি কী বললে না!

নেশা বাবু।

কীসের নেশা'!

বনজঙ্গলের। নদীর পাড়ের। খোলা আকাশের।

নেশা বলছ কেন?

তা ছাড়া কী বাবু। ওইতো সেবারে কপালি শহর থেকে চলে এসে ভয়ে বাড়ি ঢোকেনি। পাছে মন্দ কথা বলি। বড়ো খাটতি পারে। বললাম, চলে এলি!

বাবুরা মন্দ স্বভাবে!

কী বলে!

কিছু বলে না।

ভালো নয়। কিছু না বললে চলবে কেন! শহর তো ভালো জায়গা নয়। কপালির মন্দ কিছু করেনি তো!

না বাবু। মন্দ কিছু করলে বলতনি! তার নাকি পেয়ারা গাছটা ছাগলে না হয় গোরুতে খাবে এই আতঙ্ক।

কপালি পেয়ারা গাছ লাগিয়েছে?

শুধু কী পেয়ারা গাছ'! বাড়ি থাকলে, আনাচে-কানাচে নিজের মাটিটুকু সাফ করে লঙ্কা গাছ, কুমড়ো গাছ, ফুলের গাছ যা পায় লাগায়। গাছের যত্নআত্তি জানে। এটাও নেশা।

তা কপালির বদভ্যাস বলছিস কেন?

ওইতো বলছি বাবু, তার মন পুড়লে চলবে'! পেট পুড়লে মন কি ঠিক থাকতে পারে'! আগে তো পেট বাবু, পরে তো মন—কী বলেন, ঠিক বলিনি'!

সবই ঠিক। তবে চেষ্টা করে দেখতে পারিস। খোকন অফিস যাবে না বৌ সামলাবে, বাচ্চা সামলাবে বুঝতে পারছি না। ঠিকা কাজের লোক আছে। তার মাকে ফের চিঠিতে লিখছে, দেশ থেকে যদি কেউ যায়।

চেনাশোনা ছাড়া বাড়িতে কাউকে রাখাও যায় না। দিনকাল বড়ো খারাপ। ঝি-চাকর গলায় ছুরি বসায়—খবরের কাগজ দেখে তো ঘিলু ঠাণ্ডা মেরে যায়। কাকে যে পাঠাই।

কপালিরে দিয়ে আসব বাবু?

থাকবে?

সেই। থাকবে কি না কথা দিতে পারব না। কন্যে লকলক করে বাড়ছে বাবু। কুমড়ো গাছের মতো—এ-বেলা দেখলেন একরকম, ও-বেলা অন্যরকম। আমার কপালি কাজ করলে ক-টা কাচা পয়সা হয়। তা কন্যে মাথা পাতছে না। শহরের কথা তুললেই মন খারাপ, মেজাজ খারাপ—খাঁচার মধ্যে বন্দি। আমি কী টিয়া না ময়না। খাঁচায় পুরে দিয়ে আসতে চাও'!

কথা তো মিছে না। কপালির দোষ নেই। তবে খোকন বেশ বড়ো জায়গা নিয়ে বাড়ি করেছে। আমি জমিটা কিনে রেখেছিলাম—কোনো রকমে বাড়িটা করেছি। তোর গিন্নিমা গিয়েও সুখ পায় না।

কলকাতায় আমারও মন টেকে না। কেন টেকে না বলতো?

সেইতো কথা বাবু। কপালির দোষ দিই না। আমার ভাগ্য। বাপের স্বভাব পেয়েছে। শহরে যেতে পারলাম কৈ বাবু? কেত্তনের গলাখানা আমারে খেয়েছে। তা খোলে চাপড় মেরে যখন গাই, ও রাই নিশি যে পোহায়—শহরে কে বোঝে তার মর্ম বলেন।

নিশি যে পোহায়।

খুবই দামি কথা। ছোটোবাবু ঝিম মেরে থাকেন। কথা বলেন না। শুধু মাথা ঝাঁকান—নিশি যে পোহায়।

তা কপালিরতো নিশি পোহাবার সময় নয়। নিশি সবে শুরু। চেষ্টা করে দেখতে ক্ষতি কী। ওরে একদিন নিয়ে আয়, দেখি।

কালীপদ এক ক্রোশ হেঁটে কপালিকে দেখাতে নিয়ে গেছিল। বাবুর সম্ভ্রম আছে এ-তল্লাটে। লোকে এক নামে গড় হয়।

সেও কপালিকে গড় হতে বলেছিল।

দিব্যি কোঠাবাড়ি—সামনে গন্ধরাজ ফুলের বাহার। কপালি এক ফাঁকে কখন যে গাছের কাছে চলে গেছে। ফুল তুলছে। খোপায় গুঁজেছে। তারপর বাবুর পায়ে গড় হলেই বলেছেন, কপালি তুই ফুল হয়ে ফুটে থাকতে চাস ভালো। টিয়াপাখির মতো উড়ে বেড়াতে চাস ভালো—বয়েসটাতো ভালো না। তা কালীপদ শাড়ি কিনে দিও। বলে দুখানা পঞ্চাশ টাকার নোট এগিয়ে দিয়ে বলেছিলেন, ঘুরে দেখে আসতে পারিস। মন টিকলে থাকবি, না টিকলে কী করা'! বাচ্চাদুটোকে দেখাশোনা করবি, পারবি না'!

কপালি একবার বাপের দিকে তাকায় অন্য বার বাবুর দিকে তাকায়। কিছু বলে না। যা বলবে বাবা, যা করবে বাবু। সে তো সব বুঝতে পারে না।

তা কালীপদ নিয়ে যাও। মেয়ে তোমার মাথা পাতবে মনে হয়। খাঁচায় বন্দি থাকবে না। বাড়িটায় ঝোপজঙ্গলও গজিয়েছে। বর্ষাকাল বোঝইতো। সাফ না করলে ঘাস, ঝোপজঙ্গলে ভরে যায়। বনজঙ্গলেরতো নিশি পোহাবার বালাই নেই। আপনিই বড়ো হয়, আর আপনিতেই মজে যায়। শীত এলে বুঝি। ফাগুনের বাতাসেই পাতা ঝরতে থাকে। কীরে কপালি বুঝলি কিছু?

ফিক করে হেসে দিয়েছিল কপালি। বাপের পেছনে গিয়ে মুখ লুকিয়েছিল। কোনো কথা বলেনি।

দুদিন পরে ফের গিয়েছিল কালীপদ। গড় হয়েছিল।

কী খবর।

মেয়েতো মাথা পেতেছে বাবু।

বলিস কী'!

ওই যে বলেছেন, ঝোপজঙ্গল আছে—কী বুঝল কে জানে—বলল, কবে যাব বাবা। তুমি দিয়ে এস।

তারপর টাকাপয়সার রফা। কপালি টাকাপয়সার মধ্যে থাকে না। টাকাপয়সা সে বোঝেও না। ভাই-বোনগুলি খেতে পাবে—উদোম হয়ে এ-বাড়ি সে-বাড়ি করবে না—দিদি যাবে শহরে—তা পথের দিকে তাকিয়ে থাকবে—কবে আসে দিদি—এলেই দৌড়। দিদির কোমর জড়িয়ে চিৎকার—আমার দিদি। দিদি এসেছে।

কপালির এই সুখটাও কম না। এই ভাবনাটাও বড়ো মধুর।

তা কপালিকে নিয়ে রওনা হবার সময় কালীপদ বার বার বুঝিয়েছে, ভেবে দ্যাখ, আমার মুখ পোড়াস না। বাড়িঘর দেখে পছন্দ হলে থাকবি, নয়তো সঙ্গে নিয়ে ফিরে আনব। বাবু নতুন শাড়ি দিয়েছে। শাড়ি পরতে শিখে গেলি। বেইমানি করলে, মুখ থাকবে না।

সে শহরে ঢুকে দেখল, তারাবাতির মতো রাস্তায় আলো জ্বলছে। লোকজন, হট্টগোল পার হয়ে ঠিকানা খুঁজে বাড়িখানা বের করতেই হিমসিম খেয়ে গেল।

নতুন বাড়িঘর উঠছে। এদিক ওদিক ফাঁকা জমিরও অভাব নেই। গাছপালাও চোখে পড়ছে। ডোবা কচুরিপানায় ভরতি, ইট সুরকির রাস্তা—তারের লাইন চলে গেছে মাথার উপর দিয়ে। গাঁয়ের আসটে গন্ধটা যে মরে যায়নি বাড়ির সামনে দাঁড়িয়েই কপালি টের পেল।

গেট সামনে।

ঝুঁকে, কী লেখা দেখল কালীপদ। 'নিকু' ভবন'। ছোটোবাবুর নামে বাড়ির নাম। সান বাঁধানো রাস্তা গেট থেকে। কালীপদ গেট খুলতেই ভিতরে আলো জ্বলে উঠেছিল'!

কে? কে?

আমি খোকনবাবু। আপনার বাবা পাঠিয়েছে।

দরজা খুলে বলেছিল, ভিতরে এস। তারপর খোকনবাবু পত্রখানা পাঠ করে বলেছিল, তোমার মেয়ে।

আজ্ঞে বাবু।

খোকনবাবুর স্ত্রীও হাজির।

স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বলেছিল, বাবা পাঠিয়েছে।

স্ত্রীটি যে কমজোরি দেখে টের পেয়েছে কালীপদ। কপালি গা ঢেকে একপাশে অন্ধকারে নিজেকে আড়াল করে রেখেছে।

চিঠির বয়ানটি খুব মধুর ঠেকেনি। বাবা লিখেছেন, সুজাপুরের লোক এরা। বাবা কীর্তন গাইয়ে। মেয়ে ফুল-বিলাসী। দ্যাখো রেখে, যদি টিকে যায় ভালো। না টিকলে চিঠি দেবে—কালীপদ গিয়ে নিয়ে আসবে।

কীরে থাকতে পারবিতো?

ঘাড় বাকিয়ে দিয়েছিল কপালি।

কালীপদ দুগগা নাম জপ করছে। বললেই হল, আমি যাব বাবা।

কোথায় যাবি।

তোমার সঙ্গে চলে যাব।

যাক ঘাড় কাত করেছে। থাকতে পারবে বলছে। তবু সারারাত কালীপদ ঘুমোতে পারেনি। খাওয়াটাও পেটের কসি আলগা করে—মুগের ডাল, বেগুনভাজা, ইলিশ মাছের ঝাল, চাটনি। শেষ পাতে গিন্নিমা দুটো মিষ্টি দিয়েছে। বাচ্চা-দুটি যে জমজ বুঝতে অসুবিধা হয়নি। দেখতে একরকম। একটা গেলে, আর একটাকে খুঁজে আনলেও চলে।

সকালে উঠে কালীপদ কপালিকে বিছানায় দেখতে পায়নি। বাইরের ঘরে তাদের থাকতে দিয়েছে। ফুল ফল আঁকা রংচঙে মেজে। মাদুর দুখানা, বালিশ দুখানা। বড়ো বড়ো জানালা খোলা। বাবু পাখা চালিয়ে দিলে বলেছিল, না বাবু, পাখার হাওয়া সহ্য হয় না। শরীর ম্যাজ ম্যাজ করে। মাথা ধরে।

তা এই গরমে!

গরমকালে, গরম থাকবে না'! সে হয় বাবু'!

বৃষ্টি বাদলার দিনে বৃষ্টি না হলে গরমের প্রকোপ বাড়ে। ভ্যাপসা গরম পড়েছে। তবু কালীপদ পাখা চালাতে রাজি হয়নি।

কপালিও বেঘোরে ঘুমিয়েছে।

সকালে উঠেই দেখেছে, কপালি বিছানায় নেই। গেল কোথায়। তা তার একটু বেলা হয়ে গেছে, উঠতে।

আকাশ ফর্সা। রোদ উঠে গেছে। এত বেলা অবধি কপালি বিছানায় থাকতে পারে না। অন্ধকার থাকতেই কপালির ঘুম ভেঙে যায়। তার হাঁস মুরগি আছে। মুরগির ডিম হয়। কপালি ডিম ফুটিয়ে বাচ্চা বানায়। বড়ো করে। সংসারে শতেক কাজ।

সে দেখল দরজা খোলা।

সদরও খোলা।

বাবুরা কেউ ওঠেনি। বাবুদের বেলা করে ঘুম ভাঙে। কিন্তু কপালি গেল কোথায়।

সদর ধরে বাইরে বের হয়ে এল। ভিতরের দিকের দরজা বন্ধ। কপালি কি হাওয়া হয়ে গেল'! তার বুক ধড়াস ধড়াস করছে। আর তখনই দেখল বাড়িটা মেলা জায়গা জুড়ে। অথচ গাছপালা কিছু নেই। ফাঁকা জমিন—ঘাস বড়ো বড়ো। চারপাশে উঁচু পাঁচিল। পাঁচিলের গেটে তালা মারা। পাঁচিল টপকে কপালি পালাতে পারবে বলে মনে হয় না। সে আর্ত গলায় ডেকেই উঠত, বাবুগো আমার সর্বনাস হয়েছে।

কিন্তু তখনই দেখল, পাঁচিলের এক কোণায় কপালি ঝোপজঙ্গলে উঁকি দিয়ে আছে।

অ কপালি'! তুই এখানে। তোরে খুঁজছি।

বাবা দেখবে এস।

কালীপদ ছুটে গিয়েছিল।

কলমি লতায় ফুল এয়েছে। কপালি ফুল দেখে কী খুশি'!

পাঁচিলের কোণের দিকে সামান্য জলা জায়গা। শাড়ি তুলে কপালি কলমিলতার শাক তুলছে।

বাবু বের হয়ে বলছেন, আরে তোমরা এখানে?

কপালি কেমন লজ্জা পেল। সে পা ঢেকে সরে দাঁড়াল।

কপালির কাণ্ড দ্যাখেন বাবু'! শাকপাতা তুলছে। আর কপালির এই দোষ, একদণ্ড স্থির হয়ে বসতে জানে না। ঘুম থেকে উঠে দেখি বিছানায় নেই। বিদেশ জায়গা—ডর লাগে না বলেন'! তা জায়গা তো অনেক। গাছ নাই একটা বাবু। কপালির ওই আর এক দোষ। ফাঁকা জমিন সহ্য হয় না। ওর দোষগুণ ক্ষমা করে নিলে, কপালি আমার সন্ধ্যাতারা।

তা সন্ধ্যাতারাই বটে।

কপালি কই রে'!

যাই দাদাবাবু।

কলপাড়ে কী করছিস'! ডাকলে সাড়া দিস না। বৌদিমণির ঘরে চা দিলি না।

কপালি দৌড়ায়।

কলপাড়টা কী হয়ে আছে'! বর্ষাকাল—ঝুপঝাপ বৃষ্টি নামে। ঝম ঝম করে আকাশ মেঘলা হয়ে যায়—ঘোর অন্ধকারে কপালি জানালায় দাঁড়িয়ে থাকে। আর কেন যে তার মনে হয়, জমি পরিষ্কার করে দুটো কুমড়োর চারা পুঁতে দিলে হয়। তার চোখ, বাড়ির আনাচে কানাচে ঘোরে। সে দেখেছে এটো কাঁটা ফেলার জায়গায়, দুটো কুমড়োর চারা

বর্ষার জলে লক লক করছে। সে ফাঁক খুঁজছিল—দাদাবাবু অফিস, অরুণ বরুণ মার সঙ্গে দিবানিদ্রা দিচ্ছে।

এই সুযোগ।

সে চুপি চুপি খুরপি হাতে বের হয়ে এসেছে। দাদাবাবু এত সকাল সকাল বাড়ি আসবেন বুঝতে পারেনি। সদরে ঢুকে গেলে কলপাড় থেকে বোঝার উপায় থাকে না। সে কলপাড়ে কী করছে ভাবতেই পারে। জিভ কেটে সে দৌড়াল। বৌদিমণি দরজা খুলে দিয়েছে। খুবই অনায্য কাজ। সে আঁচলে হাত মুছে এক লাফে রান্নাঘরে ঢুকে বাসন সরাতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে।

দাদাবাবু বুঝুক, সে রান্নাঘরেই আছে।

বৌদিমণি বুঝুক, সে চা-এর জল গরম করছে।

দাদাবাবু রান্নাঘরে উঁকি দিতেই বলল, চা করে দিয়ে আসছি দাদাবাবু।

কোথায় থাকিস। কলপাড়ে গলা পেলাম। না, ঘরেই ছিলাম।

সে না ধরা পড়ে যায়। নতুন জায়গা, তবে সে বোঝে, বৌদিমণি বড়ো আয়েসি। সে খুবই কাজের। কারণ শহরে যে টাইমে জল আসে তাও সে জানে। গ্যাস বন্ধ করতে জানে, খুলতে জানে। বৌদিমণি খুবই অবাক—তুই এত শিখলি কবে'!

বৌদিমণি, তোমাদের টাইমের জল নেই।

আসবে। কেন'!

শহরে তো টাইমের জল থাকে।

আসলে বৌদিমণি টের পাক, সে শহরের অনেক খবরই রাখে। টাইমে জল আসে তারও খবর জানা। বৌদিমণিকে অবাক করে দিতে পারলে ভারি মজা। কুমড়োর চারা পুঁতে দিয়েছে। মাটিতে লেগে গেলেই ডগা মেলতে শুরু করবে। এটা তার আর এক আনন্দ।

সে বাজার করেও আনে।

লোকজনের সঙ্গে মিশতে শিখে গেছে।

ও মাসি, আমাকে দুটো লঙ্কার চারা দেবে।

কী করবি।

বারে কত জমি আমাদের। গাছ হলে লঙ্কা হয় তাও বুঝি জান না?

গাছ হলে লঙ্কা হয় খবরটা কপালি ছাড়া কেউ যেন বোঝে না।

দাদাবাবুর এক অভিযোগ, তুই ঘরে থাকতেই চাস না। থাকবে কি'! খোলামেলা আকাশ যে তার প্রিয়। ঘরের মধ্যে কাহাতক বন্দি হয়ে থাকা যায়। বাড়ির ফাঁকা জায়গাটুকু না থাকলে তার যে কী হত।

এই কপালি।

আজ্ঞে যাই বৌদিমণি।

এত বেলা হল, চান করিসনি, খাসনি'! কী করছিস?

রিনা দরজায় চুপি দিলে দেখতে পায়—কপালি কি লাগাচ্ছে।

কী আবার কার কাছ থেকে আনলি'! তোর কি মাথা খারাপ আছে'!

এই হয়ে গেল। যাচ্ছি।

ক-টা বাজে খেয়াল করেছিস?

তা অনেক বেলা। তারতো জমির আগাছা দেখতে ভালো লাগে না। সে যে নিজের মেলা জমি পেয়ে গেছে তারতো মনেই হয় না, সে এ-বাড়ির কেউ না। কুমড়ো গাছ, লঙ্কা গাছ,

ক-টা বেগুনের চারা পর্যন্ত পুঁতে দিয়েছে। কে যে মাথার দিব্যি দিয়েছে সে তাও জানে না, তবে দাদাবাবু একদিন খুবই প্রশংসা করেছে। তার হাতের গুণ আছে। কুমড়ো ফুল ভাজা খেতে খেতে দাদাবাবু এমন বলেছিল। তারপর বড়ো বড়ো কুমড়ো ধরল, গাছে লঙ্কা হল—দাদাবাবু দেখে আর অবাক হয়ে যায়।

সে কোত্থেকে দোপাটি ফুলের চারা এনেছে। কিছু রজনীগন্ধার মূল। এবং এক বছরেই সে বাড়িটায় পেঁপে গাছ, লেবুর গাছ এবং সঙ্গে দুটো আমগাছের চারা পর্যন্ত পুঁতে দিয়েছে। এত ফাঁকা জমিন—শুধু আগাছা থাকবে, হয়'!

হঠাৎ বিকালে সেই কপালি উধাও। গেল কোথায়'! না বলেতো কোথাও যায় না। বড় রাস্তা, বাজার ওদিকে, হানাপাড়া পর্যন্ত চেনে—তার বেশি না।

রিনা, কপালি নেই!

রিনা টেবিল পরিষ্কার করছিল।

কিছু বললে?

কপালিকে কোথাও পাঠিয়েছ?

নাতো'! দুধ আনতে যায়নি তো। দ্যাখোতো রান্নাঘরে দুধের পাত্র আছে কি না'!

দাদাবাবুর মাথা গরম। কপালির গায়ে কি শহরের জল লেগে গেল’! সে যদি পালায়। তা কপালির মিষ্টি মুখখানি উঠতি ছোকরাদের টানতেই পারে। সকাল থেকে তো কাজের শেষ থাকে না।

এই কপালি যা, দোকান থেকে দাদাবাবুর ব্লেড নিয়ে আয়।

এই কপালি যা, রেশন তুলে আনগে।

এই কপালি যা, গ্যাসের লোকটাকে খবর দিয়ে আয় সিলিণ্ডার খালি।

কত লোককে সে এখন চেনে।

তুই কাদের বাড়িতে কাজ করিস রে’! বললেই কপালি ক্ষেপে যায়।

আমি কোথায় কাজ করি তা দিয়ে তোমার কী দরকার’!

সে বাজারের পয়সা বাঁচিয়ে একবার একটা কাগজি লেবুর কলম কিনে এনেছিল। লোকটা তাকে চেনে। খোকনবাবুর কাজের মেয়ে। কাজের মেয়ে কাগজি লেবুর কলম দিয়ে কী করবে’! মনে তার সংশয় হতেই পারে।

কোথায় লাগাবি’!

কেন আমাদের বাড়িতে।

লোকটা হেসেছিল।

কপালির যে তখন কী রাগ হয় না। সে গজ গজ করছিল, আমার গাছ কোথায় লাগাব তাতে তোমার কি গো। জায়গা না থাকলে গাছ কেউ কেনে’! গাছ না থাকলে বাড়ি হয়!

জানো দাদাবাবু লোকটা ভালো না।

কোন লোকটা’!

ওই যে গাছের চারা নিয়ে বসে থাকে।

আবার গাছ কিনলি’!

এই এতটুকুন গাছ। বেশি দাম না।

দাদাবাবু কিছু আর আজকাল বলেন না। বাড়িটাকে কপালি খুশিমতো বাগান বানিয়ে ফেলছে। আত্মীয় স্বজনরা এলে সে তার কিচেন গার্ডেন ঘুরিয়ে দেখায়। এতদিন বাড়ির পেছনের দিকটা ঝোপ- জঙ্গলে অন্ধকার হয়ে থাকত। এখন সেখানে একটা আগাছা গজাতে দেয় না কপালি। কপালির গাছ লাগাবার এত নেশা যে চান খাওয়ার কথাও মনে রাখতে পারে না। আবদার করলে সে নিজেও গাছের কলম কেনার জন্য আলাদা পয়সা দেয়। কপালিকে আর মনেই হয় না, সে এ-বাড়ির কেউ না। শহরে থেকে রং ফর্সা হয়ে

গেছে। রিনাও পছন্দ করে, বকাঝকাও করে। পূজার সময় কপালির পছন্দ মতো সায়া শাড়ি কিনে দিয়েছে। নিজের শাড়ি একটু পুরোনো হলেই কপালিকে দিয়ে দেয়। কী খুশি মেয়েটা। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সে নিজেকে ঘুরে ফিরে দেখতেও পছন্দ করে। গোপনে কাজটা সারে। একদিন তার চোখে পড়ে যেতেই বুকের কাছে মাথা নীচু করে হাওয়া।

কিন্তু গেল কোথায়'!

কার কাছেই বা খবর নেবে! উঠতি বয়েস। ফুলের মতো ফুটে উঠছিল সবে। কী যে করে'!

কপালি অদায়িত্বশীলও নয়। যদি কোনো উটকো লোকের পাল্লায় পড়ে যায়।

সাজ লেগে গেল। সামনে কপালির ফুলের বাগান। টগর দোপাটি যুঁই মালতী কী ফুল নেই। সদর দরজায় রিনা দাঁড়িয়ে।

দুশ্চিন্তায় মুখ ভার। মেয়েটা শেষে না বলে-কয়ে পালাল!

রিনা দেখল তার মানুষটি ফিরে আসছে। একা।

কোনো খোঁজ পেলে'! কেউ দেখেছে'!

না। কেউ দেখেনি।

তবু একবার ভালো করে ঘরগুলি দেখা দরকার। বাড়িতে ঘরও অনেক। বাবার ইচ্ছে ছিল ফ্ল্যাট বাড়ি করার। দুটো করে হাজার স্কোয়ার ফিটের মতো ফ্ল্যাট। তার বাবা শেষে কেন যে মত বদলালেন। বাড়িতে থাকবে তো নিজের বাড়িতে থাকবে। বাইরের লোক বাড়িতে থাকা ঠিক না। ফ্ল্যাট বাড়িগুলি নিরাপদও নয়। কার বাড়িতে কোন অছিলায় কী লোক ঢুকে যাবে—কিছু বলাও যাবে না। পরে আর বাড়ির কাজে বাবা হাতই দিলেন না। দেশের জমিজমা বেচে দিয়ে শহরে চলে আসবেন এমনও ভেবেছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পারলেন না।

তোমার মা থাকতে রাজি না। বাবার এক কথা।

তোমার বাবাও শহরে এসে সুখ পায় না। বাবার এক কথা।

আসলে গাঁয়ে থাকলে এক রকমের স্বভাব, শহরে থাকলে এক রকমের।

ওদিকের ঘরগুলি খোলাও থাকে। বন্ধও থাকে। লম্বা করিডোর—দু-পাশে দুটো ফ্ল্যাট—এখন সবটাই তার ভোগ দখলে।

কোনো ঘরে যদি ঘাপটি মেরে থাকে। আকাম কুকাম করলে বুঝতে পারে কপালি, দাদা এসে চোটপাট করবে। দাদাবাবু বকতে পারে। তখন পালিয়ে থাকার স্বভাব।

অন্ধকারও পছন্দ। শ্যামলা রং ধরেছে ইদানীং। বিয়ের বয়স ফুটে উঠলে যা হয়। লাবণ্য যেন উপচে পড়ছে। কারো নজর পড়বে না হয়'! আর কপালি যদি মাথা পাতে।

দরজা খুলে সব ঘরগুলিই দেখা গেল।

ঘুমালে অঘোরে ঘুমায় কপালি। দিশা থাকে না। সাঁজ লাগলেও সাড়া পাওয়া যায় না। মরার মতো ঘুম। মাদুর পেতে শুতে তর সয় না। পড়লো তো মরল।

না কোনো ঘরে নেই। ছাদেও নেই। বাথরুম খুলে দেখল। তারপর অগত্যা দেশেই খবর পাঠাতে হয়। থানা পুলিশ করতেও ভয়। কালীপদকে আগে খবর দেওয়া দরকার। সঙ্গে বাবাকেও। বাবা ঠিক কথাই বলেছেন, মন খারাপ হলে পালাতে পারে। যদি দেশেই চলে যায়।

সাত পাঁচ ভাবছিল তারা। আর তখনই রিনা বলল, দেখতো গেটের অন্ধকারে কে যেন দাঁড়িয়ে আছে।

গেট বন্ধ করে দিয়ে এসেছিল সে। বেশি রাতে গেট খোলা রাখতেও সাহস পায় না।

কে? ওখানে কে'!

সাড়া নেই।

সে ছুটে গিয়ে দেখল, অন্ধকারে কপালি দাঁড়িয়ে আছে।

আর মাথা ঠিক রাখা যায়'!

কোথায় গেছিলে'! ভিতরে আয়। আজ তোর একদিন কী আমার একদিন!

কপালি মাথা তুলছিল না। দাদাবাবু চোটপাট করলে সে এমনিতেই ঘাবড়ে যায়। আজ যে কপালে দুর্ভোগ আছে ফেরার মুখেই টের পেয়েছিল।

দাদাবাবু, বৌদিমণি কাউকে না বলে বের হয়ে যাওয়া ঠিক হয়নি। মিনসেটা এত পাজি জানবে কী করে।

কী বললি কপালি?

আমার গন্ধরাজ ফুলের কলম কী হল?

দেব।

দেব! তবে দিচ্ছ না কেন। ঘোরাচ্ছ।

বাড়িতে কলম করেছি। হলে বলব।

কবে হবে?

সময় হলে বলব। তখন কিন্তু না করতে পারবি না।

বারে না করব কেন?

বাড়ি যেতে হবে।

যাব। বাড়ি কতদূর!

এই হানাপাড়া পার হয়ে।

গেট বন্ধ করার সময় দাদাবাবু তার দিকে তাকিয়ে অবাক!

এঁকি ছিরি তোর। চোখ বসে গেছে কেন! এত আতঙ্ক কীসের। হাতে ওটা কী!

শাড়ি সায়া ব্লাউজ সামলাতে পারেনি। দেখেই দাদাবাবু বোধহয় টের পেয়ে গেছে। সে ফুঁপিয়ে উঠল। কাঁদছে।

কী হল!

রিনাও ছুটে এসেছে। গেটে এই তামাসা তার পছন্দ না। বলা নেই কওয়া নেই হাওয়া। রাত করে ফিরে আসা! চোখে আবার জল গড়াচ্ছে! ঢং। হাতে ছোট্ট টব। কী ফুল, কী গাছের কলম কিছুই বুঝছে না রিনা। সব গেলেও কপালি টবটা আর গাছটা অক্ষত রাখতে পেরেছে—একেবারে ভেঙে পড়ছে না। এতে আরও ক্ষেপে গেল রিনা।

ভিতরে যা।

কপালি বাড়ি ঢুকে বারান্দায় টবটা আলতোভাবে নামিয়ে রাখল।

তারপর জেরা শুরু।

জেরার মুখে কপালি বলল, আমার কী দোষ, লোকটা তো বলল, বাড়িতে গেলে দেবে'!

কোন লোকটা!

ওই যে গাছফাছ বিক্রি করে।

ধন'য়। ও বলল, আর তার বাড়ি গেলি!

আমার কী দোষ! ওতো ঘোরাচ্ছিল। বাড়ি যেতে বলল। লোকটার খারাপ মতলব বুঝব কী করে! টবটা দেখিয়ে বলল, ঘরে আয়। দামদর হবে! কত এনেছিস! বলেই হাত ধরে টানতে থাকল। আমিও ছাড়িনি। হাত কামড়ে টব নিয়ে পালিয়েছি।

টবটা ছুঁড়ে মারতে পারলি না মুখে! দেখাচ্ছি মজা!

টবটা ছুঁড়ে মারলে ভেঙে যেত না! গাছটা কী তবে বাঁচত!

বৌদিমণি কিংবা দাদাবাবু কেন যে আর একটা কথা বলতে পারল না। মাথা নীচু করে ভিতরের দিকে চলে গেল! নিজে ক্ষতবিক্ষত হলেও গাছটা অক্ষত আছে ভেবেই কপালি খুশি।

কপালি বেশ চেঁচিয়ে বলল, বৌদিমণি গাছটা কিন্তু গেটের সামনে লাগাব। দেখবে ফুল ফুটলে বাড়িটা গন্ধে ম ম করবে। কী মজা হবে না বৌদিমণি।

কপালি সব ভুলে গেছে। টবটা কোথায় রাখবে ভেবে পাচ্ছে না।

ও বৌদিমণি, টবটা বারান্দায় রাখলাম।

অবশ্য ভিতর থেকে কোনো সাড়া নেই।

সে আবার চেঁচিয়ে বলল, গাছ না হলে বাড়ি হয়।

এবারেও কোনো সাড়া পাওয়া গেল না।

কপালি সত্যি সন্ধ্যাতারা। তারার সঙ্গে কে কথা বলে!

কাকচরিত্র

বড়োই বিপাকে পড়েছি হে। ঘিলুতে লোকটার এই একটা কথাই পাক খাচ্ছে। তাও মনে মনে। কী বিপাক, কীসের বিপাক কেউ জানে না। মাসখানেক ধরে এই একটা কথাই পাক খায়। ছনের চালে কাক এসে বসে থাকে—হুস করলে উড়ে যায়, কিন্তু এই বিপাক উড়ে যায় না। আবাদে আখাম্বা ষাঁড় দৌড়ায়, হাতে লাঠি নিয়ে তাড়া করলে, সেও দৌড়ায়। পাখ পাখালি গমের জমিতে উড়ে এলে হাঁ হাঁ করে তেড়ে যায়, পোকামাকড়ের বড়ো উপদ্রব। তার এক কথা। বিষম বিপাকে পড়েছি হে।

এই বিপাক মাসখানেক দৌড় করাচ্ছে তাকে। তা তুই আবাগির বেটি বুঝলি না, তোর বাপ মুখ দেখায় কী করে! শিরে বজ্রাঘাত। এখন আমি তাকে পাই কোথা'!

হা শুনছ বাবা'!

কে?

আমি তোমার খুড়ামশায়।

কিছু করেন।

আরে দেবীর খোঁজ জান'!

ও তো নলহাটির কাছে কোথায় থাকে'!

তারে যে একখান খবর পাঠাতে হয়'!

তারপরই চুপ, খবর কেন'! কীসের খবর'!

মাখন কুণ্ডু দেবী ঠাকুরের খবর জানতে চায় কেন! খবর পাঠাতে চায় কেন'!

পাড়া প্রতিবেশীরা কেমন চুপ মেরে গেছে। সৃষ্টিছাড়া কাজ হয়ে গেল যে, উঠোনের মাঝখানে অপকম্মটা সেরে গেল। ধূপ ধুনোর তো খামতি নেই। সকাল থেকে তার কাজ, জমিতে যে দিনে যা লাগে সবকিছুর জন্য ছোটাছুটি। গোরুর দুধ ঘরে—তা অভাব অনটন আছে, ছানি মানি ধানি তিন কন্যে, বড়ো পুত্র কাঁচরাপাড়ায় কলে কাজ করে, হপ্তার ছুটিতে এলে যেতে চায় না—লাগোয়া ঘরটায়। উঠতি যুবকেরা তখন ভিড় বাড়ায়—কীসের গরমে সে বোঝে। শরীরে গরম ধরলে এটা হয়।

মানুষটা সব বুঝেও চুপচাপ ছিল। ছানি মানি ধানি তিনজনাই সোমত্ত, গায়ে গরম ধরে গেছে। পুরুষ মানুষ বড়ো সংক্রামক ব্যাধি, এলেই গায়ে তাপ বাড়ে। তা বাড়ছিল, বেশ কথা। বাড়তে বাড়তে আগুন লেগে যাবে, মুখপুড়ী রাক্ষুসী তোর এ কথাটা মনে এল না। পেটের মধ্যে, আগুন গিলে বসে আছিস, কে নেভায়।

সহসা তার আর্তনাদ, কার কাম ক দিকি, মুণ্ডু ছিঁড়ে আনি!

ছানি মুখ থুবড়ে বসে পড়েছিল সেদিন। বমি, গা গোলায়, তা তুই কুমারী মেয়ে, আমিতো বসে নেই—বয়স হলে গোরু বাছুরের মতো পাল খাওয়াতে হয়, মনুষ্য সমাজে বাস, শাঁখা, সিঁদুর লাগে, আর লাগে হলুদ বাটা, আম্র পল্লব—সামিয়ানা টানাতে হয়, তার নীচে আগুনের কুণ্ডু, হোম দু-হাতের মিলন, তারপর যদৃচ্ছ আচরণ, যেমন খুশি পা তুলে নামিয়ে, উপুড় করে কিংবা উটের মতো মুখটি তুলে হাঁটো, কিছু বলার নেই—মাথা উঁচু করে হাঁটতে কষ্ট হয় না। পেটে আগুন থাকলেও জ্বলে না।

কার কাম? বল! বল পোড়াকপালী সর্বনাশী, দা খানা কোথায়, না বলিস তো দা দিয়ে গলাখানা কেটে ফেলব।

ছানি কী বলবে। ডাগর চোখে তাকিয়ে আছে। ধানি মানি বাবাকে জড়িয়ে ধরেছে।—ও বাবা কী কচ্ছ, ও বাবা তুমি কি পাগল হয়ে গেলে? বাবা বাবা!

মাখন কুণ্ডু তেড়ে যাচ্ছে আর বলছে, তার আগে আমি কেন গলায় দড়ি দিলাম না। তোদের মা থাকলে সে সব সামলাত! আমি কার কাছে যাই, কী করি! আবার হুংকার, বলবি না, কে করল। কোন পাষণ্ডের কাজ। আমার এমন সুন্দর কন্যেটাকে নষ্ট করে দিল।

ছানি ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়েছিল। কিছু বলে না! খাচ্ছে না! দুপুরে দরজা বন্ধ করতেই গোলমাল, ও বাবা শিগগির, এস। ক্ষোভে দুঃখে মাখন নিজের জমির আলে মুখ গামছায় ঢেকে শুয়েছিল। খায়নি স্নান করেনি, কোনোদিকে বের হয়ে যাবে ভাবছিল—তুই হলিগে ধরিত্রী। আবাদের সময় পার হয়ে যাচ্ছে বুঝি। তা পাত্রপক্ষের এত জুলুম আমি অভাবী মানুষ সামলাই কী করে'!

কী হল!

শিগগির এস। দিদি দরজা বন্ধ করে দিচ্ছে।

আতঙ্ক। সে মাথার গামছাখান হাতে নিয়ে ছুটেছিল। সুখো মিঞা রাস্তায়। গোরুর গাড়ি নিয়ে শহরে যাচ্ছে—তার সামনে পড়ে গিয়ে মানি ধানি জমির মধ্যে নেবে গেল।—বড়োভাই ছুইটে

গ্যাল! কী ব্যাপার!

ধানি শাড়ির আঁচলে গা ঢাকছিল। বাবা দৌড়াচ্ছে। কথা কবার সময় নাই। ছুটতে ছুটতেই বলল, শকুন উড়তাছে সুখা ভাই।

কোনখানে?

বাড়ির মাথায়।

আসলে এই শকুনের ওড়াউড়ি তারা বড়ো হতে না হতেই টের পায়। চোখ দেখলে টের পায়। দিদি এখন পেটে আগুনের আঙরা নিয়ে বসে আছে, পেটে আগুনের আঙরা এবং এসব মনে হলেই ধানি মানির মনে হয়, সব শকুন। সব ক-টা শকুন। দেবীদা, অমর, গোপাল ছান সব। ওরা কী টের পেয়ে গেল। দাদাটাও মাসখানেক বাড়ি আসছে না। কী যে করে। শাড়ির আঁচল সামলে তালগাছটার নীচে আসতেই কেমন আতঙ্ক—পা অসাড়। তবু টেনে টেনে যখন উঠোনে হাজির, দেখল দিদি আবার অক অক করে বমি করছে।

ধানির মনে হল, বমি পেয়েছে বলে রক্ষা, দরজা খুলে বমি করতে বের হয়েছে। না হলে সর্বনাশ।

মানি ফুঁপিয়ে কাঁদল দিদিকে জড়িয়ে। আর ঠেলাঠেলি, তুই কেন দিদি দরজা বন্ধ করে দিচ্ছিলি,—এই দিদিরে, তুই কেন, কেন! দরজা বন্ধ করলে মাথাকুটে মরব বলে দিচ্ছি। বাবাতো একরামের নানির কাছে যাবে। সব সাফ হয়ে যাবে দেখবি! ভালো হয়ে যাবি। আসলে এতটা কথা মানি বলতে জানে না। টের পেয়ে সেও গুম মেরে গেছিল। ধানির ফিসফিস কথাবার্তা—দেবীদা ছাড়া কেউ না। আসুক ঠ্যাং খোঁড়া করে দেব।

তা হতেই পারে। মিলে যাত্রা দেখতে গেলে, দিদি একা বাড়ি ছিল। পূজার দিনে শহরে ঠাকুর দেখতে গেলে দিদি একা বাড়ি ছিল। ফাঁক ফোঁকরে ইঁদুর বাদুড় ঘরে ঢুকে গেছে। দিদি কিছু বলছে না, বাবা গুম মেরে গেছে—মাঝেমাঝে একখানই কথা, বিষম বিপাকে পড়েছি হে।

তা সংসারে কন্যের বাপ হওয়াটা বড়ো দায় হে। এই একখান কথাও ত্রিভুবনে লংকা কাণ্ড—কন্যের জমিতে বীজ ফেলে তুই উধাও হলি। হারামির বাচ্চা। দেখি নাগাল পাই কী না।

গোপনে গোপনে সাফ করার চেষ্টা, এক সকালে মাখন দুটো শেকড় এনে দিল ধানিকে। বলল, পাঁচ ক্রোশ হেঁটে গেছি হেঁটে এসেছি। নির্ঘাৎ পাতের কথা বলে দিয়েছে।

ধানি বলল, শুধু বেটে খাওয়ালেই হবে।

সঙ্গে নিরসিন্দার পাতার রস।

আর কী।

আর ত কিছু বলেনি।

সব গোপনে গোপনে, বাড়িগুলি ফাঁকা ফাঁকা বলে রক্ষা, প্রথম থেকেই গোপন রাখা গেছিল, কিন্তু শেষে আর পারা যায়নি।

এই দিদি রসটা খেয়ে নে।

ছানি পাশ ফিরে দেখছিল ধানিকে। হাতে কাচের গেলাস নীল রঙের রস। ছানির চোখ সাদা ধূসর, মুখ শুকনো, গলা টিপে আত্মহত্যার চেষ্টা করার সময় মনে হয়েছে, পেটে তার আবাদ, সে মরে গেলে আবাদ নষ্ট। পারেনি।

এই দিদি ওঠ না।

ছানি শাড়ির আঁচলে মুখ ঢেকে রেখেছে।

দিদি।

বাইরে বসে আছে মাখন কুণ্ডু।—নচ্ছার, কুলটা মেয়ে, বংশের মুখে কালি দিলি! তুই মরে যা। মরে যা। সবই মনে মনে—ত্রিসংসারে তার আর কে আছে? এই তিনটে কন্যে, কিছু হাঁস কবুতর, গোয়াল গোরু বাছুর, জমিজমা—চাষা মানুষের যা হয় লেপ্টে থাকার স্বভাব, এই তিন কন্যে নিয়ে সে লেপ্টে ছিল।—ছানিরে তুই একী সর্বনাশ করলি রে'!

দিদি ওঠ। খা। বাবা চিল্লোচ্ছে।

সহসা ছানি উঠে বসল, গ্লাসটা কেড়ে নিল ধানির হাত থেকে। তরপর উঠোনে ছুঁড়ে মারল। শেষে আবার গিয়ে শুয়ে পড়ল। মাখন কুণ্ডু ভাবল, উঠে গিয়ে মেয়ের চুল ধরে টেনে আনে। আছড়ে-পিছড়ে পেট থেকে পিছলে বের করে আনে এক কুলাঙ্গার ইতরটাকে। হাতের কাছে না পেয়ে দাঁত নিশপিশ করছে। যেন বেটা ভূত হয়ে উবে গেল। তারপরই মনে মনে এক কথা, বিষম বিপাকে পড়েছি হে!

মাথায় চড়াৎ করে দেবী ঠাকুর এ-ভাবে হেগে দিয়ে যাবে কল্পনাও করতে পারেনি। বামুনের বেটা তুই, আমার কন্যের এত বড়ো সর্বনাশ করলি'! তা পঞ্চায়েতে গেলে হয়।

কে বলল পাশ থেকে, তুই পাগল মাখন!

আপনি কে গুরুঠাকুর?

আমি কে দেখতে পাও না!

অ আপনি আমার মাথার ঘিলু। তা বলেন, কী করব।

খুঁজে দেখ পাও কি না।

মাখন খুঁজে দেখতে বের হয়ে গেল। সেই যে বের হয়ে গেল আর ফিরল না।

তারপর দিন যায়।

ছানি এক রাতে দেখে দেবী ঠাকুর হাজির।

ছানি বলল, আমি জানতাম তুমি আসবে!

দেবী ঠাকুর বলল, এখান থেকে চলে যেতে হবে।

কেন?

সবই গোপনে! রাতের গভীরে ঢোকা। ধানি ভেবেছিল, বাবা ফিরে এসেছে, দরজা খুলে দেখে বাবা না, দেবীদা।

ধানি প্রায় চাপা আর্তনাদ করে উঠেছিল, দিদি, দেবীদা!

ছানির পৃষ্ট শরীর দুর্ভাবনা দুশ্চিন্তায় কিছুটা রোগা হয়ে গেছে। তবু স্তন বেশ পুষ্টই আছে। এবং দেখামাত্র লোভ এবং সংক্রামক ব্যাধির মতো শরীর অবশ হতে থাকলে দেবী ঠাকুর শিয়রে বসে পড়ল।

ধানি বলল, বাবা তোমায় খুঁজতে গেছে। মাস হয়ে গেল ফিরে আসছে না। বলে ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেলল।

ছানি পাশ ফিরে শুয়ে আছে। ঘরে লণ্ঠন জ্বালা। কথা বলছে না।

ধানি বলল, এই দেবীদা দিদি না কেমন হয়ে গেছে।

কারো সঙ্গে রা করে না।

দেবীর চারপাশে সতর্ক নজর। এদিক ওদিক তাকিয়ে বলল, তোরা যা। আমি দেখছি কথা কয় কি না।

ধানি মানি ঘর থেকে বের হয়ে গেল। বেশি রাতে পাশের বাড়ির পিসি এসে শোয়। আজ বারণ করে দিতে হয়। দাদা এসেছে। তোমার শুতে হবে না পিসি।

ঘর থেকে দু-বোন বের হয়ে গেলেই ছানি বলেছিল, তুমি আসবে জানতাম।

সেই জানাজানি দুজনে রাতে ফের এক প্রস্থ ভালো করে হয়ে গেল। শরীরে গরম ধরলে আর সব অচল পয়সা। গরম মরে গেলে ছানি বাপের জন্য সে রাতে চোখের জল ফেলল। বাবা আর ফিরবে না আমার এমন বলে ভ্যাক করে ধানির মতো কিছুক্ষণ কেঁদেও নিল। দেবী ঠাকুর বুঝল প্রবোধ দিল। রাত থাকতে বের হয়ে পড়তে হবে। কাকপক্ষী টের যেন না পায়।

পরদিন সকালে দুই বোন উঠে দেখল, ঘর ফাঁকা। দরজায় শেকল তোলা।

বাপ গেল, দিদিও গেল।

শকুন উড়ছে।

শকুনের চোখ বড়ো তীক্ষ্ণ। সে শুধু উপরে উড়ে—গন্ধ শুঁকে বেড়ায়।

দুই বোন গলা জড়াজড়ি করে কাঁদল। প্রতিবেশীরা বলল, তোর দাদাকে খবর দে।

দাদা আর আসবে না।

তা না আসতেই পারে। ছোঁড়ারই বা কী দোষ। বোনের এত বড়ো কলঙ্ক মাথায় বয়ে বেড়াচ্ছে। বাপ নিখোঁজ। বোনটাও।

কোথায় গেল।

দু-বোন বলল, জানি না।

তবে জানে না বললে মিছে কথা বলা হবে।

নলহাটির ডাকবাংলোয় দেবী ঠাকুর কাজ পেয়েছে। চাপরাশির কাজ। দিদিকে নিয়ে সেখানেই তবে তুলেছে। কেবল রাতে বলেছিল, আমি যে নলহাটিতে আছি বলিস না।

দেবী ঠাকুরের বাবার মুদি দোকান বাজারে। পুত্রের প্রতি কোনোদিনই আবেগ বোধ করেনি। নষ্ট মেয়েছেলে তিনটের পেছনে দু-হাতে টাকা উড়িয়েছে। দোকান ফেল মারতে বসেছিল—সময়মতো রশি টেনে ধরেছে বলে রক্ষা। সেই থেকে দেবী ঠাকুর পলাতক।

বাড়ি জমিজমা চাষ আবাদ হাঁস কবুতর দুই বোন সামলায়। দুটো পেট। ধানি শাড়ি পরে। মানি ফ্রক। গাছপালার মতো শরীরে ডালপালা মেলছে। মুখে লাবণ্য, শাড়ি পরলে সুন্দরী ধানি, আলতা পরে মেলায় যায়। মানি ঘর ঝাঁট দেয়—দুধ দুইয়ে দিয়ে যায় নরহরি, আবাদ দেখে সুখো মিঞা—পুরুষ মানুষ এ-কামে সে-কামে বাড়িতে আসেই। নরহরি দুধ দুইয়ে নড়তে চায় না।—এক কাপ চা হবে নি ধানি?

হবে না! বস না। কী কাজকর্ম ফেলে এয়েছ?

আর বলিস না, বসার কী সময় আছে, টেনে এক কোরোশ রাস্তা যেতে হবে।

নরহরি একা মানুষ বিধবা পিসি নিয়ে সংসার। আচার্য বামুন। কাকচরিত্র জানে। গলায় তুলসির মালা। দুধ দুয়ে ফের বসে, এক গেলাস দুধ পায়। বাকি দুধ রোজ। দু-বোনের কপালে দুধ বড়ো জোটে না।

নরহরিই বলেছিল, মাখনদা গেছে নৈঋত কোণে। বুঝলে অগস্ত্য যাত্রা। ওই যাত্রায় বের হলে ফেরা যায় না।

মানি ফ্রক গুটিয়ে বসলে মাখনের মতো সাদা উরু দেখা যায়। বসেও। এই একটা লোভ আছে—তা বয়স একটু বেশি তার। ধানি শাড়ি পরে আলতা পায়ে দিলে দেবী জগদ্ধাত্রী। সে শুধু তাকিয়ে থাকে তখন। বলে তোমার বাবা বুঝলে ধানি একজন পুণ্যবান মানুষ। তা তিনি এখন সাধু সন্নেসী হয়ে গেছেন।

তুমি দেখতে পাও। ধানি ভাবল, কাকচরিত জানে, বলতেই পারে।

চোখ বুঝলে, কে কোথায় আছে টের পাই।

আমার দিদি কী করছে।

ও একখান বারান্দা বুঝলে লম্বা। সামনে মাঠ। চারপাশে গাছপালা। ফুলের গাছ। সূর্যমুখী, গেঁদা, দোপাটি, বেলফুল। নানা গাছ। তোমার দিদির বাচ্চাটা বসে আছে। দিদি তোমার বোতলে দুধ খাওয়াচ্ছে।

কোথায় আছে বলতে পার? কোনদিকে?

এই তোমার উত্তর-পশ্চিম কোণে। কী ঠিক না?

কী ঠিক না কথায় সায় দিতে পারে না মানি। দেবীদা নলহাটির কোথায় কোন ডাকবাংলোর চাপরাশি এটুকু শুধু জানে। নলহাটি কতদূর জানে না। কোনদিকে জানে না।

কী করে যেতে হয় জানে না। খবর নেবে কাকে দিয়ে—এমনও মনে হয়। সংসারে দিদিটার কথা উঠলে নিজেরাও ছোটো হয়ে যায়। শুধু গুম মেরে থাকা। বাবার জন্য ধানি মানি আর অপেক্ষায় থাকে না। সুখো মিঞার এককথা, বড়া ভাইর মাথায় আল্লার গজব নেমে এয়েছে। পথের টানে বের হয়ে গেল।

তারা এই পথের টানটা কী জানে না। থানা পুলিশে খবর দেবার লোক নেই। শুধু কেউ পথে ঘাটে দেখা হলে এক প্রশ্ন, কী রে দিদি ফিরল? তোর বাবা।

ধানির আজকাল মনে হয়, এ-সব বলে শুধু লোক তামাসা দেখছে। নরহরিদাকে ধানি না পেরে একদিন বলল, মুখে পোকা পড়বে।

কার মুখে। কী হল?

আবার কার। আমরা নষ্ট মেয়ে বলে।

তা বলবে। গার্জিয়ান না থাকলে বলে। এত করে বললাম, পিসিরে নিয়ে এসে তুলি, আমি থাকি, সুখো মিঞা বরগা করে, চাষ আবাদ করলে দেখবি কত ফলে। আমি একাই একশো। গার্জিয়ান না থাকলে শকুন ওড়ে।

কথাটা মন্দ মনে হয়নি ধানির।

শকুন উড়ছে। টাউনে ভালোবাসা ছবি চলছে। ধানি গেছিল শোভাদির সঙ্গে। শোভাদির বর ভালো মানুষ বুঝেই গেছিল। শোভাদিকে রিকশায় তুলে দিয়ে তার সঙ্গে হেঁটে ফিরেছিল। এক রিকশায় চারজন ধরবে না, শোভাদি তার জা। দুটো রিকশা একসঙ্গে—কত টাকা, ধানির কট কট করছিল—সে বলেছিল হেঁটেই মেরে দেব। তা সাঁজ লেগে যাবে, লাগুক। শোভাদির বর বলেছিল সে না হয় আমি যাচ্ছি সঙ্গে। রিকশায় ওরা চলে গেলে বর মানুষটি বলল, টাউনে এলে, চা খাবে না?

দেরী হয়ে যাবে। মানিটা একা।

আরে আবার কবে আসব।

লোভ তারও শরীরে আছে। কেমন যেন ঝিম ধরা জীবনে, একটু নেশা, রাত হয়ে গেছিল ফিরতে। রেলগুমটি পার হয়ে পঞ্চানন তলার রাস্তায় বলল, চল কারবালা দিয়ে সোজা মেরে দি তা রাস্তা সংক্ষেপ হয়, ঝোপজঙ্গল আছে, সেই ঝোপজঙ্গলে ঢুকতেই হাত ধরে টানাটানি। গার্জিয়ান নেই বলেই এত সাহস।

মাথার উপরে শকুন উড়ছে।

ধানি বলল, সেই ভালো। পিসিকে, এনে তোল। পাশের ঘরটায় থাকলে শকুন সব ভেগে যাবে।

ভেগে গেল ঠিক—তবে নরহরি ছেড়ে দেবার পাত্র না। জমিজমার লোভে এক রাতে ধানির হাত ধরে বলল, দেখলি তো। কী ফসল তোদের ঘরে তুলে দিয়েছি। নরহরিকে ঘাঁটাতে কে সাহস করে।

ধানি জানে, লোকটার কাগচরিত্র জানা। সে কী বুঝে ফেলেছে বছরখানেক যেতে না যেতেই টান ধরে গেছে। গলায় তুলসীর মালা শুধু বদল করে ক-জন বোষ্টম বোষ্টমীকে খাওয়ালেই কাজ সারা।

ধানির গলায় তুলসীয় মালা উঠে গেল।

মানি এখন একা শোয়। কী ছিল, কী হয়ে গেল। জমিজমা নতুন সেটেলমেন্টে নরহরি নিজের নামে করিয়ে নিল। যে মালিক সে নেই, ক্যাম্প অফিসে গিয়ে এদিক ওদিক পয়সা দিয়ে অধিকটা দিদির নামে, বাকিটা তার নামে লিখিয়ে বলল, আমি কারো বাড়াভাতে নজর দিই না। কারো পয়সা ছুঁই না। মাখন কুণ্ডুর নাতি ভোগ করবে জমি। বংশ রক্ষা না হোক, কন্যের পক্ষে বংশধর জমি ভোগ করবে। মাখন কাকার কত কষ্টের উপার্জন। একটা পয়সা হাত থেকে খসত না। দিন নেই রাত নেই খেটে খেটে মানুষটা কম রেখে যায়নি। তা শকুনে খাবে, হয় নরহরির যে কাগচরিত্র জানা, মানি সেটা বুঝেছিল, দিদি একটা পুত্রসন্তান প্রসব করতেই। লোকটার তেলের কাছে মানি কাৎ। সে যেন ইচ্ছে

করলে সত্যি বলতে পারে, তার বাপ আছে না মরে গেছে বলতে পারে। কুণ্ডু মশাইর নাতি হবে নরহরি আগেই গাওনা গেয়েছে।

মানি এক সকালে উঠে মুখ গোমড়া করে বসে আছে। বাজারে যাবে নরহরি। ছেলেটা তার কাঁধ থেকে নামছে না। সকাল বেলা, বেশ রোদ উঠেছে, শীতও জাঁকিয়ে পড়েছে। আর এ-সময় মানি গোমড়া মুখে বসে আছে দেখতেই বলল, আরে আমিতো আছি শকুন উড়ে দেখুক না।

মানি বলল, একটা কথা রাখবে নরহরিদা!

এই স স্কালে তোর আবার কী কথা।

না বলছিলাম, তোমার তো কাগচরিত্র জানা, বল না, বাবা এখন কোথায় আছে?

নরহরি ট্যারচা চোখে দেখল মানিকে। ডুরে শাড়ি পরে উঠোনের কোনায় রোদে পিঠ দিয়ে বসে আছে। সে যে বড়ো রসিকজন। এমন একটা গানের কলি গলায় ভেসে উঠল। বলল, বলব। তবে বসতে হবে। হুঁট করে সব বলা যায় না। রাতে জায়গা পবিত্র করে রাখবি—বসব।

এই পবিত্র করে রাখবি কথাটাতে মানির মনে শিহরণ খেলে গেল। সে পবিত্র করেই রেখেছিল।

সকালে ধানি বলল, রাতে টের পেলে?

মানি বলল, কী জানি? জানি না।

ধানি বলল, একা ঘরে উনি কাগচরিত্র নিয়ে বসেছিলেন। ছেলেটাকে বুকের দুধ খাওয়াতে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম—আমার আর জাগা হল না। সকালে উঠে দেখি তুই নিজেই কখন উঠে ঘরদোর লেপতে শুরু করেছিস। কী বলল?

মানির এককথা, কী জানি'! তোমার সোয়ামি বোষ্টম মানুষ, তারে আমি ঠিক বুঝি না! জিগাও না কী কয় দ্যাখ।

লোকটা সকালেই গোরু বাছুর নিয়ে মাঠে বের হয়ে গেছে। ফিরলে বলল, বাবার খবর পেলে। কালতো বসলে।

বাবার খবরে আর কাজ কী? মানি আর বাবার খবর জানতে চায় না। ধানি বলল, তাহলে বাবা আমার নেই? কাল পবিত্র জায়গায় বসে কী টের পেলে বল!

বললাম মানিকে, তোর বাবা পথের টানে পড়ে গেছে। ফিরছে না।

আর কী বললে?

বললাম, তোর বাবা সবার ঠিকানায় গেছে।

এখানে এসেছিল?

ঘুরে গেছে।

গাঁয়ে এসে বাড়ি না ঢুকে চলে গেল।

নরহরি হাসল। বসে আছে বারান্দায়। আসন পেতে। কোলে মাখন কুণ্ডর নাতি। বংশধর। কন্যের পক্ষের। বলল, নাতির মুখ দেখে গেছে।

বুবলার মুখ দেখে গেল?

হাঁ, হাঁ। দেখল। রাস্তায় নিয়ে গেছিল মানি কোলে করে। লোকটা বলল নলহাটির রাস্তা চেন।

নলহাটি?

আরে হ্যাঁ। ওই রাস্তার খোঁজে গিয়ে দেখল, সবাই যে যার মতো বেঁচে আছে। সে কে? এই ভাবটা উদয় হতেই বিবাগী। সবারেই এককথা কয়।

কী কথা!

রাস্তাটা কোনদিকে। নলহাটির রাস্তার খোঁজ আর পায়নি।

তবে যে বললে, সব দেখে গেল?

এখন মাথায় অন্য পোকা। কারা এরা?

বষ্টুম মানুষের কথায় রহস্য—ধানি পাশে বসে শুনছে।

এই ধর না, বড়ো পুত্র কাঁচরাপাড়ায় বাড়ি করে বৌ নিয়ে সুখেই আছে। ছানি বছর না ঘুরতেই পেটে আর একখান। বাপের কথা কে মনে রেখেছে বল। মানি এতদিন অবুঝ ছিল। বলে হাই তুলল একটা। জমিজমা পেলে, ফনী ধরের বেটা রাজি। সেটাই শুধালাম মানিকে। মানি রাজি।

কিন্তু বাবা গেল কোথায়? কী দেখলে পবিত্র জায়গায় বসে?

কেমন গম্ভীর গলা নরহরির। চুল কোঁকড়ানো চোখ জবাফুলের মতো লাল—রাত্রি জাগরণ গেছে হতেই পারে—কালো ধুমসো চেহারার মধ্যবয়সী মানুষ। কাগচরিত্র আর ঝোলা ছিল সম্বল। মানুষ ঠকিয়ে, করকোষ্ঠি বিচার করে পয়সা—সেই পয়সা থেকে বৌ, জমি, বংশধর ওই পর্যন্ত সে বোঝে। শরীর তার এমন খেলাতেই ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল। তার জন্য জমিজমা, গাই বাছুর, হাঁস কবুতর ছানি ধানি মানি লাগে—আর রহস্য এক ঘরে উদয়, অন্যঘর ফাঁকা।—তোদের বাপের শেষে অন্য রহস্য। দেখল, সবাই ত ভালোই

আছে। সে না থাকলে সংসার অচল এই বিশ্বাসটা গেল মরে। সে বাড়তি মানুষ। নলহাটির খোঁজে যেতে যেতে পথের টানে ঘাটে-অঘাটে কুখাদ্য খেয়ে মরে পড়ে থাকল বালির চরায়। শকুনে চোখ উপড়ে খেল। শেষে থানা পুলিশ, মর্গ—এই আর কী? মানুষের জীবন। জীবনের আর একখানা কাগচরিত্র। সব গরমে হয় বুঝলি না। গরম মরে গেলে কিছু থাকে না। তখন বালির চরায় মরা লাশ।

তারপর একেবারে চুপ নরহরি। চোখ বুজে আছে। আসন পিঁড়ি। সোজা, লম্বমান দেহ, যেন ইচ্ছে করলেই শরীর থেকে জ্যোতি বের করতে পারে। বহু দূর থেকে কথা বলার মতো সতর্ক বাণী—শকুন উড়ছে।

আবার সতর্ক বাণী, বুঝলি ধানি মানি, নলহাটি যাবার রাস্তা কেউ কেউ খুঁজে পায় কেউ পায় না। খুঁজতে গেলেই আউল বাউল হয়ে যেতে হয়। মরে যেতে হয়। শকুনে তার চোখ উপড়ে খায়।

ফেরা

এক একটি খণ্ড দৃশ্যে জীবনকে উপভোগ করার জন্য এই জীবনমালা। যেমন পুষ্পবতী। বাসে হেলান দিয়ে অপেক্ষা করছে স্বামীর ফেরার আশায়। বিকেল হয়ে গেল, ফিরছে না। কেউ কোনো খবরও দিয়ে যায়নি। কেউ বলেনি তিতলিপুরের বাসে উঠে যেতে দেখলাম। যেমন সেই লোকটা, কী যেন নাম! পঞ্চায়েতের বাবু। বগলে ছাতা, সে ঘুরে ফিরে চলে আসে, চশমার আড়ালে পুষ্পবতীকে খোঁজে। নানা ধান্দার খবর দিয়ে যায়। আর বিপ্রদাস তাকে দেখলেই কেন যে খেপে যায়। লোকটাকে দেখলে পুষ্পবতীর মানুষটা আড়ালে থু থু ফেলে। গরমেন্টের লোক, দালাল, শালাকে সুযোগ মতো হাতে পাই—পোঁদে বাঁশ ঢুকিয়ে ছাড়ব। থু থু! লোকটা নেমকহারাম। পঞ্চায়েতের বাবু, প্রভাবশালী মানুষ। জ্যাংরার মোড়ে পেল্লাই বাঁশের আড়ত, সেখানে বাঁশ কেনাবেচা চলে, পেল্লাই সব ফ্ল্যাট বাড়ি উঠছে—বাঁশের ঝাড় সাফ হয়ে যাচ্ছে।

পাজামা পাঞ্জাবি গায়, কখনো তিনি ভোটের বাবুও হয়ে যান—কখনো একা হাঁটেন না, সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে হাঁটেন—বিপ্রদাস আছে। বিপ্রদাস।

কেউ সাড়া দেয় না।

পুষ্পবতী লোকটাকে কেন যে ভয় পায়। কাজের ধান্দায় মানুষটা কোন সকালে বের হয়ে গেছে, অনু বাসে উঠে স্কুলে গেছে—বাড়িটা ফাঁকা। লোকজন নিয়ে হারুবাবু তার উঠোনে, বসতে বলতে হয়, না হলে যে বাড়িঘরের মান থাকে না—পুষ্পবতী মাথায় ঘোমটা টেনে থামের আড়ালে গিয়ে দাঁড়ায়।

বিপ্রদাস কি বাড়ি নেই।

আজ্ঞে কাজে বের হয়েছেন।

ও কী স্থির করল, কিছু তো জানাল না।

জমিন আর মেয়েমানুষ নাহলি পুরুষের জীবন চলে না, এইসব অঞ্চলে বাঁশের খোঁজে এলে হারুবাবু টের পান। বিপ্রদাসের বাঁশবাগানটি তার নজরে পড়েছে। এত দারিদ্র্য তবু কেউ একটি বাঁশে হাত দিতে পারছে না।

হারুবাবু বললেন, ওকে বলবে আড়তে যেন দেখা করে। ও কীসের আশায় যে বাঁশবাগান আগলাচ্ছে বুঝি না। আরে সময় থাকতে বিক্রি করে দে। বাঘা সরকারের থাবা ঝুলছে—ও কি কিছু টের পায় না।

বারান্দায় পুষ্পবতী আসন পেতে দেয়।

হারুবাবু তার সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে আর এগোয় না। শোনো বউ মা, কিছু থাকবে না। বাঁশের দর চড়ছে, এই বেলায় বাঁশ বিক্রি না করলে বিপ্রদাসের কপালে দুঃখ আছে বলে দিও। আমরা বসব না। বিপ্রদাস কোনো নোটিশ পায়নি?

আজ্ঞে না। নোটিশ নিয়ে বহু কথা ওড়াউড়ি হয়। আজ্ঞে না বলে সে বোধহয় ঠিক কাজ করেনি।

আরে আজ্ঞে না বললেই হল। সরকারের নোটিশ ফিরিয়ে দিলেই হল! সাধ্য আছে, ফিরিয়ে দেবে, সরকারের লোক এসে ফিরে গেলে কী হয় জান না!

পুষ্পবতী থামের আড়ালেই দাঁড়িয়ে থাকে—সে আর কথা বলে না। কারণ সে তো ঠিক জানেও না, মানুষটা নোটিশ পেয়েছে না পায়নি। তবে মাসখানেক ধরে গুম মেরে আছে।

শোনে বউ মা, দুবার ফিরিয়ে দেবে, টাকা দিলে নোটিশ না ধরিয়ে দিয়েও যেতে পারে গরমেন্টের লোক। তবে কথা একখানা—রেহাই নেই। সই করে নিলে সরকারের ক্ষতিপূরণ সহজেই পেয়ে যাবে। দু-হাজার টাকা কাঠা, বাপের জন্মে শুনেছ, জমির দাম এত মাঙ্গা হয়। নোটিশ না নিলে, দেয়ালে সেঁটে দিয়ে যাবে—তখন তোমার জমিও যাবে, টাকাও যাবে।

পুষ্পবতী কী যে বলে!

নীলু কি এদিকটায় এসেছিল।

পুষ্পবতী নীলুকে ঠিক চেনে না। তবে শুনেছে, কে একজন মাঠচাষিদের উসকাচ্ছে। রোগাপটকা মানুষটার খুবই তেজ। বিপ্রদাসই খবর দিয়েছে। জমি বাঁচাও কমিটি গড়েছে নীলু দত্ত।

হারু হাজরা বলল, বিপ্রদাসকে বলো, নীলুর সঙ্গে যেন ঘোরাঘুরি না করে। সব খবরই পাই। যত সব চ্যাংরামি। আরে বুঝিস না সরকার ময়দানের ঘোড়া ছেড়ে দিয়েছে। নীলুর সাধ্য কী জমি বাঁচাও আন্দোলন করে চাষের জমি রক্ষা করে। বাধা দিতে গেলে জমিও যাবে, মানুষও যাবে।

পুষ্পবতী ভাবল, মানুষটা যে সারাদিনই প্রায় বিবাগি হয়ে থাকে, নীলু দত্তের পাল্লায় পড়ে না কাজে কামের ধান্দায়—সে কিছুই জানে না। চাপা স্বভাবের মানুষ হলে যা হয়।

সে চোখের আড়ালে দাঁড়িয়ে শুধু শুনছে।

শোনো বউ মা, বাঁশের বাগানটিও কম মূল্য ধরবে না। সরকার জমি দখল করার আগে, পোক্ত বাঁশগুলি বেচে দাও। ওকে তুমি বোঝাও। এলাকার বাঁশের সুনাম আছে বলেই না বিপ্রদাসের বাবা সুরদাস তাঁর উরাট এলাকাতে বাঁশের ঝাড় বসিয়ে দিল। নারকেল গাছ, তালগাছ, লিচু, আম যা আছে বেচে দাও। সরকারের দখলে চলে গেলে সব যাবে বলে গেলাম। কেউ রক্ষা করতে পারবে না।

সব তো যাবেই। ময়দানের ঘোড়া ছুটিয়ে দিলে মানুষ তো মানুষ। পাখি প্রজাপতিও দেশ ছাড়া হবে। এই জমি মাটি যে আত্মার সঙ্গে জড়িয়ে আছে কে বোঝে। পৈতৃক ভিটা, বাবা ঠাকুরদার জমি, কত গাছপালা, কত পাখি উড়ে আসে, সামনের সড়ক পার হলে যতদূর চোখ যায় ধানের জমি, ফুলের চাষও আছে, কেউ কেউ ফুল চাষ করে—তাদের জমি নেই, পৈতৃক ভিটা সম্বল—আর আছে ভিটা সংলগ্ন দুখানা বাঁশ ঝাড়।

পুষ্পবতী বারান্দায় থামে হেলান দিয়ে চুপচাপ বসে থাকে—কেমন একা হয়ে যাচ্ছে।

সে হঠাৎ লাফিয়ে উঠল, ভবা গেল কোথায়!

ভবা, ভবারে।

আর তখনই মনে পড়ে গেল, সকাল বেলায় ভাদুর মা এসে ভবার হাত ধরে নিয়ে গেছে।

বউ মা ছেলে যে ছাড়ছে না।

এই, কী হচ্ছে। পিসিকে দেখলেই তোর কী হয়।

ভবা খিল খিল করে হাসে। আর পিসির পেছনে দৌড়ায়।

ঠিক আছে বউ মা, তুমি যাও, আমি তাকে দিয়ে যাব। ভবার কোনো দৌরাত্ম্য নেই, বারান্দায় এক বাটি মুড়ি মোয়া দিয়ে বসিয়ে দিলেই খুঁটে খুঁটে খাবে। এত গাছপালা জঙ্গল, ভবার কি তোমার কোনো অভাব আছে।

তা ঠিক—

এই এক আশ্চর্য পৃথিবী, যে বাঁচে, যে থাকে সেই জানে কী মজা আছে এই বেঁচে থাকার।

হারু হাজরা কেমন তরাসে ফেলে দিয়ে গেল তাকে—একে চৈত্র-মাস।

জল নেই।

ঝিল্লি দেখা যায় প্রান্তরে।

খাল বিল পার হয়ে তাড়িপোতার অন্নপূর্ণার মন্দিরের ত্রিশূলটিও দেখা যায়। সকাল হলে পুষ্পবতী প্রথমেই সেই দূরবর্তী ত্রিশূলটির শরণাপন্ন হয়। ভবার বাবা, ভবারে ভালো রেখো ঠাকুর—মেয়েটা ফ্রক পরে স্কুলে গেছে, স্কুলে গেলেও চিন্তা। যা দিনকাল—মানুষ মানুষকে সুযোগ পেলেই কামড়ে দেয়। রাস্তায় মেয়েটাকে বাস থেকে কেউ যদি জোর করে নামিয়ে দেয়, হারু হাজরা চলে যাবার পরই এ-সব চিন্তা মাথায় আসে। জমিদারদের কাল কবেই গেছে—ঠাকুরদার মুখে জমিদারদের জবরদস্তির মেলা খবর সে রাখে, এখন পলিটিকসের বাবুরা জমিদার। বাড়িতে এসে না হলে হারু হাজরা হুমকি দিতে পারে—নীলু দত্ত কি তোর ব্যাটা নাক কামড়ে দিয়েছে। নীলু দত্তের সঙ্গে মিশলে কি পুতনা রাক্ষসি তারে গিলে খাবে। এত রোয়াবি, ছিলি তো যোগলের ব্যাটা—পলিটিকস করে বাবু হয়ে গেলি!

পলিটিকসের বাক্স, বিপ্রদাসের কথাবার্তায় লোকটার প্রতি অতি বিষম উক্তি শুনে শুনে পুষ্পবতীও বোঝে পলিটিকসের বাক্সে কী থাকে—বড়ো বড়ো কথা বলে জাগয়া দখলের কথা থাকে, এলাকা দখলের কথা থাকে, পলিটিকস থাকলেও মানুষ বাঁচে, পলিটিকস না থাকলেও মানুষ বাঁচে। মানুষে মানুষে বিভেদ সৃষ্টির অনিষ্টকারীদের পুষ্পবতী দু-চক্ষে দেখতে পারে না।

বিপ্রদাসের মুখেই শোনা।

বুঝলি পুষ্প, আমরা এই ধূর্ত লোকগুলোর পণ্য।

পণ্য।

পণ্য বুঝিস না, আমাদের বেচাকেনা করে বাবুরা। আমাদের লোভ দেখিয়ে ফুলটুসি বানায়। কর্তার ইচ্ছায় কর্ম হয়। ভাগের ভাগ বাবুরাই খায়। আমরা খাই উচ্ছিষ্ট।

এটা ঝোঝে পুষ্পবতী, মানুষটার মাথা গরমের কারণও বোঝে।

উচ্ছেদ। এই একটি কথাই এলাকার মানুষজনের ঘিলু গলিয়ে দিচ্ছে।

বিপ্রদাস বাড়ি থাকলে মাথায় হাত দিয়ে বসে থাকে। উত্তর দক্ষিণ পূব পশ্চিমে যতদূর চোখ যায়, যত বসত আছে সব উড়বে বাতাসে। হাওয়ায় পাতা উড়ে যাবার মতো উড়ে যাবে সব। যত এইসব বিপ্রদাস ভাবে, তত চণ্ড ক্রোধ তাকে পাগল করে দেয়।

বিপ্রদাস বাঁশঝাড়ের তলায় কখনো বসে থাকে, কখনো বাপঠাকুরদার লাগানো আম জাম গাছের দিকে তাকিয়ে বসে থাকে—কেমন এক ঘোর সৃষ্টি হয় ভিটে মাটির জন্য। শুধু নীলুদাই তাদের বল ভরসা। মানুষটা কাগজে উচ্ছেদকারীদের হয়ে খবর ছাপছে। বলে গেছে, শোনো বিপ্রদাস, এই জলাভূমি টাউন হলে সব হবে। নীলুদা মউজা দাগ নম্বর

দেখিয়ে তাকে বুঝিয়েছে, সোজা না, সড়ক যাবে লম্বা সড়ক, জল জঙ্গল থাকবে না, সরকার কেনা-বেচায় মেতেছে।

ভাদুই ঠিক বলে, কার জমি কে বেচে। আমরা দাদা বলির পাঠা। মালা গলায় পরিয়ে সাজিয়ে দেবে—কিছুই চিহ্ন থাকবে না, যাদের যূপকাষ্ঠে ফেলে ঘ্যাচাং।

এইসব ভাবলেই বিপ্রদাসের শরীর নিথর হয়ে আসে। তার কিছু ভালো লাগে না। চৈত্র মাস। চাষ আবাদের জমি পার হয়ে জলাভূমি শুকিয়ে কাঠ।

জল নেই। সেই কবে শীতে বৃষ্টিপাত, তারপর আর মেঘের দেখা নেই। আকাশ তামার বাসনের মতো চকচকে হয়ে আছে। দিন যায়, মাস যায় আকাশ আর ঘোলা হয়ে ওঠে না। মাঠ খাঁ খাঁ করছে। কিছু শকুন উড়ছিল। দূরে অদূরে বাঁশের জঙ্গল—নিশিতে থেকে বিশ্রী শব্দ ওঠে। কে যেন হেঁকে যায়। তোমার সব হে বিপ্রদাস। তুমি অবেলাতেই রওনা হয়ে যাও, আশায় আশায় বসে থেকো না।

আসলে তার কী মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে।

দু-দিকের মাঠ ফেলে ছাল চামড়া ওঠানো পাকা সড়ক আটখরার দিকে চলে গেছে। সেখানে গেলেই শহর, সেখানে স্কুল সিনেমা ভি আই পি রাস্তাটা অজগরের মতো চারপাশের বৈভব যেন নিচ্ছে। সেখানে এই সড়ক ধরে বাস যায়, সাইকেল যায়। বাঁশবোঝাই হয়ে যায় গোরুর গাড়ি। মানুষজন নামে ওঠে। রাস্তার পাশে কোথাও টালির কারখানা। আবার দূরে গেলে মাছের ভেড়ি, আরও দূরে গেলে ইটের ভাঁটা। ভাঁটাগুলির পাশ দিয়ে পাকা রাস্তার মেলা ডালপালা বের হয়ে গেছে। কোনওটা হাসনাবাদ যায় কোনওটা বারাসতের দিকে—আবার বসিরহাটের রাস্তাও তার চেনা। কিংবা সাইকেলে কিছুটা গেলেই হাসনাবাদ যাবার রেলে উঠে পড়া যায়।

এইসব রাস্তায় বিপ্রদাসকে যাওয়া আসা করতেই হয়—সেই জনম ইস্তক সে রাস্তার দোকানপাট, মানুষজন, গাছপালা পার হয়ে সুমার প্রকৃতির বনজঙ্গলে, যত রকমের গরিব পুরুষের বসতি দেখে দেখে বড়ো হয়েছে। কেউ ফিরি করে, কেউ মাছ ধরে, কেউ ফুরনে প্লাম্বার মিস্ত্রি, ইটভাঁটাতেও কাজের মানুষ মেলা—যতদূর চোখ যায়, সবার মধ্যেই আছে প্রিয়জন, প্রিয় ভূমি, গেরস্থ মানুষও মেলা, ইটের কোঠাবাড়ি, টালির ঘর, ছনে ছাওয়া বাহারি ঘর, হাল গোরু গোয়ালে—কুকুর বেড়ালও চেনা যায় তারুলিয়ার ঘোষবাড়িতে গেলে—একটি মহাবিশ্ব নিয়ে যে তার বাস। উচ্ছেদ করলেই হল—যত ভাবে তার মাথা গরম।

সেই সে বছর তার লায়েক পুত্রটির মৃত্যুদৃশ্যও চোখে ভেসে ওঠে। স্মৃতির শেষ নেই—গাছপালায় তার সব স্মৃতি মাখামাখি হয়ে আছে। সে গাছ বেচে না, বাঁশ সহজে বেচে না,

পাকা বাঁশঝাড়ের পুষ্টি হবে ভেবেই বেচে—তার আটান্ন শতক জমির মধ্যে কী নেই—একটা সফেদা গাছ পর্যন্ত আছে। লিচু গাছটায় ঝেঁপে লিচু হয়, লাল হয়ে থাকে গাছের ডালপাতা। ফুলের গন্ধেই সে টের পায় কোন গাছের কোন ফুল। আমের মুকুলের গন্ধ উঠলে আধা আধা হয়ে যায় পাতা ডাল। কত কিছুর যে স্মৃতি—সে ভেবে ভেবে শেষ করতে পারে না। যেন এক জন্ম এবং জন্মান্তরের অস্তিত্ব গাছপালার মধ্যে এবং আটান্ন শতক জমিতে লেপ্টে আছে।

সে ডাকল, বউ এক গ্লাস জল দে।

মানুষটা তার এই রকমের—বের হলে বাড়ি ফিরতে চায় না।

বাড়ি থাকলে বের হতে চায় না।

তার শুধু অপেক্ষা।

এই অপেক্ষাও যে ঘরবাড়ি গাছপালায় জড়িয়ে থাকে।

পুষ্পবতী এক গ্লাস জল দিয়ে বলল, কাল খেতি ঘুরে গেছে। বলল, দাদা বাড়ি নেই।

খেতি তার বাড়ির লাউ, কুমড়ো, সিমের মাচান করলে সিম, পালং শাক, ঢেরস, ঝিঙে, যে দিনকার যা কিনে নিয়ে যায়। আমের দিনে আম, লিচুর দিনে লিচু, কাঁঠাল গাছ দুটোও কম যায় না। ইঁচর থেকে বিক্রি শুরু। পাকা কাঁঠালে শেষ। চৈত্র মাস। বৃষ্টি নেই, লাউ-এর মাচানে ফুটো লাউ ঝুলছে, খেতি তারই লোভে ঘুরছে, সে বোঝে। একেবারে কচি, আরে বাড়তে দে।

আসলে খেতি যেন তার চেয়ে বেশি টের পায়। বাড়িটায় সে সওদা করতে আসে। বিপ্রদাস বসে থাকে না। সারাদিন কোদাল মেরে জমি সরেস করে রাখে। জায়গায় জায়গায় সিম, লাউ-এর বিচি লাগিয়ে রাখে। যেদিনকার যা। খেতি জানে কোথাও কিছু না পেলেও বিপ্রদার জমিতে কিছু না কিছু ফলন থাকে। ওই তো মোচা ঝুলছে।

ওই তো লেবু গাছের, লেবুর ফলন—দিন দাদা।

তারপর দামদর হয়।

খেতি মাথার ঝাঁকা নামিয়ে বসে। তারপর ফাঁকা ঝাঁকা দেখিয়ে বলবে, আপনারা আছেন বলে আমরাও বাঁচি। দাদা আপনার গন্ধরাজ লেবুর বড়ো সুখ্যাতি।

বাড়ি এবং জমির এখানে সেখানে কত রকমের যে জীবনের উৎস। কাঁচালংকার গাছও আছে। বারোমাসই লংকার ফলন হয়। আট-দশটা গাছ কি বাড়ন্ত, ফুল ফুটছে তারপর লংকা, তারপর এই ধানি লংকার বাজারও খুব ভালো—সপ্তাহের এক দু-দিন। এই বাড়িটায় তার কিছু না কিছু সওদা হয়ে যায়।

সে বলে, তোমার ঘরে লক্ষ্মী বাঁধা। যাতে হাত দেও তাতেই সোনা ফলে। বউদি যে তোমার অন্নপূর্ণা দাদা।

এইসব সোহাগি কথায় পুষ্পবতীও গলে যায়। কিছু না কিছু খেতিকে খেতে দেয়। যখন যা হয়, কখনো মুড়ি, না হয় রুটি, আলুর ছেঁচকি। খেতে পেলে সে আরও সোহাগি হয়ে যায়। তবে সে দাদাকে ঠকায় না, ন্যায্য দাম দেয়। পুষ্পবতী আজও বারান্দার খুঁটিতে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সেই মানুষটা কোন সকালে বের হয়েছে ফেরার নাম নেই। ঘুরে আসছি বলে বের হল।

কিন্তু ফিরছে না।

সকাল গেল, দুপুর গেল ফিরে এল না।

এই এক বাতিক। বের হলে আর ফিরতে চায় না।

কোথায় যে গেল মানুষটা! বলেও গেল না। তবে এমন যে হয় না, কতবারই দেখেছে, অনেক রাত হয়ে গেছে ফিরতে। তবে কেউ না কেউ খবর দিয়ে গেছে, কাকা হাসনাবাদের রেলে উঠে গেল। খবরটা দিতে বলল। চিন্তা করবে না কাকি। রাত হবে ফিরতে।

মানুষটার বাঁধা মাইনের কোনো কাজ নেই। রাস্তার মোড়ের হাসুর চায়ের দোকানেও মাঝে মাঝে বসে থাকে। রোজগারের ধান্দায় মানুষজনের সঙ্গে মিশে থাকতে ভালোবাসে। বাড়িতে ফিরলেই মাথা গরম করে ফেলে।

তখন পুষ্পবতীর ভয় হয়।

আরে ছ্যাঁচড়া জীবন আমার। বউ তুমি বোঝ না। মানুষটার মাথা গরম হলে জীবন সম্পর্কে ধিক্কারেরও শেষ নেই। গাছের ফলন, মাচানের ফলন কিংবা চাষের ফলনে তার যে জীবন নির্বাহ হয় না।

সে জীবন নির্বাহের জন্য ঠেকও খাটে।

কখনো মাছের ভেড়িতে, কখনো বাঁশের জঙ্গলে অথবা ইটের গাড়িতে উঠে তেঘরিয়া, বাগুইআটি, জ্যাংরা যেখানে যখন সুবিধা পায়, চুন সুরকি বালি ফেলে দিয়ে আসে।

কোথায় যে গেল!

কত কাজ। অনুর স্কুল থেকে ফেরার সময় হয়ে গেল। ভবা ফড়িং-এর পেছনে ধাওয়া করছে। সে রাস্তার দিকে তাকিয়ে আছে। কাউকে দেখলেই এই মলয়।

আমায় ডাকছেন কাকি?

তোর কাকাকে দেখেছিস।

না কাকি।

কোথায় যে গেল। কিছু বলেও গেল না।

কেমন তরাসে পড়ে যাচ্ছে পুষ্পবতী। তরাস থেকে আত্মরক্ষার জন্য ছুটে গিয়ে ভবাকে কোলে নিয়ে বাড়ি থেকে নেমে গেল। ভবা কোলে থাকলে সে সাহস পায়। কেউ তার কোনও ক্ষতি করতে পারবে না, সে সহজেই দরজায় শেকল তুলে এ-বাড়ি সে-বাড়ি যেতে পারে। মানুষের সঙ্গে কথা বললেও সে জোর পায়। রাস্তায় দাঁড়িয়ে অচেনা লোকের সঙ্গে কথাও বলতে পারে। এবং এভাবে সে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে দেখতে পায়, মানুষটা ফিরছে। এই ফেরা যে জীবনে কত মাধুর্য তৈরি করে পুষ্পবতীকে না দেখলে বোঝা কঠিন।

বাগানের তাজা গোলাপ

আজকাল কোনো অনুষ্ঠানে আমার যেতে ইচ্ছে হয় না। তবু যেতে হয়। এমন সব কাছের মানুষজন আসে অনুরোধ নিয়ে, যাদের শেষ পর্যন্ত কিছুতেই 'না' বলতে পারি না। অনেক সময় উপরোধে ঢেঁকিও গিলতে হয়।

এই উপরোধের ঢেঁকি গিলতে আজ যাচ্ছি। নতুন লাইব্রেরি ভবনের উদবোধন। ফিতে কাটতে হবে। আমি এবং আমার এক লেখক-বন্ধু প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথি।

স্টেশন থেকে গাড়ি করে নিয়ে গেল। অনুষ্ঠানে মানুষজনের সমাগম বেশ ভালোই হয়েছে। যদিও এই গল্পের জন্য এগুলো বাড়তি কথা, তবে গল্পের তো শুরু থাকে—শুরুটা এ-ভাবেই করা গেল।

অনুষ্ঠান শেষে অটোগ্রাফের কিছুটা ব্যস্ততা থাকে। একজন বিশ-বাইশ বছরের মেয়ে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল। আজকাল পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম বড়ো কেউ করে না। করলেও আমার অস্বস্তি হয়। বললাম, আমি তো তোমার বাবা-কাকা হই না। প্রণাম কেন? যাকে-তাকে প্রণাম করতে নেই।

মেয়েটি একদম ঘাবড়াল না। বলল, তার চেয়েও বেশি।

খুবই দমে গেলাম কথাটাতে।

মেয়েটি দুটো তাজা গোলাপ আমার হাতে দিয়ে বলল, আমার বাগানের।

তুমি বাগান করো?

ওই আর কী! আপনাকে দেবো বলে এনেছি।

তারপরই মেয়েটি ভিড়ের মধ্যে কোথায় যে হারিয়ে গেল!

কে যে কখন নিজের পৃথিবী আবিষ্কার করে ফেলে, বুঝি না। অনুষ্ঠানের মঞ্চেই রজনীগন্ধার মালা কিংবা ফুলের স্তবক ফেলে রেখে আসি। অথবা যে বালিকা মালা পরায়, তাকে পরিয়ে দিই। কিশোর হলে, তাও পারি না। কোথায় যে সংস্কারে বাধে। অবশ্য এ-সবও গল্পের জন্য লিখছি না গল্পটি এখনো শুরুই হয়নি।

আমার এই হয়। গল্প শুরু করতে সময় লাগে, গল্প শেষ করতে সময় লাগে না।

অনুষ্ঠানের মাতব্বর ব্যক্তিরা এই প্রাচীন লাইব্রেরির বার্ষিক অনুষ্ঠানে যে-সব রথী মহারথীদের নিয়ে এসেছিলেন গত একশো বছর ধরে, তাঁদেরও বিস্তারিত বর্ণনা দিলেন। আমার মতো চুনোপুঁটিকেও কিছু বলতে হল। লাইব্রেরিতে শরৎচন্দ্রও এসেছিলেন—তিনি আসতেই পারেন। জায়গাটা থেকে শরৎচন্দ্রের বাড়ি বেশি দূরও না। একটা জংশন স্টেশন থেকে মাইল দেড়েক হেঁটে গেলেই তাঁর বাড়ি।

এমন সব কথার মধ্যেই আমাকে নতুন ভবনের ছাদে নিয়ে যাওয়া হল। ছাদটি অতি বিশাল, সামনে বর্ষার গঙ্গা কলকল ছলছল।

নদী থেকে ভারি মনোরম ঠাণ্ডা বাতাস উঠে আসছে। সামনে নিরন্তন আকাশের নীচে দাঁড়িয়ে মেয়েটির মুখ কেন যেন মনে পড়ে গেল। সে তার বাগানের দুটো তাজা গোলাপ দিয়ে গেছে। অবহেলায় গোলাপ দুটো অনুষ্ঠানের মঞ্চে যদি পড়ে থাকে, তবে তাকে খাটোই করা হবে। সে জানবেও না—গোলাপ দুটো ফেলে এসেছি। ভাবলাম, গোলাপ দুটো যত্নকরে নেওয়া দরকার। ব্যাগে রাখলে—গোলাপ দুটো নষ্ট হয়ে যেতে পারে ভেবে, একজনকে বললাম, ভাই, সামান্য কলাপাতায় গোলাপ দুটো একটু জড়িয়ে দেবে।

এবারে গল্পটা শুরু করা যাক।

হাওড়া স্টেশনে নেমে ট্যাক্সি পাওয়া গেল না। আচমকা ট্যাক্সি ধর্মঘট। কোথায় যেন ট্যাক্সি ডাইভারের খুনখারাবির খবর পাওয়া গেল।

আমার লেখক-বন্ধুটি থাকে দক্ষিণে। আমি থাকি উত্তরে। রাত প্রায় দশটা বাজে। আমাদের দিকের বাস-টাস কিংবা মিনি রাত দশটার পর বিরল হয়ে আসে। শেষে বিপদে না পড়ি—এই ভেবে, একটা মিনিবাস ধরার আশায় সাবওয়ের দিকে এগোতে থাকি।

বাস স্ট্যান্ডে গিয়ে দেখলাম আমাদের দিকের একটা বাসও নেই।

আর একটু এগিয়ে দেখা দরকার, মিনি যদি থাকে। ভাগ্য প্রসন্ন, পেয়েও গেলাম। উঠে দেখি, ভেতরের দিকে একটি সিট-ই খালি আছে। তবে বসা মুশকিল। একজন সাত-আট বছরের বালিকা সিটের অধিকাংশ জায়গা দখল করে রেখেছে।

কী যে বলি!

মেয়েটির পাশে একটি সুন্দর প্লাস্টিকের ব্যাগ। কোলে প্ল্যাস্টিকের একটি হরিণ-শিশু। একপাশে তার ছোট্ট খেলনার রেলগাড়িও আছে। সে তার লটবহর নিয়ে বেশ ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বসে আছে।

বললাম, আমাকে একটু জায়গা দেবে? বসব।

মেয়েটি আমাকে দেখে মুখ তুলে, তারপর জানালার দিকে তাকিয়ে বলল, না। আমি সরে বসব না।

সুন্দর প্লাস্টিকের ব্যাগটি সে জানালার দিকেই রেখেছে। আর আশ্চর্য, ব্যাগটি সুরক্ষার জন্যই হোক, অথবা অন্য কোনো কারণেও হতে পারে, সে বেশ দু-সিটের অনেকটা জায়গাই দখল করে বসে আছে। ও সরে না-বসলে, আমার বসার জায়গা হয় না।

বললাম ব্যাগটা কোলে নাও, তাহলেই জায়গা হয়ে যাবে।

ছোট্ট মেয়েটি খুবই গম্ভীর হয়ে গেল।

পেছনের সিট থেকে কেউ তখন বলছে, অ্যাই, সরে বস না। ওনাকে বসতে দে। তুই কী রে?

আমার দিকে তাকিয়ে ভদ্রলোক বললেন, সারা রাস্তায় জালাচ্ছে। কাউকে বসতে দিচ্ছে না পাশে। কিছুতেই সরে বসবে না।

অবশ্য বাসে অন্য উত্তেজনা প্রবল।

কেউ বলছে, এতদিনে সরকার একটা কাজের কাজ করেছে!

কেউ বলছে, আগেই করা উচিত ছিল। সুরক্ষা বলে কথা!

কিছুদিন ধরেই মানুষজন বড়োই উত্তেজনায় ভুগছে। এখন সুরক্ষা ছাড়া মানুষের মাথায় যেন সব কিছুই ভোঁতা হয়ে গেছে।

পেছনের সিটে বসা ভদ্রলোক মেয়েটির হয়তো কেউ হবে। বাবা হতে পারে। মামা কাকা যে-কেউ হতে পারে।

ওঁর কথায় আমি কেমন বিব্রত বোধ করলাম।

মেয়েটি আমার দিকে আর তাকাচ্ছে না। জানালায় চোখ রেখে সেতু পার হবার সময় নদীর জল দেখছে। বাসে যে সুরক্ষা নিয়ে এত উত্তেজনা চলছে—কীসের সুরক্ষা, কেন সুরক্ষা সে কিছুই বুঝছে না। তার নিজের জায়গাটির সুরক্ষা ছাড়া, সে বেশি কিছু যেন বোঝেও না।

বাধ্য হয়ে বললাম ঠিক আছে। না বসলেও চলবে। আমার দাঁড়িয়ে যেতে অসুবিধে হবে না। আপনি ওকে প্লিজ, কিছু বলবেন না।

আসলে মিনি কিংবা বাসে বসতে পাওয়া গেলে, সৌভাগ্যবান হতে হয়। এখন তো আবার সুরক্ষার আবেগে মানুষজন ভাসছে। একজন বলেই ফেলল, আপনি এখানটায় বসুন। আমি দাঁড়িয়ে যেতে পারব। কোনো অসুবিধা হবে না।

না না, আপনি বসুন। আপনি দাঁড়িয়ে যেতে পারলে আমিও পারব।

লোকটির কথায় কিছুটা যে আহত, মেয়েটি আমাকে দেখেই তা টের পেয়েছে। সে কী ভেবে জানালার দিকে সামান্য সরে বসল। তার ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা কিছু খেলনাপাতি গুছিয়ে, প্লাস্টিকের ব্যাগে তুলেও রাখল।

আমি তবু বসছি না দেখে মেয়েটি বলল বোসো না। জায়গা হয়ে যাবে।

আমি হাসলাম।

মেয়েটি এত চঞ্চল আর সুন্দর যে তাকে ভারি আদর করারও ইচ্ছে হল। শিশুরা আছে বলে পৃথিবীটা যে এত সুন্দর তাও টের পেলাম।

মেয়েটি আরও চেপে, আরও একটু সরে বলল, কী হবে না?

আমি না বসলেও স্বস্তি পাচ্ছে না যেন মেয়েটি—তবু সুন্দর প্লাস্টিকের ব্যাগটি কোলের উপর রাখবে না।

কী আছে ওই ব্যাগে? এত সতর্ক ব্যাগটি নিয়ে। ব্যাগের মধ্যে এমন কোনো কোমল বস্তু থাকতেই পারে, কোলে তুলে রাখলে হাতের চাপে তা নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

যাই থাকুক, আমার বসে পড়া ছাড়া আর উপায় নেই।

আর বসতেই মেয়েটি বলল, তোমার নাম কী গো?

এতটুকুন মেয়ে চোখ দুটো ভারি সুন্দর—আবার কখনো সব কিছু তার মনে হয় ভারি রহস্যে ভরা, সে আমার পাশে বসে আছে, পেছনে কেউ আছে তার—কত সহজে সে আমার নাম জানার আগ্রহ প্রকাশ করল।

তার দিকে তাকিয়ে হেসে দিলাম। বললাম, আমার নাম দিয়ে কী হবে?

বলোই না। জানো, বাবা আমাকে আববু বলে ডাকে। জানো, আমার না, বাবার, বাবা আছে। তাঁর বাড়িতে আমরা যাচ্ছি।

মেয়েটির কথাবার্তা এত আন্তরিক যে কেবল আদর করতে ইচ্ছে হয়। কী পাকা পাকা কথা অথচ নিষ্পাপ।

এমন জীবন তো আমরাও পার করে দিয়ে এসেছি।

বললাম, বাবার বাবা তোমার কে হয়?

বা রে, তুমি তাও জানো না! নানাজি হয়।

তাহলে দাদুর বাড়ি যাচ্ছ?

হ্যা। জানো, আমার দাদুর খুব অসুখ। বাঁচবে না। তারপর পেছনে ঘাড় ফিরিয়ে বলল, আমার বাবা। আমার মা। কোলে দ্যাখো আমার ভাই।

পেছনে চেয়ে দেখলাম—ভাইটির বয়স বছরখানেকও নয়।

ওর বাবা আমার দিকে তাকিয়ে বলল, পাশে তো বসলেন, সারা রাস্তা জ্বালিয়ে মারবে।

আমি কিছু বললাম না। ঘন্টাখানেকের রাস্তা এবং এরা জানে না, আববুর কথা আমি কত আগ্রহ নিয়ে শুনছি।

আমার ছেলেমেয়েরা বড়ো হয়ে গেছে, তারা উড়েও গেছে—আমি আর আমার স্ত্রী এখন বাড়িতে, আমরা বড়ো নিঃসঙ্গ মানুষ। কাজের লোক ছাড়া আমাদের দেখারও কেউ নেই। অফিস ছাড়া কথা বলারও লোক নেই। কাগজের অফিসে কাজ, বিকালে যাই, রাতে ফিরি। আর এ-সময়ে এমন সবুজ তাজা প্রাণের স্পর্শ, কে না পেতে চায়।

আববু এবার কী বুঝে, খুব যত্নের সঙ্গে সুন্দর প্লাস্টিকের ব্যাগটি কোলে তুলে, জানালার কাছে ঘেসে বসল। তারপর আমাকে দেখল। শেষে কী ভেবে বলল, ঠিক হয়ে বোসো না। এত জড়ভরত হয়ে বসলে হয়!

ঠিক হয়ে বসতে না বসতেই বলল, এতে কী আছে, বলো তো?

এবারে ধাঁধা শুরু।

বললাম, এতে তোমার সব খেলনা, রেলগাড়ি, পুতুল উড়োজাহাজ, প্লাস্টিকের ঘরবাড়ি সব।

কিছু বলতে পারলে না। কী মজা। তুমি খুব বোকা আছো।

আমি বোকার মতো তাকিয়ে থাকলাম।

আববু বলল, এতে আছে আমার ভাইয়ের ফিডিং বোতল। জানো তো, ভাইকে আমি দুধ খাওয়াতে পারি।

কত কাজের মেয়ে পৃথিবীতে এ-কাজটি সে ছাড়া যেন আর কেউ করতে পারে না।

আমি ততোধিক বিস্ময়ের গলায় বললাম, বলো কী! এত কাজের মেয়ে তুমি?

জানো, আমার বাবা রোজ অফিসে যায়। মা তো একা, ভাইকে নিয়ে পেরে ওঠে না।

আর কী কাজ করো।

ঘর ঝাঁড় দিতে পারি। জানো, মা আমাকে তখন বকে। ঝাঁটা হাত থেকে কেড়ে নেয়।

তাই নাকি? তোমার মার এটা ভারি অন্যায়।

মার সঙ্গে বাসনকোসন মাজতে বসলেও বকে। কেবল বলবে—যা, পড়তে বোস। আমার পড়তে ভালো লাগে না।

কাজ করতে গেলেই, মা রেগে যায়।

খুব অন্যায়।

আমাদের কাজের দিদি না খুব ফাঁকি দেয়।

তুমি বকে দিতে পারো না?

মুখে তার আশ্চর্য হাসিটুকু লেগেই আছে। কেউ বোধহয় এত গুরুত্ব দিয়ে তার সঙ্গে কথা বলে না।

আমার দিকে তাকিয়ে ফের মুখ তুলে বলল, তুমি অফিস যাও না?

হুঁ। যাই।

তোমার বাড়িতে কে আছে?

আমার কেন যে সহসা গলায় কথা আটকে গেল! কী বলি! সবাই আছে অথচ কেউ নেই।

একসময়, সে যেন কবেকার কথা—মা বাবা ভাই বোন, আত্মীয়স্বজনও কম ছিল না। একে একে আলগা হয়ে যেতে থাকল। স্ত্রী-পুত্র-কন্যা সম্বল করে ফ্ল্যাটবাড়ি। তারপর নিজের বাড়ি। তারপর সব ফাঁকা। পুত্র-কন্যারা সময়ই পায় না! বছরে, দু-বছরে বাড়ি ঘুরে যায় ঠিক, তবে কোথায় যেন সেই আন্তরিকতা আর নেই। এককালে এক বিছানায় সবাই শুয়েছে, বড়ো হয়েছে। তারপর কখন যে সব আলগা হয়ে গেছে।

কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করে বললাম, তুমি মার সঙ্গে শোও, না বাবার

সঙ্গে?

বা রে, আমরা তো এক বিছানায় শুই। একসঙ্গে না শুলে আমার ঘুমই হবে না।

তুমি কাকে বেশি ভালোবাস? মাকে, না বাবাকে?

আমি সবাইকে ভালোবাসি।

তারপর থুতনিতে আঙুল রেখে কী ভাবল, যে আমার প্রশ্নের সে সঠিক জবাব দিতে পারেনি।

জানো, আসলে আমি ভাইকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসি।

মা-বাবাকে?

সমান-সমান।

ভাই তোমাকে ভালোবাসে?

মোটটেও না। দ্যাখো না, আমার হাত কামড়ে দিয়েছে সকালে।

খুব অন্যায়। তুমি এত ভালোবাসো, ভাই জানে না?

জানবে না কেন। মা বলেছে—নতুন দাঁত উঠেছে তো, তাই কামড়াবে। ওর তো কোনো দোষ নেই। ছেলেমানুষ, বোঝে না—কামড়ালে লাগে।

মিনিবাসটা মানিকতলার মোড়ে এসে, সামান্য জ্যামে পড়ে গেছে।

চুপচাপ বসে থাকলে যা হয়, গোলাপ দুটোর কথা মনে পড়ে গেল। খুবই যত্নের সঙ্গে কলাপাতায় মুড়ে ব্যাগে রেখেছি। ফুল দুটো কেন যে কিছুটা মায়ায় জড়িয়ে আছে, তাও ঠিক বুঝছি না। মেয়েটির মুখ মনে পড়ে গেলে যা হয়—সে দিয়েছে, সে দিয়েই খুশি তার প্রিয় লেখককে। সে কিছু আর চায়ও না। দু-দণ্ডের জন্য হলেও, আমার ফুলদানিতে ফুল দুটো শোভা পেল, তার যে খুশির অন্ত থাকবে না, তাও বুঝি।

ব্যাগে ঠিকঠাক আছে কি না, চেপ্টে না যায় সেজন্য সতর্কতার শেষ নেই।

হাত দিয়ে দেখলাম—না ঠিকই আছে।

তবে এই ফুলের জন্য বাড়ির কারও কোনো যে আগ্রহ নেই, টেবিলে রেখে দিলে পড়েই থাকতে পারে, আর কাজের লোকের দায়ই বা কতটা। সুমিত্রার অফিসে কাজের চাপ, তার শরীরও বিশেষ সুস্থ না, যেন কোনোরকমে জীবনযাপন।

কেন জানি মনে হল—ফুলদানিতে নিজেই গোলাপ দুটো রেখে দেবো। যে ক-দিন তাজা থাকে। মেয়েটি আমাকে প্রণাম করায় কেন যে সহসা ক্ষেপে গেছিলাম, তাও বুঝতে পারছি না। বরং এখন মেয়েটির সেই করুণ মুখের কথাও ভেবে আমার খারাপই লাগছিল।

আমার কোনো গল্প কিংবা উপন্যাস পাঠের পর মেয়েটির হয়তো মনে হয়েছিল—যদি কোনো দিন তার সঙ্গে আমার দেখা হয়, তবে এই গোলাপ দুটি তার ইচ্ছের প্রতীক হয়ে থাকবে।

তখনই আববু বলল, তোমাকে কে বেশি ভালোবাসে?

এ ভারি কঠিন প্রশ্ন।

শিশুদের প্রশ্ন এত কঠিন হয়, জানা ছিল না। মিছে কথাও বলতে পারছি না। সবাই আমাকে ভালোবাসে বলতে পারলে, খুশি হতে পারতাম। কিন্তু মিছে কথা হয়ে যাবে। এই

মুহূতে কে আমার নিজের, তাও বুঝতে পারছি না। এমন নিষ্পাপ শিশুর সঙ্গে ছলনাও করা যাবে না।

বললাম, আমি ঠিক জানি না, এ-মুহূর্তে কে আমাকে বেশি ভালোবাসে।

আমার মুখ কেমন হতাশায় ভরে গেছে দেখে আববু বলল, জানো, আমার নানাজির ভারি কঠিন অসুখ। আমি ফুল নিয়ে যাচ্ছি। নানাজি ফুল খুব ভালোবাসে।

দাদুর জন্য ফুল নিয়ে যাচ্ছ? কোথায় থাকেন তিনি?

বা রে, হাতিয়াড়ায় পীরের দরগা আছে না, দরগার পাশে থাকেন।

তোমরা কোথায় থাকো?

তারকেশ্বরে। আমাদের কোয়ার্টারের পাশে সবুজ ধানখেত। যতদূর তাকাবে না......... কেবল ধানের খেত। কোয়ার্টারের পাশে ডোবা আছে। কত জল। কত কচুরিপানা। মা আমাকে যেতে দেয় না। ডোবার পাড়ে জঙ্গল। জানো, জঙ্গলে একটা ভূত থাকে।

ভূতের সঙ্গে কথা হয়।

হবে না! আড়ি দিয়ে রেখেছি। আবার ভাব হলে কথা বলব। ভূতটাই তো এসে বলল—দাদুর বাড়ি যাবি, ফুল নিবি না?

তারপর আববু কী ভেবে বলল, কী ফুল নিই, কোনো ফুলই নেই—যা গরম পড়েছে! তখনই কচুরিপানার ফুল মনে পড়ে গেল। লুকিয়ে জলে নেমে গেছি—কেউ জানে না, দুটো ফুল ডোবা থেকে তুলে এনেছি।

ভূত না বলে বন্ধু বলো।

আববু বলল, বন্ধুই তো। আমি কি বলেছি, বন্ধু নয়?

এ-সব কথাবার্তার মধ্যেই আববু তার ব্যাগ থেকে কচু পাতায় মোড়া ফুল দুটো বড়ো সন্তর্পণে বের করে আনল।

সে তারপর কচুর পাতা খুলে যা বের করল অবাক না হয়ে পারলাম না।

সত্যি, দুটো কচুরিপানার ফুল।

জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সে ফুল দুটো বোধহয় তুলে এনেছে। সামান্য দুটো কচুরিপানার ফুল নীল-সবুজ পাপড়ি মেলে, এক বিশাল ফোয়ারার মতো আববুর দু-আঙুলের ফাঁকে দাঁড়িয়ে আছে।

আববু বলল, কী সুন্দর না! বাবা জানে না—ব্যাগে লুকিয়ে নিয়ে যাচ্ছি।

আমি বললাম, আমারও কেউ জানে না। ব্যাগে লুকিয়ে নিয়ে যাচ্ছি।

বারে, বড়োরা আবার কিছু লুকিয়ে নিয়ে যায় নাকি?

আমি বলতে চাইলাম, যায়। বড়রাই যায়।

আববু বলল, কী লুকিয়ে নিয়ে যাচ্ছ?

তোমার মতো দুটো ফুল।

দেখি কোথায় ফুল?

ব্যাগ থেকে কলার পাতা খুলে দেখাতেই আববু লাফিয়ে উঠল।

কী সুন্দর ফুল! আমাকে একটা দেবে?

আমার ফুল দুটো কলাপাতায়, ওর দুটো কচুর পাতায়।

তুমি দুটোই নাও। দুটোই বাগানের তাজা গোলাপ।

বাড়িতে তোমাকে বকবে না? সব দিয়ে দিচ্ছ।

হাসলাম। শেষে বললাম তোমার দাদুকে দিও। দাদুকে বলবে—রাস্তার একটা লোক...... জানো, ফুল দুটো তোমাকে দিতে বলল। .... আর কী বলবে, বলো তো?

'বা রে, আর কী বলব, জানব কী করে? আমি কি তোমাদের মতো বড়ো?

বলবে—আমিও তোমার দাদুর বাড়ির দিকে হাঁটছি। আগে থেকেই তাঁকে আমার প্রিয় ফুল দুটো পৌঁছে দিলাম।

তুমি যাবে আমাদের বাড়ি?

যাবো।

কবে যাবে?

বাস থেকে নেমে যাবার সময় হাত তুলে বললাম যাবো। ঠিক একদিন চলে যাবো। যে-কোনও দিন।

আববু বাসের জানালায় হাত নাড়ল।

টা টা।

আববুর মুখে দুরন্ত হাসি। যতক্ষণ দেখা যায় বাসের জানালায় দাঁড়িয়ে আববু আমাকে দেখল। আমি হাত নাড়ছি। হাঁটছি।

বাসটা চলে যেতেই কেমন ঝুপ করে যেন সব অন্ধকার হয়ে গেল। চোখে যেন কিছু আর দেখতে পাচ্ছি না।

কে যে কখন কার প্রিয়জন হয়ে যায়, কেউ বোধহয় জানে না।

তৃতীয় ভুবন

কেন জানি কিছু আর তার ভালো লাগছে না।

জীবন একঘেয়ে হয়ে গেলে যা হয়, মাঝে মাঝে খুবই বিষণ্ণ বোধ করে সে। বয়স বাড়ছে।

মাঝে মাঝে মনে হয় কোথাও বের হয়ে পড়া দরকার।

আবার কখনো মনে হয় মাঝে মাঝে কেন, একেবারেই বের হয়ে গেলে হয়। চেনাজানা পৃথিবীর বাইরে, হয়ত সেখানে নদী থাকবে, পাহাড়ও থাকতে পারে আবার যদি দীর্ঘতম কোনো রেলের গুমটিঘরে অদুলার মতো গুমটিম্যানের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়, যতদূর চোখ যায় তখন শুধু হিজলের বনভূমি, নীল আকাশ এবং কোনো বালির চরা এবং অদুলা ফিরছে বনভূমি থেকে, হাতে ঝুলছে একটা বুনো হাঁস, কাঁধে শুকনো কাঠ এবং পেছনের শালের জঙ্গল থেকে সে তুলে এনেছে কচুপাতা কুমড়োপাতা, রাতে আগুন জ্বেলে পাখির মাংস পোস্তবাটা দিয়ে কুমড়োপাতার বড়া অথবা কুমড়োফুলের বড়া, গরম ভাত সামনে রেখে ঠিক বলবে, এতকাল কোথায় ছিলেন গ বাবু।

অদুলার কাছে চলে যেতে মন চায় মাঝে মাঝে তার।

আসলে তখন যৌবনের শুরু, হাইস্কুলে চাকরি, স্ত্রী রমার সঙ্গে সেই স্কুলেই আলাপ এবং পরে রেজিস্ট্রি। পরে বিবাহ। অদুলার গুমটিঘর পার হয়ে রমাকে গাঁয়ে ফিরতে হত। অদুলার কাছেই রমা চিঠি রাখত। ভালোবাসার চিঠি।

বিকেলে রেলের ধার ধরে সে বেড়াতে যেত—আসলে অজুহাত, সে জানে রমা অদুলার কাছে একটি চিঠি রেখে যাবে, শত হলেও স্কুলের দিদিমণি রমা—কত কথা বলার ইচ্ছে হয়, কিন্তু দিদিমণি যে—খুবই গম্ভীর, অথচ কত হালকা কথা এবং ফুল ফোটার মতো সুন্দর কথা রমা তাকে জানাতে চায়। স্কুলের করিডরে কিংবা তার অফিসে যখন সে একা বসে থাকত, দেখলেই বুঝতে পারত রমার চোখমুখ ভারি চঞ্চল কথা বলার জন্য—সে চোখের ইশারায় মানা করত। ছাত্রছাত্রীরা কিছু ভাবতে পারে। শিক্ষক-শিক্ষিকারা রমার দুর্বলতা টের পেয়ে যেতে পারে। সে তো স্কুলের প্রধান শিক্ষক, তার যে প্রগলভতা শোভা পায় না—রমাকে সে বলেছিল, অফিসে একা থাকলে এস না, গ্রাম জায়গা, কুৎসা রটে

যেতে পারে। বরং অদুলাকে বলে যেও, সে আমার খুব বিশ্বাসী জন, এবং আরও বলত, দেখি কলকাতার দিকে কোনো কাজ নিয়ে চলে যেতে পারি কি না—না হলে যে আমরা ভালোবাসার দৃষ্টান্ত হয়ে যাব।

সেই থেকে রমা অদুলার কাছেই চিঠি রেখে যেত। এবং নানাভাবে পরামর্শ, সে কাগজের বিজ্ঞাপন দেখছে, তবে ঠিক কলকাতার কাছে হচ্ছে না, তা না হোক, যে-ভাবেই হোক জায়গাটা ছাড়তে হবে। স্কুলের মাস্টার-মাস্টারনীর প্রেমের বিয়ে গাঁয়ের মানুষ সহ্য করবে কেন?

আজকাল দোতলার বারান্দায় একা বসে থাকলে তার যে কত স্মৃতি ভেসে আসে।

সেই ঝুপড়ি ঘরবাড়ির কথাও মনে হয়।

মা বাবা ভাই বোন কেউ বাদ যায় না।

অবশ্য তখন বাড়িতে দুবেলা অন্ন জোটানোই কঠিন, ওরা এতগুলি ভাইবোন, বাবার শিষ্যবাড়িতে কুলাত না, যজন যাজনে কুলাত না।

এবং বাড়ি ফিরলেই, মা-র এককথা, আর অভাব যায় না বাবা, তোরা যে কবে বড়ো হবি। তোর বাবা আমাকে পাগল না করে ছাড়বে না, দুদিনের বলে নবদ্বীপে অন্নদা মুন্সির বাড়ি গেল সূর্য পূজার দিনক্ষণ ঠিক করতে, আজ সাতদিন, না চিঠি, না কোনো খবর। বাড়ি থেকে বের হলে আমাদের কথা আর তার মনে থাকে না। আমরা বেঁচে আছি কি মরেছি, তাও তার মাথায় থাকে না। তারা ভাইবোনেরা তখন বড়ো সড়কে গিয়ে অপেক্ষা করত বাবা যদি ফেরে।

তাদের খুবই তখন দুরবস্থা। দু-তিন বিঘার মতো জায়গায়, জঙ্গলের মধ্যে, বাবা বাছারি ঘর তুলে, ঠাকুর ঘরের বাছারি তুলে সবে এ দেশে বসবাসের বন্দোবস্ত করছেন, তখন কথায় কথায় সবাইকে ফেলে একটা না একটা কাজের অজুহাত দেখিয়ে বাবার এই ভেগে পড়া যে-কোনো মায়ের পক্ষেই ক্ষেপে যাওয়ার কথা। আসলে তাঁর বাবা বোধহয় পরিবারের অন্নকষ্টের আতঙ্কেই ভেগে যেতেন। কিছু না জোটানো পর্যন্ত দেশান্তরী হয়ে থাকতেন।

কী খাব, বাবার মাথায় নেই।

যাওয়ার আগে বাবা—রমণীকে বলে গেছি, কিছু লাগলে তাকে বলিস। এইটুকু খবর শুধু দিয়ে যেত।

রমণী বাজারের বড়ো মুদি।

কে যাবে রমণীর কাছে।

মা বলত, যা একবার। ঘরেও একমুষ্টি চাল নেই।

আমি পারব না। তার ছিল এক কথা। গেলেই রমণীকাকা দশ কথা শোনায়।

সে অর্থাৎ মানবেন্দ্র মা-র কথা শুনতে রাজি না। রমণীকাকাকে সে ভালোই চেনে। গেলেই বলবে, এই কর্তাঠাকুর তো কিছু বলে যায়নি।

বাবার ধারণা, রমণীর এত বড়ো মুদিখানা, দেশের যজমান, এদেশেও এসে যজমান, কর্তাঠাকুরের চালচুলো ঠিক রাখা রমণীর নৈতিক দায়।

দোতলার বারান্দায় বসে এখন শুধু অতীতের কিছু দৃশ্য, সেই কবেকার কথা সব, যেন এই সেদিন রমার সঙ্গে প্রেম, যেন এই সেদিন। কলকাতায় রওনা হওয়া, দুজনের ফের একই স্কুলে চাকরি এবং রমার স্কুল সকালে, তার দুপুরে, একখণ্ড জমিরও খোঁজ করা হচ্ছে—বাড়িতে টাকা পাঠিয়ে সঞ্চয় ভালোই হচ্ছে, একে জীবনযুদ্ধই বলা যায়, পুত্ররা একে একে জন্মাচ্ছে এবং এভাবে তারা বড়োও হয়ে যাচ্ছে।

কীভাবে যে সব হয়ে গেল। একটা বিদ্যুৎ রেখার মতো সব ভেসে ওঠে।

কীভাবে যে কেউ কেউ চলেও গেল।

এই সেদিন যেন বাবার মৃত্যুর খবর এসেছিল। অথচ সেই মৃত্যুর খবরটিও তো প্রায় চব্বিশ বছর আগে। মা তো সত্যি সেদিন গেলেন।

দোতলার বারান্দায় বসে থাকলে তার এমনই মনে হয়।

এত বড়ো একটা দীর্ঘজীবন এত সংক্ষিপ্ত হয়ে গেছে কীভাবে সে বুঝতেও পারে না।

রমার ঘর খালি।

ডবল খাট বের করে দেওয়া হয়েছে।

তাঁর সম্বল রমার ঘর, রমার দুটো লকার, কিছু মোটা অ্যালবাম—তাতে রমার জীবনের উচ্চাশা এবং তার উচ্চাশার ছবি, ছবির পর ছবি, দীর্ঘ জীবনযাত্রার এই সব ছবি, এক সকাল লেগে যায় ছবিগুলি দেখতে। বাইশ বছরের জীবন থেকে বাষট্টি বছরের জীবন—এই সব ছবি রমার গ্রথিত হয়ে আছে—কখনো পাহাড়ের ছবি, কখনো নদীর পাড়ের ছবি আবার রমা সমুদ্রে সাঁতার কাটছে, সে পাড়ে দাঁড়িয়ে আছে, তারপর দেখা যায় জ্যোৎস্নায় কোনো কুয়াশার ভেতর থেকে উঠে আসছে—রমা হাত ধরে ফিরছে এক শিশুর, তাকে বেলুন কিনে দিয়েছে, তারও পরে বই, আবার এক শিশুর মুখ, কাজের মেয়ে নয়না সংসার সামলাচ্ছে, সকালে তার বাজার, খুবই সকালে ওঠার অভ্যাস, কারণ কঠিন জীবনযুদ্ধ, প্রতিষ্ঠা, শুধু তার নয়। তার পুত্রদেরও। বাজার ফেলে দিয়েই তার নিজের ঘর,

অর্থনীতির সরল সহজ গদ্য এবং বই, বাজার ধরে গেছে, বসে থাকলে চলে! স্কুল সিজনে হু হু করে বই বিক্রি।

রমার ঘর বছরখানেক হল খালি। এই ঘরটার মধ্যে হাজারবার শুধু সহবাসের স্মৃতির কথা মুভি ক্যামেরা থাকলে ধরে রাখা যেত—এই সব স্মৃতি প্রিয়, কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে তার রংও ফিকে হয়ে গেল। শুয়ে থাকলে মনে হয় রাতে রমা পা টিপে টিপে হাঁটছে। সে যে অনিদ্রায় ভুগছে—রমা মরে গিয়েও যেন টের পায়। রমা তার শাখাপ্রশাখা রেখে গেছে —শাখাপ্রশাখার জের তাকে রোজ সামলাতে হচ্ছে।

বারান্দায় চা রেখে গেল আলো। নতুন কাজের মেয়ে—কবে কে রাখল, সে জানে না। তবে তার জামাকাপড় কাচা থেকে বিছানা করা, মশারি টাঙিয়ে দেওয়া, জল রাখা এবং লোডশেডিং যদি হয়, একটি তালপাতার পাখাও শিয়রে রেখে দেয় আলো। খুবই মার্জিতরুচির। বউমারাই তার জন্য আলাদা একটি কাজের মেয়ে রেখে দিয়েছে। কারণ সকাল আটটা থেকেই বাড়িটা খালি হতে থাকে—কারও হাসপাতাল কারও কোর্ট, অফিস, কারও কলেজ। সকাল হতে না হতেই তাদের উঠতে হয়, তাদের আলোদা আয়া আছে, তাদের আবার সবারই মাত্র এক হয় পুত্র নয় কন্যা—তাদের জন্য স্কুল বাস আছে—স্কুলের টিফিন, বাস ফিরলে তাদের নিয়ে আসা—আর বাড়িটাও, রমার সময় একতলা। তিন পুত্র হওয়ার পর দোতলা, বড়ো পুত্রের বিয়ে দিয়ে তিনতলা, রমার তারপর রিটায়ার।

সে বোঝে কাল কত বদলে গেছে।

তারা ছিল আট ভাইবোন।

বাবার রোজগার নেই, সে তো ক্লাস টেনে ওঠার পরই টিউশনি শুরু করে দেয়। এবং সব ভাইবোনকে স্কুল, কলেজ, যে যতটুকু পড়তে পেরেছে, চেষ্টা করেছে। তবে সবার তো একরকমের স্বপ্ন থাকে না, যে যার মত স্বপ্ন নিয়ে বাঁচে।

রমার স্বপ্ন, অন্তত রমার কাছে সার্থক।

কারণ রমার তিন পুত্রই কৃতী।

রমার তিন বউমাও কৃতী। কলেজ, কোর্ট, প্রশাসন এবং হাসপাতাল, নানা কাজে সবাই ব্যস্ত। কারও সময় নেই। কাজের লোকই বাড়িটার ভরসা।

এতসব হওয়ার পরও কেন যে মনে হয় তাঁর কেউ নেই। রমা চলে যাওয়ায় এতটা সে নিঃসঙ্গ হয়ে যাবে, ভাবতেই পারেনি।

সে তার সঞ্চিত অর্থ সবার মধ্যে ভাগ করে দিতে চেয়েছিল। কেউ নিতে রাজি না। তারা নিজেরাই যে নানারকমের আয়করের ঝামেলায় নাজেহাল।

বড়ো পুত্রের এককথা, থাকুক না। এত ব্যস্ত হওয়ার কী আছে?

নেই বলছিস!

না।

অঃ ঠিক আছে। তিনি তবু বড়ো বউমাকে ডেকে বলেছিলেন, লকারের চাবিটা তোমার কাছে রেখে দাও।

কী হবে।

সত্যি তো কী হবে। ওরা তো টিনের চালের বারান্দায় বসে কখনো কাঠালবীচি ভাজা খায়নি।

কাঁঠালবীচি ভাজা।

কতকাল পর কত দীর্ঘকাল পর, কাঁঠালবীচি নামক একটি বস্তুর চেহারা তার চোখের সামনে ভেসে উঠল। নানারকমের আকার। কাঁঠালের কোয়া থেকে বের করা এই সব বীচি বাছারি ঘরের কোণায় জমা থাকত। সে এবং আট ভাইবোন সকালবেলায় কাঁঠালের কোয়া আর মুড়ি, ভুরিভোজনই বলা চলে। তারা সব পিঠেপিঠি ভাইবোন। ক্লাস টেনে সে পড়ে, টিউশনি করে, মেধাবী বলে ছাত্র-বেতন দিতে হয় না—আর মা তার সেই আট ভাইবোনকে কত সহজেই না সামলাত। পিঠেপিঠে দুই বোন, তারা ফ্রক গায়ে দেয়— মা-র দোসর।

এই করুণা, দ্যাখ তোর বাবা কোথায় গেল।

করুণার জবাব, বাবা গোয়ালে।

তুই বসে থাকলি লাবি। কাঁঠালবীচিগুলি নিয়ে পুকুরঘাট থেকে ধুয়ে আন। কত বেলা হয়ে গেল। রোদে শুকোতে দে। আকাশের যা অবস্থা। সরা তো সকাল থেকে মুখ গোমড়া করে রেখেছে।

বাড়িটায় কাঁঠাল গাছ, আম গাছ মেলা। বাবার দেশ থেকে আনা শেষ কপর্দক ফুলপাকুড়ের বাগান এবং একটি ডোবা ক্রয় করতে গিয়েই শেষ।

সব ঠিক হয়ে যাবে।

পুত্ররা লায়েক হয়ে গেল বলে।

সারাদিন গজর গজর—মাথার ওপর তো একজন আছেন। তাঁর আশায় এ দেশে চলে এসেছি। কেবল নাই নাই। এত নাই নাই করলে ঈশ্বর আরোপিত হয় জানো?

আর ঈশ্বর। মারও গলা চড়ে যেত। বলে দিলাম বৃষ্টি বাদলার দিন, কাঠকুটো কিছুই নেই। আমি কি হাত পুড়িয়ে তোমাদের পিন্ডি সেদ্ধ করব।

হবে, সব হবে। এই নিত্য, যা তো বাবা, কাঠকলে যা, আমার কথা বলবি। বলবি বাবা পাঠাল।

তার মনে আছে, বাবার কথা কেউ মান্য করত না। একজন গরিব বামুনের পুত্র কাঠকলে গিয়ে বাবার দোহাই দিলেই কাঠ দিয়ে দেবে কখনো হয়!

নিত্যর এক কথা, আমি পারব না, তুমি সঙ্গে চল।

যাই কখন, আমায় যে অশ্বমেধের ঘোড়া ছুটছে—সকাল সকাল না গেলে সবাই ঠাকুরমশাইয়ের আশায় বসে থাকবে। যা বাবা নেত্য।

নেত্য ঘাড় কাত করছে না। নেত্য না করলে সে আছে।

তুই যাবি, একবার, তোর মা-র দুখানা হাত—আমাদের যে কিছু সম্বল তোর মা-র হাত দুখানি। তিনি খেতে দিলে খেতে পাস। তিনি আহারের বন্দোবস্ত করেন, তিনি ঘুঁটে দেন। তিনি ধান সেদ্দ করে রোদে শুকিয়ে বস্তায় ভরে দিলে চালকলে নিয়ে যেতে পারিস, সেই অমূল্য হাত দুখানি পুড়িয়ে তোদের পাতে ভাত দিলে ভালো হবে!

মাকে যে খোঁচা দিয়ে কথা বলছে—মা সহ্য করবে কেন।

ভালো হবে না। আমার পেছনে লাগবে না। সংসারটার কী অবস্থা। তুমি তো ঠাকুরকর্তা, যজমান বাড়ি গেলেই ফলাহারের ব্যবস্থা। আমাকে খোঁটা দিয়ে কথা বলতে তোমার বিবেকে বাধে না।

আর তারা অর্থাৎ সে এবং অন্য ভাইবোনেরা বুঝত, লেগে গেল। তখন বারান্দায় বসে থাকাও ঠিক হত না। শুকনো কাঠকুটোর খোঁজ করতেই হয়। সে বের হয়ে যেত একটা লম্বা কোটা নিয়ে গাছের মরা ডাল টেনে নামাত। জমানো খড়কুটো বাইরের উঠোনে ছড়িয়ে দিত নেত্য, তারপর সে ছুটত কাঠকলে। হারানদাদা বাবা পাঠিয়েছে।

দ্যাখেন ওদিকটায় গাছের ছালবাকল পড়ে আছে—নিয়ে যান। ঠাকুরকর্তাকে বলবেন, শনি- সত্যনারায়ণের পূজা আছে। আপনেরা সবাই প্রসাদ নিতে আসবেন।

নেত্য মাথায় শুধু কাঠকুটোই নিয়ে আসত না, সঙ্গে শনি-সত্যনারায়ণের পুজার খবরও নিয়ে আসত।

তখনই বাবার কথা মনে হয়।

প্রায় যেন ধরণী বিজয় করার মতো বলতেন, বুঝলে মনোজের মা, রাখে কৃষ্ণ মারে কে। তোমার আর হাত পুড়িয়ে খাওয়ার বন্দোবস্ত করতে হবে না।

মা তখন তার যেন খুবই কাতর হয়ে পড়ত, গরিব বামুনটির জন্য।

তার দিকে তাকিয়ে বলত, মনোজ তোর বাবাকে বল, তিনি যেন কিছু মুখে না দিয়ে বাড়ি থেকে বের না হয়। বাড়ি থেকে বের হলে তো, আর বাড়ির কথা মনে থাকে না। কী খান, কোথায় থাকেন, চিন্তা হয় না। তোমাদের বাবামশাইটি কি তা বোঝেন!

তারা আট ভাইবোন। ছোটোটি বারান্দায় হামাগুড়ি দেয়, কান্নাকাটি করলে, হয় লাবি না হয় করুণা কোলে নিয়ে এ-গাছ সে-গাছের নীচে দাঁড়িয়ে পাখপাখালি দেখায়, মা তো বসে থাকে না, বাসনপত্র ধুয়ে আনছে লবি। কাঁঠালবীচিগুলি উঠোনে চাটাইয়ে বিছিয়ে দিয়েছে। রোজই লাবি যত্ন করে এই বীচি শুকনোর কাজটা করত। মাটির কলসিতে শুকনো বালির মধ্যে রাখা যাবে, না আরও রোদ খাওয়াতে হবে, মা অনুমতি না দিলে মাটির কলসিতে রাখা যেত না। মা হাত দিয়ে দেখত, কী বুঝত কে জানে। জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় দু-মাস ধরে কাঁঠাল খাওয়া আর বীচি সংরক্ষণ—পাঁচমেশালি তরকারি হবে, কাঁঠালবীচি, ঘরে চাল আছে, তরিতরকারি নেই, কাঁঠালবীচি সেদ্ধ—সে যে কী সুস্বাদু বীচি সেদ্ধ আর ভাত। সামান্য সর্ষের তেল। কত সামান্য উপকরণে অসামান্য খাওয়া।

সেই মনোজ আর এখন মনোজ নেই। কেউ তাকে মনোজ নামে চেনেই না। শৈশবের মনোজ কখন যে স্কুলে, কলেজে, বিশ্ববিদ্যালয়ে মানবেন্দ্র হয়ে গেল। কী করে যে এতবড়ো বাড়ি এবং এত খ্যাতি হয়ে গেল বুঝতে পারে না। সংগ্রাম, নিষ্ঠা, অথচ জীবন বড়ো ভারবাহী জন্তু, অথবা এমনও মনে হয়, রমারই কাজ। সেই তাকে সংগ্রামে লিপ্ত করেছে, নিষ্ঠায় কাতর হতে বলেছে, আবার কখনো জীবন বড়ো ভারবাহী জন্তু এমনও মনে করিয়ে দিয়েছে।

আসলে সব কিছুর পেছনে থাকে শুধু একজন নারী।

সে তার কৈশোরকাল থেকেই কোনো নারীর ছলনায় এতদূর এসে বুঝেছে, সব ফাঁকা।

তখন মেজো পুত্র বোধহয় কোর্টে বের হবে—কানে তার কথা উঠেছে, দেখগে তোমার পিতাঠাকুরের পাগলামি শুরু হয়েছে। তাঁর নাকি কিছু ভালো লাগছে না। তাঁকে আজ হোক কাল হোক কোথাও চলে যেতে হবে।

মেজো পুত্র সুরেন জানে মায়ের মৃত্যুর পর বাবার মতি স্থির নেই।

বছর পার হয়ে গেল।

বৎসরান্ত এই সেদিন বেশ জাঁকজমক করেই পালন করা হল। পুত্রেরা পিতামাতার প্রতি কোনোই ত্রুটি রাখার পক্ষপাতী নয়।

একজন বিখ্যাত রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী গান করলেন।

ছাদে বড়ো পুত্র মন্ত্র পাঠ করছে।

অতিথি-অভ্যাগতরা, এমনকী আত্মীয়স্বজনরা সবাই এসেছে। তার কুশল নিয়েছে।

পুত্ররা ছোটো হয়ে যায় ভেবে মানবেন্দ্র বলেছেন—না ভালোই আছি। সময় হলে যেতেই হয়। তোমরা কেমন আছ বল।

এই যে বাবা, কুশল।

অঃ কুশল, তোমার বাবার নাম কী বল তো!

ছোটোদির ছেলে। জববলপুরে আছে। রেলের ডাক্তার। ভুলে গেছ।

ও হ্যাঁ। মনে থাকে না। কেমন সব গুলিয়ে যায়।

মানবেন্দ্র তখনই ভাবেন, এটাকে কি বাহাত্তুরে বলে। এই যে সব গুলিয়ে যাওয়া কুশলকে এমন প্রশ্ন কেন, সবই কি মগজের কোশের কোনো ভ্রম থেকে হয়—শুধু কুশল কেন, অনেক বন্ধুবান্ধবের মুখও ভুলে গেছেন—নাম মনে পড়ে না। তখনই যে কেন মনে হয়, কী আর হবে, কোথাও চলে গেলেই হয়। নিজেকে পরিবারের পক্ষে বোঝাও মনে হয় কখনো।

তার ফুটফরমাশ খাটার মেয়েটাই একমাত্র যখন-তখন তাঁর কাছে আসতে পারে।

সে এসেই পাশের টি-পয়ে একটা রেকাবি রাখল। চিনামাটির সুন্দর প্লেটে দুটো সন্দেশ, একটি কলা এবং একটি হাফবয়েল ডিম। বড়োবাবুর কখন কী মর্জি হবে সে জানে না। তাই রাতেরবেলা মশারি গুঁজে দেওয়ার সময়, সকালে তাঁর জলখাবার কী হবে জেনে নিতে হয়।

জেনে না নিলে কী হয়!

আরে ডিম দিলি কেন, নিয়ে যা। আরে টোস্ট দিলি কেন, নিয়ে যা। দুধ-মুড়ি-আম

খাব।

বাড়িতে শোরগোল তখন, রান্নার মেয়েটার গলার ঝাঁঝ আছে। যতই ঝাঁঝ থাকুক, বড়োবাবুর বেলায় ট্যা-ফুঁ করতে সাহস হয় না।

তার চিৎকার, একতলা থেকে দোতলা, কিংবা তিনতলার ঘরে আস্তে কথা বললে, কারও সাড়াই পাওয়া যায় না। বড়োবাবু দুধ-আম মুড়ি খাবে বলেছে।

সকালের চায়ের দুধটুকু আছে। খাটাল থেকে দুধ আসতে আসতে নটা বেজে যায়। আম-মুড়ি-দুধ। মুড়ি আছে কি না, বাড়িতে মুড়ি কেউ খায় না। দুধ-মুড়ি-আমও কেউ খায় না। সবাই সাহেবি ব্রেকফাস্ট করে—বউমারাও। নাতি-নাতনিরা আতপ চালের সুগন্ধ ভাত,

ঘি ডিমসেদ্ধ। হালকা মাছের ঝোল। ছুটির দিনেও একই খাবার। বড়োবাবু তাদের খাবার দেখলে এককথা—আরে আমের সিজন চলছে। সকালে দুধ-মুড়ি-আম কেন খাস না বুঝি না। গাদা গাদা মাখন পাউরুটি—টোস্ট আর ডিম আর কলা, কখনো আঙুর, নাসপাতি, এগুলো যে বাঙালির খাবার নয়, তিনি তাদের বোঝাতেই পারেন না। নাতি-নাতনিরা তাকে সমীহ করে না। বুড়ো মানুষটা যা খুশি বলুকগে—তারা কিছুটা খায়, কিছুটা ফেলে। মানবেন্দ্র এ সব দেখে মনে মনে খুবই কষ্ট পান। কাজেই আজ সকালে কি তাঁর ব্রেকফাস্ট হবে রাতে কোনো আভাসই দেননি, মাঝে মাঝে তিনি যে চান সংসারে খাওয়া নিয়ে একটা সংকট তৈরি হোক।

বোঝ এবার।

অ মেজো বউদি।

বউদি বাথরুমে। যাওয়ার সময় মেজোপুত্র তাকে কলেজে নামিয়ে দিয়ে যাবে। ছোটো পুত্রবধূর চেম্বার। সকালেই বের হয়ে গেছে। ফিরতে ফিরতে একটা।

আর মেজো বউদি। সাড়া দেবে কী করে। বাথরুমে জলের শব্দ। রান্নার মেয়েটা সিঁড়ি ভেঙে দোতলায় উঠেই টের পেল, বাথরুমে জল পড়ছে। দরজা বন্ধ।

সে যে কী করে।

অ মেজো বউদি।

বল।

আরে বড়োবাবু যে বলছে, দুধ-মুড়ি-আম খাবে।

তা দে, দিলেই হয়।

আম পাব কোথায়। মুড়ি পাব কোথায়। ঘরে কি কিছু আছে। খাটাল থেকে এখনও দুধ আসেনি।

দাঁড়া আমি যাচ্ছি।

মেজো বউদিদিরই সংসারের প্রতি কিছুটা নজর আছে। বাঁধাধরা রান্না, এই যেমন আলুভাজা, না হয় আলুপোস্ত। মুগের না হয়, মুসুরির ডাল—মাছ এবং চাটনি—সরকারি রান্না—পুত্ররা পতে কিছু দিলেই হল, তারা কোনোরকমে কিছু মুখে দিয়ে বের হয়ে পড়ে। দেখার কারও সময় নেই—আগে রমা দেখত, তারপর সংসারে গার্জিয়ান হিসেবে মাস দু-এক দেখতে গিয়ে টের পেল সে বড়ো কঠিন ঠাঁই। দু-মাসেই মাথাটা খারাপ।

বড়ো পুত্রকে ডেকে পাঠাল।

শোন।

তোমাদের রান্নাঘরটা তোমরাই সামলাও।

কেন কী হল!

কী আবার হবে। কে কী খাবে, সেইমতো বাজার করা যায়, এতকাল করেও গেছি—এখন তো দেখছি—ভালমন্দ রান্নার ব্যবস্থা করেও লাভ নেই। এত অপচয় তোমাদের। বাইরে খেয়ে এলে আগে জানাবে না। এই যে তোমরা যখন-তখন বলে দাও, রান্নার মেয়েটাকে আয়া দিয়ে খবর পাঠিয়ে দাও, রাতে খাবে না, খেয়ে এসেছ, আগে বলে যেতে দোষ কী। তোমাদের খাবারগুলো নষ্ট হলে কী হয়?

বড়ো পুত্র মাথা চুলকে বলল, ওরাই বা কী করবে—যা রান্নার ছিরি, বাইরে না খেয়ে কোথায় খাবে।

রান্নাই যদি না করতে পারে, ছাড়িয়ে দাও। এত অপচয় তো ভালো না। তা ছাড়া সবার জিভের স্বাদ বুঝে রান্না সম্ভব! ঝাল বেশি। নুন কম। তেলে ভাসছে। ফোড়ন ঠিক নেই। মুসুরির ডাল—পেঁয়াজ ফোড়ন পছন্দ না, কালোজিরে ফোড়ন পছন্দ না, এই যে কারও পছন্দ, কারও পছন্দ না, এত সব পছন্দ আমারও পছন্দ না। তারপর তিনি হুকুম জারি করে দিয়েছিলেন, বউদের বল কী রান্না হবে, তারা যেন বলে দেয়। তোমাদের মা নেই, তোমাদের এই পছন্দ-অপছন্দের ঠেলা সহ্য করতে না পেরেই বোধহয় তিনি দ্রুত পালালেন—তোমাদের ঘরে ঘরে ফ্রিজ, সেখানেও নানাবিধ খাবারের প্রক্রিয়া থাকে—এত সব ব্যবস্থা যখন আছে, তখন আর আমার দরকার কী! তোমরা যা হয় ব্যবস্থা করো।

বড়োপুত্র বলেছিল, ঠিক আছে আপনি আর সংসারে মাথা গলাতে যাবেন না। সব ঠিক চলে যাবে। কিছু আটকাবে না।

না, সত্যি কিছু আটকাল না। বরং তার ওপর নতুন নতুন নিয়ম জারি হতে শুরু করল।

কাল এত রাত হল আপনার ফিরতে?

ছোটোপুত্রের উলটো চাপ।

কামিনীর সঙ্গে দেখা। সে-ই নিয়ে গেল।

কোথায়?

ভবানীপুরে।

ফিরলেন কী করে?

ওর ড্রাইভার পৌঁছে দিল।

কাউকে বলে যাবেন না! কামিনী কাকা একটা ফোন করে দিতে পারত।

সে বলতে পারত, কাকে ফোন করবে। কেউ কি আমার অপেক্ষায় বসে থাকে!

সোজা মিছে কথা, ফোন করার কথা মনেই হয়নি তার।

চিন্তা হয় না?

বড়োপুত্র তার বসার ঘরে ঢুকে একদিন বলেছিল, রাস্তায় একা হবেন না। আপনি নাকি বাসে উঠে আপনার কোনো এক পিসিমার কাছে চলে গেছিলেন!

কী হয়েছে!

একদম ট্রামে-বাসে উঠবেন না।

কেন!

মাথা ঘুরে পড়েটড়ে গেলে কে দেখবে!

আমার মাথা ঘুরবে!

বয়স হয়েছে, বোঝেন না। আর যখনই কেউ বলে মানবেন্দ্রবাবুকে দেখলাম, মিনিবাসে কোথায় যাচ্ছেন, তখন খারাপ লাগে না! গ্যারেজে খবর দিতে পারতেন। হরনাথকে বললেই গাড়ি বের করে দিত।

সেই বড়োবাবু সকালে আজ দুধ-মুড়ি-আম খাব বলেছে। আমের সিজন চলে যাচ্ছে— দুধ-মুড়ি-আমে মাখামাখাই সুস্বাদু খাবার এখন তাকে না দিলে, সকালে কিছুই খাবে না জানিয়েছে। আলো কিচেনে ঢুকে বলল, কথা কথা। নট নড়নচড়ন।

এখন খোঁজ মুড়ি কোথায়? কোন দোকানে বিক্রি হয়।

এ-বাড়ি থেকে মুড়ির চল সেই কোন অতীত থেকে উঠে গেছে। মেজোবৌদি বলল, চন্দ্রনাথকে ডাক।

চন্দ্রনাথ মেজবৌদির নিজস্ব ড্রাইভার।

শোন চন্দ্রনাথ, এখানে কোন দোকানে মুড়ি পাওয়া যায় জান?

আমার বাড়ির পাশে কোথায় পাওয়া যায় জানি, এখানে কোথায় পাওয়া যায় জানি না।

যাও গাড়ি বের করে তোমার বাড়ির পাশ থেকেই নিয়ে এস।

সে তো অনেক সময় লেগে যাবে!

আমি জানি না। টাকা নাও। যেখান থেকে পার নিয়ে আসবে।

রান্নার মেয়েটা তখন বলল, কেন বউদি এত দূরে যাবার কী দরকার! বাজারে গেলেই পাবে। কাউকে জিজ্ঞেস করলেই বলে দেবে মুড়ি কোন দোকানে পাওয়া যায়।

সেই তো।

চন্দ্রনাথ গেট দিয়ে বের হওয়ার মুখে একটা লোক বলল, স্যারের সঙ্গে দেখা করব। তিনি আছেন?

যাবেন কোথায়। যান ভিতরে। বসার ঘরে আছেন।

আলো তখন দোতলার বারান্দায় খবর দিল, একজন আপনার সঙ্গে দেখা করতে চায়।

বল গিয়ে দেখা হবে না! কী চায় জানি। আর ইস্কুল-কলেজ পাঠ্যবই তিনি যে লিখবেন না স্থিরই করে ফেলেছেন। বাজারে ধরে গেলে বছরের পর বছর রয়েলটির টাকা। আর কপালও তার, যাতে হাত দেয় তাই সোনা। এই বইই তার কাল। বিনা পরিশ্রমে টাকা আসতে থাকলে, বাড়িতে মুড়ি থাকে না। চাউমিন থাকে। আম থাকে না, আমূল থাকে।

তোর হাতে কীসের পেকেট পাপাই। আয় তো কাছে। দেখি দেখি।

নাতিটি গদগদ হয়ে বলল, আমূল।

আমূল দিয়ে কী হবে। রান্নাঘরে রেখে আয়।

দাদুর নিবুর্দ্ধিতায় সে খিল খিল করে হাসছে। দাদু ঠিক ভেবেছে, এটা হল মাখন। সে বলল, এই দ্যাখ না। মাখন না, ক্যাডবেরি।

মানবেন্দ্র প্যাকেটটা উলটেপালটে দেখল, কত দামরে?

দশ টাকা।

দ-শ টাকা। সকালে দশটা টাকা পেটে তোর ফাউ হয়ে ঢুকে যাবে। টাকাপয়সার দাম এত কমে গেল কবে।

ঘরে ঘরে ফ্রিজ বাবুদের। ঘরে ঘরে ফ্রিজে কোকোকোলার বোতল। জ্যাম জেলি, কাম্পাকোলা, অরেঞ্জ স্কোয়াস—এখন আর বাড়ি করে কিংবা রাস্তায় তেষ্টা পেলে বউমারা-নাতিরা জল খায় না। ডাবের জল সুস্বাদু এরা জানেই না। আরে এরা বোঝোই না, এই যে, সব দুরারোগ্য ব্যাধি নিত্যনতুন, কর্কট রোগের কথাই ধরা যাক, ঘরে ঘরে এই সব রোগ ছড়িয়ে পড়ছে। এখন তো আর ক্ষয় রোগের প্রকোপ নেই, সর্দিকাশির মতো অসুখটা মাসতিনেক ট্যাবলেট খেলেই আরোগ্যলাভ। নতুন সব প্রোডাক্টে বাজার ছেয়ে যাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে নতুন নতুন রোগের প্রোডাক্টও বাজারে ছড়াচ্ছে—এখন তো আর ওলাওঠা কিংবা গুটিবসন্তে কেউ মরে না। কাজেই বাজারে রোগের নতুন নতুন প্রোডাক্ট না ছড়ালে, মানুষ যে মরণশীল সেটাই ভুলে যাবে না জননীরা।

টিভির সামনে বসাই যায় না।

একদিন বড়োপুত্রকে ডেকে না বলে পারল না।

এত ঠাণ্ডা খাস না। কী কেমিকেল দেয়, রাস্তাঘাটে তাকানো যায় না, ফ্যাশান যেন, কী খাচ্ছে কেউ জানেই না। আফিমের জল যে মেশায় না কে বলবে! এত না হলে নেশা হয়! বাড়িতে পর্যন্ত কোলার উৎপাত। শুধু জল বেচে পয়সা। কী যে হল দেশটা।

বড়োপুত্র বোঝে, তার পিতাঠাকুর চিন্তা-ভাবনায় খুবই সেকেলে। কিছু করারও নেই। মায়ের মৃত্যুর পর আরও জেদি হয়ে উঠছে। এখন পেটি পেটি কোলার বোতল ঠিকই আসে, চন্দ্রনাথ গ্যারেজেই রেখে দেয়—তার দিবানিদ্রার ফাঁকে, ওপরে নীচে, ঘরে ঘরে যার যার ফ্রিজে সে সব সুযোগ বুঝে পাচার হয়ে যায়।

চন্দ্রনাথ আম-মুড়ি নিয়ে ফিরে এল—মেজ বউমার বের হতে দেরি হয়ে গেল। দিন যত যাচ্ছে—তত যেন তার শ্বশুরমশাই জেদি হয়ে উঠছে। কেবল তাদের পছন্দের বিরুদ্ধে প্রত্যাঘাতের অপেক্ষায় তিনি বসে থাকেন।

রাতে ডিনারে পুত্রদের সঙ্গে সে আহার করে। এই একটা সময়, যখন সবাইকে একসঙ্গে পাওয়া যায়। বউমারাও কিচেনে যাবে। তখন রান্নার মেয়ে অথবা আয়ারা যার যার ঘরে আয়েস করে। এই সময়টায় পুত্রদের সঙ্গে গল্পগুজব হয়, তাদের পিতাঠাকুরের মুখে তখন শুধু পুরনো দিনের কথা—তার মা, জেঠিমারা—

ছোটো বউমা বলল, বাবা এক পিস চিকেন পাপরিকা খান। আমি নিজে করেছি। খেয়ে দেখুন, না রিচ না। খান না।

তার এক কথা, না। তোমরা খাও। আমার জিরেবাটা দিয়ে মৌরলা মাছের ঝোলের কাছে কিছু লাগে না।

রাতের বেলাতেই নানা রেসিপি, যার যেদিন ইচ্ছে—বাবা, মাখন ভাতের সঙ্গে ভেটকি নিউবার্গ—খান, খেয়ে দেখুন।

না।

আশ্চর্য সুন্দর সুঘ্রাণ এবং চিনেমাটির প্লেটে সাজানো খাবার—কী দারুণ। খেয়ে দেখুন—বড়ো পুত্রবধূর অনুরোধ, উপরোধ।

না বউমা, তোমরা খাও। বড়োপুত্র প্রায় ক্ষেপেই গেল।

স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বলল, কেন যে দাও। দ্যাখছ পছন্দ করে না।

বড়ো বউমাটি নাছোড়বান্দা—খাওয়াবেই।

বাবা।

বল।

একটু মুখে দিয়ে দেখুন।

দেখছি।

মুখে দিয়ে বলল, বিস্বাদ। আমি জানি না, কেন তোমরা খাও।

তারপর কিছুটা খেল। এবং প্লেট সরিয়ে দিয়ে বলল, আজ কি ভাত, ডাল, মাছ হয়নি?

হয়েছে। না হলে কাজের লোকেরা খাবে কী?

ওই দাও। এত সুন্দর করে সাজিয়ে যা দিয়েছ লোভ লাগে খেতে, তবে সহ্যও হবে না। পেট ভরে খাওয়া যাবে না।

সে জানে প্রায়ই রাতের ডিনারে এদের এক-একটা রেসিপি, সাধারণত রবিরারেই হয়ে থাকে। আত্মীয়স্বজনও আসে। তবে প্রায় বলতে গেলে সবাই বউমাদের বাপের বাড়ির। তার আত্মীয়স্বজন অপদার্থ, অর্থাৎ গরিব। একবার তো রাতে পূর্ণ, পূর্ণ মানে তার কনিষ্ঠ ভ্রাতা রাতের রেসিপি খেয়ে কেমন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল।

মানবেন্দ্র কনিষ্ঠ ভ্রাতার খাওয়া দেখেই বুঝেছিল, তার পেট ভরেনি। কারণ তার খেতেই ইচ্ছে হয়নি। জোরজার করে যতটুকু খাওয়া।

কনিষ্ঠ ভ্রাতাটি সেই থেকে রবিবার দিনটিতে কখনো আর আসত না। রেসিপির ঠ্যালা সামলাতে সে রাজি না। আরে ভাত ডাল মাছের কাছে কি কিছু লাগে!

এইভাবে কখনো—চিকেন আলা, চিকেন সামুসিয়া এমনই কত রকম সব বিদঘুটে নাম —

বাবা এটা খান। একটু মুখে দিন, ভেটকির মধ্যে চিংড়ির পুর দিয়ে ক্রিম সসে অসাধারণ রান্না।

মানবেন্দ্র ভাবত, রান্না না, অর্থের গাবরাবাজি, অর্থের চূড়ান্ত অপব্যবহার।

খেতে বসলেই মেজাজ তার নানা কারণেই খাপ্পা হয়ে যায়। ইদানীং মাছ মাংস খাওয়ার তেমন আর আগ্রহ নেই। পেঁয়াজ রসুনের রান্নাও সহ্য করতে পারে না। বাজারের চালানি রুই কাতলা, না হয় ইলিশ, এ দুটো মাছই বেশি হয়। খাওয়ার পাতে বড়ো মাছের টুকরো, খেতে তুলোর মতো, কবেকার মাছ কে জানে, মাছের মাছত্ব বলতে আর কিছু থাকে না। ড্রাইভার চন্দ্রনাথ সকালের বাজার করে। বড়োপুত্রের বের হতে দশটা-সাড়ে দশটা হয় বলে, চন্দ্রনাথ সকালটায় প্রায় ফ্রি থাকে।

খেতে বসলেই এক কথা, তখন অবশ্য রান্নায় মেয়েটাই কিচেনের মালিক। দুপুরে সে বলতে গেলে একাই খায়—কেউ তো তখন বাড়ি থাকে না—এই যে চন্দ্রাবতী—

আজ্ঞে।

বাজারে ট্যাংরা পুঁটি কি পাওয়া যায় না?

বাবু আমি কী বলব। বাড়িতে ছোটো মাছ কেউ খেতে চায় না।

পাবদা মাছ পাওয়া যায় না।

চন্দ্রাবতী কী বলবে? চুপ করে থাকে। রাতে একদিন প্রায় হুকুমই জারি করে দিল সে।

বড়োপুত্রকে বলল, তোমরা যা খুশি খাও। আমার জন্য জ্যান্ত মাছ চাই। সকালে মক্কেলদের একটু কম আস্কারা দিয়ে বাজারের জন্য একটু সময় বের করে নাও। তোমরা কী হলে। আটটা না বাজলে তোমাদের ঘুম ভাঙে না।

শুতে শুতে অনেক রাত হয়ে যায় বাবা।

আমি ওসব বুঝি না, তোমরা ভেটকি, চিংড়ি, পচা রুই, পচা ইলিশ যত খুশি খাও। আমি খাব না। আমার জন্য পুঁটি, মৌরলা, তাজা ট্যাংরা, তাজা পাবদার ব্যবস্থা করবে, না পারলে মাছ স্পর্শই করব না। মাংস হলে রেজালা খাসি, কেন দেশি পাঁঠার মাংস পাওয়া যায় না। তোমাদের তাড়নায় মাছ মাংস দুই ছেড়ে দিতে হবে দেখছি।

বড়োপুত্রটি বাবার মরজি বোঝে। যত দিন যাচ্ছে তত অতীতের স্মৃতি তাকে তাড়না করছে। কেমন অবোধ শিশুর মতো অদ্ভুত সব বায়না। যত দিন যাচ্ছে তত মা বাবা ভাই বোন, জেঠি কাকিদের গল্প—তখন কতরকমের রান্না হত—

তিলের বড়া খেয়েছ।

না।

না খাওয়ারই কথা। তাদের জননী এ দেশের মেয়ে, সে পোস্ত ছাড়া কিছু বুঝত না।

তিলের অম্বল, কচি পাটপাতার বড়া, পাটপাতার শাক, মানকচু সেদ্ধ সর্ষেবাটা দিয়ে, কত সব উপাদেয় খাদ্য—আর কাঁঠালবীচি সেদ্ধ গরম ভাত, না তুলনা নেই। রাতে সেই মোকাম্বা চিংড়ি, কে যেন বলল, ভেটকি মাছের ভেতরে চিংড়ি মাছের পুর দিয়ে নতুন রেসিপি—রেসিপির খেতাপুড়ি। সকাল বেলায় উঠেই হুকুম জারি করে দিলেন—তোমরা, বউমারা, নাতিরা যা খায় খাবে। আমি খাব না।

মেজপুত্র একটু বেশি আদরের, সে চিৎকার করে বলল, কারণ মানবেন্দ্র তার বসার ঘরে মেজপুত্রকে ডেকে বলেছিল, তোমাদের ছাঁইপাঁশ আর গেলা যাচ্ছে না। আমার জন্য

কাঁঠালবীচি সেদ্ধ দিতে বলবে।

মেজপুত্রটি তর তর করে সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠে গিয়ে খবরটা চাউর করে দিল।

কাঁঠালবীচি সেদ্ধ!

সে আবার কী? সবারই কেমন কৌতূহল জানার।

নীচে গিয়ে জেনে এস। তাঁর হুকুম। তিনি কাঁঠালবীচি সেদ্ধ খাবেন।

বড়ো বউমাকেই মানবেন্দ্র কিছুটা সমীহ করে। হাওয়া গরম। কেউ বাবার ঘরে যেতে রাজি না হওয়ায় সে-ই গেল।

বাবা।

সে প্রুফের লম্বা বাণ্ডিল খুলছিল। গাটার খুলছিল—তারপর উলটোভাবে আবার মুড়ে নিচ্ছিল—কেউ তার ঘরে যে ঢুকেছে, বুঝতে অসুবিধা হয়নি—কিন্তু পাত্তা দিতে রাজি না। চিংড়ি মোকাম্বার জের চলছে—বুঝতে অসুবিধে হল না বড়ো বউমাটির।

বাবা।

বল।

কাঁঠালবীচি যে নেই।

নেই মানে।

শীতকাল না।

তাতে কী হল।

কাঁঠালবীচি পাব কোথায় তাই তো জানি না। আর সেদ্ধ কাঁঠালবীচি দিয়ে শুধু ভাত খাওয়া যায়!

সেদ্ধ কাঁঠালবীচি, সঙ্গে একগণ্ডুষ খাঁটি সরশের তেল—এটাও একটা রেসিপি—খেয়েছ কখনো, দারুণ খেতে, মুখ বদলাবার জন্য মোকাম্বা চিংড়ি পর্যন্ত যাওয়ার দরকার হয় না।

ঠিক আছে, জোগাড় করি। দেখি কোথায় পাওয়া যায়। আপনাকে কথা দিলাম—আপনার রেসিপিও হবে।

ওই হবে। স্তোক দেওয়া কথা।

মানবেন্দ্র একদিন ডেকে বড়ো বউমাকে বললেন, কী হল। সব পাওয়া যায়, কাঁঠালবীচি পাওয়া যায় না।

চেষ্টা হচ্ছে।

চেষ্টা হচ্ছে মানে!

নিউমার্কেটে পর্যন্ত গেছে আপনার বড়ো ছেলে। কাঁঠালবীচি নামটাই খুঁজে পেল না। যাও বলল, এখন তো বাবু কাঁঠালের সময় নয়। কাঁঠালবীচি পাবেন কোথায়!

কিচ্ছু জান না। কাঁঠালবীচি শুকিয়ে মাটির কলসিতে শুকনো বালির মধ্যে রেখে দিলে কখনো নষ্ট হয় না।

এক নাতি ক্লাস টেনে পড়ে। সে উঁকি দিলে বলল, বীচির হিমঘর।

হিমঘর না, প্রিজারভেশন।

মানবেন্দ্র বলল, আমাদের বাজারে পাওয়া গেল না।

বলল, পাওয়া যাবে। কাঁঠালের দিন আসুক, পাওয়া যাবে।

ততদিন বেঁচে থাকব তো।

আপনি বাবা এমন অলুক্ষণে কথা বলেন। সত্তর বাহাত্তর বয়েস একটা বয়েস।

আমার এখন সেভেনটি ফাইভ চলছে।

ওই হল।

একবার জগুবাবুর বাজারে খোঁজ করবে ত?

আপনার ছেলেকে বলব।

কেন তোমরাও তো বের হও। ছেলেটা সারাদিন একদণ্ড সময় পায় না। হিল্লি-দিল্লি ঘুরে বেড়াতে পার, জগুবাবুর বাজার চেন না। ওখানে মানিকতলার বাজারে ঠিক পাওয়া যাবে। রিফুজিদের বাজার নাই যে পাবে না, এ-দেশের লোক তো চিংড়ি পুঁই ছাড়া কিছু বোঝে না।

শেষদিকে একটু বেশি বাড়াবাড়ি শুরু করায় বড়োবউমা, দেশের বাড়িতে ফোন করে পূর্ণকাকাকে খবর পাঠাল। পূর্ণকাকার বাড়িতে যে নেই। বাবার কনিষ্ঠ ভ্রাতা পূর্ণকাকা গরিব মানুষ, তার শ্বশুর অভাব-অনটনে টাকা পাঠান—সম্প্রতি কাকার মেয়ের বিয়ের পণ যে সব খরচাই সামলেছেন।

মানবেন্দ্রর ছেলেরা তাকে একা ছাড়ে না—কোথাও প্রায় যেতেও দেয় না। তীর্থক্ষেত্রে নিয়ে যাওয়া যায় না, শুধু দেশের বাড়ি, দেশের বাড়ি কিছু গরিব পরিবার, ভাইয়েরা যে কেউ কেউ খুবই গরিব, থাকা কোথায়, পাখা নেই, পরিত্যক্ত কম্বলের মতো একটা বসতি, জঙ্গলের পড়ে আছে—শ্বশুরমশাইটির কাছে, এমন সুন্দর জায়গা, ভূ-ভারতে কেন, সারা

পৃথিবীতেও খুঁজে পাওয়া যায় না। আজকাল মাঝে মাঝে বলছেন, তাঁর কিছু ভালো লাগছে না, দেশের বাড়িতে যাওয়ারও বায়না।

শ্বশুরমশাইয়ের দেশের এক ভগ্নীপতির বাড়িতে ফোন আছে। এস টি ডি করে তার সঙ্গেই কথা বলেছে বড়োবউমা—পূর্ণকাকাকে খবরটা দেবেন তাঁর বড়দা, কাঁঠালবীচির জন্য প্রায় বলতে গেলে নাওয়া-খাওয়া ছেড়ে দিয়েছেন। সংসারে খুবই অশান্তি চলছে। খুবই আর্জেন্ট, পূর্ণকাকা যদি কারও বাড়ি থেকে কিছু কাঁঠালবীচি নিয়ে আসতে পারেন। যে করে হোক। না হলে হুমকি দিয়েছেন, একাই চলে যাবেন দেশের বাড়িতে। তাঁর ধারণা, গেলে পূর্ণ ঠিক ব্যবস্থা করবে।

ভগ্নীপতিদেরও যে অনেক অনুযোগ।

এত করে বললাম, দাদা দেশে একটা বাড়ি করুন। কিছুতেই তেনার মা রাজি না। অর্থাৎ তার দিদিশাশুড়ির এককথা, না বাবা, তোর বাবার স্মৃতি, মাটির ঘর কি ফ্যালনা। সারাজীবন তিনি এই ঘরটাতেই কাটিয়ে দিয়েছেন, লাইট নেই পাখা নেই, আমরা তো মরে যাইনি।

মা বেঁচে থাকতে মানবেন্দ্র বছরে একবার অন্তত যেত। মা কিছুতেই কলকাতার বাড়িতে আসতে রাজি না। তাঁর বড়োছেলের পরিবারটি ম্লেচ্ছ হয়ে গেছে। আচার-বিচারের কোনো বালাই নেই। তিনি গিয়ে সেখানে থাকেন কী করে!

মনিঅর্ডারে টাকা যেত, না হয় পূর্ণকাকাই মাসে একবার এসে, কাজের জন্য এবং দিদিশাশুড়ির জন্য টাকা নিয়ে যেত। শ্বশুরমশাই এলে, সেই মাটির ঘরেই আলো পাখা বিনা সাম্রাজ্যে বসবাস করে একেবারে তাজা হয়ে ফিরত। বাবার বানানো বড়ো একটা চকিতে শুত—ছোট্ট চকিতে মা।

আর মায়ের মৃত্যুর পর ছোটো চকিটি পূর্ণকাকা নিজের ঘরে তুলে নিয়ে গেছে। বড়ো তক্তপোশটিই ছিল মানবেন্দ্রর একমাত্র শোওয়ার জায়গা। জঙ্গলে না হয় মাঠে হাগা-মোতার কাজ সারত। পূর্ণকাকিমা রান্না করে দুবেলা বারান্দায় খেতে দিত। টালির লম্বা বারান্দায় একটা হাতল ভাঙা চেয়ারে বসে গাঁয়ের লোকজনদের সঙ্গে গল্প করত। কী দিন ছিল, কী দেশ ছিল, আর শেষে কী হয়ে গেল সব। শুধু আক্ষেপ!

পূর্ণকাকা এল ঠিক, তবে কাঁঠালবীচি সংগ্রহ করতে পারেনি। গরম পড়ে গেছে চৈত্রমাস। দাদাকে বোঝ প্রবোধ দিয়ে বলেছে—আর দুটো মাস দাদা।

আমি তোর সঙ্গে যাব। আর এক বায়না।

পূর্ণকাকা না বলে পারেননি, ও-ঘরে থাকা যাবে না দাদা। গত বছরের বন্যায় মাটির দেওয়ালে বড়ো বড়ো ফাটল ধরেছে। সাপখোপেরও উৎপাত আছে। হুড়মুড় করে কখন

ভেঙে পড়বে—ঘরটায় আপনার ভাইপোরা থাকত—এখন তারাও রাতে শুতে সাহস পাচ্ছে না।

আমার সঙ্গে কি সাপের শত্রুতা আছে। আমাকে কামড়াবে?

না, তা না।

আমরা আগে থাকিনি?

তা থেকেছি।

প্রথমবার তোর মনে নেই, রাতের বেলা, মধ্যরাতে, মনে আছে একটা বিশাল দুধ খরিস মেঝেতে ফস ফস করছিল। মনে নেই।

ওরে ববাস, কতবড়ো সাপটা।

বাবা কী বললেন পূর্ণ?

মনে নেই দাদা।

তা মনে থাকবে কেন, টাকা নিতে আসার কথা তো ভুলে যায় না।

পূর্ণ জানে, দাদার ওই মুশকিল, দেবে, আবার খোঁটাও দেবে। পূর্ণ জানে, দাদার এটা ধাত। মাসোহারা নিতে হলে সহ্য করতে হয়। দাদারও দোষ দেওয়া যায় না, তার নামে মনিঅর্ডার গেলে পাঁচ কান হবেই, তারপর বউদিটি জানতে পারলে সর্বনাশ। সে এলেই যা তা বলত। জোয়ান ব্যাটা, বিয়ে করার সময় খেয়াল ছিল না, আবার পুত্রকন্যাও হয়েছে। এক পয়সা রোজগার নেই, বিয়ে করলে কোন আক্কেলে। সারাজীবন মানুষটাকে জ্বালাচ্ছে।

দাদারও অশান্তির শেষ থাকে না।

পূর্ণই দাদাকে বুদ্ধি দিয়েছিল, আমার টাকা মনিঅর্ডারে পাঠাবেন না। মা, শুধু মা কেন, বোনেরাও বউদিকে জানিয়ে দেয়। কারও অবস্থাই যে খুব একটা পদের না। কনিষ্ঠ ভ্রাতাটিকে মাসোহারা পাঠানো হয়। আর তারা কি সব বানের জলে ভেসে এসেছে। মানবেন্দ্র যে সবারই বড়দা। সুতরাং পূর্ণ নিজেই আসে। গাছের নারকেল, লেবু, আমের দিনে আম, লিচুর দিনে লিচু, কাঁঠাল, বাড়িটা বলতে গেলে মা আর কনিষ্ঠ ভ্রাতাই ভোগ করে।

আমাদের বাড়ির পুকুরপাড়ের গন্ধরাজ লেবু বড়োবউদি। তোমাদের জন্য নিয়ে এলাম। দ্যাখ কত বড়ো হয়েছে।

রমার হয়ে গেল। পূর্ণ না থাকলে, বাড়ির ফল-পাকুড় কে খাওয়াত। সেই তো তবু সম্পর্ক রেখেছে।

মানবেন্দ্র মজা ভোগ করত। আসলে টাকার লোভে এসেছে, রমার মন জয় করা কত সহজ।

আমের দিনে আম।

লিচুর দিনে লিচু।

কখনও নারকেল।

মানবেন্দ্র বলেছিল, সে কি তটস্থ অবস্থা। মেঝে থেকে গলা বের করে ফোঁস ফোঁস করছে, মা বাবাকে ডাকছে, বাবার তো কুম্ভকর্ণের ঘুম। ঘুম ভাঙে না। ঠেলেঠুলে তোলা হল, বাবা উঠলেনও, হারিকেনের আলোতে দেখলেনও—ও সাপ, তা বেশ বড়ো।

ইঁদুরের যা উৎপাত। একটা ধানের বস্তাও আস্ত নেই। ইঁদুরে ধান খায়, সাপে ইঁদুর খায়। ধানের বস্তা আস্ত আছে তোমার। সারা মেঝেতে, খাটালের নীচে ইঁদুরের বাসা। ধানের দফা রফা করছে। সাপ না, আসলে মঙ্গলময়ী। ইঁদুরের গুষ্টির তুষ্টি করে ছাড়বে। নাও শুয়ে পড়।

বাবা পাশ ফিরে শুয়ে পড়লেন, নাক ডাকতে থাকলেন, মনে নেই তোর।

হ্যাঁ হ্যাঁ, পূর্ণ জানে দাদার কথায় সায় না দিলে টাকার অঙ্কে এক লাফে অর্ধেক হয়ে যেতে পারে।

তা হলে?

পূর্ণ বুঝতে পারল না। হাঁ করে তাকিয়ে ছিল।

সাপ কামড়াবে কেন। তার সঙ্গে কি আমার শত্রুতা আছে। আমি যাব, সাপই থাকুক, আর গতবারের বন্যায় মাটির দেওয়াল বসেই যাক। বাবার তক্তপোশে শুয়ে থাকলেও শান্তি।

পূর্ণ খুবই ঘাবড়ে গেছে। বাবার আস্ত তক্তপোশটাও যে হাফিজ হয়ে গেছে।

আসল কথা বাবার চকিটা বেশ বড়ই ছিল। তার দুই ছেলে, তারাও লায়েক, দুজনই রঙের মিস্ত্রি। রঙের কাজ করে। বোনের বিয়ে উদ্ধার হয়ে যাওয়ায় তারা আর জ্যাঠাকে সমীহ করে না। এজমালি সম্পত্তি। যে যা কেড়ে নিতে পারে—ঠাকুমার বাসনপত্র, কম তো ছিল না, কত বড়ো বড়ো সব কাঁসার থালাবাসন, জামবাটি, তামার ডেগ, প্রেস্টিজ কুকার, শ্বেতপাথরের থালা, বোকনা, কী ছিল না। সবই তাদের বড়পিসি হাতিয়েছে—গাছটাছও পূর্ণ বিক্রি করে দিচ্ছে, বড়দাকে না জানিয়ে—সবই করতে পারে, তবে মা-র ঘরের

তক্তপোশটা বের করে দু-আধখান করে, তার রঙের মিস্ত্রির যোগ্য পুত্ররা কেটে যে ফাঁক করে দিয়েছে, আসলে ঘরটায় মানবেন্দ্রের প্রিয় তক্তপোশটিই হাফিজ হয়ে গেছে। দাদার মেলা আছে, ভাইপো-ভাইঝিরাও ভাবছে, জ্যাঠা বুড়ো হয়ে গেছে, আর আসছে না, এমনকী অন্য শরিকরা, সেই ভাই আর বোনই হোক, কাউকে এখন বাড়িটায় ঢুকতেই দেওয়া হয় না। আর জরাজীর্ণ মাটির ঘরটি নিয়েও কারও মাথাব্যথা নেই। কিন্তু মানবেন্দ্রের কাছে এই ঘরবাড়ি তীর্থের সামিল। পূর্ণ ঘর মেরামতের অছিলায় দাদার কাছ থেকে দফে দফে কম টাকাও নিয়ে যায়নি—কিন্তু দাদা যাবে শুনে তার মাথা ঘুরতে শুরু হয়েছে। এবারে আসল খবরটি দিলে যে এ বাড়িতে আর ঢোকা যাবে না, তাও জানে। আসলে তিন বিঘে জমি যদি জবরদখল করে নিতে পারে, জমির দামও মেলা, বিশ-বাইশ হাজার টাকা কাঠা —সেই জমি বারো-চোদ্দতে রেজিষ্ট্রি এমনকী বন্টননামা ছাড়াই কেনার মেলা লোক আছে সে জানে। শুধু বসিয়ে দিলেই হল। দাদার সঙ্গে তার সম্পর্ক থাকল কি গেল বয়ে গেল তার। তার বউদিটি তো তাকে কম অপমান করেনি।

পূর্ণ অগত্যা বলল, এই গরমে গিয়ে কী করবেন। কষ্ট হবে আপনার।

হোক কষ্ট। তবু যাব।

কাঁঠালবীচির জন্য যাবেন, দুমাস বাদেই বৃষ্টি নামবে। কাঁঠালের সিজন শুরু হবে। বাড়ির কাঁঠালও খাওয়া হবে, তার বীচিও পাওয়া যাবে। আমি এসে নিয়ে যাব।

বড়োপুত্রটি অফিস বের হওয়ায় সময় ইশারায় পূর্ণকে ভেতরে যেতে বলল।

ভেতরে না, একেবারে বড়োপুত্রের এলাকায়। দাদা ছেলেদের জন্য প্রায় বলতে গেলে প্রাসাদ বানিয়ে রেখেছে। যে যার এলাকায় থাকে। তবে ঘরগুলি তার গুদামখানাই মনে হয়। বড়ো বড়ো সব স্টিলের আলমারি, টিভি, সেও বিশাল—এক কোনায় কম্পিউটার, কী যে কাজে লাগে, সে বোঝে না। বড়োপুত্রটি তার বসার ঘরে নিয়ে কাকাকে বসাল।

কী বলছে?

কী আবার বলবে, জানই তো বাড়ি যাবার নামে পাগল। বড়োবউমার চিঠি পেয়েই তো ছুটে এসেছি, দাদা কাঁঠালবীচি সেদ্ধ খাবে। পাওয়া যায়নি।

খবরদার নিয়ে যাবেন না। হার্টের অবস্থা বিশেষ ভালো না। বাড়ি বাড়ি করে সবার মাথা খারাপ করছে। কোথায় বাবা স্কুলের প্রধানশিক্ষক ছিলেন, সেখানেও যাবেন বলছেন। আপনি আবার উসকে দেবেন না।

না না, আমি এক পাগল! দাদার সব অভ্যাস বদলে গেছে। সুখী মানুষ, আর রাখবই বা কোথায়! আগে তবু মা-র ঘরটা ছিল, গত বছরের বন্যায় ঘরে জল ঢুকে গেছিল। ঘরটার বয়সও তো কম না। পঞ্চাশ-ষাট বছর তো হবেই। কিছু একটা হয়ে গেলে কেলেঙ্কারি।

পূর্ণ ফের বলল, কিন্তু দাদা যে বলছেন, তাঁর এখানে একদম ভালো লাগছে না। ছাঁইপাঁশ রান্না হয়, একদম মুখে দিতে পারেন না। তাঁকে কেউ গ্রাহ্য করে না। ব্রাত্য হয়ে গেছেন।

সে বলুকগে। আমিও বলেছি, বর্ষা পড়ুক, হরনাথ আপনাকে হিজলের রেল-লাইন, অদুলার গুমটিঘর সব দেখিয়ে আনবে। মা মারা যাওয়ার পর থেকেই বায়না। কিছুতেই কোনো তীর্থভ্রমণে বের হবেন না। আমার শ্বশুরমশাই এত করে বললেন, চলুন বেয়াই দক্ষিণ ভারত ঘুরে আসি, কিছুতেই রাজি করাতে পারলেন না—তাঁর নাকি কোথাও গিয়ে ভালো লাগে না। হোটেলের খাবার সব অখাদ্য—আমরা বড়োই ফাঁপরে পড়ে গেছি। বলেছি গাড়িতে যাবেন, বাড়ি হয়ে ফিরবেন। অদুলার গুমটিঘরও দেখা হবে। সঙ্গে হরনাথ থাকবে, পূর্ণকাকা থাকবে।

পূর্ণ আশ্বাস দিল, সে তোমাদের ভাবতে হবে না। বুঝিয়ে দিলে কথা বুঝবেন।

বড়োপুত্রকে বড়োই অসহায় দেখাচ্ছিল।

বাবার বয়স হয়েছে, হার্টের অবস্থা ভালো না—কিছুই মানতে রাজি না। তাঁর এককথা, আসলে আমাকে তোমরা বাড়ি থেকে বের হতে দিতে চাও, না। আমার কিছু হয়নি। সবাই তোমরা বউমাদের কথায় নাচ।

যাইহোক, শেষ পর্যন্ত পূর্ণ তার দাদাকে সাময়িকভাবে নিবৃত্ত করতে পেরে খুশি।

আমি কথা দিচ্ছি দাদা, জ্যৈষ্ঠমাসের শেষাশেষি আমি আসব আপনার সাধের কাঁঠালবীচি সেদ্ধ আপনি খেতে পাবেন। বাড়িতে গিয়ে বললে, ঝুনুর মা সব ব্যবস্থা করে রাখবে।

শোন আমি কিন্তু কুমড়ো ফুলের বড়া খাব।

খাবেন।

বেলেমাছের চালকুমড়ো পাতার বড়া খাব।

খাবেন।

বাড়িতে কত রেসিপি হয়, হয় না বেগুন দিয়ে গিমাশাক। খেতে বড়োই সুস্বাদু বল। বাড়িতে যা চলছে, পাঁচ-সাতদিন থেকে যা তবেই বুঝতে পারবি।

চপকিয়া স্যালাড, নাম শুনেছিস?

আজ্ঞে না।

বুকিয়া স্যালাড। নাম শুনেছিস?

আজ্ঞে না।

জুকিনি?

না।

ফিস মুনিয়ের, গ্রিলড ফিস, লেমন রাইস—বউমারা রবিবার রাতে রেসিপি করবে, আর ঊর্ধ্ববাহু হয়ে নাচবে। এসব নাকি একজিকিউটিভ বুফে—বল মাথা ঠিক রাখা যায়। তোর মাথা ঠিক থাকত। ভারতীয়, কন্টিনেন্টাল, চাইনিজ। রবিবার আসে, আবার রবিবার চলে যায়। রবিবারের আতঙ্কে আমার ঘুম গেছে। বিশ্বায়ন বিশ্বায়ন বাইরে চলছে, সেটা যদি ঘরে ঢুকে যায়, ইচ্ছে হয় না পালাই।

তা তো ইচ্ছে হবেই।

তোর বউদি বেঁচে থাকত, দেখতাম মজা।

আমাদেরও কম রেসিপি নেই। কাসুন্দি দিয়ে রসুন সম্বারে নটেশাক কতকাল যে খাই না। কত বলেছি, আমার ভাইরা তো দেশে থাকে—গেলে কতরকমের রেসিপি।

বড়দা আজ লাউশাক করি।

লাউশাক। দারুণ, দারুণ, ভুলেই গেছি।

লাউচিংড়ি।

আমার মা বড়ি দিয়ে যা লাউচিংড়ি করত, ওই এক পদ দিয়েই এই থালা ভাত খাওয়া যায়। কোথায় যে গেল যে সব খাবার! বাড়িতে আমার, দুই পুত্রবধূ লাউ খায় না লাউ আসে না। মাগুরমাছ খায় না নাতিরা—বাড়িতে যা চলছে না।

পূর্ণ খুব হতাশ গলায় বলল, নাতিদের দোষ দিয়ে লাভ নেই দাদা। ঠাকুরের কৃপায় সংসারের কোনো অভাব নেই, শুধু জমছে। ওড়াতে না পারলে টাকার গায়ে ছাতা ধরে যাবে না। গরিবদের বাঁচতে হবে না।

মানবেন্দ্র বড়োপুত্রকে ডেকে বলল, পূর্ণ আমাকে নিতে কবে আসবে বলে দাও।

আসবে, নিয়ে যাবে ঠিক।

আমি কিন্তু ট্রেনে যাব।

পূর্ণ বলল, কেন বাড়ির গাড়ি পাওয়া যাবে না?

দ্যাখ পূর্ণ, তুই আমার চেয়ে ভালো বুঝিস। বর্ষা থাকলে রাস্তাঘাটের কী অবস্থা হবে বুঝিস না। এই সেদিন এক ওয়গনার গ্যারেজে ঢুকেছে, নতুন গাড়ি, খানাখন্দে পড়ে গাড়ির বারোটা বাজুক আর কী।

বড়োপুত্র দরজার আড়াল থেকে ইশারায়, বাবার সব কথায় সায় দিয়ে যেতে বলল।

আসলে মানুষটি যে খুবই নিঃসঙ্গ, পুত্ররা বোঝে। এবং সেই কথামতে দিনও স্থির হয়ে গেল। পূর্ণ এলে বড়োপুত্র সাবধান করে দিল, সাবধানে নিয়ে যাবেন। মা না থাকায় আমাদের হয়েছে মুশকিল, একবগ্গা হয়ে গেল। মাথাও যেন কিছুটা বিগড়ে গেছে মনে হয়।

সব ঠিক হয়ে যাবে। কাঁঠালবীচি সেদ্ধ আর ক-ফোটা খাঁটি সরষের তেল দিয়ে ভাত পাতে পড়লেই সব ঠিক হয়ে যাবে। ভাবিস না।

তুলবেন কোথায়।

মেজদার বাড়িতে।

তাদের ছোটোকাকাটির পোশাক খুবই মলিন, টাকাপয়সা যে যায়, সেই টাকাপয়সায় ইচ্ছে করলেই ভালো জামাপ্যান্ট কিনে পরতে পারেন, তবে কিছুতেই পরবেন না, যদি বাবা মাসোহারা বন্ধ করে দেন—তুই তো ভালোই আছিস দেখছি। ফুটানি করতেও শিখে গেছিস—আর দাদার ঘাড়ে চেপে বসে থাকা কেন, তবেই হয়ে গেল।

দুর্গা দুর্গা করে রওনা করিয়ে দেওয়া হল।

মেজপুত্র বলল, চন্দ্রনাথ, বাবাকে ছোটোকাকাকে গাড়ির কামরায় বসিয়ে ট্রেন ছাড়লে তবে ফিরবে।

আজ্ঞে ট্রেন ছাড়তে দেরি করলে!

ও ঠিক আছে, বড়োবউদির গাড়িতে চলে যাব। তুমি ঠিক চারটায় হাসপাতালে চলে যাবে।

শিয়ালদা স্টেশনে পৌঁছেই পূর্ণ কাউন্টারে গিয়ে জানতে পারল, ফার্স্ট ক্লাস বগি আছে, তবে টিকিট ইস্যু করা হয় না।

তা মান্ধাতা আমলের লাইন, লাইনের দুপাশে যত দূরেই যাও, ঘন্টার পর ঘন্টা, শুধু রিফুজি কলোনি—রিফুজিরা কখনো টিকিট কাটে না। এ লাইনটা চেকারবাবুদের স্বর্গরাজ্য লজঝড়ে ট্রেন, লজঝড়ে যাত্রী, টিকিট না কাটলেও অসুবিধা হওয়ার কথা না।

পূর্ণ আরও জানাল, অর্ডিনারি টিকিট কেটে প্রথম শ্রেণির বগিতে বসে পড়লেই হবে। চেকারবাবুর সঙ্গে পরে রফা করে নিতে হবে।

মানবেন্দ্র বলল, তার মানে।

পূর্ণ বুঝতে পারল, কথাটা শুনে দাদা বিগড়ে গেছে।

আসুন তো দেখা যাক না কী হয়, দুটো টিকিট কাটা আছে।

চন্দ্রনাথ বলল, বাবুর খুব অসুবিধা হবে।

পূর্ণর এক ধমক, আমার দাদা না, তোমার দাদা।

চন্দ্রনাথ জানে বড়োবাবু এই সব রফাটফা একদন পছন্দ করে না। শেষ পর্যন্ত ঠিক অর্ডিনারি কামরায় উঠে বসে থাকবে। যা একরোখা মানুষ।

পূর্ণ অভয় দিল, আরে খালি কামরা দেখে উঠলেই হবে। বসার জায়গার অসুবিধা হবে না। পাঁচ-সাত ঘন্টা তো লাগবে। গাড়িটায় একদিন ভিড় হয় না। শুয়ে-বসে যাওয়ার কোনোই অসুবিধা হবে না। তুমি ভেব না চন্দ্রনাথ। বাড়িতে গিয়ে বলারও দরকার নেই।

আসলে পূর্ণ যে বাড়িতে আশ্বাস দিয়ে এসেছে পুত্রদের, তোরা চিন্তা করিস না। সাড়ে বারোটার গাড়িতে একটা ফার্স্ট ক্লাসের বগি দেয়। ওতে উঠে চলে যাব। এখন চন্দ্রনাথ যদি বাড়িতে গিয়ে বলে দেয় টিকিট পাওয়া গেল না, অর্ডিনারি ক্লাসে উঠেই চলে গেছেন, তা হলে আর এক বিপত্তি। বাবার যাতে অসুবিধা না হয়, সেই ভেবে কাকার হাতে গুচ্ছের টাকা ধরিয়ে দিয়েছে বড়োপুত্রটি।

হয়ত বাবুর পুত্ররা গাড়ি নিয়ে বের হয়ে ট্রেনের আগেই বাড়ি পৌঁছে যাবে। বাবাকে শেষ পর্যন্ত আস্ত নিয়ে নামাতে পারল কি না এমন আশঙ্কার উদ্রেক তাদের মনে হতেই পারে।

আর আশ্চর্য, ট্রেনে ওঠার মুখে দেখা গেল একদম ভিড় নেই। সাধারণ কামরাতেও শুয়ে-বসে যেন সহজেই গন্তব্যস্থলে পৌঁছানো যায়। এক ধারে সিট—জানালা তুলে দিলে হাওয়া-বাতাসেরও অসুবিধা থাকল না। তবে বৃষ্টি শুরু হয়েছে। বর্ষাকালে বৃষ্টি থাকবে না হয় কী করে। এবং মনে হল, তার, ভারি আরাম, ট্রেন ভিজতে ভিজতে ছুটবে, তারা তার যাত্রী।

চন্দ্রনাথ উঠে এসে দেখে গেল।

পূর্ণ বলল, সারা রাস্তায় এরকমই থাকবে। ট্রেনটায় একদম ভিড় নেই। নিজ চোখে দেখে গ্যালে তো।

মানবেন্দ্র এবার চন্দ্রনাথকে এক ধমক লাগাল—কাজে ফাঁকি, যাও নামো, ওর হাসপাতালের দেরি হয়ে যাবে। বাড়িতে গিয়ে বলবে পূর্ণ আমাকে ফাঁকা গাড়িতে বেশ ভালোভাবেই নিয়ে যাচ্ছে। অযথা চিন্তা করতে বারণ করবে।

ট্রেন ছাড়ল।

ট্রেন ছুটছে।

বিধাননগর স্টেশন ধরল না।

তারপর দমদমের কাছাকাছি এসে থেমে গেল।

অঝোরে বৃষ্টি হচ্ছে। ভালোই লাগছিল। এত স্বাধীনতা—নেমে বৃষ্টিতে ভিজলেও যেন হয়। তার আর যেন কোনো পিছুটান নেই।

পূর্ণ বলল, বৃষ্টি হয়ে ভালোই হল দাদা। কী বলেন?

কেন রে বৃষ্টি না হলে খুব খারাপ লাগত তোর।

আরে না, বুঝছেন না কেন। এমন ঘনঘোর বৃষ্টিতে বাড়ি থেকে কেউ বের হয়। দুর্যোগ মাথায় করে কার এত দায়। বের হওয়ার! খুব জরুরি কাজ থাকলে এক কথা।

তা অবশ্য ঠিক।

তারপরই মনে হল তার, ট্রেনটা চুপচাপ দাঁড়িয়ে বৃষ্টিতে ভিজলে যেতে দেরি হয়ে যাবে।

শেষে মানবেন্দ্র না বলে পারল না, কী রে পূর্ণ ট্রেন তো দেখছি শুরু থেকেই লেট করতে শুরু করল।

না, না, ঠিক শেষে মেকআপ করে দেবে, দ্যাখুন না—ভাগীরথীর পরেই এটা ভালো ট্রেন। আপনি তো ফার্স্ট ক্লাসে উঠলেন না। রফাটফায় আপনার বিশ্বাস নেই। দেখতেন কেউ হয়ত কোনো প্রশ্নই করত না। সারা রাস্তায় দেখবেন, এক-দুজন চেকারবাবু যাও থাকবে—কেবল পালিয়ে বেড়াবে।

পালিয়ে বেড়াবে কেন?

আরে যাত্রীর মুখোমুখি পড়ে গেলেই টিকিট চাইতে হবে না। কাজের এত চাপ বাড়িয়ে কী দরকার—এমনিতেই সবাই যখন সব কিছু হাতের কাছে পৌঁছে দিচ্ছে।

তখন গাড়িটা নড়ে উঠল।

যাক চলছে—এমন ভাবল মানবেন্দ্র।

তখনই তার মনে হল, এভাবে বর্ষণে জানালার ধারে বসে থাকলে শৈশবের কথা স্মৃতির চূড়ায় ভেসে উঠবেই।

কী রে পূর্ণ তোর মনে পড়ে, বৃষ্টির দিনে আমরা ভাইবোনেরা বারান্দায় বসে কাঁঠালবীচি ভাজা খেতাম। মা বালিতে গরম গরম ভেজে দিত।

পূর্ণ বলল, বাবা বলতেন, কী সামান্য উপকরণ, অথচ আশ্চর্য সুস্বাদু খাবার।

সেই।

দুধকচু দিয়ে মুগের ডাল, মা-ও নেই, সেই রান্নাও নেই। আমাদের তখন কী অভাবের সংসার! বাবার উপার্জন নেই, এতগুলি মুখে অন্ন জোগানোই কঠিন। জমির ধান সম্বল। আর বাড়ির এখানে সেখানে লাউ, শশা, কুমড়ো ঢেঁড়স—ফলনও হত। বাবার গাছ লাগানোর গুণই আলাদা।

আসলে এই সব স্মৃতিই এখনো তাকে দেশের বাড়িতে যাওয়ার জন্য পাগল করে দেয়। বাড়ির অখাদ্য খাবার খেয়ে অতিষ্ঠ হয়ে উঠলেই কেন যে মনে হয় দেশ থেকে ঘুরে আসা যাক। এখন তো আর একা যেতে পারেন না। কেউ না কেউ সঙ্গে থাকেই—

বাড়িতে গেলে শোরগোলও পড়ে যায়। বড়দা আসছে।

দাদার বাথরুমের অসুবিধা, এখন আর সেই অসুবিধা নেই। দাদা তাকে গুচ্ছের টাকা হাতে ধরিয়ে দিয়েছিলেন। বাড়ির জন্য, যেমন মা-র ঘরটাই ধরা যাক। যা খরচ হবে, তার তিনগুণ দাদার কাছ থেকে সহজেই হাতিয়ে নেওয়া যায়। মাঝে মাঝে সে তার দাদাকে পাগলও ভাবে। বাবার তক্তপোশে শুয়ে এক-দু হপ্তা পার করে দিলে, দাদার নাকি পরমায়ু বেড়ে যায়। পৈতৃক ভিটার নামে মানুষ এমন পাগল হয়। পূর্ণ বোঝে এতে তার পোয়াবারো—তার সংসার খরচ দাদা এমনিতেই দেয়, বাড়ি এলে দু-হাতে টাকা খরচ করতে ভালোবাসে। পরমায়ু বৃদ্ধির তক্তপোশটা যে তার দুই পুত্র সুজন-কুজন বের করে দুফালা করে যার যার ঘরে তুলে নিয়ে গেছে, জ্যাঠা বুড়ো হয়ে গেছে, বাড়ি থেকে বের হওয়া নিষেধ, বাড়ি থেকে বের হলেও গাড়ি না হয় ট্যাক্সিতে—কেউ না কেউ সঙ্গে থাকতে হয়, জ্যাঠার মৃত্যুও ঘনিয়ে আসছে—এমনও ভাবতে পারে—বাড়ির যা কিছু যতটুকু দখল করা যায়। তারা দু-হাতে যা পারছে জ্যাঠার ঘরবাড়ি থেকে তুলে নিচ্ছে। জ্যাঠার এত টাকা খাবে কে। কাজেই পূর্ণর মন ভালো না। কোথায় রাখবে, কোথায় যে শুতে দেবে। দাদা ক্ষেপে গেলে তার যে সব যাবে।

এমন সব স্মৃতির মধ্যেই ট্রেনটা হুস করে স্টেশনে ঢুকে গেল—ওরে বাপস, পঙ্গপালের মতো উড়ে আসছে যেন। ট্রেনের দরজা-জানালায় ঝাঁপিয়ে পড়ছে সব। কারও হুঁস নেই এমন মনে হল মানবেন্দ্রর।

গাড়িটার একটাও জানালা নেই। লোহার শিক নেই। মাথার ওপর সব পাখা হাপিজ।

জানালা গলিয়ে দরজা ঠেলেঠুলে যে যার মতো গাড়ির ভেতর হুমড়ি খেয়ে পড়ছে। বাক্সপ্যাঁটরা ধপাস ধপাস ফেলছে। খালি সিট আর একটাও নেই। রক্ষা, সে জানালার ধারে, পূর্ণও জানালার ধারে। এদিকের জানালায় অবশ্য কাচ আছে—তাতেই যেটুকু রক্ষে।

বৃষ্টি ধরে আসায় পূর্ণ জানালার কাচ তুলে দিতেই মিষ্টি হাওয়া। যদিও খালি সিট নেই, তবু যে ট্রেনটা ফাঁকাই। কেউ দাঁড়িয়ে নেই। সরকারের ভারি সুবন্দোবস্ত। গোটা ট্রেনটা

জনগণ হাপিজ করতে পারেনি প্রশাসন খুবই কড়া বলে।

আজকাল বয়েস হয়ে যাওয়ায়, সামান্য ভিড়েই হাঁসফাঁস লাগে। বড়োই অস্বস্তি হয়।

কী রে পূর্ণ, কী বুঝছিস।

কিছু ভাববেন না। আমার দায়িত্ব নেই। এই ট্রেনটায় ভিড় থাকে না। সামনের স্টেশনে দেখবেন খালি হয়ে যাবে কামরা।

এরা যে লোকাল যাত্রী দেখলেই বোঝা যায়। তবে লোকাল যাত্রী অনায়াসে বাক্সপ্যাঁটরা নিয়ে পাঁচ-সাত ঘন্টা পার করে দেবে না, কে বলতে পারে। তারপরই মানবেন্দ্র ভাবল ট্রেনটায় একটা প্রথম শ্রেণির বগি আছে। খুব বেশি ভিড় দেখলে সেখানে না হয় উঠে যাওয়া যাবে।

পূর্ণ বলল, দাদা আপনি চিন্তা করবেন না তো—এরা অধিকাংশই বিনা টিকিটের যাত্রী—সবই সম্ভব, সবাইকে তো বেঁচে থাকতে হবে। যে টিকিট কাটতে পারে কাটুক, যে পারে না, তারও তো একটা উপায় রাখতে হবে।

তখনই মানবেন্দ্র দেখল পাশের বেঞ্চিতে, চার-পাঁচজন লোক একটা কাগজে উপুড় হয়ে কী দেখছে।

সে জানে কী দেখছে—সেই বিপ বিপ শব্দ। সকালেই কাগজটা দেখেছে, মঙ্গলগ্রহে প্রাণ আছে কী নেই—তার ছবি। মানুষ কত কিছু যে ভেবে রাখে, মানুষের জন্মহার খুবই দ্রুতগতির দিকে, এই শতাব্দীর শেষে হাগামোতার জন্যও বোধহয় এই গ্রহে ফাঁকা জায়গা পাওয়া যাবে না। অন্য কোনো গ্রহে বসতি স্থাপনের বন্দোবস্ত যদি করা যায়। ছবিটা দেখার কৌতূহল থাকবেই। গ্রহটির নাম নিয়েও কথাবার্তা হচ্ছে, কত দূরত্বে তাও তাদের কথাবার্তার বিষয়। অত দূরে মানুষের জন্য মহাকাশ ফেরি তৈরি থাকবে। চন্দ্রবিজয় হয়ে গেছে মানুষের এখন একমাত্র মঙ্গলবিজয় বাকি।

মানবেন্দ্রর কেন যে দীর্ঘশ্বাস উঠে এল, আর এক দুর্ভোগ। ট্রেনের বদলে মহাকাশ ফেরি—তখনো হয়ত পৈতৃক ভিটায় ফেরার জন্য হুড়োহুড়ি পড়ে যাবে।

সে না হয় ভিড়ে অসুবিধা হলে ফার্স্ট ক্লাসে পূর্ণকে নিয়ে গিয়ে বসবে, কিন্তু চেকার যদি রফা করতে চায়। সে যদি রফায় রাজি না হয়। চেকার বলতেই পারে সর্বত্রই রফা হচ্ছে, আপনার বেলায় ব্যতিক্রম হবে কেন সার। ট্রেনে বোধহয় চাপেন না।

খুব ভুল হয়ে গেল। টিকিট যথাযথভাবে কাটার এই ম্যানিয়া এই একবিংশ শতাব্দীতে থাকা উচিত কি না এও মনে হল তার। সে এত বড়ো লম্বা ট্রেনে একজন চেকারবাবুকেও দেখতে পাচ্ছে না। এত লম্বা ট্রেন, চেকারবিহীন হয়ে থাকলে মানাবে কেন!

আর এও মনে হল তার, পূর্ণর কথাই ঠিক—এরা গরিব মানুষ, গরিব মানুষের পয়সা কোথায়, টিকিট না-ই কাটতে পারে। সে যেতে যেতে হাইরাইজ বিল্ডিংও কম দেখছে না—আবার বস্তি অঞ্চলেও ভরে আছে চারপাশ। ট্রেনই সাধারণের যানবাহন।

ট্রেন চলছে ফের।

বেশ দুলুনি খাচ্ছে।

শহর গঞ্জ, ধানের মাঠ পার হয়ে যাচ্ছে। একটা ছোটো রেল ব্রিজও পার হয়ে গেল। দু-পাশের দৃশ্যাবলি না হলেও, একপাশের দৃশ্যাবলি ভালোই উপভোগ করা যাচ্ছিল। ট্রেনের গতিও বেড়েছে। এভাবে শেষ পর্যন্ত যেতে পারলে ট্রেনে যাওয়াই সুবিধা, বাসেও যাওয়া যেত—সরকারি বাস মেলা। উত্তরবঙ্গের যে-কোনো বাসে চাপলেই যাওয়া যায়। মুশকিল বয়েস হয়ে যাওয়ায় প্রস্ট্রেটে কিছু গণ্ডগোল দেখা দিয়েছে। ঘন্টায় ঘন্টায় প্রস্রাব পায়। বাস তো বার বার দাঁড় করানো যায় না। বাস ছাড়লে টানা গতি পেয়ে যায়। সেই কৃষ্ণনগরে পনেরো মিনিটের হল্ট । আগে-পিছে বাস দাঁড়ায় ঠিক, লোকও তুলে নেয়। ভিড় গেঞ্জামও থাকে, নেমে যে একটু হালকা হয়ে নেবে তারও উপায় থাকে না। বারবার কতবার বলা যায়, বাস থামাও বাপু।

এসব কারণে বসে যাওয়ার একটা অস্বস্তি থাকে—পুত্ররা তার রাজি হয়নি। বর্ষায় রাস্তা খাটাল হয়ে আছে বলে গাড়িতেও ছাড়তে রাজি হয়নি। এই সব দুর্গতির কথা ভেবেই পূর্ণ পুত্রদের আশ্বাস দিয়ে এসেছে, ট্রেনেই ভালো—ভিড়ও থাকবে না, শুয়ে-বসে-ঘুমিয়ে ট্রেনযাত্রা কাবার করে দেওয়া যাবে।

তবু দুর্গতি থাকলে কপালে কে খণ্ডায়। কাউন্টারে ফার্স্ট ক্লাসের টিকিই পাওয়া গেল না।

তখনই চাই চা।

উচ্ছেদ

এ যেন গত জন্মের কথা। একটা কাজের জন্য তখন হন্যে হয়ে ঘুরছি। তখন মুকুল আমার আশাভরসা। যখনই বিপন্ন বোধ করেছি তার কাছে ছুটেছি। সেও চেষ্টা করছে। আমরা তখন এক কলেজে পড়ি, একসঙ্গে ঘুরি, দু-জনেরই দুটো ভাঙা সাইকেল সম্বল। মুকুল থাকে শহরে, আমি কলোনিতে। জঙ্গল সাফ করে মাটির ঘরবাড়ি, ভাইবোন মেলা, তখন আমরা ছিন্নমূল। মুকুলের দাদা পি ডব্লিউ ডি-র কোয়ার্টারে থাকেন, আফিসের ডেসপাচ ক্লার্ক তিনি। যদি কোনো কাজের সুযোগ করে দেন, যে কোনো কাজ, মুকুলের জামাইবাবু স্কুল ইনসপেক্টর, মুকুলের দিদিকে ছোড়দি ডাকি—সকলেরই এককথা আরে হয়ে যাবে, আমরা তো আছি। জামাইবাবু একদিন ডেকে বললেন, সারকুলার এলেই তুমি অ্যাপ্লাই করবে।

কাজের জন্য চেনাজানা যত মানুষজন আছে, তাদের কাছে যাই—মুকুল আমার সঙ্গে থাকে। বাড়ি ফিরতে ফিরতে বেশ রাত হয়ে যায়। বাড়িতে অর্ধাহার অনাহার, কী যে করি, নিরুপায় বাবার একটাই কথা—বিলু, কেউ কিছু বলল!

কিছু বলল মানে, আমার চাকরির কথা জানতে চান। বাবার দিকে তখন তাকানো যায় না, ক্লিষ্ট এবং উদাস মুখখানি আমি তার এখনও ভুলতে পারি না।

কলেজে যেতে হয় যাই, বেতন দিতে পারি না বলে যে কোনো সময় নাম কাটা যাবে, বাড়িতে থাকলে পিতাপুত্রের একটাই কাজ, জঙ্গল সাফ করা, এবং গাছপালা লাগানো—একদিন সকালে মুকুলই খবর দিল, হাতিনগর প্রাইমারি স্কুলে স্পেশাল ক্যাডার শিক্ষকের পদে আমার কাজ হয়েছে—আশি টাকা মাইনে—আশি টাকাই বাবার হাতে তুলে দিই এবং এ-ভাবেই জীবন শুরু, সে দিন আনন্দে চেনাজানা মানুষের কাছে খবর পৌঁছে দিতে বেশ রাত হয়ে গেছিল ফিরতে। দু-বেলা আহারের বন্দোবস্ত হয়ে গেলে মানুষের আর কী লাগে! মুকুল না থাকলে বোধহয় আমার জীবনসংগ্রামই শুরু হত না। ভাঙা সাইকেলটার কথাও মনে হয়, বিকেল হলেই সাইকেলে পাকা সড়ক ধরে কত দূরে যে উধাও হয়ে যেতাম। তখন শুধু স্বপ্ন, স্বপ্ন নিয়ে ঘুরছি—আরও বন্ধুবান্ধব জুটে গেল, আমরা সবাই মিলে একটা কাগজও বের করলাম, রায়বাহাদুরের নাতনি মৃন্ময়ীও জুটে গেল।

আড্ডায় যা হয়, কথা শেষ হতে চায় না। রাত বাড়ে। আকাশে নক্ষত্র ফুটে থাকে। গাছপালা অন্ধকারে কেমন নিথর। সোজা পাকা সড়ক চলে গেছে লালাবাগের দিকে। রেলগুমটি পার হলে দু-দিকে দুটো সড়ক। কারবালা দিয়ে গেলে বাড়ির রাস্তা সংক্ষিপ্ত হয়। খুবই বনজঙ্গলের ভিতর দিয়ে কবরখানা পার হয়ে রাস্তাটা আমাদের বাড়ির দিকে চলে গেছে। দিনের আলোয় সাহস পেলেও, রাতে ওই রাস্তা ধরে একা বাড়ি ফিরতে ভয় হয়। বাদশাহি সড়ক ধরেও যাওয়া যায়, তবে অসুবিধা, পুলিশ ট্রেনিং ক্যাম্পের ভিতর দিয়ে যেতে হয়, ঢুকলেই সিপাই হল্ট বলে চিৎকার করবেই। তখন বলতে হয়, আমি পিলুর দাদা। ব্যস, ওই যে কথা, পিলুর দাদা, এতেই হয়ে যায়। পিলুর খ্যাতি সর্বত্র। পিলু-ধিলুরা তখন বড়ো হয়ে উঠছে।

তারপরই ট্রেনিং ক্যাম্পের আর্মারি। আর্মারি পার হলে মাঠ। মাঠে কাঁটাতারের বেড়া। মাঠে নামলেই আমাদের পাড়াটা চোখে পড়ে। বেড়ার গেট পার হলে দেখতে পাই লম্ফ জ্বলছে, ঘরে ঘরে। অন্ধকার রাতে এগোনো যে কত কঠিন—গাছপালার ছায়ায় নিজেকে পর্যন্ত দেখা যায় না—তবু পথটা এত চেনা যে যেন জন্মজন্মান্তরের রাস্তা, কখনোই ভুল হতে পারে না— কারণ বাড়ি ঢুকলেই যে বাবা মা ভাই বোনেরা উৎকণ্ঠা নিয়ে অপেক্ষা করছে, বুঝি। কুকুর বিড়াল কিংবা মানুষের গায়ে না পড়ি এজন্য অনবরত ক্রিং ক্রিং বেল বাজাই — যারা দূরে কাছে আছ, সরে যাও। বাবা-মা এমনকী পিলু দূর থেকেই টের পায় তার কলেজে পড়া দাদাটি ফিরছে। আমাদের ফেলে আসা দেশ, কিংবা জন্মভূমির জন্য কারও আর তেমন কোনো মায়া মমতা নেই। যেন এ-দেশে চলে এসে আত্মরক্ষা করা গেছে। মান মর্যাদা আর নষ্ট হবার ভয় নেই। মনেই হয় না আমরা ছিন্নমূল। বরং এই যেন আমাদের দ্বিতীয় জন্মভূমি। সুযোগ এবং সময় পেলেই, ছোট্ট জন্মভূমিতে বাবা, আমি শুধু গাছ লাগাই, আম জাম জামরুল কাঁঠাল লিচু এবং একটি বাতাবি লেবুর গাছও লাগানো হয়ে গেছে। গাছের সঙ্গে মানুষের যে কত নাড়ির টান বাবাকে দেখলে বুঝি। বাড়ির গাছপালার ভিতর দিয়ে সাইকেলে চেপে উধাও হওয়ার আনন্দও আলাদা। আর কী করে যে এই বাড়িঘরের সঙ্গে বাবার মতো আমিও এক গভীর মায়ায় জড়িয়ে গেছি। তারপর যা হয় মুখ বাড়ে, মানুষ বাড়ে, দায়িত্ব বাড়ে—বাবার সংসার, আমার নিজের সংসার, কত দায়িত্ব, বোনেদের বিয়ে, ভাইয়েরা কেউ পড়াশোনায় মন দিতে পারল না, পিলু মিলিটারিতে চলে গেল, বিয়ে করে বাবার সংসার থেকে আলাদাও হয়ে গেল, ধিলুর মোড়ের মাথায় দোকান। দোকান জমে উঠতেই সেও ভিন্ন হয়ে গেল। ধিলুর বউয়ের অভিযোগ আমি যে বাবার মাসোহারা পাঠাই, তাতে সব খরচ নির্বাহ হয় না।

বাড়িটা আর বাড়ি থাকল না। দাদা দেশভাগের আগেই রেলে কাজ নিয়ে সুদূরে হারিয়ে গেল, সেখানে সে ঘরবাড়িও বানিয়েছে। বছরে দু-বছরে আসে এই পর্যন্ত। তার কথায় বুঝি তারও অভাবের অন্ত নেই, পর পর সন্তান ধারণ করে বউদিও জেরবার, এবং একবার বাড়ি গিয়ে জানতে পারি সে তার বড়ো মেয়েটিকে বাড়িতেই রেখে গেছে।

বাবা বললেন, কী আর করা!

বাবা যে খুব অদৃষ্টবাদী এবং ধর্মভীরু মানুষ। জীবন একভাবে না একভাবে চলে যায়। এত ভেবে কী হবে!

তত দিনে আমারও কলকাতায় থাকার একটা আস্তানা হয়েছে। কিন্তু মা বাবা ভাই বোনের টানে, এবং সেই গাছপালা—যা প্রায় তিন বিঘা জুড়ে বড়ো হয়ে উঠেছিল, তারা প্রায় বলতে গেলে মহাবৃক্ষ হয়ে উঠেছে—ডালপালা মেলে দিয়েছে—বড়োঘর, রান্নাঘর, ঠাকুরঘরও হয়ে গেছে এবং শহর জীবনে অতিষ্ঠ হয়ে উঠলে, প্রায়ই মা বাবার কাছে ছুটে যাই। মাটির আটচালা ঘরটির একটি তক্তপোশে বাবার বিছানা হয়, আমারও হয়, পাশের তক্তপোশে আমার মা এবং ভাইঝি শোয়, আমায় ছেলেরা কিংবা স্ত্রী গেলেও কোনো রকমে সেই ঘরটাতেই থাকি। ধিলু বাড়ির সামনের দিকটায় মাটির ঘর তুলে সে তার আলাদা সংসার করে নিয়েছে। বাড়ি গেলে বাবাই একবার বললেন, ধিলুর দোকান ধারদেনায় বসে গেছে। তুই যদি পারিস মাসে মাসে কিছু টাকা পাঠাস।

মা দরজায় ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়েছিল।

তাঁরও এক কথা। তুই না দেখলে, কে দেখবে। এমন অবস্থা ধিলুর, দুবেলা পেট ভরে খেতেও পায় না। তুই যা টাকা পাঠাস আমাদেরই হয় না, তার উপর ধিলুর বাড়তি মুখের অন্ন জোটানো তো বাবার পক্ষে সম্ভব! ধিলুকে কত বললাম, তোকে চিঠি লিখতে, সে কিছুতেই রাজি না। বড়ো বিবেচক, দাদা কত দিক সামলাবে। বরং তোমরা বললে দাদা গুরুত্ব দেবে।

কী আর বলি, দেখি বলে চুপ করে গেলাম। সেই কবে কলেজের চাকরি নিয়ে প্রথম বাড়ি ছেড়ে কাটোয়ায় যাই। তখন থেকেই ধিলু আমার কাছে। সে স্কুলে যায়, আমার স্ত্রী শিক্ষয়িত্রী একটা স্কুলের। সে-ই সকালে কাজের ফাঁকে ধিলুকে পড়ায়। কিন্তু তার পড়ায় মন বসে না। সুযোগ পেলেই, পড়া ছেড়ে উঠে যায়, স্টেশনে গিয়ে বসে থাকে—বাড়ির জন্য মন খারাপ হলেই, তাকে ধরে রাখা কঠিন হয়ে পড়ে। স্কুল কামাই হয়। স্কুলে না গেলে পড়ায় যে ক্ষতি হয়, কিছুতেই সে তা বোঝে না।

এক সকালে বাবার চিঠি নিয়ে বোনও হাজির। আমার কাছে না থাকলে সে পরীক্ষায় পাশ করতে পারবে না। তার বউদি স্কুলে পড়ায়। এই ভরসাতেই বাবা ভেবেছেন, বউমা

সাহায্য করলে বিনি ঠিক পাশ করে যাবে।

পাশ আর করে!

পড়তে বসে, তবে মন অন্যমনস্ক। পড়া ছাড়া আর সব কাজই তার প্রিয়। ধিলুর সঙ্গে বিনি একদণ্ড বনে না। অথচ বাড়ি গেলে দুই ভাইবোনেই বউদিটি যে তার ভালো না, কারণ দাদাকে গ্লাস ভরতি দুধ দেয়, তাদের গ্লাস ভরতি দুধ দেয় না, বউদির খুবই দেড় নজরে স্বভাব, এই সব অভিযোগে মা ক্ষিপ্ত হন, তাঁর এক কথা, তুই পেটে ধরেছিস, না আমি ধরেছি। তোর উপার্জনে খায়, না আমার পুত্রের উপার্জনে খায়! এই সব নিন্দামন্দ কানে উঠতেও দেরি হয় না। স্ত্রী মাঝে মাঝে এই নিয়ে কান্নাকাটিও করতেন। সে যাইহোক, কাটোয়া থেকে সরকারি কলেজে চাকরি নিয়ে কলকাতায় চলে আসার আগে জেলা বোর্ডের বড়োবাবু ধ্রুবকে ধরে আমার স্ত্রী একটি মাদার টিচার ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা করে দেয় বিনিকে। আর কলকাতার স্কুলে ধিলুকে যে ভর্তি করানো কঠিন, বরং তাকে বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া দরকার। সেখানে কলোনির হাইস্কুলে যদি ভর্তি করে দেওয়া যায়।

আমি নিজেই বাড়ি গেলাম।

বাবা।

বলো। আমি তো কলকাতা চলে যাচ্ছি। আপনার বউমার ডেপুটেশনে কাজ, সেও চাকরি ছেড়ে দিচ্ছে। কলকাতায় স্কুলে ভর্তি করানো খুব টাফ ব্যাপার। ওকে কলোনির হাইস্কুলে ভর্তি করে দিন। বাড়ি থেকে পড়ুক। আর একটা তো বছর—দেখি তারপর কী করা যায়।

আর, একটা বছর!

বাবার চিঠি নিয়ে ধিলু আমার বাসায় হাজির।

বাবা লিখেছেন, ধিলু আর পড়তে চায় না। সে তোমার কাছে চলে যাচ্ছে। যে কোনো একটা কাজ তাকে তুমি জুটিয়ে দিও। কী করি! বাধ্য হয়ে আমার এক ছাত্রের বাবাকে ধরে ধিলুকে কারাখানায় ঢুকিয়ে দিই। এই সব স্মৃতি আমাকে বিষণ্ণ করে দেয়। ধিলুর শেষে এই পরিণতি! বড় দুশ্চিন্তা আমার। তার মারামারির স্বভাব প্রকট, মাথা গরম, একবার স্কুলেও সে তার এক সহপাঠীর মাথা ফাটিয়ে দিয়ে বাড়িতে পালিয়েছিল। স্ত্রী শিক্ষয়িত্রী, আমি কলেজে পড়াই, কাটোয়ায় আমাদের বিশেষ পরিচিতির দরুনই বিষয়টি বেশি দূর গড়ায়নি। কারখানায়ও সে মারপিট করে চাকরিটা শেষ পর্যন্ত খুইয়েছে।

তখন সে আমার বাসায় থেকে কারখানায় কাজ করত। ধিলু কাজ পেয়েছে শুনেই, মা এক সকালে হাজির আমার কলকাতার বাসায়।

আমি যে জন্যে এলাম— মা বললেন।

বিশেষ জরুরি কাজেই এসেছেন মা। স্ত্রী নীরা মাকে ভালোই জানে। সে ভয়ে ভয়ে প্রণাম সেরে বলল, আপনি হাতমুখ ধুয়ে বিশ্রাম করুন মা। আপনার ছেলে আসুক। আমার দুই পুত্র তাদের ঠাম্মাকে ধরে নিয়ে গিয়ে সোফায় বসিয়ে দিয়েছে। তারাও জানে ঠাম্মা তাদের মাকে পছন্দ করে না। মা বাবাকে অন্য গ্রহে তুলে আনায় ঠাম্মার যে ক্ষোভ আছে তাও তারা বোঝে—

শোনো বউমা, ধিলু কোথায়?

কাজে গেছে। কারাখানায় ওর শিফট ডিউটি।

বিলু!

আপনার ছেলে বাজারে গেছে। আসছে।

আমি বসব না বউমা। মরনির ছেলের বিয়ে, বিয়ে বলে কথা, না এসেও পারা যায় না। সংসার ফেলে আসা সোজা কথা না, এলাম প্রাণের দায়ে—

আমি দরজা খুলে ঢুকতেই কানে এল কথাটা—বাজারের থলে নামিয়ে বসার ঘরে ঢুকে প্রণাম সেরে বললাম, প্রাণের দায়! প্রাণের দায় কেন মা!

হ্যাঁরে বাবা। তোর পলতার মরনিমামির ছেলে জনার্দনের বিয়ে। যখন এতটা দূরে এলামই, তোকে, নাতি দুটোকে না দেখে যাই কী করে। প্রাণ কাঁদে।

কে তোমাকে দিয়ে গেল!

নরহরি।

অর্থাৎ আমার মেসোমশাই, বললাম, তিনি এলেন না।

আসে কী করে! বিয়ে বলে কথা, এদিকটার আত্মীয়স্বজনদের বিয়ের চিঠি দিয়ে আসবে। তার সঙ্গেই ফিরব।

প্রাণের দায়টা কী তোমার! এসেই যাওয়ার কী হল!

তুই কি বাবা মানুষ আছিস!

বুঝলাম হয়ে গেল। সবটাই নীরা উপলক্ষ।

নিজের ভাই বলে কথা! সে থাকে তোর কাছে, তার কাছ থেকে, কোন মুখে খোরাকির টাকা নিস—

ও তো কোনো টাকা দেয় না মা!

দেবে কোত্থেকে, কটা টাকা মাইনে, তোকে দিলে ওর বউকে কী পাঠাবে! ওর বউয়ের যা চোপা, ঠেস দিয়ে কথা—নিজের ভাই, থাকে খায় সে জন্য কেউ টাকা নেয়! কী মুখ বউটার! তোকেও ঠেস দিয়ে কথা বলে। একজনের নামের চোটে গগন ফাটে, আর তারই ভাই উবু হয়ে ঘাস কাটে। আরে তোর এ-কথা সাজে, বিপদে আপদে সেই তো দেখে!

বললাম, মা ধিলু আমাকে কানাকড়িও দেয় না। খোরাকির টাকার কথা আসে কী করে!

কী জানি বাবা তোরাই জানিস।

বছর দশেক ছিল ধিলু আমার বাসায়। তারপর ফের বাড়িতে। কোম্পানির প্রভিডেন্ট ফান্ড এবং সঞ্চিত টাকা নিয়ে গিয়ে ফের মোরের মাথায় দোকান, এবং বাড়ি ছেড়ে সে যে থাকতে পারেনি—কাজে কামাই করারও স্বভাব ছিল তার। বাড়ি গেলে আর ফিরতে চাইত না। কাজ থেকে ছাড়িয়ে দেওয়ার এটাও বোধহয় একটা কারণ। ধিলুকে নিয়ে আমার শুধু দুশ্চিন্তা বাড়ে।

৩

সে বারে বাড়ি গিয়ে দেখি, ধিলুর ঘরটা ফাঁকা।

বাবা বুঝতে পেরে বললেন, তাড়িয়েছি। অত্যাচারের শেষ নেই। সে আমার ত্যাজ্যপুত্র।

কী বলছেন!

তোমার ভাইঝিকে ধিলুর বউ চর মেরেছে। ধিলু বারান্দার টালি টেনে ছুঁড়ে ফেলেছে উঠোনে। তোমাকে জানাইনি। পিলু ছুটে না এলে ধিলুর বউ তোমার ভাইঝিকে মেরেই ফেলত। চুল ধরে টানতে টানতে উঠোনে আছড়ে ফেলেছে। মানিক ছুটে এসে লাঠি নিয়ে তাড়া না করলে আমাদেরও মেরেই ফেলত। বাড়িটা দিন দিন শেষে কী হয়ে উঠল!

আমার মা জেদি, একগুঁয়ে। বুঝি দোষ সবটাই ধিলুর বউয়ের নয়। ভাইঝিও রগচটা। সে যাহোক, বললাম ওরা কোথায়।

দীনবন্ধুর বাড়িতে বাসা ভাড়া করে আছে।

এটা খারাপ দেখায় বাবা। বাড়ি ঘর থাকতে বাসা ভাড়া করবে— শত হলেও সে আপনার পুত্র।

পুত্র না মূত্র। তুমি যা পাঠাও ওই সম্বল আমার। একটা পয়সা দেয়! দিতে পারে, দেবে না। কুপুত্র থাকার চেয়ে না থাকা ভালো। আর প্রতারণা, তোমাকে সাতকাহন করে যে অভাবের কথা লেখে সব বানানো। সুদের ব্যবসা করছে সে।

কথায় কথা বাড়ে। মা বললেন, থাকবি তো! রুমির একটা সম্বন্ধের কথা হচ্ছে। সবই ঠিক, কেবল বলেছি তুই না এলে কিছু হবে না। তুই না দেখলে কিছু হবে না। দেনা পাওনা নিয়ে সেই কথা বলবে।

আমি বললাম, দাদা কী বলছে! দাদা দেখুক।

বাবা বললেন, সে দেখবে না। তার দায় নেই জানিয়ে গেছে। আমার কাছে বড়ো হয়েছে, আমার দায়। তার নিত্য অভাব, জানিয়েছে, বিয়ে দেবে কোত্থেকে। ঘাড়ের উপর তার আরও তিনটি মেয়ে—

দাদার দোষও দেওয়া যায় না। পুত্র দুটির তার অপুষ্টি কিংবা অন্য যে কোনো কারণেই হোক, বুদ্ধি-বিবেচনার খুব অভাব। কিছুটা মানসিক প্রতিবন্ধীও বলা যায়। রেলের চতুর্থ শ্রেণির একজন কর্মীর পক্ষে এতগুলো মানুষের ভরণপোষণই কঠিন।

মা বললেন, কীরে কদিন থাকবি তো! গলায় বিষধর সর্প নিয়ে ঘুরছি। তুই ছাড়া কে উদ্ধার করবে—তুই দেখে যা। দাবিদাওয়া বলতে নগদ পঞ্চাশ হাজার চায়, আর কিছু চায় না। আর বিয়ের খরচ।

আমি কী যে বলি! নগদ দেওয়া যে অপরাধ, যে দেয় সেও অপরাধী। তারপর এত টাকা পাব কোথায়! সব আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে চাইছে মা। মা ফের বললেন, সাদুল্লা আমগাছটা বিক্রি করলে হাজার তিনেক টাকা পাওয়া যাবে। যদি বলিস, গাছটা না হয় বিক্রি করে দিবি। বিয়ের খরচ মিটে যাবে।

বাবা খেপে গেলেন, শোনো ঠাকরুণ, গাছ আমার প্রাণ। গাছগুলোর দিকে তোমাদের নজর পড়েছে দেখছি। এত বড়ো বড়ো গাছ বাড়ির চারপাশে তোমার সহ্য হচ্ছে না!

বিকেলে আমার বোন বিনিও হাজির। তার বিয়ে কলোনিতেই হয়েছে। সে কলোনির প্রাথমিক স্কুলে মাস্টারিও করে। সপ্তাহে দু-সপ্তাহে একবার মাকে রুমিকে দেখে যায়—রুমিকে সে মেয়ের মতোই ভালোবাসে। কারণ মাকে যখন দাদা রেখে যান তারই উৎসাহ ছিল বেশি। আমি রাজি ছিলাম না।

ভগ্নিপতিও কিছুক্ষণ পরেই হাজির। কথাবার্তায় খুবই ভদ্র এই ভগ্নিপতি, প্রণাম সেরে বলল, কবে এলেন দাদা। ছেলেটিকে আমার পছন্দ। বাজারে স্টেনলেস স্টিলের বাসনকোসনের দোকান আছে। দোকানটা সে বড়ো করতে চায়। এই জন্যই নগদ টাকা তার দরকার।

কী যে বলি! তবু বললাম, সবাই মিলে দিলে ত হয়েই যায়। তবে এত টাকা!

আর কার দেবার সামর্থ্য আছে বলুন! থাকলেও মুখ শুকিয়ে রাখার স্বভাব। কার কাছে চাইবেন বলুন। ইচ্ছা হল বলি বিনিও দিতে পারে। তুমিও পার। সবাই মিলে দিলে আমার ভার লাঘব হয়। গাছও কাটতে হয় না। যাই হোক বিয়ে আর হয়নি। ছেলের কী খুঁত পাওয়া গেছে।

রাতের দিকে বারান্দায় বসে আছি। বাড়ি এলে যে আমরা পরমায়ু বাড়ে—এত সব গাছপালার মধ্যে বসে থাকার আনন্দই আলাদা।—দেখি অন্ধকারে উঠোন অতিক্রম করে কে বারান্দায় উঠে আসছে। পরনে লুঙ্গি, গায়ে ফতুয়া। ধিলু! তার ছেলে দুটি এবং মেয়েটিও হাজির। ওরা প্রণাম করে বলল, জেঠু তুমি কিন্তু আমাদের বাসায় যাবে। মা রাতে তোমাকে খেতে বলেছে।

সবারই কুশল নিতে হয়।

তুই কোন ক্লাশে পড়িস মেঘা?

ক্লাশ ফোরে পড়ি।

সিধু তুই?

আমি পড়ি না জেঠু।

তখনই মা বললেন, ও তো ব্যবসা করবে বলছে। একটা সাইকেল না হলে চলছে না। আমাকে ধরেছে, ঠাম্মা তুমি জেঠুকে বলো, আমাকে একটা সাইকেল কিনে দেয়।

ধিলু বাঁশে হেলান দিয়ে চুপচাপ বসে আছে। কোনো কথা বলছে না। সে যে ভিতরে ভিতরে ফুঁসছে বুঝি, তার এই ক্রোধ যে বাবা বাড়ি থেকে বের করে দেওয়ায় তাও বুঝি—বারান্দার এক কোনায় হারিকেনটা রাখা, তার আলোতে সবার মুখই আবছা দেখা যায়, রুমি ঘর থেকে গলা বাড়িয়ে বলল, কাকা সবারই চা হচ্ছে, আপনাকে দেব?

দে। ধিলুকে বললাম, তুই এত অমানুষ ধিলু, বারান্দার টালি সব ভেঙে ফেললি, তোর স্ত্রী রুমিকে ধরে মারধর করল— ছেলেটার পড়া বন্ধ করে দিলি, এই সে দিন হল, ব্যবসার ও কী বোঝে!

সহসা ধিলু আগুনের মতো জ্বলে উঠল। আমি অমানুষ—তোরা সব মানুষ। তুই আমাকে টাকা পাঠাতিস, মা-র সহ্য হল না। বউদিকে লাগাল। তুই টাকা বন্ধ করে দিলি।

তোর দোকান তো ভালোই চলছে।

মিছে কথা। ঈর্ষা, এই দোকান থেকে কী হয় বুঝিস না, ধার দেনায় ডুবে গেছি। বাসা ভাড়া করে থাকতে হয়, এখন সব রুমি, তুই জানিস দাদা, দিদি মা মিলে তোর টাকা থেকে রুমিকে পাসবই করে দিয়েছে। তোকে চাপ দিয়ে, তুই খাস না-খাস বছরের পর

বছর টাকার অঙ্ক বাড়িয়ে নিচ্ছে, দিদিই দেখবি রুমির বিয়ে দেবে না। ওর মেয়েকে কে পাহারা দেবে, সকাল হলেই রুমি দিদির বাড়ি চলে যায়—তার মেয়ের দেখাশোনা করে, বাড়িতে কতক্ষণ থাকে!

এসব কথা আমার শুনতে ভালো লাগে না, বললাম ঠিক আছে, বাবাকে বললাম, আপনি সামনের দিকে ওকে দুকাঠা জমি দিন, ধিলু বাড়ি করে থাকুক। বাড়ির ছেলে পাড়াতে বাসা ভাড়া নিয়ে থাকবে, দেখতেও খারাপ লাগে।

বাবা আর কী করেন? বাড়ির দায়-অদায় সব যে সামলায় তার কথা ফেলাও যায় না, তিনি বললেন, আমার উঠোনে সে থাকতে পারবে না। জায়গার তো অভাব নেই, রাস্তার দিকে জায়গা দে।

সেই মতো ধিলু জমিটার এক কোনায় বাড়িঘর করে আছে। বছরে দু-চারবার কখনো আরও বেশি বাড়ি যাওয়াই আমার স্বভাব। মাটির টানে হতে পারে, মা বাবা ভাই বোনের টানে হতে পারে, গেলেই কেমন প্রাণ জুড়িয়ে যায়। অথবা সেই গাছপালা বৃক্ষ, কারণ কখনো যে বাড়িটাকে তপোবনের মতো মনে হয়, শহরের কোলাহল থেকে এই সব বৃক্ষসমূহের নির্জনতায় ঢুকে গেলে তৃপ্তিতে মন ভরে ওঠে। বাবার লাগানো গাছ, আমার লাগানো গাছ পঁচিশ-ত্রিশ বছরে যে-সব মহাবৃক্ষ হয়ে গেল, তার নীচে চেয়ার পেতে দিলে গাছের সঙ্গে আমার কথা হয়।

বাবাও সারা দিন এ-গাছ সে-গাছের গোড়া খুঁড়ে মাটি আলগা করে দেন, এতে গাছের প্রাণশক্তি বাড়ে। সারা দিন বাবাও গাছের সঙ্গে কথা বলেন।

সে যাহোক, সে বারে বাড়ি গিয়ে টের পাই, প্রকৃতই বাবার অনেক বয়েস হয়ে গেছে। বাবা বারান্দায় জলচকিতে বসে আছেন। বর্ষাকাল, বাবার শরীর কেমন ফ্যাকাসে হয়ে গেছে।

আমার জরুরি কাজ, পরদিনই ফিরতে হবে। পিলুকে ডেকে পাঠালাম। সে কয়েকটা জমি পার হয়ে আলাদা জমি কিনে পাকা বাড়ি করে আছে।

বাবার শরীর কিন্তু ভালো না পিলু।

সে তো জানি দাদা, আমি একা কী করব?

কালু ডাক্তারের কাছে নিয়ে যা, না হয় কল দে। বাবার রক্ত পরীক্ষা করা দরকার। ধিলুকে ডেকে বললাম, বাবার কিন্তু শরীর ভালো না।

ধিলুর সোজা কথা, আমার পক্ষে সম্ভব না কিছু করা। অগত্যা আর কী করা, নিজেই ছোটাছুটি করে বাবাকে ডাক্তার দেখিয়ে ওষুধ পথ্যের ব্যবস্থা করে আসার সময় বিনিকে

খবরটা দিয়ে এলাম। সাত দিনের মাথায় বিনির টেলিগ্রাম। আমাদের বাবা আর নেই।

৪

নামের চোটে গগন ফাটে এমন সব কথা এমনিতেই পাড়াগাঁয়ে চাউর হতে সময় লাগে না। মান এবং বংশের মর্যাদা রক্ষার্থে, সব ভাইরাই বসল। দাদাও বাড়িতে চলে এসেছেন।

বললাম, দাদা, বাবার শেষ কাজ। আমরা সবাই তঁরা আত্মার সদগতির অংশীদার। তোমরা কে কী দিতে পারবে, বললে ভালো হয়।

দাদার দিকে তাকালাম, আমি ভাই হাজার টাকার বেশি দিতে পারব না।

পিলু—

দাদা আমার অবস্থা তো বুঝিস?

ধিলু—

আমরা ক্ষমতা কোথায়! মাঝে মাঝে কিছু দিস বলে এখনো দুবেলা খেতে পাই।

অগত্যা ভগ্নীপতিকে ডেকে পাঠালাম। এবং পুরোহিত ডেকে ফর্দ তৈরি হল।

আমাদের আত্মীয়স্বজন মেলা। জেঠা কাকারাও আছেন, বংশটি বড়ো, কারণ বাবা জেঠারা পাঁচ ভাই—দুই বোনও আছে, তা ছাড়া কলোনির কাজে কর্মে যারা আমাদের নিমন্ত্রণ করে তাদেরও বলা দরকার। এ ছাড়া পিলু ধিলুর শ্বশুরবাড়ির মানুষজন, কাজেই তালিকাটিতে নামের সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে যেতে লাগল। বাবার কাজে কোনো কার্পণ্য থাকুক আমি চাই না। বৃষোৎসর্গ শ্রাদ্ধ সহ দান-ধ্যানেরও ব্যবস্থা থাকল। বলতে গেলে ঘটা করেই কাজ সারা হল।

মৎস্যমুখ হয়ে যাওয়ার পর স্ত্রী-পুত্রদের নিয়ে কলকাতায় ফিরব। বড়ো পুত্রের বারো ক্লাসের রেজাল্ট বের হবে পরদিনই, বড়ো মাটির ঘরটায় তক্তপোশে বসে আছি। মা কেমন ব্যাজার মুখ করে বলল, আমাকে আলাদা ক-টা টাকা দিয়ে যাস বাবা। স্টোভ না কিনলে আমার রান্না হবে কীসে। মন আমার আরও খারাপ হয়ে গেল। বাড়ির টানে বাড়ি ফিরব ঠিক, তবে বারন্দার চেয়ারে বাবা বসে তামাক খাচ্ছেন, এই দৃশ্যটি আর চোখে পড়বে না। কেন যে চোখে জল এসে গেল। বড় বিষণ্ণ হয়ে গেলাম—বাইরে বের হয়ে অবাক, গাছের একটি পাতাও নড়ছে না। কেমন চার- পাশ এবং গাছপালা সহ সমস্ত প্রাণীজগৎ যেন স্তব্ধ হয়ে আছে।

আসলে আমি বিষণ্ণতার শিকার এবং কোথাও যেন প্রাণের লক্ষণ খুঁজে পাচ্ছি না।

পিলুকে ডেকে পাঠালাম।

ধিলুকেও।

শোনো, আমার মা থাকল, রুমি থাকল। এদের তোমরা দেখো। অযথা ঝগড়া করবে না। অসুবিধে হলে আমাকে জানাবে। এই যে গাছপালা বাবা লাগিয়ে গেছেন, এখন সব মহাবৃক্ষ, আম, জাম নারকেল গাছ কী নেই। নারকেল গাছ দুটো এই সে দিন বাবা লাগালেন। পঁচিশ-ত্রিশ বছর ধরে বাবা এই গাছগুলির সঙ্গেই কথা বলেছেন, তোমাদের আচরণে তিনি তোমাদের প্রতি বিশেষ সন্তুষ্ট ছিলেন না, মা চোপা করলে, বাবার এককথা, এই যে গাছ লাগিয়ে গেলাম—এরাই তোমাকে দেখবে। পুত্র না মূত্র বলে তিনি আমাদের অবজ্ঞাও করতেন। যাহোক, তোমরা গাছের কিছু ধরবে না। জমিজমা যেটুকু আছে, সবই মা ভোগ করবেন।

যেহেতু ধিলু পিলুর সুবিধা-অসুবিধায় আমি আছি, তারা সুবোধ বালকের মতো বলল, তুই যা বলবি তাই হবে।

ধিলু বলল, জমি ভাগ হবে না?

না। মা যদ্দিন আছেন, এ-বাড়ির, মাসির বাড়ির কোনো জমিই ভাগ হবে না। মা যত দিন বেঁচে আছেন, তাঁর ইচ্ছে মতো জমি ভোগ করবেন। ফলপাকুড় যা তিনি তোমাদের হাতে ধরে দেবেন তাই নেবে।

তুই যা বলবি, তাই হবে।

সেই এক কথা— একেবারে একান্ত বশংবদ। ঘাড় তুলতে বললে তুলবে, ঘাড় নামাতে বললে নামাবে।

মাকে নিয়ে মুশকিল হচ্ছে, তিনি কারও ওপর প্রীত থাকলে, দু-হাত উজার করে তাকে সব দিয়ে দিতেন। রুমি আর ধিলুর বউ দুজনেরই আচরণ সাপ আর নেউলের মতো। গাছের আম জাম জামরুল, প্রতিবেশীদের ডেকে দেবেন, কিন্তু ধিলুর বউকে দেবেন না। তার ছেলেমেয়েরা গাছতলায় ঘুরে বেড়ালেও রক্ষা থাকত না।—গাছতলায় ক্যারে।

অবশ্য আমার মা কখন কার পক্ষ নেবে বলাও মুশকিল— মা কীভাবে যে কার অনুগত হয়ে যান তাও বোঝা যায় না। ধিলু এক সকালে কলকাতার বাসায় এসে হাজির। মা তাকে চিঠি লিখে দিয়েছেন, আমাকে দিতে। চিঠিতে দেখি গাছ বিক্রির কথা আছে। ধিলুব খুব অভাব। আতপ চাল রাখার অজুহাতে পুলিশ তার দোকান সিজ করে দিয়েছে। তার ত্রাহি মধুসূদন অবস্থা। থানা, পুলিশ, আদালত, সামলাতে অনেক টাকার দরকার।

লাইসেন্স না থাকলে দোকানে চাল রাখা যায় না। ধিলুর দোকান থেকে প্রায় আট কুইন্টাল চাল পুলিশ তুলে নিয়ে গেছে। দোকানও বন্ধ করে দিয়ে গেছে, এখন বাড়ির বাবার লাগানো গাছই একমাত্র তাকে রক্ষা করতে পারে। গাছই ভরসা।

মামলা কত দিন চলবে উকিলও বলতে পারল না— পুলিশে ছুলে আঠারো ঘা বুঝি, এই খরচ চালানো আমার পক্ষেও কঠিন, বললাম, তোরা যা ভালো বুঝিস করবি।

গাছ কাটা শুরু হয়ে গেল। আমারও ধিলুর জন্য দুশ্চিন্তা বাড়তে থাকল। আমিই বা কতকাল টানব।

ধিলু দুটো বিশাল আমগাছ বিক্রি করে আপাতত শান্ত আছে। মাঝে মাঝে সে আমার বাসায় এসে বাড়ির খবর জানিয়ে যায়, হেমন্ত উকিলের ফিজ বাবদ টাকাও নিয়ে যায়— আর আমার এত অনুগত যে সে তার লেবুগাছ থেকে কিছু কাগজি লেবু নিয়ে এলেই নীরা খুশি, বাড়ির গাছের লেবু, এতেই নীরা ধন্য।

ধিলু এলেই এক কথা, জানিস দাদা মা কাঁঠাল গাছ দুটো বিক্রি করে দিয়েছে, দিদির পরামর্শে এ সব করে মা, সব টাকা রুমির নামে পাশবুকে রাখছে। আমার মেয়েটাও বড়ো হচ্ছে—আমি যাব কার কাছে! এভাবে কখনো মা, কখনো ধিলু, কখনো পিলু, আপদে বিপদে গাছই যে ভরসা—গাছ কাটতে অনুমতি না দিলে দায়টা যে আমার ঘাড়ে চাপবে বুঝি। নীরাও বোঝে, ওর এক কথা, যা খুশি করুক।

তবে যা খুশি করলেই তো হয় না। বাড়ি যাই, বাবার ঘরটায় থাকি, গাছপালা কাটা হয়ে গেলে কী যে শূন্যতা সৃষ্টি হয় কেউ বোঝেই না। অজুহাতেরও শেষ নেই। ধিলু বড়ো রাস্তার ধারে বাড়ির সামনের দিকটায় আছে—সে নতুন করে গাছ লাগাচ্ছে সামনের দিকটায়। মা বলল, তুই ধিলুকে গাছ লাগাতে দিস না। আমিও বুঝি, জমি দখলের চেষ্টা, বাধ্য হয়ে বললাম, জমি বন্টন নামা হয়নি, গাছ লাগাচ্ছিস তুই!

ধিলুর একেবারে দরাজ প্রাণ, জমি খালি আছে, লাগিয়ে দিচ্ছি। বন্টননামা হলে যার যার জায়গা সেই পাবে। গাছ তো কাটলে বাধা দিতে যাবে না।

অকাট্য যুক্তি। আমার বাবাও গাছ লাগাতে ভালোবাসতেন। ধিলুও গাছ লাগাতে ভালোবাসে। আমি শুধু বললাম, তুই লাগাচ্ছিস ভালো। পরে এই নিয়ে যেন ঝামেলা না হয়।

না না। তুই যা বলবি তাই হবে।

মামলা করতে গিয়েই আদালতের উকিল মুহুরিদের সঙ্গে চেনা জানা হয়ে গেল ধিলুর। সে আদালত চত্বরে ফলের কারবারিও হয়ে গেল। যে দিনের যে ফল। গরমে ডাব, শীতে আঙুর, আপেল বেদানা নেসপাতিও বিক্রি করে। আম, লিচু, কাঁঠালের সময়, লিচু বিক্রি করে, আম বিক্রি করে। বাড়ির গাছের একটা ফল থাকে না। মা শাপ-শাপান্ত করে, তোর সর্বনাশ হবে রে, তুই নির্বংশ হয়ে যাবি। রাতে আমার গাছ কে ফাঁকা করে দেয় বুঝি না! মা গেলেই নালিশ দেবে, তুই অরে কিছু বলবি না। আসলে ধিলু পিলু আমার পায়ে পায়ে

বড়ো হয়েছে, ধিলুর অভাব সে দূর না করতে পারলে আমার সাধ্য কী দূর করি! ছ্যাঁচড়ামি করে যে পেট ভরে না, কলকাতার বাসায় এলে তাও টের পাই। চোখ মুখ শুকনো, যেমন সত্যি চোরের মতো চেহারা হয়ে গেছে—বাসায় ঢুকেই নীচের ঘরের খাটে লম্বা হয়ে যাবে, কথা বলবে না, স্নান করতে যাবে না, জোর করে যেন তাকে স্নানে পাঠানো হয়, খেতে বসানো হয়, রান্নার মেয়েটা পিছু লেগে থাকে। বাড়িতে যে তার স্ত্রীর সঙ্গে অশান্তি হয়, ঠিক মতো টাকা না পাঠালে আমাকে আত্মহত্যারও হুমকি দেয়। ধিলু আমার বাড়িতে এসে যদি কিছু করে বসে, এই এক আতঙ্কও কাজ করে। স্ত্রীর স্কুল, আমার অফিস, বউমাদেরও কলেজ না হয় হাসপাতলে ডিউটি, কাজের লোকরাই সব দেখে, রান্নার মেয়ে প্রভারই দায়—সে বার বার তাগাদা দেবে, যান কাকা, স্নানে যান, খাবেন কখন, খেতে বসুন, এবং সে খায় আবার শুয়ে থাকে, বাড়ি ফিরলে দেখি নীচের ঘরের খাটে লম্বা হয়ে শুয়ে আছে। আমি জানি যে অভিপ্রায়ে এসেছে, তা না মেটা পর্যন্ত স্বাভাবিক হবে না।

কীরে কী খবর?

আর খবর! মেঘার কোনও খোঁজ নাই। মেঘা তার বড়ো পুত্র।

বলিস কী!

কী যে করি! ওর মাসির বাড়ি যাব, যদি সেখানে যায়। এবং আরও নানা অছিলায় আমার মাথায় কাঁঠাল ভেঙে যখন টাকাটি তার হস্তগত হয়, তখন আর তাকে দেখে কে! দ্রুত স্নান টান সেরে, তখন তার খাবারও সময় থাকে না, রাস্তায় খেয়ে নেবে বলে, এবং বের হয়।

মায়ের মৃত্যুর জন্যও ধিলু দায়ী এমন মনে হয় আজকাল। লিচু গাছটায় এত লিচু হয়, যে দূর থেকে মনে হয় এক থোকা মেরুন রঙের ফুল হয়ে গাছটা দাঁড়িয়ে আছে। লিচু চুরি যাবে বলে, রাতে মা ঘুমায় না, বার বার উঠে গিয়ে গাছটার নীচে দাঁড়ায়। হাতে লণ্ঠন, লণ্ঠন তুলে দেখারও চেষ্টা করে। হনুমানেরও উৎপাত আছে, তবে মা আসল হনুমানের চেয়ে ধিলুকেই ভয় পায় বেশি। দুপুরে পর্যন্ত ঘুমায় না, গাছতলায় বসে থাকে। জ্যৈষ্ঠ মাস, বৃষ্টি নেই হাওয়া আগুনের মতো গরম এবং যেন লু বয়, যত কষ্টই হোক মা লিচুগাছ পাহারা দেবেই। এবং এই করে গাছতলা থেকে বারান্দায় উঠে চেঁচায়, এক গ্লাস জল দে রুমি। বলে দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে, রুমি জল নিয়ে এসে দেখে ঠাম্মা, কাত হয়ে পড়ে আছে। কোনো হুঁস নেই মার। তাঁর আর হুঁস ফিরেও আসেনি। মা বোধহয় বুঝেছিলেন, যে ক-টা টাকা পাওয়া যায় লিচু বিক্রি করে, রুমির পাশ-বুকে রেখে দেবেন। মা যে আমার রুমি-অন্ত প্রাণ। রুমির বিয়ে না হোক, তার নামে ব্যাঙ্কে অনেক টাকা জমা রাখার স্বপ্ন দেখতেন মা। সেই স্বপ্নও আমার মা-র শেষ হয়ে গেল।

তারপর যা হয় বাড়িটা আবার আত্মীয়স্বজনে ভরে যায়।

মাটির আটচালা ঘরটির তক্তপোশে শুয়ে কত কথা যে ভাবি, এই মা, আর আমরা তার এই পুত্র। কষ্ট হয়—মায়ের কাজ-কামও ঘটা করে করতে হয়, কারণ তিনি যে বিলুঠাকুরণের মা।

আটচালা টিনের ঘরটাতে গেলেই থাকি। একবার গিয়ে দেখি বড়ো তক্তপোশটা নেই।

ধিলু বলল, বড়ো তক্তপোশটা দুই ভাই ভাগ করে কেটে তাদের ঘরে তুলে নিয়ে গেছে।

কী আর বলি! তবে ছোটো তক্তপোশটা আছে। গেলে সেখানেই শুই। সে ঘরেই থাকি চাল ডাল তেল নুন এক মাসের মতো ধিলুকে কিনে দিই। সকালে ভালমন্দ বাজারও করি। দুবেলা ধিলুর বউই রান্না করে খাওয়ায়। বাড়িতে গাছ বলতে আর বিশেষ কিছু নেই, শুধু জঙ্গল, নারকেল গাছ দুটো শুধু আছে।

নিরানব্বই সালের বন্যায় আমার প্রিয় সেই টিনের আধচালা ঘরটির খুব ক্ষতি হয়। ধিলুর ঘরটিরই বেশি ক্ষতি হবার কথা। নীচু জমিতে তার ঘর। অথচ ধিলুর ফোন পেলাম, সে জানাল, মাটির দেয়াল ফেটে একটা দিক ধসে গেছে। বড়োই ফাঁপড়ে পড়ে গেলাম, ঘরটি মেরামত না হলে বাড়িতে গিয়ে থাকার আর কোনো সুযোগ থাকবে না। বাবা-মা এবং আমরা থেকেছি, সব ভাইবোনেরা এই ঘরটায় বড়ো হয়েছি। এই ঘরেই বাবার মৃত্যু হয়েছে, মাও গত হয়েছেন এই ঘরে। এ তো ঘর নয়, আমার পরমায়ুর প্রাসাদ—ইট গেঁথে পাকা করারও সুযোগ নেই কারণ মাটির ঘরের সৌন্দর্য পাকা বাড়িতে থাকে না। বাবা কিংবা মায়ের কারও ইচ্ছাই ছিল না ঘরটি পাকা হোক।

এই ঘরের মেরামত উপলক্ষেও ধিলু যথেষ্ট টাকাপয়সা নিয়ে গেছে। আশায় আছি, ঘরটি থাকার উপযুক্ত হয়ে ধিলু ফোন করে জানাবে। বাড়ির পাশেই এস টি ডি বুথ থেকে আজকাল সবাই ফোন করে থাকে। আমার বোন বিনি জানাল, দাদা তুই আর টাকা দিস না। তুইও ফতুর হয়ে যাবি।

সত্যি তো দু-তিন মাস হয়ে গেল, নিজের চোখেই একবার দেখে আসা যাক। গিয়ে দেখি ঘরটা আছে। তবে দেয়াল মেরামত হয়নি। ছোট্ট তক্তপোশটাও হাওয়া।

বললাম, মেঝেতেই থাকা যাবে। তোর দুই ছেলে তো এ ঘরে থাকে বলেছিলি।

ধিলুর মুখ করুণ।

ধিলুর বড়ো পুত্র মেঘা বলল, তুমি থাকবে। এই সে দিন একটা এত্ত বড়ো মোটা চিতি ফুলগাছটা থেকে লাফিয়ে পড়ল টিনের চালে। ভয়ে আর আমরা ঘরটায় শুই না।

ধিলু বলল, ঘরে বাড়ির সেই বাস্তু সাপটা আশ্রয় নিয়ে আছে। রাত-বিরেতে পা পড়লে —

পিলু এসে বলল, দাদা, তুই আমার বাড়ি চল। এ ঘরে থাকা ঠিক হবে না। মেঝেতে শুবি কী করে!

ঘরে ঢুকে দেখলাম, দেয়ালের দুরবস্থা। টিনের চাল একদিকে কাত হয়ে আছে।

ঘরটায় আমি থাকলে দখল-স্বত্ব থাকত। ধিলু ঠিক পরিকল্পনামাফিক আমাকে উৎখাত করছে। সব বুঝি। কিন্তু ধিলুকে দেখে আমার কষ্টই হল, সেই লুঙ্গি-পরা বাসি দাঁড়ি গালে।

ধিলু বলল দাদা তুই আমার বারান্দায় থাক। কোনো অসুবিধা হবে না। আমার বাড়িতে লাইট এসেছে। তোর অসুবিধা হবে না। ধিলুর বউ মেয়ে খুব আদর যত্নের মধ্যেই রাখল। খেতে বসলে বউমা বলল, আপনার ভাইঝির বিয়ের কী করবেন। আপনি মাথা না পাতলে আমাদের সাধ্য আছে বিয়ে দিই। নগদই আঠারো হাজার টাকা চায়— তারপর দানসামগ্রী। তা ছাড়া ধিলু বাইরে ডেকে বলল, দাদা বংশের মান সম্মান আর থাকবে না। তোর ভাইঝি এস টি ডি-র ছোকরাটার সঙ্গে পালাবার ধান্দা করছে। আমাকে রক্ষা কর দাদা।

মনে মনে ভাবলাম, এরা আমাকে কী পেয়েছে। আমি পাগল, না ভাইদের উপসারী একজন দানব। আমারও তো সংসার আছে। যদিও আমার পুত্ররা কৃতী তবু কেন যে মনে হল কোনো ছলনা আমাকে গ্রাস করছে।

ন্যাড়া আর বেলতলায় যায়!

বিনি আমাকে ফোনে জানাল, খবরদার দাদা, টাকা দিবি না। তার আগে জমি বন্টননামা করে নে। মেয়েটার বিয়ে হয়ে গেলে, ধিলু তোদের কিন্তু জমির দখল দেবে না। বাড়িতে ঢুকতে দেবে না।

পরদিনই চলে এলাম। আসার আগে সারা বাড়ির কোথায় কী গাছ ছিল মনে করার চেষ্টা করলাম। এক জীবনে একটা বাড়ি ছারখার হয়ে যেতে পারে, আমাদের সেই টিনের আটচালা ঘরটি না দেখলে অনুমান করাই কঠিন। রাস্তায় রিকশায় তুলে দেবার সময়ে ধিলু বলল, দাদা তুই পঁচিশ হাজার টাকা দিলেই হবে। আর তোর কাছে আমি কোনো দিন টাকা চাইব না।

কোনো কথা না বলে রওনা হয়ে রাতের দিকে বাড়ি ফিরে এলাম। অবাক, এসে দেখি ধিলু আমার আগেই কীভাবে বাসায় পৌঁছে গেছে। সে আমার ছোটো পুত্রকে রাজি করিয়েও ফেলেছে। আর ছোটো পুত্রের কথা কখনোই আমি অগ্রাহ্য করি না। তবু কোথায় যেন এক প্রতারকের পাল্লায় পড়ে গেছি এমন মনে হল আমার।

মেয়ের বিয়ে হয়ে যাওয়ার পরই, পিলুকে ধিলু শাসিয়ে গেছে, যে বাড়ি ঢুকবে দখল নিতে লাশ ফেলে দেব। আমাকেও সে ফোনে একই হুমকি দিয়েছে।

জমির দর বাড়ছে। ত্রিশ হাজার টাকা কাঠা। তিন বিঘা জমির দু-বিঘে তার, আর এক বিঘে আমরা ইচ্ছে করলে পাঁচ ভাইবোন নিতে পারি। সেই পিতার প্রকৃত অধিকারী—তার দাবি। সবাই উড়ে গেছে, সেই একমাত্র এই বাড়িতে বসবাস করছে। তা ছাড়া জমি, আমার বাবার অনুমতি দখল, বলতে গেলে খাস জমি—সে, তার দুই পুত্র এবং কন্যা মিলে পাঁচ কাঠা করে কুড়ি কাঠা জমির আইনত উত্তরাধিকারী—তারা এখানে বাড়ি করে আছে। কে হঠায়!

ছোটো পুত্র শুধু বলল, একবার দেশ থেকে উচ্ছেদ, দ্বিতীয়বার পিতৃভূমি থেকে উচ্ছেদ। ভালোই হল।

সারা জীবন দাদার মুখাপেক্ষী হয়ে থাকার চেয়ে এ যে এক আশ্চর্য মুক্তি, আমার তা কে বোঝে!

এখন ফোটার সময়

কোনো কোনো দিন কাকে যে কীভাবে মুখর করে তোলে। চারপাশে মনে হয় ব্যাপ্ত জীবন-আকাশ গভীর নীল, পৃথিবীর অদূরে শুকতারা জ্বলে। দখিনের হাওয়া বয়—মনের মধ্যে কারা কেবল কথা কয়ে যায়—জীবনের চারপাশে অপার এক সৌন্দর্য খেলা করতে থাকে। এরই নাম বোধ হয় জীবনের সুষম্য—কখনো অতর্কিতে সে আসে। আবার গভীর এক রহস্য লোকে সে হারিয়ে যায়।

আজ জানালা খুলতেই পূর্বার এমনটি মনে হল। শীত যাই যাই করেও যাচ্ছে না। বাগানে বড়ো বড়ো ডালিয়া, ক্রিসেন্থিমাম সব ফুটে আছে। শিশির ভেজা। সকাল সকাল তার আজ ঘুম ভেঙে গেছে। এত সকালে তার ওঠার অভ্যাস নেই। মা গায়ের লেপ সরিয়ে না দিলে সে উঠতেই চায় না। সকাল থেকে বাবা ডেকে যান, মা ডেকে যায়, আরে ওঠ। কত ঘুমাবি।

মা বলবে, ঘুম না ছাই। লেপে মাথা ঢেকে শুয়ে আছে। পড়ার ভয়ে উঠছে না।

বাবা বলবেন, উঠে পড়। শুনছিস তো কী বলছে তোর মা।

আসলে পূর্বা জানে বাবা বিশ্বাসই করেন না, সে পড়ার ভয়ে না ওঠার মেয়ে। বাবা কি টের পান, ভোরে জেগে জেগে সে একটা স্বপ্ন দেখে। বাবা না হলে বেসিন থেকে হয়ত মুখ ধুয়ে আসার সময় চোখে পড়ে গেলে মিষ্টি করে হাসেন কেন!

তার ভাবতে লজ্জা লাগছিল।

বাবা এ-সব জানবেন কী করে!

মা জানতে পারে। মার কাছে তার এখনকার পৃথিবীটা পুরোনো পৃথিবী।

কিন্তু বাবা!

সে কেমন তাড়াতাড়ি গা ঢেকে ফেলল। চাদর মুড়ি দিয়ে অলস চোখে বাগানের ফুল ফোটা দেখছিল।

সে ভাবল, ফুল ফোটে।

সে ভাবল, তার এখন ফোটার বয়স।

সে জানালায় দাঁড়িয়ে গাছপালার ফাঁকে সূর্য ওঠা দেখল। কত সব পাখি উড়ে যাচ্ছে দূরের আকাশে। সবাই বের হয়ে পড়েছে। সে টের পায় সুদূরের সব সৌন্দর্য এখন তার সারা গায়ে শীত হয়ে জড়িয়ে আছে। সে ভিতরে ভিতরে আজ ভারি শীত অনুভব করল।

বাবা সকাল আটটায় বের হয়ে যান।

বাবা বোধহয় বাথরুমে। ঘড়িতে সে দেখল সত্যি বেলা হয়ে গেছে। সাতটা বাজে। শীতের সকালে সাতটা খুব বেলা নয়। তবু বাড়িতে সকালের দিকে খুব তাড়াহুড়ো থাকে। বাবা বের না হয়ে যাওয়া পর্যন্ত এটা চলে। সে দরজা ভেজিয়ে দেয়, দরজা বন্ধ করে শুতে তার কেমন এখনো ভয় লাগে। বাড়িতে সে মা বাবা, আর দুজন কাজের লোক। ওরা রান্নাঘরের ওদিকটায় থাকে। সবার আগে ঘুম ভাঙে মার। মারই কাজ সবাইকে ডেকেডুকে তোলা। করিডোরে হাঁটাহাঁটির শব্দ হলেই তার ঘুম ভেঙে যায়। মার ডাকাডাকিতেও ঘুম ভাঙে। তাদের দিকটায় কোলাপসিবল গেট। রাতে শোবার সময় মা সেটা বন্ধ করে দেয়। কারণ বাবা-মা কেউ বোধ হয় কাজের লোক দুজনকে বিশ্বাস করে না। মেয়ে বড়ো হয়ে উঠছে, না চোর বাটপাড়ের ভয় কোনটা, সে বোঝে না। সুদামদা নিরীহ গোবেচারা মানুষ, আর নন্দ তো বুড়ো হয়ে গেছে। কতকাল হল আছে!

আজ নিনি মাসিরা আসবে। শীতের সময় নিনি মাসি, মেসোমশাই, অরূপদা এখানে একবার বেড়াতে আসেন। ফুল ফোটা দেখার সময় এ-কথাটা মনে হতেই ভেতরে সে কেমন চঞ্চল হয়ে উঠল। এমন চাঞ্চল্য সে কেন জানি কোনোদিন অনুভব করেনি! তার হাই উঠছিল।

আসলে বড়ো হবার সময় কত অকারণে মনের মধ্যে নিশিদিন কি যেন এক রূপকথার জগৎ ভেসে থাকে। অরূপদার ভারি ফাজিল স্বভাব। মাথায় গাঁট্টা মেরে কথা বলবে। বছর খানেকের বড়ো। তবু যেন তার কত খবরদারি।—এই পূর্বা, আবার জানালায় মুখ বাড়াচ্ছিস!

গাড়িতে যাবার সময় বাবা মেসো সামনে। সে মাসি অরূপদা আর মা পেছনে। সব সময় সে জানলার পাশে বসতে ভালোবাসে। অরূপদা তার সঙ্গে। সে দশ ক্লাশে উঠেছে। এবার। অরূপদার দশ ক্লাস শেষ। অথচ খবরদারিতে একেবারে বাবা মেসোর মতো!

আবার!

পূর্বা জানালার কাচ নামিয়ে মুখ বাড়িয়ে চারপাশের বাড়িঘর গাছপালা দেখতে ভালোবাসে। হু হু করে হাওয়া বয়। চুল ওড়ে, যেন এক ড্যাং ড্যাং বাজনা শুরু হয় ভিতরে। আর তখনই অরূপদার শাসনের গলা, ইস আবার!

চার পাশে তখন রা রা করে যেন বাজনা বাজতে থাকে 'আবা'র মিউজিক—ক্যান ইউ হিয়ার দ্য ড্রামস ফারনানডেজ। ওর তখন চোখ বুজে আসে। আবার কানে ভাসতে থাকে সেই অলৌকিক জগতের বাজনা-কিংবা সংগীত-সিনস মেনি ইয়ারস আই হ্যাভেন্ট সিন ইউ লাইং ফোল্ডিং ইউর হ্যাণ্ডস। অথবা নিল ডায়মন্ডের সেই সব সঙ্গীতমালা, ইউ আর দ্য সান, আই অ্যাম দ্য মুন, ইউ আর দ্য ওয়ার্ডস, আই অ্যাম দ্য টিউন। প্লে মি।

আসলে বাবা কী বুঝতে পারেন, এই খেলা তার জীবনে শুরু হয়ে গেছে। নতুবা আয়নায় এতবার মুখ দেখে কেন! বাথরুমে ঢুকলে বের হতে ইচ্ছে হয় না। আয়নায় সে কত ভাবে যে নিজেকে এই বছর দুইয়ের মধ্যে আবিষ্কার করে ফেলেছে। সারা শরীর দেখার মধ্যে আশ্চর্য এক মজা পায়। চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকতে আয়নার সামনে ভালোবাসে। বাবা কি টের পেয়ে গেছেন কেউ তার জীবনে সকালের সব পবিত্রতা নিয়ে জেগে উঠছে। ঠিক সূর্যের মতো। যেন লালা আভা, দিগন্তবিস্তৃত শস্যক্ষেত্র, কীটপতঙ্গের আওয়াজ, ঝাঁকে ঝাঁকে নিরন্তর পাখিদের ওড়াউড়ি কোন এক সুদূরের জগতে নিয়ে চলে যায়— বাবা কি সকালে মুখ দেখলেই এ-সব টের পান! এবারে সরস্বতী পূজার সময় বাবা না হলে তার জন্য হলুদ পাড়ের সাদা জমিনের শাড়ি কিনে আনলেন কেন! বললেন কেন, পূর্বা তুমি এই শাড়িটা পরে অঞ্জলি দেবে!

তখনই মার গলা পেল।

— কীরে এয়ারপোর্টে যাবি নাকি!

পূর্বার মনে হল মাসিদের আনার জন্য এয়ারপোর্টে গাড়ি যাবে। সব বারই সে মা-বাবার সঙ্গে যায়। নিনি মাসি মার বোন নয়। ছেলেবেলায় একসঙ্গে মানুষ, মার তো আর কেউ নেই। তার একটা মামা পর্যন্ত নেই। নিনি মাসিকেও দেখে বোঝা যাবে না, কথায়-বার্তায় এমনকী ব্যবহারে, নিজের বোনের চেয়েও বেশি। বোম্বেতে গেলে ওদের মাসি ছাড়তেই চায় না। যেমন কলকাতায় এসে মাও ছাড়তে চায় না নিনি মাসিকে। ক-টা দিন বাবার চেম্বার, নাসিংহোম সব কেমন ঢিলেঢালা। কখনও দীঘা, কখনো মুর্শিদাবাদ, আবার কখনো পিকনিক করতে চিড়িয়াখানায়। নানা রকম প্রোগ্রামে দিনগুলি ঠাসা থাকে।

কেন জানি সে বলল, আমি যাব না মা। তোমরা যাও।

মার কথা বলার সময় নেই। বাবার ঘরে উঁকি দিয়ে বলে গেল পূর্বা যাচ্ছে না। শরীরটা বোধ হয় ভালো নেই।

শরীর ভালো নেই বললেই বাবা সব বোঝেন। তখন আর কেউ তাকে পীড়াপীড়ি করতে সাহস পায় না।

এই শরীর ভালো না থাকার মধ্যেও সে দেখেছে বাবা মজা পান। সে যে গিয়ে বলবে, ধূস, তোমরা যে কী না, আমার শরীর ভালো নেই কে বলল! এমনি যেতে ইচ্ছে করছে না। দু-বছরে সে কত বড়ো হয়ে গেছে বাবা-মা বুঝবে কী করে। এই তো সেবারে অরূপদারা এল, তার ঘরে অরূপদা সব কিছু নিয়ে টানাটানি করত। তার ছবির খাতা, অ্যালবাম, ক্যাসেট, রেকর্ডপ্লেয়ার যা কিছু সবই হাঁটকাত। এটা না, ওটা। কী কেবল 'আবা'র রেকর্ড দিচ্ছিস। 'বনি-এমে'র রেকর্ড দে না শুনি। সেই গানটা বাই দ্য বিভারস অব ব্যাবিলন, অথবা সেই রেকর্ডটা, নেভার চেঞ্জ লাভার এট মিড-নাইট। কেন যে এ গানটা এত ভালোবাসত অরূপদা। না দিলে কাড়াকাড়ি শুরু করে দিত। অরূপদা রেকর্ডটা বাজাবেই। সে কিছুতেই দেবে না—কী বিশ্রী গান! না ওটা না। এটা শোন, 'আবা'র সেই রেকর্ড দিলে, অরূপদা সুইচ অফ করে দিত। এটা তোর খুব ভালো গান, না! ইউ আর দ্য ওয়ার্ডস, আই অ্যাম দ্য টিউন! এই একটাই বুঝেছিস!

হ্যাঁ বুঝেছি। যাও। ভাল লাগে না শুনবে না। তোমাকে কে শুনতে বলেছে! জোর করে পূর্বা সুইচ টিপে দিলে অরূপদা ফের ওটা আল্লা করে দেবেই। সে যতবার দেবে ততবার। তখন দুজনেরই গলা সপ্তমে। মাসি দেখ অরূপদা আমার সঙ্গে কী করছে!

ডাইনিং টেবিলে দুই বন্ধুতে ছেলেবেলার গল্পে মশগুল—মাঝে মাঝেই পূর্বার ঘর থেকে হাঁক আসছে—ওরা দু'জনেই চিৎকার করে ওঠে এখন, আবার শুরু হলো শম্ভু-নিশুম্ভু যুদ্ধ।

আমাকে মারছে।

এই অরূপ মারছিস কেন?

না মা, মারছি না। মিছে কথা বলছে। তারপর আরম্ভ হতো দু-জনের মধ্যে রেকর্ড নিয়ে কাড়াকাড়ি-ধস্তাধস্তি।

সে কিছুতেই রেকর্ডটা বাজাতে চাইত না। গানটার মধ্যে কি যেন এক নগ্ন নির্জনতা লুকিয়ে আছে। অরূপদাটা যে কী! কিছু বোঝে না! ছেলেমানুষির চূড়ান্ত। পাশের ডাইনিং স্পেসে মা- মাসি, ঘরে সে আর অরূপদা—এমন একটা গান বাজছে শুনলে মা-মাসি কী না মনে করবে। নেভার চেঞ্জ লাভার এট মিড-নাইট। এই মিড-নাইট কথাটাই কেন জানি আজকাল তাকে ভারি হন্ট করে। কতদিন ঘুম আসে না। ছটফট করে। কখনো মধ্যরাতে ঘুম ভেঙে গেলে আর ঘুম আসতে চায় না। দুবছরে সে বুঝেছে, কেন অরূপদা গানটা এত ভালোবাসে। মধ্যরাতে মানুষের ভিতর এক আশ্চর্য নির্জনতা জেগে ওঠে। বোধ হয় এই বয়সে এটা বেশি হয়। মনে হয় সে এবং কেউ কোনো নদীর ধারে, কিংবা গভীর বনের অভ্যন্তরে হেঁটে চলে যাচ্ছে। সব সবুজ বৃক্ষ, লাল নীল ফুল ফুটে আছে চারপাশে— আবার খড়ের বন, বন পার হলে নদীর চরা—বালিয়াড়ি, দু-পা বালির ভিতর ঢুকিয়ে নদীর

জলকল্লোল শুনতে পায়। শরীর তখন তার অবশ হয়ে আসে। অথবা স্বপ্নে সে এমন সব কিছু দেখে ফেলে যা ঘুম ভাঙলে মনে হয় কি যে একটা অসভ্যতা সে করে ফেলেছে। বাবা কি তার চোখ দেখলে, রাতের স্বপ্নের কথাও টের পান। তখন সে কেন জানি বাবার দিকে মুখ তুলে তাকাতে পারে না। আশ্চর্য এক অপরাধবোধে সে বাবাকে দেখলেই মুখ নিচু করে পাশ কাটিয়ে চলে যায়।

বাবা দরজার পাশে এসে বললেন, তুমি তবে যাচ্ছ না।

তোমরা যাও। আমার যেতে ভালো লাগছে না।

বাবা এরপর আর কোনো প্রশ্ন করবেন না সে জানে। মায়ের মতো বলবে না, তোমার কি শরীর খারাপ! জ্বরজ্বালা না হলে বাবা তার শরীর খারাপ নিয়ে কোনো প্রশ্ন করে না। শরীর খারাপ কথাটা একজন নারীর পক্ষে কত দূরের খবর যে বয়ে আনে— বাবা বুঝবে কী করে! যদিও ভারি অস্বস্তি হয় তার তখন। কেবল শুয়ে থাকতে ইচ্ছে হয়—অথবা র্যাক থেকে গল্পের বই নিয়ে মুখ ঢেকে রাখতে ইচ্ছে হয়—কেমন এক আলস্য সারা শরীরে জড়িয়ে থাকে তখন। আজ তার সে সবের কিছুই হয়নি। বরং সে আজ একটু বেশি ছিমছাম। এক হপ্তাও হয়নি, সময়টা পার হয়ে গেছে। দু-তিন হপ্তার জন্য নিশ্চিত। সে ইচ্ছে করলে সহজেই বের হয়ে পড়তে পারে।

কিন্তু কেন যে সে বলল, যাবে না, মাথায় কিছুতেই আসছে না। তার খুবই ইচ্ছে করছে, বলে, সে যাবে। কোথায় যেন একটা সূক্ষ্ম বাধা তাকে আটকে রাখছে। কেন এই সংকোচ সে ঠিক বুঝতেও পারছে না। দু-বছরে সে কতটা যে বদলে গেল! আগে সে এতটা ভাবতই না। সবার আগে গিয়ে সেজেগুজে বসে থাকত। ফ্রক গায়, বব করা চুল, সাদা মোজা, আর হালকা প্রসাধন মুখে। মেসো গাড়িতে ওঠার সময় তার দিকে তাকিয়ে বলত, ব্লুমিং মাই গার্ল। এবারে কী বলত! অরূপদা প্রথম দিকে কেমন একটা আলগাভাব দেখাত। যেন চেনেই না। তারপর দিন যেতে না যেতেই অসুরের মতো উপদ্রব শুরু করে দিত। কোথায় কোনো সিনেমায় কোন নায়ক কীভাবে হাঁটাচলা করে, কিংবা কথা বলে সব নকল করে দেখাত। তারপর মজা করার জন্য বলত, মার দেঙ্গা। কেইসে তুম হো! আর তখনই তার রাগ বাড়ত। একদম হিন্দি বলবে না। তোমার এমন কথা শুনলে আমার বন্ধুরা হাসবে। আসলে পূর্বা বাংলা মিডিয়ামে পড়ে। ইংরেজিটা ভালো আসে না। অরূপদার সব কথাই হয় ইংরেজি না হয় হিন্দিতে। সে বলে দিয়েছে, আড়ি। এ কীরে বাবা, বাংলা বলতে পার না।

পারি। থোড়া থোড়া।

আবার ইয়ার্কি হচ্ছে!

আচ্ছা বাবা বাংলাই বলব। তোর এত রাগ কেন বুঝি না!

রাগ আবার কী! ও-ভাবে কথা বললে, কাছের মানুষ তোমরা মনেই হয় না।

কত সহজে সে বলতে পেরেছে অরূপদাকে, কাছের মানুষ! অরূপদার সেই থেকে কেমন একটা অধিকার জন্মে গেছে। মতো তার ঘরে এসে এটা ওটা ধরে টানাটানি করত। তুই আজকাল খুব হালকা নভেল পড়ছিস দেখছি। তারপর হেডলি চেজ থেকে আরম্ভ করে হ্যারল্ড রবিনস, আরভিং ওয়ালেস, এমনকী আরও আধুনিক লেখকদের নাম করে বলত, পড়বি। একটা বই দিয়েছিল অরূপদা, দু-পাতা পড়েই শরীর কেমন গোলাচ্ছিল। মেয়েদের এ-সব কথা এ-ভাবে লেখা যায়। নোংরা! তুমি এ-সব পড়ো। ছি!

পড়তে বারণ করছিস!

একদম পড়বে না।

কেন পড়লে কী হয়!

নষ্ট হয়ে যায়।

নষ্ট হওয়াটা কী মজার তুই বুঝিস না।

আমি বুঝি।

বুঝিস! আরে ব্বাস, মাই গড, তুই এত বুঝিস জানতামই না।

এবারে তবে জেনে রাখ।

কথাগুলো বলতে হয় বলে বলা। সে এত কিছু ভেবে বলেনি। শুধু বলেছিল, এসব বই পড়লে তুমি নষ্ট হয়ে গেছ ভাবব।

বাবা মাও তো পড়ে।

যা!

সত্যি বলছি।

পূর্বা কেমন অবাক হয়ে যায়। মানুষের কাছে এটা তো এক মুগ্ধ জীবনের প্রকাশ। ভারি গোপন। সবাইকে জানিয়ে দিলে এর সব স্নিগ্ধতা যেন নষ্ট হয়ে যায়। গভীর গোপন এই সৌন্দর্যকে নিয়ে চটকালে ফুলটা বিবর্ণ হয়ে যাবে না! এমনই ভাবে পূর্বা। অরূপদা ভালোবাসে বলেই 'আবা'র বনি-এমের রেকর্ড কিনে এনেছিল—এই কী বাজাচ্ছিস, আজ জ্যোৎস্না রাতে সবাই গেছে বনে। কী গান রে বাবা। চল তোকে 'আবা'র রেকর্ড কিনে দিচ্ছি। আশ্চর্য মিউজিক। রেকর্ডগুলো এনে বাজাবার সময়, আঙুলে তুড়ি মেরে কেমন

গলা মিলিয়ে গাইত। পূর্বার মনে হত অরূপদা বড়ো কম বয়সে অনেক বেশি জেনে গেছে। মাঝে মাঝে রাগ হলে বলত, ইঁচড়ে পক্ব।

সেই অরূপদারা আসছে।

গাড়ি বের হয়ে যাবার শব্দ পেল পূর্বা।

পূর্বা এখন কী করবে বুঝতে পারছে না। বাথরুমে ঢুকে স্নান সেরে নিলে হয়।

নন্দ বলল, দিদিমণি চা।

সে চা না খেয়েই বাথরুমে ঢুকে গেল। সেই বড়ো আয়না। সে ছোটোবেলা থেকেই আয়নাটা দেখে আসছে। মাথা সমান একটা উঁচু আয়না দেয়ালের সঙ্গে সাঁটা—আগে বুঝত না, বাথরুমে এত বড়ো একটা আয়নার কী দরকার! যত বড়ো হচ্ছে তত বুঝতে পারছে আয়না আছে বলেই সে নিজের সব কিছু এত খোলামেলা দেখতে পায়। আগে সে বাথরুমে ফ্রক প্যান্টি খুলতে পর্যন্ত লজ্জা পেত। সে খুলত না। বাবাকে মনে হত, বুদ্ধির ঢেঁকি। আর জায়গা পেলে না! এত বড়ো আয়না এখানে! এখন বুঝতে পারে আয়নার রহস্য! আয়নাটা না থাকলে বাথরুমের আসল সৌন্দর্যটা নষ্ট হয়ে যেত। বাথরুমে ঢুকলেই আয়নায় সে তার নারী মহিমা টের পায়।

সে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে আজ নিজেকে একটু বেশি মনোযোগ দিয়ে দেখল। আশ্চর্য, আয়নার অদুরে কেউ দাঁড়িয়ে হাসছে। এই ফাজিল ছেলে, ওখানে কেন। মারব। সরে যাও বলছি। ছিঃ তুমি কী! যাওনা। নানা। ও-ভাবে না। আমি ও-ভাবে ভালোবাসি না।—পাশ থেকে? না না আমি মরে যাব। ও-ভাবে না! তুমি কী বোকা! এই পাগলের মতো কী করছ! আঃ।

সে কতক্ষণ আয়নার সামনে চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিল জানে না। কখনো চড়াই উৎরাই পার হয়ে গেছে কারো হাত ধরে, কখনো কোনো নির্জন দ্বীপে সে আর অরূপদা। একটা বোটে করে চলে গেছে। এক উলঙ্গ পৃথিবীর বাসিন্দা দুজনে। সবুজ প্রান্তর পার হয়ে ছুটে গেছে প্রজাপতি ধরতে। আবার কখনো সমুদ্রের তরঙ্গমালায় ভেসে যেতে যেতে চিৎকার করে উঠেছে, আমি ডুবে যাচ্ছি কেন। আমাকে কে তলিয়ে দিচ্ছে। সমুদ্রের গভীরতা খুঁজে পাচ্ছি না অরূপদা! আর তখন অরূপদার ক্ষীণ গলা শুনতে পাচ্ছে, গভীরতার খবর আমি রাখি। আমি আছি বলেই তোমার এই গভীরতার সন্ধান দিতে পারব। আমরা আছি বলেই তোমার এই রহস্যময় গভীরতা পৃথিবীতে জন্মের ইশারা ডেকে আনে।

নন্দ ডাকছে তখন, ও দিদিমণি, খাবার ঠাণ্ডা হয়ে গেল।

তার হুঁশ ফেরে।

সে বের হয়ে এল শাড়ি পরে।

নন্দ বলল, কী সুন্দর লাগছে দিদিমণি! সরস্বতী ঠাকরুণ একেবারে।

এই মারব!

তুমি একেবারে দুগগা ঠাকুর হয়ে গেছ দিদিমণি!

মারব বলছি।

আসলে পূর্বার মনে হচ্ছিল দুগগা ঠাকরুণ না ছাই। বাথরুমে কত রকমের অসভ্য চিন্তা করেছে। ওটা ভালো না। নিজেকে বড়ো ছোটো মনে হয়। অথচ না ভেবেও কেন যে থাকতে পারে না। অসভ্যতা ভেবেও সে স্থির থাকতে পারে না। ভাবতে ভাবতে কখন অবশ হয়ে আসে শরীর। পিচ্ছিল এক নদীপথে ভাসমান নক্ষত্রমালার স্বপ্ন দেখতে দেখতে তার ঘুম চলে আসে। নন্দ তা বুঝবে কী করে! সে খুব সাহসী না। সে এখনও দরজা ভেজিয়ে শোয়। বন্ধ করে শুতে ভয় পায়।

আর তখনই সিঁড়িতে হৈ-চৈ করে উঠে আসছে কারা। অরূপদার গলা পাওয়া যাচ্ছে। সিঁড়ি ভেঙে দোতলায় উঠলেই দেখতে পাবে তাকে। তাড়াতাড়ি নিজেকে কেমন লুকিয়ে ফেলতে ইচ্ছে হল। কেন যে সোজাসুজি ছুটে গিয়ে বলতে পারছে না—অরূ-প-দা, কি মজা, তোমরা এসে গেছো! এবারে তোমাকে নিয়ে কাকুলিয়া পার হয়ে চলে যাব। কাঁচা রাস্তা, তারপর আর গাড়ি চলে না। আমরা হেঁটে যাব। গ্রামটা কী সুন্দর! সব গরিব মানুষের বাস। ওখানে আমার এক বন্ধু থাকে। বাবা তার পড়ার খরচ চালান। বড়ো হোস্টেলে থাকে। বাবা মাঝে মাঝে আমাদের ওখানে নিয়ে যান। এবার আমি তোমায় সেখানে নিয়ে যাব। ওর বাবা মা কী ভালো। সামনে পুকুর, তেঁতুল গাছ কী প্রকাণ্ড, তার ছায়া কী গভীর আর কী ঠাণ্ডা! তেঁতুল গাছের নীচে আমরা দুজনে চুপচাপ বসে থাকব।

আর তখনই গলা পাওয়া গেল, এই পূর্বা তুই কোথায়।

সে আয়নায় নিজের মুখ দেখে চুলে সামান্য চিরুনি চালিয়ে বের হয়ে বলল, তালে এসে গেলে!

আমরা ভাবলুম, তোর আবার কোনো অসুখ-বিসুখ নাকি!

তুই গেলি না!

পূর্বা কিছু বলল না।

অরূপদাকে কিছু না বললেও আসে যায় না। নিজেই অজস্র কথা বলে যাবে। কে কী কথার জবাব দিল তোয়াক্কা করে না। দু-বছরে মানুষ সত্যি দ্রুত বদল হয়ে যায়। অরূপদা

আরও লম্বা হয়েছে। ঢ্যাঙা, লম্বু। চুল ব্যাকব্রাস করা। নরম নীলাভ দাড়ি গালে অল্প অল্প। প্রায় নবীন সন্ন্যাসী গেরুয়া পরলে। পূর্বা ঠিক চোখ তুলে তাকাতে পারছে না।

আবার অরূপদার কথা, এই আয়। তোকে মা ডাকছে বাবা খোঁজাখুঁজি করছেন।

পূর্বা জানে ওরা এখন বসার ঘরে। বসার ঘরটা করিডোরের শেষ প্রান্তে। সিঁড়ির মুখেই। মা ওদের জলখাবার করার জন্য ব্যস্ত। বাবা বসে শহরের যান-জট নিয়ে কথা বলছেন। বাবার এক কথা, যে ভাবে পপুলেশন বাড়ছে, বামফ্রন্ট কেন, কোনো সরকারেরই ক্ষমতা নেই সমস্যার সমাধান করতে পারে।

প্রায় যেন অরূপদাই তার হাত ধরে টেনে নিয়ে গেল। সে যেতেই মেসো বলল, দেন মাই ফেয়ার লেডি, কেমন আছ!

পূর্বা হেসে বলল, ভালো।

— পড়াশোনা কি রকম চলছে?

— ভালো।

আসলে পূর্বা এর চেয়ে বেশি জবাব দিতে পারছে না। এবারে মাই ব্লুমিং গার্ল না বলে, মাই ফেয়ার লেডি বলছে। সে কেমন নিজের মধ্যে অতর্কিতে ড্রাম পেটানোর শব্দ শুনতে পায়। সে বড় হয়ে গেছে। শাড়ি পরলে বড়ো দেখায়। আর বোধ হয় ঠিক ফ্রক গায় সে আর তাদের সামনে দাঁড়াতে পারবে না। আসলে মেয়েরা শাড়ি পরলে অনেক বড়ো হয়ে যায়।— সে প্রায় ছুটেই বের হয়ে গেল। বলল, আসছি।

আসলে জীবনের এই মাধুর্য কেউ জানে না কখন জেগে ওঠে। রান্নাঘরে এসে সে এটা-ওটা মাকে এগিয়ে দিচ্ছে।

মা অবাক!—কী রে তুই। তোকে এ-সব কে করতে বলল! যা ওদের সঙ্গে গল্প করগে। ওরা কী ভাববে!

অরূপ রান্নাঘরে ঢুকে বলল, আন্টি তোমার মেয়ে পালিয়ে এল কেন?

কী জানি! জিজ্ঞেস করে দ্যাখ, কেন পালিয়ে এল!

আমার ইচ্ছে। বলে সে আবার মাকে কাজে সাহায্য করতে গেলে তার মা কেমন বিরূপ হয়ে উঠল।—সব ভাঙবে। ইস তোমাকে কে বলেছে! কবে ঢুকেছ! মেসোকে গিয়ে বল হাত মুখ ধুয়ে নিতে। ওদের ঘরগুলো দেখ ঠিক আছে কি না!

পূর্বা ঘর হয়ে এল। মা বুঝতেই পারছে না, সবার কাছে সে ধরা পড়ে গেছে। অরূপদার চোখ কি রকমের বন্য, মেসোর চোখে অপার প্রশান্তি, মাসির স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলার মতো যেন বলা, যাক তবে বড়ো হয়ে গেলি! অরূপদার বন্য চোখ দেখলে সে

কেমন অস্থির হয়ে উঠছে। অরূপদার ঘরটায় সব ঠিক আছে কি না—পাট করা সাদা চাদর বের করল, বালিশের ওয়াড় পাল্টে দিল, সামান্য ঝুল ছিল কোণায়, নিজেই তা পরিষ্কার করার সময় দেখল অরূপদা হাজির। তাকে অরূপদা এক দণ্ড কোথাও একা থাকতে দিচ্ছে না।

এই।

বল!

এখানে এ-সব কী হচ্ছে!

কী করব।

চল না সেই রেকর্ডটা বাজাই।

কোনটা?

কিস মি, কিস মি।

না।

কেন না।

বললাম তো না।

অরূপ বলল, দেন লেট মি কিস ইয়ু বলে হাত ধরে টানতেই পূর্বা কেমন ক্ষেপে গেল, ছোটোলোক! ইতর!

অরূপ কেমন ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেল। সে মাথা নীচু করে বসে থাকল। পূর্বা ছুটে বের হয়ে গেছে।

পূর্বা নিজের ঘরে এসে কেমন হাঁপাতে থাকল। সে বলতে চায়নি। সে এত ছোটো নয়, তবু কেন যে এমন কুৎসিত ভাবে অরূপদাকে অপমান করল! কী তার হয়েছে! সে তো চায় কোনো কাশবনের গভীরে অরূপদাকে নিয়ে প্রবেশ করতে— সে তো চায়, আকাশের নীচে একজন মানুষই তার সর্বস্ব কেড়ে নিক— তবু কেন, সে এ-ভাবে মানুষটার খোলামেলা স্বভাবে আঘাত দিতে গেল। নিজের মধ্যে এ-ত সব বৈপরীত্য কাজ করে কেন! কেন! সে প্রায় বিছানায় হুমড়ি খেয়ে পড়ল। বালিশে মুখ চাপা দিল। এমন সুন্দর মানুষটাকে অপমান করে এসে বিষের জ্বালায় নিজেই জ্বলছে।

সে-দিনই রাতে প্রথম পূর্বা তার দরজার ছিটকিনি আটকে ঘুমাতে গেল। জীবনে আর একটা নতুন ভয় এবার তার সামনে হাজির। সবাই জেনে গেছে এই বয়সেই বালিকারা নারী হয়ে যায়। আর মাঝরাতে ঘুম ভেঙে গেলে সে শুনতে পেল সুদুরে সেই মিউজিক

বাজছে, আই অ্যাম দ্য সান, ইউ আর দ্য মুন, আই অ্যাম দ্য ওয়ার্ডস, ইউ আর দ্য টিউন। মিউজিক শুনতে শুনতে নারীমহিমায় চোখের জলে ভেসে যাচ্ছিল পূর্বা। — প্লে মি।

পৃথিবী তারপর শব্দগন্ধহীন

ছুটির দিনে সুবিনয় অন্যরকমের। অন্য দিনগুলোর মতো সে সেদিন কিছুতেই তাড়াহুড়ো করে না। ঘুম থেকে উঠতে তার দেরি হয়ে যায়। বিছানায় এ-পাশ ও-পাশ করার স্বভাব। সে সকালে সেদিন বাজারে পর্যন্ত যায় না। নিবারণ বাজার করে আনে। ওর তখন সারাটা সকাল কেবল চিৎকার চেঁচামেচি। সিগারেটের প্যাকেটটা কোথায় গেল। বুক পর্যন্ত চাদর টেনে শুসে থাকার স্বভাব। ছ-দিনের খাটাখাটনি একদিনে সে পুষিয়ে নিতে চায়। সে সেদিন কুটোগাছটি পর্যন্ত নাড়তে চায় না।

আর যখন মা থাকে না, পলু থাকে না তখনও সে এ-ভাবে জীবন কাটাতে ভালবাসে। ছুটির দিনে সে বাড়িতে খায় না। নিবারণকে খাবারের পয়সা দিয়ে দেয়। সে কোনো হোটেলে খেয়ে নেয়। সন্ধ্যা সকাল বিকেল এখন শুয়ে থাকা। কোনো গল্পের বই পেলে কথা থাকে না। গল্পের বই পড়তে পড়তে কখনও মনে হয় আজকাল কেউ তাকে ডাকছে।—বিনুদা, দরজা খোলো। আমি অপু। আর তখনই এক আশ্চর্য বিষণ্ণতা। মাথার ভেতর মনে হয় গির্জার ঘন্টা বাজছে। অথবা মনে হয় রেলগাড়ি চলে যাচ্ছে দূরে। অথবা কোনো প্রপাতের শব্দ। সে তখন চুপচাপ শুয়ে থাকতে ভালোবাসে। আসলে কেউ তাকে ডাকে না—সে এটা বুঝতে পারে।

তারপর যা হয়, বিকেল গড়িয়ে গেলেই বিনু আর শুয়ে থাকতে পারে না। জানালা খুলে দিলে বুঝতে পারে বিকেলের সূর্য রেল-ইয়াডের ও-পাশে নেমে গেছে. গাছের ছায়া লম্বা হয়ে যাচ্ছে। ছোটো ছোটো সব ফুলের সমরোহ চারপাশে। ফুলগুলো সব সে ঠিক চেনে না। শহরে এদিকটাতে কোথাও কোনো সবুজ মাঠে সব সুন্দর সুন্দর বাড়ি। লনে কোথাও মেয়েরা টেনিস খেলছে। সে জানালা খুললে এসব দেখতে পায়। মেয়েরা টেনিস খেললে ওর দেখতে ভীষণ ভালো লাগে।

সে কখনও কখনও এ-ভাবে বিকেলটা কাটিয়ে দেয়। সামনে অ্যাসফালটের কালো রাস্তা কোথায় চলে গেছে সে যেন সঠিক জানে না। রাস্তার দু-পাশে কোথাও কলের চিমনি, কখনো সাইরেনের শব্দ, আর কখনো সব গাড়ি হুসহাস বের হয়ে যাচ্ছে। তখন নিবারণ আসে, হাতে এক কাপ চা। —দাদাবাবু চা আপনার।

সে চোখ তুলে তাকায়। নামটা মনে করতে পারে— নিবারণ। নিবারণ অনেকদিন ওর সঙ্গে থেকে গেল। অনেকদিন কোনো মানুষ একসঙ্গে থেকে গেলে আপনি মায়া গড়ে ওঠে। অপু তার সঙ্গে অনেকদিন ছিল। ছুটির দিনগুলো তখন এত একঘেয়ে মনে হত না। বড় সহজে ছুটির দিনগুলো তার শেষ হয়ে যেত। তারপর কেমন রাখতে হয়—এই এতটা অ্যান্টি লিখব, নইলে পাবলিক নেবে না, কিন্তু লাইনটা খুব মোটা করে টানা আছে, দাস ফার অ্যান্ড নো ফার্দার।

রাত্রি আর একটু গভীর হয়ে এসেছে, কলধ্বনি এখন শান্ত, আর সেই শান্ত পরিবেশে নক্ষত্রখচিত আকাশের নীচে উঠেছে সেতারের মৃদু ঝঙ্কার। কার্পেটের ঠিক মাঝখানে বসেছেন আলি সাহেব, তার চোখ বোজা আর শীর্ণ আঙুলগুলো ওঠানামা করছে সেতারের গা বেয়ে—কোমল মৃদু সেই স্পর্শ, যেন অভিমানী প্রিয়ার কপট ঘুম ভাঙানোর জন্যে প্রেমিকের ভীরু সঞ্চার।

আশে পাশে ছড়িয়ে আছে অনেক সুশ্রী তনু। অনেক কোমল মুখশ্রী নরম আলোয় আরও স্নিগ্ধ দেখাচ্ছে। অন্ধকারে হঠাৎ ঝিলিক দিয়ে উঠেছে কোনো নাকছাবি বা কর্ণভূষণ। তালে বা বেতালে মাথা নাড়ছেন লম্বাচুলের কোনো কোনো পুরুষ, আর্টক্রিটিক তারা বা কোনো সংস্থার কর্ণধার, কবি বা চিত্রাভিনেতা—তারা সকলেই বিশিষ্ট এবং বুদ্ধিজীবী।

একটু দূর থেকে লক্ষ্য করছিল জয়তী কার্পেটে না বসে সে বসেছে কোণের একটা হেলানো চেয়ারে। পরনে তার রূপোলি পাড়ের গোলাপি বেনারসি, হাতে কানে গলায় হিরের ঝিলিমিলি। মুখে তার তৃপ্তি মাখানো—সবাই এসেছে, সবাই—এমনকী জয়ন্ত ভৌমিক অবধি। কি মায়াবী এই রাত্রি, কি মধুর এই সেতার, কী মোহন এই পরিবেশ... কিন্তু কিছু কি এতো ভালো লাগত যদি না এরা সকলে উপস্থিত থাকত? উষ্ণ ঘন মদের মতো এই উৎসবের প্রতিটি মুহূর্ত নিঃশেষে পান করছিল সে। এই পরিমণ্ডল রচনা করতে পারার ক্ষমতা তাকে নেশা ধরিয়ে দিচ্ছিল। স্বপ্নালু চোখ তুলে আকাশের দিকে তাকালো জয়তী।

সেতারের ঝঙ্কার দ্রুত থেকে দ্রুততর হচ্ছে।—প্রিয়ার ঘুম ভেঙেছে বুঝি, প্রেমিকের আবেশ নিবিড় হয়েছে, অভিলাষ তীব্র থেকে তীব্রতর। তারারা আলো আরও উজ্জ্বল, সুরের মূর্চ্ছনা ঢেউয়ের মতো উঠছে আকাশপানে। নূপুর পরা কচি পদপল্লব ছন্দে ছন্দে মৃদু স্পন্দিত হচ্ছে। নিঃশব্দচারী বেয়ারারা স্ন্যাকস আর ড্রিংকস বদলে বদলে দিয়ে যাচ্ছে।

আপনার গ্লাস যে খালি, সোমনাথ আস্তে বলল। আরে না-না, আপনি ব্যস্ত হবেন না। সে কী কথা, সোমনাথ গ্লাস নিয়ে উঠল, আর তক্ষুনি তার মাথা ঘুরে গেল। দু-এক

সেকেন্ড সব অন্ধকার, তারপর কোণের বার-এর দিকে এগিয়ে গেল। আজকাল প্রায়ই এরকম হচ্ছে। ডাক্তার দেখিয়ে চেক-আপ করব তারই বা সময় কই? ব্যাঙ্গালোর যাবার আগে একবার—ভিড় গোলমাল আর সহ্য হয় না। জয়তী জানে সব, তবু কিছুমাত্র বিবেচনা নেই। সেতারটা কিন্তু সত্যি সুন্দর বাজাচ্ছে, সোমনাথের কপাল মুহূর্তের জন্যে মসৃণ হল, সহসা তাকে তরুণ দেখাল।

...তীব্র গভীর উন্মাদনা... তারপর মধুর মধুর ক্লান্তি। ধীরে ধীরে লীয়মান হল সুরের রেশ সেই প্রশান্তির বক্ষে। নিঃশ্বাস পড়ল টেবিলে টেবিলে আলো উজ্জ্বল হল, আর সুগন্ধী সুসজ্জিত এই সমাবেশ উজ্জীবিত, চঞ্চল, মুখর হয়ে উঠল।

মফতলালের শেয়ার সম্বন্ধে কী বলছিলেন তখন? ওহে, বুলু সেনকে জিজ্ঞেস করো তো রাজাধ্যক্ষ সত্যি কাজ ছাড়ছে নাকি? ওই তো জয়ন্ত ভৌমিক, বাঃ হ্যান্ডসাম সত্যি। মিসেস সিং, এতো দামি প্রেজেন্ট কেন? কিছু না—কিছু না, মেনি হ্যাপি রিটার্নস—

চিকেনটা একটু দেখি, জয়তী আজ তুমি দেখছোই না আমাকে, আমি কিন্তু সেই তখন থেকে— আঃ ছাড় না, কি যে করো সন্দীপ, ডাকছি তোমার গিন্নীকে, ইটস হার্ড অন আস, উই পুওর ইন্টেলেকচুয়লস—

আচ্ছা—খুব এনজয় করলুম, আবার নেকসট ইয়ার, সত্যি চমৎকার কপল। যাই বলো জয়তী যেন একটু—মানে সবই ভালো—তবু যেন একটু, ডোন্ট বি ক্যাটি ডার্লিং—

রাত্রি আরো গভীর, লনের আলো নিভে গেছে। বিশাল হলে ছড়িয়ে আছে সিগারেটের টুকরো, ফুলের পাপড়ি আর রঙিন কাগজ। তাপ-নিয়ন্ত্রিত শোবার ঘরে রাত্রির পোশাক পরে ঢুকল সোমনাথ, বিছানা থেকে জয়তী হাত বাড়িয়ে স্বামীকে কাছে ডাকল।

তোমার জন্যে কী এনেছি বলো তো? জয়তী কৌতুকভারে—ব্রীড়াভরে হাসল, তারপর সিল্কের চাদরের তলা থেকে একটা প্যাকেট বের করে আনল।

সোমনাথ খুলল মোড়কটা, ঝকমকে পিতলের একটা পাত্র বের করল।

কি এটা?

আইস টাম্বলার।—সুন্দর না?

আইস রাখবে কী করে এতে? মুখ তো খোলা, বরফ গলে যাবে না?

গলে যাবে?—আচ্ছা যদি মুখটা ঢেকে দেওয়া যায়?

তবুও গলে যাবে, দেখছ না চারিদিকে পার্ফোরেটেড?

ও—।

আর কোনো কথা হল না। নিঃশব্দ ঘরে এয়ার কন্ডিশনারটার একঘেয়ে গুজন স্পষ্ট হয়ে উঠল।

দুটো একটা শব্দ, হাসি, রিনরিন করে বাজনার মতো যেন কার গলা ভেসে আসে। — এই ওঠো। আর না। প্লিজ ওঠ না।

—এত তাড়াতাড়ি উঠবে।

—মাকে বলেছি পুনুর সঙ্গে সিনেমায় যাব। এখন না ফিরলে ভীষণ ভাববে। তারপরই কানে কানে ফিসফিস করে কথা বলার মতো শব্দ ভেসে আসে—তিনটের শো কটা অবধি থাকে মশাই।

তখন বিনু ঘড়ি দেখত। কানের কাছে এনে দেখত, ঘড়ি ঠিক চলছে, না চলছে না। তারপর বলত, আর একটু বসি। সাতটা মাত্র বাজে। তুমি চলে গেলে ভারি একা হয়ে যাব আমি।

অপু আর কিছু বলতে পারত না তখন। সে তার সব জোর হারিয়ে ফেলত বুঝি। ঘাসের ভেতর সে পা আরও ডুবিয়ে দিত। শাড়ি টেনে আরও পা ঢেকে বসত। অস্পষ্ট আলো থাকত তখন চারপাশে। মাঠের এ-দিকটা ভারি নিরিবিলি মনে হত তাদের। সামান্য ঝোপ-জঙ্গল পাশে। ওরা বেশ সুন্দর করে ছেলেমানুষের মতো কখনো আইসক্রিম খেত, কখনো চা, অথবা কখনো বেলুন উড়িয়ে দিতে ভালোবাসত আকাশে। এবং মাঠের গাছপালার ভেতর ওরা হেঁটে যেতে যেতে কখনও ভারি অন্যমনস্ক হয়ে যেত।

—এই বিনুদা, কী ভাবছ!

—কিছু না।

—তা হলে দাঁড়িয়ে পড়লে কেন!

—দ্যাখো দ্যাখো অপু কি সুন্দর নীল আকাশ! আর কত বড়ো।

অপু বলত, ও আবার দেখার কি আছে।

বিনু বুঝি বলতে পারত, আকাশ মানুষের কাছে সব সময় নীল থাকে না। সব সময় এত বড়ো দেখায় না। অপু তোমার সঙ্গে হাঁটলে, আকাশটাকে ভীষণ নীল মনে হয়, আকাশটা মনে হয় ভীষণ বড়। ইচ্ছে করে তখন আমরা আকাশটা ছুঁয়ে দি। তারপর সহসা ভীষণ সতর্ক গলায় বলত—তোমার আকাশ ছুঁতে ইচ্ছা করে না অপু।

অপু পায়ের নোখে তখন মাটি খুঁড়ত। ওর মুখ দেখা যেত না। স্যাম্পু করা চুলে ওর মুখ ঢেকে থাকত। বিনুর বার বার ইচ্ছে হত চুল সরিয়ে ওর সুন্দর মুখ দেখবে। ওর ইচ্ছে হলেও সে সেটা কিছুতেই পারেনি।

বিনু তখন ভয়ে ভয়ে বলত, তুমি কিছু মনে করলে?

অপু তেমনি মুখ না তুলে বলত, না।

—তবে বল ছুঁতে ইচ্ছে করে কি না?

আপু বলেছিল করে।

আর বিনুর কি যে হত তখন। মাথার ভেতর আবার সেই রিনরিন বাজনা। যেন সে দু-হাতে তখন চারপাশের যা কিছু আছে সব লুটেপুটে নেবে। সে যেন লাফিয়ে লাফিয়ে ছুটবে। সে আর অপু। অপুর শাড়ি তখন বাতাসে উড়বে। আর সুন্দর সব গাড়ি ঘোড়া চারপাশে। তখনও সে আর অপু। কেবল কোথাও কেউ ক্ল্যারিওনেট বাজাবে—তখনও সে আর অপু। পৃথিবীতে শুধু সে আর অপু। আর কিছু সে ভাবতে পারত না। আর কিছু তার মনে থাকত না।

অপু বলত, আমরা তারপর কি করব বিনুদা?

বিনু বলত, আমরা কিছু করব না, শুধু ফুল ছিঁড়ে খাব।

অপু বলত, তুমি ভারি খারাপ কথা বলতে পার বিনুদা।

এ-ভাবে ওরা চুপচাপ কথা বলত। ছুটির দিনগুলো সে অপুকে নিয়ে এভাবে ঘুরত। সে জানত না, অপুরা কখনও প্রবাসী হয়ে যেতে পারে। সে বুঝতে পারত না অপুর বাবা এটা পছন্দ করবেন না। আর অপুর স্বভাবতো ভীষণ নরম। অপু কষ্ট পাবে, কিন্তু কেউ তার জন্য কষ্ট পাক অপু তা চায় না। বিনুর মনে হয় দিনগুলো একইভাবে কেটে যাবে। তার তখন অফিসে সামান্য কাজ, সামান্য বেতন, সে বড়ো বলে দায়দায়িত্ব বেশি। ছোটো ফ্ল্যাট ছোটো সংসার মা আর পুনু। পুনুর সঙ্গে অপুর ভীষণ ভাব অপু পুনুর কলেজের বন্ধু। পুনুই প্রায় এক সন্ধ্যায় অপুকে টানতে টানতে নিয়ে এসেছিল তার কাছে। বলেছিল দাদা এই হচ্ছে আমাদের অপর্ণা রায়। আমরা কলেজের বন্ধুরা ওঁকে অপু ডাকি। ভারি মিষ্টি দেখতে না দাদা।

অপুর দু চোখ ভারি। অপু সেদিন কিছুতেই মুখ তুলে তাকাতে পারেনি। ওকে খুব সুন্দর বলে পুনু কি যে বিপদে ফেলে দিয়েছে। শিরশির করে রক্তচাপ সারা শরীরে তার। সে তো আগেই দেখেছে বিনুদাকে। বিনুদার লম্বা গড়ন, ঘন চুল আর সহজ কথাবার্তা এত বেশি আকর্ষণ করেছিল যে সে একটা কথা বলতে পারেনি।

অপু একদিন বলেছিল, বিনুদা তোমাকে একটা কথা বলা দরকার।

বিনু মুখ তুলে তাকিয়েছিল। ওর মুখে মটন-ওমলেট। সে কথা বলতে পারছিল না।

অপু আবার বলেছিল, বাড়িতে সবাই টের পেয়েছে।

—কী বলছ। প্রায় বিষম খাবার মতো। আর তো তোমাদের বাড়ি আমার যাওয়া হবে না। ভাববে ভীষণ ধূর্ত আমি। বড়োলোকের মেয়েকে ফুঁসলে নিয়ে যাচ্ছি।

অপু খুব গম্ভীর। খাবার নিয়ে নাড়াচাড়া করছে। কথা বলছে না। বিনুও কেমন ভয় পেয়ে গেল। বলল, এই।

—বিনুদা সব কিছু নিয়ে তুমি ঠাট্টা করতে পার। আমি পারি না। ভেবেছি মাসিমাকে বলে তোমার কাছে চলে আসব।

অপুকে ভীষণ সাহসী দেখাচ্ছিল। অপু সেদিন পরেছিল, লালপেড়ে মুর্শিদাবাদ সিল্ক গায়ে নীল রং-এর ব্লাউজ—সাদা রং-এর জমিন ছিল ওর শাড়ির, আর কী যে স্নিগ্ধ লাগছিল ওকে দেখতে। কপালে বড়ো করে আলতার টিপ। সারা মুখ ছিল পবিত্রতায় ভরা। বেশ স্থির গলায় বলেছিল, তুমি তো বিনুদা ভীতুগোছের মানুষ। তোমার সব কিছু জোর করে না নিলে আমি কিছু পাব না।

বিনুর মনে হয়েছিল, অপু ঠিকই বলেছে। অপু এবং সে আলাদা স্বভাবের। অপুর বাবা এটা সহজে মেনে নেবেন না। অপু যত কথা বলতে বলতে গম্ভীর হয়ে যাচ্ছিল তত তার ভয়। ভেতরে যেন খচখচ করে সংশয়ের কাঁটা ফুটছে। প্রাণের ভেতর থেকে কেমন সে আর সাড়া পাচ্ছিল না।

বিনু বলেছিল অপু একটু অপেক্ষা করতে হবে। পুনুর বিয়ে হয়ে যাক। মা শুনলে খারাপ ভাববেন। সংসারে আমি ভীষণ তা হলে স্বার্থপর হয়ে যাব।

অপু বলেছিল, বাবা দিল্লিতে বদলি হয়ে যাচ্ছেন।

—হঠাৎ।

তোমার হাত থেকে বোধ হয় আমাকে বাঁচাবার জন্য। অপু এমন বলতে পারত। সে কিছু বলল না। এ-সব বলে তার বাবাকে বিনুদার কাছে ছোটো করে দিতে পারে না। সংসারে যে অপুকে নিয়ে চাপা অশান্তি চলছে, কিছুতেই কেন জানি মুখ ফুটে কোনোদিন অপু বলতে পারল না। কোথায় যেন এতে ওর পারিবারিক মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হচ্ছিল।

আর বিনু এটা কখনও বুঝতেই পারিনি। সে অপু এবং তার বাবা মাকে স্টেশন পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছিল। অপু তেমনি হাসিখুশি ছিল। সে বুঝতেই পারেনি, অপুকে নিয়ে তার বাবা মা দূরে চলে যাচ্ছে। আর এদিকে সহজে ফিরছে না। সে স্টেশনে গাড়ি ছাড়ার সময় বলেছিল, গিয়েই চিঠি দেবে অপু। তোমার চিঠি পেলে ছুটি নিয়ে চলে যাব।

অপু বলেছিল, আচ্ছা।

তরপর আর অপু তাকে চিঠি দেয়নি। কতদিন হয়ে গেল। সে একটা চিঠির আশায় কতদিন জানালায় দাঁড়িয়ে থেকেছে। চিঠি আসেনি।

তারপর একদিন রোজ দশটা চিঠির মতো একটা চিঠি—তাও মার নামে। অপুর বিয়ে। সরল সহজ নিমন্ত্রণের চিঠি। আর কিছু না। কেয়ার অফ শুধু সুবিনয় মজুমদার। সে অপুকে যে একটা চিঠি লিখবে ভেবেছিল তাও আর পারল না।

এবং এ-ভাবে যখন বিনুর ছুটির দিনগুলো ভীষণ লম্বা হয়ে যেত তখন বার বার মনে পড়ত অপুকে। জানালায় দাঁড়ালেই মনে হয় অপু যেন বার বার তার হাত ধরে আকাশ ছুঁয়ে দেখবে বলছে, সে কিছুতেই পারছে না।

আর এ-ভাবে জানালায় দাঁড়িয়ে সে বুঝতে পারল ক্রমে সূর্য রেল-ইয়ার্ডের ও-পাশে অস্ত যাচ্ছে। গাড়িগুলো টংলিং টংলিং শব্দ করে চলে যাচ্ছে। ক্রমে আকাশ অন্ধকার হয়ে উঠছে। নিবারণ ঘরের আলো জ্বেলে দিচ্ছে এক এক করে। আশ্চর্য শূন্যতার ভেতর সে এখন বেঁচে আছে। পুনুর বিয়ে হয়ে গেছে। মা মাঝে মাঝে তীর্থে চলে যান। এত বড়ো ফ্ল্যাটে সে আর নিবারণ। আর কেউ না। অপু এ-সব একেবারে জানে না। ওর তখন শুধু অপুর নামে একট চিঠি লিখতে ইচ্ছে হয়—তোমাকে পাওয়ার মতো সব কিছু হয়েছে আমার অপু। সুন্দর ফ্ল্যাট, বিশ্বস্ত চাকর ছোট্ট পুলের বাগান, দুটো নীর রং-এর বেতের চেয়ার, একটা ছোট্ট সাদা রং-এর গাড়ি। সবই হয়েছে। তবু ছুটির দিনে আর কোথাও যাই না। বাসাতেই শুয়ে বসে সারাটা দিন কাটিয়ে দিই। কোথাও বেড়াতে বের হলে নিজেকে বড়ো একা মনে হয় অপু। আমার কিছু ভালো লাগে না তখন।

তারপর মনে হয়ে বিনুর অপুকে সে যেন প্রতিদিন এ-ভাবে একটা চিঠি লিখতে পারে। প্রতিদিন একটা করে নীল রং-এর খাম ডাকবাকসে ফেলে দিয়ে আসতে পারে। কোনো ঠিকানা থাকবে না। শুধু নাম লেখা থাকবে অপু। চিঠিটা অপু পেল কি পেল না আসে যায় না। সে চিঠি অপুকে লিখেছে, তার নিজের কাছে এর চেয়ে বেশি দামি আর কিছু নেই। আর যদি কেউ এসে দেখতে পায়, ওর টেবিলে, বালিশের নীচে, ড্রয়ারে সেলফে সর্বত্র, এমন অনেক চিঠি, চিঠি লিখে রাশি রাশি কাগজ সারা ঘরে ছড়িয়ে রেখেছে—অবিশ্বাস করার কিছু নেই। বিনু সময় পেলেই অজস্র চিঠির বেলুন আকাশে উড়িয়ে দিতে ভালোবাসে। আসলে মানুষ বোধ হয় দুঃখ নিয়ে বেঁচে থাকতে ভালোবাসে। সবাই কিনা বিনু জানে না, তার তো বেশ ভালো লাগে।

আর তখনই মনে হয় মার মুখ অভিমানে ফেটে পড়ছে। —বিনু, তুই আর বিয়ে-থা করবিনে। বয়স তোর জন্য বসে থাকছে!

সে হেসে বলত মা বিয়ে বিয়ে করছ, হয়ে গেলেই তো শেষ। সে কখনও ঠাট্টা করে বলত ইস আমার বিয়ে, ভাবতে কি মজা লাগে না। বিয়ের কথা ভাবলেই আর ঘুম আসতে চায় না মা। তারপর সে মায়ের মুখের কাছে মুখ নিয়ে বলত, আচ্ছা মা, বাবার সঙ্গে যখন তোমার বিয়ের কথা হল, ঘুম আসত তোমার?

মা তখন ছোট্ট মেয়েটির মতো ফিক করে হেসে দিত। বলত, নাক ডাকিয়ে ঘুমোতাম।

—মা তুমি সত্যি কথা বলছ না।

—হ্যাঁরে সত্যি কথা। তোর বাবাতো আমার দাদার বয়সি। দাদার সঙ্গে একই স্কুলে পড়ত। আমাদের বাড়িতে বিয়ের আগে কত এসেছে।

—মা—আ, তুমি ভালোবেসে বাবাকে বিয়ে করেছ। সব্বাইকে বলে দেব।

বিনু ভা...ল হ...চ্ছে...না।

তখনই নিবারণ এসে বলল, দাদাবাবু আপনাকে কে ডাকছে। বিনুর চিন্তাভাবনা সহসা ভেঙে খানখান হয়ে গেল। সে বুঝতে পারল, যেমন সে প্রতিদিন ছুটির দিনে বিকেলে জানালায় দাঁড়িয়ে থাকে, আজও তেমনি ছিল। কত কিছু মনে হচ্ছিল তার। নিবারণকে ডেকে বলল, বলতে বল। যাচ্ছি।

পার্লারে ঢুকে সে হতবাক। অপু চুপচাপ বলে আছে। পাশে ছোট্ট অ্যাটাচিকেস। ওর কপালে খুব ছোটো সিঁদুরের টিপ। সে পরেছে মুগা রং-এর মণিপুরী শাড়ি। পায়ে আলতা। আর আশ্চর্য সৌরভে সারা ঘর ম ম করছে। বিনু বলল, অপু, অপু, তুমি।

অপুর চোখ ভারি চঞ্চল। সতেজ। নতুন অভিজ্ঞতা অপুর শরীরে। বিনু আনন্দে চিৎকার করে ডাকল নিবারণ তুই ওকে চিনিস না।

নিবারণ বলল, অন্ধকারে ভালো দেখতে পাইনি বাবু।

বিনু বলল, অপু তুমি এখানে ভাবতে পারছি না।

অপু শুধু বলল, এলাম। তুমি কেমন আছো?

—আমি ভালো আছি অপু।

অপুর বলতে ইচ্ছে হচ্ছিল, তুমি ভালো নেই বিনুদা। তুমি মিথ্যে কথা বলছ। সে এসব কিছুই বলল না। শুধু বলল, মাসিমা, পুনু।

—মা তো এখানে নেই। পুনুর বিয়ে হয়ে গেছে।

—তুমি একা।

—না। বিনু ফের একটু থেমে বলল, আমি আর নিবারণ।

অপু বলল, দাঁড়িয়ে থাকলে কেন? বোস। একা বেশ ভালোই আছ দেখছি।

—এই চলে যাচ্ছে। বিনু কথাবার্তায় কেন জানি আর সহজ হতে পারছে না। সে ঘাবড়ে গেছে।

—তোমার মতো মানুষের চলে গেলেই হল।

তারপর কেউ কিছু বলছে না। চুপচাপ। দূরবর্তী কোনো বনে টুপটাপ পাতা ঝরে পড়ছিল বোধ হয়।

বিনুর তখন মনে হল, অপুর আর আগের স্বভাবে নেই। খোঁচা দিয়ে কথা বলতে শিখে গেছে। অভিজ্ঞতায় ভীষণ সতেজ এবং দু-পাড় ভরে আছে বর্ষার নদীর মতো।

অপু বলল, ভাবলাম যখন কলকাতায় এলাম মাসিমা পুনুর সঙ্গে দেখা করে যাব। কেউ নেই। তুমি একা।

বিনু আবার মনে করিয়ে দিল, না, নিবারণ আছে।

—নিবারণ আছে, আমাকে মনে করিয়ে না দিলেও চলবে।

বিনু বলল, চল তাহলে ভিতরে গিয়ে বসি।

আমি আর একদিন না হয় আসব।

ভিতরে নাই গেলাম।

—আমার সব দেখে যাবে না! আমি কিভাবে বেঁচে আছি দেখে যাবে না!

অপু চারপাশের দেয়াল দেখছে। মানুষটার রুচি আছে। সোফা, ডিভানে কারুকার্যময়

কভার বিদেশি রেকর্ডপ্লেয়ার গমগম করে যেন এক্ষুনি রেকর্ড বেজে উঠবে। আসলে সে কি করবে ভাবছিল। আসলে সে যে গোপনে এখানে চলে এসেছে কথাবার্তায় এতটুকু বুঝতে দিল না।

বিনু বলল, কবে এলে, কোথায় উঠেছ, তোমার কোনো খবরই আমি জানি না। অপু চোখ তুলে এক পলক দেখে নিল মানুষটি তেমনি আছে। এতটুকু স্বভাবে পরিবর্তন নেই। তার মানুষের সঙ্গে এ-মানুষের স্বভাব একেবারে আলাদা। জোরজার করে নিতে জানে না।

বিনু ফের বলল, একটু বসে গেলে তুমি খারাপ হয়ে যাবে না। আমারও ভালো লাগবে।

—সত্যি বলছ! অপুর চোখে সামান্য বিদ্যুৎ খেলে গেল।

—জানি না অপু। তুমি কত বদলে গেছ।

এবার অপু কেমন সাহসী মেয়ের মতো হেঁটে যেতে থাকল বিনুর পাশাপাশি। লম্বা করিডোরে আশ্চর্য সব সুন্দর ছবি, জানালায় মানি-প্ল্যান্ট। বারান্দা পার হয়ে ওরা ডাইনিং

রুমে ঢুকে গেল। পাশে দুটো ছোটো ব্যালকনি। ব্যালকনির পাশে বিনুর শোবার ঘর। সেন্টার টেবিল। বাতিদানে সবুজ ঝালরের ঢাকনা। ফুলদানিতে একটা তাজা পলাশের ডাল। ফুলগুলো লাল টকটক করছে। জানালাগুলো সব বন্ধ।

অপু কেমন সহজভাবে নিঃশ্বাস ফেলার জন্য এক এক করে জানালাগুলো খুলে দিতে থাকল। এখন মনেই হবে না, সে এ-বাড়ির কেউ নয়। জানালা খুলে দেবার সময় একবার ঘাড় ঘুরিয়ে বিনুদাকে দেখল। বিনুদা ভীষণভাবে ওকে দেখছে। কেউ নেই। নিবারণ কোথাও গেছে। ওর শরীরে সেই রক্তপ্রবাহ ফের ঝিম-ঝিম করছে। বিনুদার সঙ্গে আকাশ ছুঁতে ইচ্ছে করছে।

অপু বলল, কি সুন্দর ফ্ল্যাট তোমার বিনুদা। জানালাগুলো বন্ধ করে রাখো কেন! তুমি ভীষণ দেখছি অন্ধকারে থাকতে ভালোবাস।

বিনুর মনে হল জানালা খুলে দিয়ে অপু সবটাই খোলামেলা করে দিল। যদি কোনো ইচ্ছের কথা থাকে, বাইরের মাঠ, দূরের রেল-গাড়ির শব্দ এবং বড় আকাশ কখনো তাদের ছোটো হতে দেবে না। বিনু না হেসে পারল না। ওর কেবল বলতে ইচ্ছে হচ্ছিল অপু বিয়ের পর তুমি আরও সুন্দর হয়েছ। বর্ষার নদীর মতো তোমার এখন পাড়ে পাড়ে কাশফুল। আমাকে সামান্য ফুল তুলতে দেবে না অপু!

অপু কেমন ছেলেমানুষের মতো হাত পা ছড়িয়ে বিনুর বিছানায় বসে পড়ল। বলল বিনুদা, এখানে কখনো আসব, তোমার সঙ্গে কখনো পালিয়ে দেখা করতে পারব স্বপ্নেও ভাবিনি।

বিনু জানালার পাশে দাঁড়িয়ে এখন সিগারেট খাচ্ছে। মাঝে মাঝে চুরি করে দেখছিল অপুকে। অপু কত কথা বলে যাচ্ছে! কিছু শুনছে, কিছু শুনছে না। অপু কেন এখানে এসেছে। তার স্বামী এখন কোথায়, কবে তাকে নিতে আসবে, তার বাবার খবর কী, সে কবে চলে যাচ্ছে ফের, তার কিছুই বলছে না।

বিনু বলল ঠিকানা কী করে পেলে?

—সব খবর রাখি মশাই।

—পুনুর বিয়ে হয়ে গেছে জানতে?

—সব জানতাম।

—সব জেনে এভাবে চলে এসেছ! এটা ঠিক করনি।

অপু আদৌ পাত্তা দিচ্ছে না তার কথা। সে তার খুশিমতো এখানে পালিয়ে এসেছে। সে বলে আসতে পারত, তবু কি যে থেকে যায়, গোপনে কোথাও চলে যেতে এখনও তার

ভীষণ ভালো লাগে। এ শহরে এসে সে এক দণ্ড দেরি করতে পারেনি।

বিনু বলল, কী খাবে?

—কিছু খেতে ইচ্ছে করছে না।

—কিছুই খেতে ইচ্ছে করছে না। বিনু সামান্য দুষ্টুমি করতে চাইল।

—এই খারাপ কথা একদম বলবে না।

—কবে এসেছ এখানে? বিনু সামান্য ঘুরিয়ে দিল প্রসঙ্গ।

—আজই।

—কবে যাবে?

—জানি না।

—মানুষটি কোথায়?

—বাইরে গেছে।

—কবে আসবে?

—বেশি হলে ছ-মাস।

—অনেকদিন গেছে?

—গত মঙ্গলবার। এখন থেকে পুরো ছ-মাস বাবার কাছে।

—খুব কষ্ট তবে!

—আবার! একটু থেমে বলল, বাড়িতে যাবার আগে, তোমার এখানে হয়ে গেলাম। তোমাকে না দেখে যেতে পারলাম না।

—মেসোমশাই তাহলে এখানে।

—বাবা সল্ট লেকে বাড়ি করেছেন।

—তাই!

অপু বলল, এভাবে পালিয়ে দেখা করে গেলাম বলে রাগ করছ না তো! তুমি যা মানুষ। বলেই আগের মতো হাত পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ল অপু। আর আশ্চর্য অপু, বিনুদা ঘরে নেই। সে বলল, তুমি কোথায় বিনুদা?

—এখানে।

—কী করছ?

—চা।

—কেন তোমার নিবারণ?

—ওর চা তুমি খেতে পারবে না।

—আমি বুঝি চা করতে জানি না? বলেই এক লাফে উঠে বসল। বিনুর পাশে গিয়ে বলল, তুমি সরো। কোথায় কী আছে বল। করে আনছি। চা না খাওয়ালে তোমার কিছুতেই যখন চলছে না...

ওরা দুজন-যখন সামনা-সামনি বসে চা খাচ্ছিল ঘরে সামান্য সবুজ আলো, অস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে দুজনের মুখের ছায়া তখন বিনু না বলে পারল না, তুমি না এলে ভালো করতে।

অপু চায়ের কাপ নীচে নামিয়ে রাখল। বলল, তার মানে।

—তুমি খারাপ হয়ে যাও, আমি চাই না অপু।

অপু কেমন বিস্মিত গলায় বলল, খারাপ! খারাপ আবার কী জিনিস!

—তুমি বুঝতে পারছ সব। দোহাই আর ব্যাখ্যা করতে বল না।

অপুর হাসি পাচ্ছিল। ভীষণ, হাসি পাচ্ছিল। বোধ হয় হেসে বলত, তুমি কি বোকা না বিনুদা! কিন্তু সে হাসল না। বরং খুব গম্ভীর হয়ে গেল। বলল, বাজে কথা রাখ।

আর বিনু কত সহজে যে বুঝে ফেলল, অপু আর আগের অপু নেই। অভিজ্ঞতা অপুকে ভীষণ বদলে দিয়েছে। সে শুধু আকাশ ছুঁয়ে দিলেই খুশি না, আরও কিছু চায়। অপুর মুখে চোখে ক্রমে উষ্ণতা জমে উঠছে। বিন্দুমাত্র শিথিলতা উভয়কে গ্রাস করবে। সে বলল, আমি ফুল ছিঁড়ে খেতে ভালবাসি। তুমিও। তবু আমার কাছে তুমি আগের অপু হয়ে যাও।

অপু বলল, আমরা সবাই। তারপর কিছু বলল না। যেন নিজের বাড়ি, নিজের ঘর, এমনভাবে দরজা জানালা সব ফের বন্ধ করে দিচ্ছে। অপুর অহমিকায় লাগছে। তুমি চিরদিন ভালো মানুষ থাকবে, ভারি মজা! আমি ব্যবহারে ব্যবহারে পুরোনো হয়ে যাই, তোমার তাতে বুঝি কিছু আসে যায় না। এসব সে বলতে পারত। ভাবো শুধু ঐশ্বর্য তোমারই আছে, আমার ঐশ্বর্য কিছু নেই! সে এবার বিনুর পাশে দাঁড়িয়ে বলল, নিবারণ কোথায়?

বিনু বলল, অপু নিবারণ রাতে বাইরের ঘরে থাকে। প্লিজ তুমি ছেলেমানুষী কর না।

অপু যে এখন কী করে। সে অপমানে মুখ লুকিয়ে রেখেছে বিনুর পিঠে। এবং বিনু বুঝতে পারলে, এতদিন পর অপু ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

আর তখনই বিনুর কি হয়ে যায়। আবার সেই রিনরিন বাজনা মাথার ভেতর। যেন সে তেমনি অপুকে কাছে পেয়ে দুহাতে সব লুটেপুটে নেবে। সে আগের মতো ফের লাফিয়ে লাফিয়ে ছুটবে—সে আর অপু। পৃথিবীতে সে আর অপু। আর কিছু লাগে না।

বিনু একটা শাদা চাদরে এবার শরীর ঢেকে দিল। নীল রঙের সামান্য বাতিটা জ্বলছে। দূরে সেই রেল-ইয়ার্ডের ঘটাং-ঘটাং শব্দ। ক্রমে নিশীথের সব শব্দ মুছে গেলে শুধু নীল আলোটা জেগে থাকল পৃথিবীতে। অনেক দূরে বনের গভীরে হায়েনারা যেন ডাকছে। আর কিছু না। পৃথিবী তারপর শব্দ গন্ধহীন এক আশ্চর্য পারাবারে নিথর হয়ে আছে।

টিউলিপ ফুল

কার্ডিফে আমরা বিশ-বাইশ দিন ছিলাম। নাকি তারও বেশি। এতকাল পর ঠিক মনেও করতে পারছি না। আমাদের জাহাজ তো কার্ডিফ বন্দরেই ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল। মাল খালাস করার জন্য জাহাজ ছিল ড্রাইভে আর আমরা পোর্টের কাছাকাছি লম্বা একটা টিনের চালায় উঠে গেছিলাম। তিন-চারদিন ছিলাম।

না! বোধহয় আরও বেশি।

স্মৃতি ধূসর হয়ে আসছে। ঠিক মনে করতে পারছি না। অস্বস্তি হচ্ছে ভেবে, ড্রাই ডক করাতে কতদিন সময় লাগার কথা। সাতদিন, দশদিন, না দু-দিনেই শেষ করা যায় কাজটা।

অবশ্য তিন দশক আগে একরকম, এখন অন্যরকম। আমি ছিলাম কয়লা জাহাজের নাবিক। জাহাজের তিনটে বয়লার হাইমাই করে সমুদ্রে রাক্ষসের মতো কয়লা গিলত। এখনতো শুনছি, কয়লায় আর জাহাজই চলে না। হয় মোটর ভেসেল, নয় ডিজেলে চলে।

আমাদের সময় মোটর ভেসেলে নাবিকের কাজ পাওয়াটা সৌভাগ্যের প্রতীক ছিল।

আর আমার তো ছেঁড়া কপাল। পড়বি তো পড়বি এমন জাহাজে, যার সব কিছু লরঝরে বোট-ডেকে উঠতে কতবার যে রেলিঙ খসে পড়েছে। ডেরিক ভেঙে পড়েছে। ইনজিন-রুম চিপিং করতে করতে হয়রান হয়ে গেছি। কখনও বালকেভে চিপিং করার সময় দেখি ফুটো। সমুদ্রের নীলজল দেখা যায়। দৌড়ে উঠে গেছি ইঞ্জিন রুম থেকে। সারেঙকে খবর দিয়েছি। তিনি ছুটে গেছেন মেজমিস্ত্রি লেসলির কেবিনে। মেজমিস্ত্রি তড়াক করে লাফিয়ে নেমে এসেছেন। অন্ধকারে টর্চ মেরে দেখে আবার দু-লাফে সিঁড়ি ডিঙিয়ে সোজা বড়োমিস্ত্রির কাছে। বড়োমিস্ত্রি কাপ্তানের ঘরে। কাপ্তান ইনজিন-রুমে নামছে, নাবিকেরা জড় হয়েছে টুইন-ডেকে। আতঙ্কে সবার মুখ কাল। কারণ ফুটো দিয়ে জল ঢুকে যেতেই পারে।

কশপ, ইনজিন-সারেঙ আর লেসলি তিনজনে মিলে কোনোরকমে জোড়াতালি দিয়ে বলে গেলেন নো চিপিং। সাদা খড়ি দিয়ে দাগ কেটে দিলেন। জাহাজ বন্দরে না ভেড়া পর্যন্ত চিপিং বন্ধ। চকখড়ির দাগ দেওয়া জাহাজটার দিকে যেতেও তখন ভয় করত। জং

ধরে ভিতরে খেয়ে গেছে। বালকেভের প্লেট খুলে আবার লাগানো এবং আমার যতদূর মনে আছে ড্রাই ডকের সময়ই কাজটা সেরে ফেলা হয়েছিল।

দিনক্ষণের হিসাব দূরে থাকুক, রাস্তার নাম, বাড়ির নাম, ক্যাসেলের নাম কিছুই মনে নেই। মনে রাখার বাসনাও ছিল না। একজন অভাবী তরুণের কাছে জীবন তখন ছিল ভারি ক্ষুধার্ত।

সুতরাং কতদিন ছিলাম কার্ডিভ সঠিক বলতে পারব না। আমাদের ভাঙা জাহাজের দুর্গতি দেখলে আমার চোখেই জল চলে আসত। একবার তো পোর্ট-মেলবোর্নে টানা তিন মাস। বড়ো বড়ো অক্সিজেন সিলিন্ডার, দিনরাত হাতুড়ির ঘা, খোলের প্লেট কেটে নতুন প্লেট বসানো, রিপিট মারা কত না হঠকারির তাণ্ডব চলত জাহাজটাতে। কেবল দেখতাম খুলে নেওয়া হচ্ছে, কেবল দেখতাম ছেঁড়া কাথার ওপর সেলাই ফোঁড়াই হচ্ছে। ক্রম বাংকারে মেরামত, বয়লার-চক তুলে নতুন চক বসানো, হুড়মুড় করে কিনার থেকে মিস্ত্রিরা শকুনের মতো খাবলে খুবলে খাচ্ছে জাহাজটাকে। টানা তিনমাস, না আরও বেশি! না তাও মনে নেই।

এখন আর দিনক্ষণের হিসাব মাথায় নেই। শুধু কিছু ঘটনা, কিছু মুখ এই অপরাহ্ন বেলায় মনে পড়ে কিংবা কোনো দৃশ্য। বড়ো একঘেয়ে সমুদ্রযাত্রা। জাহাজে উঠে এটা আরও বেশি টের পেয়েছিলাম।

যেমন ড্রাই ডকের সময় ঘরে বসে গল্পগুজব, বিকেলে বেড়ানো—তখন তো জাহাজিদের হাতে কোনও কাজ থাকে না। খাও দাও ফুর্তি করো। আমার কপালে ফুর্তি বিষয়টা ছিল একটু অন্যরকমের। যে পারিবারিক পরিমণ্ডলে মানুষ তাতে শত হঠকারিতা সত্ত্বেও কোনো নারীর ঘরে রাত কাটানো দুঃস্বপ্নের শামিল।

অথচ ইচ্ছে করত। দুরারোগ্য ব্যাধির আতঙ্ক ছিল তীব্র। যে যার মতো বের হয়ে গেলে আমি কার্ডিফ-ক্যাসেলের পাশ দিয়ে হাঁটতাম। সারা বিকেল, কখনো সন্ধ্যা হয়ে যেত, কত উঁচু পাঁচিল পাথরের—মনে হয় গ্র্যানাইট পাথরে তৈরি প্রাচীন কোনো পুরাতত্ত্ব আমাকে ধাওয়া করত। ফাঁক পেলেই পাঁচিলের পাশ দিয়ে হেঁটে যেতাম। কোনো দোকানে ঢুকে টুকিটাকি জিনিস কিনতাম। কাউন্টারে কোনও যুবতী থাকলে তার সঙ্গে দু-দণ্ড কথা বলার জন্য বসে থাকতাম—কখন তার হাত খালি হবে। অপ্রয়োজনে ফলের দোকানে ঢুকে ফল কিনতাম—কারণ তরুণী আমারই বয়সী। সে বুঝত কি না জানি না, সে আমাকে দেখলেই হাই করে ডাকত।

একজন গরিব বামুনের ছেলের পক্ষে এটা ছিল বিপজ্জনক খেলা। তবু মনে হত যাই। বসি, তার ব্যস্ততা দেখি। কথা বলুক না বলুক, কাউন্টারে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকারও স্বভাব

ছিল আমার। অগত্যা শেষ বেলায় কিছু কেনা কাটা—সে ভারি যত্নের সঙ্গে দুটো আপেল দেবার সময় বলত, গুড-নাইট সেলর।

অথবা কোনো অপরাহ্ন বসে থাকতাম, বন্দরের লাগায়ো পাহাড়ি উপত্যকায়। বসে থাকলে, অনেক জাহাজ এবং দূরের নীল সমুদ্র চোখে ভেসে উঠত। নৌবাহিনীর জাহাজ দেখতে পেতাম, ঘোরাফেরা করছে। আর রংবেরঙের হাজার হাজার পাখির ওড়াউড়ি। কিচির মিচির শব্দ, কখনো রাত হয়ে যেত। সমুদ্রে চাঁদ উঠত। নক্ষত্ররা জেগে থাকত মাথার উপরে। কখনো বেশ রাত হয়ে যেত ফিরতে। ইঞ্জিন সারেঙ ধমক দিতেন, ব্যাটারে কোনখানে গ্যাছিলা! এত রাইত হইল ফিরতে। মন্দ জায়গায় যাও নাইত!

আমি হাসতাম। পিতৃতুল্য তিনি। একদিন তো এনজিন-ভাণ্ডারির উপর খাপ্পা। বাঁধাকপিতে বিটের টুকরো ডুমো ডুমো করে কেন দিয়েছে। বনার্জি খাইব কী দিয়া! যাও মিঞা! ডাল আলুভাজা দিয়া খাইব! তুমি কি চাও পোলাডা না খাইয়া মরুক। তুমি খাইতে পারবা রোজ রোজ।

আমরা মাত্র পাঁচ-সাতজন হিন্দু জাহাজি। বিফ খাই না। সপ্তাহে দু-দিন মটন রেশনে থাকে। বাদবাকি দিনগুলি বিফ। আমার হিন্দু সতীর্থরা পাঁচ-সাত সফর দেওয়া নাবিক। তাদের আটকায় না। আমায় আটকায় কারণ এটাই আমার প্রথম সমুদ্র সফর।

আসলে আমি কেন এত একা ছিলাম, এবং নির্জনতা পছন্দ করতাম এখন বুঝি। হইচই ধাতে একদম নেই। ভালো আড্ডা দিতে পারি না। সংকোচ, এই বুঝি ধরা পড়ে গেলাম। তবু মানুষের তো কিছু চাই। সমুদ্রে আমার দিনরাত ছিল একটাই ভাবনা, আবার দেশে কবে ফিরে যাব। ফিরতে পারব কিনা, এও ছিল ভয়। তাপ্পি মারা জাহাজে উঠেছি, দৈব দুর্বিপাক যেন হাঙরের মতো সবসময় ঘোরাফেরা করত। ক্রস বাংকারে কয়লা টানছি, এক চাকা হুইলের গাড়িতে কয়লা ভরছি, ধুলো ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন, শ্বাস নিতে কষ্ট—বারবার বোঁট-ডেকে উঠে বুক ভরে শ্বাস নিতাম। সমুদ্র দেখতাম—বড়ো নিস্তরঙ্গ। জাহাজ যাচ্ছে, জলকেটে প্রপেলার জাহাজের গতি তৈরি করছে। রেলিঙে ঝুঁকে দাঁড়াতে ভয় পেতাম। পড়ে গেলে প্রপেলার আমাকে ছিন্নভিন্ন করে দেবে। মাংসের টুকরো এবং রক্তের ঘ্রাণ পেয়ে গভীর সমুদ্র থেকে উঠে আসবে হাঙরের ঝাঁক। তাদের কোনোটার পেটে আমার হাত, আমার পা, কিংবা মুণ্ডু। আমি তাদের পেটের বাসিন্দা হয়ে গেছি এমনও মনে হত কখনও। রেলিঙে ভর করে দাঁড়াতে ভয় করত।

দেশে ফেরার পর বন্ধুদের একটাই প্রশ্ন, বন্দরে নারীসঙ্গ করেছি কি না।

আমি হাসতাম।

বলতো লাভ নেই। ‘ইচ্ছে ছিল, পারিনি।’

আর বললে, বিশ্বাসই বা করবে কেন। জাহাজে সফর করতে বের হয়ে কোনো নারী সংসর্গ হয়নি, এটা যেন বন্ধুদের বিশ্বাসের বাইরে। কী করে বলি, ইমানুল্লা বলে একজন মাথার ওপর ছিলেন জাহাজে। জাহাজে ফিরতে দেরি হলে গ্যাংওয়েতে পায়চারি করতেন। দুশ্চিন্তায় অস্থির হয়ে পড়তেন। আমি ফিরে এলে তার প্রশ্ন, 'কই গ্যাছিলি। এত রাত করলি!'

'আর বল না চাচা, সামোয়ার পিকনিক গার্ডেনে চুপচাপ বসেছিলাম। 'কী করে বোঝাই ডাঙা মানুষের কত প্রিয়। গাছপালা, পাখি এবং সুন্দরী বালিকার মুখ আমাকে টানে। জাহাজে ফিরতে ইচ্ছে হয় না। ফিরলেইতো রং বার্নিশের গন্ধ। চিফ কুকের গাফিলতিতে মাংসপোড়ার গন্ধ। আমার যে ওক উঠে আসে।

এমন কথায় তিনি কেন যে ক্ষেপে যেতেন বুঝি না। প্রায় তেড়ে মারতে আসার মতো!

'কেন মরতে আইছিলা জাহাজে। কেডা কইছিল আইতে! ভালো লাগব ক্যান! কার ভালো লাগে। তাই বইলা, এত রাতে ফিরবি। চিন্তা হয় না!'

'আচ্ছা চাচা অযথা রাগ করছ কেন বলত!'

কই গেলি ক'। আমি ছাড়ুম না। জাহান্নামে যাইতে চাস। কষ্ঠ তুই। আমি কেবল ঘর-বার হইতাছি। রাস্তাঘাট ভালো না। তর বুদ্ধি সুদ্ধি কবে হইব। কিছু হইলে ...

কী হবে!

কী হয় না জাহাজে! কত দেখলাম, ঘিলু চিবাইয়া খায়। রাস্তা খুঁইজা পায় না। পরি হুরির দেশ—মাথা ঠিক রাখন সোজা কথা! জাহাজ থাইকা যদি পালানোর চেষ্টা করস পুলিশ দিয়া ধইরা আনমু! আমার নাম ইমানুল্লা। আল্লার বান্দা। তারে ছাড়া কারে ডরাই ক!

'ঠিক আছে, মাথা গরম করবেন না। আমি বের হচ্ছি না। কি খুশি!'

'বাইর হইতে বারণ করছি। মন-মেজাজ বলে কথা! তা ঘুইরা ফিরা দেখবি। ফাঁইসা যাবি না।'

জাহাজে দুর্ঘটনার শেষ থাকে না। ওই তো পাশের জেটিতে কে গ্যাংওয়ের সিঁড়ি থেকে পড়ে গিয়ে জলে ডুবে গেল। নেশা করে উঠতে গিয়ে পা হড়কে গেছে। আমাদের জাহাজ থেকে দুজন বেপাত্তা। আসলে জাহাজ বিলাতে এলেই অনেকে পালায়। আমি না আবার কিছু করে বসি।

'এই বনার্জি শোন।'

কাছে গেলে বললেন, 'বড়টিন্ডাল তরে কু-পরামর্শ দেয়!'

কুপরামর্শ অবশ্য দেয়। বড়োটিন্ডাল অবশ্য ভাবে এটা তার সৎ পরামর্শ। বড়টিন্ডালের সঙ্গে দেখা হলেই এক কথা, দেশে ফিরা করবাডা কী। বার্সিগ্রামে আমার খালাত ভাই আছে, তার কাছে চইলা যাও। সে হিল্লা কইরা দিব। লেখাপড়া জানা পোলা তুমি, একবার যখন আইসা পড়ছ ফিরা যাওন ঠিক না। বার্সিগ্রাম যে আসলে ব্লিসিংহাম পরে জেনেছিলাম।

ড্রাই-ডকের সময় বড়োটিন্ডাল দু-দিনের ছুটি নিয়ে বার্সিগ্রামে তার মেমান বাড়িতে ঘুরে এসেছে। মেমান নিজেও এসেছিলেন। কী একটা রেস্তোরাঁর মালিক। বিবি সঙ্গে। মেমসাব। কন্যা সঙ্গে মেমসাব। টিন্ডাল সাব তাঁর বালিকা ভাইঝিটির সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবার সময় বলেছিলেন, বামুনের বেটার দশা দ্যাখ। সে তো বাংলা বোঝে না। সে আমার দিকে শুধু তাকিয়েছিল—তার অপরূপ লাবণ্য, এবং কাল চুল, গভীর নীল চোখ কোনও মায়াবী দ্বীপের কথা মনে করিয়ে দেয়। সারা দিন সে আমাকে নিয়েই শহরে ঘুরেছে। কেনাকাটা করেছে। কখনই মনে হয়নি আমি একা। স্টেশনে তাকে তুলে দিতে গিয়ে মনটা এত খারাপ হয়ে গেছিল—কী বলব—যেন সে আমাকে ইশারায় থেকে যাবার আমন্ত্রণ জানিয়ে গেছে।

ওর কথা আমার মনে হয়।

সে পরেছিল সাদা রঙের ভয়েলের স্কার্ট। লালরঙের জ্যাকেট। উরু পর্যন্ত নাইলনের মোজায় পরম স্নিগ্ধতা বিরাজ করছিল। আশ্চর্য ঘ্রাণ শরীরে। বিদেশি পারফিউমের এমন মৃদু সৌরভ এর আগে কখনো টের পাইনি।

ট্রেনটা চলে যাবার পরও আমি স্টেশনে চুপচাপ বসেছিলাম। হঠাৎ আমার মা-র দু-চোখ কোথা থেকে যেন উঁকি দিয়ে গেল। চারপাশে ভাই, বোনেরা দাঁড়িয়ে আছে। ডাকছে—দাদারে ফিরবি না। বসেই থাকবি।

সম্বিত ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গে একটা ঝাঁকুনি খেলাম। দেখি সারেঙ সাব পেছনে দাঁড়িয়ে।

বললেন, মন খারাপ!

না না।

ওঠ। চল। মন খারাপ করিস না। দেখবি দেখতে দেখতে দিন কাইটা যাইব।

সেই থেকে তিনি সতর্ক হয়ে গেলেন। বড়োটিন্ডালের সঙ্গে তাঁর অসাক্ষাতে কথা বললেই ক্ষেপে যান তিনি।

সম্ভবত আমি কার্ডিফে গেছিলাম জুন-জুলাইয়ে।

দু-পাঁচদিন বেশ রোদ, হালকা মেজাজ মানুষের—সুন্দর মনে হয়েছে মানুষের ঘরবাড়ি। ঘোরাঘুরিও মন্দ চলছিল না। তারপর টানা বিশ-বাইশ দিন সূর্যের মুখ দেখাই গেল না। প্যাচপ্যাচে বৃষ্টি। টিন্ডাল ডাকলেই টের পাই সারেঙ সাব একবার ঠিক উঁকি দিয়ে গেছেন।

টিন্ডাল বলেছিল, 'কি রে যাবি? তিন চার মাস পুলিশের চোখে ধুলা দিয়া থাকতে হইব। কইরা ব্যবস্থা খালাত ভাইসাব করে দিব কইছে।'

যদি রোদ থাকত এবং ঝলমলে আকাশ কিংবা এত শীতের কামড় না থাকত হয়তো থেকে যেতাম। আর যখন জানতে পারলাম, সূর্যের মুখ দেখা সৌভাগ্যের সামিল, তখনই মনটা দমে গেল। চোখের উপরতো দেখছি শুধু সারাদিন ঝিরঝিরে বৃষ্টি। টানা বিশ-বাইশ দিন এমন দুঃসহ অভিজ্ঞতার পর আর পালাবার ইচ্ছে হয়নি। বড়োটিন্ডালতো একদিন খোদ ভাইঝিকে নিয়ে ফের হাজির। জাহাজে মেয়ে উঠে এলে চাঞ্চল্য দেখা দেয়। কিন্তু বড়োটিন্ডাল গোমড়ামুখো মানুষ, বেয়াদপি একদম পছন্দ না। তাঁর ভাইঝি নাজিরা আমাদের সঙ্গে খেলল। গল্প করল, জানাল—যদি যেতে চাই, তার বাবা ব্যবস্থা করে দেবে। তার বাবার লেখা একটা চিঠিও সে আমাকে দিল। তখনই কেন যে শুনতে পাই, দাদারে বাড়ি ফিরবি না!

না আমার পালানো হয়নি।

আসলে মন্দ কপাল। ঘরমুখো মন, এই যে জাহাজে ভেসে পড়েছি শুধু একটি দুর্গত পরিবারকে রক্ষা করার জন্য। অন্তত আমার তখন এমন অবস্থা মুরুব্বির জোর নেই কলোনিতে থাকি, গরিব মানুষের ঘরে টিউশনি জোটে না, কোনোরকমে, আই এ পাস যুবক—অর্থাভাব, কিছু একটা করতে হয়।

কিছু একটা করতে হয় বলেই জাহাজে উঠে পড়। তার আগে হালিশহরে ট্রেনিং, ভদ্রা জাহাজে ট্রেনি, জাহাজে ওঠার ছাড়পত্র, সি ভি সি সংগ্রহ এতসব করার পর জাহাজ।

পাঁচ-সাত মাসও হয়নি। সেই কবে কলকাতা বন্দর থেকে জাহাজে উঠেছি। যেন কতকাল আগে, যেন কোনো পূর্বজন্মে ঘটনাটা ঘটেছে, এ জন্মে আমি নাবিক, এই অস্তিত্ব ছাড়া আর কিছু টের পাই না। আঠারো-উনিশ বছর বয়সের যুবক স্বপ্ন দেখতে ভালবাসে, সমুদ্রে ঘুরে বেড়াবে, এমন স্বপ্ন দেখতে ভালোই লাগত। জাহাজে উঠে টের পেলাম, বাড়ির কথা মনে হলেই মন খারাপ হয়ে যায়।

কলম্বো হয়ে ডারবান, কেপটাউন। মাস দুই লেগে গেছিল। এক নাগাড়ে মাসখানেক সমুদ্রে, শুধু জল আর জল—ইঞ্জিন রুম থেকে উঠে আসছি, ওয়াচ শেষ, বিধবস্ত। ঝড় সাইক্লোন, ডেকের ওপর কয়লা, জাহাজ দুলছে, তবু কয়লা টেনে নিয়ে যেতে হবে ইঞ্জিন রুমে। কখনো রক্ত বমি—নিস্তার নেই। জাহাজে মার মার কাট কাট লেগেই থাকত। সি-

সিকনেস বড়োই কঠিন আপদ। সব সামলে সমুদ্রে ঘোড়সওয়ার আমি কখনই ভেঙে পড়ি না।

কেবল মাঝে মাঝে প্রশ্ন—ডাঙা কবে পাব।

ডাঙার কথা বললেই সারেঙ সাব মুখ গোমড়া করে থাকতেন। ভাঙা কী এত মধুর তিনি যেন বুঝতেই পারেন না। ডাঙা মানেতো জাহান্নামে যাওয়া। নেশা, নয় কার্নিভেলে ঘোড়া জুয়ার ঠেকে আটকে পড়া, আর রাতে পরি হুরির কব্জায়। তার চেয়ে যেন এই অনন্ত অসীম সমুদ্র তার কাছে খুবই পবিত্রতার কথা বলে। পাঁচ ওক্ত নামাজ তিনি সকাল আর সাঁজবেলায় সেরে নেন। সাইক্লোন থাকলে মেসরুমে মাদুর পেতে, না থাকলে ফল্কার উপর মাদুর বিছিয়ে তিনি যখন ছাড়ান, মাথায় কুরুশ কাঁটায় নকশা তোলা সাদা টুপি, পরনে লুঙ্গি, গায়ে সাদা পাঞ্জাবি এবং মুখে সাদা দাড়ি—যেন কোনও ফেরেস্তা। এই জাহাজ, এই সমুদ্র, এমনকী আরও গভীর নৈঃশব্দে ডুবে যাওয়া প্রাণীকুলের জন্য তাঁর মোনাজাত—আমাকে উদ্বুদ্ধ করে। ঈশ্বর প্রীতি হয়তো মানুষকে কোনো বড়ো জায়গায় নিয়ে যেতে পারে—কিন্তু আমি হঠকারি যুবক, না ভেবেচিন্তে জাহাজে উঠে পড়ায় তিনি খুশি না।

বুয়েন্সএয়ার্স বন্দরে জাহাজ ভেড়ার দিন তিনি আমাকে ডাকলেন। এত বেশি খবরদারি কখনও বিরক্তির কারণ হত। তিনি সোজা বলে দিলেন, 'জাহাজ ছেড়ে বেশি দূর যাবি না। হারিয়ে গেলে আমি কিচ্ছু জানি না।'

'হারাব কেন চাচা। আমাকে কী ভেবেছেন!'

শোন কিচ্ছু ভাবিনি। তোর ভালোর জন্যই বলছি। কেউ তোর কথা বুঝবে না। একটা লোকও বাংলা-ইংরেজি কিছু বোঝে না!

তার মানে।

লোকগুলো ইংরেজি জানে না। হাতের ইশারায় কথা বলতে হবে। পারবি। তুইও বোবা, তারাও বোবা। ভাষা না জানলে এটা হতেই পারে।

দূর থেকেই মেঘমালা ভেসে ওঠে আকাশের গায়, বুঝি সামনেই বন্দর। প্রথমে দিগন্ত রেখায় এক টুকরো মেঘ ভেসে থাকে তারপর জাহাজ যত নিকটবর্তী হয় ধীরে মেঘ থেকে যেন বৃষ্টির ফোঁটা আলাদা হবার মতো—বোঝা যায় ঘরবাড়ি, বোঝা যায় জেটি, বোঝা যায়, জাহাজ নোঙর ফেলান আছে। প্রথমে মাস্তুল, পরে চিমনি, আরও পরে মানুষজন।

রাতের বেলাতে আলোর মালা পরে থাকে—ঢেউ ওঠে নামে, জাহাজে ওঠা-নামা করে—আমরা টুইনডেকে শুধু দাঁড়িয়ে থাকি। ওয়াচ না থাকলে, সারা সকাল, অথবা দুপুর

এমনকী গভীর রাতেও উঠে যাই উপরে। সামনে ডাঙা। জাহাজিদের কাছে এর চেয়ে বড়ো সুখবর কিছু নেই।

সারাক্ষণ জাহাজের আফটার পিকে, খোলা ডেকে, নয় ফল্কার ওপর বসে থাকা, তাসের আড্ডা। কখনও, কেউ কেউ কোরান পাঠও করেন। যে যার মতো ডাঙার প্রত্যাশায় বসে থাকে।

আমারও মন আনচান করে।

জাহাজ বাঁধাছাঁদা হলে সারেঙ সাব বলেছিলেন, 'বসে থাকবি কেন। যা ঘুরে আয়। মন হালকা হবে।'

'আপনি যে বললেন, কথা বোঝে না কেউ।'

বেশি দূরে যাস না। দেবনাথ বনার্জীকে নিয়ে যা। আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, ডাঙায় পা রাখলে জাহাজিদের আয়ু বাড়ে।

ডাঙায় পা রাখলে জাহাজিদের আয়ু বারে এটা হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছি। জাহাজ কলকাতা থেকে ছাড়ার পর কী যে ঝড়ঝঞ্ঝা, সমুদ্র উথাল-পাতাল, কলার খোলের মতো বে অফ বেঙ্গলে জাহাজের পিচিং—তারপর কী অমানুষিক কষ্ট, চারঘন্টার ওয়াচ দিতে পাঁচ ঘন্টা লেগে যায়, কাজ শেষ করতে পারি না—কয়লা টেনে ফেলছি 'সুটে', আর হড়হড় করে নেমে যাচ্ছি। জাহাজের দুলুনিতে মাথা তুলতে পারছি না। তবু 'সুটের' মুখের দিকে সতর্ক নজর। কারণ মুখ থেকে কয়লা নেমে গেলেই, স্ট্রোকহলভে হাইহাই হয়ে যায়। তিনটি বয়লার কেবল কয়লা গিলছে। স্টিম পড়ে যাচ্ছে। টন টন কয়লা পুড়িয়েও স্টিম ধরে রাখা যাচ্ছে না। ঝড়ের দরিয়ায়, আমার মতো পয়লা সফরের জাহাজির যে প্রাণান্ত হবে যেন এটা প্রথমে টের পেয়েছিলেন সারেঙ সাব।

কিছুতেই তিনি সঙ্গে নিতে রাজি না।

জাহাজ পাচ্ছিলাম না।

হাতে 'সি ভি সি' নিয়ে রোজ শিপিং অফিসে 'মাস্তারে' দাঁড়াচ্ছি। জাহাজ আসছে, ক্ল্যান লাইন, সিটি লাইন, বি আই কোম্পানির জাহাজ। জাহাজের সফর সেরে ফেরা জাহাজিরা নেমে যাচ্ছে। নতুন জাহাজি রিক্রুট হচ্ছে। আমিও সেই আশায় মাস্তারে দাঁড়াচ্ছি রোজ। আমার চোখ মুখ দেখছে। 'নলি' দেখছে। সমুদ্র সফরের কোনো অভিজ্ঞতা নেই। শরীরে বামুনের রক্ত। কিংবা শরীর শক্ত কিংবা ঋভু নয়, যে জন্যই হোক, বুড়ো কাপ্তান কিংবা যুবা চিফ ইঞ্জিনিয়ার কারও আমাকে পছন্দ নয়—পারবে না, ভালো করে দাঁড়ি-গোঁফ ওঠেনি ছেলের, সে আর কতটা কাজ পারবে। বমি টমি করে অসুস্থ হয়ে পালাবার জন্য

মরিয়া হয়ে উঠবে। এমনও ভাবতে পারে। যাই হোক রোজ মাস্তার দেওয়াই সার যখন, এবং মাসখানেক ধরে শিপিং অফিসে যাচ্ছি, বুড়ো মানুষটা লক্ষ করে থাকতে পারে।

তিনিই একদিন ক্যান্টিনে ডাকলেন, 'এই যে ব্যাডা রোজ আইসা লাভডা কি! পারবা না। জাহাজের মার মার কাট কাট সহ্য করতে পারবা না! দড়িয়ায় পানি সহ্য হইব না। কেডা তোমারে বুদ্ধি দিছে, জাহাজে যাইতে!'

কী বলি, বুদ্ধিটা যে কারও নয়, বুদ্ধিটা যে আমারই এবং একজন উদ্বাস্তু পরিবার এ-দেশে এসে জলে পড়ে যাবার পর, আমিই যে একমাত্র বাবার সক্ষম পুত্র তার কাজ বসে থাকা নয়, যা হয় করে কিছু উপার্জন করা এ-সব একে একে তিনি জানতে পারলেন বলেছিলেন, 'করবি'। জাহাজে গেলে না, পাক হয়ে যাবি। না-পাক অর্থ কী পরে বুঝেছিলাম। পাক কথার অর্থ পবিত্র, না-পাক মানে অপবিত্র।

তিনি আরও বলেছিলেন, 'তোর বয়সটা ভালো না।'

আমি তাঁর পাশে বসে থাকতাম। জাহাজের নানাবিধ গল্প বলতেন। বলতেন তাঁরা চায় পুরুষের জাহাজি। তাঁরা বাধা দিলেন, সিটি লাইনের সারেঙ। তিনি নিজেও আমার বয়সে জাহাজে উঠে এসেছিলেন।

এবং তিনি যখন বুঝতে পারলেন, আমি নাছোরবান্দা তখন একদিন বলেই ফেললেন, ঠিক আছে, আমার জাহাজ আসছে, ওতে যাবি। বলে তিনি কিছুক্ষণ চুপচাপ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলেন!

তারপর কী ভেবে বলেছিলেন, 'জাহাজটা কয়লার জাহাজ। ধকল খুব। পারবি!'

'আমার তখন এক কথা, পারব।'

'ওয়াচে তিন টন কয়লা খায় কসবিটা।'

ওয়াচ অর্থাৎ চার ঘন্টায় তিন টন কয়লা যায়।' কসবিটা কে বুঝতে অবশ্য কষ্ট হয়নি— আসলে জাহাজটাকেই তিনি কসবি হয়তো বলেছেন। কসবি কথাটা মন্দ কথা। এটাও বুঝেছিলাম। জাহাজটাকে তিনি কখনও ইলিশের বাচ্চা বলে গাল পাড়বেন। যেন জাহাজ না, একটা আস্ত শয়তানের বাচ্চা। এবং দুজন মাত্র সারেঙ আছেন, যারা এই শয়তানের বাচ্চার মেজাজ ঠান্ডা রাখতে পারে।

এমন একটা জাহাজে তিনি আমাকে নিতে অবশ্য শেষ পর্যন্ত রাজি হলেও, মুখে তার প্রায়ই দুশ্চিন্তার রেখা ফুটে উঠতে দেখতাম। জাহাজিদের ওপরওয়ালা বলতে সারেঙ। তার সুপারিশ থাকলে জাহাজ পেতে অসুবিধা হয় না। শিপিং অফিসে মাসখানেক যাতায়াত করেই তা টের পেয়েছিলাম।

যেদিন জাহাজ এল, তিনি ডেকে বললেন, ভেবে দ্যাখ, যাবি কি না! পরে দোষ দিতে পারবি না।

'বললাম তো পারব। আমি নিজের ওপর কিছুতেই আস্থা হারাতে রাজি না।'

তিনি আমাকে বলেছিলেন, লরঝরে জাহাজ। সারাদিন ঠায় খাটুনি। বন্দরে গেলেও রেহাই পাবি না। স্মোকবক্স পরিষ্কার করতে জান কয়লা হয়ে যাবে।

তাঁর ওপর মাঝে মাঝে তখন থেকেই আমি বিরক্ত। বড়ো বেশি ভাবনা! আমি তার কে, এমন মনে হত। এই যে তিনি বুয়েন্সএয়ার্স বন্দর ধরার আগে বললেন, যাবি। বের হবি। না বের হলে চলবে কেন! ডাঙায় নামলে জাহাজিদের আয়ু বাড়ে—হাড়ে হাড়ে এটা টের পেয়েছি জাহাজে থেকে। দিনের পর রাত, রাতের পর দিন, শুধু জল আর জল। নীল আকাশ। সমুদ্রে ঝড় থাকুক, সাইক্লোন থাকুক, ইঞ্জিন চালু রাখতেই হবে। চালু রাখতে না পারলেই মরণ। কয়লা টেনে 'সুটে' ফেললে ফায়ারম্যানদের কাজ শুরু। চকাচক বেলচায় কয়লা তুলে মারছে। ফার্নেসডোর খুলে দিলেই আগুনের হলকায় মুখ লাল। কয়লা মেরে, র্যাগ দিয়ে টেনে, কয়লা উলটেপালটে আঁচ তোলা। এয়ারভালভ খুলে দিলে হাওয়ায় আগুন আরও তখন ঝলসে ওঠে। কেবল বেলচায় কয়লা হাকড়ানো—তিনটে বয়লার, তিনটে করে ফার্নেস বয়লারে কয়লা খাচ্ছেতো খাচ্ছেই। আর পোর্টসাইডের ক্রশ বাংকারে টানা চারঘন্টা আমার কাজ। লম্ফ জ্বালিয়ে কোনো প্রাচীন গুহাবাসীর মতো অস্পষ্ট অন্ধকারে টানা ঘন্টার পর ঘন্টা কয়লা ভরছি। হুইলের গাড়িতে, সুটে এনে ফেলছি। বয়লার থেকে ছাই টেনে ফেললে, জল দিয়ে নেভাচ্ছি—অ্যাসরিজেকটারে আবার ছাই তুলে স্টোকহোলড পরিষ্কার করে দিতে হচ্ছে। ওয়াচ শেষে বিধবস্ত।

সিঁড়ি ধরে যে বোট ডেকে উঠে যাব তার পর্যন্ত ক্ষমতা থাকত না।

এবং এভাবেই বুঝেছিলাম, ইমানুল্লা সারেঙ আমার ভালো চান। কয়লা টানতে টানতে বমি করছি হড়হড় করে খবর পেয়ে জাহাজের বাংকারে তিনি ছুটে এসেছেন, দাঁড়িয়ে থেকেছেন, কখনও নুনজল এগিয়ে দিয়েছেন—নুনজল খেলে সি-সিকনেস কমে, এটা জানি, কিন্তু তিনি অন্য কাউকে ডেকে দেননি। বলেননি, ঠিক আছে, তুই যা। এনামুলকে পাঠাচ্ছি।

'কোল-বয় আমরা মাত্র সাতজন।

দুজন করে আমাদের ওয়াচ।

পোর্ট-সাইডের বাংকারে মনু অর্থাৎ মৈনুদ্দিন। আসলে সে আমার ওয়াচের জুরিদার।

চারঘন্টার ওয়াচে যতই আমি বিপাকে পড়ি না কেন, সারেঙ সাব অবিচল।

তার এক কথা, সব জাহাজে কি আমি থাকব। অভ্যাস হোক। তিনি চাইতেন, জাহাজে যখন উঠেই পড়েছি, তখন জাহাজের ধকল আমাকে মেনে নিতেই হবে।

অবশ্য জানতাম না, কার পরামর্শে মনু এসে আমার বাংকারে ঢুকে বলত, আরে বনার্জী সুট যে খালি হয়ে গেছে।

আমি তখন হয়তো ক্লান্ত। অবসন্ন। লোহার বাংকারে বেলচা মাথায় দিয়ে শুয়ে আছি। নীল জামা প্যান্ট কয়লার ভুসো কালিতে মাখামাখি। মুখ ভুসো কালিতে কয়লা খাদের মজুরের মতো। কয়লা টানা ছাড়া জীবনে যেন আর কোনো কাজ নেই আমার। এ জন্য জন্মেছি, এ জন্য বড়ো হয়েছি—ভাবলে তখন বিপন্ন বোধ করতাম। মাঝে মাঝে নিজের ওপর আস্থা হারালেই বেলচা ছুঁড়ে মারতাম কয়লার ওপর। তারপর চিৎপাত হয়ে পড়ে থাকলেই মনু এসে কয়লা টেনে দিত আমার হয়ে।

আমার খারাপ লাগত। উঠতাম। বলতাম, তুই যা। তোর 'সুট' কে ভরবে!

সে বলত, পয়লা সফরে পারবি কেন! পেটে তোর বিদ্যার জাহাজ, একাজ তোকে দিয়ে হয়!

এটা ঠিক জাহাজিরা প্রায় সবাই নিরক্ষর। তারা দেশে খত পাঠাবার সময় লেখাপড়া জানা আদমির খুবই কদর দেয়। দু-একজন চিঠি লেখার মতো বিদ্যা পেটে নিয়ে উঠলে, জাহাজিদের কাছে সে মাস্টার। তার প্রতি আলাদা সম্মান। আমি এ-জন্য সবার কাছেই সমাদর পেয়ে থাকি। ডেক আর এনজিন জাহাজি মিলে ষাট পঁয়ষট্টি জন জাহাজে উঠে এসেছিলাম—অনেক মুখ হারিয়ে গেছে কিন্তু বড়োটিন্ডাল, ছোটোটিন্ডাল, সারেঙ সাব কিংবা আমাদের দেবনাথ, অমিয়, হীরেনের কথা এখনও মনে করতে পারি। মনু আমার জুরিদার —তার কথাও মাঝে মাঝে ভাবি। এতদিন পর কে কোথায় জানি না। কারও খোঁজও রাখি না।

তবে ডাঙা যে জাহাজিদের পরমায়ু বাড়ায় এটা প্রথম বুঝেছিলাম, কলম্বো বন্দরে নোঙর ফেলার পর রাতের বেলায় নোঙর ফেলল, ভোর রাতে নোঙর তুলে ফেলা হল। প্রায় দশদিন এক টানা জাহাজ থেকে ডাঙার জন্য পাগল হয়ে আছি। আমরা জাহাজিরা ডাঙা দেখার জন্য সারারাত জেগেছিলাম ডেকে। একমাত্র প্রাচীন নাবিকদের কাছে ডাঙা এবং জল যেন সমান। কিন্তু যারা পাঁচ সাত কিংবা দশ সফরের জাহাজি তাদের কাছেও ডাঙা পরমায়ু বাড়ায়। তা না হলে কে সারারাত জেগে ডেকের ওপর বসে থাকে। কলম্বো থেকে জাহাজে রসদ তোলা হয়েছিল।

জাহাজ নোঙর করা, নামার সুযোগ থাকলেও নিষেধ—কারণ ভোররাতে জাহাজ ছেড়ে দেবে। শুধু বন্দরের দূরবর্তী আলো এবং কখনো কোথাও লোহার পাত পড়ার শব্দ অথবা

জাহাজ ছেড়ে যাবার সময় সাইরেন ছাড়া আর যা শব্দমালা টের পেয়েছি—সে শুধু সমুদ্রের জল এবং তার কল কল আওয়াজ। কিংবা কিছু সমুদ্র-পাখির উড়ে যাওয়া, কখনো তারা ডানা মেলে মাস্তুলে বসে থাকলে বাড়ির জন্য মন কী যে খারাপ করত!

বুয়েন্সএয়ার্স বন্দরে ঢোকার সময় এটা আরও বেশি টের পাচ্ছি। আফ্রিকার ডারবান কেপটাউন বন্দরে স্রেফ পাঁচ দিনের বিরতি।

সেখানে পাটের গাঁট নামানো হয়েছে। ডারবান বন্দরে জাহাজ ভিড়লে ইমানুল্লা এসে আমার ফোকসালে উঁকি দিয়ে বলেছিলেন, 'বনার্জী ওপরে আয়। কথা আছে।

তিনি কখনো তার ঘরে কাউকে ঢুকতে দিতেন না। এমনকী আমাকেও না। কেন এটা করতেন বুঝতাম না। আমাকে ওপরে ডেকে নিয়ে আফটার পিকের পেছনে গেলেন। রেলিঙে ভর করে দাঁড়ালেন।

এমনই যেন সব দৃশ্য দেখতে পাই।

তিনি বেশ গুম হয়েছিলেন। কথা বলছিলেন না। আমি বললাম, 'কী হল! ডাকলেন কেন!'

'তুই আবার ছোটোটিন্ডালের সঙ্গে মিশছিস!'

'মিশলে কী হয়।' না।

বড়োটিন্ডাল যে তার সুনজরে নেই, সেটা যেমন বুঝেছিলাম কার্ডিফ বন্দরে গিয়ে, তেমনি ছোটোটিন্ডালও যে তার কোপে পড়ে গেছে, সেটা বুঝেছিলাম ডারবান বন্দরেই।

'তা বলবেন তো কথা বলছেন না কেন!' ধুস, বুড়োর যত্ত সব বাতিক। আমি নষ্ট হয়ে না যাই এই এক ভিমরতিতে তিনি ভুগছেন! এ-জন্য মাঝে মাঝেই ক্ষেপে যেতাম।

'শোন, 'তিনি মুখে সুপারি ফেলে বললেন, 'জায়গাটা ভালো না। রাতে বের হস না। ছোটোটিন্ডালের ঘর আছে, এখানটায়। ওর পাল্লায় পড়ে গোল্লায় যাস না।'

'ঠিক আছে যাব না।'

'না তোকে যেতে বারণ করছি না। বন্দরের কাছাকাছি থাকবি। ওদিকটায় মাছ ধরতে পারিস। আমার ছিপ নিয়ে যা, বসে না থেকে দু-চারটে সেকরল মাছ ধরে আনলে জাহাজে বেশ ভোজ লাগান যাবে।

আসলে বুঝি, তিনি আমাকে মাছের নেশায় ফেলে দিয়ে ডারবান বন্দরটা পার করে নিয়ে যেতে চান।

এটা আমার মনে আছে জাহাজের খাওয়া বড়ো একঘেয়ে ছিল।

সকালে চর্বি ভাজা রুটি।

দুপুরে ডাল গোস্ত ভাত।

বিকেলে চর্বি ভাজা রুটি।

রাতে আবার ডাল, আলুভাজা, গোস্ত।

এই ছিল নিত্যদিনের খাবার। বরফঘরের বাসি পচা মাংস—বিস্বাদ, কিন্তু এমন যমের খিদে পেত যে শুধু ডাল দিয়েই সব ভাত তোলা হয়ে যেত।

কাজেই জাহাজিরা বন্দর পেলে, মাছ শিকারেও যায়। যেমন ইমানুল্লা সাব জাহাজে ওঠার সময় দুটো আলাদা কাঠের পেটি তুলে এনেছিলেন। একটা পেটিতে জাল তৈরি করার সুতো, আর একটা পেটিতে কয়েক রকমের ছিপ। ছিপগুলো ছিল, মাছ ধরার জন্য এবং তিনি বন্দরে গেলেই ছিপ ফেলে জাহাজের আফটার পিকে বসে থাকতেন। কখনো ছোটো ছিপ। কোন বন্দরে, কী ছিপ ফেললে, কোন মাছ পাওয়া যায় তিনি তা এত জানতেন যে আমরা অবাক হয়ে যেতাম।

জাহাজে ওঠার পর প্রথম ডারবান বন্দরে টের পেলাম, তিনি আমাকে হুকুম করছেন, 'বনার্জী, যা বাটলারের কাছ থাইকা, লিস্টি মিলাইয়া জিনিসগুলি নিয়া আয়।

বাটলার হাসান খুবই সেয়ানা লোক সে জানে, ডেক সারেঙ আর এনজিন সারেঙকে হাতে রাখতে পারলে, জাহাজিদের রেশন মারতে পারবে। গোস্ত ওজনে চুরি করতে পারবে, চিনি, টোবাকো সব চুরি করা সম্ভব শুধু দুই সারেঙ হাতে থাকলে। এ-জন্য ইনামও দেয়, যেমন জাহাদের অফিসারদের রেশনেই শুধু ডিম আছে—ডিম নয় শুধু, এক এলাহি ব্যবস্থা খাদ্য তালিকার। ইংলিশ মেনু। সকালে ওরা ব্রেকফাস্ট করার পর প্রায়ই দেখতাম পকেটে আপেল নিয়ে বের হয়ে আসত ডেকে। কাজ করত আর আপেলে কামড় বসাত।

তাদের খাওয়া দাওয়ার বহর দেখলে আমাদের জিভে জল আসত। চিফ কুক, সেকেন্ড কুক আট দশ জন অফিসারের খাদ্য তালিকা মেনু মাফিক তৈরি করতে গলদঘর্ম। আর আমাদের ইঞ্জিন ভান্ডারি এক হাতে সব সামলায়।

মনে আছে অফিসারদের মধ্যে একজনও বাঙালি ছিলেন না। এমনকী ভারতীয়ও নয়। ব্যাংক লাইনের জাহাজ অফিসাররা হোম থেকে উঠতেন। পরে জেনেছিলাম, অধিকাংশই ওয়েলসের বাসিন্দা।

অফিসারদের হরেকরকমের খাদ্য তালিকার বহর এবং আমাদের একঘেয়ে খাবার নানা কারণে জাহাজিদের মনে ঈর্ষার উদ্রেক করত। সারেঙই পারতেন সব সামলাতে। এবং

এজন্য সারেঙকে হাতে রাখার নৈতিক দায়িত্ব বাটলারের। দুই সারেঙ অফিসারদের মেনু থেকে ফল ডিম আলাদা করে পেতেন। এছাড়াও যখনকার যা।

সুতরাং ডারবান বন্দরে ইমানুল্লা সাব আমার হাতে যে লিস্টি ধরিয়ে দিয়ে বলেছিলেন, যা নিয়ে আর সেটা নিশ্চয়ই হরেক কিসিমের খাবার—যেমন কিসমিস লবঙ্গ জায়ফল। এগুলি কখনো যদি কোনো অনুষ্ঠানে হত, যেমন ইদের পরবে বিরিয়ানি করার জন্য পাওয়া যেত। আমার ধারণা ছিল, তেমনই কিছু। কিন্তু আশ্চর্য সারেঙ সাব ওসব দিয়ে একসঙ্গে আদা এবং চিনির গাদ মিশিয়ে জাফরান দিয়ে মাছের চাড় তৈরি করে বলেছিলেন, 'বসে যা। পাঙ্গাস মাছ গাঁথতে পারিস কি না দ্যাখ।'

বন্দরের জলে, হরেক রকমের সামুদ্রিক মাছের আড্ডা থাকে। কারণ জাহাজের উচ্ছিষ্ট খাবার জলেই ফেলে দেওয়া হয়। গভীর সমুদ্র থেকে মাছ যেমন উঠে আসে, তেমনি ভালো মাছ শিকারি হলে বড়ো দু-চারটে গলদা চিংড়িও কপালে মিলে যেতে পারে। এক ঘেয়ে খাওয়া, বৈচিত্র্য খোঁজাই স্বাভাবিক। তা-ছাড়া ভাত খেকো বাঙালির মাছ যে কী প্রিয় সবারই জানা। বন্দরে জাহাজ ভিড়লেই বঁড়শি নিয়ে কেউ কেউ বসে থাকে। আমিও বসেছিলাম ইমানুল্লা চাচার পাশে। মাছ ভিড়লই না।

কাহাতক ভাল্লাগে। খোঁট দিচ্ছি, উঠছে না। জাহাজ থেকে বন্ধু নেমে যাচ্ছে দেখেই মনটা দমে গেল।

বলেছিলাম, 'চাচা, বের হচ্ছি।'

তিনি বোধহয় বুঝতে পারছিলেন মাছ শিকারের লোভ দেখিয়ে আমাকে আর আটকে রাখা যাবে না। শুধু বললেন, 'যা। তবে একা বের হস না। পারিসতো মাইজলা সাবের লগ ধরার চেষ্টা কর।'

মাইজলা সাব অর্থাৎ জাহাজের সেকেন্ড অফিসার খুবই রসিক মানুষ। জাহাজিদের নেটিভ বলে ঘেন্না পেত্তা করে না। বরং হাই হুই করে একে ডাকে, ওকে ডাকে। দু-একটা হিন্দি বাতও বলতে পারে। যেমন, খানা মিলে গা! ইন্ডিয়ান কারি বহুত আচ্ছা।

অবশ্য সে মাঝে মাঝে আমাদের গ্যালিতে এসে প্রায় চুরি করে গোস্ত ভাত খেতে মজা পেত। তার দেশোয়ালি ব্রাদার অফিসারদের কাছে ধরা পড়ে না যায়, এই ভেবে সবসময় সতর্ক।

হ্যালো বাবা, 'প্লিজ লুক দেয়ার।'

অর্থাৎ সে আঙুল তুলে কেবিনে ঢোকার রাস্তাটার দিকে নজর রাখতে বলত। কেউ বের হয়ে যদি এদিকে চলেই আসে, তবে মুখ মুছে, প্যান্টে হাত মুছে শিস দিতে দিতে নেমে

যাবে। কারণ সে জানত, কাপ্তানের কানে খবর পৌঁছে গেলে আস্ত রাখবেন না। ন্যাস্টিম্যান বলে গালাগালি করবেন।

মনে আছে, সে আমাকে বাবা বলেই ডাকত। কারণ এই কথারও ইতিহাস আছে। কলকাতা থেকে জাহাজ ছাড়ার সময়ই আমার প্রতি তার কিছুটা সখ্যতা গড়ে তোলার চেষ্টা ছিল। সবার নাম জানারও কৌতূহল আছে। আমার নাম জিজ্ঞেস করতেই বঙ্কু বলেছিল, সাহেব হি ইজ বস। হিজ নেম ইজ বাবা। অর্থাৎ আমার নাম বাবা। সারা সফরই সে আমাকে বাবা বলে ডাকত। খোঁজাখুঁজি করত, হোয়ার ইজ মাই বাবা?

সেই বাবা যখন ডারবানে জাহাজ ভিড়তেই নেমে পড়ার জন্য আকুল এবং আমি কোনো ফাঁদে পড়ে না যাই বন্দরে সেই আতঙ্কে সারেঙ সাব যখন কাবু তখন আমার প্রিয় পুত্র অর্থাৎ আমারই বাবার বয়সী মানুষটির সঙ্গে যাবার কথা শুনে এক পায়ে খাড়া হয়ে গেছিলাম।

জাহাজ থেকে নামার সময় সারেঙ সাব বললেন, সাহেব ওকে কিন্তু ফেলে এস না।

নো নো। হি মাস্ট কাম ব্যাক। ডোন্ট বি ওরি।

মনে আছে আমায়, ডারবানে তখন হাড় কাঁপানো শীত। এত শীত যে আমরা দুজনই ওভারকোট পরে বের হয়েছিলাম।

বন্দর থেকে জেটি এলাকা পার হয়ে রাস্তায় পড়তেই ছিমছাম ঘরবাড়ি। পার্ক। দৈত্যের মতো সব নিগ্রো পুরুষ রমণী। কী পুরুষ, কী রমণী কারো মাথায় প্রায় চুল নেই বললেই হয়! মনে হয় টাক মাথা। কোঁকড়ানো চুল থাকলেও ঘন নয়, খুব পাতলা। ইতস্তত বিক্ষিপ্ত রোয়া ধান পোতার মতো কেউ যেন চুল টাকের যত্রতত্র পুঁতে রেখেছে। সৌখিন নিগ্রো মেয়েদের মাথায় সবারই প্রায় স্কার্ফ বাঁধা। শীতের জন্যও হতে পারে। আবার টাক আবৃত করার জন্যও হতে পারে।

এতকাল পর অবশ্য মনে করতে পারছি না, প্রথম দিনই কি না, না দু-পাঁচদিন পরে তিন নিগ্রো নারী ছিনতাইকারির হাতে পড়েছিলাম! মনে আছে ট্রলি বাস চেপে ইন্ডিয়ান মার্কেটের দিকে যাচ্ছিলাম। যাবার সময় দু-পাশের পার্কে দেখেছিলাম লেখা আছে, নাই ইউরোপিয়ান। এগুলো লেখা থাকে কেন পরে জেনেছিলাম। ভাষাটা যে ওলন্দাজ ভাষা তাও সেকেন্ড অফিসারই বলে দিয়েছিলেন। পার্কে, বাসে সর্বত্র এধরনের লেখা দেখে ঠিক করে নিতে হবে কার কোথায় জায়গা। কে কোন পার্কে ঢুকতে পারবে, কে ট্রলি বাসের নীচের বা উপরের তলায় উঠে যাবে।

বর্ণবৈষম্য কী প্রবল কদিন বন্দরে ঘুরেই টের পেয়েছিলাম।

সাঁজবেলায় আমরা বন্দরে ঢুকব বলে শটকাট করতে যাচ্ছি—এদিকটায় কিছু বস্তি অঞ্চল, কালো মানুষের বসবাস, নিজের সঙ্গে কিছুটা যেন আত্মীয়তাও অনুভব করছিলাম—কারণ এ দেশে আমি তাদের সমগোত্রীয় কাজেই আমার ভয় ডর কম ছিল।

সেকেন্ড অফিসার বললেন, এদিকটায় না ঢুকলেই হত। তার চেয়ে লিউস্ট্রিট ধরে চল যাই।

আমি ঠিক বুঝলাম না, কেন এ কথা তিনি বলছেন। কোনো উপদ্রবে পড়িনি। আর তখনই তিনজন নিগ্রো যুবতী। তিনজনই আমাদের চেয়ে উঁচু এবং লম্বা। বিশাল এই তিন যুবতী আমাদের ওভারকোট ধরে বলেছিল, হাউ মুচ।

তার মানে হাউ মাচ। তার মানে কত দাম।

আমরা জানতাম, এইসব বন্দরে শহরে নাবিকরা পুরোনো কোট ওভারকোট কিংবা গরম জামাকাপড় বিক্রি করে টু পাইস কামায়। সেকেন্ড অফিসার এমন তিন যুবতীকে পেয়ে খুব খুশি। সে প্রায় দেখলাম মজেই যাচ্ছিল। দু-একটা ফাজিল কথাবার্তাও হয়ে গেল। আর ঠিক সে সময়ে দুই যুবতী আমাদের এমন আলিঙ্গনে আবদ্ধ করল যে আমরা বুরবকের মতো কী করব ভেবে পাচ্ছিলাম না সাঁঝবেলায় রাস্তার উপর—এটা তাদের কোনো আদব কায়দা কিনা অন্তরঙ্গ হবার তাও বুঝছিলাম, এই যখন অবস্থা তখন তৃতীয় যুবতী হাতের ওভারকোট দুটো টেনে নিয়ে অন্ধকারে উধাও হয়ে গেল। আর বাকি দুজনও সঙ্গে সঙ্গে দৌড়ে পালাল।

আমি তটস্থ হয়ে পড়েছিলাম। এমনিতেই বিদেশ বিভুঁইএ কোনো অপরিচিত শহরে একা বের হতে একটা অস্বস্তি আছে। দল বেঁধে বের হওয়া ছাড়া উপায় থাকে না। দুজন আমরা তখন ছুটে পালাচ্ছি। কারণ হাতঘড়ি খোয়া যায়নি—এটাও কম ভাগ্যের কথা না। বন্দরে ঢুকে সেকেন্ড অফিসার বললেন, বাবা, প্লিজ ডোন্ট ডিসক্লোজ ইট টু এনিবডি।

আসলে সেকেন্ড অফিসার চাননি, সবার কাছে বোকা বনতে। জাহাজে কে কতভাবে যে ঠকে আসে ফিগার থেকে! ডাঙার এমনই মোহ। এবং নাবিকরাও কেমন অন্ধের মতো আচরণ করে ফেলে যুবতী নারীর সামান্য সঙ্গ পেলে।

এরপর আর আমার ডারবান বন্দরে বের হওয়া হয়ে ওঠেনি। ইমানুল্লা সাবের পাশে বসে মাছ ধরায় মনোযোগ দিয়ে ফেললাম। একদিন দুটো বেশ বড়ো সাইজের গলদা চিংড়ি গেঁথে ফেললাম। ওভারকোট হারিয়ে যে কষ্টে ভুগছিলাম, দটো চিংড়ি শিকারে তার কিছুটা অন্তত লাঘব হয়েছিল এখনও তা মনে করতে পারি। তবে বন্দর ছাড়ার আগে এক সকালে, একজন নিগ্রো এসে আমার ফোকসালে হাজির। তাকে আমি চিনি। জাহাজ থেকে মাল খালাসের সময় সে এজেন্ট অফিসের হয়ে শ্রমিকের কাজ করে গেছে।

হাসিখুশি মানুষ। ডেকে উঠেই দু-জ্যাব ভর্তি ভাত নিয়ে মুঠো করে খেত আর বলত ওয়ান ওয়াইফ নো গুড, টু ওয়াইভস গুড। থ্রি ওয়াইভস ভেরি গুড। সে আমার ওভারকোট ফিরিয়ে দিয়ে বলেছিল ডোন্ট মাইন্ড, আই হ্যাভ থ্রি ওয়াইভস।

তবে আমি কেন যে ইমানুল্লা সাবের ওপর মাঝে মাঝে ক্ষেপে যেতাম বুঝতে পারতাম না। আর যারা এনজিন জাহাজি আছে, তাদের ওপর খবরদারি করায় যেন বিন্দুমাত্র তাঁর ইচ্ছে নেই। কাজ কাম শেষে কে কোথায় যায়, কোথায় রাত কাটায় কিছুই জানতে চায় না। জানার নিয়মও নয়।

অথচ আমার বেলায় তাঁর ষোলো আনা মেজাজ।—'এত রাত করে ফিরলি! কার সঙ্গে গেছিলি! কোথায় গেছিলি! কোথায় গেছিলি বল! চুপ করে আছিস কেন।'

আসলে কখনো-কখনো রাত হয়ে যেত। দু-চারদিন নেশা করেও গিয়েছি। নেশা করলেই তিনি তার ফোকসালের দরজা বন্ধ করে দিতেন। রাতে খেতেন না। ভান্ডারি নীচে নেমে বলত, যান বনার্জী সারেঙ সাবের গোসা ভাঙান গিয়া। ক্যাম নে খান, বেততামিজ হতে ভালো লাগে!

পরে কেন যে নিজেরই খারাপ লাগত—বাংক থেকে উঠে পড়তাম। সিঁড়ি ভেঙে ওপরের ফোকসালে যেতাম। সারেঙ সাব একা একটা ফোকসালে থাকেন। একটা কাঠের পেটি বাংকের নীচে। একটা হুকা ঝোলানো বাংকের কোনায়। একটা বড়ো এনামেলের হাড়ি দড়ি দিয়ে বাঁধা। এবং সেটা ছাদের আংটায় ঝোলানো। তাতে রাব ভর্তি। তামাকের বস্তা আছে। বস্তা দিয়ে তামাক পাতা খুব যত্নের সঙ্গে জড়ানো। লকারে তার কী থাকে জানি না। আমি নেশা করে ফিরলে তার সেদিন কোরান পাঠ শুরু হয়। যেন আমার গুনাহ তিনি কোরান পাঠ করে স্পষ্ট করে দিতে চান। নামাজ শেষ করে দুলে দুলে পাঠ শুরু হবে, আর তখনই জাহাজে সবার এত কথা হয়ে গেল।

আর তারা এসে আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ত। কিংবা যায় সঙ্গে যাই, সেও অপরাধী সাব্যস্ত হত। এমন হয়ে গেল শেষে যে কেউ আমাকে ডাঙায় সঙ্গেই নিতে চায় না।

তাদেরও দোষ নেই।

কারণ সারেঙ সাব আমার চেয়ে তাদের বেশি তড়পাবেন। 'হারামজাদা, বেয়াকুবের দল, নিজেরা জাহান্নামে গেছিস বলে, সেদিনের ছেলেটাকে নষ্ট করে দিচ্ছিস।'

বুয়েন্সএয়ার্স বন্দরেও সেই ঘটনা। আমি যেতে চাইলে কেউ সঙ্গে নিতে চায় না।

আর তখন সারেঙ সাব নিজেই হন্তদন্ত হয়ে উপরে উঠে আসতেন!—এই দেবনাথ যা-বনার্জীরে নিয়া যা!

দেবনাথও ছেড়ে কথা বলে না, ‘দেখুন সারেঙ সাব, দেরি টেরি হলে তেড়ে আসতে পারবেন না।’

‘যা, তোরা মাথা গরম করিস কেন যে বুঝি না। যা। বনার্জীরে নিয়া যা। ডাঙায় ঘুরে বেড়াক। মনটা পরিষ্কার থাকব।

দেবনাথ বলত, আমি বারণ করেছি! তোমার তড়পানি কে এত সহ্য করে।

যা বাবা। রাগ করিস না, বনার্জীরে নিয়া যা। বনার্জী বসে থাকলি ক্যান। যা।

তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বলত, কিরে যাবি না! জাহাজে বসে বিকালটা কাটাবি কী করে! একা একা ভালো লাগবে!

শহরটা বড়ো বেশি সাজানো গোছানো। আমাদের জাহাজ জেটিতে বাঁধলে টের পেলাম, সামনে গাছের সারি। প্রকাণ্ড বড়ো বড়ো গাছ। গাছগুলো আমার চেনা নয়। ওক গাছ-টাছ হবে। নাও হতে পারে। প্রায় শ-খানেক গাছ সার দিয়ে লাগানো। গাছের নীচে সব কিনারায় লোক এসে জড় হয়েছে। জাহাজ থেকে নামলেই শহরে ঢুকে যাওয়া যায়। লেন্দ্রো অ্যালেন জায়গাটা বেশি দূরও নয়। শহরের জাঁকজমক এলাকা ওটাই। জেটি থেকে আধ কিলোমিটারও রাস্তা হবে না। অনেক বন্দরে গেছি, কিন্তু একেবারে বন্দর বুকে নিয়ে একটা শহর গড়ে উঠেছে, এটা আর কোথাও দেখিনি। কোনও কাস্টম চেকিং নেই। জাহাজ থেকে নেমে দু-পা হেঁটে গেলেই শহর। কার্নিভেল। আর ফুলের সব দোকান। ফলের দোকান। যখন খুশি নেমে যাওয়া যায়—যখন খুশি ফেরা যায়। আর যুবতীরা এক একজন যেমন মিষ্টি আপেল হাতে নিয়ে হাঁটছে। আপেলের মতোই গায়ের রং। এবং সরস, কী নারী কি পুরুষ সবাই কী সুন্দর দেখতে। চোখ নীল, চুল নীলাভ, গায়ের রং গোলাপি এবং রং বেরঙের স্কার্ট, জ্যাকেট, দামি গাড়ি, বাড়ির পাশে ফুলের বাগান, তকতকে ঝকঝকে।

এই শহরে নেমে না খেতে পারলে আমি মরেই যাব। হঠাৎ ক্ষেপে গিয়ে বলেছিলাম, আমি একাই যাব। দেবনাথদা তোমরা যাও।

ইমানুল্লা সাব যেন জলে পড়ে গেছিলেন। আমার দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন, একা যাবি! তোর এত সাহস! পরি-হুরির দেশ। বাইন্দা রাখলে আমি কিছু জানি না।

সারেঙ সাব কখনো তাঁর দেশের ভাষায় কথা বলেন। রাগ কিংবা ক্ষোভ অভিমান হলেই মাতৃভাষা বের হয়ে পড়ে। তিনি গুম মেরে গেলে বলেছিলাম—ওরা নেবে কেন সঙ্গে বলুন। আমার জন্য ওদের তাড়াতাড়ি জাহাজে ফিরে আসতে হয়। কে আপনার ধমক সহ্য করবে।

দেবনাথ, বন্ধু, অমিয় চলে যাচ্ছিল। সারেঙ সাব তাদের পেছনে ছুটছেন। আমি বসেছিলাম বিমর্ষ মুখে। আঙটায় পিচের বেঞ্চিতে বসে দূরের সমুদ্র দেখছি। গাছগুলি পার হয়ে ছোট্ট মতো পার্কটা পার হয়ে গেলে আমার সমুদ্র। অথচ গাছপালার জন্য দূরের কিছু দেখাও যায় না। ইন্ডিয়া থেকে জাহাজ গেলে যারা পার্কে বেড়াতে আসে, তারা জাহাজে ওঠে কিছু কেনাকাটাও করে। যেমন যারা পুরোনো জাহাজি যারা ব্যাংক লাইনের জাহাজেদ সফর করেছে কয়েকবার। তারাই জানে, ময়ূরের পালক কিংবা কাঠের হাতি চওড়া দামে বিক্রি করা যায়।

জাহাজটা মাত্র কয়েক ঘন্টার জন্য কলম্বো বন্দরে থেমেছিল।

নীচে নৌকার ভিড়। কিনারার লোক কাঠের হাতি, কাঠের বুদ্ধমূর্তি কিংবা ময়ূরের পালকে তৈরি পাখা বিক্রি করতে চলে এসেছে নৌকায় করে। যারা জানে, তারা ঠিক কিনে নেয়। এতে যে দু-পয়সা কামানো যাবে বুয়েন্সএয়ারস বন্দরে গেলে তারা তাও জানে। এবং সেই সব জাহাজিরাই আফটার-পিকে বেশ দোকান সাজিয়ে বসার মতো বসে গেছে। স্প্যানিস নারী-পুরুষের যে কোনো কারণেই এই সব ময়ূরের পালক, কাঠের হাতি, কাঠের বুদ্ধ মূর্তির প্রতি বিশেষ আগ্রহ আছে টের পেলাম। জোড়ায় জোড়ায় উঠে আসছে। দর-দাম করে কিনে নিয়ে যাচ্ছে।

আমি এদের মধ্যে ঘাপটি মেরে বসেছিলাম—ইমানুল্লা সাব ফিরে এসেই ডাকাডাকি শুরু করে দিয়েছিলেন, ওরে বনার্জীরে দেখছ! গেল কোথায়! অ বনার্জী গেলি কোথায় বাবা। যা। জামাকাপড় পালটে নে। সু বুরুশ করে নে। দেবনাথ কিনারায় অপেক্ষা করছে।

সারেঙসাবের এই কাতর ডাক আমাকে খুবই বিচলিত করে তুলত। শেষ পর্যন্ত রাগ পুষে রাখতে পারতাম না। দৌড়ে টুইন-ডেক পার হয়ে গ্যাংওয়ে ধরে নেমে যেতাম—ডাকতাম, দেবনাথদা দাঁড়াও। আমি আসছি।

গাছগুলি পার হলেই, শহরের বড়ো রাস্তা।

ওরা বড়ো রাস্তায় পড়ার জন্য হাঁটছিল।

যেদিকে তাকাই চোখ জুড়িয়ে যায়।

কোথাও একটা মেয়ে সাদা ফ্রক আর সাদা প্যান্ট পরে একটা টেনিস বল নিয়ে পাঁচিলে মারছে, আবার ফিরে আসছে বলটা, আবার মারছে। শহরের মাথায় রোদ নেমে আসছে। এ-দেশে এটা শীতকাল না বসন্তকাল আমরা টের পাই না। আমাদের কাছে প্রচণ্ড ঠান্ডার দেশ। কোট প্যান্ট, শালদরাজ কী নেই—তবু সমুদ্র থেকে কনকনে ঠান্ডা বাতাস উঠে আসছে। অথচ মেয়েটা একটা স্কার্ট আর ফ্রক গায়ে নিজের মনে পাঁচিলটার সঙ্গে খেলছে।

রাস্তায় কোনো ভিড় নেই। ইতস্তত মানুষের হাঁটাহাঁটি। নর-নারীদের পোশাকেও বিশেষ বাহুল্য নেই। কটনের সার্ট প্যান্ট পরে অনায়াসে ঘুরতে পারছে। আমরা পারছি না।

আমি যেখানে যা কিছু দেখি কেমন অবাক হয়ে যাই। নীলচে রঙের বব করা চুল, মুখ আপেলের মতো মসৃণ, শরীরে বোধ হয় আশ্চর্য সুবাস আছে। আমার বয়েসী এই মেয়েটা এখানে আছে ভাবতে কেমন অবাক লাগে।

ইচ্ছে হত কথা বলি।

কিন্তু সাহস হত না।

দেবনাথদা ডাকলেন, এই তুই কিরে! কি দেখছিস! কোনো লাভ নেই।

সত্যি কোনো লাভ নেই। তবু দেখার জন্য মনের মধ্যে একটা টান জন্মায় কেন বুঝি না। ওদের পছন্দ হচ্ছিল না।—এই হা করে দেখছিস দেবনাথদা চিৎকার করে বলল, হারামজাদা কী দেখছ বুঝি না!

আসলে আমি কী দেখছিলাম, ওর স্তন! কারণ ভারী স্তন খেলতে গিয়ে দুলে উঠছিল— ওর থাই এত মসৃণ, যেন হাত দিলে মোমের মতো পিছলে যাবে।

শুধু পিছলে যাবে, না আরও কিছু যেমন জংলার অন্তর্গত সেই নিদারুণ ভূমি—আমি কী তার আঁটো প্যান্টের ভিতর সেই আকস্মিক হতচ্ছারা তরুণকে খুঁজছিলাম। যার মধ্যে আছে অন্তহীন এক অন্তর্গত খেলা। কেমন যেচে বন্ধুত্ব করতে ইচ্ছে হচ্ছে। সে যদি পড়ে যেত, তাকে তুলে দিতাম। তার এই নমনীয়তা আমাকে আকর্ষণ করতেই পারে।

আর তখনই সাদা বলটা মাথার ওপর দিয়ে ফসকে গেল। আমি দৌড়ে গেলাম। বলটি কুড়িয়ে আবার তার কাছে দিলাম। বলটি দিলে সে সামান্য হেসে কিছুটা জানু নত করে আমার কাছে বোধহয় কৃতজ্ঞতা জানিয়েছিল।

আমি নড়ছিলাম না।

দেবনাথদার হুঙ্কার, মর বেটা। হারামজাদা তুমি শালা ঈশ্বরের পুত্র। কেউ তোমাকে কিছু বলতে পারে না। তোমার নিন্দা শুনলে সারেঙসাব কথা ঠিক রাখতে পারেন না।

কিরে যাবি?

এই যাচ্ছি দাদা।

রাস্তাগুলি এত চওড়া যে ইচ্ছে করলে যেন ফুটবলও খেলা যায়। এটা বন্দরে ঢোকার রাস্তা, গাড়ি-টারি কম। আর তা ছাড়া এই প্রশস্ত রাস্তায় ইচ্ছে করলেই বেগে গাড়ি চালানো যায় না। কারণ সামনে সমুদ্র। বিচের দিকে যারা যায়, তারা এদিকটায় গাড়ি পার্ক করে যায়। পাশের মাঠে বেশ গাড়ির ভিড়।

আমি দাঁড়িয়ে আছি ওর থেকে প্রায় দশ গজ দূরে। এই সব রাস্তাকেই বুলেভার্ড বলে কিনা জানি না। মাঝখানে গাছপালার সারি। কোনো গাছে হলুদ রঙের ফুল ফুটে আছে। সমুদ্রের হাওয়ায় ফুলের ওড়াউড়ি ছিল বেশ। কেন যে তরুণীকে ফেলে শহরের ভিতরে যেতে ইচ্ছে হচ্ছিল না। কেন যে দাঁড়িয়ে থেকে তার সঙ্গে খেলার অংশীদার হতে ইচ্ছে হচ্ছিল! কেমন নেশার মতো পেয়ে বসেছিল— আর দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিলাম, আবার একটা বল মিস করলে সুযোগ পেয়ে যায়।

আমি পরেছিলাম, কালো সুট। জামার ওপর লাল রঙের পুলওভার। আর গলায় আমার স্কার্ফ জড়ানো।

যাক বেটা দাঁড়িয়ে থাক। রাস্তা হারিয়ে ফেললে আমরা জানি না।

মনে আছে, আমি বলেছিলাম, তোমরা যাও না। একা জাহাজে ঠিক ফিরে যাব।

ফিরেও গেছিলাম।

মেয়েটি গেট দিয়ে দৌড়ে ঢুকে গেলে আমি কিছুটা অস্বস্তিতে পড়ে গেলাম। লোহার গেট—বাড়িটার সামনে কোমর সমান পাঁচিল। সদ্য রং করা মনে হয় বাড়িটা। সামনে অনেকটা জায়গা জুড়ে ফুল-ফলের বাগান। সব বাড়িগুলিই প্রায় দেখতে একরকম। কোনো বাড়ি থেকে আর একটা বাড়িকে আলাদা করা যায় না। কেবল এ-বাড়িটার বিশেষত্ব বাগানে একটা ইউক্যালিপটাস গাছ আছে। তার সাদা পাতা, সাদা রঙের ডালাপালা দেখলেই আমি ঠিক চিনতে পারব, এ বাড়িটার পাশেই কোমর সমান পাঁচিলের সামনে মেয়েটি দাঁড়িয়ে টেনিস খেলে। একা একা এই টেনিস খেলারই বা কী মজা আমি তখন জানতাম না।

ভয় হচ্ছিল।

দেবনাথদারা চলে গেছেন। বন্দরের জাহাজ, কিংবা মাস্তুলও অদৃশ্য।

চলে গেলে ভাববে পালিয়ে গেছে। এটা একজন ভারতীয় নাবিকের পক্ষে শোভা পায় না, এমন মনে হচ্ছিল। অবশ্য জাহাজ পাটার, কিংবা যেখানেই গেছি দোকানে আমাদের দেখলেই এটা-ওটা কেনার পর প্রশ্ন করত, কোথা থেকে এসেছ!

বলতাম, ইন্ডিয়া থেকে।

তারপরই বেশ সমীহ জবাব, আই সি ইউ আর গ্যান্ডি পিপল।

ভারতীয় যে আমরা, তা যেন সে-সময়ে খুবই গৌণ হয়ে গেছিল। গান্ধি পিপল বলেই যেন খারাপ কাজ শোভা পায় না। আর তখনই ভদ্রা জাহাজে ট্রেনিং-এর সময়কার সেকেণ্ড অফিসারের সতর্ক কথাবার্তা শুনতে পাই।

মাই বয়েজ।

তিনি এ-ভাবেই কথা বলতেন।

মাই বয়েজ, তোমরা জান, স্বাধীন হওয়ায় আমাদের দায়িত্ব বেড়ে গেছে। তোমরা জান, জাহাজে নাবিকের কাজ যাঁরা করতেন, তারা অধিকাংশই এখন পূর্ব-পাকিস্তানের লোক।

মাই বয়েজ, মনে রেখ, তোমাদের কাজ দেখে যেন জাহাজের কর্তা ব্যক্তিরা খুশি হন। বেঙ্গলি পিপল, লেজি, বাগার, এ ধরনের একটা ধারণা আছে তাঁদের।

এখানে বলে রাখা ভালো, জাহাজে ওঠার পর সবাই আমাদের বাঙালিবাবু বলতেন। পূর্ব-পাকিস্তান থেকে যারাই জাহাজে উঠতেন, তারা সবাই মুসলমান। তাদের থেকে আমরা যে আলাদা, বাঙালিবাবু বলে সেটা যেন মনে করিয়ে দিত? এই নিয়ে মনু, ইমতাজ, আমাদের সঙ্গে কতদিন তর্ক হয়েছে। আমরা বলতাম, তোরা কী, তোরা বাঙালি না! আমাদের বাঙালি বাবু বলিস!

ওরা কিছুতেই এটা মানতে পারত না। তারাও যে বাঙালি মুসলমান, বাংলা ভাষা তাদের মাতৃভাষা কিছুতেই বুঝতে চাইত না। আরবি ফারসিও নয়, এমনকী উর্দুও নয়, এত্তারে, ওত্তারে যাদের লজ্জা, তারা বাঙালি জাতি সম্পর্কে এত উদাসীন যে মাঝে মাঝে ক্ষেপে গিয়ে বলতাম, তোমাদের মিঞা ত যাবে না। মনে রেখ তোমরাও বাঙালিবাবু।

কেউ কেউ অবশ্য আমাদের যুক্তি ধরতে পেরে চুপ করে যেত।

বলতাম, পাকিস্তানি পাকিস্তানি বলে গেলে! এত দেমাক! আর বাংলা দেশটাকে ভাগ করে পাকিস্তান বানালেই হল। খেজুর গাছ আছে মরুভূমি আছে? আর দেশটা অনেক দূর জানিস। মুসলমান বলেই তারা তোদের সব, আমরা কেউ নয়! আবার কোনোদিন শুনছি ত, এই বাঙালিবাবু চা আছে, চিনি আছে, সিগারেট আছে—বললে কোনো সাড়া পাবি না বলে দিলাম।

তারপর এ নিয়ে তর্ক এত প্রবল হয়ে উঠত যে সারেঙ সাব এসে বলতেন, জাত আবার কিরে। মানুষের গোত্র বিচার মনুষ্যত্ব দিয়ে। তা না থাকলে, বাঙালি হও পাকিস্তানি হও কিছু আসে যায় না।

সারেঙ সাবের সামনে আমরা কেউই তর্ক করতাম না। তিনি বলতেন, যার ইমন নাই, সে হিন্দুও না মুসলমানও না। সে কাফের বুঝলি।

তিনি চলে গেলেই, আমেদ ক্ষেপে গিয়ে বলত, বুড়োর একমাত্র ছেলেটা লন্ডনে নেমে যাবার পর থেকেই কেমন হয়ে গেছেন। শুনলি তো কথাবার্তা। আমেদ আমার দিকে তাকিয়ে বলতেন, তোরই বয়সী। জাহাজে সঙ্গে নিয়ে উঠেছিলেন। জাহাজের কাজ কাম

শিখলে সফরে বের হতে পারবে। আর সফর! বিলাতের ঘাটে সেই উধাও হয়ে গেল আর কোনো খোঁজ নেই।

সেদিনই আমি টের পেয়েছিলাম, বুড়ো মানুষটি আমি দেরি করলে কেন এত ক্ষেপে যান। তিনি কী তার পুত্রের কথা ভেবে বিচলিত হয়ে পড়েন। তিনি কী বোঝেন, এই বয়সটাই খারাপ! কী জানি, এত দিন পর জীবনের সে সব রহস্যময়তার কথা ভাবলেও মন কেমন উদাস হয়ে যায়।

যা বলছিলাম, সেকেন্ড অফিসার বলতেন, মনে রেখ, প্রায় দেশে আমাদের দূতাবাস আছে। তাদের সঙ্গে সাধারণ মানুষের কোনো যোগাযোগ থাকে না। তোমরাই হলে আসল, এদেশের পরিচয়— তোমাদের আচরণে এই দেশ সম্পর্কে বিদেশিরা অনুমান করতে পারবে, ভারতীয়রা গরিব, তবে তাদের শালীন আচরণের তুলনা নেই। তোমরা জংলি নও। তোমরা হলে আসল ভারতীয় দূত।

আসল ভারতীয় দূত, এই উক্তি জাহাজে উঠে মনে থাকার কথা না। বিপদে পড়লে মনে পড়ত।

যেমন মেয়েটি না খেলে, বল নিয়ে দৌড়ে পালাল। বেশ সুন্দর জ্যোৎস্না উঠেছিল। বুলেভার্ডে মসৃণ ঘাস, গালিচার মতো। খুব যত্ন নেওয়া হয় ল্যান্ডমেয়ারে কাটা ঘাস হাঁটলেই বোঝা যায়।

দেখাই যাক না কী হয়।

আমি ঘাসের ওপর বসে পড়লাম।

দোতলার কোনো ঘরে কে আলো জ্বেলে দিল। রঙিন কাচের ভিতর এক নারীমূর্তিকে হাঁটাহাঁটি করতে দেখলাম। তারপর অদৃশ্য হয়ে গেল।

কেমন সব মরীচিকার মতো, এই আছে এই নেই। কিন্তু বাড়ি থেকে আর কেউ প্রায় বেরই হল না। কিছুক্ষণ পর একটা গাড়ি বের হয়ে গেল। আবছা আলোয় টের পেলাম, গাড়িতে সে আছে।

জাহাজে ফিরতে ইচ্ছে করছিল না।

আমি সাদা টেনিস বল যতবার হাতে দিয়েছি, ততবার সামান্য নত হয়ে বাউ জানিয়েছে।

কেমন ফাঁকা ফাঁকা লাগছিল।

হাজার হাজার মাইল দূরে আমি ঘাসের ওপর শুয়ে আছি। ছোটো ছোটো ভাইবোনদের অনাহার থেকে রক্ষা করার এ-ছাড়া আমার আর কোনো উপায়ই ছিল না।

বাবার বিষণ্ণ মুখ মনে পড়ছে।

মা-রও।

ছোট ভাইরা তখন চারপাশে ঘিরে দাঁড়িয়ে থাকে। তাদের এক কথা দাদারে।

আমি নিজের সঙ্গে নিজে কথা বলি।

দাদারে।

বল।

ফিরবি না! কত রাত হল?

আমার মধ্যে আবার সে জেগে ওঠে—অথচ পিতার একমাত্র প্রথম পুত্র।

আমি উঠে বসি। জাহাজে ফিরে যাই।

গ্যাঙওয়ে ধরে উঠে যাবার জন্য সিঁড়ি ভাঙছি। কেমন ক্লান্ত মনে হত নিজেকে। জাহাজ কবে ফিরবে দেশে কেউ বলতে পারে না। কতকাল এভাবে জাহাজ নিয়ে বন্দরে বন্দরে ঘুরবে তাও জানি না। জাহাজ সমুদ্রে ভাসলেই আতঙ্ক। সেই ওয়াচ, টন টন কয়লা টেনে নিয়ে যাওয়া, রাশি রাশি ছাই হাপিজ করা কাজ সেরে উঠে এসে স্নান আহার, তারপর লম্বা হয়ে শুয়ে পড়া।

কিন্তু কী যে আতঙ্ক ছিল, কিছুতেই ঘুম আসত না।

এই বুঝি উঠে এল— ইঞ্জিন রুমে যাদের ‘পরি’ থাকে, তাদেরই কাজ জাগিয়ে দেওয়া, আমার দিনের ‘পরি’ অর্থাৎ ওয়াচ ছিল আটটা বারোটা। রাতেও আটটা বারোটা। চার ঘন্টা করে কাজ আট ঘন্টা বিশ্রাম ঠিক তবে কী দিনে, কী রাতে আমার ছিল অস্বস্তি। ওয়াচে যেতে হবে শুনলেই আতঙ্কে মুখ কাল হয়ে যেত।

তবে তিন চারমাসে রপ্ত হয়ে উঠেছিলাম। আগের মতো ওয়াচের আতঙ্কে ভুগতাম না। ডাঙা এলে খুশির জোয়ারে ভেসে যেতাম। শহরের রাস্তা ধরে হেঁটে গেছি, পাহাড়ি বন্দর হলে টিলায় উঠে সমুদ্রে সূর্যাস্ত দেখেছি, আর সব বন্দরেই একটা না একটা মোহে পড়ে গেছি।

ফিরতে বেশি রাত হওয়ায় সারেঙ সাব মুখ গোমড়া করে ফেলেছেন। নিশ্চয়ই দেবনাথদারা এসে সব বলেছে। কোনো তরুণীর টেনিস বল কুড়িয়েছি শুনে সারেঙ সাব নিশ্চয়ই ভেবেছেন ছোড়া হয়ে গেল। কিন্তু তার জন্য এত রাততো হবার কথা নয়। রাস্তা হারিয়ে ফেললে, বন্দরে ফেরা যাবে না এই দুশ্চিন্তাও থাকতে পারে।

আমাকে দেখে তিনি কথা বললেন না। আমি ফেরায় তিনি নিশ্চিন্ত দেখে তাও মনে হল না। কেবল সিঁড়ি ধরে নীচে নামার সময় বললেন, তোর খাবার ভাণ্ডারি ঢাকা দিয়ে রেখেছে। হাতমুখ ধুয়ে খেয়ে এবারে উদ্ধার কর।

পরদিন সেজে গুজে একাই বের হয়ে গেছিলাম। যেন হেঁটে গেলেই দেখতে পাব একটা ইউক্যালিপটাস গাছ দাঁড়িয়ে আছে। পাচিলের পাশে সাদা সাদা খাটো ফ্রক গায়ে টেনিস খেলছে।। রোজই কেন যে মনে হত, আজ হয়ত গিয়ে তাকে দেখব না।

ঠিক দূর থেকে দেখলাম গাছটা।

কিন্তু কেউ খেলছে না।

তবে কী আমার মতো একজন অপরিচিত তরুণের বল কুড়িয়ে দেওয়া পছন্দ নয়।

তা ছাড়া মারধর করবার জন্য দলবল নিয়ে বাড়ির ভিতর সে ঘাপটি মেরে নেই ত। এমনও মনে হত।

মনটা দমে গেল।

জাহাজে ফিরে যাব ভাবছি। যদি সত্যি গেট খুলে ওরা ছুটে আসে। মেরে ছাল চামড়া তুলে দিতে পারে। এ-সব যখন ভাবছিলাম, তখনই দেখি মেয়েটা গাছের নীচ দিয়ে ছুটে আসছে। এক হাতে র্যাকেট অন্য হাতে টেনিস বল।

আমাকে দেখে মিষ্টি করে হাসল। তারপর বলটা ওপরে ছুঁড়ে দিয়ে সার্ভ করতেই আমার সব সংশয় জল হয়ে গেল। না, আমাকে সে খারাপ লোক ভাবেনি। আমি যে জাহাজি তাও বুঝতে পেরেছে। কারণ আমার চেহারা এবং পোশাকে দূর সমুদ্রের ঘ্রাণ আছে মেয়েটি বোধ হয় টের পেয়েছিল।

সেদিন সে ইচ্ছে করেই দেরি করেছিল, না টানে-টানে আমিই সকাল সকাল জাহাজ থেকে নেমে গেছিলাম মনে করতে পারছি না। কেবল মনে আছে দুধে আলতা রং তার। চোখ কালো, চুল নীলাভ। মুখে তার আশ্চর্য দেবী মহিমা।

সে সেদিন ইচ্ছে করেই বল বেশি মিস করছিল, আর আমি দৌড়ে দৌড়ে তার বল কুড়িয়ে দিয়ে যখন কৃতার্থ হচ্ছিলাম, তখনই একবার র্যাকেটটা বগল দাবা করে আমার দিকে এগিয়ে এল। মিষ্টি হেসে কী বলল, তার এক বর্ণও বুঝলাম না।

তবে আমি বললাম, ইয়েস সি সেলর।

কী বুঝল সেই জানে।

আবার বল নিয়ে সার্ভ করল। পাঁচিলে ঠেকে বল ফিরে আসছে, ডান হাত বাঁহাতে সে বল পাঁচিলে ফিরিয়ে দিচ্ছে। একটা বলও মিস করছে না।

আমি বোবার মতো পাশে দাঁড়িয়ে তার এই মজার খেলা দেখছি।

সে যে কী বলল!

আমার ভালো লাগছিল না। আশ্চর্য সে একটা বলও মিস করছে না। মিস না করলে আমার আর থেকে কাজ কী। আমি তো তার বল কুড়িয়ে দেবার জন্যই দাঁড়িয়ে থাকি। বোধহয় ভিতরে কোনো অভিমান কাজ করে থাকতে পারে। আমি হাঁটা দিচ্ছিলাম, আর তখনই—হুই। শিস দেবার মতো আমাকে উদ্দেশ্য করে কিছু যেন বলল।

কাছে গেলে দেখি সে র্যাকেটটা আমার দিকে এগিয়ে দিচ্ছে। বলটাও।

আমি যে এ-ব্যাপারে একেবারে আনাড়ি মেয়েটা বোধহয় জানে না। তাও ভাবতে পারে সাদা বলের প্রতি এত যখন আগ্রহ, তখন আমারও খেলার ইচ্ছে আছে। সে আমার হাতে র্যাকেট তুলে দিতে এলে সরে দাঁড়ালাম— বললাম, নো নো।

তারপর বললাম, আই নো নাথিং অফ দিস গেমস।

আমার কথা সে কিছুই যে বুঝতে পারছে না, হাব ভাবেই বোঝা গেল।

সে আমার হাতে র্যাকেট দেবেই।

আমি খেলব সে বল কুড়োবে। খুব কাছে থেকে বুঝলাম, সে সবে বালিকা বয়স পার করেছে। একজন প্রৌঢ় মতো লোক বের হয়ে এলে তাকে কিছু বলল মেয়েটা। সেও আমার দিকে তাকিয়ে হাতের ইসারায় কিছু বোঝাবার চেষ্টা করল।

তখনই টের পেলাম হাতের ইশারায় কিংবা মুখের অঙ্গিভঙ্গি দিয়ে বোঝাতে না পারলে মেয়েটা আমার কোনো আগ্রহের কথাই বুঝবে না।

খেলার চেয়ে বল কুড়িয়ে আনার আগ্রহ যে বেশি, বোঝাই কী করে।

এ ছাড়া র্যাকেট কি ভাবে ধরতে হয় জানি না। যদিও এটা কোনো সমস্যা নয়— কিন্তু বল ছুঁড়ে মারতে গেলে ফসকে যাবারই সম্ভাবনা বেশি।

খুবই কাঁচা কাজ হয়ে যাবে ভেবে র্যাকেটটা কিছুতেই নিচ্ছিলাম না। জোর করে গছাবেই. অজস্র কথাও বলছে, যার এক বর্ণ বুঝতে পারছি না।

ওর শরীরে ভারি সুঘ্রান।

সামান্য হাওয়ায় ওর বব করা চুলে ঢেউ খেলে যাচ্ছিল। যেন এই যে বালিকা কিংবা তরুণী যাই বলা যাক, তার মুখে সামান্য অভিমানও ফুটে উঠতে দেখলাম।

এত নাছোরবান্দা হলে পারা যায়।

যেন খুশি করার জন্যই র্যাকেট হাতে সাদা বল মাথার ওপর ভাসিয়ে দিলাম।

যা হবার তাই হল।

কোথায় যে গেল বলটা।

ফসকে গেছে। এত জোরে মেরেছিলাম যে র্যাকেটও ফসকে গেল হাত থেকে।

আর আশ্চর্য দেখি মেয়েটা ফুলে ফুলে হাসছে। হা হা করে হাসছে। এত হাসছিল যে আমি খুবই অপ্রস্তুত হয়ে গেলাম।

বয়সের দোষে অপমান বোধ প্রখর।

আমি হাঁটা দিতেই মেয়েটা এসে পেছন থেকে আমাকে জড়িয়ে ধরল।

না এতটা আমি আশা করিনি, সমবয়সী এক তরুণ তার খেলা দেখার জন্য একা একা দাঁড়িয়ে থাকে—এটা তার কাছে কোনো বিস্ময়ের কারণ হতে পারে—কিংবা এপ্রিসিয়েট করছে তার খেলার এটাও ভাবতে পারে—সে যাই ভাবুক, আমি নড়তে পারলাম না।

সে হাত টেনে আমাকে নিয়ে গেল। কী করে র্যাকেট ধরতে হয় দেখাল, কী করে বল ছুঁড়ে দিতে হয় দেখাল। এবং সে আবার হাতে র্যাকেট দিয়ে অপেক্ষা করতে থাকল, আমি ঠিক মারতে পারি কি না।

র্যাকেটটা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়েছি। আর হাসির খোরাক হতে রাজি না। সে দু-হাত নাচিয়ে আমাকে এনথু দিতে চাইছে। আমি যে কী করি!

সে এসে এবার র্যাকেটটা আমার হাত থেকে তুলে দিল। কী ভাবে ধরতে হয় দেখাল। বল লুফে মারতে হয় কী ভাবে তাও দেখাল। টেনিস র্যাকেট এত ভারী তাও আগে জানতাম না। দেখিওনি। খুব বেশি ব্যাডমিন্টন খেলেছি কলেজে। দু-র্যাকেটের আকাশ পাতাল তফাত। কব্জির জোর না থাকলে হয় না।

তারপর আমি আবার মিস করলাম।

সে আবার দেখিয়ে দিল।

একবার সত্যি লেগে গেল।

আর মেয়েটা হাততালি দিয়ে আমাকে চিয়াস করল।

এই হল আমার মরণ।

আমাদের জাহাজ বুয়েন্সএয়ার্স বন্দরে বোধহয় মাসখানেক ছিল। পাটের গাঁট নামানো, তারপর মাল বোঝাই হবার সময় আচমকা বন্দরে শ্রমিক ধর্মঘট।

জাহাজ টানা একমাসই বন্দরে লেগে থাকল। আর ক্রমে আমি চেরির ঘনিষ্ঠ হয়ে গেলাম। তার নাম চেরি। একদিন সে হাতে করে ফল এনে দেখাল। একবার আঙুলে ফল

দেখায়, একবার আঙুল বুকে ঠেকায়। একদিন সে ইশারায় বোঝাল, আমার জাহাজ দেখতে আসবে। কিন্তু আমি যে সেকশনে থাকি, তা খুবই অপরিষ্কার, তাকে এনে কোথায় বসাব এই দুশ্চিন্তায় মাথা খারাপ। সারা সকাল বাংক পরিষ্কার করলাম। বিছানার চাদর কেচে ফেললাম। নোংরা পোষাক সব লকারের এক কোনায় কাগজ দিয়ে মুড়ে ফেললাম। সারেঙ সাবকে বলে বাংকে রং লাগালাম। বাংকে সাদা রং। তারপর কসপের কাছ থেকে একটা পুরোনো কম্বল এনে গালিচার মতো মেঝেতে বিছিয়ে দিলাম। আমার সাফসুতরোর ব্যাপারে এত মনোযোগ দেখে সব জাহাজিরা বেশ তাজ্জব বনে গেছে। বনার্জীর এই সুমতি—তার তো কিছুই ঠিক থাকে না। হপ্তার পর হপ্তা সমুদ্রে এক জামা-প্যান্ট পরে কয়লা টানি। ঘাম বসে গিয়ে শক্ত খড়খড়ে প্যান্ট। সারেঙ সাব দেখলে শুধু প্যান প্যান করেন। বলেন, তোর ঘেন্নাপত্ত নেই। দোতলাটায় আমরা দুজন থাকি। উপরে থাকে বাহারুদ্দিন। ওকে বাহার বলে ডাকি। গরমের সময় সমুদ্রে সে লোকসা ফোকসালে হয় গামছা নয় তোয়ালে পরে থাকে। খালি গা। তবে বুয়েন্সএয়ার্সের প্রচণ্ড ঠান্ডায় লুঙ্গি পরলেও, ওপরে পুলওভার গায়ে দেয়।

ওকে নিয়েই ঝামেলা।

ওর সতরঞ্জি শতছিন্ন। নানা জায়গায় সেলাই করা। কৃপণ স্বভাবের। ওর ফুটো কম্বল এবং মোটা কাঁথা এখুনি কোথায় যে রাখি। একমাত্র সারেঙ সাব যদি রাজি হন।

সারেঙ সাব রাজি। একজন কয়লাওয়ালার পেটি তার ঘরে রাখা খুব সম্মানের না। তবু সে জাহাজে আসবে শুনে সারেঙ সাব কেন যে আমার সম্মান রক্ষার্থে নিজেই দায়িত্ব নিয়ে ফেললেন। বাটলারের কাছ থেকে ফুলদানি পর্যন্ত চেয়ে আনলেন। এক গুচ্ছ মিমোসা ফুল ফুলদানিতে রাখলাম। প্রায় পূজা-পার্বণের মতো ঘরটাকে সাজিয়ে ফেললাম।

আমরা ইশারায় ততদিনে কথা বলতেও শিখে গেছি। দুটো একটা ইংরেজি সেও জেনে নিয়েছে। সে এলে কফি সার্ভ করা হল। এক প্লেট বিরিয়ানি দেওয়া হল। সে খেয়ে খুব খুশি। সর্বাগ্রে সঙ্গে সে ইশারায় কথা বলার চেষ্টা করছে। তাকে আমি ইঞ্জিনরুমে নামিয়ে সব ঘুরে ঘুরে দেখিয়েছি।

সেও আমায় তার গাড়ি করে এক বিকেলে এভিতাতে নিয়ে গেল। এভাপেরনের সমাধিক্ষেত্র দেখলাম। কী শান্ত আর নির্জন। বড়ো বড়ো গাছের ছায়ায় নায়িকা এভাপেরনের সমাধি। গাড়ি করে দূর দূর থেকে লোক আসে। সেখানে আমি আর চেরি ঘাসের ওপর চুপচাপ শুয়ে থাকতাম। পাখিরা সমুদ্র থেকে উড়ে আসত। যেন এক মায়ায় জড়িয়ে যাচ্ছিলাম চেরির সঙ্গে। তার মা বাবা একদিন আমাকে জাহাজ থেকে নিয়ে গেল। আমরা খাওয়াদাওয়া সেরে সে দেশের বিখ্যাত আপেলবাগান দেখতে বের হয়ে গেলাম।

অথবা কোনো বিকেলে, কিংবা সাঁজবেলায় আকাশের নক্ষত্র দেখতে দেখতে আমার মনে হত, কতদূরে আমি। ঘাসের ওপর বসে আমরা কখনো হাতে হাত মিলিয়ে অদ্ভুত এক খেলা খেলতাম। এক দুই পাঁচ, তিন সাত চার, এমন ছিল খেলার হিসাবটা। কোথায় হাতের পাতা পড়বে, কোন দিকে, নীচে না ওপরে, না কোমরের কাছে, মাঝে মাঝে ভুল করে ফেললে প্রথম থেকে আবার শুরু করতে হত খেলাটা—এইভাবে এক বিকেলে কেন যে আমার মনে হচ্ছিল, এদেশ ছেড়ে গেলে আমি বাঁচব না। সে আর কোনোদিন পাঁচিলের পাশে এসে র্যাকেট হাতে নিয়ে দাঁড়াবে না, আমিও আর কোনোদিন সাদা বল তার হাতে কুড়িয়ে দিতে পারব না। যখন চেরির জন্য টান ধরে গেছে, ওদেশে থাকারও একটা হিল্লে হয়ে যেতে পারে— চেরিই বলেছিল, ওহ ইন্ডিয়ান।

'ওহ ইন্ডিয়ান' কথাটা এত বেশি গেঁথে গেছিল মনে যে সে আর আমি তাদের বাগানে ফুল চোর সেজে ছোটাছুটি করেছি কত বিকেলে।

এক বিকেলে গিয়ে দেখলাম, চেরি নেই।

সে চলে গেছে।

কোথায় গেছে?

তারা যা বলে বুঝি না।

কবে ফিরবে। তাও তাদের ভাষা থেকে ধরতে পারি না। কেমন ভেঙে পড়েছিলাম। না বলে কোথায় গেল। কবে ফিরবে। একবারও তো বলেনি। আবার বলতেও পারে, আমিই ঠান্ডায় তার ইশারা ধরতে পারিনি। বুলেভার্ডে রোজ গিয়ে বসে থাকি। জাহাজ ছাড়ার সময় হয়ে যাচ্ছে। এ-দেশে থাকি না থাকি, যাবার আগে তার সঙ্গে একবার দেখা হবে না ভাবতে পারি না।

গেটে তালা।

দরজা জানালা বন্ধ।

কেউ নেই বাড়িটাতে।

আর আমার কেন যে প্রত্যাশা ছিল, যেখানেই থাক, জাহাজ ছাড়ার আগে ঠিক চেরি চলে আসবে। অন্তত ও-দেশ ছেড়ে যাবার আগে তার সঙ্গে আর দেখা হবে না ভাবতে পারি না।

রোজ যাই। গাছের ছায়ায় বসে থাকি।

দূর থেকে কোনো গাড়ি এলে মনে হত বাড়িটার সামনে থামবে। গেট খুলে চেরি তার বাবা মা এবং একজন কাকাও ছিল বোধহয়, তবে সম্পর্কটা সঠিক কি বুঝতে পারিনি।

এভাবে একদিন দেখলাম জাহাজ ছাড়ার নিশান উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

চবিবশ ঘন্টা আর মাত্র আছি এ-বন্দরে।

ভোর রাতে জাহাজ ছাড়বে।

জাহাজ ছাড়ার আগে কিছু কাজ থাকে, ডেক পরিষ্কার করা, ফল্কার কাঁঠ ফেলে ত্রিপল দিয়ে ঢেকে দেওয়া খিল এঁটে দেওয়া চারপাশে—এই সব কাজ যত দেখছি, তত মুখ আমার শুকিয়ে যাচ্ছে। বিকেলে গেলাম। সাঁঝবেলায় ফিরে এলাম। ভিতরে কেন যে এত ছটফট করছিলাম জানি না। অন্তত জাহাজ ছেড়ে দিচ্ছে। আমরা বন্দর ছেড়ে চলে যাব, আর হয়তো জীবনে চেরির সঙ্গে দেখা হবে না। ভাবতেই চোখ ফেটে জল বের হয়ে এল।

এবং কেমন ঘোরে পড়ে গেছিলাম। মাঝরাতে জাহাজ থেকে পালিয়ে ভেসে যাব ভাবছি —এবং ডেক ধরে যাবার মুখেই দেখি পেছনে কে আমাকে অনুসরণ করছে। সারেঙ সাব।

কোথায় যাচ্ছিস?

মেজাজ খারাপ হয়ে গেল। সাড়া মুখে তিক্ততা ভেবেছে কী। আমি কোথায় যাচ্ছি, না যাচ্ছি, এতে তার কী দায় থাকতে পারে। আমি মরি বাঁচি, তার কি তাতে আসে যায়।

প্রায় আর্তনাদ করে উঠেছিলাম—আমি যেখানে যাই, আপনার কী তাতে।

আমার কী! তিনি আমার কাঁধে হাত রেখে বলেছিলেন, আমার কিছু না। তোর বাবা-মার কথা ভাবলি না। পালাচ্ছিলি।

তার তখনই মনে হল, কে যেন ডাকছে, দাদারে বাড়ি ফিরবি না।

কত দূর দেশে আমার বাবা-মা, আমার ভাই বোনেরা রয়েছে। আর আমি কবে ফিরব এই অপেক্ষায় আছে। এজেন্ট অফিস থেকে বাবার নামে মাসোহারা যায়। জাহাজ ছেড়ে দিলে সব বন্ধ হয়ে যাবে।

আমি ফিরে এলাম। বাংকে শুয়ে গোপনে অশ্রুপাত। কার জন্য এখন আর সাঠিক মনে করতে পারছি না। বাবা-মা, ভাই বোন, না চেরি।

যাই হোক জাহাজ ছেড়ে দিলে চুপচাপ গ্যালির পাশে বেঞ্চিতে বসে থাকলাম। যতক্ষণ না বন্দর চোখের ওপর থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল, বসে থেকে ছিলাম।

কার্ডিফ বন্দর ছাড়ার সময়ও এক পরিস্থিতি। ইমানুল্লা সারেঙ নজর রাখছেন। এমন ভাবলেই আমার মাথা গরম হয়ে যেত সারেঙ সাবের ওপর। কেবল মনে হত আমার ভালোমন্দ দেখার এত দায় কে দিয়েছে আপনাকে। আমি জাহান্নামে গেলে আপনার কি! কিছু বললেই চটে যেতাম। এবং মনে হত, তিনি আপদবিশেষ। জাহাজের কাজকর্ম ছাড়া হয়তো খবরদারি করার কথাও নয়। বন্দরে কে কোথায় রাত কাটায়, জানার তাঁর কোনো

অধিকার নেই। আমার বেলায় তাঁর যত নজর। কেমন যেন জেদি হয়ে যাচ্ছিলাম। উচিত শিক্ষা দিতে হবে। যাতে তিনি কখনো আর আমার ব্যক্তিগত কাজেকর্মে নাক না গলান, সেজন্য মরিয়া হয়ে উঠলাম।

বোধহয় সময়টা জুন-জুলাই। প্যাচপ্যাচে বৃষ্টি। কার্ডিফ থেকে এই বৃষ্টির মধ্যেই খালি জাহাজ নিয়ে আমরা রওনা হলাম।

কাছাকাছি আর কোনো বন্দরে জাহাজ ধরছে না।

বুয়েন্সএয়ার্স থেকেও আমরা খালি জাহাজ নিয়ে রওনা হয়েছিলাম। ভিক্টোরিয়া পোর্টে মাত্র দুদিনের জন্য থেমেছিল। ব্রাজিলের এই বন্দরটি লৌহ আকরিক রপ্তানির জন্য বিখ্যাত। দু-দিনেই লৌহ আকরিকে জাহাজ বোঝাই । সেখান থেকে টানা সমুদ্র ভেসে গেছি বে অফ বিসকে পর্যন্ত। প্রায় মাসখানেক জাহাজ সমুদ্রে।

কার্ডিফে মাল খালাস। ড্রাই-ডক সারতে বিশ-বাইশ দিন কী বেশি সময় লেগেছিল সঠিক এখন আর মনে নেই।

শুধু মাসখানেক পর আমরা পোর্ট অফ জামাইকা যাব। যেখানে জাহাজের রসদ নেওয়া হবে।

ক্যারাবিয়ান সিতে দু একদিনের জন্য নোঙর ফেলা হবে। জাহাজের চার্টে এমন খবর পেয়ে আমরা বেশ মুষড়ে পড়েছিলাম। কারণ তারপর কোনদিকে কী নিয়ে রওনা হবে জানি না বলে মন বেশ খারাপ।

এমনিতেই জাহাজটা লরঝরে। সাউথ-ওয়েলসের উপকূল থেকে একটানা এতদিন জাহাজটা ভেসে চলতে পারবে কি না সংশয়। প্রায়ই মনে হত জাহাজ বন্দর ধরার আগেই সমুদ্রে ডুবে যাবে। ঝড় সাইক্লোনে পড়লে এটা বেশি মনে হত। এই বুঝি স্টিয়ারিঙ ইঞ্জিন ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। কারণ আমাদের ঠিক মাথার উপরেই ছিল হালের যন্ত্রপাতির ঘর। ঝড়ে মাঝে মাঝে উদ্ভট সব শব্দ পেতাম। একদিন তো দৌড়ে উঠেও গেছিলাম— দেখি না ক্রাংক ওয়েভগুলো ঠিকমতোই কাজ করছে।

আসলে আমরা যাচ্ছি কান্দি নিউ পোর্টে।

তার আগে পোর্ট অফ জামাইকা থেকে শুধু রসদ তোলা।

জাহাজ ছেড়ে দেবার পর কার্ডিফ বন্দরও অদৃশ্য হয়ে গেল। এ যে গভীর সমুদ্রে জাহাজ। আবার সেই ওয়াচ, কয়লা টানা, ছাই হাপিজ করা, চান, খাওয়া, ঘুম। প্রতিদিন একই দৃশ্য, নীল আকাশ। নীল সমুদ্র। অনন্ত অসীম এই সমুদ্র যাত্রা কবে যে শেষ হবে তাও জানি না।

বুঝতে পারছি, এবারে আমি একটু বেশি বেপরোয়া হয়ে উঠছি। ইমানুল্লা সাবের কাজে নাজিরা যেন ডাইনি। তার সঙ্গে ঘুরে বেড়িয়েছিলাম বলে দু-দিন কোনো কথাই বললেন না।

মাঝে মাঝে সারেঙ সাবের এমন ছেলেমানুষী দেখে আমার হাসি পেত। নাজিরা কি আমাকে খেয়ে ফেলবে। আমি কী সত্যি কোনো বন্দরে হারিয়ে যেতে পারি! হারিয়ে গেলে, তাঁর কী! আর যদি আমার ব্যক্তিগত অভিরুচিতে বারবার তিনি হস্তক্ষেপ করেন তবে রাগ হয় না।

জানি না কেন, অনেকের মতো আমিও 'ফুল' নেব জানতে পেরে আবার সারেঙ সাব খাপ্পা।

ছোটোটিন্ডাল করিম মিঞা ব্যাংক লাইনের পুরোনো জাহাজি। সে অনেক খবর রাখে। কারণ নিউপোর্ট থেকে জাহাজ সালফার বোঝাই হয়ে পানামা ক্যানেল অতিক্রম করে আবার দূর সমুদ্রের যাত্রা। পানামা ক্যানেল অতিক্রম করার সময় কে ফুল নেবে, এমন কথাবার্তা আমার কানে এসেছিল। বঙ্কুই এসে খবর দিয়েছিল, ছোটোটিন্ডালের ঘরে যা। ডাকছে।

আমি এখন লকার গোছাচ্ছিলাম। মা শীতে কষ্ট পান বলে একটা কম্বল কিনেছি। সেটা যত্ন করে ভিতরে গুছিয়ে রাখছিলাম।

'ফুল নেব' এমন খবর যে সারেঙ সাবের মাথা খারাপ করে দিতে পারে আমি জানতাম। অনেক হয়েছে আর না। ঘোমটার তলে খ্যামটা নাচ আর ভালো লাগছে না। জাহাজিরা যা আমিও তাই। অত শুচিবাই জাহাজে উঠলে চলে না।

বঙ্কুকে বললাম, যা আমি যাচ্ছি।

আমার ফোকসালে দুটো বাংক।

নীচের বাংকে থাকত বাহার। সে সারেঙের 'ফালতু' ছিল। অর্থাৎ অতিরিক্ত কোলবয়। আমাদের সাতজনের একজন। কার কঠিন অসুখ-বিসুখ হলে সে তার হয়ে পরি দিত। অন্য সময় সারেঙ সাবের ফুটফরমাস খাটত বাহার।

বাহারের মেজাজ বেশ দরাজ উঠেই টের পেয়েছিলাম। সে নীচের বাংকটা আমাকে ছেড়ে দিয়েছিল। উপরের বাংকে শুলে ঝড় সাইক্লোনে ঘুমোতে বেশি অসুবিধা। বেশি ওঠানামা করে বাংক। সে আমার সুবিধার দিকটা সব সময় নজর দিত। আমার টোবাকো কিংবা চিনি রেশনে সেই তুলত। সিগারেট খাওয়ার অভ্যাস ছিল না। সেও ধূমপায়ী ছিল না বলে আমাদের টোবাকো জমে যেত। এবং কিনারায় সে টোবাকো তিন গুণ দামে বিক্রি করে আমার প্রাপ্য কড়ায় গণ্ডায় মিটিয়ে দিত। এই করে আমাদের হাতে অতিরিক্ত পয়সা

এসে গেছিল। যার জন্য সহজেই একটা দামি কম্বল কিনে ফেলতে পারলাম। ঘাটে জাহাজ গেলে কোম্পানির ঘর থেকেও কিছু পয়সা তোলা যায়। সব মিলিয়েই কম্বল কেনার পয়সা জোগাড় হয়ে গেছিল। ফন্দিটা জুগিয়েছিল বাহারই। সেই বাহার কার্ডিফ বন্দরে হাওয়া হয়ে যাওয়ায় পুরো ফোকসালটা আমার একার দখলে এসে গেছিল।

আমরা তখন মিসিসিপি নদীর মোহনার সামান্য ভিতরে ঢুকে গেছি।

সেই এক ফুলের খবর। করিম টাকা পয়সা তুলছে।

যত শুনি তত নারীসঙ্গ পাবার জন্য মনটা উতলা হতে থাকে। বারবার সারেঙ সাব নিষেধ করলেন, ছোটোটিন্ডালের ফাঁন্দে যেন না আটকে যাই।

কেন যে এটা সারেঙ সাবের বাড়াবাড়ি মনে হচ্ছিল এখন ভাবলে কষ্ট পাই।

সে যাই হোক, নিউপোর্ট আমরা নামতে পারলাম না। পোর্ট অফ সালফারেও না। কাপ্তান সারেঙ সাবের কাছে খবর পাঠালেন, কিনারায় আমরা যেন কেউ না নামি।

আমেরিকার দক্ষিণ মুল্লুক এটা।

বর্ণবিদ্বেষ প্রবল। কিছুদিন হল কালো সাদায় দাঙ্গা হয়ে গেছে। ভারতীয় জাহাজিদের নামার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা জারি হয়ে গেল।

এতেও হয়ত মনটা আরও বেশি উৎক্ষিপ্ত হয়ে গেছিল। গোপনে ছোটোটিন্ডালের হাতে ফুলের দাম একবারে পৌঁছে দিলাম।

এত কাছে ডাঙা। জেটি পার হলে বড়ো বড়ো তেলের পিপে রোদে ঝলমল করছে। শহর এলাকা একটু দূরে। তবু বোট ডেক থেকে নারী পুরুষের ফারাক বুঝতে পারে। আমরা বন্দি জীবন প্রায় যাপন করছি। কাঁহাতক সহ্য হয়।

আমার সঙ্গে সেকেন্ড অফিসারের কিছুটা গোপন দস্তি আছে জাহাজিরা জানে। তার সঙ্গে ইচ্ছে করলে নেমে যেতে পারি। কারণ আমি এমনিতেই বেস ফর্সা। জাহাজে উঠে সমুদ্রের নোনা হাওয়ায় রঙ আরও খুলে গেছে। সাহেবের স্বজাতি বলে চালাতে কষ্ট হবার কথা নয়। ইচ্ছে করলে নেমে যেতে পারি। ঘুরে আসতে পারি। কিন্তু ওই যত গেড়ো ইসানুল্লা সারেঙ। তার চোখে ফাঁকি দেওয়া কঠিন। আর কিনারায় নেমে যদি শেষে ধরা পড়ে যাই তবে আর এক কেলেঙ্কারি। সাত পাঁচ ভেবেই পোর্ট অফ সালফারেও নামা হল না।

আর এতে নিজের ভিতরে সেই চিরন্তন নাবিকের নেশা যে আরও পাক খেয়ে উঠছে বুঝতে কষ্ট হত না। তা না হলে বোধহয় এত মরিয়া হয়ে উঠতাম না।

সালাফার নিয়ে আবার পাড়ি দিতে হবে দূর সমুদ্রে। মাসখানেক, কি তারও ওপর জাহাজ ক্রমাগত সমুদ্রে ভেসে চলবে। কেবল লিখলেন যেতে আমরা পানামা ক্যানেলের দু-পাশের ডাঙা দেখতে পাব। এ-ছাড়া শুধু দিনরাত সমুদ্র, নীল আকাশ, ঝড় জল আর মাঝে মাঝে সমুদ্র পাখিদের ওড়াউড়ি দেখা।

জাহাজ পোর্ট অফ সালফার থেকে দড়ি-দড়া খুলে দিল। মোহনা থেকে জাহাজ ভেসে পড়েছে সমুদ্রে। জাহাজের পেছনে উড়ে আসছে সব সমুদ্রপাখি। ডানা সাদা, হলুদ ঠোঁট কবুতরের মতো দেখতে বিশাল আকারের পাখিগুলি টানা কতদিন যে জাহাজের পেছনে উড়ে চলবে আমরা জানি না।

কখনো-কখনো দু-এক জোড়া পাখি আমাদের জাহাজের মাস্তুলে এসেও বসে থাকত। তাদের সঙ্গে আমরা কথাও বলতাম—বেশ আছ তোমরা, তোমার নারী তোমার পাশেই বসে আছে, উড়ছে। ঢেউ-এর মাথায় বসে সমুদ্রে ভেসে যাচ্ছে। তোমাদের হিংসা হয়। এমনই কথাবার্তা হত পাখিরা এসে মাস্তুলে বসে থাকলে।

জাহাজ তখন গভীর সমুদ্রে। খুব একটা ঝড়ঝাপ্টা নেই। কাজ সামাল দিতে কষ্ট হয় না। অবলীলায় কাজ কাম সেরে শিষ দিতে দিতে সিঁড়ি ভাঙতে পারি। উঠতে পারি বোট-ডেকে। শরীর দানবের মতো মজবুত হয়ে উঠেছে। হাতে পায়ের পেশি শক্ত হয়ে গেছে। সমুদ্র আমাকে অজ্ঞাতেই তার মতো সহনশীল করে নিতে পেরেছে। স্বাধীন হতে শিখিয়েছে। আমার ব্যক্তিগত অভিরুচির ওপর কারও খবরদারি একদম আর সহ্য করতে পারছি না।

এক রাতে সারেঙ আমাকে ডাকলেন। তিনি সেদিন আমাকে নিয়ে উপরে উঠে গেলেন না। দরজায় ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে। খোপকাটা লুঙ্গি পরনে। মাথায় সাদা টুপি। গায়ে ফতুয়া।

তিনি বললেন, তুই নাকি ফুল নিবি বলেছিস!

নেব বলেছি।

সারেঙ সাবের মুখ থম থম করছে ক্ষোভে দুঃখে। তিনি বললেন, তুই নিবি!

হ্যাঁ নেব।

তুই নিবি বলতে পারলি। তোবা আল্লা! বলে সারেঙ সাব দরজা বন্ধ করে দিলেন মুখের ওপর।

নীচে এসে দেখি বন্ধু আমার ফোকসালে বসে চা খাচ্ছে।

বন্ধুকে দেখেই ক্ষেপে গেলাম। আসলে আমি সারেঙ-এর তপ্লিবাহক, আমার বেশিদূর যাবার ক্ষমতা নেই কারণ সারেঙ সাব যখন ডেকে পাঠিয়েছেন, আমার ক্ষমতার দৌড়

শেষ—এবং এসব ভেবেই সে মজা পাচ্ছিল, কিংবা মজা দেখার জন্যই আমার ফোকসালে ঢুকে বসে আছে। বললাম, তুই এখানে কেন!

না দেখতে এলাম, সাধু পুরুষের কী সাধ যায়।

না পেরে বললাম, কেন ফুল নিতে পারি না!

পারবি না কেন! পারবি। তবে শেষ পর্যন্ত পারবি কি না জানি না। সারেঙ সাব মাথার ওপর আছেন ত।

সবই কেমন বিদ্রুপের মতো শোনাচ্ছে। আমি বললাম, ঠিক আছে, যা। এখন আমি শোব।

ওপরের বাংক খালি দেখে বঙ্কু আমার ফোকসালে চলে আসবে বলেছিল। কিন্তু সারেঙ সাব রাজি হননি। রাজি না হবার কারণ পরে বুঝতে পেরেছি। দেশের খত কতজনার আমি লিখে দিই। দরকারে সারেঙ সাবের। আমার ফোকসালে অন্য কেউ থাকলে অসুবিধা। খতে কত ব্যক্তিগত কথা থাকে। এসব কথা দশকান হলে মন্দ ব্যাপার। সারেঙ সাব সেই ভেবেই হয়তো বঙ্কুকে আমার ফোকসালে উঠে আসতে দেয়নি। এখন বুঝতে পারছি না দিয়ে ভালোই করেছেন। ইচ্ছেমতো দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়তে পারি। পেছনে লাগার কেউ নেই।

তাছাড়া বঙ্কু এলে লকারটার ভাগ দিতে হত। জাহাজে আস্ত একটা ফোকসাল, একটা লকার একজন জাহাজির ভাবাই যায় না। লকারটা পুরো আমার। ওতে আমার কোট-প্যান্ট, কিছু গরম জামা কাপড়, রেশনের কনডেনসড মিল্ক, চা, চিনি, আর মার জন্য তুষের মতো নরম কম্বলটা আছে।

বঙ্কুও দেখি বেশ ক্ষেপে আছে। বলল, সারেঙ সাবের এটা বাড়াবাড়ি। আমরা কী ভূত! এ ভাবে পারা যায়। তারপর বলল, তুই বুঝিয়ে বললে হয়তো রাজি হবে।

আমি আবার কী বুঝিয়ে বলব। কিছু বলতে পারব না। যা।

মাথা গরম করছিস কেন। সবাই আশা করে আছে।

থাকুক। আমি পারব না। ওঠ আমার বাংক থেকে। ওঠ বলছি। আচ্ছা তুই কিরে, ঘড়ি দেখে বললাম, দুটো ঘন্টাও নেই, পরিতে যেতে হবে। একটু শুতেও দিবি না।

ওর কেন জানি কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই। সে বাংকের নীচ থেকে একটা টব বের করে গবাগুব বাজাতে থাকল। আর গান। ওর গলা ভাল, হঠাৎ এত প্রসন্ন হবার কারণ কি বুঝতে পারলাম না। সে কী ভেবেছে কে জানে—যাই হোক মনে আছে গাইছিল, ও ফুল তুমি ফোট না ক্যানে, ফুলরে আমার কেশের চুল।

আসলে গানটি যে বাংলা সিনেমার, ‘কবি' বই এর বুঝতে কষ্ট হল না। গানটি হবে, কালো যদি মন্দ তবে, কেশ পাকিলে কান্দ ক্যানে। সেই সুরেই গাইছিল শুধু শব্দ কিছু, কিছু কেন প্রায় সবটাই পালটে দিয়ে ফুলের লাইনে চলে এসেছে। কেশের লাইনে আর থাকেনি।

ওর গান শুনে আমিও হেসে ফেলেছিলাম।

তখনই যেন বঙ্কু সাহস পেয়ে গেল। বলল, জানিস সারেঙ সাব ক্ষেপে গেছেন। বলছেন, না কেউ জাহাজে উঠতে পারবে না। ছোটোটিন্ডালকে ডেকে ফতোয়া জারি করে দিয়েছেন।

বুঝলাম, ছোটোটিন্ডাল তালিকায় আমার নাম রেখেই ভুল করেছে! আমি না থাকলে, তালিকাটিতে তার আপত্তি ছিল না। পানামা খালে কে উঠে এল, কে নেমে গেল, তা নিয়েও বোধ হয় ভাবতেন না। সারেঙ সাব হুকুম জারি করে দিয়েছেন। ক্যানেলে কাউকে তোলা যাবে না।

রাত দশটা বেজে গেছে। রাত বারোটায় আমার ওয়াচ। বঙ্কুর কী বুদ্ধি সুদ্ধি নেই বসেই আছে। উঠছে না! আর তখনই দেখি ছোটোটিন্ডাল দলবল নিয়ে এসে হাজির। আমার মতো ওরাও সবাই ফুলের গাহেক।

যদি সারেঙ সাব ক্যানেলে কোনো নারী জাহাজে তোলার অনুমতি না দেন, তবে আমিই তার জন্য দায়ী।

ছোটোটিন্ডাল বলল, এই নাও টাকা। হবে না।

বাদবাকি বলল, কেন হবে না। সারেঙ কী ভেবেছে।

আমি বললাম, ঠিক আছে দাও। এবারে সারেঙ সাব হয়তো রাজি হয়ে যাবেন। গিয়ে বল, বনার্জী ফুল নেবে না বলেছে।

জাহাজ তখন লেমন-বেতে ঢুকবে। আর দু-দিন বাকি। আমি পড়লাম মহাফাঁপড়ে।

ছোটোটিন্ডাল এসে বলল, না, সারেঙ সাবের এক কথা হবে না।

আমিও চোটপাট শুরু করে দিলাম, কেন হবে না। অন্য জাহাজে কি হয়ে থাকে! জাহাজিদের মেজাজ মর্জি বুঝতে হবে না। আমিতো ফুল নেব না বলেছি। তবে আর আটকাচ্ছেন কেন!

ছোটোটিন্ডাল বলল, তুই একটু বুঝিয়ে বললে হবে। জানিস গরিব গুরবো মেয়েগুলোর এই একটা উপার্জনের পথ। জাহাজিদের কছে টিউলিপ ফুল বিক্রি করে কিছু পয়সা

রোজগার করে। ওতেই ওদের চলে। দুটো খেতে পায়। জাহাজ দেখলে, কত আশা নিয়ে থাকে।

বিষয়টা আমার কাছে তখনও খুব যে পরিষ্কার ছিল বলতে পারব না। আসলে ভেবেছিলাম, ওর ফুল বিক্রি করতে উঠে আসা। জাহাজ প্রশান্ত সাগরে পড়ার আগে আবার নেমে যায়। ফুল নিয়ে ডেকে সামান্য রং রসিকতা হতে পারে—কিংবা কারও গরজ থাকলে, সহবাসও হতে পারে—তবে এ-নিয়ে জাহাজিদের মাথা ব্যথা থাকার কথা না। কাপ্তানেরও না। কাপ্তানতো সব সময় চান, জাহাজিরা কিনারায় এনজয় করুক। বরং না করলেই দুশ্চিন্তার কারণ—অনন্ত অসীম সমুদ্রে জীবন হাতে নিয়ে ঘোরাঘুরি, একটু বেচাল না হলে চলবে কেন!

বাধ্য হয়ে উঠে পড়লাম। সারেঙ সাবের দরজায় টোকা মারতেই তিনি দরজা খুলে দিলেন। সব শুনে বললেন, যা খুশি কর। আমার কি। ইমান কে-কার রক্ষা করে। বন্দরে নেমে কে কোথায় যাস আমার জেনে দরকার নেই। আমার তোদের সঙ্গে কাজ নিয়ে কথা। কাজ পেলেই হল।

আসলে এ ব্যাপারে সারেঙ সাবেরও কোনো এক্তিয়ার নেই, না করার। দীর্ঘ সমুদ্র সফরে কোনও জাহাজি বন্দরে না নামলেই ভয়। একঘেয়ে সমুদ্রযাত্রায় কেউ কেউ পাগল পর্যন্ত হয়ে যায়। তাদের নেমে ফুর্তিফার্তা না করলে এটা বেশি হবার কথা। তবে জাহাজিদের বলতে গেলে সর্বময় কর্তা সারেঙ সাব। তাকে সমীহ না করলে জাহাজিদেরও ইজ্জত থাকে না। তিনি অনুমতি দিতেই সবাই হা হা করে লাফিয়ে সিঁড়ি ধরে উপরে উঠে গেল। শিস দিল কেউ। কেউ রাত দুপুরে রঙের জব নিয়ে বসে গেল। ডুবাডুব বাজনা আর সমস্বরে গান। মুহূর্তে জাহাজিদের চেহারাই পালটে গেল।

দু-দিন বাদে সাঁঝবেলায় দেখি সারেঙ সাব আমার ফোকসালে উঁকি দিয়ে কী দেখছেন। আমি উঠে বসলাম। তিনি সাধারণত অন্য ফোকাসালে ঢোকেন না। উঁকিও দেন না। একমাত্র দরকারে আমার ফোকসালে গলা বাড়িয়ে কথা বলেন। তার দেশে চিঠি লেখার প্রয়োজন হলে এটা করে থাকেন।

বললাম, কিছু বলবেন চাচা?

তিনি বললেন, শুয়ে থাকলি। উপরে উঠে যা। পানামা ক্যানেলে জাহাজ ঢুকে যাচ্ছে। কী করে জাহাজটাকে টিলায় তুলে দিচ্ছি দেখবি না!

আমি বুঝি তিনি আমাকে নিয়ে বিশেষ ভালো নেই। তাঁর অহরহ দুশ্চিন্তা। একজন নতুন জাহাজিকে এ-ভাবে দমিয়ে রাখা সুবিবেচনার কাজ কি না তাই নিয়েও দ্বন্দে পড়ে গেছেন। তাঁর অশ্বস্তি বুঝি। বললাম, যাচ্ছি।

তাঁর মুখ ভারি প্রসন্ন হয়ে গেল। বললেন, যা বাবা যা। শুয়ে থাকিস না। শুয়ে থাকলে মন খারাপ থাকে।

সারেঙ সাবের কথা ভেবে আমার চোখ জলে ভারি হয়ে গেল।

আসলে, শুয়েছিলাম—ডাঙা দেখলে বাড়ি ঘরের জন্য মন বড়ো বেশি খারাপ হয়ে যায়। এতক্ষণ ওপরেই বসেছিলাম। দুটো লকগেট পার হবার পর কিছুই কেন জানি না ভালো লাগছিল না। একটার পর একটা লক গেটে ঢুকে জাহাজ যেন সিঁড়ি ভাঙছে। জাহাজ উপরে উঠে যাচ্ছে ক্রমে। সামনে বিশাল কৃত্রিম হ্রদ। পাহড়ের উপত্যকায় এই কৃত্রিম হ্রদের সৃষ্টি জাহাজ পারাপারের জন্য। গাছপালা কোথাও দ্বীপের মতো ভেসে আছে।

জাহাজ কাপ্তানের জিম্মায় নেই। জ্যোৎস্না রাত। দূরের জলরাশি এবং পাহাড়ের ছোটোখাটো ঢিবি চোখে পড়ছিল।

জাহাজ পাইলটের জিম্মায়। সে খাড়ি ধরে জাহাজ নিয়ে যাচ্ছিল।

ডেকের ওপর বসে মনে হচ্ছিল, জাহাজটা যেন পুব-বাংলার বর্ষাকালে নদী মাঠ কিংবা গ্রাম গঞ্জ ফেলে চলে যচ্ছে। এখানে ওখানে ঝোপ জঙ্গল, টিলা, কলাগাছ, কচুগাছ। বুনো ফুলের গন্ধ পর্যন্ত পাচ্ছিলাম ডেকে বসে। এই প্রথম দেখলাম জাহাজের সার্চ লাইট জ্বলছে।

আর কেন যে সে-সময় বাড়ির কথা, মা-বাবা, ভাইবোনের কথা ভেবে চোখে জল চলে আসছিল। মনটা এতই দমে গেছিল যে আর বসে থাকতে ইচ্ছে হচ্ছিল না। নীচে নেমে শুয়ে পড়েছিলাম। সারেঙ সাবের বোধ হয় সতর্ক নজর এড়াতে পারিনি। তিনি সিঁড়ি ধরে নেমে আমাকে শুয়ে থাকতে দেখে ঘাবড়ে যেতে পারেন।

অগত্যা আবার উপরে যেতে হল। ভাণ্ডারির গ্যালিতে ভিড়। কেউ আর নীচে নেই। একমাত্র এনজিন রুমের পরিচালকরা নীচে কয়লা হাকড়াচ্ছে। জাহাজের স্টিম খুব বেশি দরকার ছিল না। বড়ো বেশি টিমে তালে জাহাজ চালানো হচ্ছে।

উঠে দেখলাম, আমাদের আগে যে জাহাজটা যাচ্ছিল, ওটা সামনের ঝোপ জঙ্গল টিলার —ওপাশে হারিয়ে গেছে। কেমন স্বপ্নের মতো দূরাতীত ছবি—মগ্ন হয়ে যেতে হয়।

মেসরুমের পাশে একটা বেঞ্চিতে বসে আছি। আর সব জাহাজিরা আমার পাশে বসে গল্পগুজব করছে। তারা সবাই অপেক্ষা করছে, কখন ফুলওয়ালিরা সব উঠে আসবে।

তারা ফুল দেবে। মাত্র একটি করে টিউলিপ ফুল। ফুল তাদের চুলে গোঁজা থাকে। জাহাজিরা যে যার পছন্দমতো ফুল নেবে। মাত্র এক ডলার।

এক ডলার তখনকার সময়ে বেশ দাম।

আর এ-সময়ই দেখলাম লক-গেটের দিক থেকে একটা ডিঙি নৌকা ভেসে আসছে।

জাহাজটি থেমেছিল কেন তা অবশ্য তখন জানতাম না। জাহাজটা হঠাৎ স্ট্যান্ড বাই হয়ে গেল।

এখন আর সব ঠিক ঠাক মনেও করতে পারছি না। দুটো কারণ থাকতে পারে। হয়ত কাপ্তান জাহাজিরা নারী সঙ্গ পায় বলে, থামাবার অনুমতি দিতে পারেন, হয়তো দূরবর্তী জাহাজের কোনো সিগনালিং দেখে জাহাজ থেমে যেতে পারে। অথবা, এই জায়গাটায় এলে কোনো কারণে জাহাজকে দাঁড়িয়ে পড়তেই হয়।

দেখছি তর তর করে দড়ির সিঁড়ি বেয়ে কারা উপরে উঠে আসছে। জাহাজিরাই হল্লা জুড়ে দিয়েছে। সবাই প্রায় ছুটছিল। প্রাচীন নাবিকেরা শুধু চুপচাপ বসেছিলেন। তাঁরা যাননি। বরং তাঁরা জাহাজিদের গালমন্দ করছিলেন।

দেখছি গাউন পরা কজন নারী।

ছোটোটিন্ডালর মাতববরি শুরু হয়ে গেছে। কেউ বেশি বেলেল্লাপনা করলে ধমক-ধামক দিচ্ছে।

গাউন পরা ক'জন নারী যেন জাহাজটার প্রাণ। বেশ সাড়া পড়ে গেছে। ওরা খোলা ডেকে দাঁড়িয়ে আছে। আমি নিজেও বসে থাকতে পারলাম না। ছুটে গেছি। যারা ফুল নিবে বলে কথা দিয়েছে, তারা বেশ সামনে ঝুঁকে দেখছে।

আমার নামও ছিল। তবে নামটা কাটা।

এক একজন যে যার ফুল নিয়ে জাহাজের ঘুপটি অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে।

আমাদের ছোটোটিন্ডাল মোল্লা, তার চাই সব চেয়ে তাজা ফুল। সেই কিনারার লোকের সঙ্গে দরদাম করে এদের তুলে এনেছে। তার হক আছে। সে সবচেয়ে কচি খুকিটির খোপার ফুল তুলে নিতেই মেয়েটা কেমন কুঁকড়ে গেল!

মেয়েগুলো প্রায় সবাই রদ্দি—ওদের শরীর মুখ দেখে টের পেলাম। মাস্তুলের আলোতে মুখ স্পষ্ট। ঠোঁট ভারি, চুল তোঁকড়ানো। তামাটে রং। কম বেশি সব নারীরাই মাঝারি বয়সের। দু-চারজন যুবতী এবং তরুণীও দলে আছে। ওদের কদর বেশি হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু সব চেয়ে তাজা তরুণীটিকেই ছোটোটিন্ডাল পাকড়েছে।

ছোটোটিন্ডাল হাত ধরতে গেলে মাথা গোঁজ করে দাঁড়িয়ে থাকল মেয়েটা। পছন্দ নয়। সে তার ফুল ফেরত নিতে চায়। খুবই নিয়মের বাইরে বলে, বুড়ি মতো মেয়েটা ধমকাচ্ছে।

ছোটোটিন্ডাল বেঢপ। গোলগাল গাট্টাগোট্টা মানুষ। বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। এই নরম উষ্ণতা যেন ছোটোটিন্ডালের পাল্লায় পড়লে তছনছ হয়ে যাবে। খুব খারাপ লাগছিল। ইস নাম কেটে দিয়ে কী যে ভুল করেছি। কারণ মেয়েটি আমার দিকে তাকিয়ে ভরসা খুঁজছিল। কিন্তু সারেঙ সাবের জন্য ভরসা দেবার মতো ক্ষমতাও আমার নেই। ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে কথা বলে। সবাই বুঝতে পারছিলাম। কিচ্ছু করার নেই। মনটা দমে গেল। ডেক ধরে ফিরে আসছি। মেসরুম পার হয়ে দেখি সারেঙ সাব দাঁড়িয়ে আছেন। আমাকে একা দেখে বেশ আশ্বস্ত।

সারেঙ সাব আমার পেছনে সিঁড়ি ধরে নামছেন। কাঠের সরু সিঁড়ি। একজনের বেশি নামা যায় না। তিনি হঠাৎ কেন যে বলেছিলেন, আজও তার রহস্য স্পষ্ট নয়—কারণ আমি তালিকায় ছিলাম না, তবু কেন যে বলেছিলেন, কি রে পছন্দ হল না!

যেন মজা করছেন।

পছন্দ অপছন্দের চেয়েও আমার মনে হচ্ছিল এরা রুগ্ন। অর্থাভাব প্রচণ্ড। হত দরিদ্র হলে যা হয়। না হলে এত কম বয়সে একজন কিশোরী জাহাজে উঠে আসে! ঠোঁট ভারি হলে কী হবে, ভারি মিষ্টি দেখতে।

আর এসব সময়ে কেন যে আমার মা-র কথা বেশি মনে পড়ত, ভাইবোনদের কথা বেশি মনে পড়ত—কিছু তখন ভালো লাগত না। বাংকে এসে চুপচাপ শুয়ে পড়লাম।

জাহাজটা ভোর রাতের দিকে সামনের লকগেটে গিয়ে পড়বে। এই সাত-আট ঘন্টা উষ্ণতায় ভরিয়ে রাখবে জাহাজিদের। শুয়ে শুয়ে এ-সবই ভাবছিলাম।

আর তখনই দেখি সারেঙ সাব নিজেই চলে এসেছেন। মানুষের মনে কখন যে কি উদয় হয়, কে যে কি ভাবে—না হলে সারেঙ সাব আমাকে এসেই বা খবরটা দেবেন কেন।

এই ওঠ। মেয়েটা কাঁদছে।

কাঁদছে কেন!

কে জানে! যা একবার। জাহাজে আবার ঝামেলা না হয়।

তারপর সারেঙ সাব নিজেই সব কেন যে খুলে বলেছিলেন, তার মাথামুণ্ডু বুঝছি না। বললেন, ছোটোটিন্ডাল নাছোরবান্দা। মেয়েটা কিছুতেই রাজি নয়। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। আয়তো দেখি। এত ভালো কথা না! ছোটোটিন্ডাল বুড়িকে শাসাচ্ছে। অফিসাররাও বাদ নেই। নিজেদের ঘরে লকগেট থেকেই মেয়েমানুষ তুলে নিয়েছে। নেটিভদের কাণ্ড-কারখানা দেখতে হবে ভয়ে এলি-ওয়ের দরজা বন্ধ করে দিয়েছে।

কাছে গিয়ে হতবাক। সত্যি ফুঁপিয়ে কাঁদছে মেয়েটা। একদম নড়ছে না। নড়ানো যাচ্ছে না। শত হলেও এ-সব যৌন অভ্যাস মানুষের গোপনেই থাকবার কথা। আর তখন একটা ছোটো পরির মতো মেয়ে যদি ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে, শেষে আবার কোন কেলেঙ্কারিতে পড়ে যেতে হবে কে জানে! মেয়েটা তার খোঁপার ফুল কিছুতেই ছোটোটিন্ডালকে দেয়নি।

আর আশ্চর্য তখন কিনা সারেঙ সাব আমার দিকে তাকিয়ে বলছেন, দেখতো ফুলটা তোকে দেয় কিনা! চেয়ে দেখ।

আমি কেমন বিব্রত বোধ করছিলাম। আমার নামেতো কোনো টাকা জমা নেই। আমার কাছে কোনো ডলারও নেই। আমি কী করব বুঝতে পারছিলাম না।

সারেঙ সাবই বললেন, চেয়ে দেখ না। দাঁড়িয়ে থাকলি কেন?

আরও অবাক, হাত পাততেই মেয়েটা চুল থেকে ফুল খুলে আমার হাতে দিয়ে দিল। লজ্জায় মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে আছে। একজন বালিকার স্বভাব যেমন হয়ে থাকে—সবার সামনে সে যেন কিছুতেই আর মুখ তুলে তাকাবে না।

খুব কাছ থেকে বুঝলাম, চোদ্দো পনেরোও হবে না তার বয়স। ছোটোটিন্ডাল ক্ষেপে গিয়ে শেষে বুড়িকে নিয়েই অন্ধকারে হারিয়ে গেল।

সারেঙ সাব বললেন, যা, ফোকসালে নিয়ে যা। বসিয়ে রাখ। ঘাটে নামিয়ে দেওয়া যাবে।

মেয়েটির আত্মসম্মান রক্ষার্থে তিনি হয়তো আর কোনো রাস্তা খুঁজে পাননি। আমার ওপর দায় চাপিয়ে রেহাই পেতে চান। সারারাত তো আমি তাকে ডেকে পাহারা দিতে পারি না—অগত্যা আফটার পিকের দিকে হাঁটা দিলাম। আফটার পিকের ওপরে এনজিন এবং ডেক-জাহাজিদের গ্যালি। সঙ্গে মেসরুম। তার পাশ দিয়ে কাঠের সিঁড়ি ধরে নেমে গেলে প্রথমে দু-পাশে পড়বে ডেক সারেঙ এবং এনজিন সারেঙের ফোকসাল। এখানেই দুটো রাস্তা দু-দিকে নেমে গেছে। একটা গেছে পোর্ট-সাইডে অন্যটা স্টাবোর্ড-সাইডে যেখানে থাকি আমরা। ইনজিন-জাহাজিরা। নীচে নামলেই আমার ফোকসাল।

সে আমাকে অনুসরণ করছে বুঝতে পারছি।

কী যে করি।

ফোকসালে ঢুকে যেতেই দেখি সেও পাশে দাঁড়িয়ে আছে।

বললাম, কী নাম?

ভাঙা ইংরেজিতে কথা বলতে পারে। বুঝতেও পারে সব। নাম বলল, লেসি।

এই নারীর সঙ্গে ইচ্ছে করলেই এখন যৌন সংসর্গ করা যায়। সে তার খোঁপার ফুল দিয়ে তা বুঝিয়ে দিয়েছে। উত্তেজিত হয়ে পড়ছিলাম। নিজেকে দমন করতে পারছি না। কী ভেবে এক লাফে সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠে গেলাম। দেখি সারেঙ সাব দরজা বন্ধ করে দিয়েছেন। আমার ওপর মেয়েটির ভার চাপিয়ে দিয়ে তিনি নিশ্চিন্ত—দরজা বন্ধ দেখেই তা টের পেলাম।

ফোকসালে ঢুকে পড়লাম ফের। বেশ হাপাচ্ছি। মেয়েটিও আমার পাশে বসে পড়ল।

আমার হাত পা কাঁপছে। গলা শুকিয়ে উঠছে। কী যে বিড়ম্বনায় পড়া গেল। জল তেষ্টা পাচ্ছে। কী করব ঠিক করতে পারছি না। তারপরই মনে হল, আমার ত টাকা নেই—যৌন সংসর্গ করার জন্য কোম্পানির ঘর থেকে ডলারও তুলিনি। নাম কেটে দিয়েছি বলে তার প্রয়োজনও হয়নি। মেয়েটি টাকার বিনিময় ছাড়া আমার সঙ্গে যৌন-সংসর্গ করবে কেন! যাক বাঁচা গেল।

বললাম, লেসি, তুমি নীচের বাংকে শুয়ে থাক। উপরের বাংকে আমি উঠে যাচ্ছি।

লেসি কথা বলছে না। অপলক তাকিয়ে আছে আমার দিকে। কী করুণ চোখ মুখ! বললাম, চা খাবে?

ঘাড় কাত করে জানাল, খাবে।

বোসো।

লকার খুলে দুধ চিনি চা বের করে উপরে উঠে গেলাম। গ্যালিতে দু-গ্লাস চা বানালাম। তারপর গ্লাস দুটো হাতে নিয়ে নীচে নেমে এলাম। নামার সময় শুনতে পেলাম, ইমানুল্লা চাচা কোরান পাঠ করছেন ফোকসালে। তখনই কেন যে এক অপার্থিব পৃথিবীর খোঁজ পেলাম ভেতরে। মনে হল শরীরই সব নয়। অর্থের বিনিময়ে কেউ এ-কাজ করলে প্রেম ভালোবাসা কিংবা জীবনের রহস্যময় উষ্ণতা মরে যায়।

নীচে নেমে ওকে চা দিলাম। পাউরুটি দিলাম। খুব আগ্রহ নিয়ে খাচ্ছে। তার হাঁটুর ওপরে গাউন উঠে এসেছিল। সে বার বার পাতলা গাউন টেনে হাঁটু ঢেকে দেবার চেষ্টা করছে। চোখের মণি দুটোতে আলো পড়ায় তাকে বড়োই মায়াবী মনে হচ্ছিল—কিংবা কোনো দূরবর্তী সংকেত—অথচ আমি তার সঙ্গে সারাক্ষণ বাড়ি ঘরের গল্প করলাম।

লেসি জানাল, তার বাবা নেই। মা থেকেও নেই। কোন এক খামারে কাজ করত। সেখান থেকে নিখোঁজ। মেয়েটির ধারণা, অভাবের তাড়নাতেই মা কোথাও চলে গেছেন। ভাইবোনদের দুটো পেট ভরে খেতে দেবার জন্য সে এও লাইনে নতুন এসেছে। লোকটাকে দেখে ওর ভয় ধরে গিয়েছিল বলে কাঁদছিল।

সবারই আজ কিছু না কিছু উপার্জন হবে অথচ লেসিকে শুধু হাতে ফিরে যেতে হবে। লেসির দুর্ভাগ্যের কথা ভেবে ভীষণ খারাপ লাগছিল।

আমার নিষ্ক্রিয় কথাবার্তায় লেসি বোধ হয় অস্বস্তি বোধ করছিল। দরজা খোলা—বার বার দরজার দিকে তাকাচ্ছিল।

আমি মাথা নীচু করে বললাম, তোমার ছোটো ভাইটার কত বয়স?

জানি সে আমার কোনো কথা শুনতে চায় না। শোনার আগ্রহ নেই। ভাই-এর কী বয়স শোনানোর জন্য জাহাজে উঠে আসেনি। সে খুবই চঞ্চল হয়ে উঠছিল। আমার দিকে তাকিয়ে বলল, দরজাটা বন্ধ করে দিন না।

না।

কেন না।

না। বলছি তো।

আমি বন্ধ করে দিচ্ছি।

না।

কেন যে এত একগুঁয়ে হয়ে উঠেছিলাম, আজও তার সঠিক ব্যাখ্যা পাই না। বরং হাসি পায়, আমার পাপবোধের কথা ভেবে। নাকি তার কোনো ব্যাধি আছে এই ভয়ে কাছে যাইনি! অথচ এত সুন্দর যে নারী, যে যৌন-সংসর্গের বিনিময়ে পয়সা রোজগার করতে এসেছে তাকে আমি সত্যি ঘৃণা করছি। তা ত নয়। বরং আমার মনে হয়েছে এমন নারী জীবনে সত্যি দুর্লভ। অথচ আমি কেমন বিপাকে পড়ে গেছি। পাপ-পুণ্য কি বুঝতে পারছি না। কোম্পানির ঘর থেকে টাকা তুলে রাখলেও হত। অন্তত যৌন সংসর্গ না করি হাতে টাকাটা দিতে পারতাম। তাও আমার সম্বল নেই।

লেসিও মরিয়া হয়ে উঠেছে। বলছে, আমার কোনো অসুখ নেই। মা মেরির দিব্যি। বলে সে দাঁড়িয়ে গাউন খুলে ফেলতে গেলে আমি অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলাম।

তুমি রাগ করছ?

মুখ না তুলেই বললাম, না।

তবে আমাকে দেখছ না কেন? দরজা বন্ধ করে দিলাম। দেখছি তো!

না, তুমি দেখছ না। তুমি আমার কিছুই দেখছ না। প্রায় আমাকে ঝাঁকিয়ে দিয়ে বলল, কেন তবে ফুল নিলে। বল কেন নিলে। আমাকে কেন অপমান করলে! ফুপিয়ে কাঁদতে থাকল।

কী বলি! সত্যি ফুল নেওয়ার অর্থই তো গ্রহণ করা। আমি লেসির দিকে না তাকিয়েই বললাম, তুমি খুব সুন্দর। গাউনটা পরে ফেল। আমারও ভাইবোন আছে। তাদের বাঁচাবার জন্য এতদূরে জাহাজে কাজ নিয়ে চলে এসেছি।

তারপরই লকার খুলে বললাম, দেখতো কম্বলটা কেমন হয়েছে! শীতের সময় মা-র খুব কষ্ট। শীতে মা কষ্ট পান বলে এটা কিনে দিয়েছি! ভালো হয়নি।

ও দেখে আমার কী হবে। সে মুখ ফিরিয়ে আরও বিরক্ত প্রকাশ করে ফেলল। তারপরই কেমন চিৎকার করে বলার মতো, কেন ওসব দেখাচ্ছ। আমি তোমার মা-র কম্বল দেখতে জাহাজে উঠে আসিনি। প্লিজ । তুমি আমাকে আর খাটো করো না।

আমিও কেমন পাগলের মতো বলছিলাম, লেসি প্লিজ গাউনটা পরে ফেল। তোমার দিকে তাকানো যাচ্ছে না।

লেসি তখন উন্মত্তের মতো বলে যাচ্ছে, না, না, তুমি আমাকে ঘৃণা করছ। আমি মনে কর কিছু বুঝি না। আমার সত্যি কোনো রোগ নেই।

সে আমার সামনে এসে দাঁড়ালে আমার মা-এর কম্বলটা দিয়ে ওর নগ্ন শরীর ঢেকে দিয়ে বললাম, পাগলামি করো না। গাউনটা পরে ফেল।

সে এবার আমার হাত টেনে ধস্তাধস্তি শুরু করে দিয়েছে। বলছে, আর দেরি নেই। আমাদের নামিয়ে দেবে। শিগগির কর। আর যাই কর, তুমি আমাকে প্লিজ ঘৃণা করো না।

বললাম, লেসি আমি তোমার উপার্জনে সাহায্য করতে পারলাম না। দুঃখিত। এটা নাও। তোমকে দিলাম। ঘৃণা করলে আর যাই করি মার জন্য কেনা কম্বলটা তোমাকে দিতে পারতাম না।

সে কম্বলটা নিয়ে বুকে জড়িয়ে ধরল।

বলল, সত্যি দিচ্ছ।

হ্যাঁ। কেন বিশ্বাস হচ্ছে না!

এত দামি কম্বল! আমি যে তোমাকে কিচ্ছু দিতে পারলাম না।

বললাম, কেন ফুলইতো দিয়েছ। এর চেয়ে সুন্দর পবিত্র আর কী থাকতে পারে। একজন পুরুষতো নারীর কাছে এর চেয়ে বেশি কিছু পেতেও চায় না।

দেখি লেসি কাঁদছে। কম্বলে মুখ লুকিয়ে হাউ হাউ করে কাঁদছে।

এই অপরাহ্ন বেলায় আজকাল মেয়েটির মুখ কেন যে এত বেশি মনে পড়ছে তাও জানি না। যৌন সংসর্গ না করলেও সেদিনই জীবনে প্রথম যৌন সম্ভোগ কী টের

পেয়েছিলাম। অপরাহ্ন বেলায় তাও মনে করতে পারি।

নিজের দেশে ম্যান্ডেলা

যেন কতকাল হয়ে গেল, ম্যান্ডেলা ঘরবাড়ি ছেড়ে কেবল আকাশে উড়ে বেড়াচ্ছে। পাঁচ-সাত দিনও হয়নি তবু কেন যে মনে হয় কত কাল। বেশিদিন সে তার মাকে ছেড়ে থাকতে পারে না। এটাই হয়েছে তার ভারি জ্বালা। মা ঠিক ছটফট করছে। আবার উধাও মেয়েটা! যায় কোথায়! সে যে তার নিখোঁজ বাবাকে খুঁজতে বের হয়ে কত দেশে চলে যায়, তা মা কিংবা বুচার মামা বিশ্বাস করবে কেন! সে বলেও না কিছু। চুপচাপ থাকে। আগে হম্বিতম্বি হত। পুলিশ থেকে শহরের বড়ো বড়ো কাগজগুলিতে তার নিখোঁজ হবার খবর চলে যেত। সে ফিরে এলেই, হাজার প্রশ্ন। কোথায় গেছিলে, কে তোমাকে নিয়ে গেছিল? কোনো দুষ্টচক্রের পাল্লায় পড়ে যে সে ঘর ছেড়ে চলে যাচ্ছে না, তাই বা বিশ্বাস করবে না কেন তারা।

আর তখন এক কথা, 'জানি না'।

'কোথায় গা ঢাকা দিয়েছিলে, জান না।'

'না জানি না।'

'আরে বলছ কি, তুমি বাচ্চা মেয়ে, বোঝ না—তোমার পক্ষে কোথাও এতদিন পালিয়ে থাকা সম্ভব নয়।'

ম্যান্ডেলা সাড়া দিত না। করুক না বকবক, কতক্ষণ করতে পারে দেখা যাক। তবে এবারে বেশ কদিন সে ঘরছাড়া। উড়তে শুরু করলে তার এই হয়। ঘরবাড়ির কথা মনে থাকে না, মা-র কথা মনে থাকে না, এমনকী বুচার মামা যে তার এই বাঁদরামিতে ক্ষিপ্ত হয়ে থাকে তাও সে গ্রাহ্য করে না। উড়তে উড়তে সে সেবারে ফনের রাজত্বে ঢুকে গেছিল। সে না থাকলে মুম্বাটুকে যে পুড়িয়ে মারা হতো, কেউ বিশ্বাস করবে না। মা না, মামা না, কেউ না। আর এসব বলে সে তার সেই জাদুকরকে ছোটো করতে চায় না। জাদুকর তাকে পালকের টুপি না দিলে তার বাবাকে খুঁজে বের করাও মুশকিল। আর এমনভাবে ওড়ার আনন্দই বা সে পেত কোথায়!

সে তার বাবাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে, বাবা না থাকলে কেউ থাকে না, এরা বুঝবে কী করে। জাহাজডুবি যে কোথায় হল, এটাই সে বুঝতে পারছে না। জাহাজ তলিয়ে গেলেও বোট

থাকে জাহাজে—বাবা যে বোটে ভেসে পড়েনি কে বলবে! কোনো দ্বীপে কিংবা অরণ্যে বাবা তার বেঁচে আছে, কারণ মানুষের জন্য ঈশ্বর সর্বত্র বেঁচে থাকার ব্যবস্থা করে রেখেছেন। তার সেই বুড়ো হানসের কথাও মনে হয়। মানুষটা নির্জন দ্বীপে কতকাল কাটিয়ে দিল—সেই কবে সারা পৃথিবী জুড়ে যুদ্ধ হয়েছিল, হানস ছিল একজন সৈনিক—সে যুদ্ধজাহাজ থেকে পালিয়ে একটা দ্বীপে উঠে গেছিল। পালিয়ে না, জাহাজটা ডুবে যাচ্ছিল—কী যে খবর, সে আর এখন মনে করতে পারছে না। উড়তে উড়তে কোনো নির্জন দ্বীপে কেউ চুপচাপ বালুবেলায় দাঁড়িয়ে আছে দেখতে পেলে কার না বিশ্বাস হবে, নিশ্চয়ই সেই নিখোঁজ মানুষটি, সমুদ্রের ধারে দাঁড়িয়ে তার ছোট্ট মেয়ে ম্যান্ডেলার কথা ভাবছে! কিংবা সমুদ্রের কোথাও যদি কোনো জাহাজ কিংবা জেলে নৌকার সন্ধান পাওয়া যায়, সেই আশাতেও মানুষটা দাঁড়িয়ে থাকতে পারে।

সে যাই হোক, ম্যান্ডেলা দ্বীপে নেমে গেছিল। সঙ্গে তো হাইতিতি আছেই। সে কাছে গিয়ে দেখল, একজন বুড়ো মানুষ, চুল সব পেকে গেছে—সাদা দাড়ি, গায়ে পাতার পোশাক। তার বাবা নয় ঠিক, তবে মানুষটার জন্য কম তার ভোগান্তি হয়নি। এই আছে এই নেই, কারণ ম্যান্ডেলা পালকের টুপি মাথায় দিলেই অদৃশ্য, খুলে ফেললে ম্যান্ডেলা। হাইতিতি বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে। তার গলায় ঘন্টা বাজছে। দ্বীপে কোনো ভুতুড়ে উপদ্রব শুরু হয়েছে ভেবে লোকটা দৌড়াতে শুরু করেছিল। এতটুকুন দ্বীপে আর যে মানুষজন নেই, ম্যান্ডেলা উড়তে উড়তে টের পেয়েছে—তারপর লোকটার কাছে গিয়ে টুপি খুলে দাঁড়িয়ে পরিচয় দিয়েছে, তা নাম ম্যান্ডেলা। সে থাকে নিউ প্লাইমাউথ শহরে। জাদুকর তাকে পালকের টুপি দেওয়ায় সে যেখানে খুশি উড়ে যেতে পারে। সঙ্গে আছে ক্যাঙারুর বাচ্চা হাইতিতি—গলায় রূপোর ঘন্টা বেঁধে দিলে, সেও অদৃশ্য হয়ে যায়—উড়ে যায়। সে তো ছোট্ট মেয়ে—একা একা ঘুরতে ভয় পাবে বলেই, হাইতিতিকেও দয়াপরবশ হয়ে জাদুকর রুপোর ঘন্টা দিয়ে গেছে। হাইতিতি সঙ্গে থাকলে, তার আর কোনো ভয় থাকে না।

বুড়ো মানুষটি কিছুতেই বিশ্বাস করছিল না তাকে। এমন আজগুবি কথা কে কবে শুনেছে! বাধ্য হয়ে ম্যাণ্ডেলা টুপি পরে দেখিয়েছে, খুলে দেখিয়েছে। হাইতিতি যে একটা ক্যাঙারুর বাচ্চা তাও দেখিয়েছে। রুপোর ঘন্টা খুলে নিতেই হাইতিতি লাফিয়ে পড়েছিল, একেবারে বুড়ো মানুষটির নাকের ডগায়। সে বিশ্বাসই করতে পারেনি, হাইতিতি একটা ক্যাঙারুর বাচ্চা, আর এত চতুর। সারা দ্বীপে ছুটে বেড়িয়েছিল—কিন্তু শত হলেও বুড়ো মানুষ, পারবে কেন—ক্লান্ত অবসন্ন বুড়ো মানুষটি পাথরে হেলান দিয়ে বসে পড়েছিল—আর হাঁপাচ্ছিল। তারপর যখন বুঝল, না, ম্যান্ডেলা সত্যি সুন্দর ছোট্ট পরির মতো একটা মেয়ে

এবং হাইতিতিও সত্যি একটা ক্যাঙারুর বাচ্চা, তখন বিশ্বাস করেছিল, ঈশ্বরের পৃথিবীতে সবই সম্ভব। মানুষ তার কতটুকু জানে।

সেই মানুষটি দ্বীপে থাকতে থাকতে তার নাম ভুলে গেছিল দেশের নামও মনে ছিল না। দ্বীপে থাকে। কচ্ছপের খোলে জল ধরে রাখে। পাখিরা উড়ে আসে দ্বীপের পাহাড়ে। তারা সেখানে বাসা বানায় মুখের লালা দিয়ে। সেই বাসা বুড়ো মানুষটা জলে ভিজিয়ে খায় —খুবই উপাদেয় স্যুপ। পুড়ো মানুষটার পাতার ঘরেও নিয়ে গেছে। বুড়ো মানুষটা সমুদ্রের ধার থেকে কচ্ছপের ডিম সংগ্রহ করে পুড়িয়েছে? ম্যান্ডেলাকে খেতে দিয়েছে। বড়ো বড়ো চিংড়িমাছ সমুদ্রের ধারে ধারে জলজ ঘাসের মধ্যে লাফিয়ে বেড়ায়। নীল স্ফটিক জল, খিদে পেলে চিংড়ি মাছ তুলে এনেছে। পুড়িয়ে নিজে খেয়েছে। তাকে খেতে দিয়েছে। তারপর ম্যান্ডেলা আবিষ্কার করেছিল, বুড়ো মানুষটা বিশাল একটা গাছের কাণ্ডে তার নাম লিখে রেখেছে, নদীর নাম, মেয়ের নাম। দ্বীপে এলে কেউ যেন তার অবর্তমানে টের পায় হানস ওটো নামে এক যুদ্ধপলাতক আসামি দ্বীপটায় জীবন অতিবাহিত করে দিয়েছে— তার কোনো কষ্ট হয়নি। ঈশ্বর মানুষের জন্য সর্বত্রই বেঁচে থাকার কিছু না কিছু ব্যবস্থা করে রেখেছেন।

হানস ওটোর কথাও সে তার মাকে বলেনি, মামাকে বলেনি। বললেই তাদের হাজার প্রশ্ন। এত প্রশ্নের জবাব দিতে তার ভালো লাগে না।

কোথায় সে দ্বীপ?

কোথায় কতদূরে সে বলতেই পারে না। কারণ পালকের গুণ, নিমেষে উড়ে যাওয়া যায়, মেঘেরা ভেসে যায় তার সঙ্গে। মেঘ কাটিয়ে বাতাসের আগে সে উড়ে যেতে পারে। আবার ইচ্ছে করলে মেঘের আড়ালে সে লুকিয়ে থাকতে পারে। দ্বীপটা কত দূরে, হাজার মাইল না তারও বেশি সে জানে না। সে শুধু জানে লোকটির নাম হানস ওটো। সে শুধু জানে তার মেয়ে আছে। ম্যান্ডেলারই বয়সি হবে হয়তো। নয়তো তাকে দেখে ঝরঝর করে কেঁদে ফেলবে কেন? মেয়ের নাম, নদীর নাম গাছে লিখে রাখবে কেন! মানুষের তো সবচেয়ে প্রিয় তার নদী আর গ্রাম। গ্রামের নামও লিখে রেখেছিল। হানস ওটো কোন দেশের লোক তাও সে জানে না। যে দেশেরই হোক, মেয়েকে ছেড়ে থাকার কষ্ট সব বাবারই এক। হানস নিজেও জানে না, কতকাল সে অতিবাহিত করেছে দ্বীপে। থাকতে থাকতে দ্বীপের গাছপালা, পাখি, প্রজাপতি তার বন্ধু হয়ে গেছে। নিজের গাঁয়ের নাম ভুলে গেছে। নদীর নামও। মানুষ যেখানে থাকে, বড়ো হয়, সে অরণ্যই হোক, নির্জন দ্বীপই হোক প্রিয় হয়ে যায় তার। হানসের তাই হয়েছিল, বুড়ো হয়ে সে ভুলেই গেছিল, তার দেশ আছে, বাড়ি আছে, নদী আছে, মেয়ে আছে।

এসব মনে হলেই বাবার জন্য তার কষ্ট বাড়ে। বাবাও একদিন ভুলে যাবে তার কথা, টিলার উপর তাদের লাল নীল রঙের কাঠের বাড়ির কথা। আপেল বাগানের কথা। গির্জার কথাও ভুলে যেতে পারে। সে যে তার বাবার হাত ধরে পাইন ফেস্টিভ্যালে যেত—তাও ভুলে যেতে পারে। দ্বীপ কিংবা অরণ্যের গাছপালা, মানুষের কত প্রিয় হতে পারে হানস ওটোকে না দেখলে সে টের পেত না।

এই একটা আতঙ্ক থেকেই সে এত অস্থির। বাবা তার হয়তো একদিন বাড়ি ফেরার কথাই ভুলে যাবে।

বাবা যদি তার কথা ভুলে যায়, মা-র কথা ভুলে যায় তবে আর ম্যান্ডেলার বেঁচে থেকে কি হবে। ওয়াকার কথাও ভুলে যেতে পারে। সে বাড়ি না থাকলে, বেচারা ওয়াকাকে মামা কেবল ধমকাবে।—'গেল, কোথায় মেয়েটা? খুঁজে দ্যাখ!' তারপর বলবে, 'এত করে বলি, ম্যান্ডেলাকে ফেলে কোথাও যাস না, তাও তুই পাইনের জঙ্গলে ঢুকে গেলি! ওখানে কী আছে তোর! ওখানে গেলে সেই জাদুকরের দেখা পাওয়া যাবে! তুইও কী চাস, জাদুকর তোকে কিছু দেবে! ওটা তো পাথরের মূর্তি। সমুদ্রের কিনারে পড়েছিল। শহরের মেয়র খবর পেয়ে ছুটে গেছে। শিশুরাও। একেবারে রাজবেশ। সাদা পাথরের মূর্তি। মাথায় মিনা করা বাদশাহি টুপি, ময়ূরের পালক মাথায়, পরনে আলখাল্লা। পায়ে নাগরাই জুতো। পাথরের রাজপুত্র বলা যায়। তুই কি ভাবিস ওয়াকা, ম্যান্ডেলাকে জাদুকর অদৃশ্য করে রাখে! তুই কি জাদুকরের পায়ের কাছে বসে বারবার প্রার্থনা করিস,—ম্যান্ডেলার সুমতি দাও। ম্যান্ডেলা ফিরে এসেছে, ওকে আর তুমি অদৃশ্য করে রেখ না। বুচার মামা, লুসি মাসির ত্রাস বোঝো না। এমন একটা ছোট্ট মেয়ে বাড়ি থেকে নিখোঁজ হয়ে গেলে কত কষ্ট বল! সে কোথায় যায়, তুমি ঠিক জান। বলে দাও না, ম্যান্ডেলা কোথায় যায়। তুই মূর্তিটিকে তাই বলিস?'

ওয়াকার তখন এক কথা, 'না কর্তা কিছু বলি না তাকে?'

বুচার মামা বলবে, 'ফের যদি দেখি ওয়াকা, তুই জাদুকরের বাগানে ঢুকেছিস, পা খোঁড়া করে দেব।'

জাদুকর পাথরের। কোথা থেকে কিভাবে যে সমুদ্রের ঢেউ ফেলে দিয়ে গেছে তাকে, কেউ তা জানে না। তা এটা বেশ একটা রহস্য।

শহরের বেলাভূমিতে জাদুকর পড়ে আছে। সেই জাদুকর—যে জাহাজে এসেছিল, যে পাতার বাঁশি বাজাত—যে শিশুদের নিয়ে পাইন ফেস্টিভ্যালের দিনে, মিছিল বের করেছিল —ঠিক সেই পোশাকে, সেদিন সে যা পরে পাইন ফেস্টিভ্যালে শহরের রাস্তায় নেমে এসেছিল, শহরের মানুষজন তাকে দেখে তো অবাক—বাড়ির কাচ্চা-বাচ্চারা সব ছুটে বের

হয়ে গেল, পাতার বাঁশির সুরে মুগ্ধ করে সব শিশুদের সে বের করে নিল, সে যদি মাস কাবার না হতেই পাথরের মূর্তি হয়ে ভেসে আসে আর বেলাভূমিতে পড়ে থাকে—তবে মানুষের দোষ কি! তারা তো অবাক হবেই।

ম্যান্ডেলা উড়ে যাচ্ছে, আর বাড়ির কথা ভাবছে। মা-র কথা, ওয়াকার কথা, মামা বুচার ঠিক বাগানে পায়চারি করছে। শহরের লোকজন বলাবলি শুরু করে দিয়েছে, ভুতুড়ে মেয়েটা সত্যি এবারে উধাও! এতদিন তো সে বাড়ির বাইরে কখনো থাকে না। শহরের ছেলে-মেয়েদের চোখেও ঘুম নেই সম্ভবত। ওয়াকা অস্থির হয়ে পড়বে। সে পাইনের জঙ্গলে ঘুরে বেড়াবে। উপত্যকায় আপেলের বাগানে ঘুরে বেড়াবে কিংবা ভেড়ার পাল নিয়ে যারা নীচে নেমে যায় , তাদের কাছে খোঁজাখুঁজি করবে, 'ম্যান্ডেলাকে দেখেছ! কোথায় যে আছে! কোথায় যে গা ঢাকা দিয়ে থাকে। খায় কী!' অবশ্য খাবার ভাবনা থাকার কথা না। চেরি ফলের বাগানে ঢুকে গেলে চেরি ফল খেয়ে আনন্দেই দিন কাটিয়ে দিতে পারে—কিংবা আঙুরের খেতে যদি লুকিয়ে থাকে, তবে তো হাইতিতিরও খুব মজা। আঙুর খেতে ওস্তাদ। আর কোনো খামারে পালিয়ে থাকলে, সেখানে দুধ মাখন সব পাবে। নদী এবং হ্রদের পাড়ে পাড়ে ঘুরে বেড়ালেও তার ভয় থাকার কথা না। ম্যাণ্ডেলার ভারি মিষ্টি স্বভাব। সবাই তাকে আদর করে খাওয়াতে পারে। মেয়েটার মধ্যে ঐশী শক্তি আছে, এমনও এখন শহরের লোকজনরা বিশ্বাস করে। তার পক্ষে পাঁচ-সাতদিন নিখোঁজ হয়ে থাকা খুব কঠিন না। এমনকী এখন রাত জেগে ছাদে বসে থাকবে সবাই—ওর ফেরার সময় শহরের মাথায় ঘন্টাধবনি হয়। সাধারণ মানুষ তো জানে না হাইতিতির গলায় ম্যান্ডেলা রুপোর ঘন্টা বেঁধে দেয়। সে এই রুপোর ঘন্টা পেল কোথায় তাও কেউ জানে না। তা হাইতিতি ভাসতে ভাসতে নেমে এলে ঘন্টা বাজবে, ঘন্টাধবনি হবে—এবং নীল আকাশে দেখা যাবে ছেঁড়া রুমালের মতো কী যেন দুটো ভেসে চলে আসছে। তখনই তারা বলবে, লুসির ভুতুড়ে মেয়েটা ফিরল। যাক কিছু যে হয়নি—কোথায় যায়! লুসির প্রাণে এবার জল এল! সবাই লুসিকে এজন্য কিছুটা মা মেরির কাছাকাছি জননী ভেবে থাকে। তাকে সবাই ভক্তি শ্রদ্ধাও করে। বাগানের সুমিষ্ট ফল, ভেড়ার বাচ্চা উপহারও পাঠায় কেউ কেউ।

ম্যান্ডেলা দ্রুত বাতাস কেটে নেমে আসছে। এতদিন এভাবে তার বাইরে ঘোরা উচিত কাজ হয়নি। তারপরই মানে হল, সে না থাকলে ফনের আদেশে মুম্বাটুকে পুড়িয়ে মারা হত। একজন মানুষের প্রাণ বড়ো, না মা-র দুশ্চিন্তা বড়ো কিছুতেই ম্যাণ্ডেলা তার গুরুত্ব বুঝতে পারে না। মাকে সে কষ্ট দিতে চায় না। সেবারে, সেই প্রথম, পালকের টুপি আর রুপোর ঘন্টা পেয়ে কী বোকামিই না করে ফেলেছিল! পাইনের জঙ্গলে এভাবে কেউ পালকের টুপি ফেলে রেখে যায় না। রুপোর ঘন্টাও ফেলে রেখে যায় না। যদি যায়, তবে কোনো মহৎ উদ্দেশ্য আছে। এবং সেদিনই স্বপ্নে কে যেন তাকে বলে গেল, আরে সেই

জাদুকরই তো, তার সামনে দাঁড়িয়ে বলল, ওটা অমূল্য জিনিস—তোমার বাবা নিখোঁজ। তাকে ওটা পরে খুঁজতে যেতে পারবে। পৃথিবীর যে কোনো জায়গায়, তুমি ইচ্ছেমতো উড়ে যেতে পারবে। তারপর মনে হল, না যেন এটা জাদুকর তার হাতে দিয়েই বলেছিল—কি যে হয়, কখনও মনে হয় স্বপ্নে, কখনো মনে হয় বাস্তবেই মানুষটি তার নিখোঁজ বাবার কষ্ট বুঝে পালকের টুপিটি তাকে দিয়ে গেছিল। তবে রহস্যময় মনে হলেও তার কেন যে মনে হয়, জাদুকর বসন্তনিবাস তার ভালোই চায়। এই যে সে ফনের রাজত্বে ঘুরে এল, তাও বোধহয় জাদুকরের ইচ্ছে। তা না হলে, সাত সমুদ্র তের নদী পার হয়ে সে নিমেষে উড়ে যায় কী করে! তবে এটা মনে আছে, জাদুকর তাকে পইপই করে বলেছে, 'এই টুপির খবর, রুপোর ঘন্টার খবর কেউ যেন না জানে—এতে মন্ত্রগুণ নষ্ট হয়ে যায়' সে এজন্য কিছুই বলতে পারে না। ওড়াউড়ির শুরুতে লায়ন রকে গেছিল। সবে সে পালক আর রুপোর ঘন্টা পেয়েছে। পেয়েই টুপিটা মাথায় দিতেই কেমন হালকা হয়ে গেল। উড়তে থাকল—তার খুব ভয় ধরে গেছিল—আরে বাতাসে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে যে তাকে! সমুদ্রের উপরে যে নিয়ে যাচ্ছে তাকে! যেই না ভয় সঙ্গে সঙ্গে সে দেখতে পায়, বাড়ির দিকে উড়ে যাচ্ছে—কী সুন্দর বাড়িটা—এত উপর থেকে তো সে তার বাড়ি কখনো দেখেনি। সবুজ পাইনের জঙ্গলে পাহাড়ের মাথায় বাড়িটা মনে হচ্ছিল, আশ্চর্য সুন্দর। সামনে সমুদ্র, সমুদ্রের বালিয়াড়িতে পাথরের জাদুকর একবার ঘাড় ফিরিয়ে তাকে দেখেও ছিল। বলেছিল, 'ভয় কি! মাথায় পালকের টুপি আছে, ভয় কি! তুমি যা ভাববে, ঠিক সেমতো টুপিটা কাজ করবে। তোমার ভয় ধরে গেল, তাই আবার বাড়ির দিকে উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে তোমোকে।' তারপর বলেছিল, 'তুমি একা কেন—হাইতিতি কোথায়। ওকে সঙ্গে নাও। তারও তো আছে রুপোর ঘন্টা। একা ওড়াউড়ি করলে ভয় পাবারই কথা। আমারও ভয় করত। এই যে সমুদ্রবেলায় তোমরা আমাকে পাথরের মূর্তিতে বন্দি করে রেখেছ, আমারও একা ভয় করে। ভয় করে বলেই তো সব পাখিরা ওড়াউড়ি করে মাথার উপর। রাতে যখন শহর ঘুমিয়ে পড়ে তখনও একটা বড়ো অ্যালবাট্রস পাখি আমার মাথায় চুপচাপ বসে থাকে। আমাকে সঙ্গ দেয়। কথা বলে। হাইতিতি সঙ্গে থাকলে তোমার ভয় করবে না। মানুষের সঙ্গে পাখি, প্রজাপতি, শুধু পাখি, প্রজাপতি কেন, সব প্রাণীরই একটা মধুর সম্পর্ক থাকে। যারা শুধু মানুষের কথা ভাবে, তারা স্বার্থপর। মানুষের সঙ্গে গাছপালারও গভীর সম্পর্ক। কেউ কাউকে ছেড়ে বাঁচতে পারে না। বড়ো হতে পারে না।'

রাত শেষ হয়ে আসছে। আকাশে স্বাতি নক্ষত্রের গায়ে যেন কুয়াশার জল লেগে গেছে। আকাশ আর নক্ষত্রমালার ভিতর ম্যান্ডেলা ভেসে যাচ্ছিল। ম্যান্ডেলা কত কিছু ভাবছিল। বাড়ি ফেরার সময়ই তার সব কথা মনে হয়। এমনকী বাবার লাগানো প্রিয় গাছগুলোর কথাও মনে হয়। কাঠের সেই লাল নীল বাড়িটার চারপাশে, বাবা কত দেশ থেকে সব

সুন্দর সুন্দর গাছ এনে লাগিয়েছে। বাবার জন্য আগে মন খারাপ হলে সে গাছগুলির চারপাশে ঘুরে বেড়াত। সিলভার-রক গাছটিও তার প্রিয়। শুধু তার কেন, হাইতিতিরও। হাইতিতিকে তো গাছটির সঙ্গে বেঁধে রাখা হয়। সুযোগ পেলেই সে জঙ্গলে ঢুকে যেতে চায়। এমনও হয় যে তাকে আর খুঁজেই পাওয়া যাচ্ছে না। গেল কোথায়! ওয়াকা, সে, বুচার মামা পর্যন্ত টর্চ হাতে পাইনের জঙ্গলে খুঁজতে বের হয়। বাড়িটার নীচে বিশাল পাইনের বন—কতদূর চলে গেছে। কোথায় কোন জঙ্গলে ঘাপটি মেরে আছে তারা বুঝবে কী করে। না, খুঁজে খুঁজে কোথাও পাওয়া গেল না। নিরাশ তারা। আর বাড়ি ফিরে দেখে, দুষ্টুটা সিলভার-ওক গাছের নীচে চুপচাপ বসে আছে। গাছটাকে হাইতিতিও কত ভালোবাসে এটা যেন তার প্রমাণ।

সেই গাছটা সে কতদিন দেখে না। গাছটার নীচে বসে থাকে সকাল হলে। গাছের ছায়ায় নীল রঙের বেতের চেয়ারে সে বসে থাকে। হাইতিতি তখন একেবারে পোষা কুকুরের মতো। সে যা খাবে, ভাগ না পেলে ক্ষিপ্ত হয়ে কখনও গিয়ে সে জঙ্গলে লুকিয়ে পড়ে। টমেটো সস দিয়ে স্যান্ডউইচ খেলে হাইতিতিরও চাই স্যান্ডউইচ, টমেটো সস। এত পাজি কখনো লাফিয়ে হাঁটুতে দু-পা রেখে ঝুঁকে দেখবে সে কী খাচ্ছে।

সেই গাছটাও তাকে টানছে, এই টানের জন্যই সে মেঘ ফুঁড়ে বের হয়ে আসছে। মেঘেরা কী, দায় নেই, দায়িত্ব নেই, তাদের মা-বাবাও নেই, ঘরবাড়ি তাদের কোথায় সে জানে না, মেঘেরা ঝরঝর করে ঝরে পড়লেই খালাস। তাদের মতো ঢিমেতালে ভেসে বেড়ালে চলবে কেন। সে সাঁ সাঁ করে উড়ে চলেছে, দুরন্ত ঈগল কিংবা কোনো অ্যালবাট্রস পাখির ঝাঁক নিমেষে পড়ে যাচ্ছে তার পেছনে। রকেটের মতো সে ছুটে চলেছে। মা রোজ আশা করছে, সকালে ঘুম থেকে উঠেই দেখতে পাবে তাকে! দুপুরেও খাবার নিয়ে বসে থাকছে হয়তো। রাতেও । আর রোজ ঠিক গির্জায় যাচ্ছে প্রার্থনা করতে। রাত হলে চুপচাপ জানালায় দাঁড়িয়ে থাকবে। এখন আর আগের মতো মা ত্রাসে পড়ে যায় না। আগে তাকে না দেখলেই কান্নাকাটি জুড়ে দিত। বুচার মামাকে ফোন করত, 'ম্যান্ডেলাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।' ব্যস। সারা শহর তোলপাড়—থানা-পুলিশ কত কিছু হয়েছে। কিন্তু যে উড়তে পারে, অদৃশ্য হয়ে থাকতে পারে, থানা-পুলিশের সাধ্য কি তাকে খুঁজে বের করে।

সেই সেবারে—দূর ছাই মনেও থাকে না। সেই সেবারে বললেই তো হয় না, আরে ওই যে লায়ন রকে তারা যেবারে যায়—পুরো চব্বিশ ঘন্টা নিখোঁজ। তা এতটুকুন ছোট্ট মেয়ের পক্ষে চব্বিশ ঘন্টা নিখোঁজ হয়ে থাকা যে কত ঝকমারি—বাড়ি ফিরে হাড়েহাড়ে টের পেয়েছিল।

হাওয়ায় ভেসে বাড়ির কাছাকাছি আসতেই মনে হয়েছিল, তাদের বাড়িতে মানুষজনের ভিড়, পুলিশে পুলিশে ছয়লাপ। কী হল রে বাবা!

তাদের বাড়ির সামনে সুন্দর ঘাসের লন। সবুজ—আর সেখানে এত মানুষের ভিড়! নীচে পাইনের বনভূমি, সেখানেও লোকজন কি খোঁজাখুঁজি করছে। বাড়ির পেছনে সাদা পাহাড়—এপমন্ট হিল। প্রায় সারাটা বছর তুষার শৃঙ্গ রোদে ঝকমক করে। বৃষ্টির দিনে, কিংবা কুয়াশা হলে পাহাড়টা কখনো কখনো আড়ালে পড়ে যায়। তখন কেন যে বাড়িটা তাদের ন্যাড়া ন্যাড়া মনে হয় সে বুঝতে পারে না। কুয়াশা থাকায় সে পাহাড়টা দেখতে পায়নি—তবে পাহাড় না থাকলেও, সবই আগের মতো আছে। বনভূমির নীচে ছোট্ট বেলাভূমি। আর আছে অজস্র লাল নীল পাথর, ফুলের উপত্যকায় রাজবেশে জাদুকর দাঁড়িয়ে আছেন। এমনকী পাহাড়ের নীচে সবুজ ঘাসের চারণভূমিতে সে অজস্র ভেড়ার পালও দেখতে পেয়েছিল। সবই এত ঠিকঠাক, তবু কেন যে বাড়িতে তাদের এত লোকজন প্রথমে ঠাউর করতে পারেনি।

পরে বুঝেছিল, অ তাইতো, সে যে মনের আনন্দে হাইতিতিকে নিয়ে লায়ন রকে উড়ে গেছে তা তো কেউ জানে না। সে পাইনের বন থেকে উঠে আসার সময়ই সবাই হইচই বাধিয়ে দিয়েছিল—ওই তো ম্যান্ডেলা! ওই তো হাইতিতি! মা প্রায় পাগলের মতো ছুটে এসে তাকে জড়িয়ে ধরেছিল, আর হাউহাউ করে কাঁদছিল।

বুচার মামার গম্ভীর গলা, 'কোথায় গেছিলে—দিনকাল ভালো না, বিচ্চু মেয়ে, তোমাকে নিয়ে তো আমরা সবাই পাগল হয়ে যাব দেখছি। বল, কোথায় গেছিলে!'

সে তো বলতে পারে না, লায়ন রকে গেছিল। জাদুকর যদি রাগ করে। জাদুকর তো স্বপ্নে দেখা দিয়ে বলতেই পারে—'ম্যান্ডেলা তোমার একদম বুদ্ধি নেই। ওরা বিশ্বাস করবে —তুমি গেলে কি করে জানতে চাইবে না! এখন লায়ন রকে যাওয়া যায় না। ঝড়ের দরিয়া বলে ফেরি বন্ধ! স্বভাবতই প্রশ্ন উঠবে, তুমি গেলে কী করে। কী দরকার বলার, লায়ন রকে গেছিলে—চুপ করে থাকলেই তো হয়।

২

সে সেবারে অবশ্য মামার দাবড়ানিতে ভাগ্নে বলে ফেলেছিল সব। লায়ন রকে উড়ে গেছে। এমনকী টিউলিপ ফুল খেয়ে হাইতিতির কি আনন্দ। সে লাফায় আর টিউলিপ ফুল খায়। যত পায় তত খায়। কিন্তু মামা বিশ্বাসই করলেন না। ভাবলেন মিছে কথা বলছে।

গুরুগম্ভীর গলায় প্রশ্ন, 'এই তোমার শিক্ষা! তুমি জান না, গুরুজনদের সঙ্গে মিছে কথা বলতে নেই। আমরা খোঁজাখুঁজি করে হয়রান। বাড়িটার উপর এত ভুতুড়ে উপদ্রব। তোমার বাবা জাহাজে গেলেন, আর ফিরলেন না, তুমি বড়ো হতে না হতেই নিখোঁজ হয়ে গেলে। কোথায় না খুঁজেছি—পিকাকোরা পার্কে তন্নতন্ন করে খোঁজা হয়েছে। তোমার তো ধারণা, তোমার বাবা সেখানে লুকিয়ে আছেন। বল, সত্যি করে বল, কোথায় সারাটা দিন

ঘাপটি মেরে ছিলে।' না বললে, বলেই লুসিকে ডেকে বললেন, 'তোমার অনেক ভোগান্তি আছে। এ মেয়ে তোমাকে ভোগাবে। যাও নিয়ে যাও। তালা বনধ করে ফেলে রাখ ঘরে। কোথায় যায় দেখব! বাবাকে খুঁজতে যায়। আর কিছু খোঁজার অজুহাত পেল না!'

সহৃদয় পুলিশ অফিসারটিই তাকে সেবারে বলতে গেলে রক্ষা করছিল। বলেছিল, 'ওকে আর বকাবকি করবেন না। যা হয়ে গেছে তা নিয়ে ওকে কোনো প্রশ্ন করবেন না। নিজে না বললে, ভয় দেখিয়ে কথা বের করতে যাবেন না। শিশুরা একটু চঞ্চল হয়েই থাকে।' পুলিশ অফিসারটি আরও জানিয়েছিল, মি. হাসিমারা আসবেন। তিনি একজন শিশু বিশেষজ্ঞ। সেই বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিটিই হয়তো বলেছেন, নিরুদ্দেশ থেকে বাচ্চা ছেলেমেয়ে ঘরে ফিরে এলে তাকে অযথা প্রশ্ন করে উত্যক্ত করতে নেই।

বুচার মামা এসব কারণেই বোধহয় নানা বিভ্রমে পড়ে গেছিলেন। তাকে বুকে তুলে নিয়ে বলেছিলেন, 'মা আমার খুব ভালো। বেশ বেড়িয়ে হাওয়া খেয়ে ফিরলে। তা কোথায় গেছিলে? নিশ্চয় খুব সুন্দর জায়গা। আমরাও না হয় যেতাম।' আর তখনই সে বোকামি করে ফেলল, 'জান বুচার মামা—আমরা না, লায়ন রকে গেছিলাম।'

বুচার হতভম্ব।

'লায়ন রকে! কেন? কী করতে!'

'বাবাকে খুঁজতে।'

বুচার মামা তার মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। বিশ্বাস করবে কেন, সে তার বাবাকে খুঁজতে লায়ন রকে গিয়েছিল। আসলে শিশুরা মনে মনে নানা জায়গায় ভ্রমণ করে থাকে। এও বোধহয় তাই—এমনই হয়তো ভেবেছিলেন বুচার মামা। শুধু বলেছিলেন, 'বাবাকে একা খুঁজতে গেলে? ভয় করল না।'

'একা কেন? সঙ্গে হাইতিতি ছিল। ওকে জিজ্ঞেস করে দেখ না?'

বোকা হাইতিতিও কম যায় না! সে সোজা ঢেকুর তুলে দুটো তাজা টিউলিপ ফুল জিভে তুলে এনেছিল। তারপর জিভ বের করে দেখিয়েছিল, মনের আনন্দে সে সারাদিন টিউলিপ ফুল খেয়ে বেড়িয়েছে। একমাত্র এসময়ে লায়ন রকেই টিউলিপ ফুল ফুঁটে থাকার কথা, অন্যত্র তারা যে ঝরে গেছে বুচার মামা কেন—সবাই সেটা জানে!

বুচার মামা এরপর আর কি প্রশ্ন করবেন বুঝতে পারছিলেন না। হতভম্ব অবস্থা বোধহয় কিছুটা কেটে গেছে। লোকজনের ভিড়ও পাতলা হয়ে আসছে। সবাই বলাবলি করছিল, 'মেয়েটার মাথায় নিশ্চয় ভূত চেপেছে।' অথবা বাবাকে খুঁজতে যায় বলায় মনে করেছে, শেষে তার বাবাই মেয়েটাকে খাবে। কোথায় কোন গভীর সমুদ্রে জাহাজডুবিতে মারা গেছে কে জানে—তার প্রেতাত্মা যে মেয়াটাকে ঘরছাড়া করতে চাইচে না, তারই বা

ঠিক কি! বরং এসব ব্যাপারে পুলিশ, শিশুবিশেষজ্ঞ না ডেকে ওঝা গুণিন ডাকাই বেশি শ্রেয়। ঝাড়ফুঁক করলে নিরাময় হয়ে যেতে পারে।

ম্যান্ডেলা দেখছিল মাকে ঘিরে প্রতিবেশীরা নানা উপদেশ দিচ্ছে। ওয়াকা মা-র ফুটফরমাস খাটছে। ম্যাণ্ডেলা ফিরে আসায় তার আর কোনো দুশ্চিন্তা নেই। সেও লাফিয়ে বেড়াচ্ছে টুকিটাকি কাজ সারার সময়।

আসলে বুচার ভেবেছিলেন, পাইনের বনে ঢুকে মেয়েটা নির্ঘাত রাস্তা হারিয়ে ফেলেছিল। তারপর ক্লান্ত শ্রান্ত হয়ে কোনো গাছের নীচে ঘুমিয়ে পড়েছিল। তারপরই মনে হল, রাস্তা হারালে, ফের পথ চিনে বাড়ি এল কি করে! এও হতে পারে বাবার খোঁজে সে পাইনের বন পার হয়ে কোনো উপত্যকায় উঠে গেছিল। কিংবা কোনো আপেল বাগানে, বাবা নিখোঁজ—কোথায় আর যাবে, ঠিক খুঁজে বের করবে এমন আশাতে সে আর বাড়ি ফেরার কথা মনে রাখতে পারেনি। এও হতে পারে বাবার কথা ভাবতে ভাবতে কোনো পাথরে বসে কাঁদছিল। কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়েছিল, তারপর সকাল হলে বাড়ির কথা মনে হয়েছে। মার কথা মনে হয়েছে। আর স্থির থাকতে পারেনি। ঘুমিয়ে স্বপ্নও দেখতে পারে। স্বপ্নে সে লায়ন রকে ঘুরে আসতেই পারে। সুতরাং ম্যান্ডেলার বিশ্বাসকে বুচার ক্ষুণ্ণ করতে চায়নি। টিউলিপ ফুল সব ঝরে গেছে তাও বিশ্বাসযোগ্য নয়।

'তা হলে লায়ন রক থেকে ঘুরে এলে?'

'হ্যাঁ মামা।'

'বেশ করেছ। একা অবশ্য যাওয়া তোমার ঠিক হয়নি।'

'তুমি না মামা, খুব বোকা! হাইতিতি আমাকে ছেড়ে কোথাও যায়, কোথাও থাকে!

বুচার অবশ্য তা জানেন। তার ভগ্নীপতির এই এক শখ ছিল—পৃথিবীর যেখানে যা কিছু পাওয়া যায় মেয়ের জন্য নিয়ে আসতে পারলে, যেন তার সমুদ্র-সফর সফল। আর ম্যান্ডেলারও আবদারের শেষ ছিল না।

'বাবা আমার চাই সিংহলের হাতি।'

বাবা তার জন্য সিংহল থেকে কাঠের হাতি কিনে এনেছিলেন।

'বাবা আমার চাই জাভাদ্বীপের গিরগিটি।'

বাবা ম্যান্ডেলার জন্য পাথরের গিরগিটি নিয়ে এলেন।

'বাবা আমার চাই, তুষার হরিণ!'

বাবা নিয়ে এলেন, রুপোর একটা সাদা হরিণ।

‘বাবা আমার চাই ক্যাঙারুর বাচ্চা!’

বাস যেমন বাবা তেমনি তার মেয়ে। তিনি সেবারে নিয়ে এলেন সত্যি একটা জ্যান্ত ক্যাঙারুর বাচ্চা। ম্যান্ডেলা যা চায় তাই পায়। বাবার জাহাজ কবে ফিরবে সেই আশায় কতদিন জেটিতে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। বাবার জাহাজ ফেরার কথা আছে জানলেই ম্যান্ডেলা বাড়ির লনে বসে সাদা জাহাজের অপেক্ষায় থাকে। বাড়িতে বসে থাকলে নীল সমুদ্র দেখারও একটা আনন্দ আছে। টিলার ওপরে বাড়ি—সমুদ্র অনন্ত অসীমে মিশে গেছে —ঝড় এবং তরঙ্গমালা উভয়ই সে কাঁচের জানালায় দাঁড়িয়ে দেখতে পায়। নীচে পাইনের বনভূমি, গাছগুলি ঝড়ের দাপটে নুয়ে পড়ে। ঝড়ের ঝাপটার গাছের ডালপালা ভেঙে পড়ে —কখনো সমুদ্রের জলকণা ভেসে এসে নানা কারুকার্য গড়ে দেয় জানালার কাচে। এমন মেয়ের জন্য বাবার কেন শখ হবে না—একটা জ্যান্ত ক্যাঙারুর বাচ্চা। মেয়ের মুখে হাসি ফোঁটাতে পারার জন্য বুচার জানেন, পারলে ভগ্নীপতি সারা পৃথিবীর সব বিচিত্র গাছপালা পাখি জীবজন্তু বাড়িটায় ছড়িয়ে দেয়—নানা মজা সৃষ্টি করার খুবই আগ্রহ তার।

সেই ভগ্নীপতি যেবারে ক্যাঙারুর বাচ্চাটি নিয়ে জাহাজ থেকে নামল, কী ভিড় বাচ্চাটাকে দেখার জন্য। বাড়িতেও ভিড়। ম্যান্ডেলাকে খুশি করার জন্য সেবারে আর কাঠ নয়, পাথরের নয় একেবারে রক্তমাংসের জীব এনে হাজির করলেন। তবে ক্যাঙারুর বাচ্চা তো—পোষ মানবে কেন! খায় না, শুয়ে থাকে। ম্যান্ডেলা বোঝে ক্যাঙারুরও মা-বাবা থাকে। মা-বাবার জন্য মন তো খারাপ করবেই।

‘এই দুধ খাও?’

‘খাবো না!’

‘না খেলে, আমিও খাচ্ছি না।’ ম্যান্ডেলা গুম মেরে বসে থাকত বাচ্চাটার সামনে। লুসি রাগারাগি করছে—’তুমি কি, মেয়ে বলল, আর জ্যান্ত একটা ক্যাঙারুর বাচ্চা ধরে আনলে!

বাঁচবে'।

ম্যান্ডেলার মনে আছে, বাবা শুধু একটা কথাই বলেছিলেন, ‘বাড়িতে ম্যান্ডেলা আছে। বাঁচবে। ভালোবাসা পেলে কে না বাঁচে! বাঁচতে চায়!’

তখন তো বাচ্চাটা ভালো করে লাফাতেও পারত না। ম্যান্ডেলার আদরে মাথাটিও গেছে। ম্যান্ডেলা খেতে বসলে নিজেই লাফিয়ে এসে বসে পড়বে। টেবিলের চারপাশে চারটে চেয়ার। ডাইনিং টেবিলে কারুকাজ করা চিনামাটির প্লেট, বাচি, চা-এর পট, নুনদানি জলের মগ। চারপাশে চারজন। বাবা-মা একদিকে—সে আর হাইতিতি একদিকে। ওয়াকাই নামটা দিয়েছিল। বাড়িতে কেউ অতিথি এলে তার যে একটা নাম থাকে ওয়াকাই মনে করিয়ে দিয়েছিল।

কত নাম ঠিক করা হল।

ম্যান্ডেলার একটাও পছন্দ না।

'সি-গাল।'

'সি-গাল কেন? ও কি পাখি! সি-গাল নাম রাখছ! ও কি উড়তে পারে? ওর কি ডানা আছে?'

বাবা বললেন, 'শ্যাময় নামটা বেশ।'

ম্যান্ডেলা জানে না শ্যাময় কোনো নাম হতে পারে। সেটা আবার কি বস্তু?

বাবা বলেছিলেন, 'শ্যাময় একপ্রকারের হরিণ। আল্পস পর্বতমালায় তারা বিচরণ করে। তুষার হরিণও বলতে পার। রঙটা তো হরিণের মতো। শ্যাময় নামটাই আমার পছন্দ।'

মা ধমকে উঠেছিল, 'যেমন মেয়ে তেমনি বাবা। নাম নিয়ে এত দুশ্চিন্তা! কেউ খাচ্ছে না। কেউ কাঁটা চামচ ধরছে না। আর বাচ্চাটাও হয়েছে, দেখ, যেন সব বুঝতে পারে। সবার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। কে কি নাম রাখতে চায়, নামটা পছন্দ কিনা, বোঝার চেষ্টা করছে।'

মা-র ধমকে সবারই মনে হল, খাবার টেবিলে গল্পও করতে হয়, আবার খেতেও হয়। তারা শুধু গল্পই করছে। ওয়াকা ডাইনিং টেবিল সাজিয়ে ক্যাঙারুর বাচ্চাটার পাশে দাঁড়িয়ে আছে। সে কি নাম রাখতে চায়, কারো সে বিষয়ে যেন কোনো আগ্রহ নেই জানার।

তার খুব অভিমান। সে কোনো কথা বলছে না। গুম মেরে একপাশে দাঁড়িয়ে আছে। সে-ই যে বাজার থেকে, বন থেকে বাচ্চাটার জন্য খাবার সংগ্রহ করে আনে কেউ যদি তার কষ্টটা বুঝত। সে-ই তো আবিষ্কার করেছিল, বাচ্চাটা খেতে ভালোবাসে আনারস আর তরমুজ। লেটুস পাতাও তার প্রিয় খাবার। আর বুনো ফল এবং গাছের নরম শেকড়-বাকড়। যেমন বনআলু তার খুব প্রিয়। জঙ্গলে ঘুরে ঘুরে ওয়াকা লতা দেখলেই চিনতে পারে, কোনটা বনআলুর, কোনটা শালুই লতা। লতার ফল দেখলেও সে চিনতে পারে। দুটো লতাই একরকম দেখতে। পাতাও একরকমের। পানপাতার মতো। ওয়ালনাট গাছ কিংবা কৌরিপাইনের কাণ্ড খুব প্রিয় এ-দুটো লতারই। গাছের ডালপালা জড়িয়ে এমন বিতিকিচ্ছি অবস্থা করে ফেলে যে তখন গাছটাকে আর চেনাই যায় না। ঝুপড়ি মতো হয়ে যায় গাছটা। এত সব কারণে দু-একবার ওয়াকা যে না ঠকেছে তা নয়। বনআলু ভেবে লতার গুঁড়ি কুপিয়ে দেখা গেল, কিছুই নেই। শালুই লতার মূল বলে বিশেষ কিছু থাকে না। লতার নীচে হাতির দাঁতের মতো নরম রসালো মূলও থাকে না। পরিশ্রমই বৃথা। এখন অবশ্য সে জঙ্গলে ঘুরে ফুল এবং ফল দেখে চিনতে পারে, কোনটা বনআলুর। কোনটা শালুই লতা। শালুই লতার ফুল এবং ফল দুই হয়। ফুলগুলি কাকটাস লতার

ফুলের মতো। নীল রঙের। ফল হলে লম্বা পটলের মতো দেখতে। বিস্বাদ খেতে। মুখে দিলে বমি হবেই। আর বনআলুর কোনো ফুল হয় না। ফল হয়। ফলগুলি দেখতে বিশ্রী। বড়ো জড়ুলের মতো যেন থোকা থোকা ঝুলে থাকে। পুড়িয়ে খেতে দারুণ। বাচ্চাটা কী খায়, না খায় তাও জানা নেই। তবে দুধ খায়। দুধ সব বাচ্চারাই খায়। ক্যাঙারুর বাচ্চা দুধ খাবেই ধরে নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু দুধ তো বার বার খেতে ভালো লাগে না। মুখরোচক কিছু চাই। আর এজন্যই হাইতিতির ডিসে লেটুস পাতা, বনআলুর টুকরো—কিছুটা শাঁখআলুর মতো কেটে রাখা হয়েছে। আনারসও কেটে রাখা হয়েছে। সব রেডি—অথচ খাওয়ার নাম নেই। বাচ্চাটার নাম নিয়ে সবাই পড়েছে। অথচ ওয়াকার মতামত এ ব্যাপারে সবাই অগ্রাহ্য করছে। ওয়াকার তো রাগ হবেই।

ম্যান্ডেলা মা-র কথাতে সচকিত হয়ে গেছে। সত্যি তো কেউ কিছু মুখে তুলছে না। গ্রিন পিজ আর টমেটোর স্যুপ—ভাপ উঠতে উঠতে ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে, সে খেয়ালও নেই। মা-র তো রাগ হবেই। সাদা ন্যাপকিন ভাঁজ করা। কেউ খুলে হাঁটুতে বিছিয়েও নিচ্ছে না। যেন নামকরণ না হলে কেউ কিছু মুখে দেবে না ঠিক করেছে। অগত্যা কাঁটা চামচে গেঁথে নিল একটা লেটুস পাতা। ম্যাণ্ডেলা বাচ্চাটার মুখের কাছে নিয়ে গেলে, মুখ হাঁ করল। বাচ্চাটার বায়নাও শেষ ছিল না তখন! ম্যাণ্ডেলা না খাইয়ে দিলে কিচ্ছু মুখে দেবে না। একবার সে বাচ্চাটার মুখে খাবার তুলে দেয়, একবার সে চামচে স্যুপ খায়। আহার পর্ব শুরু হতেই বাবা যে কেন বললেন, 'ওয়াকা কী বলে?'

আর যায় কোথায়।

ওয়াকার মুখে একগাল হাসি।

সে বোধহয় রাগে ক্ষোভে ঘামছিল। তার তখন সব ঠান্ডা। সে জামার আস্তিনে মুখ মুছে বলল, 'হাইতিতি।'

'হাইতিতি আবার নাম হয় নাকি!' মা মুরগির রোস্ট কেটে সবার পাতে দেবার সময় কথাটা বলেছিল।

ব্যস, ওয়াকার আবার মন খারাপ। টিকল না। তার নাম পছন্দ না। সে ব্যাজার মুখে চায়ের পর্টে গরম জল ঢেলে দিল। খাওয়া হলে ওয়াকা সব যখন সাফ করে তুলে নিয়ে যাবে তখন সবাই এক পেয়ালা চা না হয় কফি খায়। সে হাতের কাছে সব জোগাড় রাখে। যে যার মতো পট থেকে চা নেয়। চিনি নেয়। দুধও নেয়। তবে বাবা চা-এর লিকারই বেশি পছন্দ করেন— তিনি তাঁর চা-এ কখনো দুধ মেশান না।

ম্যান্ডেলার খারাপ লাগছিল। ওয়াকার ব্যাজার মুখ সে একদম পছন্দ করতে পারে না। তাছাড়া ওয়াকারই তো ভাব ছিল বেশি জাদুকরের সঙ্গে। সেই তো জাদুকরকে শহরটা

ঘুরিয়ে দেখিয়েছিল। সেই তো বাড়ি ফিরে হাঁপাতে হাঁপাতে বলেছিল—'জান, জাদুকর বসন্তনিবাস এসেছে শহরে। সে যা চায় পেয়ে যায়। আলখাল্লার ভিতর থেকে যখন তখন সে একটা বেড়ালের বাচ্চা বের করে আনে। তারপর জাদুকরের কান যত ফরফর করে নড়াচড়া করে তত বেডালছানাটা বড়ো হয়ে যায়। শেষে বাঘ হয়ে যায়। বাচ্চারা বাঘ দেখে খুশি হলে, জাদুকরের আর কান ফরফর করে না। বাঘটা ছোটো হতে হতে শেষে আবার বেড়ালছানা হয়ে যায়। তারপর লাফিয়ে জাদুকরের আলখাল্লার পকেটে ঢুকে পড়ে।' তবে ওয়াকা এ-সব ম্যান্ডেলাকেই বলে। কারণ বড়োরা তো বিশ্বাস করবে না। বাচ্চারা যা দেখতে পায় বড়োরা তা দেখতে পাবে কেন।

তার মনে আছে, বাবা সেদিনই সমুদ্রযাত্রায় বের হয়ে গেছিলেন। খুব ইচ্ছে ছিল, জাদুকরের খবরটা বাবাকে দেয়। কিন্তু বাবা যদি বিশ্বাস না করে—ওয়াকা তো বলেছে, 'ছোটোরা যা দেখতে পায়, বড়োরা তা দেখতে পায় না। বড়োরা বিশ্বাস নাও করতে পারে। বিশ্বাস না করলে জাদুকরের অপমান না! সে রেগে গেলে, তাদের ক্ষতিও করতে পারে। বিশ্বাসীদের জন্য জাদুকর—অবিশ্বাসীদের প্রতি জাদুকর খাপ্পা।' পর পরই ওয়াকা বলেছিল, 'আমাদের ধর্মে আছে, তুমি জান মেসাইয়া কি না করেছেন। তিনি ইচ্ছে করলে কুষ্ঠরুগীর আরোগ্য লাভ করাতে পারেন। মূক-বধির তাঁর কৃপায় কথা বলতে পারে, অন্ধ ব্যক্তি দৃষ্টি ফিরে পায়। মৃত ব্যক্তির জীবনলাভ হয়। অবিশ্বাসীরা এ-জন্যই তো বিধর্মী।'

খুবই অকাট্য যুক্তি।

ম্যান্ডেলা বাবাকে জাদুকরের খবর দিতে সাহসই পায়নি। আর সে-বারই তো বাবা জাহাজডুবিতে নিখোঁজ হয়ে গেলেন। বাবা কি কারও কাছ থেকে শহরে জাদুকরের আবির্ভাবের খবর পেয়েছিলেন! খবর পেয়ে কি তিনি অবিশ্বাস করেছিলেন—'যত্ত সব আজগুবি কথা!' জাদুকর আজগুবি হলে যিশুর দয়াও আজগুবি। কই তার বেলায় তো তিনি অন্ধজনে দেহ আলো গোছের। তিনি কত সব অলৌকিক ক্রিয়া কাণ্ড করে গেছেন, গির্জায় গেলে কিংবা মা যখন অত্যন্ত নিরিবিলি পবিত্র গ্রন্থটি পাঠ করেন, তখন তো তিনি কখনো বলে না—আজগুবি। বরং যিশুর দয়ার কথা পড়তে পড়তে মা কেঁদে চোখ ভাসায়। তারও যিশুর কথা শুনতে শুনতে কেন যে কান্না পায় বোঝে না। মনে হয়, তিনি একজন মাস্টার ম্যাজেসিয়ান। তাঁর দয়ায় মানুষ সঠিক পথের খোঁজ পায়। শয়তান শত লোভে ফেলেও তাঁকে কব্জা করতে পারনি—মানুষের মঙ্গল ছাড়া মাস্টার ম্যাজেসিয়ান আর কিছু ভাবতেই পারতেন না। যিশু রাস্তায় আসছে জেনে দু'জন অন্ধলোক অপেক্ষা করছে। কাছে আসতেই তো তারা চিৎকার করে বলেছিল, প্রভু আপনি আমাদের স্পর্শ করুন। যীশু তাদের চোখে হাত রাখলেন। তারা আবার পৃথিবীর সব কিছু দেখতে পেল। কত বড়ো জাদুকর হলে এটা যে সম্ভব! বসন্তনিবাস তাকে পালকের টুপি দিয়ে গেছে—কাউকে বলা

যায় না। অথচ তিনি যে একজন প্রবল জাদুকর কেউ বিশ্বাসই করবে না। যিশুর সেই গল্পটাও তো তার মনে গেঁথে আছে। সক্কাল বেলায় তিনি জেরুজালেমে ফিরছেন। বড়ো ক্ষুধার্ত। রাস্তায় একটা মরা যজ্ঞিডুমুরের গাছ দেখতে পেলেন। পাতা নেই, ফল নেই। তিনি শুধু বললেন, আমি ক্ষুধার্ত—তুমি কি আমাকে কিছু ডুমুর ফল দিতে পার না! সঙ্গে সঙ্গে গাছটি পাতা মেলে দিল। হাওয়ায় তার ডালপালা দুলতে থাকল। ডুমুর ফলে ভরে গেল ডালপালা। যিশুর শিষ্যরা তো দেখে অবাক। তাঁরা প্রশ্ন করলেন, প্রভুকে—কী করে সম্ভব? প্রভু বললেন, যদি তোমাদের অটুট বিশ্বাস থাকে, যদি কোনো সংশয় না থাকে, এর চেয়ে আরও অলৌকিক কাজ তোমরা ইচ্ছে করলে করতে পার। এই যে সামনে মাউন্ট অফ অলিভস রয়েছে, তাকে যদি বল, সমুদ্রে বিচরণ কর—তবে সে তাই করবে। যদি প্রার্থনায় বিশ্বাস জন্মায়, হেন কাজ নেই মানুষের মঙ্গলের জন্য তুমি তা করতে পার না।

ম্যান্ডেলা মা-র কাছে শুনেছে, আরও কত অলৌকিক ঘটনার কথা। বাবা জাহাজে চলে গেলে মা তো সারাদিন চুপচাপ কাজ করত, ঘর সাজাতো, বাবার লাগানো গাছগুলিতে জল দিত, তাকে নিয়ে বসাতো—হাতের লেখা, অঙ্ক ড্রইং সব খাতাগুলির মলাট দিত যত্নের সঙ্গে। ইস্কুলের নাম, তার নাম, কোন ক্লাস সুন্দর হস্তাক্ষরে লিখে দিতে পারলে খুশি হত।

তারপর অবসর সময়ে যিশুর মহিমা পাঠ করে শোনাতো মা। বিশ্বাস করলে মাউন্ট অলিভসকেও যে নির্দেশ দেওয়া যায়, যাও সমুদ্রে গিয়ে বিচরণ কর—আর তক্ষুনি পাহাড়টা হয়তো চলে যাবে সমুদ্রে। আসলে বিশ্বাস। পালকের টুপি পরে সেটা আরও বেশি বুঝেছে। জাদুকরের প্রতি প্রবল বিশ্বাসই তাকে পালকের টুপিটা যেখানে খুশি নিয়ে যেতে পারে। যতই দুর্গম অঞ্চল হোক, যতই দূরের হোক সব দেশে সে ঘুরে বেড়াতে পারে। তার কি মজা কেউ বুঝবে না।

সে তো একদিন মাকে অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে বলেছিল, 'আচ্ছা মা, পাহাড় কখনও সমুদ্রে বিচরণ করতে পারে। তার কি হাত পা আছে, যে হেঁটে বেড়াবে, নয় সাঁতার কাটবে। পাহাড় কখনো সমুদ্রে হেঁটে যেতে পারে!'

মা চোখ কপালে তুলে বলেছিল, 'বলছিস কি! অমন কথা মুখে কখনো বলবি না। তিনি ঈশ্বরের পুত্র। তাঁর মহিমা অপার। তিনি বললে সব হয়। তিনি ইচ্ছা করলে সব পারেন। পাহাড় কেন, সব এক মুহূর্তে লন্ডভন্ড হয়ে যেতে পারে। পাহাড় গুঁড়িয়ে যেতে পারে। সমুদ্রের জল তিনি অঙ্গুলি হেলনে শুষে নিতে পারেন। কখনো আর এমন কথা বলবে না।' বলে মা হাঁটু গেড়ে বসেছিল—বিড়বিড় করে প্রার্থনা করেছিল—'মেয়েটা অবুঝ প্রভু। তার দোষ ধরো না।'

দূর থেকে দেখতে পাচ্ছে সেই প্রিয় এগমন্ট হিল। এই পাহাড়টার কোলেই তার প্রিয় শহর নিউ প্লাইমাউথ। সমুদ্রের ধারে পাহাড়ের কোলে শহরটা। ধাপে ধাপে উপরে উঠে। গেছে। বন্দর এলাকা পার হয়ে সি-ম্যান মিশান—ট্রাম গাড়ি এক বগির। গাড়িটা দুলকি চালে পাহাড়ের চড়াই-উৎরাই পার হয়ে যখন যায় তখন দূর থেকে মনে হয় খেলনার গাড়ি। তার কেবল ইচ্ছে হচ্ছে, কতক্ষণে সেই গাড়িটা তার দৃষ্টিগোচর হবে।

এ সব ভাবার সময়ই মনে হলো, বাবা ওয়াকার কথাই শেষ পর্যন্ত মেনে নিয়েছিলেন। হাইতিতি নামটা ভারি সুন্দর। জব্বর নাম ছিক করেছে ওয়াকা। তবু বাবার বোধহয় কোনো সংশয় ছিল নাম নিয়ে। তিনি ওয়াকাকে প্রশ্ন করেছিলেন, 'নামটি তোর সুন্দর। কিন্তু হাইতিতি বললে তো কিছু বোঝায় না। এই যেমন সব নামেরই একটা ব্যাখ্যা থাকে —তোর নাম ওয়াকা। মাউরি উপজাতিদের ভাষায় ওয়াকা মানে সুন্দর। হাইতিতির মানেটা কি বুঝতে পারছি না।'

৩

ওয়াকা সত্যি বিপদে পড়ে গেল। সে ভেবেও কিছু বলেনি—তবু কেন যে বাচ্চাটার নাম সে হাইতিতি রাখতে চাইছে। তারপরই এক গাল হেসে বলেছিল, 'আমরা ডাং খেলি না?'

'তা খেলিস। তোর তো কাজকাম না থাকলেই ডাং খেলার নেশা। তখন তোর পাত্তা পর্যন্ত পাওয়া যায় না। কোথায় যে লুকিয়ে পড়িস!'

বেচারা পড়ে গেল মহা ফাঁপরে। ঠিক নালিশ গেছে তার নামে। সে তবু কিঞ্চিৎ চুপচাপ থেকে কী ভাবল—তারপর বলল, 'ডাং ছুঁড়ে দেবার সময় আমরা চিৎকার করি—হাই।'

'হাই! সে আবার কী?'

'জিজ্ঞেস কর না ম্যান্ডেলাদিদিকে। কী তুমি চুপ করে আছ কেন? তুমি খেল না। আহা, কী ভালো মেয়ে সেজে বসে আছে!'

শহরটায় মাউরি উপজাতির লোকেদেরও বাড়িঘর আছে। তবে ম্যান্ডেলা বোঝে না, তারা কেন গরিব হয়। গরিব বলেই তো ওয়াকা সেই বাচ্চা বয়স থেকে তাদের বাড়িতে আছে। তার সঙ্গে বড়ো হচ্ছে। ওয়াকা ফাঁক পেলেই ডাং খেলতে চলে যায়। পাহাড়ের উপত্যকায় উঠে গেলে সে দেখতে পায় ওয়াকার বন্ধুরা তার অপেক্ষায় বসে আছে। এদের প্রায় সবার বাবা-মাই দিনের বেলা কাজে বের হয়ে যায়। কেউ রাস্তা পরিষ্কার করে। কেউ আঙুরের জমি চাষ করে মালিকের হয়ে। মেয়েরা দোকানে কাজ করে। বাজারে নানা কিসিমের মাছও বিক্রি করে। সমুদ্রে মাছ ধরার জন্যও দলে দলে তারা বের হয়ে যায়। তখন বাড়ির কাচ্চাবাচ্চারা স্বাধীন। যে যার মতো হুটোপুটি করে বেড়ায় অথবা সমুদ্রের

ধারে ঘোরে। কেউ গিয়ে জেটিতেও বসে থাকে। নাবিকদের পিকাকোরা পার্কে চিনিয়ে নিয়ে যায়।

ম্যান্ডেলা বলছিল, 'জানো বাবা, একটা ছোট্ট লাঠি, সাইপ্রাস গাছের ডাল কেটে তৈরি। জানো বাবা লাঠিটা না খুব ভারি। দল বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকে সবাই। এক লাইনে কেউ আগু-পিছু থাকতে পারবে না। তারপর না, দলের রাজা ঠিক হবে। তারপরে না, রাজা ডাং ছুঁড়ে দেবার সময় চিৎকার করে উঠবে—হাই। ব্যস, সঙ্গে সঙ্গে সবাই এক পায়ে লাফাতে থাকবে। তিতি তি—সবাই এক পায়ে লাফিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে আর মুখে তি তি বলছে। যে আগে যেতে পারবে, আগে কব্জা করতে পারবে ডাং সেই হবে ফের দলের রাজা।'

বাবা বলেছিল, 'বা, সুন্দর খেলা তো। তা এই হাইতিতি খেলার সঙ্গী হতে পারি না আমি?'

বাবা জাহাজ থেকে ফিরে এলে মাঝে মাঝে বড়ো ছেলেমানুষ হয়ে যেত। একবার তো সত্যি ওয়াকার সঙ্গে ডাং খেলতে চলে গেল।

মার এক কথা, 'তোর বাবা গেল কোথায়!' ম্যান্ডেলাও জানে না, গেল কোথায়। বাবা বাড়ি নেই, ওয়াকাও নেই, এমনকী হাইতিতি নেই—তা ওয়াকা বাচ্চা হাইতিতিকে নিয়ে মাঝে মাঝে শহরে ঘুরতে বের হয়। কখনো ম্যান্ডেলা সঙ্গে থাকে। শহরটা না চিনলে হবে কি করে! তারা হাইতিতিকে নিয়ে পিকাকোরা পার্কেও বেড়াতে গেছে। মুশকিল, হাইতিতিকে দেখলে সব বাচ্চাদের কেন যে ল্যাজ গজিয়ে যায়। ভিড়ে হাঁটা যায় না কখনো। আর নানা প্রকারের দুষ্টুমি—কেউ কান টেনে দেয়—লম্বা কান বলে টানতে খুবই সুবিধা। কেউ ল্যাজ টেনে দেয়। কেউ আবার চিমটি পর্যন্ত কাটে। তখনই রেগে যায় ওয়াকা।'—কি হচ্ছে, এটা কি বাঁদর,—এটা কি কুকুর! হ্যাঁ, তোরা বাচ্চাটার পেছনে লেগেছিস! জানিস ফু মন্তরে বাঘ বানিয়ে দিতে পারি—জানিস ইচ্ছে করলে হাতি হয়ে যেতে পারে। বাঁদরামি করছিস, জাদুকরের কথা মনে নেই—' আর তখনই সবাই খুব ভালো ছেলে। একেবারে ভাজা মাছটি উলটে খেতে জানে না। তারা তো দেখেছে জাদুকরের সঙ্গী ওয়াকাকে। ওয়াকা বললেই তো জাদুকর যে যা চাইত দিত। দুষ্টুমি করলে জাদুকরকে বলত, 'না, দেবে না। তোমার পেছনে লুকাই প্যাক দিচ্ছিল। তুমি টের পাওনি! ওকে পাতার বাঁশিও দেবে না।' জাদুকর পাইন পাতা দিয়ে সব সুন্দর সুন্দর বাঁশি বানিয়ে দিয়ে গেছে তাদের। এখনও তারা পাইন ফেস্টিভ্যালের দিন, পাতার বাঁশি বের করে সমস্বরে আশ্চর্য মিউজিক তৈরি করে। তখন শহরের লোকজন না বলে পারে না, ভাগ্যিস জাদুকর বসন্তনিবাস জাহাজে করে এসেছিল, পাতার বাঁশি বানিয়ে দিয়েছিল বাচ্চাদের, না দিলে এমন একটা সুন্দর বন্দর শহরে এই আশ্চর্য মিউজিকের খবরই কেউ পেত না। এখন তো নানা সাজপোশাকে পাইন পাতার পোশাক পরে সবাই যখন শহরের

বড় গির্জার দিকে হাঁটে তখন এই মিউজিক শোনার জন্য রাস্তার পাশে, ঘরের ছাদে, জানালায় মানুষের উপচে পড়া ভিড়। জাদুকর বলেই সম্ভব, যেন এই শহরে সবই ছিল—ছিল না কোনো অকল্পনীয় মিউজিক। যার স্রষ্টাও জাদুকর নিজে। সে সেবারে মিছিলটি নিজেই পরিচালনা করছিল। তার লম্বা আলখাল্লার উপর পাইন পাতার নানা বাহার। ওয়াকাই বুঝিয়েছিল, 'তুমি জান না বসন্তনিবাস, এটা আমাদের সবচেয়ে বড়ো উৎসব। সারাদিন সারারাত উৎসব চলবে। যে যার মতো বাহারি মিছিল বের করবে। আমরা বের করব বাঁশির মিছিল। সবার হাতে থাকবে পাইন পাতার বাঁশি, তুমি তো সুন্দর সুন্দর বাঁশি বানিয়ে দিয়েছ আমাদের। মন ভালো না থাকলে আমরা সমুদ্রের ধারে ধারে ঘুরি আর বাঁশি বাজাই। বাঁশির সুর কতদূর থেকে শোনা যায়! আর কি সুমিষ্ট। তখন মানুষের তো দুঃখকষ্টও থাকে না। তোমার হাতেও থাকবে লম্বা পাইন পাতার বাঁশি। ক্লারিওনেটের মতো লম্বা। তুমি যে সুর দেবে, সেই সুরে আমরা বাঁশি বাজাব। শহরের লোকজন বুঝতে পারবে, কত বড়ো ওস্তাদ লোক তুমি।'

সুতরাং ম্যান্ডেলার কেন যে মনে হয়েছিল, বাবা, ওয়াকা কোথাও কোনো নির্জনে বসে পাতার বাঁশিও বাজাতে পারে। কে জানে, বাবা হয়তো চুপি চুপি বলছে—'এই ওয়াকা, আমাকে দিবি একটা পাতার বাঁশি। আমি বড়ো হয়ে গেছি বলে কি বাঁশি বাজাতে পারি না। ছোটোরা যা পারে, বড়োরাও তাই পারে। ছোটোদের মতো বড়োদেরও ইচ্ছে হয় পাতার বাঁশি বাজিয়ে যদি দুঃখকষ্ট ভুলে থাকা যায়।' তা জাহাজে উঠলে তো ফেরার দিনক্ষণ ঠিক থাকে না। কবে জাহাজ ফিরবে কেউ জানেও না। পাঁচ-সাত মাস এমনকী কখনও বছর কাবার হয়ে যায়। তখন তো বাবার মন বাড়িঘরের জন্য খারাপ লাগতেই পারে। পাতার বাঁশি বাজাতে জানলে, মানুষের যে দুঃখকষ্ট অনেক লাঘব হয় বাবাও বোধ হয় টের পেয়েছিলেন।

বেশ বেলা হয়ে গেছিল বাবার ফিরতে।

মা কেবল ঘরবার করছিল।

'গেল কোথায়? দ্যাখ না ম্যান্ডেলা সে গেল কোথায়। আরে ওয়াকার না হয় কাণ্ডজ্ঞান থাকতে না পারে, তাই বলে সে না বলে কয়ে সকালে বের হয়ে গেল!'

ম্যান্ডেলার কি যে তখন রাগ হচ্ছিল! তাকে ফেলে চুপচাপ বাবা চলে গেল। একবার বলতেও পারল না, 'আমরা যাচ্ছি, তুই যাবি!' ওয়াকা বাবার এত প্রিয় হয়ে গেল! সে তার বাবার কেউ না!

ম্যান্ডেলার তখন এক জবাব, 'জানি না, কোথায় গেছে তারা। আমি জানব কী করে।' মাছ ধরতে গেলে ছিপ হুইল ঘরে পড়ে থাকত না। মাছের খবর ওয়াকা ভালো জানে।

সমুদ্রে সারডিনের ঝাঁক কখন উঠে আসে সেই ঠিক খবর দিতে পারে। মাছ ধরার নেশা ওয়াকারও কম নেই। তার দাদুর ছোট্ট সরু সাদা নৌকাটির সে মালিক। দাদু ছিলেন মাছ মারার ওস্তাদ লোক। মৃত্যুর আগে নৌকাটি নাকি ওয়াকাকে দান করে গেছেন। আর নৌকাটিরও আছে নানা বাহারি শখ। সে যেদিকে যেতে চায়, যেতে দিতে হয়। যেমন চিংড়িমাছ বড়ো বড়ো—প্রায় হাতখানেক এক একটা লম্বা—নৌকাটিই তার খবর জানে, কোথায় আছে কী মাছ!—সমুদ্রে কবে যে নৌকাটি ভাসানো হয়েছিল কেউ জানে না। সরু ছিপনৌকা। খুবই ছোটো। একজনের বেশি আরোহী উঠতে পারে না। আর এর আশ্চর্য ক্ষমতা বিশাল বিশাল ঢেউ অবলীলায় পার হয়ে যাওয়া। যতই ঝড় থাকুক সমুদ্রে, হাল ঠিক রাখতে পারলে সাধ্য কি ঢেউ নৌকাটিকে গ্রাস করতে পারে! চেষ্টারও ত্রুটি নেই। নৌকাটি ভাসলেই সমুদ্রের তর্জন গর্জন শুরু হয়। আবার তুমি! দেখাচ্ছি মজা। দু-হাত তুলে, হা রে রে করে ঢেউগুলি নৌকাটিকে তেড়ে আসে। ওয়াকা নিপুণভাবে সমুদ্রের ওপর তার নৌকা ভাসিয়ে দূরে দূরে চলে যায়। এটাও তার এক ভারি মজার খেলা। ফেরার সময় নৌকায় থাকে নানা রঙের ঝিনুক, শঙ্খ, চিংড়িমাছ বড়ো বড়ো। আর সারডিন মাছ। সে নৌকার খোল থেকে মাছগুলি যখন সমুদ্রের কিনারে নামিয়ে আনে, ম্যান্ডেলার কি আনন্দ। বেছে বেছে তাজা আর সুস্বাদু মাছগুলি ম্যান্ডেলা দিদির জন্য রেখে দেয়। বাকি সব দিয়ে দেয় তার জাতভাইদের। সে মাছ কখনো বিক্রি করে না।

ওয়াকা সমুদ্রে গেছে খবর পেলেই তার জ্ঞাতিভাইরা সব ছুটে আসবে বেলাভূমিতে। ওয়াকা যখন মাছ ধরতে গেছে, তখন সে খোল ভরতি করে মাছ শিকার করে ফিরবেই। সবাই ঝুড়ি নিয়ে বসে থাকে। ওয়াকা নৌকা টেনে বালিয়াড়িতে তুলে আনলে সবাই ঝাঁপিয়ে পড়ে। কিন্তু ওয়াকা তখন খুব গম্ভীর। সে বেশ বড়োদের মতো তখন কথা বলে।

'লাইন দিয়ে দাঁড়াও।'

সবাই লাইনে দাঁড়িয়ে যায়।

'এস এক এক করে।'

সবাই এক এক করে এলে ভালোমন্দ মিশিয়ে মাছ তুলে দেয়।

কাজেই বাবা ওয়াকার পাল্লায় পড়ে মাছ শিকারেও যেতে পারে। ওয়াকার তো মাথার ঠিক নেই—এক ভেবে বাবুর সঙ্গে বেড়াতে বের হয়েছে, আর এক ভেবে নৌকায় উঠে গেছে! বাবা যে তার কত ছেলেমানুষ তখনই টের পায় ম্যান্ডেলা। তা না হলে বাড়ির কাজের ছেলেটি কখনো মনিবের মতো কথা বলতে পারে—'চলুন কর্তা বাঁশি বাজাইগে। চলুন কর্তা ডাং খেলিগে। চলুন কর্তা মাছ শিকারে।' আরে কারও বাবা কি এমন হলে হয়!

নিজের মর্জির কথা বুঝতে হয় না। ওয়াকার মর্জিতে যেখানে সেখানে চলে যাওয়া কি ঠিক!

কাজেই ম্যান্ডেলার গোঁসা হবে না তো কার হবে! তার দায় পড়েছে, কোথায় গেল তারা রোদে বের হয়ে খুঁজতে হবে। ডাকাডাকি করতে হবে।

বাবা কেন যে জাহাজ থেকে ফিরলে এত ছেলেমানুষ হয়ে যেত সে বুঝত না। এটাই ছিল তার ক্ষোভের কারণ। যেন ওয়াকা বাড়ির কাজের ছেলে নয়, বাবার ঘনিষ্ঠ বন্ধু।

সেই বাবা আর ওয়াকা ফিরে এল। পাইনের জঙ্গল ভেঙে উপরে উঠে এল! হাইতিতিও ফিরছে। তিনজন একেবারে যেন বিশ্বজয় করে ফিরেছে। তিনজনের কাছেই পাইন পাতার বাঁশি। বাবারটা হাতে, ওয়াকারটা পকেটে গোঁজা আর হাইতিতির বাঁশিটা বগলে।

এখন কেন যে মনে হয়, জাদুকর শহরের শিশুদের খুশি করার জন্য, যে যা চেয়েছে দিয়ে গেছে। যেমন ওয়াকাকে দিয়ে গেছে পাতার বাঁশি। পাইন পাতা দিয়ে কি সুন্দর বাঁশি বানানো যায় সে-ই শুধু জানে। আর সবাই যে চেষ্টা না করেছে তা নয়, কিন্তু পাতা মুড়ে বাঁশি হয় তবে কোনো সুর থাকে না। ফুঁ দিলে সুমিষ্ট সুর ভেসে বেড়ায় না। ওয়াকাকে এই জাদুবিদ্যা দেওয়ায় সে কি খুশি! ওয়াকা তো জানে না, তাকেও দিয়ে গেছে পালকের টুপি, হাইতিতিকেও দিয়ে গেছে রুপোর ঘন্টা। ওয়াকা মনে করে জাদুকর কেবল তাকেই ভালোবাসত। ম্যান্ডেলাদিদিকে সেই তো জাদুকরের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল। সেই ম্যান্ডেলাদিদি যে আরও আশ্চর্য টুপির মালিক ওয়াকা জানেই না। ওয়াকার এত অনুগত ছিল বসন্তনিবাস যে সে ছাড়া কাউকে কোনো জাদুবিদ্যার অধিকারী করবে বিশ্বাস করতে পারত না। অন্তত যেদিন বসন্তনিবাস জাহাজে চলে গেল সেইদিন তো মনে হয়েছিল, ওয়াকাই জাদুকরের প্রিয়জন। সে শহরের সব শিশুদের এনে জড় করেছিল জাহাজঘাটায়। বড়ো বড়ো ক্রেনের নীচে দাঁড়িয়ে তারা সাদা রঙের পোশাকে বিদায় জানিয়েছিল জাদুকর বসন্তনিবাকে। তারা সবাই একটি আশ্চর্য মেলডি পাতার বাঁশিতে সৃষ্টি করেছিল। সেই সুরে কান্না পায়নি, এমন একটি শিশুও ছিল না জেটিতে। ম্যান্ডেলা আর ওয়াকা মাঝখানে। তাদের দুজনের মাঝখানে হাইতিতি। 'হাইতিতি পর্যন্ত অপলক দেখছিল, জাহাজে সেই ক্ষেপাটে নাবিক দাঁড়িয়ে আছে। অন্তত জাহাজের ছোটোবাবু ওয়াকাকে কানে কানে ফিসফিস করে বলেছিল, 'নজর রেখ। জাহাজ থেকে পালিয়ে কোথায় যে গিয়ে বসে থাকে —আমরা খুঁজতে বের হই। দেখছ তো কেমন কিম্ভুতকিমাকার পোশাক পরে জাহাজ থেকে নেমে আসে! লক্ষ্মী ছেলে, খবর দিতে পারলে জাহাজের কাপ্তান খুশি হবে।' ওয়াকা জাদুকরকে ক্ষেপাটে লোক বলায় খুবই ক্ষুব্ধ হত। তবে প্রকাশ করত না। সে বলত, 'ছোটোবাবু, জাদুকর কখনো ক্ষেপাটে হয়! আমরা যা চাই তিনি তাই দেন। চাইতে জানতে হয়।' তবে আপনি স্যার, যখন বলেছেন, জাহাজে পৌঁছে দিতে, যতই রাত হোক

বসন্তনিবাসকে আমরা জাহাজে ঠিক পৌঁছে দেব। যত রাতই হোক ওয়াকা বসন্তনিবাসকে জাহাজঘাটায় পৌঁছে দিত। জাহাজের ছোটোবাবু এবং আরও দু-চারজন নাবিক টর্চ হাতে সি-ম্যান মিশানের সামনে অপেক্ষা করত। ওয়াকা বসন্তনিবাসকে যত রাতই হোক জাহাজঘাটায় পৌঁছে দেবে এমন বিশ্বাস তাদের যথেষ্টই ছিল।

সেই ওয়াকা পাতার বাঁশি পেয়েই খুশি। জাদুকরের জন্য মন খারাপ হলে, সে চুপচাপ জাদুকরের মূর্তির পায়ের কাছে গিয়ে বসে থাকে। শহরের মানুষেরা অবাক হবে না! জাদুকর জাহাজে চলে গেল, ওয়াকা তার ব্যান্ড বাজিয়ে বিদায় জানাল—হাজার হাজার বেলুন উড়িয়ে দেওয়া হল বাতাসে—আর সাদা জাহাজ যত দূরে যায়, তারা দেখতে পায়, জাদুকর একইভাবে দাঁড়িয়ে আছে ডেকে। শিশুদের উদ্দেশে হাত তুলে দাঁড়িয়ে আছে—যেন বলতে চায় সব শিশুদের মনেই আছেন একজন জাদুকর—যে তাকে যে-ভাবে চিনতে পারে। সাদা জাহাজ নীল জলে ক্রমে অদৃশ্য হয়ে গেলে ওয়াকা ফিরে এসেছিল—আর কি কান্না! বোধহয় জাদুকর ওয়াকার কষ্ট টের পেয়েই মাস কাবার না হতেই বেলাভূমিতে এসে তিনি পড়ে থাকলেন। সেই এক পোশাক। একই রকমের নাগরাই জুতো, মাথায় ময়ূরের পালক—একেবারে রাজবেশ। জাদুকর ছিলেন রক্তমাংসের, হয়ে গেলেন শেষে সাদা পাথরের মূর্তি।

আর তাই না দেখে শহরবাসীদের চোখ কপালে উঠে গেল। একজন জাদুকর যদি পাথরের মূর্তি হয়ে শহরের শিশুদের কাছে ফের ফিরে আসেন, তবে তাঁকে অবহেলা করা যায় না। বাচ্চাদের শুভ-অশুভ বলে কথা। সব বাবা-মারাই তো চায় তাদের শিশুরা বড়ো হয়ে উঠুক—পৃথিবীর তাবৎ স্বপ্ন নিয়ে। নগরপাল সভা করলেন তখন, এই মূর্তি নিয়ে কি করা। শিশুরা দাবি করল, বেলাভূমিতেই মূর্তিটি বসিয়ে দেওয়া হোক। গড়ে তোলা হোক সুন্দর একটি বাগান। বাগানে নানা ফুলের গাছ লাগিয়ে দেওয়া হোক। আর যেসব পাখিরা ফুল ভালোবাসে মধু খেতে ভালোবাসে তাদের বলা হোক, এখানেই এসে তোমরা থাকবে। কেউ তোমাদের ক্ষতি করবে না।

৪

দূর থেকে যত শহরের কাছে উড়ে যাচ্ছে তত ম্যান্ডেলা উত্তেজিত হয়ে পড়ছে। প্রথমেই দেখতে পাবে সেই বিশাল পর্বতশ্রেণি। এগমণ্ড হিলের শৃঙ্গগুলি বরফে ঢেকে থাকে। রোদের বর্ণছটায় ঝিকমিক করে পাহাড় চূড়ো। কখনো মনে হয় সোনালি পাহাড়। কখনো রূপালি পাহাড়। তার সেই বর্ণছটায় রাতেও কেমন শহরটা বিভোর হয়ে থাকে। আকাশের দিকে তাকালে চোখে পড়বে অনন্ত হয়ে আছে সেই পাহাড়ের দেশটা। সে এত জায়গায় উড়ে গেছে নিজের এই পাহাড়টির ওপরে কখনও উড়ে যায়নি। দু-চোখ মেলে

তার প্রিয় এই পাহাড় দেখার ইচ্ছে কেন যে হয়নি বোঝে না। দূর থেকে পাহাড় যত রহস্যময় ঠেকে, কাছে গেলে তা হারিয়ে যেতে পারে। এই আতঙ্কেই হয়তো সে কখনো পাহাড়ের ওপর দিয়ে উড়ে যায়নি। যেন পাহাড়টা আছে থাক। সে তার রহস্য নিয়ে সারাজীবন ম্যান্ডেলার মনে বেঁচে থাক। উড়ে গেলেই দেখতে পাবে, সেই একই বনভূমি, নদীর খাদ কিংবা যেমন আর দশটা পাহাড় থেকে ঝরনা নেমে আসে তেমনি কোনো নিরাভরণ ঝরনা নিয়ে জেগে আছে পাহাড়টা। দিন রাত জল পড়ার ঝরোঝরো শব্দ যদি কখনো একঘেয়ে মনে হয়, তবে যেন পাহাড়ের মহিমা খাটো হয়ে যাবে।

তারপর আরও কাছে গেলে সে দেখতে পাবে পাহাড়ের কোলে সব আপেল কমলালেবুর বাগান, পাকা সড়ক—লাল-নীল কাঠের বাড়ি। গাছগুলিতে আপেল আর আপেল। গোলাপি কিংবা টকটকে সিঁদুরের রং আপেলের গায়। উপত্যকায় এই আপেলের বাগানগুলি কি যে টাটকা আর তাজা! মাঝে মাঝে এখানে সেখানে কৌরিপাইনের জঙ্গল, নীচে আবাদের ভূমি কিংবা মেষপালকরা অস্থায়ী কুটীর বানিয়ে চলে আসে এখানে। সারাদিন তারা ভেড়ার পাল নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। ঘাস খাওয়ায়। রাতে মাঠের মধ্যেই ঘুমিয়ে থাকে ভেড়ার পাল। গুঁতোগুঁতিও করে—তখন মেষপালকের কাজ ছুটে যাওয়া। ঝগড়া থামিয়ে দিতে না পারলে শিং-ফিং ভেঙে রক্তপাত। বড় বিশ্রী ব্যাপার। মেষপালক কুটীরে শুয়ে থাকে খড়ের বিছানায়। কখনো সে নির্জন প্রান্তরে সেই বাঁশি বাজায়। যা দিয়ে গেছে বসন্তনিবাস সবার হাতে হাতে।

নীচে সেই সমুদ্র কিংবা দ্বীপটিকে শুধু সে দেখতে পাচ্ছে। দুটো একটা জেলেডিঙিও দেখতে পেল। সকাল হচ্ছে। এবারে দূরে এক ঝলক আলোর মতো পাহাড়টা চোখে ভেসে উঠল। তার চোখ বাঁধিয়ে গেছে। তুষারশৃঙ্গে সূর্যোদয়ের সময় তাকালে যা হয়! সে কেমন মুহ্যমান হয়ে পড়ে। হাইতিতি উড়ে যাচ্ছে আরও বেগে। সে বোধহয় ভেবেছে ম্যান্ডেলার আগে পাইনের বনভূমিতে টুপ করে নেমে পড়বে। হাইতিতির এই এক দোষ। কিছু বুঝতে চায় না। মাঝে মাঝে গোয়ার্তুমিও করে ফেলে—সে যা বলে হাইতিতি তাতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হয় না। বোঝে না—সমুদ্রপাখিরা পথ ভুল করে অন্য কোথাও নিয়ে যেতে পারে। সমুদ্রের উপর উড়ে যাওয়া এমনিতেই কঠিন—কেবল ম্যান্ডেলা জানে, সে বাড়ি ফিরছে, বাড়ির জন্য তার মন খারাপ, মাকে দেখার জন্য সে উত্তেজিত হয়ে আছে—পালকের টুপি জানে, সে কি চায়। জানে বলেই সে বাড়ি ফিরে যেতে পারছে—

হাইতিতির তা না। হাইতিতির মা-বাবার কথাও বোধহয় মনে নেই। সমুদ্রে ঝাঁক ঝাঁক পাখি দেখলেই সে তাদের সঙ্গে খেলা করে বেড়ায়। উড়ে বেড়ায়, ওরা যদি কোনো দ্বীপের দিকে ধাওয়া করে, সেও পিছু নেয়। পিছু নিলে তাদের যে নিজের দেশে ফেরা হবে না হাইতিতি বোঝে না। এত বোকা। ডাকলেও শোনে না। তখন আর কি করা। অগত্যা ছুটে

যেতে হয়, ডাকতে হয়, হাইতিতি ভালো হচ্ছে না। পাখিদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করা ভালো। কিন্তু পাখিরা জলে ভেসে থাকতে পারে, ঘুমাতে পারে, তুমি পারবে ডালে বসে থাকতে, ঘুমাতে পারবে। খাবে কি! পাখিরা ছোঁ মেরে সমুদ্র থেকে মাছ তুলে নিতে পারে দরকারে! তুমি পারবে। তোমার কি আর কখনো কাণ্ডজ্ঞান হবে না!

কে শোনে কার কথা।

অগত্যা ছুটে গিয়ে কান টেনে ধরতে হয়—

বলতে হয়, 'ওদিকে নয়, এদিকে। ওদের সঙ্গে কোথায় রওনা হলে! ফিরছি বাড়ি, মন ভালো নেই, মা কত চিন্তা করছে— 'আর তুমি পাখিদের দেশে উড়ে যেতে চাও। সে না হয় যাওয়া যাবে। ওড়া তো তোমার ফুরিয়ে যায়নি। ম্যান্ডেলাদিদি তোমাকে একবার পাখিদের দেশও ঘুরিয়ে আনবে। এখন চল। লক্ষ্মী ভাইটি।'

হাইতিতি রেগে যায়।

'তুমি আমার কান ধরলে কেন?'

'একশোবার ধরব।'

'আমি যাব না।'

'হাইতিতি ভালো হচ্ছে না। নিজের ভালোমন্দ বুঝতে শেখ। আমি চিরদিন থাকছি না যে তোমাকে পাহারা দিয়ে বেড়াব।'

হাইতিতির রাগ জল। সত্যি তো ম্যান্ডেলাদিদি না থাকলে সে খুবই বিপদে পড়ে যাবে। সে একেবারে তখন খুবই অনুগত হয়ে যায়। 'আমি চিরদিন থাকছি না' ম্যান্ডেলাদিদি শুধু বলে না, বুচার মামাও বলে। লুসি মাসিও বলে। ম্যান্ডেলাদিদি উৎপাত শুরু করলেই লুসি মাসি বলবে, 'ম্যান্ডেলা নিজের ভালোমন্দ বুঝতে শেখ। আমি চিরদিন থাকছি না, যে তোমাকে পাহারা দিয়ে বেড়াব।'

ছোটোরা যে বড়োদের কথাই অনুকরণ করে—ম্যান্ডেলাদিদির শাসনে এটা সে ভালোই টের পায়। ছোটোরা বড়োদের কাছেই সব শেখে। বজ্জাতিও। তবে ম্যান্ডেলাদিদি খুবই সরল। আর মনটাও খুব ভালো। তার যে ভালো চায় হাইতিতি তাও বোঝে। সে আর পাখিদের ঝাঁকের পেছনে ধাওয়া করে না। কিংবা পাখিদের মতো ডিগবাজিও খায় না। সত্বর বাড়ি ফেরা দরকার। মা-র জন্য মন খারাপ—পাখিদের সঙ্গে ওড়াউড়ির খেলা পছন্দ নাই করতে পারে। সে দুষ্টুমি করলে রেগে তো যাবেই। পাখিরা কেন তার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারবে। আর পাখিরা তাকে দেখতে পায় কিনা তাও সে বোঝে না। তার গলায় ঘন্টা বাজলে শব্দ হয় ঢং ঢং। তাকে দেখতে না পাক ঘন্টার শব্দ ঠিকই টের পায়। তখন

পাখিদের মধ্যে কলরব পড়ে যায়। উড়তে উড়তে যদি পাখির ঠ্যাং ধরে ফেলে—তবে খুব জব্দ। কিন্তু ম্যান্ডেলাদিদি তেড়ে আসবে।

‘এই হাইতিতি, হচ্ছেটা কি! ছেড়ে দাও। কাউকে জব্দ করাও মোটা বুদ্ধির লক্ষণ। তোমার খেলা আর একজনের প্রাণসংশয়। ঠ্যাং ভেঙে গেলে, পাখা মচকালে, পাখিটা আর উড়তে পারে! দেব তোমার ঠ্যাং ভেঙে। বুঝবে মজা। কারও অনিষ্ট করলে তোমার অনিষ্ট হতে পারে বোঝো না। বয়স তো কম হল না—ধেড়ে বাঁদর কোথাকার।’

‘তুমি আমাকে বাঁদর বললে।’

‘বাঁদরামি করলে বাঁদর বলব না তো কি বলব।’

‘পাখিদের সঙ্গে তো খেলা করছিলাম। বাঁদর বললেই হল।’

‘এটা খেলা! খেলা বোঝ না। একজনের খেলা, আর একজনের প্রাণসংশয়—এটা তোমার কাছে খেলা হতে পারে—কিন্তু পাখির জীবনসংশয় বোঝো! তুমি তাকে আদর করতে চাইছ বুঝবে কী করে। সে তো ছটফট করবেই। এস।’

আবার হাওয়ায় ভেসে চলে তারা।

এগমন্ট হিল চোখের ওপর ক্রমশ বড়ো হচ্ছে। এবারে শতরঞ্জের মতো পাহাড়তলি ভেসে উঠেবে চোখে। একবারে দাবার ছকের মতো মনে হয়। গাছপালা স্পষ্ট নয়, ধীরে ধীরে সব এবারে স্পষ্ট হয়ে উঠবে। তার শরীর আর ততটা হালকা নেই যেন। গতি কমে আসছে।

আর তার যে কি হয়। দেশে ফেরার সময় মনে হয়, সে হয়তো বাড়িতে গিয়েই দেখবে, বাবা তার ফিরে এসেছেন। ম্যান্ডেলাকে বাড়িতে দেখতে না পেলে ছটফট করবেন সে জানে। বাবা যদি জানে, ম্যান্ডেলা তাকে খুঁজতে বের হয়েছে খুশিই হবে। তবে বাবা রাগও করতে পারে। বলতেই পারে, ‘তুমি একটা বাচ্চা মেয়ে ম্যান্ডেলা, তুমি আমাকে কোথায় খুঁজতে বের হয়েছিলে! তোমার এই দুর্জয় সাহস হল কী করে?’ তখন তো সে বলতে পারবে না, ‘জান বাবা জাদুকর না আমাকে একটা পালকের টুপি দিয়ে গেছে। হাইতিতিকে রুপোর ঘন্টা। আমার মুখ ব্যাজার দেখে জাদুকরের মনে দয়া হয়েছিল।’

এটাও ঠিক, বাবা ফিরে এলে সে আর ওড়াউড়ি করতে পারবে না। জাদুকর বলেই দিয়েছে, ‘টুপিটা পরলে তুমি যেখানে খুশি ইচ্ছে করলে উড়ে যেতে পারবে, বাবাকে খুঁজে বেড়াতে পারবে। বাবা তোমার ফিরে এলেই পালকের টুপি হারিয়ে ফেলবে। বাবা ফিরে না আসা তক তুমি ছোটো থাকবে। বয়স বাড়বে না। বড়ো হয়ে গেলে তুমিও একজন তখন অবিশ্বাসী হয়ে যাবে। অবিশ্বাসীদের জন্য কখনো কোনো পালকের টুপি থাকে না।’

জীবনে কিছু পেতে হলে, কিছু হারাতে হয়, এও জাদুকর তাকে বলে গেছেন। সে তার বাবাকে ফিরে পেলে, পালকের টুপি হারিয়ে ফেলবে।

ম্যান্ডেলা যদি গিয়ে দেখে বাবা সত্যি ফিরে এসেছেন—ইস—সে আর একদণ্ড স্থির থাকতে পারছে না! সে সব হারাতে রাজি, তার পালকের টুপিও—বাবা ফিরে এলে, তার আর কিছুর দরকার হবে না। যেন গিয়েই দেখতে পারে, দেয়ালের হুকে বাবার জাহাজি টুপি ঝুলে আছে। বাবা ফিরে এলে কত কিছু নিয়ে আসতে পারে। তাহিতি দ্বীপের রঙিন পাথর বাবা তাকে এনে দেবে বলেছেন। দামি পাথরের মালা পরে সে ঘুরে বেড়াতে পারবে। তার জন্য হনলুলু দ্বীপের টিয়া পাখির মুখোসও নিয়ে আসতে পারেন। মুখোস পরে সে, ওয়াকা আর হাইতিতি চলে যাবে জাদুকরের মূর্তিটির নীচে। তারপর তারা গান গাইবে। পাতার বাঁশি বাজাবে ঘুরে ঘুরে। জাদুকরের দয়াতেই বাবা যে একদিন ফিরে আসবেন, এই বিশ্বাস তার আছে। সে জানে না, জাদুকরের মনে কি আছে? তিনি যাদি চান, তার বাবা ফিরে আসুক, তবে যত সাত সমুদ্র তের নদীর পারেই বাবা তার থাকুক না, ঠিক ফিরে আসবে।

আর তখনই এটা কি দেখতে পাচ্ছে!

সমুদ্রের জল তোলপাড় করে বিশাল একটা হাঙর তেড়ে যাচ্ছে কাকে। আরে করছে কী, জল যেন পাহাড় কেটে দু-ভাগ হয়ে গেছে। সমুদ্রের জলে তাণ্ডব শুরু হয়ে গেছে—আরে মাছটা কি ক্ষেপে গেছে! ক্ষেপে যাবার কি কারণ। তার বাবার কথা মনে থাকল না, বাড়ির কথা মনে থাকল না—এমন একটা রাক্ষুসে দৈত্য তাদের সমুদ্রে এসে হাজির—আর হাঁ করে কাকে তাড়া করছে! তারপরই ম্যান্ডেলার চক্ষুস্থির। ওয়াকা আর তার ছিপ-নৌকাটি গভীর সমুদ্রে মোচার খোলের মতো নামছে উঠছে, কাত হচ্ছে। সে কি ধরে আছে ঠিকমতো? আর নীচে নামতেই টের পেল ওয়াকা তার ঠাকুরদার ছিপ নিয়ে গভীর সমুদ্রে চলে এসেছে। ছিপটার সুতো ছেড়ে দিয়েছে—এবং নীল হাঙরের গলায় আটকে গেছে বিশাল একটা বঁড়শি। মাছটা তো ক্ষেপে যাবেই। ছলচাতুরী করে মাছটাকে লোভে ফেলে দিয়ে ওয়াকা এতক্ষণ মজা দেখছিল বোধহয়। বঁড়শি গেঁথে গেলে মাছটা এত হিংস্র হয়ে উঠতে পারে সে হয়তো অনুমানই করতে পারেনি।

'বোঝো মাছ ধরার মজা!'

'বোঝো এবার কার পাল্লায় পড়ে গেছ!'

'দেখছ না, কী দ্রুত ছুটে আসছে। আরে ওয়াকা সুতো কেটে দাও। ছেড়ে দাও। তুমিও যাবে, মাছও যাবে।'

তারপরই মনে হল, সে কাকে বলছে! কে তার কথা শুনবে! তার কথা আকাশে ভেসে থাকলে কেউ শুনতে পায় না। তবে হাইতিতির ঘন্টার শব্দ শোনা যায়। বোধহয় ঘন্টার শব্দেই চকিতে একবার ওপরের দিকে তাকিয়েছিল, তার খেয়ালও নেই যেন দ্রুত ছুটে আসছে একটা অতিকায় হাঙর। থামের মতো কালো শিরদাঁড়া ভেসে আছে। লাফিয়ে ঢেউ-এর মাথাও উঠে গেল। সাদা পাথরের মতো পেটের মাংস থলথল করছে। ধারালো অজস্র দাঁতগুলি রৌদ্রকিরণে চকচক করছে—যেন খুঁজছে কোথায় আছে সেই আততায়ী এবং লাফিয়ে ঢেউ-এর মাথায় ভেসে উঠেই তলিয়ে যাচ্ছে। আবার ভেসে উঠছে।

'ওয়াকা মরবে।'

'মরণের ওষুধ কানে ঝুলিয়ে বেড়াচ্ছে।'

'কি সাহস!'

'বিন্দুমাত্র বিচলিত নয়।'

'ওয়াকা, ওয়াকা?'

সে শুনতে পাবে কেন, মাথার ওপর ম্যান্ডেলাদিদি উড়ে ওকে ডাকছে। সতর্ক করে দিচ্ছে।

ঘন্টার শব্দে কি তবে টের পেয়ে গেছে, যাক কাছে কোথাও ম্যান্ডেলাদিদি আর হাইতিতি আছে। তার আর ভয় নেই, সে বুঝছে না কেন, রাক্ষুসে মাছটা ল্যাজের এক ঝাপটায় তার নৌকা তলিয়ে দিতে পারে। নৌকা তো নয়, যেন একটা ডোঙা। বাবা যদি ফিরে আসেন, ওয়াকার এই দুর্জয় সাহসও তিনি পছন্দ করতে না পারেন। ধমক দিতে পারেন, 'প্রাণ হাতে করে মাছটার সঙ্গে লড়লে! তোমার এত সাহস, একা একা গভীর সমুদ্রে ঢুকে গেছো! মাছটা তোমার কোনো অনিষ্ট করেছে!'

অবশ্য পলকের ভাবনা, কিন্তু মাছটা যে ওয়াকার নৌকা দেখতে পাচ্ছে না বোঝাই গেল। কারণ একেবারে পাশ কাটিয়ে দূরে গিয়ে ভেসে উঠল।

জলের ঝাপটায় ওয়াকার জামা প্যান্ট ভিজে যাচ্ছে। ঢেউ এসে তাকে এবং নৌকাটাকে ডুবিয়ে দেবার চেষ্টা করছে। সে টাল খেয়ে একবার পড়েও গেল। আবার উঠে দাঁড়াল। হুইল থেকে সুতো ছেড়ে দিচ্ছে। আবার গুটিয়ে আনার চেষ্টা করছে। ওস্তাদ মাছ শিকারির মতো তার ভাবভঙ্গি ওয়াকা নুয়ে কী খুঁজল! আবার মাছটা ঢেউ-এর মাথায় লাফ দিয়ে উঠে গেল। কিনার দেখা যাচ্ছে না। শহরবাসীরা কেউ জানেই না, ওয়াকা আজ মরণ খেলায় মেতেছে—হয় মাছ শিকার করে বেলাভূমিতে ফিরবে নয় সে নিজেকে নিঃশেষ করে দেবে।

ম্যান্ডেলা ইচ্ছে করলে নৌকায় নেমে যেতে পারে। কিন্তু এত পলকা নৌকায় সে নামলে, তার ভরে যে নৌকাটা ডুবে যাবে না কে বলতে পারে। সে পাটাতনে নেমেও যেতে পারছে না। সে ভাবল, যদি মাছটাকে মুক্তি দেওয়া যায়। কি যে করে! এত শক্ত সুতো যে হাঙরের দুর্ধর্ষ ধারালো দাঁত পর্যন্ত অকেজো। অথবা মাছটার হৃৎপিণ্ডে যদি বঁড়শি গেঁথে যায় তবে মাছটা নিজের ছটফটানিতেই অস্থির হয়ে উঠেছে। দাঁতে বঁড়শি কেটে দেবার কথা বেমালুম ভুলে যেতে পারে—এই সব সাত-পাঁচ ভেবেই সে আলগাভাবে ওয়াকার মাছ কাটার ধারালো ছোট্ট ছুরিটা তুলে ঘ্যাঁচ করে সুতো কেটে দিল। মাছটা ফিরে যাক নিজের দেশে, যে যার মতো সুখে থাক ভেবেই কাজটা করেছে। এ ছাড়া যেন ওয়াকার প্রাণ রক্ষা করার উপায় তার জানা ছিল না।

কিন্তু মানুষ ভাবে এক, হয় আর এক। মাছটা ঠিকই ওয়াকাকে দেখেছে, তার নৌকাটাও। এতক্ষণ ওয়াকাই ছিল সবল প্রতিপক্ষ। সুতোয় টান দিলেই মাছের অন্তরাত্মা থরথর করে কাঁপে! সে অবশ হয়ে যায়। প্রতিপক্ষ সবল বুঝতে কষ্ট হয় না। এবার যেন মাছটা ছাড়া পেয়ে আরও হিংস্র হয়ে উঠল। ঢেউ-এর ওপর লাফিয়ে ডিগবাজি খেল দু-বার। জলে বিশাল ঘূর্ণি তুলে ভেসে বেড়াতে থাকল—ওয়াকা হতাশ। সে জানে তার বুঝি রক্ষা নেই—এতক্ষণ সে ছিল সবল প্রতিপক্ষ, এক মুহূর্তে সুতো ছিঁড়ে যাওয়ায় সে কত দুর্বল হয়ে গেছে, হতাশ মুখ দেখে টের পেল ম্যান্ডেলা।

সমুদ্রের নীল জলে মাছটা চক্কর দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সে এবার মরণ খেলায় বুঝি মাতবে। নৌকাটার চারপাশে বেশ দূরে সে মুখ তুলে বিশাল হাঁ করল—তারপর ডুব দিল। সমুদ্রের বিশাল ঢেউ ঝাপটা মারছে। ওয়াকা সত্বর তার সব গুটিয়ে নিয়ে ভেগে পড়ার তালে আছে। সে হয়তো জানে, অতিকায় মীনটি সমুদ্রের নীচে ঘুরে বেড়াচ্ছে তার খোঁজে। এবং নীল জলরাশি ভেদ করে যে কোনো মুহূর্তে তার নাকের ডগায় লাফিয়ে পড়তে পারে। তারপর ওয়াকাকে গিলে খেতে পারে।

ম্যান্ডেলা ভেবে পাচ্ছে না—কী করবে! সে কেমন অস্থির হয়ে পড়ছে। ওয়াকার কিছু হলে কি যে হবে! সে খুবই বিহ্বল হয়ে পড়েছিল। সে নৌকার ঠিক মাথার ওপরই ওড়াউড়ি করছে। হাইতিতি একবার নৌকায় নেমে যেতে চেয়েছিল, তার ল্যাজ ওয়াকার পিঠেও মাঝে মাঝে লেগে যাচ্ছে। পিঠে সুড়সুড়ি লাগছে—ওয়াকা জানে হাইতিতির ঘন্টা এভাবেই বাজে। রাতে অদৃশ্য হবার মুখে শহরবাসীদের মতো সেও শুনতে পায় আকাশে ঘন্টাধবনি করে কারা চলে যাচ্ছে। শহরবাসীদের তখন এক কথা, লুসির ভূতুড়ে মেয়েটার কাজ। শিশুরা বলবে, জাদুকরের কৃপায় এটা হয়। মানুষ ইচ্ছে করলে উড়তে পারে না, এমন অবিশ্বাসী তারা নয়। মানুষই সব পারে। জাদুকর ইচ্ছে করলেই পারে। লুসির ভূতুড়ে মেয়েটা বললে তারা ক্ষেপে যায়। ওয়াকাও ক্ষেপে যায়। সেই একই ঘন্টাধবনি

তার মাথার উপর অনবরত বাজতে থাকলে, সে চিৎকার করে উঠল— 'ম্যান্ডেলাদিদি, শিগগির খবর দাও, সমুদ্রের দৈত্যটা আমাকে ঘিরে ফেলেছে। ওই দেখ দূরে ভেসে উঠছে —ওই দ্যাখ দূরে পিঠের শিরদাঁড়া ভাসিয়ে চলে যাচ্ছে। ওই দ্যাখ আবার ফিরে আসছে।'

ম্যান্ডেলা এবার দেখল, সেই অতিকায় মীন ফের সমুদ্রের ঢেউ ঝাপটা মেরে সরিয়ে দিল—অনেকটা উপরে উঠে দেখার চেষ্টা করল কত দূরে তার সেই প্রবল প্রতিপক্ষ— তারপর ছুটে আসতে লাগল এবং ঝাঁপিয়ে পড়ল নৌকার ওপর। নৌকা উলটে গেল।

ওয়াকা লাফিয়ে পড়ল জলে—চিৎকার করে উঠল, 'ম্যান্ডেলাদিদি'। আর কোনো আওয়াজ উঠল না। ঢেউ-এর ঝাপটায় সে অনেক দূরে সরে গেছে। ওয়াকা সাঁতারে পটু— সে ঢেউ-এর ওপর একবার হাত তুলে দিল, তারপর ঢেউএর ভিতর ডুব দিয়ে সে আরও কিছুটা দূরে সরে গেল—অতিকায় মীনের আর পাত্তা নেই। ম্যান্ডেলার বুকে ত্রাস—সে উড়তে থাকল—এবং যেখানে সেই মীন ফের ভেসে উঠল তার নাকে ল্যাজ দিয়ে হাইতিতি সুড়সুড়ি দিল। মাছটা মুখ ঝামটাল। হাঁ করা মুখ বন্ধ। মীন ভেসে উঠলেই হাইতিতি ছুটে যাচ্ছে, আর ল্যাজের ডগা দিয়ে নাকে মুখে সুড়সুড়ি দিচ্ছে। যেন কোনো রকমে আটকে রাখা—এবং সেই ফাঁকে যদি ওয়াকা তার নৌকা ভাসিয়ে পালাতে পারে। কিন্তু নৌকাটা যে উলটে আছে। তার পাটাতনের কাঠ ছড়িয়ে পড়ছে সমুদ্রে। ওটাকে টেনে নেওয়া সহজ কাজ নয়। নৌকা ভেসে থাকলে, ম্যান্ডেলাই দড়ি ধরে টেনে নিয়ে যেতে পারত। সে জলেও নামতে পারছে না। যদি পালকের টুপি সমুদ্রে ভেসে যায়। যেতেই পারে। আসলে ম্যান্ডেলা ভুলেই গেছে তার পালকের টুপি ঝড় কিংবা ঢেউ কেউই উড়িয়ে নিতে পারে না। তার কেবল এখন লক্ষ্য কোনদিকে অতিকায় মীন ছুটে যাচ্ছে। অনেক দূরে অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে ওয়াকাকে। ঢেউ-এর প্রবল ঝাপটায় সে একান্ত স্থির থাকতে পারছে না। আর তখনই দেখল, আবার সেই অতিকায় মীন জলে ঘূর্ণি তুলে তালগাছের মতো সমুদ্রের পিঠে ভেসে উঠেছে। এবং তীরের ফলার মতো ছুটে যাচ্ছে ওয়াকার দিকে।

এ সময় হা-হুতাশ করে লাভ নেই ম্যান্ডেলা জানে—সে কিছুটা ধাতস্থ হয়ে উঠেছে। সে দেখতে পাচ্ছে পাটাতনের একটা লম্বা কাঠ ঢেউ-এর মাথায়। দ্রুত উড়ে গিয়ে সে কাঠটা তুলে নিল। প্রথমে ভেবেছিল, ভাসলেই কাঠটা দিয়ে মারবে মাথায়। সে মারলও। আশ্চর্য মাছটার যেন তাতে কিছুই আসে যায় না। পাথরের মতো শক্ত মাথা। অতিকায় মীন তার লক্ষ্যে স্থির। সে ওয়াকাকে গিলে খাবেই। ওয়াকাও দুর্বল হয়ে পড়ছে। ডুবে যাচ্ছে, ভেসে উঠছে। সে খুঁজছে তার নৌকাটাকে। কিন্তু কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। চারপাশে ক্ষেপা সমুদ্র তাকে ঘিরে ধরেছে। ঘন্টাধবনি দূরে শুনতে পাচ্ছে। কিন্তু কেউ তাকে উদ্ধার করতে আসছে না। প্রাণপণে সে ঢেউ কাটিয়ে ভেসে থাকার চেষ্টা করছে। এই গভীর সমুদ্রে ঢুকে গিয়ে সে বুঝতেও পারছে না, কোথায় তার প্রিয় বেলাভূমি, পাইনের বন, আর টিলার

ওবপর মিকি মাউসের মতো লাল-নীল রঙের কাঠের বাড়ি। কোনদিকে সাঁতার কাটলে, সে সেখানে পৌঁছাতে পারবে তাও জানে না। কেবল মাঝে মাঝে হাঁকছে, 'ম্যান্ডেলাদিদি তুমি সব পার। আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাও। হাইতিতিকে বল, ঘন্টাধবনি করুক, তা অনুসরণ করি।'

কিন্তু প্রবল ঢেউ-এর গর্জনে ম্যান্ডেলা ওয়াকার কোনো কথাই শুনতে পাচ্ছে না। সে এখন পাহাড়ের মতো বিচরণ করে বেড়াচ্ছে সমুদ্রে—অতিকায় মীনের খোঁজে। কোথায় গেল। যেন প্রকৃতির রুদ্ররোষে তারা পড়ে গেছে। ঝড় উঠলে বড়োরকমের সর্বনাশ। সমুদ্রের জলকণা বাতাসে ভেসে বেড়ালে সে কিছুই চোখে দেখতে পাবে না। না ওয়াকাকে, না সেই অতিকায় মীনকে।

আবার দেখল, দিগন্ত থেকে মাছটা ভেসে আসছে। সমুদ্রের জল উথাল-পাতাল করে ভেসে আসছে। সে খুঁজছে ওয়াকাকে। মাছের ঘ্রাণশক্তি প্রবল। সে ঠিক ওয়াকাকে খুঁজে পাবেই—যত দূরেই থাক ওয়াকা, ঘ্রাণশক্তি প্রবল বলে ঘোরাফেরা করতে করতে অতিকায় মীন ঠিক পেয়ে যাবে ওয়াকাকে।

ম্যান্ডেলা উড়ছে।

হাইতিতি উড়ছে।

হাইতিতি হাঁ করা মুখের কাছে ল্যাজ বাড়িয়ে দিচ্ছে। কিন্তু মাছটা কিছুই দেখতে পাচ্ছে না—অথচ কিছু যেন নাকের ডগায় স্পর্শ করছে। সেটা কি মাছটা বুঝতে পারছে না। হ্যাঁচ্চো দিচ্ছে কিনা তাও ম্যান্ডেলা জানে না। কারণ মাছের হাঁচি কাশি থাকে কিনা সে জানে না।

ম্যান্ডেলা যে উড়ে গিয়ে বুচারমামার বন্দুকটা নিয়ে আসবে তার উপায় নেই।

সদা ব্যস্ত রাখতে হচ্ছে মাছটাকে।

ভেসে উঠলেই সে পাটাতনের লম্বা কাঠটা দিয়ে পিঠে মাথায় যেখানে সুযোগ পাচ্ছে, মারছে।

মাছটা তখন জলের নীচে লুকিয়ে পড়ছে। কিন্তু অতিকায় মীন, ভবি ভুলবার নয়।

আবার হাঁ করে সমুদ্রের তলায় ঘূর্ণি তুলছে—বেঁকে যাচ্ছে, চিৎ হয়ে খেলা করছে। যেন যে আছে সমুদ্রে, সে তার কব্জার মধ্যে। খুশিমতো গিলে ফেলা শুধু কাজ। ভেসে উঠে ডুবে গিয়ে সে যে মজা করছে না অদৃশ্য কোনো অশুভ আত্মার সঙ্গে কে বলবে! যেন বলছে, 'দেখ আমরা জলের জীব। তাবৎ শক্তি আমাদের জলে। অন্তরীক্ষে তুমি আর যাই কর, জলের নীচের সাম্রাজ্যে তোমার হাতিয়ার ভোঁতা।'

ম্যান্ডেলা এটা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে। আর দেখছে, ওই তো ওয়াকা, ভাসছে—জলে ডুবছে। আর দূরে নৌকা উলটে গিয়ে যেমন লম্বা একটা কুমিরের মতো রোদ পোহাচ্ছে।

আর তখনই ম্যান্ডেলা দেখল, আবার সেই মীন ভেসে উঠেছে। চোখ হিংস্র। দাঁতালো মাছটা ওয়াকাকে মুখ হ্যাঁ করে গিলতে যাচ্ছে। ম্যান্ডেলা উপায়ান্তর না দেখে হ্যাঁ করা মুখে পাটাতনের লম্বা কাঠটা ঢুকিয়ে দিল। ক্রিকেট মাঠে স্টাম্প পুঁতে দেবার মতো হাঁ করা মুখে ঢুকিয়ে দিল। খাপে খাপে বসে গেল কাঠটা। নাও বোঝ মজা!

এতে এখন জব্দ হবে মাছটা ম্যান্ডেলা অনুমানই করতে পারেনি। মাছটা আর তার চোয়াল বন্ধ করতে পারছে না। ছুটছে, ল্যাজ তুলে ছুটে বেড়াচ্ছে, ডুবে যাচ্ছে, জলে অজস্র বুদবুদ উঠছে। আবার ভেসে উঠছে। চোয়াল বন্ধ করতে পারছে না। কাঠটা দু-চোয়ালে ঠেকার কাজ করছে। কাঠটা দু-চোয়ালে বসে গেছে। ভাসলেও মুখ হাঁ করা, ডুবলেও মুখ হাঁ করা।

ম্যান্ডেলা যত দেখে তত হাততালি দেয়। একটা অতিকায় মীনকে এভাবে সে জব্দ করতে পারবে আশাই করতে পারেনি।

সে এবার হাত ঝেড়ে নৌকাটার কাছে গেল। ওয়াকা সাঁতার কাটছে।

নৌকাটা ম্যান্ডেলা আর হাইতিতি টেনে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছে। আর মাছটা করুণ চোখে সমুদ্রে ভেসে থেকে অন্তরীক্ষের কাণ্ডকারখানা দেখছে। যেন বলছে, 'আমার দু-চোয়ালে কেন কাঠ আটকে দিলে। না পারছি ওগলাতে, না পারছি গিলতে।

ম্যান্ডেলা বলল, 'মজা বোঝ। ওয়াকাকে তুমি চেন না। সুতো কেটে দিলাম, তাই রক্ষে। পারতে সুতো ছিঁড়ে পালাতে। যতদিন তুমি জব্দ না হতে ওয়াকা নৌকায় ভেসে বেড়াত! ওয়াকাকে তুমি চেন না। বেইমানি আর কাকে বলে! প্রতিশোধ নেবে! আরে মানুষই তো ভুল করে। তাই বলে তাকে শোধরাবার সুযোগ দিতে হবে না। সে না হয় বঁড়শিতে আটকে ফেলেছিল, তোমার কি বুদ্ধি বুঝি না বাপু, দাঁত এত তোমার ধারালো—সুতো কেটে দিতে পারলে না। এথচ বড়াই ষোলো আনা!'

নৌকাটা হাতের নাগালে পেয়ে ওয়াকা অদ্ভুত কৌশলে উলটে দিল, জল সেচে ফেলে দিল—আর দেখল, সেই অতিকায় মীন তার নৌকার পাশে ঘোরাফেরা করছে। আর হাই তোলার মতো মুখ ভাসিয়ে দেখাচ্ছে, কে যে তাকে এভাবে জব্দ করে গেল!

ওয়াকাও অবাক। সত্যি তো মাছটার চোয়ালে একটা পাটাতনের কাঠ আটকে রয়েছে। না পারছে ওগলাতে, না পারছে গিলতে। কে যে কাজটা করল! তবে সে ঘন্টাধবনি শুনতে পেয়েছে। ম্যান্ডেলাদিদিরই কাজ। সে অবাক হয়ে শুনল, মাথার ওপর তখনও ঘন্টা বেজে চলেছে।

ওয়াকা ঘন্টাধবনি অনুসরণ করল। তীরের কাছাকাছি এসে দেখল মাছটা তার দিকে তখনও করুণ চোখে তাকিয়ে আছে।

সে মাছটার কাছে গেল। হাঁ করা মুখের কাঠটা সে বৈঠায় চাড়ি মেরে ভেঙে দিল। আর তখন মাছটা ছুটল—যেন উড়ে যাচ্ছে—ছোট্ট একটা বিমানের মতো। সমুদ্রের ধারে যারা ওয়াকার অপেক্ষায় ছিল তারা তো দৃশ্যটা দেখে অবাক। তারা এসেছিল মাছ নিতে, কিন্তু দেখল, নৌকার খোলে একটাও মাছ নেই। পাটাতন সাফ। সে টলতে টলতে পাইন বনের ভিতর ঢুকে যাচ্ছে। সারা গায়ে তার অজস্র ক্ষত।

ফুল ফলের জন্য

জানালা খুলতেই রোদ এসে পড়ল ঘরে। শীতে সারারাত কষ্ট পেয়েছে সনাতন। ঠান্ডা, হিম ঠান্ডায় ওর হাত পা ক্রমে যেন স্থবির হয়ে আসছিল। কুকুরছানা বুকে নিয়ে শুয়েছে। এত ঠান্ডা যে, কুকুরটা পর্যন্ত বুকের কাছে কুঁই কুঁই করেছে সারারাত। এই রোদ ওকে সামান্য উত্তাপ দিল শরীরে।

মা রাতে আজ ফেরেনি। ফিরলে কুকুরটাকে বুকে নিয়ে শুতে পারত না। জানালাতে এখন শীতের সূর্য উঁকি মারছে। কিছু পাখি উড়ছিল আকাশে। ঘর থেকে তাড়াতাড়ি বের হবার জন্য জানালায় শীতের সূর্য দেখল, আকাশে কিছু পাখি উড়তে দেখল। এই সব দেখলেই ওর সেই মানুষটার কথা মনে হয়। সামনে একটা ঘোড়ার মুখ, পেছনে লেজ, মাঝখানে মানুষটা বহুরূপী সেজে আছে। তখন ঢোল বাজে। নটবর ঢোল বাজায়। দুপাশের দরজা জানালা খুলতে থাকে। মা শুধু জানালাটা বন্ধ করে রাখবে। সনাতনকে বের হতে দেবে না। বের হলেই তিরস্কার করবে—কোথাকার কোন এক মানুষ, তুমি সেখানে যাবে না সনাতন। ওরা ভালো লোক নয়। ওরা তোমাকে নিয়ে দেখবে কোথাও একদিন চলে যাবে।

কুকুরটাকে সে পথ থেকে কুড়িয়ে এনেছে। শীতের ঠান্ডায় কুকুরটা মরে যাচ্ছিল। সে ওকে সামান্য উত্তাপ দিয়ে বাঁচিয়ে তুলেছে। মা বাড়ি না থাকলে শীতের রোদে সে কুকুর নিয়ে বসে থাকে। বুড়ি দিদিমা সনাতনকে শুকনো রুটি করে দেয়। রোদে বসে সনাতন কুকুরের সঙ্গে রুটি ভাগ করে খায়। মা আজ রাতে ফেরেনি। কোনো কোনোদিন মার এমন হয়। সেই যে শীতের মানুষটা খেলা দেখিয়ে চলে গেল আর আসেনি। আগে মানুষটা প্রায়ই আসত খেলা দেখাত। মানুষটা যেন এক হ্যামেলিনের বাঁশিয়ালা—যায় যায় নদীতে নেমে যায়। কোথায় যেন কোন গল্পে সনাতন মার কাছে শুনেছে কত হাজার লক্ষ ইঁদুর নিয়ে মানুষটা চলে গেল। তারপর কি এক কারণে হাজার লক্ষ সহরের ছেলেমেয়ে নিয়ে পাহাড় ফাঁক করে ভিতরে ঢুকে গেল। মানুষটাকে দেখলেই মার বুঝি এমন কিছু মনে হয়। তখন মা সাজতে গুজতে বসে যায়। উঁচু করে খোঁপা বাঁধে। বড়ো করে কপালে টিপ দেয়। কপালে টিপ পরলেই মাকে খুব ভালো লাগে, তখন সে মাকে ছুঁতে পারে। মার সঙ্গে কথা বলতে পারে। কিন্তু আতর মাখা শাড়ি পরলেই মাকে যেন আর চেনা যায় না।

বড়ো দূরের মনে হয়। মা তখন বোকা সনাতনকে কাছে ঘেসতে দেয় না। যেন মার সারা শাড়ি ব্লাউজে ছুঁয়ে দিলে দাগ লেগে যাবে। সে মাকে কিছুতেই আর ছুঁতে সাহস পায় না। কেবল মনে হয় এ শীতে ঠিক মানুষটা জাদুর ঘোড়া নিয়ে চলে আসবে। ঘোড়ার খেলা দেখাবে। সে ঘোড়ায় চড়ে নিরুদ্দেশে চলে যাবে।

সনাতন তার কুকুরটার জন্য বাবুদের বাড়ি থেকে একটা শেকল চুরি করে এনেছে। সে আর ভয়ে ওমুখো হচ্ছে না। গেলেই বাবুদের বড়ো ছেলে ওর হাত-পা বেঁধে মারবে। সে শেকলটাকে কুকুরের গলায় পরিয়ে চুপি চুপি বের হয়ে গেল। বস্তির পথ সদরে গিয়ে পড়েছে। সে সদর রাস্তায় পড়ে ট্রাম বাস দেখতে পেল। এই বড়ো রাস্তায় এসে পড়লেই সনাতনের মন প্রসন্ন হয়ে ওঠে। বড়ো রাস্তায় দাঁড়ালে সে মন্দিরের চূড়া দেখতে পায়। মন্দিরের চূড়ায় রোদ নামলে সব কিছুই নির্মল মনে হয়। ওর তখন ভিতরে ভিতরে একটা পবিত্র ভাব জাগে। বাবুদের শেকলটা সে ফিরিয়ে দিয়ে আসবে—এমন ভাবে।

সে রাস্তা ধরে কুকুরটাকে নিয়ে ছুটবে ভাবল। ছুটলে শীত কমে যায়। রাস্তা পার হলে মন্দির, খোলা মাঠ, মাঠ কত বড়ো, কতদূরে চলে গেছে, সে মন্দিরের চাতালে চুপচাপ বসে থাকতে ভালোবাসে। সে ভাবল আজ আর মন্দিরে গিয়ে হাত পাতবে না। কুকুরটাকে নিয়ে চাতালের একপাশে বসে খোলা আকাশ দেখবে। বস্তির ঘরে থেকে সে বড়ো আকাশ দেখতে ভুলে গেছে। যখন ওর কিছুই ভালো লাগে না, যখন মা বাড়ি ছেড়ে নিরুদ্দেশে যায়, বুড়ি দিদিমা কেবল, সনাতন মন্দিরে যা, মন্দিরে যা করে তখন ওর সেই মানুষটার মতো কোথাও চলে যেতে ইচ্ছা করে। ফুল ফল পাখি দেখার ইচ্ছা হয়। অথবা মন্দিরের ও-পাশে যে বড়ো মাঠ আছে সেখানে চুপচাপ বসে আকাশে পাখি ওড়াতে ইচ্ছা যায়। কবে যে সেই মানুষ আসবে, নটবর ঢোল বাজাবে—ঢোল বাজালে সে পাছায় হাত রেখে মার জানালার সামনে ঘুরে ঘুরে নাচতে পারবে।

বের হবার মুখে সে দেখে এসেছে, বুড়ি দিদিমা বারান্দায় একপাশে ছেঁড়া কাঁথার ভিতর কেমন গুটিশুটি দলা পাকিয়ে আছে। অন্যদিন বুড়ি সকাল সকাল উঠে সনাতনকে ডেকে দেয়। মন্দিরের পথে পুণ্যার্থীরা যায়। সনাতন তাদের কাছ থেকে দু-পয়সা এক পয়সা মেগে আনে। মেগে আনলে ওরা দুজনে মাকে লুকিয়ে চানা ভাজা অথবা বাদাম ভাজা এবং সুদিনের সময় ফুচকা খেতে খেতে বুড়ি বসে বসে টবকা টবকা কথা কয়। বুড়ি যেন আরে-ঠারে মার সম্পর্কে কী বলতে চায়। সনাতন বড়ো হয়ে যাচ্ছে, বুড়ি বুঝি বুঝতে পারছে। ওর বাবার কথা বুড়ি কিছুতে বলে না। বাবাকে সে কোনোদিন দেখেনি। পৃথিবীতে মার একমাত্র রাগ সেই মানুষটার ওপর। শীতের দেশ থেকে যেন মানুষটা মা-র জানালার কাছে এসে দাঁড়িয়ে থাকে। বাবার কথা বুড়িকে শুধালে তবর তবর করে বুড়ি অন্য কথা টেনে আনে। তখন মনে হয় বুড়ি বড়ো সেয়ানা। মা বাড়ি থাকলে, কোনোদিন

সাহস পায় না বলতে, যা একবার মন্দিরে যা, মা লক্ষ্মীরা যাচ্ছে। গিয়ে হাত পেতে দাঁড়িয়ে থাক।

মার কেন জানি ইচ্ছা সনাতন ছোটোলোকের মতো হাত পেতে ভিক্ষা করবে না। সনাতন মানুষ হবে। সনাতনকে বিদ্যাশিক্ষার জন্য মা দোয়াত কলম কিনে দিয়েছে।

রোদের ভিতর ওর হাঁটতে ভালো লাগছিল। কুকুরটা আগে আগে যাচ্ছিল। বড়ো মাঠ, খোলা আকাশ, দেখতে পেলেই ওর মনে নানা রঙের ফুলঝুরি ফুটতে থাকে। হাতে তার শেকল, সামনে তার পোষা কুকুর। মা, আজ রাতে ফিরে আসেনি। রাতে মা না ফিরলে সে জানে তার প্রাপ্য মায়ের কাছে সেদিন বেশি। মা পাউরুটি কিনে আনে, কলা কিনে আনে। মাকে বড়ো ক্লান্ত দেখায়। চোখ মুখ বিষণ্ণ। যেন মা সারারাত পথ হেঁটেছে। সারারাত মার চোখে ঘুম ছিল না। মা তখন কত ভালো কত সুন্দর। বুড়ি দরজার ও-পিঠে বসে থাকে। আর চুপি দিয়ে দ্যাখে, মা তাকে কী খাওয়াচ্ছে। এই ভালো খাওয়াটুকু দেখলে বুড়ির জিভে জল আসে। বুড়ির চোখ বড়ো বড়ো হয়ে যায়। সনাতন রে, সনাতন —তোর মা তোকে কত ভালো খেতে দেয়। তোর মা চলে গেলে মন্দিরে যা সনাতন, আমার জন্য কিছু চেয়ে নিয়ে আয়?

বুড়ির কথা মনে হলেই শীতের কথা মনে আসে। এখন এই শীতে গাছে গাছে পাতা ঝরার সময়। পাতা ঝরার সময় হলেই মানুষটা তার সাদা ঘোড়া নিয়ে চলে আসবে। সহসা ঢোল বাজলে মনে হবে ঘোড়াটা পথের ওপর নাচছে। বাঁশের কঞ্চিতে কাপড় দিয়ে তৈরি ঘোড়া, সাদা ঘোড়া—ঘোড়ার মুখে রংবেরঙের লাল নীল হলুদ রঙের রাঙতা, মাঝখানে তার জাদুকর, যেন ঘোড়া তাকায় না কেবল ঘুমায়, ঘোড়ার পিঠে জাদুকর, মাথায় রাঙতার টুপি, ছুটছে তো ছুটছেই। মানুষটা ঘোড়া নিয়ে খেলা দেখায়, জাদুর খেলা। চিঁহি চিঁহি করে ডাকে, আর দু-পয়সা এক-পয়সা যার যা সাধ্য দিয়ে দ্যাও চোখে মুখে এমন একটা হাসি লেগে থাকে।

ঘোড়ার খেলা আরম্ভ হলেই দরজা জানালা সব খুলে যাবে। ছেলে-ছোকরারা চারপাশে ভিড় করবে। ঘোড়াটার চারপাশে, যেন এই ঘোড়ার দিগন্ত জোড়া খ্যাতি—ঘোড়া এই সব দুঃখী মানুষদের জন্য কত কিছু নিয়ে এসেছে—খেলনা, ফুল পাতা পাখি, যা কিছু তোমার ইচ্ছা। তুমি ফুল হতে চাও, পাখি হতে চাও? তোমাকে সে সব দিয়ে থুয়ে চলে যাবে। সেই মানুষটা এলেই সে এবার বলবে, তুমি আমাকে সেই বড়ো মাঠে নিয়ে যাবে? মাঠের পাশে নদী থাকবে, কাশফুলের বন থাকবে আর নীল আকাশ থাকবে। একবার মার সঙ্গে ট্রেনে তেমন একটা দেশে আমরা চলে গিয়েছিলাম। বড়ো রাস্তা ধরে হাঁটলেই ওর কেবল সেই দেশটার কথা মনে হয়।

মা যখন বাড়ি থাকে না, দিদিমাই তার সব। সনাতনের তখন মনে হয় সংসারে তারা তিনটি মাত্র জীব। সে, দিদিমা এবং বুলি। মা তখন দূরের মানুষের মতো। তখন মনে হয় মা কেবল সাজতে গুঁজতে ভালোবাসে। আকাশে পাখি হয়ে উড়তে ভালোবাসে। সনাতন যেন সেই বিদেশি মানুষটার মতো অপরিচিত। দেখলেই রাগ হয়, মুখের ওপর জানালা বন্ধ করে দেবার মতো চোখে মা তাকিয়ে থাকে শুধু। সাজগোজের সময় সে কাছে থাকলে মা রাগ করে। বরং তার বুড়ি দিদিমাই তার তখন আপনার জন। মা সেজে গুজে বের হলে কে বলবে, এই হচ্ছে সনাতনের মা। সনাতন, দুই বাই একের এ নবীনচন্দ্র লেনের সনাতন—পরনের ইঁজের ছেঁড়া, পা ফাটা, চোখে পিচুটি এবং মুখের দুকষে ঘা। আগে আগে রাতে মা না ফিরলে সে বিছানায় বসে কাঁদত, বুড়ি তাড়াতাড়ি লম্ফ জ্বেলে সনাতনের মুখ দেখতে দেখতে ছড়া কাটত—মা গেছে বনবাদাড়ে,—বাপ গেছে জাদুর দেশে, লক্ষ্মী ছেলে আমার রাজপুত্র, ঘোড়ায় চড়ে যা উড়ে যা। আরও কী সব সুর ধরে বলত। ছড়া কেটে অন্ধকারে বুড়ি দিদিমা ঘুম পাড়াত। ইদানীং কি হয়েছে, শীতের জন্য হতে পারে—কিংবা দুরারোগ্য ব্যাধি এই বুড়ির শরীরে, যার জন্য সনাতনকে মা বুড়ির সঙ্গে শুতে দেয় না। কাঁথা বালিশের ভিতর সারারাত বারান্দার খোলা ঠান্ডায় কেবল গোঙায়। শীতে কষ্ট পায়। মা বুঝি ইচ্ছে করেই এবার শীতে, বুড়িটাকে মেরে ফেলবে।

রোদ খেয়ে কুকুরটার এখন তাজা প্রাণ। সনাতনের তাজা প্রাণ। কী সুন্দর রোদ। কী উত্তাপ। শরীরের সব ঠান্ডা মরে গেল। কেবল এখন দিদিমার ছড়া মনে আসছে। নিজেকে সুখী রাজপুত্র ভাবতে ভালো লাগে। তার জন্য ছোট্ট একটা আকাশ থাকবে, নদী থাকবে, ফুল ফল থাকবে, সেই মানুষটা এলেই সে সেইসব ফুল ফল পাখির জন্যে নিরুদ্দেশে চলে যাবে।

সে রোদের ভিতর কিছুক্ষণ বসে থাকল। খুপরি ঘরে আর ফিরে যেতে ইচ্ছে করছে না। রোদ আসে না ঘরে, মাথার ওপরে প্রাসাদের মতো অট্টালিকা। ছায়া ছায়া ভাব সব সময়। সূর্য আকাশে উঠতে না উঠতেই মরে যায়। মা সেই ঘরকে কতরকমের ছবি দিয়ে সাজিয়ে রেখেছে। একটা ছবিতে সে দেখেছে, এক পদ্মফুল—নীচে জল, জল কালো। পাশে লম্বা পাহাড়। নীচে রেললাইন। ছোটো ছোটো লাল নীল কাঠের ঘর। সাদা মাঠ, ঠান্ডায় বরফ পড়েছে। রেললাইন দেখলেই একটা ট্রেনের কথা মনে আসে। মা তাকে একবার সুন্দর জামাকাপড় পরিয়ে তারকেশ্বর নিয়ে গিয়েছিল। যাবার সময় সে দূরে একটা গাড়ি দেখেছিল, গাড়িটা থেমে আছে। মা বলছিল, ওটা মালগাড়ি। ওটা চলবে না। থেকে থেকে কেবল ঘন্টা বাজাচ্ছিল, টংলিং টংলিং। টংলিং টংলিং ঘন্টা ধ্বনি শুনলেই তার কেন জানি বাবার কথা মনে হয়। বুকের ভিতরটা ওর কেমন করতে থাকে তখন।

বড়ো পথ ধরে মেয়েরা সব স্কুলে যাচ্ছে। শীতের রোদে ওদের পোশাক কেমন ঝলমল করছে। নীল রঙের বাসে একদল ফুটফুটে মেয়ে বের হয়ে গেল। একটা কাক ডাকছে। দুটো শালিখ উড়ে গেল। দূরে কারখানায় ঘন্টা পেটার শব্দ। সনাতনের বিস্বাদ লাগছিল—এক্ষুনি আবার ফিরে যেতে হবে। মা রাতে না ফিরলে একটু বেলা করে ফিরে আসে। মা এসে ওকে ঘরে না পেলে মারধোর করে। এমন খোলামেলা পথ, ফুটফুটে মেয়ে, রঙিন সব গাছ ফুল পাখি ছেড়ে ভিতরে নর্দমার মতো একটা অন্ধকার ঘরে ফিরে যেতে খুব খারাপ লাগছিল। ভাবাই যায় না। এত বড়ো একটা সদর রাস্তার পিছনে দুই বাই একের এ বলে একটা খুপরি ঘর আছে। সেখানে তার বুড়ি দিদিমা কাঁথা বালিসের ভিতর ঠান্ডায় শক্ত হয়ে আছে।

ঘরে ফেরার মুখে সনাতন বুলিকে চাদরের তলায় লুকিয়ে ফেলল। যেন এই বুলির সঙ্গে সনাতনের একটা গোপন সলাপরামর্শ আছে। মা ঘরে আছে টের পেলেই চাদরের নীচে বুলি ভালো মানুষ হয়ে যায়। সন্তর্পণে সে বুলিকে ভাঙা তক্তপোষের নীচে হাড়িকুড়ির ভিতর লুকিয়ে ফেলে। মুখে একটা মালসা চাপা দিয়ে রাখে। মা যতক্ষণ বাড়ি থাকে ততক্ষণ সে বুলিকে লুকিয়ে লুকিয়ে শুকনো রুটি পাঁউরুটির অংশ, ছোলা ভাজা অথবা মুড়ি যা কিছু ওর ভাগে আসে, তার অংশ দেয়। বুলি চুপচাপ অন্ধকারে—যেন সে মৃত এক জীব, এই সংসারে তার অস্তিত্ব আছে বোঝাই দায়। মা ঘরে ফিরলেই দেখতে পায় সনাতন ভালো ছেলের মতো দোয়াত কলম নিয়ে বসেছে। সে অ আ ই ঈ লিখছে। মা তখন টেরই পায় না, এ-ঘরে একটা কুকুরছানা আছে।

রাস্তা পার হবার মুখে সনাতন বুলির মুখে চুমু খেল। তারপরই মনে হল কে যেন যায় গাড়িতে। বুঝি মা এবং সঙ্গে কে যেন। সে তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে ঘরে ফিরে এল। কিন্তু আশ্চর্য ঘরে ফিরে দেখল মা ফেরেনি। বারান্দায় কাঁথা বালিশের ভিতর বুড়ি তেমনি পুঁটলি পাকিয়ে আছে। ওর খিধে পেয়েছে, বুলির খিধে পেয়েছে। বুড়ি দিদিমা উঠে এখনও শুকনো রুটি করতে বসছে না। সে ক্ষেপে গেল। ক্ষুধায় কাতর। গলা শুকনো। মা নেই ঘরে। মানুষটা কবে আসবে—শীতের পাতা ঝরতে আরম্ভ করছে অথচ মানুষটা আসছে না। হতাশায় ওর কান্না পাচ্ছিল। সে ডাকল, দিদি, ও দিদি। ওঠ। উঠে খেতে দে। কোনো সাড়া-শব্দ নেই। শীতে কান ভোতা। সনাতনের এবার খিস্তি করতে ইচ্ছা হল—অ দিদি ওঠ। উঠে খেতে দে। না কোনো লক্ষণ নেই ওঠার। সে ক্ষোভে দুঃখে লাথি মারল কাঁথা বালিশে। তার পায়ের সঙ্গে সরে এল। দেখল, একটা মুখ, চোখে ঘোলা দৃষ্টি, নির্জীব, হা আমার সনাতন রে বলে ভ্যাঁক করে কেঁদে দেবার মতো মুখ করে রেখেছে বুড়ি। সনাতন ভয় পেয়ে ছুটবে ভাবল, আর তক্ষুনি গাড়ির শব্দ। মা একা ট্যাকসি থেকে নেমে আসছে। তাড়াতাড়ি সনাতন কি করবে কিছু ভেবে পেল না। কোথায় রাখবে বুলিকে, তাড়াতাড়ি

কিছু করতে হয়। মা এসে যাচ্ছে। মার পায়ের শব্দ। সে কেমন হকচকিয়ে গেল। তাড়াতাড়ি সে প্রতিদিনের মতো ঘরের অন্ধকার জায়গাটায় একটা হাড়ির ভিতর বুলিকে ঢুকিয়ে দিল। মালসা সে পেল না। লাফ মেরে বুলি বের হয়ে আসতে পারে। সে অগত্যা বুড়ির কাঁথা টেনে হাড়ির মুখটা জোরজার করে বন্ধ করে দিল। তাড়াতাড়ি করার জন্য কি যে হয়ে গেল—কুকুরটার কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। মা এসে বারান্দায় তখন হাউ মাউ কাঁদছে। বিকালে শ্মশানে কারা যেন গেল। মা টাকা গুণে দিলেন। দুবার তিনবার সে ভেবেছে, দুবার তিনবার কেন, সে বার বার ভেবেছে একবার সন্তর্পণে উঁকি দিয়ে দেখে তার সেই প্রিয় বুলি কেমন আছে। কিন্তু মা। আজ ঘর থেকে কিছুতেই বের হচ্ছে না। নোংরা ঘরদোর সব পরিষ্কার করছে। ধুয়ে পাকলে সব সাফসোফ করছে। হাড়ি পাতিল টানতেই ভিতর থেকে মরা কুকুরছানা বের হয়ে এল। মা কেমন বিরক্ত গলায় বলল হারে এই কুকুরছানা! সনাতন দেখল মার হাতে বুলি একটা মরা ইঁদুরের মতো দোল খাচ্ছে। ঠিক বুড়ি দিদিমার মতো চোখ উলটে আছে।

সে নিজেকে বড়ো নিঃসঙ্গ ভাবল। সে বড়ো একা। সে নিঃশব্দে বুলিকে নিয়ে বের হয়ে গেল। আর তখনই দেখল, সেই জাদুকরের দেশ থেকে মানুষটা এসে গেছে। মার জানালায় দাঁড়িয়ে কী তার প্রাপ্য ছিল, তা এখন ফিরে পেতে চাইছে। মা জানালা বন্ধ করে দিয়েছে। তখন মানুষটা পাগলের মতো চাবুক উড়িয়ে দিল বাতাসে। ঘোড়া ছুটিয়ে দিল। সে পথের ওপর হেলেদুলে ঘোড়া ছুটিয়ে নাচছিল। নটবর ঢোল বাজাচ্ছিল। বস্তির সব ছেলেছোকরারা ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে। মানুষটা সনাতনকে ডাকল। সনাতন বুলিকে বগল তলায় রেখে মানুষটার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। সে যেন বলল, তুমি যাবে সেই ফুল ফলের দেশে? তুমি যাবে, যেখানে মানুষ দূরের সাগরে পানসী নাও ভাসায়। তোমাকে আমি নিয়ে যাব। বলে সে ফের নাচতে নাচতে, দুলতে দুলতে ঘোড়ায় চড়ে যেতে থাকল। সনাতন পিছনে পিছনে নাচতে নাচতে, দুলতে দুলতে চলে যেতে থাকল। তার অ আ ক খ, দোয়াত কলম, স্বপ্ন দেখা সব পড়ে থাকল ঘরের অন্ধকারে। সে ফুল ফলের জন্য মানুষটার সঙ্গে বড়ো মাঠের উদ্দেশ্যে হাঁটতে থাকল।

সনাতনের মনে হল মৃত বুলিকে, মানুষটা—সেই যে বলে না কোথায় এক জাদুর পাহাড় আছে, পাহাড়ের মাথায় ঝরনা আছে, ঝরনার জলে যাদুর মানুষটা যত দুঃখ আছে পৃথিবীর দূর করে দেবে, বুলির বুকে প্রাণপাখি—সে প্রাণপাখির আশায় মানুষটার পেছনে হাঁটতে থাকল। জাদুর মানুষ বহুরূপী, সাদা কাপড়ের ঘোড়া আর সনাতন, বগলে তার মরা কুকুরছানা, সকলে তারা বড় একটা মাঠে নেমে গেল। নটবর মাঠে নেমেই জোরে জোরে ঢোল বাজাতে থাকল। যেন সে সকলকে বলে বলে চলে যাচ্ছে, শীতের শেষে সূর্য উঠলে আবার আমরা এ-শহরে তাজা কুকুর নিয়ে চলে আসব।

কাঠপিঁপড়ে

বিশ্বরূপ আজ মোট উনিশটি কাঠপিঁপড়ে নিধন করে ...ধরের দরজার দিকে এগোল। খুব খুশি। ওদিক থেকে আবার একটা তেড়ে আসছে। পাঁচিল থেকে নেমে সেফটি ট্যাঙ্কের দিকে এগোচ্ছে। আর এগোতে দেওয়া যায় না। পালাবার যথেষ্ট সুযোগ ছিল। পালাচ্ছে না। সারবন্দি যারা যাচ্ছিল—তারা নেই। জানবে কি করে বিশ্বরূপের মেজাজ গরম। এত উৎপাত কাঠপিঁপড়ের! শেষ করে দাও।

চটাস। চটি দিয়ে পিঁপড়ের দফা রফা। চেপ্টে গেছে। সারা বাড়িটার এখানে সেখানে সে সুযোগ পেলেই বের হয়ে পড়ে। এত মারছে, তবু শেষ হচ্ছে না। এদের চলার রাস্তা পাঁচিল ধরে, তারপর সেফটি ট্যাঙ্ক, তারপর সিঁড়ির দরজা। সামনের বারান্দায়ও ঢুকে যাবার ফন্দি। বাসা বানাবার তালে আছে। দরজা জানালার ফাঁকফোকড় খুঁজছে। কি করা যায় ভেবে পাচ্ছিল না বিশ্বরূপ। এত বিষ হুলে, যে একবার তার বড়ো নাতনির পাছায় হুল ফুটিয়ে দিয়েছিল। যন্ত্রণায় কাতর—চুন লাগিয়ে দেওয়ার পর পাছাখানা কিছুদিন ঢিবি হয়েছিল। বিষ বেদনায়ও কষ্ট পেয়েছে।

আসলে পাঁচিলের পাশের আমগাছটা ছিল এদের আস্তানা। গাছের খোঁদলে বাসা। গাছ থেকে খাবারের খোঁজে হয়তো বাড়ির দেওয়ালে, পাঁচিলে, বারান্দায় এমনকী দোতলার জানালার কাঠে ঘোরাঘুরির মজা পেয়ে গেল। হয়তো তার এ নিয়ে মাথা ব্যথাও থাকত না।

মুশকিল বাঁধাল, প্রথম বড়ো নাতনির পাছায় হুল ফুটিয়ে। তারপর একদিন বিশ্বরূপ নিজেও আক্রান্ত হল।

চেয়ারে বসে কাগজ পড়ছিল, হঠাৎ দংশন ঊরুর নীচে। প্রচণ্ড জ্বালা। সঙ্গে সঙ্গে সে ওটির নিধন পর্ব সেরে চুন হলুদের ব্যবস্থা। এবং পর পর বাড়ির সবাই যখন কোনো-না-কোনোভাবে আক্রান্ত হতে থাকল, বড়ো পুত্রবধূর অভিযোগ—গাছটা থাকলে, কাঠপিঁপড়ে কামড়াবেই। যত রাজ্যের পোকা-মাকড়ের উপদ্রব গাছটায়। শত হলেও গাছটা বিশ্বরূপ নিজে লাগিয়েছে। তার মায়া হবার যথার্থ কারণ আছে।

ছোটো ছেলেরও ইচ্ছে গাছটা কেটে ফেলা হোক। কাঠপিঁপড়ের উপদ্রব থেকে তবে বাঁচা যাবে। বিশ্বরূপ একদিন কি ভেবে নিজেই গাছটায় উঠে গেল। ... তারপর নেমে এল ফুলে ঢোল হয়ে। জ্বালা যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে চিৎকার করে ডাকল, পূর্ণ আছিস। কর্তার ডাকে, আজ্ঞে বলে হাজির। গাছে পূর্ণকেও উঠতে বলতে পারত। তবে বাড়ির সবাই যখন গাছটা কেটে ফেলার ব্যাপারে সমর্থন জানাচ্ছে, তখন পূর্ণ গাছে উঠেই—ওরে বাবা গেলুমরে মলুমরে বলে চেঁচামেচি শুরু করে দিতে পারে। সবার সমর্থনের বিরুদ্ধে সে যেতে রাজি হবে বলে মনে হয় না। কাঠপিঁপড়েতে গাছটা ছেয়ে আছে কর্তা, সে বলতেই পারে। সত্য মিথ্যা যাচাই করতে গেলে তার না উঠে উপায় কি! গাছটা যেন সবাইকে কামড়াচ্ছে।

একটা গাছও রাখা গেল না। চার কাঠা জমি নিয়ে বাড়ি। ফল ফুলের গাছ না থাকলে বাসস্থান হয়, তবে নিজের ঘরবাড়ি মনে হয় না। গাছ না লাগালে বাড়ির জন্য মায়াও জন্মায় না। সেই ভেবে একটা আম গাছ, একটা শেফালি গাছ, পেয়ারা গাছ দুটি এবং একটি কামিনী ফুলের গাছ সে লাগিয়েছিল। গিন্নিরও মেজাজ প্রসন্ন। গাছগুলো বড়ো হতে থাকলে গিন্নি একদিন অত্যন্ত আদরের গলায় বলেছিল, এখন তোমার বাড়িটাকে বাড়ি মনে হচ্ছে। বাড়িতে শুধু পুত্র-কন্যারাই বড়ো হবে, গাছ বড়ো হবে না হয়!

গিন্নি নেই। তিনি গত হয়েছেন চার পাঁচ সাল আগে। পেয়ারা গাছদুটো সে নিজেই কেটে ফেলেছে। পাশের প্রাথমিক স্কুলের হনুমানগুলির জ্বালায় দুপুরের ঘুম মাটি। সারা দুপুর গাছে উৎপাত, দাও কেটে, বাঁচি। বছর খানেক আগে শিউলি গাছটাও কেটে ফেলতে হল। বর্ষাকালে এত শুঁয়োপোকার উপদ্রব যে, ঘরের মেঝেতে, দেয়ালে তারা উঠে আসতে থাকল। জামা-প্যান্টের ভিতরও খুঁজে পাওয়া যেতে থাকল। জ্বালা যন্ত্রণা, চাকা চাকা দাগ। কী আর করা! দাও কেটে। ছিল আমগাছটা।

সে নিজে উঠে যায়। ফুলে ঢোল হয়ে নামল, তখন আর সংশয় থাকার কথা না। দিল কেটে। কাঠপিঁপড়ের ঘাঁটিটি অন্তত তছনছ করে দেওয়া গেল।

এখন গাছের কাঠপিঁপড়ে পাঁচিলের ওপর দিয়ে হাঁটে। সারা বাড়িটায় বোধহয় ছড়িয়ে পড়ার তালে আছে।

ছোটোছেলে জানাল, ছোটোবৌমা মাস দুই পরেই চলে আসছে নবজাতককে নিয়ে। তার একমাত্র বংশধর। নীচের তলায় থাকুক আর উপরের তলাতেই থাকুক কাঁথা কাপড়ের সঙ্গে অগোচরে দুটো-একটা কাঠপিঁপড়ে বিছানায় উঠে আসবে না বলা যায় না। কামড়ালে কি যে হবে! আর যদি কানের ভিতর ঢুকে যায়, শিশু সে বুঝবে কি করে দাদুর

আমগাছের পিঁপড়ে তার কানে ঢুকে গেছে, আর যদি কানের পর্দায় হুল ফুটিয়ে দেয়, তবেই হয়েছে। যেন বিষধর সর্প তার সামনে ফণা তুলে আছে। আতঙ্ক।

সুতরাং গাছটি কেটে ফেলা ছাড়া তার উপায়ও থাকল না। গাছ না থাকলে তারাও থাকবে না। অন্য কোথাও ডেরা বানিয়ে নেবে।

গাছ কাটল ঠিক, ফল হল বিপরীত। সারা বাড়ির দেয়ালে পাঁচিলে, দরজায় পিলপিল করে ধেয়ে আসছে। কাঠপিঁপড়ে কি শেষ পর্যন্ত তাদের বাড়িছাড়া করে ছাড়বে!

প্রথমে গ্যামাকসিন।

যে যাই বলে। বেগন স্প্রে করুন। কেরোসিন তেল ঢেলে দিন চলার রাস্তায়। গ্যামাকসিন ছড়িয়ে দিন। বেগন স্প্রে করল। গ্যামাকসিন দিল। কেরোসিন তেল ছড়িয়ে দিল, কিছুটা উৎপাত কমল বটে, তবে রেহাই পাওয়া গেল না। বৃষ্টিতে ধুয়ে-মুছে গেল ফের উৎপাত। তারপর দেখা গেল, কোনো কিছুতেই আর কাজ হচ্ছে না।

অল প্রুফ কাঠপিঁপড়ে।

অনায়াসে তারা গ্যামাকসিনের ওপর দিয়ে হেঁটে যায়। ঘরে ঢোকে। মেঝেতেও দু-একটা চোখে পড়ে। বারান্দার দেয়ালে। যে যা বলছে, সবই করে দেখেছে। কিছুই ফল পাওয়া যাচ্ছে না।

অগত্যা নিধনযজ্ঞও।

রোজ অবসর পেলেই, একটা চটি হাতে উঠে আসে। প্রথম বারান্দা দিয়ে শুরু। বারান্দার দেওয়ালে তিনটে কাঠপিঁপড়ে হাঁটছে। চটি দিয়ে চটাস। একটা পড়ে গেল। হাত-পা গুঁড়িয়ে গেল। পেট চেপ্টে গেল। আরও একটা চটাস। পড়ল ঠিক, তবে মরল না। মরবে মরবে ভাব। রান্নাঘরে নেই। পাঁচিলের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। পিলপিল করে আসছে। সে মারছে আর আসছে। মারছে। আবার আসছে। এক সময়ে মনে হল পাঁচিল ফাঁকা হয়ে গেছে। কিছুটা নিশ্চিন্ত হয়ে বারান্দায় ঢুকে সোফায় গা এলিয়ে দিয়েছে, অবাক হয়ে দেখছে, আবার ঠিক তিনটে কাঠপিঁপড়ে। মরা কাঠপিঁপড়েগুলো পিঠে নিয়ে উঠে যাচ্ছে।

ঠিক মরা বলা যায় না। হাত-পা নড়ছে। সে চেপ্টে দিয়েছিল, বেলুনের মতো বাতাসে আবার ফুলে উঠছে যেন। কাঠপিঁপড়ের জান এক কঠিন। কচ্ছপের চেয়েও বেশি। পাঁচিলের দিকটায় গিয়ে দেখতে হয়। আবার কোথা থেকে আধমরাগুলো পিঠে তুলে কাঠপিঁপড়েরা হেঁটে যাচ্ছে। তবে সে হেঁটে যাবার সুযোগ দিচ্ছে না। জোড়ায় জোড়ায় নিধন হচ্ছে এবারে।

মাসখানেক ধরে এই করে যাচ্ছে। কিন্তু একটা পিঁপড়েরও খোঁটা ওলটাতে পেরেছে বলে মনে হয় না। মরে যায় আবার দুদিন গেলেই বেঁচে ওঠে।

সে কাঠপিঁপড়ের গতিবিধিও লক্ষ রাখছে। আসলে সে এক সকালে একই জায়গায় বসে কাঠপিঁপড়ে নিধনে মত্ত হল। মারছে। মরছে। আবার কোথা থেকে মৃত কাঠপিঁপড়েদের খোঁজে পিলপিল করে তারা চলে আসছে। কি করে খবর পেয়ে যায়—সে বোঝে না। সাঙ্কেতিক বার্তা পাঠাতে পারে বোধহয়। সারা বাড়ি ঘোরারও দরকার নেই, তবে এক জায়গায় বসে ক্রমাগত মেরে গেলেই হয়।

চটাস শব্দ শুনলেই বাড়ির সবাই বুঝে ফেলে বাবা এখন পিঁপড়ে নিধনযজ্ঞে মেতে গেছেন। পূর্ণ বলবে, কর্তার শুরু হয়ে গেল। মাথায় তার কেমন একটা জেদ চেপে গেল।

একসময় দেখল, সে নাওয়া-খাওয়ার কথাও ভুলে গেছে। ফকির আমজাদ মাঝে মাঝে ভিক্ষে করতে আসে। বাবুর সঙ্গে তার সুখ-দুঃখের গল্পও হয়। আগে এলে দেখতে পেত, বারান্দার ইজিচেয়ারে বসে তিনি কি পাঠ করছেন, এখন এলে দেখে পাঁচিলের পাশে গোঁজ হয়ে বসে আছেন। কিছু বললেই, হাত তুলে ইশারা, ভিক্ষে দিয়ে চলে যাও। কথা না। এত মনোযোগ দিয়ে কি করেন।

সে না পেরে একদিন পাঁচিলে উঁকি দিয়ে দেখেছিল, বাবুর একহাতে চটি, এক পায়ে চটি। একটা চটি হাতে, একটা চটি পায়ে কেন! সে ভড়কে গিয়ে বলেছিল, বাবুর কি মাথা ঠিক আছে।

বিশ্বরূপ তাকাল। করিম ভিক্ষে, ধর্মের নামে বড়ো বড়ো কথা, আমার মাথা ঠিক নেই, তোমার আছে! সে জবাব দিল না।

বাবু রেগে গেছেন কথাটাতে। হেন অযৌক্তিক কথা বলা ঠিক হয়নি। সে খুব বিব্রত বোধ করে বলল, বাবু কী খুঁজছেন?

বিষধর সাপ।

কোথায়!

এই যে বলে কাগজে কুড়নো ডাইকরা মৃত পিঁপড়ে দেখাল। বলল, শালাদের পুড়িয়ে মারছি। আমার সঙ্গে চালাকি।

ফকির আমজাদ বলল, বাবু ভাবলে বিষধর সর্প—না ভাবলে জীব। সে যার মধ্যে বিচরণ করে। আপনি আমি তার কি ক্ষতি করতে পারি!

প্রাণের সাড়া

নীচের বারান্দায় কারা কথা বলছে, এত সকালে কে এল। ঝড়েশ্বর উঠে বসলেন। দেয়াল ঘড়িতে চোখ গেল—ছটা বেজে গেছে। সারারাত গরমে ভাজা ভাজা হয়েছেন, ভোররাতের দিকে ঘুমটা লেগে এসেছিল। বয়স হয়ে যাওয়ায় ঘুম এমনিতেই তার কম। রাতে দু-তিনবার টয়লেটে না গেলেও চলে না। লোডশেডিং, সেই রাত আটটায়, তারপর আর কারেন্টের পাত্তা নেই। জ্যৈষ্ঠের গরম, চাতক পাখির মতো আকাশ-বাতাস একটুকু বৃষ্টির জন্য কবে থেকে ছটফট করছে।

কারা কথা বলছে নীচে? কাজের মেয়েটা, এবং মনে হল নিরু সঙ্গে। দুজনেরই বেশ ব্যস্ত গলা পাওয়া গেল।

ভিতরে এসে বসো। এত রোগা! পারবে! বাচ্চা। তোমাকে তো আরও বড়ো মেয়ের কথা বলেছিলাম।

পারবে মাসিমা। গাঁয়ে থাকে, গরিবের ঘরে বড়ো হয়, খেতে-পরতে পায় না। জল-বাতাস লাগলে দেখবেন দুদিনে ফন ফন করছে।

ঝড়েশ্বর ভাবলেন—তাহলে সেই লোকটা এসে গেছে। সল্টলেকে রিকশ চালায়, পূর্ত ভবনে পেনশনের লাইফ সার্টিফিকেট জমা দিতে গিয়ে নিরু লোকটাকে রাস্তায় দাঁড় করিয়ে রেখেছিল। কাজ সেরে অফিস থেকে বের হতে তার দেরিই হয়ে গেছিল, ফিরে দেখে গাছের ছায়ায় লোকটা রিকশয় ঘুমিয়ে পড়েছে। ইস, খুবই দেরি হয়ে গেছে, নিরুর যত বয়স হচ্ছে, তত ন্যায়-নীতিবোধের কামড় বাড়ছে। ফলে খুবই সহৃদয়, নিরু না বলে পারেনি, দেরি হয়ে গেল! কিছু খাবে? বলে ব্যাগ থেকে ভাড়া বাদেও অতিরিক্ত দশটা টাকা দিয়ে বলেছিল, খেয়ে এস। পেট তো পড়ে গেছে। সকালে কী খেয়ে বের হয়েছিলে?

নিরুর এমনই স্বভাব, রিকশয় উঠতে কথা, বসতে কথা, চলতে কথা। নাম, কোথায় থাকে, ছেলেপুলে কি? সারাদিনে কত রোজগার, ঝড় বাদলায় বন্ধে কী করে চলে! নিরুকে নিশ্চয়ই রিকশওয়ালা তোয়াজ করে কথা বলেছে, তোয়াজ করলেই নিরু কেমন বড়ো বেশি বিবেচক হয়। কে বলবে, বৈকুণ্ঠের রিকশয় সে সেদিনই উঠেছে। যেন কতকালের চেনা।

তাহলে সেই বৈকুণ্ঠ হাজির। সুন্দরবনের বাঁদা অঞ্চলে কোথায় কোন সুদূরে থাকে। ট্রেনে, বাসে, ভটভটিতে যেতে হয়—হেঁটেও যেতে হয় ক্রোশতিনেক—সকালে বের হলে গাঁয়ে পৌঁছতে তার সাঁজ লেগে যায়। নদীনালা, খাঁড়ি আর সুন্দরী গাছের জঙ্গল। নদী পার হয়ে বাঘও চলে আসে—সুযোগ পেলে। বেনা ঘাসের মাঠের মধ্যে ফরেস্টার বাবুদের কোয়ার্টার। তার বউ সেখানে জল বাটনা দেয়। নিরু এসে কত খবর দিয়েছিল। তার বড়ো মেয়েটাকে রাখার একটা জায়গা খুঁজছে। খেতে-পরতে দিলেই হবে। আর যদি কিছু টাকা ধরে দেন মাসিমা—এই পর্যন্তই কথা।

ঝড়েশ্বর আর বসে থাকতে পারলেন না। তাঁর ঘুম ভেঙে যাবে বলে নিরু নীচের বারান্দায় খুবই আস্তে কথা বলছে। বৈকুণ্ঠ গাঁয়ের লোক, আস্তে কথা বলার অভ্যাস নেই। সে জোরেই কথা বলছে। মাঝে মাঝে নিরু বলছে, আস্তে কথা বল। বাবুর ঘুম ভেঙে যাবে। সঙ্গে সঙ্গে বৈকুণ্ঠের গলার স্বর নিস্তেজ। এমনই যখন চলছিল, তিনি শিয়রের কাছ থেকে চশমাটা চোখে পরে চাবির গোছা হাতে নিয়ে স্লিপার পায়ে গলিয়েও কী ভেবে আর গলালেন না। সিঁড়িতে নামার সময় চটির ফট ফট শব্দে নিরু বুঝতে পরবে, তিনি নামছেন। নিরুর অনেক কিছুই তখন পছন্দ না, সেজন্য নিরু সতর্ক হয়ে যেতে পারে।

এ-বাড়িটায়, এখন বলতে গেলে তাঁরা দুজন। পুত্ররা সবাই কাছাকাছি জায়গায় ফ্ল্যাট কিনে উঠে গেছে। সতের-আঠারো বছরে, বলতে গেলে বাড়িটা খালিই হয়ে গেল। বাড়িটাতে ঘরেরও অভাব ছিল না। দু-তলা, তিনতলা মিলিয়ে মেলা ঘর। এক একটা অংশে, বাথরুম এবং দুটো শোবার ঘর, পুত্রদের বিবাহিত জীবনে কোনো অসুবিধা না হয় ভেবেই করা। রান্নার লোক, ঠিকে ঝি এবং সব সময়ের টুকিটাকি কাজের জন্যও একজন চব্বিশ ঘন্টা থাকার মতো কাজের মহিলার বন্দোবস্ত আছে।

তবু কাউকে ধরে রাখা গেল না। কী যে অসুবিধা, তবে অসুবিধা থেকেই যায়, নানা কারণে ঠোকাঠুকিও হয়, মানিয়ে নেওয়ার মতো জীবনই তৈরি হয়নি হয়তো।

তিনি নীচে নেমে আসার সময়ই বাড়িটার ভবিতব্য ভেবে কষ্ট পাচ্ছিলেন।

নীচে নেমে দেখলেন কাকলাশ মতো একটি লোক বসার ঘরে মেঝেতে বসে আছে। আর একজন বালিকা, আট-দশ বছরের, ছেঁড়া ফ্রক গায়ে দিয়ে, নিরুর প্রশ্নের জবাব দিচ্ছে। তাঁকে দেখেই নিরু বলল, বলেছিলাম না বৈকুণ্ঠ ঠিক লোক নিয়ে আসবে। বৈকুণ্ঠের বড়ো মেয়ে, ফুলি, এই প্রণাম কর। দাদু বলে ডাকবি।

তাহলে সব ঠিকই হয়ে গেছে। কিন্তু এতটুকুন মেয়ে, শীর্ণকায়, চোখ কোটরাগত, অনাহার এবং অনিদ্রার ছাপ চোখেমুখে, কতটা পারবে বুঝতে পারলেন না ঝড়েশ্বর। কিন্তু কিছু বলারও উপায় নেই। নিরুর ফুটফরমাশ খাটায় লোকের যে দরকার তিনিও বোঝেন।

কোমরে-হাঁটুতে বাতের ব্যথা লেগেই আছে—বয়স হলে শরীরও ভালো যায় না, রান্নার মেয়েটা, রান্না করে চলে যায়, ঠিকা ঝি কাজ করে চলে যায়, চব্বিশ ঘন্টার কোনো লোকই আর থাকে না, বিপদে-আপদে বাড়িতে কেউ না থাকলে এ-বয়সে দিশেহারা হতেই হয়। নিরুকেও দোষ দেওয়া যায় না। শিখিয়ে-পড়িয়ে নিলে ফোন ধরতে পারবে, বাজার থেকে দৌড়ে দরকারি টুকিটাকি জিনিসও নিয়ে আসতে পারবে, বড়োই জরুরি সংসারের পক্ষে। তবে বড়ো করে না তুললে, কোনো কাজেই লাগবে না।

কত মাইনে চায়? ঝড়েশ্বর না বলে পারলেন না। নিরু বলল, কী দিতে হবে বৈকুণ্ঠ?

বড়ো বিগলিত বৈকুণ্ঠ।—দেবেন আপনাদের যা মনে লয়।

না, যা মনে লয় না। সাফ সাফ বলে নেওয়া ভালো। পরে ঝামেলা পাকালে মুশকিল। এই নিভা বৈকুণ্ঠকে চা করে দাও।

ঝড়েশ্বর সোফায় বসে পড়েছেন, ফুলি দরজার চৌকাঠে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আর বড়ো বড়ো চোখে কেমন ঘরবাড়ি দেখছে।

নিভা বলল, আমার দেরি হয়ে যাবে মাসিমা।

বাড়িটা সাফসোফ রাখা, থালাবাসন মাজা, কাচাকাচির কাজ তার। চার-পাঁচটা বাড়িতে একলপ্তে কাজ করে বলে, সময়মতো না ঢুকতে পারলে কথা কাটাকাটি শুরু হয়। নিভাননী যে কাউকে ছেড়ে কথা বলার পাত্রী নয়, ঝড়েশ্বর ভালই জানেন। সারাদিনই প্রায় তার কাজ—এ-বাড়ি সে-বাড়ি ঢুকে বসে থাকলে তার চলে না। মাসিমার যে দরদ উথলে পড়ছে টের পেয়েই নিভা সরে পড়তে চাইছে। তারপর বললেই হল, নিভা বৈকুণ্ঠকে রুটি করে দাও। আলুর সেঁচকি করে দাও।

রান্নার মেয়ে মায়ার আসতে দেরিই হয়। সে একবাড়ির কাজ সেরে, এ-বাড়িতে ঢোকে। লোক থাকলেই কাজ বাড়ে, কাজের মেয়েরা এটা ভালোই জানে, আর যদি মেয়েটা কাজ ধরে নেয় তবে তো কথাই নেই। কোনোদিন না মাসিমা বলে দেন, কাচাকাচির কাজ করতে হবে না। থালাবাসন মাজতে হবে না।

তারপর একদিন যদি বলে দেন, মোছামুছির কাজ তো ফুলিই পারে, তা হলেই হয়ে গেল—কেউ বাড়িতে কাজে ঢুকলে শেষ পর্যন্ত কোথায় গিয়ে থামবে কেউ জানে না।

কেউ কাজে নতুন ঢুকলে যে নিভা কিংবা মায়া প্রমাদ গুনতে থাকে, ঝড়েশ্বর ভালোই জানেন। নতুন লোকটিকে না তাড়িয়ে তারাও শান্তি পায় না। কারণ এ-বাড়িটায় দেখাশোনার লোকের অভাব বলে স্বাধীনতা একটু মাত্রাতিরিক্ত। বউমারাও নিজের নিজের কাজে ব্যস্ত, রান্নাঘরে কেউ উঁকি দিয়েও দেখে না। আট-দশ বছর ধরে একই মাসোহারা

—ঝড়েশ্বর-পুত্ররা কিছু দিলেই খুশি ছিলেন, এতকিছু সুবন্দোবস্ত থাকা সত্ত্বেও বাড়িটা শেষ পর্যন্ত খালিই হয়ে গেল।

ঝড়েশ্বর মাথা চুলকে বললেন, পারবে তো?

নিরু সোফায় বসে বলল, পারবে না কেন। কাজটা হাতি না ঘোড়া। এটা-ওটা এগিয়ে দেবে। পারবে না কেন?

না বলছিলাম, থাকতে পারবে তো? মন টিকবে তো? এই মেয়ে, পারবি থাকতে? বাবা-মার জন্য মন খারাপ করবে না?

ফুলির চোখ বড়ো হয়ে গেল, গোল গোল হয়ে গেল। কোনো সাড়া পাওয়া গেল না।

ঝড়েশ্বর বললেন, দ্যাখ, বাড়ির মেয়ের মতো থাকবি, তারপর বৈকুণ্ঠের দিকে তাকিয়ে বললেন, আমরা দুজনে বাড়িটায় থাকি—তোমার মেয়ে কষ্ট পাবে না। যদি নিজের মতো থাকে, থাকতে থাকতে বড়ো হয়ে যায়, বিয়ের খরচ পাবে। কাছে থাকলেই মায়া বাড়ে। বড়ো করলাম, আর হুটহাট একজনকে ধরে গছিয়ে দেবে—সে হবে না।

আসলে বাড়িটা এত খালি, কেউ থাকলেই যেন ভরে যায়।

নিরু বলল, মাকে ছেড়ে থাকা কঠিন, আমি তো ভেবেছিলাম, বড়োই হবে। বারো-চোদ্দো বছর, আর আট-দশ বছরের যে অনেক ফারাক বৈকুণ্ঠ। তোমার পরিবারের কষ্ট হবে, তার তো বুক খালি হয়ে যাবে।

ঝড়েশ্বর বললেন, বুক খালি কার না হয়। তুমি কি ভালো আছ? রাতের নৈঃশব্দ্য তোমাকে পীড়ন করে না! বল, দিনের বেলাটাও ভালো যায় না। কেমন সব শুনশান মনে হয়।

তারপরই কেন যে মনে হল, তিনিও নিরুর মতো কেমন নিজেকে বড়ো অসহায় বোধ করছেন। বৈকুণ্ঠ টের পেলে চেপে ধরতে পারে—বাড়িটায় সে এবং তার পরিবার যদি একটু থাকার জায়গা পায়, বাড়িটা তো খালি পড়েই আছে, তারা থাকলে বিপদে-আপদে কাজে আসবে। বলতেই পারে, বাবু আমাদের থাকতে দিন না। বনজঙ্গলে বউ ছেলে-মেয়ে ফেলে রেখে এতদূরে থাকা যে খুব কষ্ট।

নিরু বলল, কী হল বৈকুণ্ঠ, কত দেব?

না মাসিমা, আপনি বলুন।

দুশো টাকা পাবে। একটা লোকের খেতেও কম খরচা না। কলকাতায় খাওয়া পাওয়া যায়, থাকার জায়গা পাওয়া যায় না।

তাই দেবেন মাসিমা। আমি মাসপয়লা টাকাটা নিয়ে যাব।

নিরু বলল, ফুলি তো কথাই বলছে না! কিরে, তোর ভালো লাগছে না আমাদের?

ও ভাববেন না, ঠিক মানিয়ে নেবে। আমি তাহলে উঠি।

এই যা, ও নিভা, মায়া আসেনি! একটু চা করে দিতে বললাম, তোমরা যে কী কর না! বলেই নিরু ডাইনিং প্লেস পার হয়ে গিয়ে রান্নাঘরে উঁকি দিয়ে দেখল সব ফাঁকা।

নিরু ফিলে এসে বিরস গলায় বলল, তোমাকে যে চা খাওয়াব তারও উপায় নেই বৈকুণ্ঠ। মায়া যে কী করে! কত বেলা হল, এখনও আসার নাম নেই। তোরা মাগনা কাজ করিস! নিভা যাওয়ার সময় বলে যাব তো! নিভাও কিছু না বলে চলে গেল।

বৈকুণ্ঠ কাঁচুমাচু গলায় বলল, এত বড়ো বাড়ি, আর কেউ থাকে না। দাদা-বউদিরা, তারপরই কী ভেবে বলল, সব কপাল মাসিমা, আমরা একটা ঘরে পাঁচজন শেয়ারে থাকি। বাগমারির বস্তিতে আলো নেই, পাখা নেই, আমাদের কোনো কষ্ট হয় না। মানুষ না থাকলে কীসের ঘরবাড়ি? বলেন!

ঝড়েশ্বর বললেন, থাকত। এখন নেই। এত বড়ো বাড়িতেও কুলাল না। এখন তো আমার শিরেসংক্রান্তি। বাড়িটা যে রং করাব, মেরামত করব, তারও ইচ্ছে হয় না। উদ্যম হারিয়ে ফেললে মানুষেরই এই হয় বৈকুণ্ঠ।

বৈকুণ্ঠ বলল, দুদিন কাজ কামাই করে নিয়ে এলাম। মাসিমা এত করে বলল, কাছে তো না! তারপর ট্রেনে, বাসে, ভটভটিতে কাল রাতে নিয়ে এসেছি। আমি উঠছি, এই পুলি, ভালো হয়ে থাকবি। দাদু-দিদার কথা শুনবি।

ফুলি শুধু তাকিয়ে আছে।

কখনো বাপের কথা শুনছে, কখনো বাবুর কথা শুনছে। কোনো কথা বলছে না।

ঝড়েশ্বর না বলে পারলেন না, কিরে ফুলি, তুই কি কথা বলতেও পারিস না?

সব পারে বাবু। দমে আছে। এতটা রাস্তা, বুঝতেই পারেন! আমি উঠি বাবু, না উঠলে আজও লস হবে। আমাদের খাটলে ভাত, না খাটলে—তারপর সে তার পেট দেখাল—উপোস।

ফুলির বগলের পুঁটলি বগলেই আছে।

ঝড়েশ্বর ভাবলেন, ফুলির উচিত পুঁটলি খুলে দেখানো।

ফ্রক আর এনেছে!

আছে আর একটা।

নিরু বলল, এই ফুলি চল তোকে বাথরুম দেখিয়ে দিচ্ছি। সার্ফ দিচ্ছি, সব ধুয়ে নে। বাজারে বের হলে তোর জন্য নতুন ফ্রক, চিরুনি, আয়না এনে দেব। সাফসোফ থাকবি। এই নাক খুঁটছিস কেন? তোর কি ঘেন্নাপেত্তা নেই! আয়।

ফুলি দাঁড়িয়েই থাকল।

ঝড়েশ্বরের মনে হল, বৈকুণ্ঠ রওনা হলে ফুলিও পিছু পিছু দৌড় মারবে। দৌড় মারারই কথা—এখনও কথা বলছে না কেন! হাবা-কালা নয়তো! বোবাও হতে পারে। সে যাই হোক, থাকলে ক্ষতির প্রশ্ন নেই। মেয়েটা ছোটাছুটি করলেও বাড়িটা যেন প্রাণ ফিরে পাবে। কাজ করুক না-করুক, তাঁরা ছাড়াও বাড়িতে আর একজন আছে ভাবতেও ঝড়েশ্বরের ভালো লাগছে।

তাহলে বাবু যাই। বৈকুণ্ঠ একবার মেয়েকে দেখল, তারপর বাবুর পায়ে গড় হল। নিরুকেও প্রণাম করল।

ঝড়েশ্বর কেমন এই প্রণামের বহরে মুগ্ধ হয়ে বলল, মেয়ের জন্য ভাববে না। নিজের মতো থাকলে আখেরে ভালোই হবে। বড়ো হলে বিয়েও দিয়ে দেব। কাজের লোক তো আছেই। সব সময়ের লোক না থাকলে অসুবিধা, এটা-ওটা এগিয়ে দিলেও আমাদের অনেক। কাছে থাকলে মায়া পড়ে যায় বোঝই তো!

আজ্ঞে যাচ্ছি।

মাঝে মাঝে এসে খবর নিয়ে যেও।

সে তো আসতেই হবে। মাসপয়লাতেই আসব। মাসের টাকাটায় সংসারে পঁচিশ-ত্রিশ কেজি চাল হয়। ওর ভাইবোনগুলো খেয়ে বাঁচবে। সোজা কথা!

তারপর সদর খুলে দিলে বৈকুণ্ঠ বের হয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে বাড়িটা দেখল। রাস্তাঘাট দেখল। গলিঘুঁজিতে মেয়েটা হারিয়ে না যায়, যদিও মাসিমা একখানা কার্ড দিয়েছে, ওতেই ঠিকানা লেখা ছিল, সেই ঠিকানা যে ভুলও নয়, নিজে এসে তাও দেখে গেল।

ফুলি জানালায় দাঁড়িয়ে রাস্তায় বাপকে দেখছে! বাপ হেঁটে যাচ্ছে। যতক্ষণ দেখা যাচ্ছিল, জানালা থেকে নড়ল না। বাপ রাস্তার মোড়ে অদৃশ্য হয়ে গেলেও জানালায় দাঁড়িয়ে থাকল। সদরে কেউ এসেছে। সদর খুলে দেওয়ার জন্যও লোকের দরকার। কে খোলে! নীচে এতবার ওঠানামা আর করতে পারেন না ঝড়েশ্বর।

তিনি ডাকলেন, এই ফুলি, দরজা খুলে দে।

ফুলি তরতর করে ছুটে এল। দরজা খুলে দিল।

ঝড়েশ্বর বসার ঘরে। মায়া ঢুকছে। দরজা খোলা-বন্ধ করাও একটা বড়ো কাজ। সকাল থেকেই কেউ না কেউ আসছেই। শহরে বাড়ি হলে যা হয়, বড়ো সতর্ক থাকতে হয়। কোলাপসিবল গেট আছে সদর দরজায়। তবে সদর কমই খোলা হয়। বাড়িটার ভেতরের দিকেও দুটো দরজা আছে। কাজের লোক, মুড়িওয়ালা, দুধওয়ালা, ছাত্রছাত্রীরা—সবাই ঢোকে দ্বিতীয় দরজাটা দিয়ে। কলপাড়ের দিকেও একটা দরজা আছে, সেখানে নিরুর কিছু শৌখিন গাছপালা বড়ো হয়।

একটা টিউকলও আছে, বাসন মাজার আলাদা জায়গাও আছে। বেসিনে এত বাসনকোসন ধোওয়া যেত না—তখন তো বাড়িটায় বারো-চোদ্দোজন লোক। পুত্ররা, পুত্রবধূরা, নাতি-নাতনিরা... বাড়িটা মানুষের কলরবে ভরে থাকত। এখন তিনি আর নিরু। ফুলি আসায় তারা তিনজন। কলপাড়ে আর কেউ যায় না। কলপাড়ের দরজাটাও বন্ধ থাকে। গাছে জলটল দিতে হয়। গাছের গুঁড়িও খোঁড়াখুঁড়ি করতে হয়। মৌসুমি ফুলেরও চাষ আছে। অবসর নেওয়ার পর, নিরু এই গাছপালা নিয়েই বিকেলটায় ব্যস্ত থাকে। একটা পাতা পর্যন্ত পড়ে থাকতে পারে না।

আসলে বাড়ির গলিটা দিয়ে ঢুকে দ্বিতীয় দরজা। সেটাই বেশি খুলতে হয়। বন্ধ করতে হয়। যতক্ষণ তিনি নীচে থাকেন, ছাত্রছাত্রীরা তাঁর কেচিংয়ে ভিড় করে থাকে, সবাই হয় অনার্সের ছাত্র—ফিজিক্সের অধ্যাপক ঝড়েশ্বরের খুবই সুনাম, ভালো ছাত্র পেলে তিনি পয়সাও নেন না, এসব কারণে সুখ্যাতি আছে তাঁর—সব সময়ের জন্য মাসমাইনের লোকও ছিল তাঁর। কিন্তু যা হয়, সুযোগ পেলেই কোপ বসিয়ে চলে যায়। আর বয়েস হয়ে যাওয়ায় এবং পুত্ররা সব আলাদা ফ্ল্যাটে উঠে যাওয়ায়, বয়স্ক লোক রাখতে কেন জানি আর সাহস পাচ্ছিলেন না। নীচে যতক্ষণ থাকেন, তিনিই উঠে গিয়ে দরজা খুলে দেন, বন্ধও করেন—এতে তাঁর কাজের অসুবিধা হয়, কিছু স্কুল বই আছে, প্রেসের লোকও আসে, বইয়ের প্রুফটুফ দেখারও কাজ থাকে। ছেলেমেয়েরা বাবা-মার খবর নিতেও আসে, ভালোমন্দ রান্না হলে কাজের লোক দিয়ে পাঠিয়ে দেয়, নিজেরাও আসে, ছুটিছাটায় তারা থেকেও যায়। বাড়িটা তখন জমজমাট। তিনি তখন বাজারে নিজে যান—নিরুর বাজার পছন্দ না তার। কে কী খেতে ভালোবাসে, সব বাছবিচার করে কেনেন—এটা তাঁর একটা হবি।

কিন্তু বাড়িটা খালি হয়ে যাওয়ার পর বাজার করার হবিটাও তাঁর চলে গেছে। দুজনের আর কী লাগে! একদিন বাজার করলে চার-পাঁচদিন চোখ বুজে চলে যায়। তবে রান্নার মেয়েটির হাতটান থাকায়, তাঁর হিসেব ঠিক থাকে না। বারবার মায়াকে সতর্কও করে দিয়েছেন, হলে কি হবে, সে নেবেই—কী করে সরায়, এই বিষয়টাই তাঁর মাথায় আসে না। কিচেন, ডাইনিং প্লেস সম্পূর্ণ আলাদা বলে নজর রাখাও কঠিন। নিরুকে বললেও

বিপদ, সে পাহারা দেওয়ার নামে এমন সব জটিলতা সৃষ্টি করবে যে, তখন তাঁর মধ্যস্থতা ছাড়া উপায় থাকে না। মাছের পিস, মাংসের পিস, গুনেও রাখা হয়, চারদিন চলার কথা, তিনদিনও যায় না—সংসারে এত সব জটিলতায় পড়েই এই ফুলিকে তুলে আনা—অন্তত নিজের করে নিতে পারলে, সে-ই সব লক্ষ রাখতে পারবে।

যদিও তিনি জানেন রান্নার মেয়েটি খুবই ধুরন্ধর। দুদিনেই ফুলিকে হাত করে নেবে, সংসারে তার কেবল নাই নাই—মাসের বাজার বিশ-বাইশ দিনে শেষ। তিন কেজি আলু দুদিনেই শেষ। চারদিনের বাজার তিনদিনও যায় না। কিছুকাল যে তালা-চাবির বন্দোবস্ত না করেছেন তাও নয়। তারপর তালাও থাকে না, চাবিও থাকে না। নিরুর পূজাআর্চাতে সকালটা কেটে যায়—পুজোয় বসলে তার সঙ্গে কেউ কথাও বলতে পারে না—

বাবু চা নেই, বাবু চিনি নেই, বাবু পোস্ত আনতে হবে।

মাসের বাজার শেষ। পাঁচশ পোস্ত, কে খায়! কদিন আলুপোস্ত হয়! ছোটো পুত্রটি বাড়ি এলে কিংবা থাকলে, পোস্ত হয়। তিনি কিংবা নিরু পোস্ত বিশেষ পছন্দ করেন না। দুজন লোকের রান্না তিন কেজি আলু তিনদিন যায় না, এক কেজি পেঁয়াজ তিনদিন যায় না। এক রান্নাঘর আর রান্নার মেয়েটাকে নিয়েই পাগল হওয়ার জোগাড়। তার ওপর অপচয় তো আছেই। ছাড়িয়েও দিতে পারেন না। পরের বস্তুটি আরও বিপজ্জনক পরিস্থিতির সৃষ্টি যে করবে না, এই আতঙ্কে তাড়িয়ে দেওয়ার কথা ভাবলেও শেষে আর সাহসে কুলায় না।

শিবানী মেয়েটা মন্দ ছিল না। চালাকচতুর, যাক সে রান্নাঘরটায় নজর রাখতে পারবে। বছর দুই ছিল, কিছুদিন যেতে না যেতেই শিবানী তাঁদের চেয়ে রান্নার মেয়েটার বেশি বাধ্যের হয়ে গেল।

এই শিবানী, যা তো রসিকের দোকান থেকে দু দিস্তা কাগজ নিয়ে আয়।

শিবানীর সাড়া নেই।

কী হল! শুনতে পাচ্ছিস না শিবানী?

রান্নার মেয়ে মায়া তখন ডাকবে, এই শিবানী, তুই কোথায়! মেসো তোকে ডাকছে।

আর সঙ্গে সঙ্গে তিনতলা থেকে জবাব, যাই।

ঝড়েশ্বর কুপিত না হয়ে পারেন না।

তিনতলায় কী করছিস?

দিদুর ছাড়া কাপড় ধুয়ে মেলে দিচ্ছি তারে।

আসলে কিছুই করছে না। কাছেপিঠে থাকলেই কাজ, তাকে দেখলেই দিদুর কাজের ফরমাশ, যতদূরে গা বাঁচিয়ে থাকা যায়। ঝড়েশ্বর সবই বোঝেন, রান্নাঘরে থাকলে মায়াই

তাকে এটা-ওটা খেতে দেবে।

নে যা।

বলে, চিংড়ি মাছ ভাজা দেবে খেতে, তেলের বড়া দেবে খেতে, এমনকী দুধরুটি মায়াও খাবে, সে-ও খাবে। সবই লুকিয়ে-চুরিয়ে, দুজনের সংসারে এত টানাটানি। তাঁর খাবার বেলায় দুধ থাকে না, চিনি থাকে না, এই তো কাল বিকেলে দু-প্যাকেট দুধ আনা হল, সকালেই বলছে দুধ নেই। তোমার কি! তোমাদের চোখে লাগে না।

একদিন তিনি রান্নাঘরে উঁকি দিয়ে আক, তাঁরা কেউ খাননি, শিবানী আর মায়া দুজনেই আম মুড়ি কলা দুধে হাপুস-হুপুস ফলার খাচ্ছে।

মাথা ঠিক থাকে?

তিনি বলেছিলেন, তোমরা কি মানুষ না!

শিবানী এককদম এগিয়ে গেল। বলল, খেলে কী হয়? তোমরা খাও না!

শিবানী এতটাই মাথায় চেপে বসেছিল যে ঝড়েশ্বর আর ধৈর্য রাখতে পারেননি। শিবানী তার খুশিমতো কাজ করত। অথবা মায়া যা বলত, এমনও হয়েছিল শেষদিকে, তিনি শিবানীকে কিছু বলতে সাহসই পেতেন না। মায়াকেই বলতে হত, শিবানীকে বল তো, দু-প্যাকেট সিগারেট এনে যেন রেখে দেয়। শিবানী সঙ্গে সঙ্গে চলে যেত।

লোকজন সকাল থেকেই বাড়িতে ঢুকছে। তাদেরও চা দিতে হয়। শিবানীই এনে দেয়। তারপর সেও এককাপ চা নিয়ে বসে যায়। তখন ডাকলে এক কথা, দাদু চা খাচ্ছি। চাও একটু নিশ্চিন্তে খেতে পারব না! এক দণ্ড বসতে দাও না। কী বাড়িরে বাবা!

যাঁর মারফতে শিবানীকে এনেছিলেন, তাকে ডেকে পাঠালেন।

সে এসে বলল, ভাই গোকুল আমাকে রক্ষা করো।

কী হল!

কিছুই হয়নি। এই শিবানী, তোর ফ্রক প্যান্ট ব্যাগে ভরে নে। এই নে তোর এ মাসের টাকা। গোকুল তোকে দিয়ে আসবে।

গোকুলদার দরকার হবে না। আমি একাই যেতে পারব।

তুই বাড়ি যা। গোকুল দিয়ে আসুক। তারপর বাড়ি থেকে একা খুশিমতো বের হবি, ঢুকবি। আমার দায় থাকবে না। তোর বাবাকে দেখা করতে বলবি।

গোকুলের এক কথা, কী করেছে দাদা!

কী করেছে!

তোমার মাসিকে ডাক্তার দেখাতে গেছি। ফিরে দেখি, মায়া নেই, শিবানী নেই। সদরে তালা দেওয়া।

মানে!

মানে আর কি! তিনি মায়ার সঙ্গে বের হয়েছিলেন পান খেতে। আজকাল একা একা বের হওয়া স্বভাবে দাঁড়িয়ে গেছে।

কোথায় গেল! কাউকে কিছু বলে যাবে না। কিছু হলে তো আমাকেই ধরবে। দেখি তিনি পান চিবুতে চিবুতে ফিরছেন। ধমক দিতেই, অ মা এ কি কথা গ। আমি কি হারিয়ে গেছি! তুমি আমাকে বকছ। তোমাদের দেরি দেখেই তো এগিয়ে দেখছিলাম, ফিরছ কি না। একা এত বড়ো বাড়িতে থাকা যায়, বল!

তিনি নিজেই হতভম্ব। এই সব জটিলতায় এক সময় ঝড়েশ্বর ঠিক করে ফেললেন, না আর রাখা যাবে না। মাঝে মাঝে ভয়ও দেখাতেন, তোর বাবাকে ডেকে পাঠাব। তোকে আর রাখা যাবে না। ছাড়িয়ে দেব।

দাও না। আমার কি কাজের অভাব!

শিবানীর বেলাতেও তার বাবাকে ঝড়েশ্বর বলেছিলেন, নিজের মতো থাকলে, ওর ভালোই হবে। আমরা দুজন, আরও একজন থাকলে বাড়িটা প্রাণ পায়। ভালো হয়ে থাকলে, ওর বিয়ের জন্য তোমাকে ভাবতে হবে না।

এজন্য শিবানীকে, নানা লতাপাতা আঁকা ফ্রক, প্যান্ট কিনে দিয়েছেন। তিনতলার একটি পুরো ঘর ছেড়ে দিয়েছেন—ড্রেসিং টেবিল, আয়না, একটা ক্যাম্পখাট, কাফুই স্নো-পাউডার কিছুই বাদ দেননি। লতাপাতা আঁকা একটা টিনের সুটকেসও কিনে দিয়েছিলেন।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত রাখা গেল না।

একমাত্র মায়াকে তাড়ালে যদি হত, কারণ মায়া এবং নিভা, দুজনেই জানে, বাড়িতে সবাই থাকতে—তাদের মাইনে, জলখাবার, পুজোয় শাড়ি, নতুন বছরকার শাড়ি সব ঠিক হয়ে আছে।

পুত্ররা বাবা-মার অসুবিধে হবে ভেবেই, যা দেওয়ার তারাই দেয়। মাইনে, পুজোয় শাড়ি, অসুখে-বিসুখে ওষুধ, পুজোর বখশিস—সব। মা-বাবার প্রতি তাদের গুরুদায়িত্ব এভাবেই পালন করছে। কাজেই তিনি ইচ্ছে করলেই বলতে পারেন না, না দরকার নেই!

তখন এক কথা।

আপনি কে?

মাইনে দেয় বাবুরা।

তারাই বলবে, যাব কি থাকব।

ঝড়েশ্বর অবশ্য বলতে পারেন, দ্যাখ বাবা, এত অপচয় আমার সহ্য হয় না। আমি গরিব বাবার ছেলে, তোমরা যে কাজ করছ, তার মাইনে যে মাত্রাতিরিক্ত তোমরাও বোঝ, আমিও বুঝি। বাড়ি ছাড়া বাড়ি না হয়ে যায়, তাই পুত্ররা বাড়িটার তদারকিতে তোমাদের রেখে গেছে। দোতলা, তিনতলায় অর্ধেকটাই এখন তালা দেওয়া। যার যার এলাকা, তালা দিয়ে রেখে গেছে। কারও দুটো ঘর, কারও তিনটে ঘর, বাথরুম, বারান্দা, খাট, ড্রেসিং টেবিল, আলমারি সবই রয়েছে। মাসে দু-মাসে তারা এলে, সব সাফসোফ হয়। না থাকলে, না এলে, ঘরগুলি সাফ হয় না, মাইনে ঠিকই আছে, বারন্দায় ঝাঁট পড়ে না— মাইনে ঠিকই আছে, মোছামুছির বালাইও থাকে না। এখনও দোতলা এবং তিনতলায় মিলে চার-পাঁচটা ঘরে ন্যাতাই পড়ে না। মাইনে তো অর্ধেক হয়ে যাওয়ার কথা। আর রান্নাঘরটা তো লঙ্গরখানা, খুশিমতো খাওয়াদাওয়া। ভালোমন্দ তোমরা আগে খাও, আমরা পড়ে থাকলে খাই। কাজেই ঝড়েশ্বর বোঝেন, তাঁর মাথা গরম হলে সবাইকে তিনি ঝেঁটিয়ে বিদায় করতে পারেন। এখন আর এক বাই উঠেছে ছোটপুত্রের—একজন চব্বিশ ঘন্টার লোক না হলে চলছে না। মাঝে আয়ার বন্দোবস্তও হয়েছিল, মাসচারেক ছিলও, তবে শুধু খাওয়া আর ঘুম, এবং মশারি টাঙানো ছাড়া, অথবা টেবিলে তাঁদের ভাত, ডাল, মাছ, সবজি সাজিয়ে দেওয়া ছাড়া কাজও বিশেষ ছিল না।

তিনি রাজি ছিলেন না।

কী দরকার, চব্বিশ ঘন্টার লোকের!

তোমাদের বয়েস হয়েছে। বাজারে গেলেই লোকের দরকার। একা কোথাও বের হওয়া ঠিক না। কখন কী হবে, খবর কে দেয়! বড়ো দুশ্চিন্তায় থাকতে হয়। রোজ ছুটেও আসতে পারি না। টেনশন। কেউ থাকলে কিছুটা নিরাপত্তা থাকে। বোঝ না। ছোটোপুত্রই আয়ার ব্যবস্থা করে যাওয়ার সময় বলেছিল, পেছনে লেগে থেক না।

রাত আটটায় আসত। সকালে বাজার করে ফিরত তার সঙ্গে। তারপর ছুটি। রাতে খেত, সকালেও একপেট খেত। সারাদিন বোধহয় আর না খেলেও চলত। সঙ্গে রোজ পঞ্চাশ টাকা।

ঝড়েশ্বরের গা জ্বালা করত। এত পরিশ্রমের উপার্জনে, শুধু শুয়ে-বসে ভাগ বসাবে।

এক দুপুরে ফোন।

হ্যালো, হ্যাঁ আমি বলছি। কাল থেকে আসতে বারণ করেছি।

বাবা আপনারা দুজনে একা বাড়িটায় থাকবেন! মার শরীর ভালো না।

সারাটা দিন তো একাই থাকি। একাই বা বলছ কেন, তোমার মা কি সংসারে একেবারেই বাতিল হয়ে গেল! তিনি তো আছেন। সারাদিন একদণ্ড শান্তিতে থাকতে দেন না। বউমারা তোমাদের ফুঁসলে-ফাঁসলে নিয়ে গেছে, এই এক অভিযোগ। আমার ব্যক্তিত্বের অভাব কাউকে কিছু বলি না, তা না হলে সাহস হয় কী করে, আলাদা ফ্ল্যাট কেনার। আমরা কেউ না!

তিনি ফের বলেছিলেন, রান্নার মেয়েটা তো বারোটার আগে যায় না। কখনো একটা। আমাদের খাইয়ে সে যায়। নিজেও খায়। যত বেলা বেশি হয়, তত তার ক্ষুধা বাড়ে। তার তো সকালে শুধু রুচি-চা খাবার কথা ছিল। ঠিকা মেয়েটাও সঙ্গে বসে যায়। আমি দেখেও দেখি না—আরে বাজারটা তো আমাকেই করতে হয়? লোক বাড়লে কাজ বাড়ে বোঝ না! তোমার মা তো সারাদিন কখনো বাইরের দরজায়, কখনো ভাঁড়ারে তালা দিয়ে বেড়ায়। তারপর চাবি কোথায় রাখে মনে রাখতে পারে না, সারাদিন তারও কাজ মেলা। চাবি খুঁজতে খুঁজতেই তার বেলা যায়।

না বাবা, এভাবে হয় না। এভাবে আপনাদের ফেলে রাখা যাবে না। আপনারা বরং আমার এখানে চলে আসুন। কী হবে বাড়ি দিয়ে! আপনিই তো বলেছেন, বাড়িতে থাকা কঠিন। লোক বাড়ছে, বাড়ি হচ্ছে, উৎপাত বাড়ছে, আপনার প্রতিষ্ঠায়, প্রতিবেশীদের কেউ কেউ ঈর্ষাকাতর। কী দরকার ওখানে থেকে!

তা দিনকাল ভালো না, তিনিও জানেন। বাড়িটা বিক্রি করে দেওয়ারও চেষ্টা করেছেন। কিন্তু এত সস্তায় কে দেয়! এত বড়ো বাড়ি বিশ-বাইশ লাখ টাকার কমে করা যায় না। বাড়িটারও খামতি আছে—জমির পাট্টা নেই। কো-অপারেটিভের নামে তার এক সময়ের প্রিয়জন, এভাবে ঠকাবে বিন্দুমাত্র বুঝতে পারেননি। বাড়ির ছাদ ঢালাইয়ের পর জানতে পারেন, কো-অপারেটিভের সরকারি স্বীকৃতিই নেই। তবু মাথা গোঁজার ঠাঁই, সবাইকে নিয়ে এক ছাদের তলায় থাকার স্পৃহাতেই এত বড়ো বাড়িটা করেছিলেন। নিজের রক্ত-মাংস দিয়ে গড়া যেন বাড়িটা। সেগুন কাঠের দরজা, দামি মোজাইক টাইলসের মেঝে, বাজারের সেরা ইট, নিজে দাঁড়িয়ে থেকে কাজের ফাঁকে ফাঁকে—এই বাড়ি নিয়ে-কেমন এক নেশায় পড়ে গেছিলেন। এখন সেই বাড়িটাই তাঁর কাছে উপদ্রবের সামিল। তার ওপর ছোটোপুত্রের বায়না, তোমরা এখানে চলে এস।

বললেই যাওয়া যায় না। তারও স্বাধীনতা আছে। নিরুর স্বাধীনতা আছে। পুত্রদের কারও ফ্ল্যাটে উঠে যাওয়ার অর্থই ব্যক্তিস্বাধীনতা খর্ব করা। নিরু রাজি হবে না কিছুতেই।

বাড়িটা বিক্রি করে একটা ফ্ল্যাট কিনতে পারলেও হত। এমন ভাবলেই বুক চিরে যেন রক্ত নির্গত হতে থাকে। এত শখের এত পরিশ্রমের বাড়ি, বললেই কি বিক্রি করা যায়!

বাড়িটাকে ঘিরে সন্ত্রাসেরও শেষ নেই। পুত্ররা চায় না, বাড়িটায় তিনি একা নিরুকে নিয়ে থাকেন। অন্তত কেউ পাশে থাকুন।

এ সব ভাবতে ভাবতেই তাঁর কেন যে মনে হল, পুত্রটি যা নাছোড়বান্দা, ঠিক তুলে নিয়ে যাবে।

তিনি বলেছিলেন, আমি খুঁজছি। তোমার মাও খোঁজ করছেন।

এই খোঁজাখুঁজির ঠেলাতেই শেষবেলায় ফুলি হাজির। শিবানীকে দিয়ে হল না, যদি ফুলিকে দিয়ে হয়। অন্তত সারাদিন তারা ছাড়াও কেউ একজন থাকবে। তাঁদের প্রতি থাকতে থাকতে ফুলির মায়া গড়ে উঠবে। এ বাড়িতে বসবাসের ফের আকর্ষণ গড়ে উঠবে।

তখনই নিরু এসে বলল—কী ঝামেলা বল তো?

কী হয়েছে?

ফুলি বাথরুমে ঢুকতে চাইছে না। দরজা বন্ধ করলেই চেঁচামেচি শুরু করে দিচ্ছে।

কেন! তুমি ওকে বকেছ!

বকব কেন! ওর নোংরা ফ্রক ধুয়ে চানটান করে নিতে বলছি। বিসুনের ধোওয়া ফ্রক প্যান্টি বের করে দিয়েছি। কী নোংরা সব। গায়ে পলেস্তারা পড়ে গেছে।

তুমি পারবে না। একদিনের ঘষামাজার কাজ না। নিভা চলে গেছে? না আছে। কলপাড়ে বাসন মাজছে।

সকালে নিভার কাজ সব ঘর-বারান্দা ঝাড় দেওয়া, মোছা। তারপর এ-বাড়ি সে-বাড়ির কাজ সেরে ফিরে এসে চা-ও খায়, চপাটিও খায়। কলপাড়ে বসে বাসনও মাজে। বেল, আটটা না বাজলে এ বাড়িতে চা-জলখাবার খাওয়া যায় না। তার কাজের চেয়ে জলযোগের লোভ বেশি। বাসন-কোসন মেজে রান্নাঘরে কতক্ষণে পা ছড়িয়ে বসবে, স্টিলের গ্লাসে এক গেলাস উত্তপ্ত চা আঁচলে চেপে খাবে, রুটি আলুর ছেঁচকি খাবে। খাওয়ার কথা নেই, তবু খায়। কে খাবে বাবুর? তারা খায় বলে সংসার সচল বায়ুর বোঝা উচিত। মায়াও আছে, নিভাকে হাতে রাখতে না পারলে, চাল, ডাল, তেল, নুন সরানো কঠিন—নিভারও বায়নার অন্ত নেই—

কী হচ্ছে?

ফুলকপির ডালনা।

দাও তো দেখি, কীরকম রাঁধলে?

মায়া অক্লেশে হাতায় তুলে দেয়।

কী বসিয়েছ!

চাউমিন।

দাও তো—

অক্লেশে চাউমিন দিলে, নিভার সতর্ক নজর।

সস দাও একটু। বেশি সুযোগ পেলে ডিমের ওমলেট। বাবু-বিবি দোতলার ঘরে। সারা সকাল কাগজ আর কলম—কী যে লেখেন? না হয় পড়েন। আর টিউশিনি। দুজন থাকলে সুযোগ বেশি, তৃতীয় কেউ থাকলেই ঝামেলা, তার আর মায়ার আনতে চললেই হয়ে গেল। তৃতীয় জন থাকতে থাকতেই বুঝে যায়, এ বাড়িতে এ-দুজনের মৌরুসিপাট্টা।

লপ্তে লপ্তে কাজ, লপ্তে লপ্তে টাকা।

ঠাকুরের বাসন, পঞ্চাশ টাকা।

রান্নাঘরের এঁটো বাসন, একশো টাকা।

নালায় দু-বালতি জল ঢেলে দেয় তারজন্য পঞ্চাশ টাকা। জামাকাপড় কাচা—একশো টাকা, এত বড়ো বাড়ির ঘর-বারান্দা মোছা—তিনশো টাকা।

মায়া সকালে রান্না করে খাওয়ায় টেবিলে সাজিয়ে রেখে যায়। ঝড়েশ্বর চান করে বের হলে, নিরু পুজোর ঘর থেকে নেমে আসে। খেতে দেয়। তারপর বাকিটা ফ্রিজে ঢুকিয়ে রেখে দেয়। সাঁজবেলায় আবার মায়া আসে, ফ্রিজের খাবার গরম করে ফাঁক বুঝে এটা-ওটা খেয়ে যায়। কিছু নিয়েও যায়। যেতে-আসতে হাতে তার একটি পলিথিনের ব্যাগ ঝুলবেই। সকালে-সন্ধ্যায় তার আসল কাজ—নিয়ে যাওয়া। দিনরাতের কেউ না থাকলে হচ্ছে না, ছোটোপুত্র খরচের বহর দেখেই টের পায়।

দিন-রাতের বয়স্ক মহিলা রাখারও চেষ্টা করেছেন ঝড়েশ্বর। তবে রাখতে পারেননি।

এল একা। মাস যেতে না যেতেই মাইনে হাতে পড়তেই দেশে না গেলে চলছে না। সপ্তাহ কাটিয়ে একা এল না। সঙ্গে কচাকে নিয়ে এল।

কোথায় রেখে আসব বলুন! কেউ রাখতে চায় না। মরদ আমার নতুন বউ নিয়ে কোথায় ভেগে গেছে।

বাবুর শিরেসংক্রান্তি। নিয়ে গেলে ফেলতে পারবে না বাবু। এই ভরসা বউটির। তিনি যে কী বলেন! কিন্তু ঝড়েশ্বর বোঝেন, এক মাসেই সংসারের হাল বুঝে গেছে বউটি। হাতের কাছে কেউ না থাকলে বাবু-বিবি নাচার। নাও এবারে ঠ্যালা সামলাও। কিন্তু

ঝাড়েশ্বর বোঝেন, বাড়িটার অপচয়ের বহর টের পেয়েই সঙ্গে পুত্রটিকে নিয়ে আসতে সাহস পেয়েছে। ছাড়িয়ে দিলে লোক পাবেন কোথায়! লোক পাওয়া সোজা!

কিন্তু ঝড়েশ্বর যে একগুঁয়ে এটাই বোধহয় দিন-রাতের মহিলাটির জানা ছিল না।

হবে না।

কী হবে না?

তোমার থাকা হবে না।

কেন?

আমার দরকার নেই। কার কাছে রেখে আসব বলুন! বাড়ির এক কোনায় পড়ে থাকবে। কোনো উৎপাত করবে না।

না, আমি রাখব না।

কে করবে কাজ?

নিজেই করে নেব?

কিন্তু যায় না, বাড়ি ছেড়ে যেতে চায় না। তারপর অগত্যা পুলিসের ভয় দেখাতেই তিনি নিষ্ক্রান্ত হলেন।

তারপর এল শঙ্করী। মাস যেতে না যেতেই স্বামী এসে হাজির। টাকা নিতে এসেছে—ভালো। টাকা দিলেন, সেদিন গেল না। পরদিনও গেল না। তিনতলার ঘরটায় শুয়ে-বসে থাকে—আর কীর্তন গায়।

কী হল শঙ্করী! তোমার বরের যে নড়ার নাম নেই। মাঝে মাঝে কীর্তনও গায়। বাড়িটা যে পীঠস্থান হয়ে যাবে দেখছি।

আজই যাবে। আমার গোঁসাই বেশিদিন কারও বাড়িতে থাকে না। গেল ঠিক, মাস শেষ হলে আবার চলেও এল। ঝড়েশ্বরের ছোটোপুত্রের এক কথা, মেয়েটা বাবা বিশ্বাসী। বর এসে দু-চার দিন থেকে যায় তো কী হয়েছে! থাকুক না। তোমার তো কথা বলারও লোক নেই। বিশ্বাসী লোক পাবে কোথায়। কথা বলার লোক পাবে কোথায়?

তারপরের মাসে এল, যাওয়ার আর নাম করছে না।

ছোটোপুত্রকে না জানিয়েই বললেন, শঙ্করী এই নাও টাকাপয়সা। অন্য কোথাও ঠিক কাজ পেয়ে যাবে। সেখানে গিয়ে বরকে নিয়ে থাক। আমার অসুবিধা হচ্ছে। সেখানে গিয়ে যত কেত্তন গাও, মচ্ছব বসাও, আমার কিছু বলার নেই। আমি রাখতে পারব না।

নিরুরও এক কথা, বিশ্বাসী লোক পাওয়া দুষ্কর। বর আসে, থাকে খায়, তোমার কী? বর আসবে না। ও বেচারারই বা দোষ কোথায়। শরীর বলে কথা।

ঝড়েশ্বরের এক কথা, থাকবে না বলেছি, থাকবে না। বর না কে দেখগে!

অগত্যা শঙ্করী রফায় এসেছিল।

মাসে বাবু দু-দিন।

দু-দিনে হয়ে যাবে?

তা হয়ে যাবে বাবু। আমরা গরিব মানুষ, দু-দিনই পাই কোথায়!

বর থাকে কোথায়? কাজে ঢোকার সময় তো বলেছিলে সংসারে কোনো পিছুটান নেই। দুই মেয়ে বিয়ে হয়ে গেছে, পুত্রটি তোমার রাজের কাজ করে।

মিছে কথা বলি না বাবু। স্বোয়ামিও নাই। একা মানুষ। এই লোকটাই তো বুদ্ধি দিল, তোর গতর আছে, খেটে খাগে। তোর ঝুপড়ি পাহারা দেব। ব্যাংকে পাসবই করে দেব। বাবুর বাড়িতে খরচ নাই। খাবি থাকবি ব্যাংকে টাকা জমাবি।

তোমার গতর আছে, অন্য লোকে বুঝে ফেলল, তুমি বুঝতে পারনি।

কী করে পারব কন! লোকটা ঝুপড়িতে উঠে না এলে বুঝতেই পারতাম না। বর্ডার পার হয়ে চইলে এল, গাঁয়ের মেয়ে আমি, ছেলেমেয়েরা উড়ে গেছে। পরান খা-খা করে। ভাদু দাদার পরামর্শ, ঘরে বসে থাকিস না পোকায় কাটবে গতর। সকালে এল, ফকটে খেল। তারপর বারান্দায় বসে নীলময় প্রভুর গান জুড়ে দিল। মনে হল লোকটা থেকে গেলে মন্দ হয় না। গরিব মেয়েছেলের কেউ না থাকলে যে বড়ো সমস্যে বাবু। আমার পিছুটান থাকলে কাজে জুড়ে যাই, বলেন।

ঝড়েশ্বরের সহসা মনে হয়েছিল, এই তার দোষ। কাজের লোকের কাছে তিনি ইজ্জত রাখতে পারেন না। এত কথা এত ব্যাখ্যা তাঁর চাওয়া ঠিক হয়নি। চাপে পড়ে শঙ্করী সোজাসুজি বলেই দিল, স্বোয়ামী থাকলে, পোলাপান থাকলে পিছুটান থাকে বাবু। আমার কিছুই নেই। ভাদু দাদা পালাগান গায়, গলায় কণ্ঠি, সাচ্চা মানুষ। দু-চারদিন থাকে দু-চারদিন উড়ে বেড়ায়। পালাগান করতে কোথায় কোথায় চলে যায়। মাস মাইনের সময় আসে। টাকা নিয়ে যায়। ব্যাংকে জমা রাখে!

ব্যাংকের বই আছে তোমার? লেখাপড়া জান?

আজ্ঞে না।

নিয়ে আসবে। দেখব কত জমেছে।

ভাদু দাদা বড়সাধু মানুষ বাবু। ঠাকুর দেবতা নিয়ে কারবার। টাকাপয়সা চিনে না। খেতে পেলেই খুশি।

ঝড়েশ্বর ভাবলেন, তা খেতে পেলেই খুশি। অন্ন কিংবা শরীর। লোকটি শঙ্করীর আসলে রক্ষিতা, রক্ষিতা হয় কী করে, বরং রক্ষিতই বলা চলে। তিনি না বলে পারেননি, মেয়ে-জামাইরা আপত্তি করে না? লায়েক পুত্র আপত্তি করে না?

না গ বাবু, কে দেখে! একটা যখন লোক পাওয়া গেছে, গার্জিয়ানের মতো আছে, আপত্তির কথা উঠেই না।

ঠিক আছে, আট-দশ মাস তো হয়ে গেল। কত জমেছে আমাকে এসে দেখাবে। তারপর কী ভেবে ঝড়েশ্বর বলেছেন, কত জমেছে বলতে পার।

নিরুর তখন কী ক্ষোভ!

ঝড়েশ্বর পড়ে যেতেন বিপাকে।

নিরুর সেই এক কথা, তোমার কোনো অসুবিধা হচ্ছে?

শঙ্করীর পেছনে এত লাগলে হয়! তার টাকাপয়সা কী জমছে না জমছে, তুমি দেখার কে? তারটা সে বুঝবে।

না, ভাবছি যদি ঠকায়।

ঠকালে ঠকবে। তার বিশ্বাসের দাম দেবে না! এত পেছনে লাগলে কেউ থাকে! এমন জেরা শুরু করলে, সে বেচারা ফাঁপরে পড়ে সব গড় গড় করে বলে গেল। বোঝ না শঙ্করী কত সোজাসরল মানুষ। না হলে বলে, মাসে তার দু-দিন হলেই চলবে! লোকটা তোমার এখানে এসে যে ওঠে, কখনো মনে হয় খিচকে হারামজাদা? তোমাকে বাবু বলে না, কর্তাবাবুও না, সোজা তোমাকে বাবা সম্বোধন। প্রভু গৌরহরি বলে পায়ে তোমার গড়িয়ে পড়ে। এত সুবন্দোবস্ত আছে বাড়িতে— তিনতলায় ফাঁকা ঘর, ফ্যান-লাইট, করিডর পার হলে বাথরুম, অপর্যাপ্ত জল, সে যে এখানে এসে উঠতে চায়, বোঝ না? বাবা বললে তো গলে যাও! তা ভাদু তোমাদের দিকে চালের দর কত? গ্রাম জায়গায় তরিতরকারি মেলা—

আর যায় কোথায়।

বাবা লাউটা গাছের। আপনের সেবায় লাগুক।

বাবা মাচানের শিম। আপনার সেবায় লাগুক।

বাবা, বাজারে ভালো মানচুক উঠল। আপনার সেবায় না লাগলে খেয়েও সুখ নাই।

তুমি তো বিগলিত। আর ভাদু, চলে গেলেই, সোজাসরল বউটাকে নিয়ে পড়। শঙ্করী, আমার বাড়িতে এসব চলবে না। চলে যাও। তোমাকে রাখব না। পিছুটান নেই, এই তোমার পিছুটান না-থাকা! শঙ্করী প্রাইভেসি পর্যন্ত থাকল না! তুমি কী!

শঙ্করীরও রেহাই নেই।

কী হল? বাড়ি যাও। ঝড়েশ্বরের এক কথা।

আপনাদের চলবে কী করে?

এক-দুদিন চালিয়ে নিতে অসুবিধা হবে না।

শঙ্করী না বলে পারল না, মাসিমার শরীর ভালো না।

সে তোমায় ভাবতে হবে না। ভাদুকে বলবে, বাবু আমার পাসবইটা দেখতে চেয়েছে। নিয়ে যেতে বলেছে।

শঙ্করীও মুখঝামটা না দিয়ে পারেনি।— আমার গোঁসাই রে আপনে সন্দ করেন বাবু। ঠাকুর-দেবতা ছাড়া লোকটা কিছু বোঝে না। পালাগানে একবার গেলে বুঝতে পারতেন, কেষ্ট কীর্তন পালা, গলায় গেঁদাফুলের মালা কপালে তিলক, নাকি তিলক, দু-হাত তুলে দোহারিরা চারপাশে ঘোরে, হারমানিয়াম বাজে। খোল-করতাল বাজে আর সমস্বরে গান, হরে কৃষ্ণ হরে রাম, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে তার পরেই গোঁসাইর খাম্বাজ গলা, কহিলা যদুপতি, আমার বালগোপাল যায় ধেনু লইয়া, মথুরায়... । আর মানুষের দু-চোখ বহে যায় অশ্রুতে। আপনে গেলেও আসর সেরে উঠে আসতে পারবেন না। আর পয়সার পুষ্পবৃষ্টি, সিকি, আধুলি, টাকা—কী নেই! পয়সার অভাব আছে তার?

আসলে ঝড়েশ্বরেরও গোঁ কম না। মাথায় কিছু ঢুকলে তা নড়তে চায় না। শঙ্করীর টাকাপয়সা থাকল কি গেল, কে ঠকাল শঙ্করীকে তাঁর দেখার কথাই না। কিন্তু ওই যে রোখ, রোখ চেপে গেলে যা হয়, শঙ্করী বিনি মাগনায় পয়সা পায় না। বাড়িটায় সারাদিন বেজায় খাটে, খাটে বলেই টাকাটা দিতে ঝড়েশ্বরের গায়ে লাগে না, তাই বলে মেয়েটার ঘাড়ে বসে খাবে! আর শরীরে রোখ চেপে গেলে দশক্রোস হেঁটে চলে আসবে! দু-দিনের অনুমতি এমনিতেই আছে, তিনতলার ফাঁকা ঘরটায় খাটিয়া পাতা থাকেই, বয়স হয়েছে বলে, ঝড়েশ্বর কিংবা নিরু কেউ ওপরে প্রায় ওঠেই না, সিঁড়ি ভাঙলেই হাঁপ ধরে, এমন সুবর্ণ সুযোগ ভাদু ছাড়ে! মাঝে মাঝে সাড়াও পাওয়া যায়, এই শঙ্করী কোথায় গেলে? আরে সাড়া দিচ্ছ না কেন? ঝড়েশ্বর ওপরেও উঠতে পারেন— গিয়ে কী দেখবেন, যদি দেখেন মথিত হচ্ছে, তবে আর এক কেলেঙ্কারী। ধরা পড়ে গেলে শঙ্করীর মাথা হেঁট হয়ে যাবে— তাঁকে মুখ দেখাতে পারবে না, লজ্জায় কাম-কাজ ছেড়ে পালালেই নিরুর চোপা শুরু হয়ে যাবে।

কে বলেছিল অসময়ে ওপরে যেতে। বাড়িটায় এটুকু প্রাণের সাড়াও তুমি সহ্য করতে পার না। কেউ থাকে। পালাবে না। তোমার ঘটে এটুকু এলেমও নেই। দুপুরের খাওয়াদাওয়া শেষ, ওরা দিবানিদ্রা দিচ্ছে— আর তুমি গিয়ে সেখানে হাজির হলে। তোমার কোনো কাণ্ডজ্ঞান আছে! তার পাসবই গেল কি থাকল, তোমার কী? শঙ্করী তো কচি খুকি না! সে তার নিজের ভালোমন্দ না বুঝলে তোমরা কী? তার গোঁসাই তারে মারে কি রাখে, সে বুঝবে।

ঝড়েশ্বর চুপচাপ শোনেন, কোনো মন্তব্য করেন না। মন্তব্য করলেই নিরুর চোপা শুরু হয়ে যাবে। তবু কী যে হয় তার, একটা দামড়া বাড়িটায় যখন-তখন ঢুকে যাবে, রাত্রিবাস করবে, ভালোমন্দ খাবে, শত হলেও গোঁসাই সে শঙ্করীর। সে এলে শঙ্করী নানা অজুহাতে একটু বেশি বেশিই নানা কিশিমের পদ তৈরি করে—

বাবু, দুধ জমে গেছে। আপনাদের জন্য পায়েশ করে রাখি।

রাখ।

দুধ জমে গেছে, ক্ষীর করে রাখি?

রাখ।

সন্দেশ করে রাখি।

রাখ।

বাজারে যাচ্ছেন, ভালো ইলিশ যদি পান। মাসিমা বলছিল, এ-বাজারে ভালো মাছ পাওয়া যায় না। বাগুইহাটির বাজারে গেলে পাবেন! পদ্মার ইলিশের ছড়াছড়ি।

গোঁসাই এলেই এটা শঙ্করীর বেশি হত।

সব তিনি চোখ বুজে সহ্য করেন। মেয়েটার হাতটান নেই। চুরি করে খায় না। দীক্ষা নিয়েছে গুরুর কাছে—মাগগিগণ্ডার বাজারে এমন কাজের লোক পাওয়া সত্যি কঠিন— নিরুকে কুটোগাছটি নাড়তে দেয় না, নিরু বাথরুমে ঢুকলেই শঙ্করীর এক কথা—মাসিমা ছাড়া কাপড় কাচতে যাবেন না। আমি আছি কী করতে মাসিমা, আমি তো মরে যাইনি।

ঝড়েশ্বর জানেন, পাসবই নিয়ে লড়ালড়ি করতে গিয়ে শঙ্করী যদি হাতছাড়া হয়ে যায়, তবে তাঁর রক্ষা নেই। তিনি শুধু দেখতে চান, টাকা ঠিকমত তার জমা পড়ছে কিনা। শঙ্করীর রক্ত জল করা পয়সা কেউ না আবার মেরে দেয়।

তার তো কোনো খরচ নেই।

শাড়ি সায়া ব্লাউজ যা লাগে দেন।

কাচাকাচির সার্ফও দেন। শঙ্করীর আলাদা সার্ফ, আলাদা সাবান।

অসুখ-বিসুখে ডাক্তার, ওষুধ—সব কিছুরই ব্যবস্থা আছে। ভবিষ্যতে তার কষ্ট না হয়। শরীর তো, কখন পড়ে যাবে—বুড়ে হলে খাওয়াবে কে? কিছু টাকাপয়সা ব্যাঙ্কে থাকলে সেই লোভে পুত্র-কন্যারা শেষ সময়ে মুখে গঙ্গাজলটুকু অন্তত দেবে। এতসব চিন্তা থেকেই, তিনি শঙ্করীর পাসবই দেখতে চাইছেন।

শঙ্করীর বছর চল্লিশও বয়েস হবে না। মুখে শ্রী আছে। খুবই মজবুত গঠন। তার প্রথম সন্তান পুত্র। পনেরো বছর বয়সেই আঁতুড় শুরু। তারপর বছর পার না হতে মেয়ে, তারপর আবার বছর পার না হতে আর একটি মেয়ে, শেষে হেলথ সেন্টার থেকে নাড়ি কাটিয়ে এখন একেবার ঝাড়া হাত-পা। ওতেও শানাচ্ছিল না, বছরখানেক আগে দীক্ষাও হয়ে গেছে। শঙ্করী থাকলে বাড়িটাতে প্রাণের সাড়া থাকে তাও তিনি টের পান, সরলসোজা হলে যা হয়! কথায় কথায় হেসে গড়িয়ে পড়ত। ডাক খোঁজে খুবই আন্তরিক।

সেই মেয়েটার শেষে কিনা পাসবই নিয়ে মরণ হল।

ঝড়েশ্বর এখনও শঙ্করীর জন্য কষ্ট পান।

তার টাকাপয়সা ব্যাঙ্কে জমা হচ্ছে কি হচ্ছে না, তাঁর কী দায়! নিরু বলত, তোমার এই পরোপকারী ভাবটা ছাড়। তোমার বাড়িতে কেউ থাকে!

শঙ্করী বাবুর তাড়াও সহ্য করতে পারছিল না।

কী হল শঙ্করী, বাড়ি যাও।

যাব।

যাব বললে তো আর হয় না, যেহে হয়। বাবু আর মাসিমাকে একা ফেলে যায়ই বা কী করে! খুবই ন্যায্য কথা।

ঝড়েশ্বর বলেছিলেন, ঠিক আছে, ভাদু মাসের শেষে আসে। ওকে বল, বাবু পাসবইটা দেখতে চেয়েছে। আবার যখন মাইনে নিতে আসবে, পাসবইটা সঙ্গে যেন আনে।

বলব। বলে বালতিতে ছাড়া কাপড় ভেজাতে বাথরুমে ঢুকে গেছিল।

গোঁসাই মাসের শেষে হাজির।

ঝড়েশ্বরই বলেছিলেন, তোমার সঙ্কোচ যখন শঙ্করী, আমিই না হয় বলব। কত নিয়মকানুনের বালাই থাকে—ভাদু হয়তো লিখতে ভুল করতে পারে, লেখাপড়া কতটা জানে, তাও জানি না। চোর-বাটপাড়ের তো অভাব নেই। ব্যাঙ্কের বাবুরাও খুব সুবিধের লোক হয় না। কোথায় কি গোঁজামিল থাকবে—ভাদু বুঝতেও পারবে না।

বাবু, গোঁসাই এত কথা বললে রাগ করতে পারে। আপনি বরং বুঝিয়ে বললে কথা ফেলতে পারবে না।

সেইমতো গোঁসাই এলে তিনি বলেছিলেন, ভাদু আবার যখন আসবে পাসবইটা সঙ্গে এন।

তা বাবা, আমি ঠিক আনব। আপনি ঠিকই বলেছেন। ভাদু দু-দিনের জায়গায় চার-পাঁচদিন থেকে যাওয়ার সময় বলে গেল পাসবইটা আপনার কাছেই রাখবেন বাবু, আমি বাড়ি থাকি না, শঙ্করীও ঘরছাড়া, তালাবন্ধ ঘরে রাতে ঢুকে কেউ চুরি করে নিলে আমার ধর্ম থাকবে না। আপনি খুবই বিচক্ষণ ব্যক্তি—পাসবইয়ের এত কি আমরা বুঝি!

ঝড়েশ্বর ভেবেছিলেন, যাক, নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। শঙ্করীর কষ্টের উপার্জন, বয়স তো এক জায়গায় থেমে থাকে না, শেষ বয়সের সঞ্চয় বলতে কথা, তাঁর পক্ষে চোখ বুজে থাকাও সম্ভব নয়, শঙ্করীর ভবিষ্যতের কথা ভেবে তিনি উচিত কাজই করেছেন।

ভাদু নিজেও একবাক্যে রাজি।

অসুবিধার আর কিছু থাকল না।

ভাদু ঠিক নিয়ে আসবে!

মাসের শেষে শরীরের রোখ দমনও হয়, হাতে টাকাপয়সাও হয়—ভাদু ঠিক চলে

আসবে।

বরং মাস শেষ হওয়ার অনেক আগেই চলে আসতে পারে।

দিন যায়।

ঝড়েশ্বর ক্যালেন্ডারের খাতা দেখেন।

কিন্তু ভাদু আসে না।

শঙ্করী জানালায় দাঁড়িয়ে থাকে। বড়ো রাস্তার মোড় থেকেই বাড়িটা দেখা যায়। ভাদুর আসার কথা থাকলে, শঙ্করীর শরীরেও যে রোখ চেপে যায় ঝড়েশ্বর ভালোই টের পান।

জানালায় শঙ্করী দাঁড়িয়ে থাকলেই বলতেন, চলে আসবে।

শঙ্করীর খুবই ব্যাকুল কথাবার্তা।

বাবু মাস তো শেষ হয়ে গেল।

আসবে। কত কাজে আটকে যেতে পারে। পালাগান গায় যখন, এক জায়গায় আটকে থাকার পাত্র সে নয়। কোথাও গ্যাছে, দু-চারদিন দেরি হতেই পারে। মচ্ছব থাকলে, তো কথাই নেই। খাওয়ার লোভ ভাদুর বেশি মাত্রাতেই। খাওয়ার লোভে পড়ে গেছে হয়তো।

দিন যায়। ভাদু আর আসে না।

মাস যায়, ভাদু আর আসে না।

দশ ক্রোশ রাস্তা, হাঁটাপথে। বাসটাসের। রাস্তা হলেও না হয় এক কথা ছিল, শঙ্করীর কেমন পাগল পাগল অবস্থা। পরপর দু-মাস বেপাত্তা থাকলে চিন্তা হওয়ারই কথা। শঙ্করী বাবুকে ফেলে যেতেও পারে না। তার খাওয়াদাওয়ায় রুচিও যেন নেই—একদিন সেই পাগল পাগল অবস্থাতেই শঙ্করীর হঠাৎ কী হল। সকালবেলায় চা-জলখাবার দেওয়ার সময় সহসা বলে ফেলল, বাবু আমি ঘুরে আসব। মন মানছে না। দু-চারদিন একটু কষ্ট হবে আপনাদের। আমারও মরণ। মন মানছে না। ঠিকা কাজের মেয়েটা তো আপনার আছে, সে-ই না হয় ডাল-ভাত করে দিয়ে যাবে।

নিরু বলেছিল, যাও। সত্যি তো ভাদুর আক্কেলখানা কি, আসতে পারছিস না, একটা খবর তো দিবি! চিন্তা হয় না। আমরা ঠিক চালিয়ে নিতে পারব। অসুখ-বিসুখ হতে পারে। তুমি বাড়ি থেকে বরং ঘুরেই এস।

শঙ্করী গেল ঠিক, তারও পাত্তা নেই।

যে গেল খুঁজতে, সেও বেপাত্তা।

ঝড়েশ্বর পড়ে গেলেন মহাফাঁপরে।

আবার চব্বিশ ঘন্টার কাজের লোক খোঁজা, পাওয়া যায়, তবে শঙ্করীর মতো বিশ্বাসী মানুষ পাওয়া কঠিন। অগত্যা তিনি নিজেই রওনা হবেন ঠিকঠাক যখন, শঙ্করী নিজেই এসে হাজির। সেই এক পাগল পাগল অবস্থা।

সে এসেই বাবুর পায়ে পড়ে গেল।

কী হয়েছে?

শঙ্করীর এক কথা, বাবু গো, গোঁসাই আমার কোথায় নিখোঁজ হয়ে গেছে।

বল কি! কোথায় যাবে। পাড়া-প্রতিবেশী কেউ জানে না, তোমার ছেলেমেয়েরা কেউ জানে না, কোথায় গেছে?

না গো বাবু, কেউ কিছু বলতে পারে না। ঘর তালাবন্ধই পড়ে আছে। ঘর খুলে খুঁজেছ!

কী খুঁজব?

তোমার পাসবই রেখে গেছে কিনা?

আজ্ঞে মানুষটাই নিখোঁজ, আমার পাসবই দিয়ে কী হবে গো বাবু। আপনি কেন আমার এত বড় সর্বনাশ করলেন গো বাবু। কী দরকার ছিল, পাসবইয়ের কথা বলার! এখন

আমি তাঁরে কোথায় খুঁজে পাই?

ঠিক আছে, স্নানটান করে কিছু খাও। পরে ভেবেচিন্তে কিছু না হয় করা যাবে।

আমার যে খেতে ইচ্ছে করে না। কেবল তারে খুঁজে দেখতে ইচ্ছে করে। কোথায় না গেছি! কীর্তনিয়া ঠাকুর প্রসাদের কাছে গেলাম, কোনো খবরই দিতে পারল না। কত জায়গায় গেলাম, কেউ কিছু জানে না। গোঁসাই কার কীর্তনের পালায় গান গাইত তাও কেউ বলতে পারল না— একটা খবর আছে, দেশের টানে বর্ডার পার হয়ে যদি চলে যায় — আপনাকে খবর না দিলেও নয়, বর্ডার পার হয়ে চলে যাব। গোঁসাই ভেবেছে কী— মন তার উদাস বুঝি। আমি মানুষ না!

ঝড়েশ্বর আর একটাও কথা বললেন না।

তবু ঝড়েশ্বরের যে কী হয়!

শোন।

শঙ্করী মুখে আঁচল চাপা দিয়ে বের হয়ে যাচ্ছিল, ফোঁপানি কিছুতেই কমছে না, বাবু যত নষ্টের গোড়া, পাসবইয়ের পেছনে লেলিয়ে না দিলে, গোঁসাই কখনো দেশান্তরী হত না। ঝড়েশ্বর না বলে পারলেন না, পাসবইটা কি পেলে? সে তো না হয় চলে গেছে। এতগুলি টাকা, ঘরে রেখে গেছে কিনা খোঁজাখুঁজি করলে না! তোমার ছেলেমেয়েদের কাছে যদি রেখে যায়—

না গো বাবু, গোঁসাই তার সুটকেস নিয়ে চলে গেছে। গোঁসাই তো বলেছে, পাসবই সুটকেসে তালা দেওয়া থাকে।

নাও ভালোই হয়েছে। মন খারাপ করে কী হবে? হাতমুখ ধুয়ে কিছু খাও। চেহারা কী করেছ! চোখমুখের দিকে তাকানো যায় না। দেখি পুলিশ তোমার পাসবই যদি উদ্ধার করতে পারে। উজ্জ্বলকে ফোন করে, আসতে বলি।

বাবু গো আপনি আমার আর সর্বনাশ করবেন না গো বাবু! পুলিশে ছুঁলে আঠারো ঘা। আমি নিজেই খুঁজতে বের হব।

তাহলে কি কাজ ছেড়ে দিচ্ছ!

না না। খুঁজে পেলেই চলে আসব। মাসের টাকাটা যদি আগাম দেন।

নিরু দরজায় দাঁড়িয়ে সব শুনছে।

ঝড়েশ্বর স্ত্রীর ওপরই খাপ্পা হয়ে গেলেন।

নাও বোঝ—প্রাণের সাড়া বাড়িটায় কোথায় গেল! তিনি তো চললেন।

শঙ্করী এখুনি কেমন বেপরোয়া হয়ে গেল—আমি যাচ্ছি না গো বাবু। আমাকে ছাড়িয়ে দেবেন না। গোঁসাই আমাকে ফেলে যাবে কোথায়! জায়গা আছে তার। এত মান-অপমান থাকলে হয়! বাবু কি মিছে কথা বলেছে, পাসবই বলতে কথা। ঠক-জোচ্চরের অভাব নেই, বাবু পাসবইটা দেখতেই পারে। সেই রাগে দেশান্তরী! তোমারে সন্দেহ করছে বাবু!

শঙ্করীর এমন সব কাণ্ডে নিরু ফুঁসছে!

দাও বিদেয় করে। ধর আগাম টাকা। খোঁজ গিয়ে তোমার গোঁসাইকে।

গোঁসাইকে খুঁজতে সেই যে গেল আর শঙ্করীও ফিরে এল না। ঝড়েশ্বরও আর খোঁজ নিলেন না। না, চব্বিশ ঘন্টার লোকের আর দরকার নেই এমনও ভেবেছিলেন—নিজের কাজ নিজেরাই করে নেবেন। এত বড়ো বাড়িটায় দুটো জীব একা থাকাও যে কঠিন। লোকজনও আসে দরজা খোলা বন্ধ করার কাজটাও কম না। নিরু শেষ পর্যন্ত আর একটাকে নিয়ে এল—আর কিছু না হোক কেউ এলে, নিভা কিংবা মায়া, যেই আসুক দরজা খুলে দিতে পারবে, কাজ সেরে চলে গেলে দরজা বন্ধও করতে পারবে। এই বয়সে বারবার সিঁড়ি ভেঙে নীচে নামা-ওঠাও কম হ্যাপা না।

রেলগাড়ি ঝিক ঝিক

সে সিঁড়ি ধরে নেমে এল। টিপ টিপ বৃষ্টি, এলোমেলা হাওয়া। জুলাই মাসের আকাশ জল ভরা মেঘে ছেয়ে আছে কদিন থেকে। একটা প্যাঁচপেচে ভাব সবসময়। সে রাস্তায় নেমে বুঝল বর্ষাতিটা না এনে খুব ভুল করেছে। বিকেলের দিকে বৃষ্টি ছিল না। দিনটা আবার ভালো হয়ে যাবে, সে ভেবেছিল। মা বলেছিল, নিয়ে যা। সে গা করেনি। সুন্দর বাসন্তীরঙের শাড়িটা সদ্য কেনা। ওটা পরে সে গানের স্কুলে আসতেই সবাই হাঁ করে তাকিয়েছিল। বন্ধুরা বলেছিল, খুব সুন্দর লাগছে দেখতে। এবং এ-জন্য আজ সব গানেরই ঠিক ঠিক সুর তুলে নিতে পেরেছে। অজিত মাস্টারমশাই দুবার ওকে চুরি করে দেখেছে, এটাও সে টের পেয়েছে। আর রাস্তায় নেমেই মনে হল, সে বড়ো একা। যত বড়ো হয়ে যাচ্ছে, তত অদ্ভুত এক নির্জনতা গড়ে উঠছে ভেতরে। কী যেন নেই। কী থাকলে যেন এত সে নির্জনতাবয় ডুবে যেত না। সে বুঝতে পারে, আসলে বড়ো হওয়া মানেই কোন যুবকের জন্য শুধু অপেক্ষা করে থাকা। কত সুন্দর সব যুবকেরা তার চারপাশে বেহালা বাজিয়ে যাচ্ছে। সে যেন কিছুই শুনছে না। বড়ো অবহেলা অথবা নিদারুণ অন্যমনস্ক সে। সে যখন হাঁটে, চোখ তুলে হাঁটে না। কারণ সে টের পায় যুবকেরা যে যেখানেই থাক ঠিক ঠিক তাকে দেখে যাচ্ছে। সে ভেতরে ভেতরে কতটা বড়ো হয়েছে সবাই বুঝতে পারে বলে লজ্জায় ভালো করে তাকাতে পারে না। এবং এ-সময় সেই ছেলেটার কথা ভেবে সে ফিক করে নিজের মনে হেসে দিল। মাঝে মাঝে বাড়ি ফেরার সময় তার সঙ্গে দেখা হয়। তখন বুকের মধ্যে কেউ যেন নিশব্দে হেঁটে যায়। মনে হয় সে কোন বিকেলে, রাস্তায় দেখা হলে বলবে, আরে আপনি'! কোথায় গেছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে বুকের মধ্যে একটা রেলগাড়ি ঝিক ঝিক শব্দ তুলে চলে গেল।

বৃষ্টিটা বোধ হয় আজ আর থামবে না। সে মাথায় সামান্য আচল টেনে দিল। সর্দির ধাত আছে। পাশের থিয়েটার হলটা পর্যন্ত সে নির্বিঘ্নে হেঁটে এসেছিল। তারপরই অবাক। ঠিক সেই সুন্দর মতো ছেলেটা, হল থেকে বেরিয়ে আসছে। যেন এতক্ষণ ঠিক ওরই অপেক্ষায় এখানে দাঁড়িয়েছিল।

ওর বুকে আবার কে যেন হেঁটে যেতে থাকে। রেলগাড়ি চলতে থাকে। এতটুকু চোখ তুলে তাকায় না। কারণ সে সব কিছু সকলের আগে ঠিকঠাক দেখে নিতে পারে। তাকে

কেউ দেখার আগেই সে তার সব কিছু দেখে ফেলে। সুন্দর মতো ছেলেটা হয়তো জানেই না, তাকে আগেই লক্ষ করেছে। এবং ওর যা আশা এখন, সে হয় তো আজই এমন সুন্দর একটা অপরিচিত জায়গা পেয়ে বলবে, আরে আপনি? কোথায় গেছিলেন?

—গানের স্কুলে।

—কোথায় ওটা।

—ওদিকে।

—আমি তো এক পয়সার পালা দেখে ফিরছি। আপনি দেখেছেন?

—না।

—দেখুন না। ভালো বই।

—কার সঙ্গে দেখব। কে আমাকে নিয়ে আসবে। কেমন অভিমান-অভিমান গলা।

—কেউ বুঝি আপনাকে নিয়ে যায় না কোথাও?

—কে নিয়ে যাবে। বাবা তো কাজ কাজ করে সারাটা দিন অফিসে কাটিয়ে দেয়। বাবা বুঝতেই পারে না, আমার আজকাল কোথাও কেবল যেতে ইচ্ছে করে। মাঝে মাঝে বাড়িটা কী যে এক ঘেয়ে লাগে। নতুনদা এলে অবশ্য বাড়িটা অন্যরকমের হয়ে যায়। অদ্ভুত ছেলে। জানেন, সারাটা দিন আমার পেছনে লেগে থাকে। আচ্ছা আপনাকে আমি যদি বিজু বলে ডাকি।

—তা হলে তো আপনার একজন আছে দেখছি। সে বিজু কথাটার জবাব দিল না।

—ও মা সে তো আমার দাদা। বড়ো মাসির ছেলে।

—অঃ।

সে আরও কিছুটা পথ এগোতেই আবার কেউ যেন তাকে বলল, পাহাড়ে গেছেন কখনো।

—পূজার ছুটিতে যাই। দেওঘর গেছি। ঝাড়গ্রাম গেছি। খুব দূরে গেছি হাজারিবাগে। জানেন আমার বাবাটা খুব ভীতু। বাইরে গিয়ে সব সময় কিছু খোয়া যাবে ভয়ে বড়ো বেশি সতর্ক থাকে। কোনো আনন্দই করা যায় না। একবার রামগড়ে ভারি মজা হয়েছিল, জানেন।

—কেউ ছিল বুঝি সঙ্গে!

—আরে না না। আমি তেমন মেয়েই নই। তবু কি জানেন, আমরা যে হোটেলটায় উঠেছিলাম, তার নীচে দুটো বাউন্ডুলে ছেলে কদিন থেকে খুব মদটদ খেয়ে পড়ে থাকত।

বিকেল হলেই ওরা বের হয়ে যেত গাড়িতে। ঘুরে ফিরে আসতে অনেক রাত করে ফেলত। আমি চুপচাপ বারান্দায় বসে থাকতাম।

—এদের আপনার ভালো লেগে গেছিল।

—একদিন আমাদের তিনজনকে নিয়ে ওরা রাঁচির দিকে রওনা হয়ে গেছিল। ভারি সুন্দর স্বভাব। সেদিন ওরা এত ভালো হয়ে গেছিল, যে বোঝাই যায়নি, ওরা মদো মাতাল। আমারও পাহাড়ে উঠে যাই ওদের সঙ্গে। ফিরি রাত করে। ওরা কখনো বলবে, কি সুন্দর আকাশ। নক্ষত্র উঠলে আমার বলতে ইচ্ছে হত, জীবন এ-ভাবেই বুঝি মানুষের শুরু হয়। আমার কেন জানি নিরিবিলি গাছের ছায়ায় ওদের সঙ্গে কত রকমের কথা বলতে ইচ্ছে হত। তবে কি জানেন, আমি পারি না। ঠিক জমিয়ে গল্প করতে পারি না। ভেতরে কত রকমের ইচ্ছে হয়, সব কী বলা যায়। আর বললে ওরাই কী ভাববে বলুন, দুদিনের পরিচয়ে মানুষ তো আর সব তার খুলে দিতে পারে না। আচ্ছা আপনিই বলুন, পারে?

সুন্দর মতো যুবকটি খুক খুক করে হাসল।

—আপনি হাসছেন।

—আহা একটু দেখে হাঁটুন।

সত্যি সে ভারি অন্যমনস্ক হয়ে গেছিল। যুবকেরা চারপাশে কেন যে কেবল এ-ভাবে আজকাল ক্রমে ভিড় বাড়াচ্ছে। এক পয়সার পালা দেখে যারা বের হয়েছিল, তাদের অনেককে হতাশ করে হালসিবাগানের মোড় থেকে সে বাসে উঠে গেল।

বাইরে টিপ টিপ বৃষ্টি তেমনি পড়ছে। কনডাকটার হাঁকছে, পরেশনাথ গেট। একজন যুবক ওর পেছন থেকে ঠেলে বের হয়ে গেল। হাতটা ঠিক জায়গায় একবার ছুঁইয়ে গেছে। ঘাড়ের ওপরে নিঃশ্বাস পড়তেই বুঝল, আবার কেউ এসে তার শরীর ঘেঁসে দাঁড়িয়েছে। সে বুজতে পারে এই বয়সে কেউ কখনও খালি থাকে না। সে তার খাতাটা বুকের কাছে আর তুলে রাখার দরকার মনে করেনি। নেমে যাবার সময় খুব ভিড় থাকলে খাতাটা আবার দরকার পড়বে। সে এখন বেশ সোজা হয়ে দাঁড়াতে পেরেছে।

মানিকতলায় আসতেই মোটা মতো বুড়িটা উঠে গেল। এতক্ষণ প্রায় দুজনের মতো জায়গা জুড়ে বসেছিল। শ্রাবণী টুপ করে জায়গায় বসে পড়ল।

বেশ আরাম। চোখ বুজে আসতে চাইল আরামে! ভিড়ের বাসে এই একটুখানি বসার জায়গা কত যে দুর্লভ না বসতে পারলে ঠিক বোঝা যায় না। কেন আর তার শরীর ছুঁয়ে পুরুষেরা কাঁঠাল পাকার মতো টিপে টিপে কিছু আর পরখ করার সুযোগ পাবে না। শ্রাবণীর ভিড়ের বাসে উঠলেই এমন মনে হয়। সব বজ্জাত হয়ে যায়। তখন বোঝাই যায়

না এরা কেউ সংসারে বাবা, দাদা, কাকা। যেন সবই তখন ভিড়ের মধ্যে নানারকম অছিলায় মেয়েদের শরীরের যেটুকু ঘ্রাণ পাওয়া যায় চুরি করে নিতে পছন্দ করে।

বাসটা চলতে আরম্ভ করলেই রাস্তার মানুষ-জন চোখে পড়তে থাকে। ছাতা মাথায়, কাদা মাড়িয়ে তারা যাচ্ছে। বৃষ্টিটা বোধ হয় আজ আর থামছে না। এই বৃষ্টির দিনে আর বসে তার রেয়াজ করতে ভালো লাগে, কবিতার বই পড়তে ভালো লাগে। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে যত প্রসাধন আছে সব শরীরে মুখে মেখে কারও জন্য অপেক্ষা করতে ভালো লাগে। তখন যে যুবকই যাক না রাস্তা ধরে, সুন্দর সুপুরুষ যুবা হলে মনে মনে তার কাছে আত্মসমর্পণ করতে ইচ্ছে হয়।

এ-সব কেউ বুঝি তার বুঝতে পারে না। না বাবা, না মা। বরং বাবা মা-তো ওর কথাবার্তা শুনে মনে করে সে ভারি বালিকা। তার এখনও কত কাজ পড়ে আছে। কলেজের পড়া শেষ করাটা তার এখন সবচেয়ে বেশি দরকার। গান-বাজনার শখ আছে। মা তাকে শৈশবে একটা নাচের স্কুলে ভর্তি করে দিয়েছিল—এখনও সে সেই এক নৃত্যনাট্য যখন কেউ বাড়ি থাকে না, আয়নার সামনে গুন গুন করে গান গাইতে গাইতে দুই হাতে যাবতীয় মুদ্রা ফুটিয়ে পা তুলে, অথবা ফাঁক করে মন মোর মেঘের সঙ্গী'...উড়ে যেতে ভালোবাসে। কেউ বোঝে না কেন এটা হয়। ভেতরে কে এই অপরূপ? যার জন্য সে কেবল ফুটে উঠতে চায়। সেই সুন্দরমতো ছেলেটার জন্য, না নিজের শরীরের রক্তে ক্রমে কূট খেলায় মত্ত হবার বাসনাতে কেউ ভেতরের আগুনটা উসকে দিচ্ছে।

তখনই কেউ যেন বলল, হে যুবতী আমি এখানে।

—তুমি কোথায়।

—আমি এখন রেলে চলে যাচ্ছি।

—আমাকে নিয়ে যাবে না।

—তোমাকে সবাই নিয়ে যেতে চায়। আমিও চাই।

—তবে নাও না। আর ভালো লাগছে না।

—তবে চলে এস না।

রেলগাড়ি ঝিক ঝিক—গ্রাম মাঠ পার হয়ে চলে যাচ্ছে। কোথাও সবুজ দিগন্ত, কোথাও শুধু আকাশ, কোথাও নক্ষত্রের বর্ণমালা—রেলগাড়ি ঝিক ঝিক

—সে এর সে। দুজন সে। মুখোমুখি। মুখোমুখি বসে বসে কত কথা।

—আমার আজকাল মরে যেতে ইচ্ছে করে।

—কেন, কেন।

—জানি না যাও।

—তুমি মরে গেলে আমিও মরে যাব।

—এই।

—কী।

—আমার পাশে এসে বোস না।

সুন্দরমতো যুবকটি শ্রাবণীর পাশে বসে গেল।

—শরীরে তোমার সুন্দর গন্ধ।

—তোমারও।

—আমি একটু ঘ্রাণ নেব?

সুন্দরমতো যুবকটি বলল।

—না।

—কেন না?

—লজ্জা করে।

—এই যে বললে দরজা বন্ধ করে দিতে। রেলগাড়ি ঝিক ঝিক।

—এমনি বললাম।

—আর রেলগাড়িতে বেড়াতে যাওয়া কেন।

—দেশ দেখব। ঘুরে বেড়াব। গাছের ছায়ায় দু-জনে বসব। কোন নদীর পাড়ে বসে থাকব। হা হা করে বাতাস ছুটে আসবে। চুল উড়বে দু-জনার।

—আর কিছু করার ইচ্ছে নেই তবে?

—আছে।

—সেটা কী?

—সোনালী যব গমের খেতে ঢুকে যাব। দু-জনে। তারপর টুপ করে ডুব দেব। কেউ দেখবে না।

শ্রাবণী ধরফর করে ঠিক-ঠাক হয়ে বসল। রাজাবাজার এসে গেছে। সে ব্যাগ থেকে কুড়িটা পয়সা বের করে টিকিট কাটল। টিকিটটা নিয়ে ঘড়ির ব্যান্ডে গুঁজে রাখার সময় দেখল বুকের আঁচল সামান্য আলগা। একটা মধ্যবয়সী লোক আড়চোখে বেশ গোপনে কিছুটা মজা পাচছে।

পাশের মেয়েটা নোংরা পোষাকে বসে আছে। সে যতটা পারছে আলগা হয়ে বসার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু ভিড়ের বাসে তা হয় না। একজন বেটে মতো যুবক কখন ঠেলে আরও ভেতরে ঢুকে গেছে। আগের মানুষটাকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে তার শরীরের গন্ধ নেবার জন্য কেমন ঝুঁকে দাঁড়িয়েছে। ভিড়ের অছিলায় সে তার একটা পা ওর পায়ের ভাঁজের মধ্যে কোন এক ফাঁকে ঢুকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মাত্র পাঁচ ইঞ্চির মতো ব্যবধান। ওর রেলগাড়ি ঝিক ঝিক, আর তার নিজের রেলগাড়ির ঝিক-ঝিকের মধ্যে ব্যবধান ফুট ইঞ্চিতে মাপলে এত কম দূরত্ব যে শরীরে সামান্য উষ্ণতা না জেগে পারে না।

একবার তো সে আর সুজয় সারা বিকেল একটু নিরিবিলি জায়গায় বসে প্রেম প্রেম খেলা খেলতে চেয়েছিল।

রেস্তোরাঁয় ওরা ভেবেছিল পর্দা টেনে খেলাটা খেলবে। আশ্চর্য বেয়ারাগুলো, এট ওটা, আর কি লাগবে, চা, তারপর কাটলেট, জল, এবং এতবার পর্দা ফাঁক করে ওদের লক্ষ রাখছিল যে দু-পায়ে ছুঁয়ে বসে থাকা বাদে আর বেশি কিছু করা যায়নি। অথচ ভিড়ের বাসে ইচ্ছে থাকলে কত কিছু হয়ে যেতে পারে। সে ভাবল সেই সুন্দরমতো যুবককে নিয়ে একদিন ভিড়ের বাসে ঘুরে বেড়াবে। ভিড়ের বাসে, তার মনে হল, কিছুই আটকায় না। শিয়ালদায় শ্রাবণী নেমে গেল। টুকিটাকি দুটো একটা জিনিস কিনতে হবে। একটা পেস্ট, এক কৌটো ফেশ-পাউডার, কুড়ি পয়সার চিনেবাদাম, বাবার জন্য দুটো গেঞ্জি, পছন্দমতো ব্রেসিয়ার পেলে একটা কিনে নেবে। অথচ টিপ টিপ বৃষ্টিটা থামছে না। এরই মধ্যে গল গল করে ট্রেনগুলো উগড়ে দিয়ে যাচ্ছে লোকজন। গায়ে গায়ে ঠোকাঠুকি সতর্ক না থাকলে হবেই। সে ভেবেছিল বড়ো মাসির ছেলেকে নিয়ে একদিন ভি আই পি রাস্তাটা হেঁটে পার হবে। একবার ট্যাকসিতে সে ছোটো মাসি আর তার দেওর অময়কাকুর সঙ্গে দমদম এয়ারপোর্টে গিয়েছিল। তখনই সেই সুন্দরমতো ভারি প্রশস্ত রাস্তাটা দেখে অবাক। কত সব গাছপালা, ফুল ফলের গাছ, বোগেনভেলিয়ার ঝাড়। পিংক কালারের ফুলে একেবারে সারা রাস্তাটা উজ্জ্বল হয়ে আছে। বড়ো বড়ো পুকুর প্রায় হ্রদের সামিল। ছই দেওয়া একটা নৌকাও সে দেখেছিল। নৌকাটার মধ্যে তার ইচ্ছে হয়েছিল সেই সুন্দর মতো ছেলেটাকে নিয়ে কিছুক্ষণ বসে থাকবে।

—এই।

—কী।

—বসবে একটু।

—বসে কি হবে। এস না হাঁটি।

—দেখব।

—কী দেখবে বলবে তো?

—এই মানে।

—আচ্ছা মুসকিল তোমাকে নিয়ে। সোজা কথা সহজভাবে বলতে পার না।

—তুমি রাগ করবে।

—রাগ করার কথা হলে রাগ করব না?

—ওটা রাগ করার কথাই।

—তা হলে বল না।

—ঠিক আছে। ওঠ।

—এই হল মুখ গেমড়া করে ফেললে তো।

—না, মুখ গোমড়ার কি আছে। এমন সুন্দর নিরিবিলি জায়গা তো পাওয়া যায় না কোথাও।

—সত্যি নিরিবিলি। গাছপালা পার হয়ে খালের ধারে দু-জনে বসে, কেউ দেখতে পাচ্ছে না, এর চেয়ে নিরিবিলি জায়গা কলকাতায় আর কোথায় আছে।

—সেই তো। কত ফুল। ওগুলো কী ফুল?

—চিনি না। বেশ ফুলগুলি। গুচ্ছ গুচ্ছ, কদম ফুলের মতো।

—সত্যি কদম ফুলের মতো। তারপরই কেমন সুন্দরমতো ছেলেটা বলল, বয়স বাড়লেই মানুষের কী যে হয়। কদম ফুল দেখার সখ হয়।

শ্রাবণীর মুখটা কেমন লাল হয়ে গেল। মনের মধ্যে এই বয়সে এই এক খেলা। কখনো কদম ফুল, কখনো বাবুইর বাসার মতো নরম সবুজ শুকনো ঘ্রাণ, আর যেন কি একটা কিনতে হবে—ও দুটো গেঞ্জি। কত মাপের? ছত্রিশ। ছত্রিশে বাবার আজকাল হয় না। আটত্রিশ দরকার। শ্রাবণী বলল, আটত্রিশ আছে?

দোকানি বলল, আছে। বলে বাক্স টেনে বের করল।

শ্রাবণী বলল, দুটো দাও।

দোকানি গেঞ্জী দুটো দিলে সবটা ভাঁজ খুলে দেখল কোথাও টুটা-ফাটা আছে কিনা। সে ব্রেসিয়ার চাইল একটা। খুব হাল ফ্যাসানের একটা বাকস। ওপরে জাঙ্গিয়া আর ব্রেসিয়ার পরা একটা মেয়ের ছবি। সে ছবিটার দিকে তাকিয়ে ভাবল, আজকাল মেয়েরা শাড়ি শায়ার নীচে কেউ কেউ জাঙ্গিয়া পরে। সে অবশ্য এখনও পরে দেখেনি। কলেজে পেনু

বলে একটা মেয়ের সঙ্গে ওর খুব সখ্যতা। ওর অনেক পুরুষ বন্ধু। ওদের সঙ্গে সে বেশ ঘুরে বেড়ায়। ওর কথা শুনলে মনে হয়, সে কাউকে বিশ্বাস করে না।

প্যাকেট হয়ে গেলে শ্রাবণী বলল, কত দাম।

দোকানি বলল, আঠারো টাকা আশি পয়সা।

কিছু কম হবে না।

—দুটো দোকানে জিজ্ঞেস করতে পারেন। এখানে এক দাম।

আর বাকি থাকল কুড়ি পয়সার চিনাবাদাম। ওটা কেনা হলেই তার হয়ে যায়। ঘড়িতে দেখল আটটা বেজে গেছে। বাসে ওঠার জন্য তাকে আরও পনেরো মিনিট দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। সে দেখেছে, তার বাসটাই বেশি দেরি করে আসে। বাসস্ট্যান্ডে গরম বাদাম ভাজা পাওয়া যায়। টিপটিপ বৃষ্টিতে বাদাম ভাজা চানাচুর ভাজা খেতে শ্রাবণীর বেশ লাগে। শ্রাবণী এমনিতেই লম্বা, শরীরে মাসে আরও একটু হলে সে খুবই সুন্দরী হতে পারত। এই মাংস লাগাবার জন্য আজকাল কলেজ থেকে ফিরে একটু দিবানিদ্রার অভ্যাস করেছে। আগে বড়ো গল্পের বই পড়ার নেশা ছিল।

বাসটা এসে গেল যা হোক। কুড়ি পয়সার চিনাবাদাম শেষ পর্যন্ত কেনা হল না। বাদাম কিনতে গেলে বাসটা ধরা যেত না।

সে দুজন যাত্রীকে ঠেলে প্রায় আগে উঠে গেল। এ-বাসটায় একটা পিন পড়ার জায়গা নেই। ইস্টবেঙ্গল মোহনবাগান খেলা কাল। পাশে দু-জন যুবক খুব হই-চই করছে। ওরা দু-জনই টিকিট সংগ্রহ করে ফিরেছে। দুনিয়াতে ওরা এখন এমন ভালো কাজ নেই যা করতে পারে না। ওরাই ওকে মাঝখানটায় চ্যাপ্টা হয়ে যেতে দেখে খুব ভালো মানুষের মতো ঠেলে একটু এগিয়ে যাবার রাস্তা করে দিল। বলল, দেখুন ওদিকে লেডিস সিট খালি থাকতে পারে। কিন্তু শ্রাবণীর এই সাতফুট রাস্তা অতিক্রম করা এ-জীবনে সম্ভব নয় বলে ভিড়ের মধ্যে ক্রমে চ্যাপ্টা হয়ে যেতে থাকল। সামনে চাপ, পেছনে চাপ ডাইনে চাপ বাঁয়ে চাপ।

বাস থেকে নেমে শ্রাবণী হতবাক। লোড শেডিং। চারপাশে গভীর আচ্ছন্ন অন্ধকার। বাস থেকে নেমে এতটা পথ অন্ধকারে যাবে কী করে, ভাবতেই কেমন মুষড়ে পড়ল।

সামনের রাস্তাটা ইঁট সুড়কির। ডানদিকে বড়ো একটা মাঠ। মরশুমে ফুটবল খেলে পাড়ার ছেলেরা। বাঁদিকে কিছুটা বস্তি অঞ্চল পার হয়ে একটা টিনের কারখানা। রাস্তা বরাবর অনেকটা দূর পর্যন্ত লোনাধরা ইঁটের দেয়াল। তারপর বেশ ফাঁকা মতো জায়গা কিছুটা—একটা ভাঙা শ্যাওলাধরা বাড়ি। কবেকার কে জানে। দিনের বেলাতেই বাড়িটা ভূতুড়ে বাড়ি বলে মনে হয়। একজন বুড়োমতো মানুষ থাকে বাড়িটাতে। সারারাত

জানালায় সে দেখেছে কেউ একটি হ্যারিকেন জ্বালিয়ে রাখে। সব বাড়িতেই বিদ্যুতের আলো—কেবল ও-বাড়িটাতে এখনও কেরোসিনের বাতি জ্বলে। ও-বাড়িটা পার হলে সূর্যদের বাড়ি। নমিতার দাদা সূর্য বেকার যুবক। দুবারের পর বি-এ পাস করেছে। এখন পাড়ার বেশ ডাকসাইটে মাস্তান। দুবার চাকু খেয়েও প্রাণে বেঁচে আছে। চায়ের দোকানি গোবিন্দ এখন ওর একমাত্র সঙ্গী। গত শীতেও একবার ওকে দেখে শিস দিয়েছিল। সে এ-রকম সময়ে খুব সাহসী হয়ে যায়। কাছে গিয়ে বলেছিল, কী, কিছু বলবেন? সূর্যদা খুব ভালোমানুষ সেজে গেছিল তখন। বলেছিল, কোথায় গেছিলে। শ্রাবণী বলেছিল, সিনেমা দেখতে।

কী বই?

—সোলে।

—বাপস। আমি তো তেরোবার দেখলাম। আবার দেখব।

শ্রাবণী বলেছিল, আমি একবারই দেখেছি। আর দেখব না।

তারপরই সে রাস্তার অন্ধকারে পা বাড়াল। সেই চায়ের দোকানটায় সুন্দরমতো ছেলেটাকে দেখল না। অথবা হ্যারিকেন জ্বালিয়ে রেখেছে বলে স্পষ্ট বোঝাও যায় না, কারা ওখানে আছে। এই রাস্তাটুকু যদি সে এসে পার করে দিয়ে যেত।

এমনিতে সামান্য রাত হলে রাস্তাটা খালি হয়ে যায়। দু-একজন উঠতি বয়সের ছোকরা হিন্দি সিনেমার গান গেয়ে এ জিন্দাগি লুট গেয়া বলে চেঁচায়, শ্রাবণী ওদের ভয় পায় না। কিন্তু সূর্যটা খুবই বেপরোয়া। ওর কেমন ঘাম দেখা দিল শরীরে। আশ্চর্য, সারাটা রাস্তা কতভাবে যে এতক্ষণ নৈনিতাল উটি হাজারিবাগে ঘুরে এল। সঙ্গে সেই সুর্যের মতো কেউ সারাক্ষণ পাশে পাশে হেঁটেছে।

টিপ টিপ বৃষ্টিটা আর নেই।

সুনীলদা টিউশান সেরে এ সময়ই ফেরেন। ওর সঙ্গে দেখা হয়ে গেলেও এতটা ভয় থাকত না। ওর খুবই ইচ্ছে হচ্ছিল, সুনীলদা এখন সঙ্গে থাকুক। টিউশান সেরে যদি ঠিক এই সময়ে ম্যাজিকের মতো সামনে এসে উপস্থিত হত। এতে তার কয়েক প্রকার সুবিধা ছিল। প্রথমত সুনীলদা খুব বেশি একটা চায় না। সে যতটা দেবে সুনীলদা ততটাই নেবে। একবার অদ্ভুত কাণ্ড ঘটেছিল সুনীলদার ঘরে। এবং সেই দাদাটির ঘরে পড়ার নাম করে কিছুক্ষণ থাকতে পারলে শরীরের মার্জিনেল ইউটিলিটির মানেটা স্পষ্ট বোঝা যেত তখন।

কী কাণ্ড। এটা কী করছ সুনীলদা!

দরজা বন্ধ করে দিলে শ্রাবণী বলেছিল।

সুনীলদা বলেছিল, কেউ নেই। দাদা বৌদি অন্নপ্রাশনের নেমন্তন্ন খেতে গেছে।

শ্রাবণী বলেছিল, তাই বলে দরজা বন্ধ করে দেবে।

সুনীলদা কেমন অপরাধীর গলায় বলেছিল, আমি একটু দেখব। এই বলে তস্করের মতো তার দিকে তাকিয়েছিল কিছুক্ষণ।

সুনীলদা অবশ্য ডিম্যান্ড অ্যান্ড সাপ্লাই-এর টোট্যাল ইউটিলিটির দিক থেকে কিছুটা কমতি ছিল। বাবা-মা ওর জন্য যা টাকা সঞ্চয় করেছে, তাতে করে ডাক্তার এঞ্জিনিয়ার পাত্র সহজেই সাপ্লাই পাওয়া যাবে। তবে সে তো আরও কিছুদিন প্রতীক্ষা করার পর। অনার্স নিয়ে বি.এ.টা পাস, গানের স্কুল থেকে ডিপ্লোমা—এতসব হবার পর। দীর্ঘসময় কিন্তু ভেতরটাতে বরাবরই আগুনের ফুলকি উঠছে। পুরুষ মানুষের কাছে থাকলে কেমন বাতাসটা আরও বেড়ে যায়। ফুলকিরা শরীরের আনাচে-কানাচে ঘোরে। খুব নির্বোধই মনে হয়েছে সুনীলদাকে। বড়ো বেশি ভালো মানুষ। মেয়েদের শরীরে কিছু আছে, কথাবার্তায় এতটুকু বোঝা যেত না তার। এক বিকেলে সিঁড়ি ধরে নেমে যাচ্ছে সুনীলদা, শ্রাবণী বাথরুম থেকে বের হয়েছে। বালতিতে সামান্য জল। কেউ কাছেপিঠে নেই—কী যে ইচ্ছে হল তার—একটু জল নিয়ে সুনীলদার শরীরে ছিটিয়ে দিতেই কেমন চোখ মুখ জ্বলে উঠল মানুষটার। বলল, এদিকে এস।

—না না। আমি পারব না।

—তবে যাও। বলে সুনীলদা চলে গেল।

বাসে যেতে আসতে, কলেজে গানের স্কুলে আত্মীয়ের বাড়ি, রানার মামার বাড়ি যখন যেখানে শ্রাবণী থাকে যখন যেখানে যে-ভাবে থাকে শীতে গ্রীষ্মে, শরতে বসন্তে সব সময় শরীর তার মার্জিনেল ইউটিলিটির আওতায়। কিন্তু এখন সে কী করবে। গানের স্কুল থেকে ফিরতে এমনিতেই একটু বেশি দেরি হয়ে গেছে। বাড়িঘর তেমন খুব ঘন নয় এখানে। মাঝে মাঝে ছোটোছোটো ঝোপ জঙ্গলও আছে খালের পাড়টাতে। দু-একবার ছিনতাইটিনতাইও হয়েছে বলে খবর পাওয়া গেছে। বাস থেকে নেমে সেডের নীচে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়েছিল। মানুষজন আছে কথাবার্তা বলছে সবাই—অথচ এতবড়ো কলকাতায় তার যে কত বড়ো সমস্যা ওই রাস্তাটুকু পার হয়ে যাওয়া কেউ বুজছে না। সে আরও দাঁড়িয়েছিল, পাড়ার পরিচিত কাউকে বাস থেকে নামতে দেখলে তার সঙ্গে হেঁটে চলে যাবে। দুটো তিনটে বাস এল। কারু মুখই এ-সময় চেনা মনে হল না। শুধু একবার দেখল দু-তিনজন যুবক রাস্তাটার অন্ধকারে নেমে গেল। শ্রাবণীর কেমন যেন রাগ হল মা-বাবার ওপর। বাড়ি ফিরতে দেরি হচ্ছে কেউ একটু ভাববে না। বড়ো রাস্তায় এসে কারও দাঁড়িয়ে থাকা উচিত না! সে যেন বাবা-মার ওপর রাগ করেই অন্ধকার নির্জন পথটার

নেমে গেল। তে যে ভালো হয়ে আছি, সেটা কার মুখের দিকে চেয়ে! আর তোমরা নিশ্চিন্তে বসে আছ বাড়ি। টেলিভিশন দেখছ। তারপরই মনে হল লোডশেডিং, টেলিভিশন দেখবে কী করে। আবার মনে হল, ওদের দিকটায় লোডশেডিং নাও হতে পারে। খুব মজা। যাকগে কিছু হয়ে গেলে আমি কিচ্ছু জানি না। আমার কোনো দোষ নেই। তোমরা মা-বাবা, তোমরা যদি না বোঝ এই অন্ধকার রাস্তায় হাঁটা আমার অনুচিত, তবে আমি কী করব।

আর ঠিক রাস্তার অন্ধকারে ঢুকে যেতেই মনে হল গায়ে কারও নিশ্বাস পড়ছে। শ্রাবণী আর্ত গলায় পেছনে তাকিয়ে বলল, কে!

—আমি সুন্দর মতো ছেলেটা।

—উঃ কী ভয় পেয়ে গেছিলাম।

—এত ভয় কেন?

—জানি না।

—আসুন এই অন্ধকারে একটু ঘুরে বেড়াই।

—কেন?

—এই দুজনে ঘুরব, কথা বলব।

—আর কিছু না?

—আর আর আর.....

—তোতলাচ্ছেন কেন?

—মানে, আপনার চুলে এত সুগন্ধ থাকে কী করে?

—কই আমি তো পাই না।

—আমি পাই।

—আপনি পান যখন তখন প্রাণভরে নিন।

—বলছেন নিতে?

—বড়ো হতে গিয়ে বার বার মনে হয়েছে কেউ আমার মাথায় মুখ রাখুক, চুলের গন্ধ নিক।

—তবে আসুন—একটু এদিকে।

—ভয়, করে।

—আমি তো আছি।

—তবু ভয় করে।

—এত ভয় নিয়ে বেঁচে থাকেন কী করে?

—এই ভয় নিয়ে বেঁচে থাকতে কেমন মজা পাই।

—পাহাড়ে সমুদ্রে সূর্যাস্তে কোন বালিয়াড়িতে আপনি কতবার তো আমার সঙ্গে একা হেঁটে গেছেন। দুজনে কখনো ক্লান্ত হয়ে হাত-পা ছড়িয়ে বালিয়াড়িতে শুয়ে পড়েছি। কখনো দুজনে হাত ধরাধরি করে ছুটেছি। কত চড়াই উৎরাইয়ে উঠতে নামতে বলেছেন, তুমি আমার হাত ধর।

রাস্তাটার বাদিকে নোনা ধরা পাঁচিল। ভয় এখানটাতেই পেল। শ্রাবণী খুব দ্রুত পায়ে হাঁটছে।

—এত জোরে হাঁটছেন।

—তিনটে ছেলে কিছুক্ষণ আগে এখান দিয়ে গেছে।

—তার জন্য জোরে হাঁটার কী হল?

—ওরা ভালো না।

—ওরা কিছু ছিনতাই করে নিয়ে গেছে!

—না ওদের একজন আমাকে দেখলেই কেমন বোকার মতো তাকিয়ে থাকে।

—বোধহয় ভালোবাসে।

—ভালোবাসা এত সোজা।

—কেন, এই তো সময় সবাইকে ভালোবাসার।

—সত্যি। সুন্দর মতো ছেলে দেখলেই আমার কেন জানি তার সঙ্গে কোনো ডাকবাংলোয় রাত কাটাতে ইচ্ছে করে।

—মুরগির ঝোল, গরম ভাত।

খুব শীত। র্যাপার গায়। আকাশে কিছু নক্ষত্র, ঝাউগাছগুলির শন-শন শব্দ।

তারপর ব্যালকনিতে বসে কত কথা। কথা ফুরোয় না। ব্যালকনিতে শীতের ঠান্ডা হাত-পা জমে যাচ্ছে। তখন খুব ইচ্ছে করে দুজনে আরও একটু ঘনিষ্ঠ হতে। তারপর নরম বিছানায় কত ব্যস্ত তুমি আর আমি। জীবন কী সুন্দর লাগে তখন।

—তুমি বুঝি তাই চাওয়?

—তুমি চাও না।

—না।

—কেন মিছে কথা বল। এস না, খেলার মাঠটার ওদিকে আমরা যাই।

—চুলের সুগন্ধ নিই।

—আর কিছু নেবে না, বল।

—না চাইলে কিছুই নেব না।

শ্রাবণী উত্তেজিত হয়ে পড়ল, না না, তুমি আমার সব নিয়ে নাও।

শুধু কদমফুলটা অক্ষত রাখ।

—ওটাই তো সব। ওটা আমি নেব।

শ্রাবণীর ভেতরটা আরও বেশি ধুকপুক করছে। এই বুঝি সেই তিনটে ছেলে—ওরা যদি এই নির্জন পথটায় সত্যি ছিনতাইকারী হয়ে যায়? শ্রাবণী প্রায় দৌড়ে সেই খাল পাড়ের রাস্তার দিকে ছুটে যেতে থাকল।

এ ছাড়া সে সব সময় মুখে হালকা প্রসাধন রাখতে ভালোবাসে। সে জানে মেয়েরা অনেকক্ষণ বাইরে থাকলে কিছু উটকো গন্ধ শরীরে গজাতে থাকে।

এ-সব গন্ধ থেকে আপাতত রেহাই পাবার জন্য সে সেন্ট পাউডার মেখে ঘরে ঢুকতেই বুঝল—এদের কাউকে সে চেনে না। বাবা-মার সঙ্গে এদের কবে পরিচয় ! বাবা-মার সঙ্গে পরিচয় থাকলে তার সঙ্গে থাকবে না, সে হয় না। বাবার অফিসের প্রায় অনেককেই সে চেনে। দিদির বিয়েতে ছাড়াও কোনো কোনো কাজে উৎসবে তারা আসেই। সুতরাং এ-ক্ষেত্রে যতটা বিনয়ী নয়, তার চেয়েও বেশি বিনয়ী—অন্তত চোখে মুখে। কারণ এরা কেউ জানে না, মেয়েটা পড়ার ফাঁকে, রাস্তায় অথবা নির্জনে, কখনো জানালায়, কতটা পর্যন্ত এলিয়ে ভাবতে পারে। সুন্দর মতো ছেলেটার সঙ্গে সে অন্ধকার রাস্তায় মনে মনে যে খেলা খেলে এল—তার বিন্দুমাত্র আঁচ এখন ওরা কেন স্বয়ং ঈশ্বর দেখেও বিশ্বাস করবে না। সে প্রায় বালিকার মতো, (না তার বয়স আরও কম, কে জানে) বড়ো বেশি নিবিষ্ট হয়ে দেখছে সেই সুদূর উষর মরুভূমির মতো একটা রাস্তা ধরে নায়ক তার নায়িকাকে নিয়ে চলে যাচ্ছে। ভাঙা সেই মোটর গাড়িটির অ্যাসিস্টান্ট রবি ঘোষ মজার কথা বললেই বালিকার মতো হেসে ফেলছে সে। যখন শো শেষ হল, বাবা দেরি করলে না আর। মেয়ের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। প্রণাম করতে বললেন। প্রণাম করার সময় ভীষণ রাগ হচ্ছিল বাবার ওপর। তারপর বাবা-মা ওদের নিয়ে বৈঠকখানা ঘরে চলে গেলেন। শ্যামলাল খুব হাসিখুশি এবং দিদিমণির সঙ্গে খুশিতে বেশ দুটো একটা রসের কথাও বলে

ফেলল। আর কী এবার তুমিও চললে। খুব মজা। কেমন সুন্দর ছেলে, কত বড়ো চাকরি। তোমাকে ওরা আগেই দেখেছে। কোথায় সেটা? সে প্রশ্ন করলে বলল, ওই যে গড়ের মাঠে বড়ো একটা হলঘরে তুমি গান গেয়েছিলে—ওর মনে পড়ল, সত্যি সে একবার সবার সঙ্গে একটা গান গেয়েছিল—আর তারই জের—

সেই সুন্দর মতো ছেলেটাকে সে বলল, হল তো। সব যাবে। আমার আর কোনো অহংকারই থাকবে না। তুমি যে কী একটা বোকা না। পারলে না, কিছুই পারলে না।

ওরা চলে গেলে বাবা-মাকে ভীষণ খুশি দেখাল। অথচ কেন এরা এসেছে, কী ব্যাপার কিছুই তাকে বলছে না। মেয়েটা বিয়ের নাম করলেই চটে যায়। মুখ গোমড়া করে শুয়ে থাকে—বাবা-মার জন্য মেয়েটার কষ্টের শেষ নেই, এ-সব ভেবেই হয়তো বাবা-মা বলল, এই কী, তুই এখন পড়তে বসলি। খাওয়া-দাওয়া সেরে নে।

শ্রাবণী বলল, তোমরা খেয়ে নাও। ঘন্টা খানেক পড়াশোনা করে গা ধোব। তারপর খাব।

আজ আর পড়তে হবে না।

শ্রাবণী বলল, আবার তোমাদের পাগলামি শুরু হয়েছে।

—পাগলামির কী। মেয়েদের বিয়ে একদিন করতেই হয়।

শ্রাবণীর বলার ইচ্ছে হল, বিয়ের ইচ্ছে আমার বারো পার না হতেই। কিন্তু বিয়ে করলে সব পৃথিবীটা একজনের হয়ে যায় বাবা। সেটা কেন বোঝ না। শ্রাবণীকে চুপ করে থাকতে দেখে মা বলল, ছেলের মতো ছেলে।

—সব ছেলেই ছেলের মতো ছেলে।

মা কী ভেবে বলল, তোর কী অন্য কাউকে পছন্দ। তবে সেটা বল।

শ্রাবণী বলতে পারত, যখন যেখানে যত সুন্দর ছেলে দেখি সব আমার পছন্দ। তাই বলে তারা একজন কেউ আমার সব অহংকার লুটে পুটে খাবে। আর আমি একটা মরুভূমির বাঘের পাল্লায় পড়ে যাব। আর শ্রাবণীর এটা হয়, অপছন্দের কিছু হলেই সেটা তার কাছে মরুভূমির বাঘের মতো মনে হয়। সুনীলদা, সূর্য, সমীরণ, বিজু এরাও সেই চেয়ে এসেছে। কাউকে আমি কিছু দিইনি। দিলেও ফুলটি অক্ষত রেখেছি। আর সেই লোকটা তাই এখন মজা করে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাবে।

শ্রাবণী বলল, কাউকে পছন্দ করতে আমার বয়েই গেছে। তারপরই কেমন ভার ভার গলায় বলল, আচ্ছা মা, আমার কী বয়েস, পড়াশোনাটাও তোমরা শেষ করতে দেবে না।

বাবা খুব উঁচু লম্বা মানুষ। খুব সুপুরুষ। বাবার মতোই সে দেখতে হয়েছে। বাবার মতো মেয়ে দেখতে হলে খুবই পয়মন্ত হয়। সুতরাং মেয়েটার সব কিছুতেই সুখ হবে—এবং তিনি সব সময়ই ভাবেন, খুব আদুরে মেয়ে বলে সামান্য বোকা। নিজের ভালোমন্দ বোঝার বয়স হয়নি। তিনি কাছে বসে মাথায় হাত রেখে বললেন, সব সময় তো ভালো ছেলে পাওয়া যায় না।

শ্রাবণী কিছু বলল না। এ-সময় কিছু বলাও যায় না। এক মাস ধরে শুধু তার কথাই ভেবেছে। বিয়ের বছর খানেক তার কথাই ভাববে। তারপর বাসের সেই কাকা বাবা মেসো হয়ে যাবে। শ্রাবণী ফিক করে নিজের মনেই গোপনে হেসে দিল। এই হচ্ছে জীবনের মজা।

বাবা বলল, আমি ওদের কথা দিয়েছি।

শ্রাবণী বলল, আমাকে এত কেন বলছ বুঝি না।

শ্রাবণী আর দাঁড়াল না। সে ভাবল, এত সব সুন্দর গাছপালা বৃক্ষের মধ্যে এতদিন সে বেশ বেঁচে ছিল, এখন একটা গাছের সঙ্গে তাকে বেঁধে দেওয়া হবে। সে হেসে দিল কথাটা ভেবে। শরীরের রক্ত টগবগ করছে। ভেতরে কেউ যেন ঘোড়ায় চড়ে ছুটছে। এটা কিছুতেই থামছে না।

সে তার বাবা-মার সঙ্গে চুপচাপ খেয়ে নিল।

সে শোবার আগে খুব সুন্দর করে সাজল। তারপর আলাদা। বৈঠকখানার আগের ঘরটা তার। বাঁদিকে ব্যালকনি, ভেতরে বাবা-মার ঘর। রান্নাঘর স্টোর রুম। সে তার ঘরে ঢুকলে বুঝতে পারে এখন আর তার সঙ্গে তার বাবা-মার ঘরের কোনো সম্পর্ক নেই। সে খিল তুলে আয়নায় দাঁড়াল। স্নান করেছে। চুলে শুকনো তোয়ালে। সে তোয়ালে খুলে আয়নার সামনে দাঁড়াল। শরীরে ঘোড়সওয়ার তেমনি টগবগিয়ে ছুটছে। সারাটা রাস্তায় সে গাছপালা বৃক্ষের ছিল। এখন সে একটা গাছের সঙ্গে বন্দি হয়ে যাবে। সে তার নখে নেলপালিশ লাগাল। চোখে আইগ্লাস ছিল। সে তার সব চেয়ে দামি বেনারসি বের করল। তার যা কিছু অলংকার ছিল এক এক করে পরল। পায়ে আলতা দিল। আয়নায় দাঁড়িয়ে দেখল, তার আর কি বাকি রয়েছে সঠিক সৌরভে ফুটে উঠতে। পায়ের আঙুলে সে অনেক দিন পর রুপোর ফুল পরল। আর কি বাকি আছে। বাকি, বাকি কি বাকি—কিছু নেই—তবে সে এই। এটুকু হলেই সে যুবতী, মায়াবী, মরীচিকা সব। তারপর সে তার যাবতীয় গাছপালা বৃক্ষ,—যেমন নন্তু, রমেন, সমীর, বকলু, গজা, সূর্য, সাধন—যত মুখ যত প্রিয় মুখ, সবার কথা ভাবতে লাগল। এরা সবাই সেই একই আশা নিয়ে পৃথিবীতে তার পাশাপাশি বড়ো হচ্ছিল। তারা তাকে পেল না। কোথাকার একটা উটকো লোক এসে

তুলে নিয়ে যাবে তাকে। সবার জন্য শ্রাবণীর কষ্ট হল। মায়া হল। বেচারা। আর এক বেচারা এখন মাথার ওপরের ঘরটায় রাত জেগে পরীক্ষার পড়া পড়ছে। গুন গুন আওয়াজে সে টের পায় সব। সবার হয়ে, সে সেই এক বেচারা বৃক্ষলতায় জড়িয়ে যাবার জন্য পাগল হয়ে যাচ্ছে। রক্তে ফুটছে পদ্ম। রক্তে ফুটছে বুদবুদ। রক্তে ঘোড়া ছুটছে। রাত গভীর। সুতরাং শ্রাবণীর ক্ষুরের শব্দ ভেতরে ক্রমে আরও প্রখর হতে থাকল। সব নির্জন হয়ে আসছে। সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। মা, বাবা, শ্যামলাল। সামনের বৈঠকখানা পার হলেই সিঁড়ি। দোতলার ঘর। সামনের ঘরটায় সেই বেচারা।

শ্রাবণী খুবই সতর্ক পা ফেলে উঠে যাচ্ছে। সতর্ক পা ফেলে স্বর্গের আসল সিঁড়ি ভাঙছে। ভাঙছে আর কাঁপছে প্রতিমা নির'নের মতো তার মুখ ঝলমল করছে।

কোথাও তখন বিসর্জনের বাজনা বাজছিল। শ্রাবণী যেন উঠতে উঠতে স্বর্গের সিঁড়ি ভাঙতে ভাঙতে কেবল তার বিসর্জনের বাজনার শব্দ শুনতে শুনতে সেই ঘরটার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। তার কোনো হুঁস ছিল না। সেই ঘরটা সেই কাপুরুষের ঘরটা শব্দ। ......

—তুমি আমাকে ফেলে চলে যাচ্ছে। কিছুই তো চাইনি। সামান্য একটা কদম ফুল চেয়েছি। যত বড়ো হয়েছি, যত বড়ো খেলোয়াড় হয়েছি সব সময় আমার জন্য কেউ একটা কদম ফুল তুলে এনেছে। বলেছে, নিন। নিতে সাহস পাইনি। কে কী বলবে। ভয় হয়েছে। যদি সত্যি নিলে রাগ করে। অথচ দেখুন কত রাতে স্বপ্নে দেখেছি, ফুলটা গাছে ধীরে ধীরে ফুটে উঠছে। পাড়তে গেলেই মনে হয়েছে—সেটা আর গাছ নেই। সুন্দর একটি কিশোরী লজ্জায় মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে আছে। কাছে গেলে বলেছে লজ্জা করে, 'বিজুদা, তুমি ওটা নিয়ে নিলে সত্যি আমার আর অহংকার করার মতো কিছু থাকল না।'

আমারও তাই। যেন ওটা নিলেই এতদিনের সব রহস্য আমার মরে যাবে বিজু। আমি সবকিছু হারিয়ে ফেলব। অথবা এক জীবন থেকে অন্য জীবনে ঢুকে যাব। বড়ো ভয় করে বিজু।

অন্ধকারটা কখনো ফিকে হয়ে যাচ্ছে। দুজন লোক কথা বলতে বলতে এদিকে এগিয়ে আসছে। মানুষের কী যে আছে। অন্ধকারে মানুষ অন্য রকমের হয়ে যায়। এবং যে বিজুটা এমন দেখতে সুন্দর, চোখ তুলে কারো দিকে তাকায় না, ঘন অন্ধকারে সেও সব কেড়ে নিতে চাইছে। সে নিজের সঙ্গেই আবার কথা বলল, বিজু আমাদের বাড়িতে একদিন এস না। বাবা-মার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব। তা হলেই আমাদের বন্ধুত্ব হয়ে যাবে। তুমি আমি, তারপরই হুঁস করে একটা সাদা রঙের গাড়িতে দেখল, সে বিজুর সঙ্গে হাই-ওয়ে হয়ে ছুটে যাচ্ছে। কিছুটা বড়ো জোরে গাড়ি চালাচ্ছে হাওয়ায় চুল এলোমেলো হয়ে গেল। বুকের আঁচল পড়ে গেল। বিজু একটা সিগারেট ধরি বিজু তুমি সিগারেট খাও কেন।

সিগারেটের গন্ধ আমার একদম সহ্য হয় না। আমার বমি বমি পায়। তোমাকে সব দেব বিজু। ফুলটা। লক্ষ্মীটি, সিগারেট খেও না।

—সত্যি দেবে?

মাথা নীচু করে রাখল শ্রাবণী।

—কী কথা বলছ না কেন?

—কী বলব বিজু।

—এই যে বললে ফুলটা আমাকে দেবে।

—তোমরাই তো কেউ না কেউ নেবে। কত গোপনে তাকে রক্ষা করে আসছি। কেলে পাগলা সুনীলদাটা একবার দেখতে চেয়েছিল।

—দেখিয়ে ছিলে?

শ্রাবণী চুপ।

—কী কথা বলছ না কেন বিজু।

—এ সব কথা বলা যায়?

—আমার খুব হিংসে হচ্ছে।

তোমার হিংসে হবে কেন। তুমি তো আমার দিকে ফিরেও তাকাও না।

—শ্রাবণী তোমার নাম। তুমি সুন্দরভাবে হেঁটে যাও। যখন যাও পৃথিবীর এমন কোন অহংকারী যুবক আছে তোমার দিকে না তাকিয়ে থাকতে পারে।

আর তখনই বাড়ির কাছাকাছি বড় শিরিষ গাছটার নীচে সে এসে গেল। আর ভয় নেই। ওর ঘরের জানলাটা পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে। পাশের বাড়িগুলোর কেউ মাসি কেউ মেসো। সুতরাং বেশ অবজ্ঞা ভরে সে হেঁটে যেতে থাকল। সারাটা অন্ধকার রাস্তায় সেই সুন্দর মতো ছেলে বিজুটা ছিল বলে যতটা ভয় বাপার কথা ছিল তা সে পায়নি। এমন সুন্দর ছেলেরা পাশে না থাকলে পৃথিবীতে বাঁচারও কোনো অর্থ হয় না। গাছটার নীচে সেই তিনজন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সিগারেট খাচ্ছে এবং মনে হল দূর থেকে ওরা শিস দিয়ে হাতে তুড়ি মেরে কি একটা গান গাইছে। পাশে যেতেই গানটা কেন যে তার ভালো লেগে গেল। অনেক পুরোনো হিন্দি ফিল্মের গান—ওরা নিজেরাই তুড়ি দিয়ে অন্ধকার আকাশের নীচে গাছের আবছা অন্ধকারে গাইছে—জেরা বাচকে জেরা হাটকে—বোধ হয় তাকে উদ্দেশ্য করে গাইছে। সে প্রায় দৌড়ে এবার বাড়ির দরজায় ঢুকে গেল। এদিকটায় লোডশেডিং ছিল না বলে সত্যি বাবা-মা বসে বসে টেলিভিশন দেখছে। তার সামান্য

অভিমান হল। বাবা বললেন, এলি। মা বললেন, 'অভিযান' বই হচ্ছে। আয় তাড়াতাড়ি আয়। সে গেল না। বারান্দায় বসে থাকল। আসলে সে বেশ ঘামছিল। পাখা ছেড়ে চুপচাপ কিছুক্ষণ বসে থাকল। বাবা-মার সঙ্গে আরও দু-তিনজন বসে আছে।

কাজের লোক শ্যামলাল এখন বাবুর মতো একেবারে টি-ভির ফুট তিনেক দূরে বসে আছে। খুব কাছে থেকে ভালো করে দেখতে না পেলে তার মন ভরে না। একটু দূর থেকে এ সে দেখে না। আর মার পান সাজা, বাবার সিগারেট, কখনো গেট খোলার দরকার হলে—এই এমন ধরনের ফুট-ফরমাস বাদে তাকে দিয়ে এখন আর কোনো কাজই করান যাবে না। শ্রাবণীর খুব জলতেষ্টা পেয়েছে। অথচ উঠতেও ইচ্ছে করছে না। ভিতরটা কেমন মাঝে মাঝে আশ্চর্য সব চিন্তায় অবশ হয়ে যেতে থাকে।

শ্রাবণী উঠে পড়ল। বাথরুমে ঢুকে চোখে-মুখে সামান্য জল দিয়ে মুখ মুছল তোয়ালে। শরীরের গরমটা যাচ্ছে না। সে আপাতত ঘাড়ে গলায় জল দিয়ে শরীরটাকে সামান্য ঠান্ডা করতে চাইল। কিন্তু পারছে না। সে তবু বাথরুম থেকে বের হবার আগে সামান্য হালকা প্রসাধন করে নিল। বাবা বসে রয়েছে কে জানে।

স্বর্ণমুকুট

শনি, রবিবারই তার পক্ষে প্রশস্ত সময়।

শনিবারেই প্রিয়তোষ অফিস থেকে সোজা শীতলকুচিতে চলে যায়। বাসে ঘন্টাখানেক, তারপর কিছুটা কাঁচা রাস্তায় তাকে হাঁটতে হয়। গ্রাম জায়গা, ঠিক গ্রাম জায়গা বললেও ভুল হবে, ঘরবাড়ি প্রায় নেই বললেই চলে। কাশের জঙ্গল কিংবা মাঠ পার হয়ে খাল, খালের পাড়ে পাড়ে কিছুটা পথ, তারপর ঝোপ-জঙ্গলের মধ্যে কাঠাপাঁচেক জমি তার। জমিটা এক লণ্ঠনওলার। সে জমিটা বেশিদাম পাওয়ায় ছেড়ে দিচ্ছে। তার কুঁড়েঘরটি আছে। প্রিয়তোষের জায়গাটা পছন্দ হয়ে যাওয়ার পর এই কুঁড়েঘরটায় সে শনি, রবিবার গিয়ে থাকে।

এবারে সে বেশ মুশকিলেই পড়ে গেছে।

পানু প্রায়ই বলবে, বিশেষ করে শনিবার সকালে, "বাবা, তুমি আজ যাচ্ছ।"

'যেতেই হবে। জঙ্গল সাফ করে ইট বালি পড়ার কথা। কতটা কী হল না গেলে বুঝব কী করে।'

'তুমি যে বলছিলে আমায় নিয়ে যাবে। ডাহুক পাখি দেখাবে।'

প্রিয়তোষের এই স্বভাব। সোমবার অফিস করে বাড়ি ফিরলেই, নমিতা, পানু, এবং মা নানা প্রশ্ন করবেন। তারাও দু-একবার গেছে। নমিতা জমিটা কেনার আগে একবার গিয়েছিলেন, তাঁর খুব পছন্দ হয়নি। বরং কিছুটা ক্ষুব্ধই বলা চলে। শহরের কোনো সুবিধেই নেই, পানুর স্কুল, অসুখবিসুখে ডাক্তার এইসব অসুবিধের কথা উঠেছে। তবে এটাও ঠিক প্রিয়তোষের ক্ষমতাই বা কতটুকু, তার সামান্য চাকরি, এবং কিছু টিউশনি ছাড়া অর্থ উপার্জনের বড়ো আর কোনো উপায় নেই। সামান্য সঞ্চিত টাকায় বাস-রাস্তা থেকে এত কাছে জমি পাওয়াই কঠিন। জায়গাটার উন্নতি কবে হবে তাও ঠিক বলা যায় না। তবু কেন যে প্রিয়তোষের এত পছন্দ ! আসলে গাছপালা এবং কিছু গরিব মানুষজন, যেমন লণ্ঠনওলার কথাই ধরা যাক, সে নিজের বাড়িতে বসেই ঝালাই করে, কুপিলম্ফ তৈরি করে এবং ঝুড়িতে বয়ে নিয়ে যায় গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে। কোনো ছকবাঁধা জীবন নয় তার। প্রিয়তোষের মনে হয়েছিল লোকটি একেবারে স্বাধীন। ঝোপজঙ্গলের ডাহুক

পাখি, তা ছাড়া কাশের জঙ্গল পার হয়ে ঘাস এবং মাঠ সহ কিছু সাদা বকের ওড়াউড়িও তার পছন্দ। খুবই নিরিবিলি জায়গা। কোনো ব্যস্ততা নেই। কেমন এক নৈঃশব্দ্য রাতে বিরাজ করে। খাল পাড় হয়ে একটা শালের জঙ্গল আছে, সেখানে শেয়ালেরা রাতে হুক্কাহুয়া করে ডাকে।

আসলে প্রিয়তোষেরা তিন পুরুষ ধরে ভাড়াবাড়ির বাসিন্দা। তাঁর বাবা শ্যামবাজারের এঁদোগলিতে সেই যে দেশ ভাগের পর এসে উঠেছিলেন আর নড়ার নাম করেননি। রাস্তায় ছিটকাপড়ের ব্যবসা, যার নাম হকারি, এই করে দিনযাপন। যাই হোক, প্রিয়তোষও এই বাসায় শৈশব থেকে বড়ো হয়েছে। ঘুপচিমতো ঘরে এত অন্ধকার যে, দিনের বেলাতেও আলো জ্বেলে রাখতে হয়। চারতলা বাড়ির একতলার স্যাঁতসেঁতে ঘরে তার শৈশব যৌবন কেটেছে, কোনোরকমে পাশটাশ দিয়ে সরকারি অফিসের আবহমানকালের কেরানিগিরিতে ঢুকে যাওয়া ছাড়া উপায়ও ছিল না তার। তার ছেলে পানুও জন্মেছে হাসপাতালে, বড়ো হচ্ছে এ-বাড়িতে। টাউন স্কুলে পড়ছে। কাজেই যুক্তির কোনও স্বাদ সে জায়গাটায় গিয়ে আবিষ্কার করে ফেলতেই পারে।

বাড়ি কবে হবে সে অবশ্য জানে না। আর হলেও, এমন একটা জনশূন্য মাঠের মধ্যে থাকা খুব সহজ কথা নয়। তবে স্বপ্ন, পাঁচ কাঠা জমির সবটাই তার। পানু সবসময়ই চঞ্চল স্বভাবের। ভূতের গল্প গোয়েন্দা গল্পের মতো কোনো ঘ্রাণ সে সেখানে না গিয়েও যেন পায়। বাবা কেন যে কিছুতেই নিয়ে যেতে চান না, সে তাও বুঝতে পারে না।

কবে যাবে, বায়না ধরলে, বাবার এক কথা, 'অতটা রাস্তা হেঁটে যেতে পারবি না। মাঠের মধ্যে একটা কুঁড়েঘরে থাকতে তোর একা ভয় করবে। আমার তো কত কাজ!'

'কেন, তোমার লণ্ঠনওলা!'

'আরে সে কখনো ফেরে, কখনো ফেরে না। তার কোনো ঠিক আছে? তাকে আমি থাকতে বলেছি বলে থাকে। সংসারে সে একা মানুষ, বেশিকিছু তার লাগেও না। বয়সেরও গাছ পাথর নেই। খোকাবাবুর জন্য সে একটা জাদুর লণ্ঠন বানিয়ে দেবে, ওটা হয়ে গেলেই সে দেশ ছেড়ে চলে যাবে।'

'কোথায় যাবে বাবা?'

'কোথায় যাবে, তা অবশ্য কিছু বলেনি।'

তারপরই কী ভেবে প্রিয়তোষ বলেছিলেন, 'ওর অবশ্য নদীর পাড়ে বাড়ি করার খুব ইচ্ছে। এই যেমন বলে, একটা গাছ, তার নীচে কুঁড়েঘর, সামনে নদী, নদীর জলে স্বর্ণমুকুটের প্রতিবিম্ব।'

'স্বর্ণমুকুট। তার মানে!'

'ওর এইরকমেরই কথা। হয়তো বলতে চেয়েছে, নদীর জল কলকল ছলছল। কলকল ছলছলই ওর কাছে স্বর্ণকুট হয়ে গেছে। জলে তার স্বর্ণমুকুট ভেসে যাচ্ছে সে দেখতে পায়।'

'লোকটা খুব তাজ্জব কথা বলে। তোমার বন্ধু না বাবা?'

'তা ওইরকমের। নামটাও ভারি মজার। তালেব সরকার। সে অবশ্য বলেছে, কর্তাঠাকুর আমাকে তালেব বলেই ডাকবেন।'

'তোমাকে কর্তাঠাকুর বলে কেন?'

'আমার গলায় পৈতে আছে না! পৈতে থাকলে কর্তাঠাকুর ছাড়া সে কিছু ভাবতে পারে না। আমি গেলে তার কাজ বাড়ে। সে আমাকে কিছুই করতে দেয় না। জল তুলে আনা, কাঠকুটো জোগাড় করা, উনুন গোবরে লেপে একেবারে নিরামিষাশী বামুনের আহারের সুবন্দোবস্ত। মাচানে শিম, লাউ, খেতে বেগুন, গাছের কাঁচালঙ্কা তার জমিতেই হয়। কাঠাখানেক জমিতেই প্রচুর ফলন।'

'তালেব গাছ লাগায় বাবা?'

'লাগায়। তবে ওই শিম, লাউ, বেগুনের চারা। সেখানে গেলে দেখতে পাবে গাছ লাগালে বড়ো হয় কী করে।'

পানুর অবশ্য একটা ফুলের টব আছে। টবে সে গাছ লাগায়। তবে বাঁচে না। রোদ না পেলে গাছ বাঁচবে কেন! সে একটা ভুইচাঁপা লাগিয়েছিল, গাছটা বাঁচেনি। সে রথের মেলা থেকে দোপাটি ফুলের চারা এনেছিল, বাঁচেনি। স্যাঁতসেঁতে অন্ধকার ঘরে গাছ বাঁচতে চায় না। মেলা রোদ সে রাস্তায় গেলে দেখতে পায়, অথচ বাড়িটায় তাদের রোদই ঢোকে না। বাবা খোলামেলা জায়গায় জমি কিনেছে, রোদ অহরহ এখানে-সেখানে ঘুরে বেড়ায়, আর রাজ্যের পাখপাখালি, অর্থাৎ প্রাণীজগতের সাড়া পাওয়া যায়, এমন একটা জায়গায় সে না গিয়ে থাকে কী করে!

বাবা সব বলেন না। সেখানে গেলে সে যেন ঠিক একটা ছোট্ট টিলা আবিষ্কার করে ফেলবে। এবং জন্তু-জানোয়ারেরাও ঘুরে বেড়াতে পারে, সে কাঠবেড়ালি, খেঁকশেয়াল গেলেই দেখতে পাবে, সোনালি হয়ে সে ঘুরে বেড়াতে পারবে—কী মজা! সে তো কার্টুন ছবির যম। সুপারম্যান, স্পাইডার ওম্যান, টিনটিনরা বোধ হয় সেইসব ঝোপজঙ্গলেই লুকিয়ে থাকে। টিভিতে সে যা দেখে, সবই সেখানে ঝোপজঙ্গলে লুকিয়ে আছে এমন মনে হয় তার। বাবা যায়, মাও ঘুরে এসেছে, ঠাম্মা যায়নি, সেও যায়নি। তার খুবই রাগ হয়। রাগ হলে নানা ঝামেলা পাকাতে ওস্তাদ। সে না খেয়ে রাস্তায় দৌড়ে চলে যায়। ফুটপাথ ধরে দৌড়য়।

বাবা পড়ে যান মহাফাঁপরে। সে রাস্তাতেই হাত-পা ছুড়তে থাকে, বাজারের সামনে ফুল বিক্রি করে কদম ঠাকুর, সেই বলবে, 'নিয়ে গেলেই পারেন। ছেলেমানুষ, অলিগলিতে কাঁহাতক ঘুরে বেড়াতে পাবে!'

পানু একদিন বলেই ফেলল, 'বাবা সেখানে ভালুক আছে?'

'না নেই।'

'বাঘ, হরিণ, টিয়া?'

'টিয়া আছে। বাঘ, হরিণ নেই।

'আছে। তুমি দেখতে পাও না। তালেবকাকা সব জানে। তালেবকাকার কুকুর আছে?'

'তা আছে। নেড়ি কুকুর। কুকুরটা তালেবের সঙ্গে সঙ্গে ঘোরে।'

'কথা শোনে?'

'কথা শুনবে না কেন?'

'দু'পা তুলে নাচতে পারে?'

'তুই থামবি পানু?'

'কবে নিয়ে যাবে, আমাকে কবে জাদুর লণ্ঠন দেবে তালেবকাকা। আমি খাব না বলে দিলাম। আমার রাগ হয় না! দেখবে একদিন আমি নিজেই বের হয়ে যাব। জায়গাটা খুঁজে দেখা দরকার। ঘুরতে ঘুরতে ঠিক জায়গায় চলে যাব!'

এই রে! বের হয়ে যেতেই পারে পানু। স্কুলের নীচু ক্লাসে পড়ে। মা তাকে দিয়ে আসে, নিয়ে আসে। এক দুপুরে গিয়ে যদি দেখে পানু স্কুলে নেই, না বলে না কয়ে স্কুল থেকে পালিয়েছে, তা হলেই সমূহ সর্বনাশ।

বাধ্য হয়ে প্রিয়তোষ না বলে পারলেন না, 'তুমি যাবে।' নমিতাকেও বললেন, 'ওকে জায়গাটা ঘুরিয়ে দেখাব। জায়গাটা নিয়ে পানু নানা আজগুবি চিন্তাভাবনা শুরু করে দিয়েছে। কাটুনের সব চরিত্র সেখানে পালিয়ে আছে কখন কী করে বসবে তার চেয়ে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া ভাল। শনি, রবিবার থাকব। প্যান্ট-শার্ট আলাদা দিয়ে দেবে। পানুর উদ্ভট চিন্তাভাবনা আমার একদম পছন্দ না।'

'তুমি ছেলেটাকে নিয়ে শেষে জঙ্গলে রাত কাটাবে! আমার কিন্তু ভালো লাগছে না।'

'তোমার ভালো লাগছে না, কিন্তু ছেলেটা সেখানে একা চলে গেলে তোমার ভালো লাগবে !'

নমিতা অগত্যা নিমরাজি না হয়ে পারল না।

পানু যাবে শুনেই ঘরের মধ্যে ছুটে বেড়াতে থাকল। রাস্তায় ছুটে গেল। ফুল বেচে খায় লোকটাকে বলল, 'বাবা আমাকে নিয়ে যাবে বলেছে।'

এক সকালে প্রিয়তোষ, পানুকে নিয়ে বের হয়ে পড়লেন। তাকে নিয়েই অফিসে যেতে হল। শীতলকুচিতে যান বলে অফিসের কাজ আগেই হালকা করে রাখেন। অফিস থেকে তাড়াতাড়ি বের না হলে দিন থাকতে জায়গাটায় পৌঁছনো অসম্ভব।

তাঁকে লাউহাটির বাস ধরতে হবে। অফিস ছুটি হলে বাসে জায়গা পাওয়াই মুশকিল। ঘন্টাখানেক আগে এসেও জায়গা পেল না। দুটো বাস ছেড়ে দিতে হল। পরের বাসে সামনের দিকে জায়গা পেয়ে গেলেন! সঙ্গে একটা ব্যাগ, একটা ওয়াটার বটল। মাঝে-মাঝেই পানু চুক চুক করে জল খাচ্ছে। কোনো উত্তেজনায় পড়ে গেলে এটা তার হয়।

বাসটা এয়ারপোর্ট থেকে জানদিকে ঘুরে গেল। পানু এতক্ষণ একটা কথাও বলেনি। চারপাশে যা দেখছে—পাকা বাড়ি, হাইরাইজ বিল্ডিং, এবং প্রশস্ত রাস্তা সবই তার চেনা। এসব দেখে তার বিন্দুমাত্র কৌতূহল সৃষ্টি হয়নি। এমনকী এয়ারপোর্টের উড়োজাহাজও তার কোনো আগ্রহ সৃষ্টি করতে পারেনি। ক্রমে বাড়িঘর কমে আসতে থাকলে, বড়ো বড়ো গাছ এবং দুটো-একটা বাংলো টাইপের বাড়ি দেখে কিঞ্চিৎ সে উৎফুল্ল হল। বাস কিংবা অটোরও উৎপাত নেই। দুটো ভ্যানে কিছু লোকজন যাচ্ছিল সে বলল, 'বাবা দ্যাখো দ্যাখো, ওদিকে তাকাও না!'

প্রিয়তোষ দেখলেন, দু-পাশে নয়ানজুলি, দুটো ভ্যান, তারপরই যতদূর চোখ যায় মাছের ভেড়ি—জল আর জল। এবং কিছু ধানের জমি। আসলে সামনেই তাদের নামতে হবে। তারপর হাঁটা। এবং কিছুটা ধানের জমি। কিছুটা রিকশায় গিয়ে নামতে পারে। তবে ঘুরপথ হয়ে যাবে। পানু একবার নুয়ে ব্যাগ খুলে কী দেখল!

'কী খুঁজছিস?'

সে টেনে বের করল।

প্রিয়তোষ দেখলেন পানু তার এয়ারগান লুকিয়ে সঙ্গে নিয়ে এসেছে।

পানুর বড়োমামা জন্মদিনে এয়ারগানটা দিয়ে গেছেন কবে যেন। এমন একটা স্যাঁতসেঁতে বাড়িতে পানু এয়ারগান দিয়ে কী করবে! টিকটিকি, বড়োজোর দুটো একটা ইঁদুরকে তাড়া করতে পারে। রাস্তার কুকুরকে অবশ্য একবার তাড়া করতে গিয়ে পানুর খুবই ভোগান্তি হয়েছিল। কুকুরের কামড়ে যে জলাতঙ্কের বিষ থাকে সেবারে সুচ ফোটাতে ভালোই টের পেয়েছিল পানু। তারপর বোধহয় সে তার এয়ারগানটার কথা ভুলেই গিয়েছিল—সে জঙ্গলে যাচ্ছে, এয়ারগানটা খুবই জরুরি এখনও মনে হতে পারে তার।

পানু তার বাবার সঙ্গে হাঁটছিল। রাস্তার ডানপাশের ভেড়ি ফেলে তারা মাঠের দিকে নেমে গেল। মানুষের কিছু ঘরবাড়িও পার হয়ে গেল তারা। বেড়ার ঘর, নিকোনো উঠোন এবং মানুষজনের সাড়াও পাওয়া গেল। দুটো গোরুর গাড়ি আসছে বাঁশ বোঝাই হয়ে। প্রিয়তোষ একপাশে ছেলের হাত ধরে সরে দাঁড়াল। বাঁশের গাড়ি দেখে পানুর আবার জলতেষ্টা পেল। সে জল খেয়ে ছুটল বাবার পিছু পিছু।

তারপরেই ধানের মাঠ। এবং আল ধরে হাঁটা। কোনো আর রাস্তাই নেই। সে শামুক গুগলি দেখল, ধানগাছের গোড়ায় ভেসে বেড়াচ্ছে। দুটো হলুদ রঙের পাখি উড়ে গেল। কিঁউ কিঁউ করে ডাকছে। আশ্চর্য এক জগৎ ক্রমে যেন উদ্ভাসিত হচ্ছে। দিগন্ত দেখা যাচ্ছে। এর পরে বোধ হয় নির্জন খাঁ খাঁ প্রান্তর। খুবই রোমাঞ্চ বোধ করছে পানু। বাবা সঙ্গে থাকায় তার বিন্দুমাত্র ভয়ডর নেই। সেই স্বর্ণমুকুটের লোকটাকেও সে এবার ঠিক দেখে ফেলবে। হাতে জাদুর লণ্ঠন নিয়ে হাজির।

তারপর তারা কাশের জঙ্গলেও ঢুকে গেল। যেদিকে তাকায় পানু, কিছুই আর দেখতে পায় না। কাশের জঙ্গলে তার মাথা ঢেকে গেছে। কিছুটা যেন পাতাল প্রবেশের মতো মনে হচ্ছিল পানুর। যদি এ-সময়ে স্বর্ণমুকুটের লোকটা জঙ্গলের ভেতর থেকে সহসা হাত ধরে টানে, তবে সে নির্ঘাত চিৎকার করে উঠবে। তার যে ভয় ভয় করছিল। এতটা রাস্তা হেঁটে সে খুবই কাহিল হয়ে পড়েছে। ঘামে জবজবে হয়ে গেছে শার্ট-প্যান্ট। ফেব্রুয়ারির মনোরম ঠান্ডা হাওয়াতেও পানু দম পাচ্ছে না। কেবল থেকে থেকে বলছে, 'বাবা আর কতদূর' !'

'দ্যাখ পানু, এটুকু হেঁটে আর কতদূর বললে কিন্তু সেখানে গিয়ে কোনো মজা পাবি না। এই যে হেঁটে যাচ্ছিস, দু-পাশে মাঠ এবং সূর্যাস্তের কাছাকাছি সময়কার পৃথিবীকে দেখতে পাচ্ছিস, এ বড়োই বিরল দৃশ্য। তুই ছেলেমানুষ, এসব বুঝতে শেখ।'

এমন কথায় পানুর খুবই অভিমান হল। আবার ভাবল, বাবা তাকে বোধ হয় গুরুত্ব দিতে চান না। সে 'তা একবারও বলেনি, 'বাবা, আমি একটু বসব। এসো গাছটার নীচে বসে একটু জিরিয়ে নিই।' বললেই যে সে বাবার কাছে ছোট হয়ে যাবে। বাবা ঠিক বলবেন, 'জানিস পানু, এজন্যই তোকে নিয়ে আসি না।' সে তো শুধু বলেছে, 'আর কতদূর?'

সঙ্গে সঙ্গে মনে হল কাশের ঝোপ ফাঁকা হয়ে গেছে। সামনে সেই মাঠ এবং খালপাড়ের দৃশ্য। একটা লোকও দেখা যাচ্ছে, পায়ের কাছে একটা কুকুর লেজ নাড়ছে। যদিও এত দূর থেকে সব স্পষ্ট নয়, কারণ সূর্যাস্ত হচ্ছে, লাল রঙিন এক জগৎ। এবং তার ভেতর একটা মানুষ আর কুকুর কী যে সুমহান কাব্যগাঁথা। সে তার স্যারের ভাষায় দৃশ্যটাকে উপভোগ করার চেষ্টায় চোখ মেলে তাকাতেই মনে হল লোকটা পরে আছে একটা ঢোলা

কালো হাফপ্যান্ট, গায়ে ফতুয়া, মাথায় যেন সত্যি স্বর্ণমুকুট। লোকটা এগিয়ে আসছে, কুকুরটা এদিক ওদিক ছুটছে। লাফাচ্ছে। লেজ নাড়ছে।

প্রিয়তোষ বললেন, 'ওই আসছে তালেব। আজ বোধহয় ফেরি করতে বের হয়নি। তুই যে আসবি তালেব জানে।'

কিন্তু পানু কী বলবে! এমন নিঃসঙ্গ প্রান্তরে একজন মানুষ রাজার মতো দাঁড়িয়ে থাকলে সে কী করতে পারে! মাথায় যে ওটা কী! কখনও মনে হয় নীল কাপড়ের ফেটি, তারপরই সূর্যাস্তের রঙে কেন যে চিকমিক করে উঠতে উঠতে হিরে-জহরত মণিমাণিক্যে ভরা মনে হয়। মনে হয় স্বর্ণমুকুট। এমন একজন মানুষ নদীর পাড়ে বাড়ি করবে ভেবে জমি-জায়গা বিক্রি করে চলে যেতেই পারে। তার যে চাই স্বর্ণমুকুট।

সে নদীর জলে স্বর্ণমুকুট ভেসে যেতে দেখে মাঝে-মাঝে। আর হাতে ওটা কী! কাছে যেতে যেতে সে বুঝল, ওটা লণ্ঠন। জাদুর লণ্ঠন কি না জানে না, কারণ তখন সাঁঝবেলা, আকাশে দুটো-একটা নক্ষত্র ভাসমান, আর হাতে জাদুলণ্ঠনে সে দেখল একটা নক্ষত্র তালেব চুরি করে কাচের ভেতর ভরে রেখেছে। নক্ষত্রটা মিটমিট করে জ্বলছে এবং আলো দিচ্ছে।

সে কেমন মুগ্ধ বিস্ময়ে তালেবের কাছে আসতেই অবাক চোখে দেখল—হাতের লণ্ঠন দুলছে। আলো দিচ্ছে। অন্ধকার চরাচরে লণ্ঠনের এই আলো পানুকে পৃথিবীর অন্য এক প্রান্তে সত্যি যেন হাজির করে দিয়েছে।

'তালেব, তুমি আজ ফেরি করতে বের হওনি দেখছি।'

'বের হয়েছিলাম। রাস্তায় মনে পড়ে গেল, খোকাবাবু আসবেন। আমার আর যেতে ইচ্ছে করল না।'

পানুর দিকে তাকিয়ে বোধ হয় মনে হল মুখখানা ভাল দেখতে পাচ্ছে না, লণ্ঠন তুলে কাছে নিয়ে দেখতে দেখতে বলল, 'কী গ খোকাবাবু, চোখে যে আপনার স্বপ্ন ঝোলে—মাকে ছেড়ে এলেন। থাকতে কষ্ট হবে না?'

পানু বলল, 'তুমি টায়ারের স্যান্ডেল পরে আছ কেন? মাথায় নীল কাপড়ের ফেটি কেন?'

হা হা করে হাসল তালেব।

পানু বুঝতে পারল না দূরে সূর্যাস্তের সময় লণ্ঠনওলার নীল রঙের পাগড়ি কেন তার চোখে স্বর্ণমুকুট হয়ে দেখা দিল। এ এক আশ্চর্য অবলোকন, অথবা কোনো ঘোর থেকে সে দেখে ফেলেছে, লণ্ঠনওলার মাথায় স্বর্ণমুকুট।

সে বলল, 'তুমি স্বর্ণমুকুট পরেছিলে?'

'পরেছিলাম।'

'এখন দেখছি নীল কাপড়ের ফেট্টি তোমার মাথায়!'

সে আবার আগের মতোই হা হা করে হাসতে হাসতে মাথা থেকে নীল পাগড়ির কাপড়টা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে প্যাঁচ খুলে মাথা নুইয়ে দেখল।

'এ মা, তোমার এক্কে !বারে টাক মাথা।'

'হাত দিন মাথায়' বলে লণ্ঠনওলা পানুর হাত তুলে মাথায় ঘষে দিতে দিতে বলল, 'মানুষের যে চাই স্বর্ণমুকুট। কর্তাঠাকুরকে আমার জমি বিক্রি করে দিলাম, সেই লোভে, নদীর পাড়ে বাড়ি, আর নদীর জলে স্বপ্ন দেখা, আপনি বড়ো হতে হতে টের পাবেন।'

এতসব ভারি কথা পানু বোঝে না। সে বলল, 'একটা নক্ষত্র যে তুমি চুরি করেছ আমি জানি।'

'আপনি জানবেন না হয়!'

'তুমি সত্যি তবে চুরি করেছ?'

'তা করেছি।'

'লণ্ঠনের কাচের ভেতর ওটা রেখে দিলে কেন?'

'তা না হলে আলো যে জ্বলে না।'

পানু ভেবে পেল না, লণ্ঠনওলা, মানুষ না অপদেবতা।

সে বলল, 'তুমি কি ভূত!'

এবারে প্রিয়তোষ ধমক না দিয়ে পারল না।

'পানু, এমন বলতে হয় না।'

তারপর তালেবের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আরে তোমরা যে এখানেই জমে গেলে। আরও যে হাঁটতে হয়।'

তালেব বলল, 'চলেন। খোকাবাবুকে আমি কাঁধে নিচ্ছি। কতটা রাস্তা, খোকাবাবু পারবে কেন।'

পানু এক লাফে সরে দাঁড়াল। বলল, 'না, না, আমি হেঁটেই যেতে পারব। কাঁধে নিয়ে তালেব যদি হেঁটে চলে যায়, তাকে নিয়ে ফেরি করতে বের হয়ে যায়—সে হয়তো আর কোনোদিনই তার মায়ের কাছে ফিরে যেতে পারবে না।'

তালেব আগে লণ্ঠন দুলিয়ে হাঁটছে।

কুকুরটা আরও আগে দুলকি চালে ছুটছে।

পানু খুবই কাহিল, সে হাঁটতে পারছে না। পায়ে খুব লাগছে, সে বলতেও পারছে না, তার কষ্ট হচ্ছে, বললেই বাবা বলবেন, এজন্যই তোমাকে নিয়ে আসতে চাই না। সে কিছুটা খুঁড়িয়ে হাঁটছে। অন্ধকারে কেউ টের পাচ্ছে না।

তার তালেবকে এখন নানা প্রশ্ন।

'এখানে একটা টিলা আছে?'

'তা আছে।'

'ভালুক আছে?'

'তাও আছে।'

'টিনটিন।'

টিনটিন। তালেব আর কিছু বলতে পারল না। টিনটিন বলে কোনো জন্তু-জানোয়ার আছে সে জানেই না। তালেবের মুখে রা নেই।

'কী হল, কথা বলছ না তালেব?'

'এই, কী হচ্ছে অসভ্যতা! তোমাকে বলেছি না, তালেবকাকা ডাকবে।' প্রিয়তোষ পানুকে ধমক দিলেন।

সে তালেবকাকা ডাকবে কী করে! তালেব অপদেবতা না ভূত, কিছুই বুঝতে পারছে না, তাকে সে তার খুড়োমশাই ভাবে কী করে। সেও কেমন চুপ মেরে গেল। সে বলতে পারল না, জঙ্গলে বাঘ নেকড়ে পুষে রেখেছে তালেব আমি জানি।

এখন সবাই চুপচাপ ! তালেব টিনটিন নিয়ে ধন্দে পড়ে গেছে। তার পৃথিবীতে ঝোপজঙ্গল জোনাকি, জনমনিষ্যিহীন এক প্রান্তর, প্রান্তর ঠেলে দিগন্তে সব প্রায় মাঠ। মানুষের বসতি, সে ফেরি করতে করতে দু-দিনের রাস্তা হেঁটে চলে যায়, ফেরার পথে গঞ্জ থেকে চাল ডাল তেল নুন কেরোসিন কিনে তার জঙ্গলের ঘরে ফিরে আসে, কোথাও সে টিনটিন কিনতে পাওয়া যায় কি না জানে না। কিংবা টিনটিন জঙ্গলে থাকলে তার চোখে একবার অন্তত পড়ত না, হয় না। সে খোকাবাবুর কথায় এমন জব্দ যে, আর তার রা সরল না।

প্রিয়তোষ জঙ্গলে আঙুল তুলে বলল, 'আমরা এসে গেছি।'

আসলে তালেব খোকাবাবুর সব কথাতেই সায় দিয়ে যাচ্ছিল। থাকুক না থাকুক, খোকাবাবু খুশি হলেই সে খুশি। কিন্তু টিনটিন সম্পর্কে সে কিছুই জানে না। টিনটিন বাস না উড়োজাহাজ, টিনটিন বিষয়টি বড়ই গোলমালে ফেলে দিয়েছে তাকে। যে নক্ষত্র চুরি করতে সাহস পায়, মাথায় যার স্বর্ণমুকুট থাকে, সে বলেই বা কী করে, এত খবর রাখি খোকাবাবু, তোমার টিনটিন বিষয়টি আদৌ বুদ্ধিগ্রাহ্য হচ্ছে না আমার! এখন কথা বললেই সে খোকাবাবুর কাছে একেবারে বুদ্ধু বনে যাবে। সে শুধু বলল, 'সকাল হলে আমরা খুঁজে দেখব টিনটিন কোথায় আছে।'

এতে পানু বড়োই আহ্লাদ বোধ করল।

জঙ্গলের ভেতর দিয়ে একফালি রাস্তা। পাশাপাশি দু-জনে হাঁটা যায় না। ঝোপজঙ্গলের লতাপাতা গায়ে লাগছে পানুর। সে বাবার প্রায় গা ঘেঁষে হাঁটবার চেষ্টা করছে। এত অন্ধকার চারপাশে যে, লোডশেডিং না হলে এমন অভিজ্ঞতা হওয়াও কঠিন। পানু দেখল, সামনে উঠোন, কুঁড়েঘরের বারান্দাও দেখতে পেল। একপাশে বাঁশের মাচান, মাচানে ব্যাগ, ব্যাগের ভেতর ঝালাইয়ের যন্ত্রপাতি, কাটা টিনের পাত দলাপাকানো। কাঠের তিন-চার রকমের হাতুড়ি। সে বারান্দায় উঠে যাওয়ার সময় সহসা কী এক আর্তনাদে চমকে গেল।

প্রিয়তোষ বললেন, 'ডাহুক পাখিরা ডাকছে।'

কেমন এক কলরব, পাশে একটা জলা আছে, জলাজঙ্গলে ডাহুক পাখিরা ডাকে, এবং পানু আসায় ওরা যে আহ্লাদে আটখানা, প্রিয়তোষ তাও জানিয়ে দিলেন। ডাহুকেরা একসঙ্গে ডেকে উঠলে আর্তনাদের মতো শোনায়, তাও বুঝিয়ে বললেন প্রিয়তোষ। পানু কিছুটা নিজের মধ্যে ফিরে আসায় ঝিঁঝি পোকা ও কীটপতঙ্গের আওয়াজ শুনতে পেল।

আর তখনই একটা কুপি ধরিয়ে তালেব বাইরে রেখে দিল। দুটো পাথর, পাশে এক বালতি জল, পাথরের ওপর দাঁড়িয়ে প্রিয়তোষ হাতমুখ ধুলেন, পানুকে হাতমুখ ধুয়ে নিতে বললেন। রাতে বেশ ঠান্ডা পড়ে। পানুকে জামা-প্যান্ট সোয়েটার বের করে দিয়ে বললেন, 'ধুলো ময়লায় সব নোংরা হয়ে গেছে, সব পালটে নাও।'

তালেব এখন আর একটা কথাও বলছে না। তার যে মেলা কাজ। কাঠকুটো ধরিয়ে চা আর চিঁড়েভাজা কাঠের সরাতে সাজিয়ে দিল। প্রিয়তোষ গামছায় মুখ মুছতে মুছতে বলল, 'শ্যামলাল আর এসেছিল?'

তালেব বলল, 'জি, শ্যামলাল মিস্ত্রির সঙ্গে দেখা হয়েছে। সে তো আপনার বাড়ি যাবে বলেছে। ইট বালি নৌকোয় খালে-খালে নিয়ে আসবে বলল, কত ইট ফেলবে, তা তো বলে যাননি।'

‘শোনো তালেব, এই একটা থাকার ঘর, কিচেন আর একটা বাথরুম—এই হলেই চলবে। তবে সব একসঙ্গে করার ক্ষমতা আমার নেই। শেষ পর্যন্ত কী হবে তাও বলতে পারব না। একটা স্বপ্ন বুঝলে, নিজের ঘরবাড়ি, তবে বাড়িটা শেষ পর্যন্ত যে ভণ্ডুলমামার বাড়ি হয়ে যাবে না, তাও বলতে পারব না। একদিকে তুলব, আর একদিকে পড়ে যাবে। হাতে এত টাকা কোথায়! মাঠ ভেঙে সরকারি টিউকল থেকে জল আনারও অনেক হ্যাপা। তুমি না থাকলে কে করবে সব ! এ-জীবনে আর তোমার নদীর পাড়ে বাড়ি নাই বা হল।’

পানুর এসব বিষয়ী কথাবার্তা একদম পছন্দ না। সে ঘরের ভেতর মাটির মেঝেতে মাদুরে বসে চিঁড়েভাজা আর রসগোল্লা খাচ্ছে। টিফিন ক্যারিয়ারে মা আসার সময় ভরে দিয়েছেন।

ঘরে সেই জাদুর লণ্ঠনটা জ্বলছে। বাবা জলচৌকিতে বসে আছেন তার। দারান্দায় উনুনে মুগের ডাল ভাজা হচ্ছে। মুগের ডাল, বেগুনভাজা, আর গরম ভাত—পানুর যে খুব খিধে পেয়েছিল, তার খাওয়া দেখেই বোঝা যাচ্ছিল।

তালেব কাজও করছে, কথাও বলছে, বাবা এটা-ওটা এগিয়ে দিচ্ছেন, যেন কতকালের এই সখ্য।

তালেব বলল, ‘এবারে জল ঢেলে দিন।’

প্রিয়তোষ উঠে কড়াইয়ে জল ঢেলে দিতেই ছ্যাঁক করে উঠল। প্রিয়তোষ ডাল, বেগুনভাজা নামিয়ে রাখলে তালেব বলল, ‘‘বড়ো ধন্দে পড়ে গেলাম কর্তাঠাকুর।’’

‘তোমার আবার কিসের ধন্দ।’

‘ওই যে খোকাবাবু বলল, তিনতিন না টিনটিন—ওটা খায় না ওড়ে, ঠিক বুঝতে পারছি না।’

প্রিয়তোষ হেসে ফেললেন, ‘‘আরও ওসব হচ্ছে ছবিতে গোয়েন্দা সিরিজ। মাথায় টাক যখন আছে দাড়ি থাকলে জাহাজের কাপ্তান হয়ে যেতে পারতে। টিনটিন খোকাবাবুর মতো একটা বাচ্চা ছেলে। তোমার মতো বয়সের একজন বন্ধু আছে তার। টিনটিনের কাছে কোনো অপরাধীরই ক্ষমা নেই। টিনটিন চোর ধরে বেড়ায়। পানু ছবির গল্প পড়তে পড়তে ভাবে সে নিজেই টিনটিন।

টাকমাথা, উসকোখুসকো একগাল দাড়ি নিয়ে তালেব কিছুক্ষণ বসে ছিল। টিনটিন চোর ধরে বেড়ায়, কথাটাতে সে খুবই দুর্বল হয়ে পড়েছে। সে যে চুরিচামারি করত, তাও ধরে ফেলতে পারে। এই জঙ্গলের মাটির নীচে সে সব পুঁতে রেখেছে। জেল-হাজতও সে খেটেছে। জেল থেকে সে পালিয়ে এই জঙ্গলের মধ্যে আশ্রয় নিয়েছিল। সামনের একটা জলায় ডুব দিয়ে আসার সময় এসব মনে হচ্ছিল তার। স্বর্ণমুকুটের কথাও জেনে গেছে

মনে হয়। তারপর মনে হল তার, সে নিজের ঘোরেই এসব ভাবছে। কথাটা যাচাই করে দেখলে হয়!

তালেব বলল, 'কর্তাঠাকুর, স্বর্ণমুকুটের কথা কী যেন একখানা বললেন?'

প্রিয়তোষ একেবারে হাঁ।

'আমি বললাম, না তুমি বললে!'

'আমি আবার কবে বললাম?'

'তুমি একদিন বললে না, নদীর পাড়ে চলে যাবে। নদীর জল কলকল ছলছল, নদীতে স্বর্ণমুকুট ভাসে।'

'আমি একথা বলিনি।'

'না বললে পানু বলল কেন, দেখছ তালেব সোনার মুকুট পরে যাচ্ছে।'

'কখন বলল?'

'যখন কুকুরটাকে নিয়ে কলপাড়ে দাঁড়িয়ে ছিলে।'

আরও বিমর্ষ হয়ে গেল তালেব।

তারপর ইনিয়ে বিনিয়ে বলল, 'আমি চলে যাব নদীর পাড়ে বাড়ি করে। এখানে কিছুতেই থাকব না। বলে যদি থাকি, সেভাবে কথাটা বলিনি, জলে কখনও কি স্বর্ণমুকুট ভাসে' !'

প্রিয়তোষ বললেন, 'ভাসে না প্রতিবিম্ব সৃষ্টি হয়।'

'সে যাই হোক, কথাটা যদি বলেই থাকি, তবে আপনার বাড়িঘরের কথা ভেবেই বলেছি। সবারই চাই স্বর্ণমুকুট। এই ঘরবাড়ি সংসার মানুষের যে সেই স্বর্ণমুকুট লাভের আশায়। জমি কিনলেন, খোকাবাবু বড়ো হতে হতে শহরের ধস এদিকটাতেও নেমে আসবে। পাঁচ কাঠা জমি সোজা কথা! কী অমূল্য দাম হবে তখন। সেই ভেবেই কথাটা বলা।'

'ঠিক আছে, তোমার কাছে স্বর্ণমুকুট নেই। এখন পানুর একপাশে বসে যাও। তোমাদের খেতে দিয়ে আমি খেতে বসে যাব। সকাল হলে পানুকে নিয়ে একবার জঙ্গলটা ঘুরে আসবে। ছেলেমানুষ যত্তসব আজগুবি চিন্তার ডিপো। সব ঘুরিয়ে দেখালে জঙ্গল নিয়ে আর কোনো রহস্য থাকবে না। বাড়িতে তোমার বউদিকে যা জ্বালায়!'

তারপর প্রিয়তোষও খেতে বসে গেল। খাওয়া হলে বাড়তি ডাল-ভাত কুকুরটাকে দিয়ে সে ঘরে ঢুকে গেল। তালেব বাসনকোসন ধুয়ে সব এঁটো সাফসোফ করে বারান্দার

সামনে কাঁথা গায়ে শুয়ে পড়ল। শুয়ে পড়ল ঠিক, তবে তার ঘুম এল না। খোকাবাবু ঠিক টের পেয়ে গেছে, সে ভালোমানুষ না। তার চুরি চামারির স্বভাব ছিল, না হলে নক্ষত্র চুরি করার কথা উঠত না। তারপর কেন যে ভাবল সে যা খুঁজে পাচ্ছে না, খোকাবাবু তা ঠিক খুঁজে বের করতে পারবে। টিনটিনের বন্ধু। নিখোঁজ জিনিসের উদ্ধারে খোকাবাবু তাকে সাহায্য করতে পারে। সে তো আর লোভে পড়ে নেই, তার মনেও থাকে না। এই কাশের জঙ্গলে সে তার চুরি করা ধনসম্পত্তি সব মাটির নীচে পুঁতে রেখেছিল। খোকাবাবু আসায় আবার তার সব মনে পড়ে গেছে। সেখানে দিঘাপতিয়ার রাজার মুকুটটিও যে আছে, শতবার বললেও কেউ বিশ্বাস করবে না।

সকালে উঠে চিঁড়ে মুড়ি দিয়ে পানুর আহারপর্ব ভালোই হল বলা চলে। বাবা খালপাড়ে যাবে, নৌকোয় যদি শ্যামলাল থাকে, এবং তারা যাবে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াতে। পানু তার এয়ারগানটা নিতে ভুলল না। কিছু ঘুঘু পাখি উড়ে যাচ্ছিল, কিছু শালিখ পাখি, খালপাড়ে উঠে পানু দেখল, তালেবকাকা কাশবনের দিকে অপলক তাকিয়ে আছে।

সে ডাকল, 'তালেবকাকা কী দেখছ?'

তালেব কেমন উদাসীন গলায় বলল, ''একখানা কথা আছে আমার।''

'কী কথা!'

'আপনি টিনটিন, সব রহস্যভেদের ওস্তাদ। ওই যে কাশের জঙ্গল দেখছেন, তার ভেতর মেলা ধনসম্পত্তি লুকনো আছে। লোকটা খুবই আহাম্মক, পুলিশের তাড়া খেয়ে এদিকটায় এসে থমকে গেল। সে ভাবল, এমন নির্জন জায়গায়, তার ধনসম্পত্তি লুকিয়ে রাখলে কেউ টের পাবে না। যেই না ভাবা, সঙ্গে সঙ্গে কাজ শুরু। তখন উরটি মাঠ। বৈশাখ মাস, লু বইছে, গোপনে মাথাসমান মাটি খুঁড়ে সে তার ধনসম্পত্তি সব লুকিয়ে ফেলল। ত্রাসে পড়ে গেলে মানুষের যে মাথাও ঠিক থাকে না খোকাবাবু।'

পানু হাঁ করে সব শুনছে।

'তারপর।'

'তারপর লোকটা ক-বছর বিবাগী হয়ে থাকল। ওই যে নাম, ঠিক হয়তো পুলিশ টের পেয়ে গেছে, সে এদিকটায় এলেই তাকে ধরে ফেলবে, এইসব ভেবেই লোকটা চার বছর তিন মাস কুড়ি দিন বাদে যখন এল, দেখল শুধু কাশের জঙ্গল। যতদূর চোখ যায় শুধু কাশফুল। কোথায় তার লুকানো ধনসম্পত্তি টেরই পেল না। কাশের জঙ্গলে জায়গাটা ভারি মনোরম হয়ে আছে।''

'তারপর?'

‘তারপর লোকটা শ্রীপদ বাগুইয়ের কাছ থেকে জমি কিনে বসবাস শুরু করে দিল। দিনে লণ্ঠন ফিরি করতে বের হয়, রাতে কোদাল কাঁধে জঙ্গল কোপায়। ওই কোপানোই সার। এভাবে মাস যায়, বছর যায়, শেষে তার কেন যে একদিন মনে হল, জঙ্গলেরও সৌন্দর্য আছে। সে কোদাল কুপিয়ে তাও বিনষ্ট করে দিচ্ছে। ওপরওলার কাছে সে কী জবাব দেবে’ ! সেই থেকে এই মাঠ, শীতলকুচির মাঠ ঠান্ডা মেরে আছে। তার আর রূপ বদলায় না। সেই থেকে সে শুধু ভাবে, নদীর পাড়ে বাড়ি করে সে চলে যাবে।’ বলে লণ্ঠনওলা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

সব শুনে পানুর কেন যে মনে হল, লণ্ঠনওলা বড়ই দীর্ঘকায় মানুষ। তাকে সে আর ছুঁতে পারবে না—ক্রমে উঁচু লম্বা হতে হতে আকাশের দিকে তার মাথা উঠে যাচ্ছে।

পানু শুধু তার বাবার মতোই বলল, ‘তুমি আমাদের ফেলে চলে যেও না। নদীর পাড়ে বাড়ি আর তোমার নাই বা হল। নদীর জলে স্বর্ণমুকুটের প্রতিবিম্ব দেখার জন্য চলে গেলে আমরা যে খুব একা হয়ে যাব কাকা।’

আত্মসম্মান

সঞ্চারী বাস থেকে নেমে গেল। এই স্টপেই সে নামে। গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে সে কাউকে যেন খুঁজছে। শরৎকাল, এবং আকাশ নীল অর্থাৎ শরৎকালে যেমনটা হয়ে থাকে। ভ্যাপসা গরম আবার রাতের দিকে ঠান্ডা বাতাসের আমেজ। নাকে কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। বাসের ভিড়ে সে কাহিল। তখনই কে যেন বলল, পলার দোকানের দিকে গেল। ওখানে গেলে পাবেন। ওদিকটায় থাকতে পারে।

এই স্টপে পর পর কিছু চা-এর দোকান, ওষুধের দোকান, এমনকী চাউমিন, এগরোলের দোকানও আছে। বড়ো রাস্তা থেকে গাড়ি চলাচলের মতো পাকারাস্তা তার বাড়ির দিকে চলে গেছে। বাসস্টপ থেকে সে হেঁটেই বাড়ি ফেরে। মার স্কুল থেকে এতক্ষণ ফিরে আসার কথা। বাবার ফিরতে রাত হয়। বাবার ছোটাছুটিরও শেষ নেই। হুট করে দিল্লি, বোম্বাই, হায়দরাবাদ কখন যে কোথায় চলে যান, ইউনিয়নের নেতা হলে যা হয়। পেকমিশনের বিরুদ্ধে লড়ালড়ি শেষ। সব দাবিই সরকার মেনে নিয়েছে। লড়াই সার্থক। বাবা আজকাল খুবই প্রসন্নচিত্তে বেশ তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরেন। সে বাড়ি ফিরলে কারও আর চিন্তা থাকে না। বাসস্টপে নামলে, সেও ভাবে বাড়ি পৌঁছে গেছে।

যা হয়, শৈশব থেকে সে বড়ো হয়েছে এই এলাকায়। মোড়ের সব দোকানিরাই বাবার দৌলতে তাকে ভালোই চেনে। সে বাস থেকে নেমে এদিক ওদিক তাকিয়ে কী খুঁজছে তারা তাও বুঝতে পারে।

পলার দোকান সামনের খাটাল পার হয়ে দুটো কাঠের গোলাও পার হতে হয়। গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে পলার দোকান দেখাও যায়। ইতস্তত রাস্তার কুকুর যেখানে সেখানে ঘুরে বেড়ায়—পলার দোকানের সামনেও কুকুরের ঘোরাঘুরি আছে। তবে তামাটে রঙের কোনো খোঁড়া কুকুর সেখানে নেই। বাসের চাকায় চাপা পড়ে কুকুরটার অর্ধেকটা পা উড়ে গেছে। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটে। পায়ে ঘা, শুয়ে থাকলে নীল রঙের মাছির উপদ্রব, কেড়ে কুড়ে খাবার আর ক্ষমতাই নেই। ভালো করে হাঁটতে পারে না, দৌড়তে পারে না, তাকে দেখলেই কুঁই কুঁই করতে থাকে।

কেউ দিলে খায়, না দিলে গাছতলায় লম্বা হয়ে শুয়ে থাকে।

সে কলেজ থেকে ফেলার সময় কুকুরটাকে একটা পাউরুটি খেতে দেয়। কলেজে যাবার সময় টিফিন ক্যারিয়ারের সব খাবারটাই খাইয়ে যায়। কোথায় যে ডুব মারল। আর তখনই কুঁই কুঁই আওয়াজ। পেছনে ফিরে দেখল গাছের গুঁড়ির আড়ালে মুখ বার করে তাকে দেখছে। 'তুই এখানে !' বলেই কাছে ছুটে গেল। পাটা ফুলে গেছে, শরীর বিষাক্ত হয়ে যাচ্ছে, নড়তে পারছে না। কাল পরশু অথবা তারও পরে, একদিন সে ঠিক দেখতে পাবে কুকুরটা রাস্তায় মরে পড়ে আছে। তার ভিতরে খুবই কষ্ট হচ্ছিল—সে একটা পাউরুটি কিনে ছিঁড়ে ছিঁড়ে মুখের কাছে এগিয়ে দিল। লোকজন তামাশা দেখতেই ব্যস্ত। তার রাগ হচ্ছিল খুব।

অবশ্য সে জানে রাগ করে লাভও নেই। যেমন কেউ বলছিল, তোর এত নরম মন ভালো না রে সঞ্চারী। কেউ বলছিল, রাস্তার কুকুর রাস্তায় মরে পড়ে থাকে, তুই তাকে বাঁচিয়ে রাখবি সাধ্য কী' ! এরা কেউ কেউ পাড়ার দাদা কাকা, কেউ সমবয়সী, যেমন 'কেউ বলেই ফেলল, তোর সঙ্গে বাড়িতেই নিয়ে যা। তুই একা থাকিস, মাসিমা খুশিই হবেন।

সে কারও কথার জবাব দিল না। রুটি খাওয়া হয়ে গেলে, সে বটুয়া খুলে কী দেখল। তারপর রাস্তায় নেমে গেল। গাছপালা এখনও কিছু আছে, এই রাস্তায় কিছু হাই-রাইজ বিল্ডিংও উঠে গেছে। পাশের মাঠে গোলপোস্টের কাঠে দুটো কাক বসে আছে, পুকুর থেকে বণিকদের রাজহাঁসগুলি উঠে এসেছে। গলা তুলে রাজনন্দিনীর মতো হাঁটছে। তার মন কঠিন না নরম সে ঠিক বোঝে না, কুকুরটা খেতে পাবে না, না খেয়ে মরে যাবে ভাবতেই তার ভিতরে কিছু একটা তড়িৎ গতিতে প্রবাহিত হচ্ছিল, বোধবুদ্ধি এর নাম হতে পারে, অথবা মায়া, সে যাই হোক, কিছু একটা করা দরকার। মনে হতেই টিফিন বাক্সটা উপুড় করে দিয়েছিল কুকুরের মুখের সামনে। সেই থেকে চলছে।

তার সালোয়ার কামিজ আশ্চর্য রকমের সবুজ। সে লম্বা এবং তার অনায়াস বিচরণে কিছুটা মুগ্ধতা থেকে যায়। ফেরার সময় সবাই টের পায় সে ফিরছে। শ্যামলা রঙের মেয়ে সে, চোখ মুখে লাবণ্য থাকলেও সে যে দেখতে খুব ভালো না, এটা সে বোঝে। রাস্তায় সে চোখ নামিয়েই হাঁটে। কারও চোখে চোখ পড়ে গেলে তার অস্বস্তি হয়। সে ঠিক সময়ে না ফিরলে মা তার বড়ো উৎকণ্ঠায় থাকে। বার বার রাস্তায় চোখ—সঞ্চারী যদি ফেরে।

সে দূর থেকেই দেখল, গেটের মুখে সেই লোকটা দাঁড়িয়ে আছে। বাড়িতে কি কেউ নেই । মা স্কুল থেকে না ফিরলে কোলাপসিবল গেটে তালা দেওয়া থাকে। তার কাছে ডুপ্লিকেট চাবি থাকে, কেউ না থাকলেও অসুবিধা হয় না। লোকটা গতকালও ঠিক এভাবে বাড়ির সামনে দাঁড়িয়েছিল। সে না বলে পারেনি, কাল আসবেন। বাড়িতে কেউ নেই। মা স্কুলে গেছে, ফেরেনি। বাবার ফিরতে রাত হয়।

এই একটা দোষ আছে তার। 'কেউ নেই' কথাটাই যথেষ্ট। মা বাড়ি কখন ফেরে, কি ফেরে না, বাবার ফিরতে রাত হয়, কেন যে বলতে গেল! সে সোজাসুজি বলে দিলেই পারত, আপনার এত আধুনিক ফিল্টার আমাদের লাগবে না। মণিপিসি রেখেছে বলে আমাদেরও রাখতে হবে তার কী মানে আছে!

কিন্তু সোজা কথা সোজা ভাষায় বলতে তার যে আটকায়। এখন ফিরে গিয়ে লোকটার সঙ্গে আবার বক বক করতে হবে। মা বাড়ি থাকলে ঠিক জানালায় দেখা যেত। কিংবা গেট খুলে লোকটা ভিতরে ঢুকে যেত। গেটে তালা দেওয়া, লোকটাই বা যায় কোথায়। মণিপিসিরও খেয়ে দেয়ে কাজ নেই, বাড়ির ঠিকানা, গেরস্থের নাম-সহ লোকটাকে এখানে পার্সেল করে দিয়েছে। কাল মা-বাবা কেউ বাড়ি ছিল না বলে ফিরে গেছে, আজ ফের হাজির। সহজে এরা ছাড়বার পাত্র না। ছিনে জোঁকের মতো লেগে থাকার স্বভাব।

তার মন নিতান্তই ব্যাজার হয়ে গেল। কেন যে মণিপিসি পাঠাল!

আপনার পিসিমা যে বলল, অবশ্যই যাবেন। চিনি বউদিকে বলবেন, আমি রেখেছি। তারপর হাতের লম্বা বাক্সটার দিকে তাকিয়ে বলেছিল, আপনার মারও খুব ইচ্ছে কেনার। যা দিনকাল, জল খেয়ে পেটের অসুখ লেগেই থাকে। পেট ভুটভাট কত কিছু....।

ইস লোকটা কত খারাপ কথা কত সহজে বলে দিতে পারে। পেট ভুটভাট মানে তার পেটে ভুটভাট শব্দ হচ্ছে—জলে নানারকম জীবাণুও এ-বাড়ির জল খাওয়ার অনুপযোগী—সে তো কোনো অসুবিধা ভোগ করে না। মা-বাবাও না। একবার অবশ্য তার জন্ডিস হয়েছিল। সে তো শুনেছে, কোনো কিছুতেই ভাইরাস আটকানো যায় না। অকারণ এই কেনাকাটা তার খুব একটা পছন্দও না। তবু লোকটা দাঁড়িয়ে থাকলে কী করা। কিছুতেই যাবে না। রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকবে, তবু যাবে না। রাস্তায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করবে, তবু যাবে না। রাস্তার ধারে বাড়ি বলে এই এক উটকো ঝামেলা। কেউ না কেউ অনবরত দরজায় টোকা মেরে যাচ্ছে—চাই বেডকভার, চাই ভাঙা ছাতা সারানো, চাই বাঁশমতি চাল, চাই শুঁটকি মাছ। তারপরও আছে, কাগজ আছে মা, কাগজ। ইচ্ছে করলেই দরজা খুলে ভিতরে বসতেও বলতে পারে না। সে একা, কাজের মাসি কাজ করে চলে গেছে। পাশের বাড়ির জানালা থেকে মুখ বাড়িয়ে কেউ কেউ লক্ষও করছিল। সেই লোকটা আবার আজ।

পূজার মরসুম শুরু হয়ে গেছে।

কেনাকাটা থাকে অনেক। স্কুল থেকে ফেরার রাস্তায় হাতিবাগানে একবার ঢুঁ মারবেই মা। বেশি কেনাকাটা থাকলে দেরি হতেই পারে। বাসে যা ভিড়! ব্যাগ ভরতি শাড়ি সায়া ব্লাউজ, এটা তোর মণিপিসির, এটা তোর সেজপিসির জন্য কিনলাম, আত্মীয়স্বজনদের এই মৌকায় যতটা পারা যায় ফুটানি দেখানো।

আসলে ‘ফুটানি দ্যাখানো’ খুবই রেগে আছে বলে ভাবছে। সেও কম দিতে থুতে পছন্দ করে না। রমাদার জন্য কিনলে না মা। বরং সেই সুযোগ বুঝে কার কেনা হয়নি মনে করিয়ে দেয়। তারপর বাড়ি বাড়ি যাওয়ার মধ্যেও কম আনন্দ থাকে না। তার যে মেলা মাসিপিসি। কাকিমা জেঠিমা। বড়োমামা মেজমামা, রনোদি, মা’র বোনঝি বোনপোও কম নেই। সুতরাং পূজার মরসুমে স্কুল সেরে কেনাকাটা যতটা পারে এগিয়ে রাখে মা। কখনো বাড়ি থাকলে সেও যায়। সেও কাকাকাকিমাদের জামাকাপড় পছন্দ করে কেনে। না গেলেও মা বাড়ি ঢুকেই চেঁচাতে শুরু করবে, সঞ্চারী কোথায় রে! এই দ্যাখ তো, কী রকম হল, তোর দুদুমণির শাড়ি।

চারপাশে তার এত আছে, তবু এই অবেলায় কেন যে মনে হল তার কিছুই নেই। রাস্তার কুকুরের মতোই সে এই সংসারে পড়ে আছে। দিদির বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর সে আরও একলা হয়ে গেল।

কী আছে তার!

সেকেন্ড ক্লাস অনার্স। ফিজিক্স । মনে হলেই যেন কেউ গায়ে তার চিমটি কেটে দেয়। তার ভিতরে জ্বালা ধরে যায়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

হবে না। এত কম নম্বরে হয় না। যাদবপুর, সিট নেই।

বিশ্বভারতী—মাত্র দুটো সিট।

ভাগলপুর যেতে পারে। বাবা রাজি না।

মার এক কথা, তোকে বলছি না, কমপিউটার কোর্সটা সেরে ফেল।

সে লেগে গেল।

তারপর সে কী করবে’ !

তারপর সে অগত্যা বিটি পড়ছে। লেসন নোট, প্র্যাক্টিস টিচিং, রুশো, ভলতেয়ার, মন্টেসারি, মায় গান্ধি রবীন্দ্রনাথ কিছুই বাদ নেই। চাকরি! শুধু ইন্টারভিউ, বেশি দূর গড়ালে ভাইবা। ব্যাস হয়ে গেল।

তারপর আর খবর নেই। সে রাস্তার কুকুরটার মতোই খোঁড়া, পর্যুদস্ত। পারলে বাড়িঘর সব গুঁড়িয়ে দিতে চায়। সেকেন্ড ক্লাস, সেকেন্ড ক্লাস বলে একদিন অকারণ চেঁচাতে থাকলে মা ছুটে তার ঘরে ঢুকে গেছে।

তোর কী হয়েছে?

কিছুই হয়নি মা। কিছুই হয়নি!

চেঁচাচ্ছিলি কেন!

জানি না। তুমি যাও মা, প্লিজ আমার ঘর থেকে এখন যাও। সে দরদর করে ঘামছিল।

আর তার জেঠুও আছেন। এসেই এক খবর, সঞ্চারী দুই কইবে!

ওমা জেঠুমণি! কখন এলে।

তোর কী খবর?

কোনো খবর নেই।

আর বাবাও আছেন, বড়দা নরেনবাবুরা আর কোনো খবর দিল!

জেঠুমণি কেমন মুখ ফ্যাকাসে করে হাসবেন। সে কাছে থাকলে সত্যি কথাটা বলবেন না। তবে আড়াল থেকে সে ঠিকই টের পায়, পছন্দ না।—তোকে তাপস এত করে বলেছিলাম, বিয়ে দিয়ে দে। লাবণ্য আছে, রেজাল্টও খারাপ না, এটাই সঞ্চারীর বিয়ের সময়।

মেয়ে রাজি না হলে কী করব বলুন।

এখন মেয়ে ধুয়ে জল খাও। চাকরি করবে, চাকরির বাজার কী বুজিস না।

সবই তো বুঝি দাদা। চেষ্টা করছি, এম এস-সি পাস করে যদি কোথাও কিছু জোটাতে পারে। কত আশা ছিল। হল কোথায়। দিনদিন রোগা আর খিটখিটে মেজাজের হয়ে যাচ্ছে। আমার সুপারিশে চাকরি হলে, বাড়ি থেকে বের হয়ে যাবে—ভয় দেখায়।

জেঠু হা হা করে হেসে উঠেছিলেন, পাগল! পাগল! বিয়ের বাজারেও চল সঞ্চারী। তার কিছুই নেই, কেন নেই এই একটা প্রশ্ন। বিয়ে থা দিলেই কি সব ল্যাঠা চুকে যেত! কেন এত কষ্ট করে পড়া! রাত জেগে, স্কুল কলেজের ভাল ছাত্রী হবার বাসনা। কোনো স্বপ্ন। সে যে কী, সে নিজেও ভালো বোঝে না। বিয়ে তো শুধু শরীরের কথাই বলে, মন বুঝবে না! লাবণ্য মানে তো শরীরের চটক, এবং বাথরুমে সে তখন দেখেছে নিজেকে বার বার—তারও যে ইচ্ছে হয় না বললে মিছে কথা বলা হবে। খুবই ইচ্ছে হয়। খুব, খুব। এক আদিগন্ত পৃথিবীর মাঝে কোনো সুনিপুণ কারিগর তার শরীরের রন্ধ্রে রন্ধ্রে খুঁজে বেড়াবে, কোথায় গচ্ছিত আছে তার ভালোবাসা। শরীরে শরীর মিশে যাবে। ভালোবাসাও।

লোকটা এখনও দাঁড়িয়ে আছে।

আচ্ছা বেহায়া মানুষ তো। বাড়িতে যখন কেউ নেই, চলে গেলেই হয়।

লোকটা যে তার কথাতেই এসেছে তাও সে জানে। তার ঠিক বলাও উচিত হয়নি, কাল সন্ধ্যার দিকে আসুন, মা থাকতে পারে।

থাকবেই সে বলেনি। চৌকোনো মতো একটা কাগজের লম্বা বাক্স কালও সঙ্গে ছিল, আজও আছে। এটাই সে ফিরি করে বেড়ায়। কোম্পানির মাল, কিছুতেই হাত ছাড়া করতে রাজি না। ওজনও যথেষ্ট। প্যান্টশার্ট পরা ফিটফাট যুবক। গলার নেকটাইটা নীল রঙের কেন সে জানে না। নীল রংটা তার পছন্দ না। চুল ব্যাকব্রাশ করা। জানালায় দাঁড়িয়ে কথা বলার সময় সে সব লক্ষ করেছে। একবার যখন এসেছে না গছিয়ে ছাড়বে না।

সে কী করবে ভেবে পাচ্ছিল না। মার জন্য অপেক্ষা করতে পারে। এই রাস্তা দিয়েই ঢুকবে। তার এখন ঘরে ঢুকে বাথরুমে না গেলেই নয়। ঘামে সারা শরীর চ্যাট চ্যাট করছে। সামনে দেখতে পেলেই ঠিক বলবে, গুড ইভনিং আজ আবার এলাম। আপনি বলেছিলেন, সন্ধ্যার সময় আপনার মাকে পাওয়া যাবে।

ধুত্তোরি গুড ইভনিং, একটুও পাত্তা দেবে না। সে চেনে না এমন ভান করবে। রাস্তায় কত লোকই তো দাঁড়িয়ে থাকে। রাস্তার লোকের খোঁজখবর নিতে তার বয়েই গেছে।

সে হেঁটে গেল লোকটার পাশ দিয়ে।

এই যে, দিদি এসে গেছেন, কখন থেকে দাঁড়িয়ে আছি। বাড়িতে কেউ নেই, আপনার মা কি আজও দেরি করে ফিরবেন!

জানি না। বলতে পারত। কিন্তু এই হয়েছে মুশকিল। সে বলতে পারে না। আশ্চর্য রকমের শীতল ব্যবহার করলেও চলে, তাও সে পারে না।

সে গেট খুলে, কোলাপসিবল টেনে ভিতরে ঢুকে গেল। বসার ঘরের দরজা খুলল না, তবে সব জানালা খুলে দিল। লোকটা গেটের মুখে ঢুকে বলল, আসতে পারি

ভেতরে!

সে যে কী বলে! যত রাগ এখন মা আর মণিপিসির ওপর। মণিপিসিরও খেয়ে-দেয়ে কাজ নেই, নিজে একটা নিয়েছে, সঙ্গে একটা লেজুড় ধরিয়ে দিয়েছে। কী যে খারাপ লাগছে। অচেনা একজন যুবক, বাড়িতে ঢুকে বসার ঘরে অপেক্ষা করলে তার যে বড়ো অস্বস্তি হয়। দিনকাল ভালো না। খবরের কাগজ খুললে সে বুঝতে পারে কতরকমের রাহাজানি ছিনতাই ধর্ষণের ঘটনা যে ঘটে থাকে। সে ইচ্ছে করলেই একজন অপরিচিত যুবককে বলতে পারে না, আসতে পারেন, আমার কোনো অসুবিধা হবে না।

তারপরই কেন যে মনে হল লোকটা নির্বোধ, 'আসতে পারি' বলা তার উচিত হয়নি। একা একটা মেয়ে বাড়িতে, 'আসতে পারি' বললে কী বোঝায়, তাও কি জানে না! অবশ্য এতসব ভাবনার মধ্যে দরজা খুলে একটা টিনের চেয়ার বাইরে বের করে দিয়ে বলল, বসুন। মা এক্ষুনি চলে আসবে। তারপর সে দরজা বন্ধ করে দিল। সে যথেষ্ট ভদ্রতা করেছে। একজন অচেনা, অজ্ঞাতকুলশীল পুরুষের সঙ্গে এর চেয়ে বেশি ভদ্রতা বজায়

রাখা যায় না। বসার ঘরে এনে বসানোও যায় না। পরদা টেনে দিলেই আব্রু ঠিক থাকবে কেন, সে বাথরুমে যাবে, যে কোনো কারণেই হোক বসার ঘর থেকে বাথরুমের জলের শব্দ শোনা যায়। জোরে পাখা চালিয়ে দিলে অবশ্য হাওয়া আর জলের শব্দ মাখামাখি হয়ে যায়। বাথরুমে কী হচ্ছে বোঝা যায় না।

সে বাথরুমে ঢুকে গেল। শরীর থেকে সব খুলে ফেলে শাওয়ার খুলে দিল। কী আরাম' ! সারা শরীরে সাবান, মুখ উঁচু করে জলের নিম্নগামী ধারার মধ্যে ডুবে যেতে যেতে কেমন মুহ্যমান এক জগৎ, এবং সারা দিনের ক্লান্তি অবসন্নতা ধীরে ধীরে সরে গিয়ে সে সহজেই সতেজ হয়ে উঠতে পারছে।

তখনই ডোর বেল বেজে উঠল। মা বোধ হয় এল!

দরজা খুলে দিলে, মা মেয়েতে ইশারায় বাক্য বিনিময় হয়ে গেল। সেই লোকটা!

ঈষৎ ব্যাখ্যা করে সঞ্চারী সব তার মাকে বলতেই, কৃষ্ণ লাফিয়ে উঠল।— ও তাই, আচ্ছা। দরজায় উঁকি দিয়ে বলল, আপনি ভাই ভিতরে এসে বসুন। মণি পাঠিয়েছে, কাল এসে ফিরে গেছেন, পুজোর বাজার' !

সোফায় ঢাউস ব্যাগটা তুলে নিয়ে কথাটা বলল কৃষ্ণ।

বসুন। মণির বাড়িতে কবে লাগালেন! মণিকে বলেছিলাম।

বসার ঘরটা একটু বেশি মাত্রাতেই বড়ো। একদিকে সোফাসেট, কোনায় টিভি, বাঁদিকে লম্বা বই-এর র্যাক, পাশে পর পর দুটো বড়ো কোম্পানির ক্যালেন্ডার এবং দেয়ালে লাঠি হাতে সেই চিরাচরিত ভঙ্গিতে চার্লি চ্যাপলিন। ঘরের আর একদিকে একজনের শোওয়ার মতো তক্তপোষ। দামি বেডকভারে ঢাকা একটা পাশবালিশের সাদা রঙের ঢাকনায় রেশমি সুতোর কিছু নকশা। ঘরের তুলনায় জানালাগুলি ছোটো, নেট দেওয়া নীল রঙের নাইলেন, মশার উৎপাত আছে।

সঞ্চারী এখন খুবই হালকা। মা এসে গেছে। তার আর কোনো কর্তব্য নেই। সে নিজের ঘরে ঢুকে আয়নায় দাঁড়াল। চুলে কাঁকুই চালাল। কাঁধের আধ-শুকনো তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছে সামান্য প্রসাধন করল। গোল করে কপালে সুন্দর সবুজ রঙের একটা টিপ পরল। তারপর উরুর কাছটায় ভিজে মনে হওয়ায় লম্বা ফ্রক তুলে বাঁপাটা খাটে রেখে ভিজে জায়গা মুছে দিতেই, মায়ের কণ্ঠস্বর কী রে এসে কিছু খেয়েছিস। শুভদা কিছু করে রেখে গেছে।

কী জানি, দেখিনি।

খেয়েছিস?

না। বাথরুমে মা-র যে বেশি সময় লাগে না, সঞ্চারী ভালোই জানে। তার প্রসাধনের ফাঁকে মা-র সব কাজ সারা। চাও বসিয়ে দিয়েছে। পাউরুটি স্যাঁকা, স্যালাড কেটে রাখা, ডিমের ওমলেট সবই তৈরি। মা এত কাজের, কে বলবে ভিড়ের বাস ঠেঙিয়ে বাড়ি ফিরেছে। বাবাও বোধহয় এসে যাবেন। তা ছাড়া পে কমিশনের লড়ালড়িও আর নেই। সংগঠিত শ্রমিক শ্রেণীর লড়াকু নেতা এখন নিশ্চিন্ত। পুজোর সময়, আত্মীয়স্বজনদের ভিড় থাকেই। কেউ না কেউ রাতে আসে। বাবা বাড়ি না থাকলে তারা যেন হই হুল্লোড়ে মেতে উঠতে পারে না। মামারা তো ভগ্নিপতিটির নামে পাগল। এই হই হুল্লোড়, কখনো তার ভালো লাগে, কখনো লাগে না। আসলে সবাই কাজে কামে ব্যস্ত, অফিস আর ইনক্রিমেন্ট পদোন্নতির কথাও থাকে, এই একটা জগৎ, কোম্পানির কথা, রেলের কথা, এবং বাজারদর, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, কোথায় কে পূজার ছুটিতে বেড়াতে যাচ্ছে, কোন কোম্পানির হলিডে হোম, কী সুযোগ-সুবিধা বিস্তারিত তার বর্ণনা। তারাও যায়, বাবার রেলের এ-সি পাস, তাদেরও। সে তো গত পুজোয় দেরাদুন থেকে দিল্লি ফেরার পথে পুরো ছশো টাকা শুধু কোল্ড ড্রিংকসের পিছনেই উজাড় করে দিয়েছিল। আসলে কিছুটা রাগ ক্ষোভ, তার কিছুই হচ্ছে না, সবাই দারুণ সুখী, মা বাবা দিদি, সবার আর্থিক সঙ্গতি প্রবল, প্রিভিলেজজ ক্লাস। সে সেবারে বাবার কাছ থেকে ছশো টাকা নিয়ে বাবাকেই ফতুর করে দিতে চেয়েছিল। সবাই মিলে তাকে ডিক্লাসড করে রেখেছে—সে ছাড়বে কেন!

তার কত স্বপ্ন, এম এস-সি, থিসিস, স্লেট নেট—সবই ভো-কাট্টা। পার্ট টুর প্র্যাক্টিক্যাল তাকে ডুবিয়েছে। পার্ট ওয়ানে এখন ব্রিলিয়ান্ট রেজাল্ট, মা তো খুশি হয়ে বাড়িতে বিশাল গেট টুগেদারে মত্ত হয়ে গেছিল। মা তার কলিগদের, বাবা তার অফিসের বন্ধুদের, আত্মীয়স্বজনরা তো আছেনই, তারপর.....তারপর কী!

না, সে আর ভাবতে পারে না। প্র্যাক্টিক্যাল পরীক্ষার আগেই অসুস্থ। ছোঁয়াচে রোগ, সারা শরীরে গুটিপোকার মতো জল নিয়ে ফোসকা, কী ব্যথা, আর জ্বর, জ্বরে তারপর বিছানায় শয্যাশায়ী, প্রাক্টিক্যাল পরীক্ষার সময় আলাদা সিটে আলাদা ব্যবস্থা। সে অচ্ছুত হয়ে গেল। অচ্ছুত জীবনের শুরু। কোথাও ঢোকার জায়গা নেই। তার জন্য সর্বত্র নো এনট্রি।

আবার ডোর বেল বাজল।

এই সঞ্চারী, দ্যাখ তোর বাবা বোধহয় এল।

সঞ্চারী বসার ঘরে ঢুকে দরজা খুলে দিল। বাড়িটায় যেই আসে, সামনের বারান্দায় উঠে বেল টিপে দেয়। পেছনে সিঁড়ির পাশের দরজাটা এ-জন্য প্রায় খোলাই হয় না। পেছনের দরজায় এসে ডাকলে, তাকে বসার ঘরে ঢুকতে হয় না। লোকটা দারুণ ভালো

মানুষের মুখ নিয়ে বসে আছে। তার দিকে চোখ তুলেও তাকাচ্ছে না। অবশ্য সে জানে লোকটা সবই তার দেখছে, এমনকী তার শরীরের সব ভাঁজগুলো পর্যন্ত। পুরুষ তো নারী-শরীরের অন্তর্যামী। তাদের কাছে কিছুই আড়াল করা যায় না। দামি পোশাকে শরীর ঢেকে রাখার চেষ্টা খুবই হাস্যকর, এটা সে ভালোই টের পায়। আলোর মতো তাপও অদৃশ্য এবং তরঙ্গগামী। উৎস থেকে তরঙ্গের আকারে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে সঞ্চারিত হয়। যে-ভাবে তাকে আড়ালে দেখছিল!

সঞ্চারী-ই....।

কেউ যেন দূরে ডাকে।

কে ডাকে! সে বালিকা বয়স থেকেই এই ডাক শুনতে পায়। সে জানা গায়ে দেয়, প্যান্টি খুলে ফেলে, মোজা পরে, পায়ে জুতো গলায়, এবং সে বিছানায় লম্বা হয়ে শুয়ে থাকলে, এই অধীর অচেনা কণ্ঠস্বরে সে বিচলিত বোধ করে। কেউ তাকে ডাকে, বড়ো হতে বলে। সে মাঝে মাঝে বড়ো হবার জন্য আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে—এবং কিছু আভাস শরীরে ফুটে উঠতে থাকলে, সে বোঝে এরই নাম বড়ো হওয়া। প্রকৃতির অমোঘ ইচ্ছে শরীরে কারুকার্য তৈরি করছে। প্রকৃতির কূট কামড়ে সে এখন বিছানায় শুয়ে প্রায়ই সেই রহস্যময় পুরুষকে খুঁজে বেড়ায়।

বাবাও ঢুকে বললেন, ও এসে গেছেন, বসুন।

তারপর পরদা তুলে ডাইনিং স্পেসে হাতের ব্যাগটা টেবিলে রেখে দিলে মা বলল, চা দেব ! হাত মুখ ধুয়ে নাও।

আচ্ছা এরা কী! লোকটার সঙ্গে কেউ আর কথা বলছে না। নেওয়া হবে কি না তাও বোধহয় ঠিক নেই। সঞ্চারী খুবই অস্বস্তি বোধ করছে।

মা বাবার দিকে তাকিয়ে বলল, কথা বলো।

তুমি বলো না।

কত দাম বলছে' !

ওতো বাজার দর—কত বলার কী আছে। সাতে পাঁচ হাজার।

লোকটিকে এক কাপ চাও দেওয়া যায়। অন্তত বসার ঘরে চুপচাপ বসে না থেকে চা খেতে পারে। তার নিজেরই গায়ে কেমন জ্বালা ধরে যাচ্ছে। ভিতরে বসে তারা চা জলখাবার খাচ্ছে, লোকটিকে বসিয়ে রাখার কোনো মানেই হয় না।

সে না বলে পারল না, তোমরা ওর সঙ্গে কথা বলে ঠিক করে নাও। কতক্ষণ বসে থাকবে !

বলছি, দাঁড়া। একটু জিরোতে দে। বলেই বাবা ঘর থেকে পরদা তুলে বললেন, এই যে ভাই, বড়ো সকাল সকাল এসে গেছেন। মণিদি তো জানে আমার ফিরতে রাত হয়। ছুটির দিনে আসতে পারতেন। একটু দেরি হবে। আমরা ফ্রেশ হয়ে আসছি। কোথায় থাকেন?

হাওড়ায়।

ওরে বাববা, সে তো অনেক দূর।

আজ্ঞে, তবে অসুবিধা হবে না। ও নিয়ে ভাববেন না। পরদার ফাঁক দিয়ে সঞ্চারীও দেখল, কেমন কুঁজো হয়ে বসে আছে লোকটি। লোকটি না ভেবে যুবক ভাবা যেতে পারে। তারই বয়সী, কিংবা কিছু বড়ো হতে পারে, সরু গোঁফ, কালো, বেশ কালো রঙের মুখে এত কালো গোঁফ মানায় না। বড্ড বেমানান। সে কেন যে ফিক করে হেসে দিল।

বাবার সঙ্গে দাঁড়িয়ে কথা বলছে, এবং কথাবার্তায় বড়োই বিগলিত ভাব।

সেলসম্যানশিপ। ব্যবহারে যদি ভজে না যায়, তবে কপালে দুঃখ থাকতে পারে। একটু বেশি মাত্রাতেই আজ্ঞে আমি করছে। ভদ্রলোকের কপালে আজ বেশ দুঃখ আছে। তার বাবাটিকে তো জানে না। সব কিছু বাজিয়ে নেবার স্বভাব। এত বৈষয়িক যে জীবনেও ঠকতে রাজি না।

বাবা পরদা ফেলে দিলে, কালো মানুষ, কালো গোঁফ নিমেষে অদৃশ্য।

সঞ্চারীর কেন জানি চা খেতে ভালো লাগছে না। সে চা ঠেলে দিয়ে উঠে পড়ল। খাবার কিছুটা খেল, কিছুটা পড়ে থাকল।

বাবা বললেন, কী হল, উঠে পড়লি।

তোমরা খাও। আমার খেতে ভালো লাগছে না।

শরীর খারাপ!

না।

তবে।

জানি না।

সঞ্চারী চায়ের কাপ বেসিনে রেখে নিজের ঘরে ঢুকে গেল। কেমন অভব্য মনে হচ্ছে। সব ঠিকঠাক থাকলে বোধহয় এমন হয়। অন্যের মান অপমান বুঝতে চায় না। দুদিন ধরে ঘুরছে, সে জিনিস গছাতে এসেছে, এটাই তার কাজ।

হাওড়ায় বাড়ি, বাসে কী ভিড় সে নিজেই টের পায়। না এটা ঠিক না। মা কার, কার পূজার বাজার এখনও বাকি, বাবাকে সেই ফিরিস্তি দিচ্ছে। বাবা মার এমন আচরণ সে

পছন্দ করে না। এত চেষ্টা করছে, একটা তার চাকরি হল না! সে বেকার। এই জ্বালা থেকেই বোধহয় ভদ্রলোকের ওপর সে একটু বেশিমাত্রায় সহৃদয় হয়ে পড়ছে।

এটাই তার দোষ।

বেকার না থাকলে, খোঁড়া কুকুরটার জন্য বোধহয় এত মায়া হত না। জীবকুলের সর্বত্রই ছড়ানো-ছিটানো হেয়জ্ঞান বিরাজ করছে। তাদের এই বয়সটাকে কেউ বুঝতেই চায় না। মেয়ে যখন, বিয়ে দিলেই রেহাই। বিয়ে, তারপর এক পুরুষ এবং পুরুষের বিছানা, তার জাতকের জন্য প্রস্তুত থাকা, তাকে বড়ো করা, মেয়েমানুষের আবার কী চাই। জানালার পরদা ঠিক আছে কি না, সতর্ক থাকলেই হল।

মানছি না, মানব না। সে কেমন স্লোগান দিতে যাচ্ছিল। তোমাদের টাকা, তোমাদের বাড়ি, আমি কেন অনুগ্রহ নিতে যাব। তারপরই মনে হল, না মাথাটাই তার খারাপ হয়ে যাচ্ছে। তার আজকের প্র্যাক্টিস টিচিংও ভালো হয়নি। বি টিতেও সেকেন্ড ক্লাস। স্যারেদের উমেদারি সে একদম করতে পারে না। সবাইকে চতুর এবং সুযোগসন্ধানী মনে হয়।

তখনই সবার ঘর থেকে বাবা ডাকলেন, সঞ্চারী শুনে যা। জিনিসটা একবার দেখবি না। তোরই পাল্লায় পড়ে কিনছি। তোর বন্ধুদের বাড়িতে অনেকের আছে, আমাদের থাকবে না, হয় কী করে। তোর মাও চাইছেন, তাঁর বন্ধুদের বাড়িতেও অনেকের নাকি আছে। জল এখন পরিস্রুত না করে খাওয়া ঠিক না।

পরিস্রুত কথাটাতে সঞ্চারীর মুখ বেঁকে গেল। পরিস্রুত না ফুটানি, সবার আছে। সবার আছে বলতে কারা! সবার কখাটা কত ব্যাপক বুঝবে না। সবার থাকে না, কিছু লোকের থাকে। বাবা-মা সেই কিছু লোকের মধ্যে। তাকে ডাকছে।

সে বলল, আমার আবার দেখার কী আছে! তোমরা কিনবে, তোমাদের পছন্দ হলেই হল।

বারে, একবারই তো কেনা হবে। দেখে নিবি না।

তোমরা দ্যাখো।

তখনই দরজায় মা পরদা ফাঁক করে বলল, আয় না। লোকটা কতক্ষণ বসে থাকবে।

সঞ্চারী এর পর আর নিজের ঘরে বসে থাকতে পারল না। তার পছন্দ না হলে সে কিনবে না, এমনও কথা নেই। তবে এই নিয়ে জল ঘোলা হোক সে চায় না। তার জন্য লোকটার দেরি হোক সে চায় না।

বাবার গলা পাওয়া গেল।

এত দেরি কেন রে।

সে শাড়ি পরছে। এবং মুখ আয়নায় দেখছে। পাফে সামান্য পাউডার মুখে ঘসে দিল। চুল দু-একটা এলোমেলো হয়ে কপালে উড়ছে। সে বের হয়ে বেশ পরিপাটি করে লোকটার পাশে না বসে বাবার পাশে গিয়ে বসে পড়ল।

সঙ্গে সঙ্গে যুবকের মুখ প্রত্যাশায় গাঢ় হয়ে গেল। সঞ্চারীর নজর এড়াল না। বড়ো সবিনয়ে বাক্স খুলতে গেলে সঞ্চারী বলল, খুলতে হবে না। ও আর দেখার কী আছে। আপনাদের কোম্পানির খুবই সুনাম।

আবার ডোর বেল।

দ্যাখ তো কে এল! বাবা তার দিকে তাকিয়ে কথাটা বললেন।

মা বলল, চেক দেব কিন্তু।

তা দিন। চেকই নিয়ে থাকি। অ্যাকাউন্ট পেয়ি চেক।

তাই দেবার নিয়ম। সে এবার বাক্স থেকে পরিস্রুত জলের মেশিন এবং তার লটবহর টেনে বের করতে থাকল।

ও মা জেঠুমণি।

জেঠুমণি ঢুকতেই বাবা বেশ চঞ্চল হয়ে উঠল। কোথায় বসায়! ঘরে এ দিকের পাখাটা চলছে। ও দিকের পাখা চালিয়ে বলল, বড়োদা এখানটায় বসুন।

সঞ্চারী দেখল জেঠুমণি মেশিনের বাক্সটার দিকে তাকিয়ে চোখ ফেরালেন কুঁজো হয়ে বসে থাকা যুবকটির দিকে তারপর মা এবং বাবা, শেষে দেয়ালের ছবি, এবং ছাদের পাখাও বাদ দিল না।

বললেন, তোমারও দেখছি খপ্পরে পড়ে গেছ।

আসলে উক্তিটি বউমার প্রতি না বাবা, না তারা সবাই সঞ্চারী বুঝতে পারছে না। জেঠুমণির এই কথাটাই যে সব কেঁচিয়ে দেবার পক্ষে যথেষ্ট। সঞ্চারী এটাও বোঝে। এবারে জেঠুমণি পাখার নীচে শোফায় বসতে বসতে বললেন, কতদিনে পাকড়ালে হে ছোকড়া। ঠিক জায়গাতেই এসে গেছ।

না স্যার, পাকড়াব কেন। এটা তো ফ্যামিলির পক্ষে খুবই জরুরি।

বাজে কথা। বছর খানেক আগে আমার বাড়িতেও গছিয়ে দিয়ে গেছে। কোনো কাজ হয় না। সাধারণ ফিল্টারেই কাজ চলে। যাই বল এতে ভাইরাস কিছুতেই আটকায় না।

বাবাও গোঁ ধরলেন, আপনি ঠিকই বলেছেন, কিন্তু বাড়ির সবাই চাইছে, আমার তো একদম ইচ্ছে ছিল না।

সঞ্চারী এবার আর পারল না।

একদম মিছে কথা বলবে না বাবা। সবাই চাইছে মানে। আমি কখনো বলেছি কিনতে।

বলিসনি, তবে কেউ কিছু কিনলেই বাড়িতে এসে কে সাতকাহন করে বলে, বল।

আমি বলি না। তোমাদের পছন্দ হলে কিনবে, না হয় কিনবে না। আমাকে এর মধ্যে জড়াবে না বলে দিলাম।

জেঠুমণি বললেন, আরে রাগ করছিস কেন। সঞ্চারী দেখল, মা গুম হয়ে বসে আছে। একটা কথাও বলছে না।

জেঠুমণি কিছু একটা আঁচ করতে পেরে বললেন, কেনার যখন ইচ্ছে হয়েছে কিনে ফেল। কত টাকাই তো জলে যায়।

যুবকটি এতক্ষণ হাবলার মতো তাকিয়ে ছিল, এবারে সে বলল, দেখুন স্যার একটা কথা বলব, কিছু যদি মনে না করেন। আমাদের মালে লাইফ লং সার্ভিস, আমার কোম্পানির মাল হলে ঠিকানা দেবেন, আমি নিজে মিস্ত্রি নিয়ে এসে ঠিক করে দেব।

ও সবাই বলে, কল দিলে পাত্তাই পাওয়া যায় না। ছ মাসও গেল না। বড়ো বড়ো কথা সবাই বলে—সকাল নটা থেকে শুরু—আসছে, যাচ্ছ। দরজায় বেল বাজছেই। কাঁহাতক দরজা খোলা যায়। আমরা স্যার বিজনেস ম্যানেজমেন্ট থেকে এসেছি, কী সাবান ব্যবহার করেন, কেন করেন, এই সবের ডাটা সংগ্রহে এসেছি। শেষে যা দাঁড়ায় ঝুলি থেকে বিড়াল, একটা শ্যাম্পেল মাল রাখুন, দাম দিতে হবে না। এই তো ভাই তোমাদের চেহারা। দুপুরে ঘুমাতে পর্যন্ত পারি না। বেচু পার্টিরা অতিষ্ঠ করে মারছে। এক তলায় থাকার এই একটা বিড়ম্বনা।

সঞ্চারীর খুবই খারাপ লাগছে। মা-র দিকে তাকিয়ে বলল, তোমরা কি কিনবে?

কেন কিনব না!

বাবা বললেন, সেই, কেন কিনব না। ভাইরাস থাকে থাকুক।

যুবকটি বলল, ব্যবহার না করলে বুঝতে পারবেন না, কত দরকারি জিনিস।

ভাইরাস মরে না কে বলেছে! কত উন্নতি হচ্ছে সবকিছুতে। ভিতরে আলট্রা ভায়োলেট রে দিয়ে ভাইরাস মেরে দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। বাজারের আর দশটা মালের সঙ্গে স্যার গুলিয়ে ফেলবেন না।

জেঠু বললেন, দ্যাখো ভাই আমি তো কিনছি না, কিনবে এঁরা।

সঞ্চারী দেখল, মা যেন কিছু বলতে চাইছে।

বলো না কী বলতে চাও।

লাইফ লং সারভিস বলছেন? যুবকটির দিকে মা তাকিয়ে থাকল।

হ্যাঁ মাসিমা।

কিন্তু কমপ্লেন আছে। আমার বন্ধুরা আপনার কোম্পানির মালের খুবই সুখ্যাতি করেছে। তবে একটাই মুশকিল, মাঝে মাঝেই খারাপ হয়ে যায়। কল দিলে কেউ তখন আসতে চায় না।

কল চার্জ দিলে আসবে না কেন মাসিমা? সঞ্চারী নিজেও কেমন অতিষ্ঠ হয়ে উঠছে।

আমি উঠছি মা।

সঞ্চারীর কেন যে মনে হচ্ছে, যুবকটি বাড়িতে ঢুকে চোরের দায়ে ধরা পড়েছে যেন। সে বিরক্ত গলায় বলল, আপনার কী নাম!

অমিত সেন।

আপনারা কেন আসেন বুঝি না। কী দরকার আসার। কী দরকার এত খোশামোদ করার। দু-দিন ধরে ঘুরছেন।

যুবকটি অবলীলায় বলল, দরকারে দু-দিন কেন বছরের পর বছর ঘুরতে পারি। আমাদের এটাই তো কাজ।

তা হলে ঘুরুন। সঞ্চারী আর একটাও কথা বলল না। রাগে ফুঁসছে। সে ভিতরে ঢুকে গেল। তারপর যা হল, মা বাবাকে দুষছে। বাবা মাকে দুষছে। কার অ্যাকাউন্ট থেকে চেক কাটা হবে, সেটা এই মুহূর্তে দিলেও দু-দিন বাদে ব্যাংকে জমা দিতে হবে। তাতেও রাজি। বাবার কথা, এক সঙ্গে এত টাকা দেওয়া ঠিক না। বরং ইনস্টলমেন্টে কেনা ভালো।

ইনস্টলমেন্টে কিনলে লাইফ লং সার্ভিসের গ্যারান্টি দেওয়া যাবে না, যুবকটি ক্যাটালগ খুলে তাও দেখাল।

পরদার ফাঁক দিয়ে সঞ্চারী দেখতে পেল, যুবকটির মুখ ক্রমে ফ্যাকাশে হয়ে যাচ্ছে।

বাবার কথা, চেক দিলে, মেশিনটা রেখে যেতে হবে। এবং দেয়ালে জুড়ে দিতে হবে। তারপর ব্যাংকে চেক জমা যাবে। কে ঘুরবে ভাই তোমাদের পেছনে।

যুবকটি বলল, ঠিক আছে পরশু দেবেন চেক। পরশু আসব। বলে সে বেশ ভারী জিনিসটি হাতে ঝোলাতে গেলে, জেঠুমণি বলল, এটা রেখে যান। এতটা রাস্তা আবার টেনে নিয়ে যাবেন। কষ্ট হবে। বাসের যা অবস্থা।

না, নিয়ম নেই। পেমেন্ট এগেনস্ট ডেলিভারি। তারপর জেঠুমণির দিকে তাকিয়ে বলল, স্যার আমাদেরও বাবা-মা আছেন। আমাদেরও পুজো পার্বণ সবই আছে। ভাইবোনেরা দাদার আশায় থাকে। ফিরতে ফিরতে কত রাত হবে জানি না। সল্ট লেকের ডিপোতে মাল জমা দিয়ে, কত রাতে কোন বাসে যাব তাও ঠিক জানি না। আমি না ফেরা পর্যন্ত বাড়ির সবাই জেগে থাকবে।

সঞ্চারী আর পারল না নিজেকে দমন করতে। সে বসার ঘরে ঢুকে চিৎকার করে বলতে থাকল, কেন আপনারা আসেন, এঁদের আপনি চেনেন না। এরা সব পেয়ে গেছে। কেউ দরজায় এসে দাঁড়ালে এদের ঘুমের ব্যাঘাত ঘটে।

বাবা অবাক চোখে সঞ্চারীকে দেখছে। সঞ্চারী এত ক্ষিপ্ত হয়ে কখনো কথা বলে না।

আরে তোর এত রাগের কী হল! তুই খেপে যাচ্ছিস কেন। আমরা কতটা কী করতে পারি।

কতটা পারো, জানি না বাবা, যতটুকু পারি তাও আমরা করি না।

সিঁড়ি ধরে নামার সময় সঞ্চারী বারান্দার আলো জালিয়ে দিয়ে বলল, অমিতবাবু, সাবধানে নামবেন। সিঁড়ির এ-জায়গাটায় অন্ধকার আছে। একটা গর্তও আছে। পড়ে-টড়ে পা খোঁড়া হলে পঙ্গু হয়ে যেতে পারেন। কে দেখবে তখন।

লোকটি পেছন ফিরে তাকাল। সঞ্চারী কেন যে মুখ ফিরিয়ে নিল। ধরা পড়ার ভয়ে, না অন্য কিছু।

প্রহসন

বয়স যত বাড়ে মেজাজ তত তিরিক্ষি হয়ে যাবার কথা। কিন্তু প্রিয়নাথ সারাদিন মেজাজ ঠান্ডা রাখার চেষ্টা করেন। কিছুতেই তিনি নিজেকে আর রিপুর তাড়নার মধ্যে ফেলে দিতে চান না।

সকাল থেকেই শুরু।

লোডশেডিং। জল তোলা যাচ্ছে না। বাড়িতে এতগুলি লোকের বাথরুমের জল, এছাড়া কাচাকাচি আছে অফিস, কলেজ, স্কুল যাবার তাড়া, ট্যাঙ্কের জল না থাকলে দোতলা, তিনতলা সম্পূর্ণ কানা। একতলায় তবু চলে যায়। টিউবওয়েলের জল টেনে স্নানটানও সারা যায়—কিন্তু তখন কাজের লোকদের কী মুখ!

কে টানবে এত জল!

কে টানবে এত জল!

তা ঠিক, যেন সবটাই প্রিয়নাথের দায়। ডিপটিউবওয়েল না করার খেসারত। সবার যেন এক কথা, তাঁকে তাক করে, তুমি বোঝো। কে টানবে এত জল।

এই তো দু-বালতি জল উপরে তুলে দিলাম। হাত জোড়া, যাই কী করে! ছোড়দা বের হবে, সবে ভাত নেমেছে। কোনদিকে সামলাব!

রান্নার মেয়েটা আজ দেরি করে আসায় সকাল থেকেই বেদানার চোপা শুরু হয়ে গেছে। সবার আগে বের হয় তার ছোড়দা, হাসপাতাল বলে কথা। সে নিজেই ছোটো ডিকচিতে ভাত বসিয়ে দিয়েছে—গাড়ি এলেই ছোড়দা বের হয়ে যাবে। তারপরই তর তর করে নেমে আসবে মেজদা মেজবউদি। ওরা একসঙ্গে অফিস পাড়ায় যায়। গাড়িতে গেলেও এক ঘন্টার কমে হয় না। বাড়িটা অফিস পাড়া কিংবা হাসপাতাল থেকে দূরে হয়ে যাওয়ায় সকাল থেকেই তাড়া—এই ঝুমকি, টেবিলে ভাত দিয়ে দাও—মেজদা, মেজবউদি নামছে, এই ঝুমকি, মাসিমা আজ পোস্তর বড়া খাবে, তাঁর জন্য আলাদা পোস্তর বড়া করে রেখো। এই ঝুমকি, মান্তু নান্তুকে ডিমের ঝোল করে দেবে, মাগুর মাছ খেতে চায় না—প্রিয়নাথ নিজের বসার ঘরে বসে সবই শুনতে পান। বাড়িটা শহরের বাইরে হওয়ায়, স্কুল কলেজ

হাসপাতাল অফিস সবই প্রায় এক দেড়ঘন্টা দূরে হয়ে যায়। উলটোডাঙা কিংবা কাঁকুরগাছিতে বাড়িটা কেন যে করলেন না, সেই নিয়েও কম উষ্মা নেই বউমাদের—ইস সকাল হতে না হতেই নাকে মুখে গুঁজে ছোটো—পারা যায়।

প্রিয়নাথ বোঝেন বউমাদের কথায় খোঁচা থাকে—এক সময় এতে তিনি ক্ষুব্ধ হতেন, আজকাল তাঁর সব সয়ে গেছে।

এমনিতেই জলের টানাটানি, জলের সাপ্লাই কমে গেছে—বিড়ালের পেচ্ছাবের মতো সরু হয়ে নীচের ট্যাঙ্কে জল পড়ে, সারাদিনে ট্যাঙ্ক ভর্তি হয় না, জল খরচের নানা বিধিনিষেধও তিনি সব কাজের লোকদের ওপর জারি করে দেন। এই যেমন,

শোনো ঝুমকি, খুচরো বাসনকোসন টিপকলের জলে ধুয়ে নেবে। লাইনের জলে হাত দেবে না। ঠিকা ঝি সুমিত্রা এলেও সতর্ক করে দেন, লাইনের জলে একদম হাত দেবে না। ট্যাঙ্ক ভরেনি। কাচাকাচি সব টিপকলের জলে সারবে। নীচের ট্যাঙ্ক ফাঁকা, উপরে জল উঠবে কী করে।

মুসকিল কুচিকে নিয়ে।

মাস তিনেক হল, বাড়িতে আমদানি।

অবশ্য রমলার দোষও দেওয়া যায় না। তার টুকিটাকি ফুট ফরমাস খাটার লোক নেই, প্রাতঃ ভ্রমণে বের হয়ে এক সকালে মেয়েটাকে নিয়ে হাজির।

প্রিয়নাথ সেদিন বাজারে বের হচ্ছেন, তখনই রমলা ঢুকে বলেছিল, নিয়ে এলাম মেয়েটাকে। দুশো টাকা দিলেই হবে। আমাদের তো দেখার কেউ নেই, এক গ্লাস জল চাইলে পাওয়া যায় না। দোতলা থেকে ডাকলে কেউ সাড়াই দিতে চায় না।

প্রিয়নাথ বললেন, ভালো করেছ।

সেদিন তিনি বাজারে বের হচ্ছেন, দেরি হলে পছন্দমতো মাছ পাওয়া যাবে না। স্ত্রীর নিবুর্দ্ধিতার প্রতি কোনো কটাক্ষ না করে বের হয়ে যাওয়াই আত্মরক্ষার প্রকৃষ্ট উপায়—কুচিকে নিয়ে তিনজন কাজের লোক, থাকা-খাওয়া, এবং তাদের শোওয়ার ব্যবস্থা, এছাড়া বাড়িটায় আলাদা বাথরুম নেই। কাজের লোকদের জন্য বাইরে কলতলায় ব্যবস্থা করে দিলেও, তারা কলতলায় খোলামেলা জায়গায় চান করতে রাজি না, সেই জন্য যদি থাকতে না চায় মুসকিল—

থাকবে কেন। কাজের লোক বলে কি তারা মানুষ না! সিঁড়ি ধরে নামতে নামতে বড়ো বউমার মন্তব্য।

ঠিক কথা। খুবই যথার্থ কথা।

তিনিও জানেন, থাকবে না। পালাবে। তোষামোদ করে কাজের লোক না রাখতে পারলে, এখন যে খুবই বিড়ম্বনা, তাছাড়া এত বড়ো সংসারে, কর্তা গিন্নি মিলে দু-জন, তিন পুত্র, তিনি বউমা মিলে ছ-জন, আর চার নাতি-নাতনী, এই মিলে সংসার বড়োই বলা যায়, তার ওপর আরও তিনজন, এতসব লোকের খাওয়া-থাকা, শোওয়া, তাদের জলখরচ থেকে শুরু করে হাত খরচের বহর যে কত বেড়ে যায়, প্রিয়নাথের মাথায় যে বোঝা কত ভারী হয়ে যায়, কেউ বুঝতেই চায় না। বউমারা ছেলেরা তো কেউ মাগনা খায় না, টাকা দিয়েই খায়। সুতরাং, খরচ কী বাড়ল বা কী কমল তাদের দেখার কথা না—তোমাকে বাপু গাড়ি চালিয়ে নিয়ে যেতেই হবে।

সকালে উঠেই তিনি বাথরুম সেরে, মোটর চালিয়ে লিখতে বসেন। আধ এক পাতা লেখা হতে না হতেই বেদানা দরজায় হাজির। হাতে তিন চার রকমের বাজারের থলে।

আমি এগচ্ছি।

এগও।

লেখার কাগজ সরিয়ে তিনি উঠে পড়েন। তারপর ফর্দ মতো বাজার। সব মাছ সবাই খায় না। একমাত্র কাটা পোনা ইলিশ পার্সে এবং চিংড়ি মাছ সর্বজনগ্রাহ্য। তবে রমলা হাঁপের রুগি বলে, একমাত্র সে-ই চিংড়ি আর ইলিশ পাতে নেয় না। অন্য মাছ, যেমন প্রিয়নাথ পছন্দ করেন মৌরলা মাছ। নাতনীরা বউমারা মৌরলা মাছ কেউই খেতেই চায় না। প্রিয়নাথ পছন্দ করেন পাবদা মাছ, ছোটো বউমা পাবদা মাছ দেখলেই অক অক করে কলতলায় ছুটে যায়। কফের দলার মতো দেখতে—তিনি অবাকই হয়ে যান, লৌটটা মাছ হলেও কথা ছিল, পাবদা মাছ কফের দলা হয়ে গেলে তিনি যে নিরুপায়। মাগুর মাছ ছেলেরা এবং তিনি নিজে খুবই পছন্দ করেন, কিন্তু বড়ো নাতি খায় না।

কেন খায় না?

রমলা বলেছিল, তুমি ডেকে জিজ্ঞেস কর না!

হ্যারে পার্থ, মাগুর মাছ খাস না কেন?

সে কোনো জবাব না দিয়ে সিঁড়ি ধরে তিনতলায় ছুটে গিয়েছিল।

তার হয়ে বড়ো বউমা হাজির।

আর বলবেন না বাবা, বারান্দায় সেদিন একটা মুচি জুতো সেলাই করছিল। মাগুর মাছের চামড়া মুচিটার গায়ের চামড়ার মতো। ওর খেতে নাকি ঘেন্না করে।

এই গ্রীষ্মের দাবদাহে বাজারে পছন্দ মতো মাছ কেনা যে কত কঠিন তিনি ভালোই বোঝেন। মাছের বাজারে ঢুকলেই—চেঁচামেচি। বাবু, কেউ মেসো, কেউ কাকা যে যার

মতো তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক পাতিয়ে নিয়েছে। তিনি যে সরেস মাছের খদ্দের তারা ভালোই জানে।

বাবু, সাড়ে চারশো!

না, চারশো। দ্যাখ চারশো-তে যদি দাও, এক কেজি দিতে পার।

বাবু পোষাবে না। তা পোষাতে নাই পারে—বাগদা চিংড়ি বলে কথা।

এইভাবেই একসময় রক্ষাও হয়।

কে কী মাছ খায় সেই মতো কেনেন। রমলা চিংড়ি মাছ খান না। তাঁর জন্য আলাদা দু-আড়াইশো কাটা পোনা নিতেই হয়।

দু-দিনের বাজার তাঁকে এভাবে সারতে হয়—মাগুর মাছ একবেলা, ইলিশ না হয়, কাটাপোনা একববেলা, এই মাছের কেনাকাটা করতে তার ঘন্টাখানেক কাবার হয়ে যায়। বেদানা তরকারির বাজার সেরে ফেলে—কে কী খাবে যেমন রমলার পাতে শাক না পড়লে ক্ষিপ্ত হয়ে যায়। যেমন তিনি নিজে নিমবেগুন, অথবা উচ্ছে ভাজা প্রথম পাতে খেতে পছন্দ করেন। নতুন আম ওঠায় চাটনির জন্য আর টমেটো কেনা হয় না। ঝোলে, তরকারিতে টমেটো না হলেও আবার চলে না, সবার সব পছন্দ বুঝে রমলার ফুল বেলপাতা, নিজের জন্য মর্তমান কলাও কেনেন তিনি। কলা, দু-পিস পাউরুটি আর একটি সন্দেশ হলে তাঁর সকালের জলখাবার হয়ে যায়।

বাড়িতে সবারই দু-বেলা ভাত, চামরমণি চালের ভাত দু-বেলা—সোজা কথা! রাত্তিরে রুটি কিছুতেই আর চালু করা গেল না। দু-বেলাই মাছ, মাছ ছাড়া কেউ মুখে ভাত তোলে না। কাজের লোকদের জন্য রাতে মাছ না নিলেও হয়, এই ভেবে তিনি নিজে কিছুদিন রাতে মাছ পাতে নেন না। তিনি না খেলে, কেউ কেউ যদি রাতে মাছের বাড়তি খরচ ভেবে না খায়, এবং তাঁর দেখাদেখি সংসারের অতিমাত্রায় খরচের প্রতি যদি সজাগ হয়, হলে কী হবে, তিনিই খান না, সবাই খায়। রমলা বিরক্ত হয়ে বলবে, তুমি না খেলে কারও কিছু আসে যায় না বোঝ না।

রান্নাঘরটা কাজের লোকদেরই জিম্মায়। যে যার মতো ঘড়ি ধরে নামে, খায়, তারপর অফিস, হাসপাতাল, কলেজ, যার যেখানে কাজ চলে যায়। ছুটির দিনে অর্ডার মতো সরবরাহ হয়ে থাকে।

কেউ চাউমিন সকালে।

কারও লুচি ছোলার ডাল।

কারও এক গ্লাস দুধ, দু-পিস পাউরুটি।

ফ্রিজে কী আছে না আছে বেদানা খবর রাখে।

মেসো, ডিম আনতে হবে, দুধ আনতে হবে। পাউরুটি আনতে হবে। দুধ আনতে হবে। পাউরুটি আনতে হবে। বেদানাই কে কী খাবে না খাবে, নীচে নেমে জানিয়ে দেয়। প্রিয়নাথের একটাই কাজ লক্ষ রাখা। কোনো কারণেই যেন কেউ না ভাবে, তিনি ঠিক মতো কিচেনের সরবরাহ বজায় রাখতে পারছেন না।

প্রিয়নাথ আজ বাজার থেকে ফিরে দেখলেন, বেদানা ফেরেনি। তিন চারটি ব্যাগ বয়ে আনা তাঁর পক্ষে সম্ভব না বলেই পাঁচটা টাকা দেন রিকশ ভাড়া বাবদ। তিনি হেঁটে চলে আসেন। বেদানা এল না এখনও, কিচেনে হুলস্থূল, কখন বাজার আসবে—কখন কী রান্না হবে, তিনি তো যতটা সত্বর সম্ভব বাজার সেরে তাকে ছেড়ে দিয়েছেন, সে না আসার কোনো কারণ থাকতে পারে না। রাস্তায় এগিয়ে দেখলেন, বেদানা হেঁটে আসছে।

তিনি বিরক্ত হয়ে বললেন, কী হল, এত দেরি!

তাঁর সাহস নেই বলার, রিকশার ভাড়া নিলে—অথচ এলে হেঁটে।

বেদানা বলল, কী করব, রিকশা না পেলে কী করব।

দেরি হয়ে যাবে বলে হেঁটেই চলে এলাম। এত বড়ো রাবণের সংসারের বোঝা কার টানতে ইচ্ছে হয় বলুন।

তিনি কথা বাড়ান না, কথা বাড়ালেই, তার মেজাজ অপ্রসন্ন হয়ে যাবে বুঝতে পারেন। এতে তাঁর লেখার ক্ষতি হয়। হাত মুখ ধুয়ে লেখার প্যাড টেনে আবার কয়েক লাইন লিখে ফেললেন। চারপাতা লেখা হয়েছে, আর চারপাতা লেখা হলেই, হাজারখানেক টাকা হয়ে যায়? এই হিসাব কাজ করছে কেবল মাথায়। বিকালেই কাগজ থেকে লোক আসবে লেখাটি নিতে। তিনি সকাল থেকে এভাবেই কাজের ফাঁকে ফাঁকে দু-চার লাইন কিংবা আধ পাতা লেখেন।

তখনই ডোর বেল বেজে উঠল।

এই কুচি, দরজা খুলে দে।

আমরা স্যার বারোয়ারিতলা থেকে এসেছি।

তাদের আবদারের কথা এবার শুনতে হবে, চিফ গেস্ট, না হয় সভাপতি, এবং সংবর্ধনাও হতে পারে তিনি মুখ গম্ভীর করে রাখেন—আচ্ছা ঠিক আছে কবে যেন?

পয়লা মে।

আমি তো থাকব না ভাই।

তিনি আর কোনো কথা বলতেই রাজি না, প্যাড, কলম পাশে পড়ে আছে। কতক্ষণে উঠবে এরা, তারপর নিরাশ হয়ে চলে গেলে আবার আধপাতাও লেখা হয়নি, কুচি এসে হাজির। ঠাম্মার ওষুধ দাও। কুচি এখন রমলার দেখাশোনা করে, রমলা এত ভোগে, অথচ তিনি হাতে ওষুধ না তুলে দিলে, রমলা ওষুধ খেতে ভুলে যায়। তাঁকে অগত্যা উঠতে হয়। ওষুধ দিয়ে আসতে হয়। কুচি জল নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। কোন ওষুধ কখন খেতে হবে তাও মনে করিয়ে দিতে হয় প্রিয়নাথকে।

প্রিয়নাথ নীচে নেমে দেখলেন, ঘর ফাঁকা, যাক বাঁচা গেল। ঘড়ির দিকে তাকালেন, দশটা বাজে, আর দু-ঘন্টা হাতে সময় আছে, বারোটায় তাঁকে খেয়ে নিতে হয়, রমলা ঠিক বারোটা বাজার আগেই স্নান সেরে ঠাকুরকে ফুলজল দিয়ে নীচে নেমে আসবে। তাঁর দেরি হলে রমলা খেপে যাবে, এই দু-ঘন্টার মধ্যে বোধহয় বাকি চারপাতা শেষ করা যাবে না।

আজকাল লেখার জন্য শব্দ বেঁধে দেওয়া থাকে, কখনো তিন হাজার, আবার কখনো ত্রিশ হাজার। পাটিগণিতের মতো অঙ্ক কষে, ক-পাতা কত লাইন, লিখে না দিলে কাগজের অসুবিধা। সব খেয়াল রেখে আর মাত্র চারপাতা। খাওয়ার পর শরীরে বড়োই আলস্য দেখা দেয়। দিবা নিদ্রার অভ্যাস আছে। ঘুম থেকে উঠে বাকি যেটুকু থাকে লিখতে হবে। আর যদি দু-ঘন্টায় চার পাতা হয়ে যায়—তার লেখার গতি এবং ঘন্টার পরিমাপ হিসাব মতো না হলে গল্প শেষ নাও করে উঠতে পারেন, ইচ্ছে করলে রাতে লিখতে পারেন, তবে নিশ্চিতভাবে রাতে লিখবেনই এমন বলা যায় না—কারণ লোডশেডিং গরম এবং মশার উৎপাত এত বেশি যে রাতে কিছুই করা যায় না। মশারির নীচে ঢুকে কেবল বই পড়া যায়। আর খুবই অনিদ্রায় ভোগেন বলে হাই তোলা যায়।

তাঁর আর রমলার খাওয়া সারতে সারতে সাড়ে বারটা বেজে যায়। তখনই বেদানা ফেরে ছোটো দুই নাতনীকে নিয়ে। স্কুল বাস থেকে তাদের নামিয়ে দেওয়া হয়, বেদানা তাদের প্রায় টানতে টানতে নিয়ে আসে। এই সময়টায় তিনি চেয়ারে বসে থাকেন। মোটরে আর এক দফা জল তোলেন, কারণ ট্যাঙ্কের জল এই সময়টায় যেটুকু হয়, তুলে রাখেন—কোনো কারণেই যেন দুতলা তিনতলায় জলের অভাব না হয়।

এই সকালটায় নানা উৎপাতের মধ্যে আরও একটি বড়ো উৎপাত—কারণ তিনি নিজেই জানেন না, কখন বাড়িটার পাহারাদার হয়ে গেছেন। যেমন ফোন, হ্যালো ম্যাডাম আছেন। তিনি ডাকেন, কুচি কুচি। কুচি এলে বলেন, দ্যাখ তো তোর বড়ো বউদি বের হয়ে গেছে কিনা কলেজে, না বাড়িতেই আছে।

বড়ো বউদি বের হয়নি।

নিয়ে যা। আপনি ধরুন। বাড়িতেই আছে। আবার দু’-পাঁচ লাইন—

হ্যালো, ডাক্তার চক্রবর্তী আছেন?

না, নেই।

কোথায়?

হাসপাতালে।

কখন ফিরবে।

রাত হবে। ফোন ছেড়ে আবার পাঁচ-সাত লাইন—

হ্যালো—

বলুন।

আমি বাবা সুপ্রিয়া, আপনার নাতনীরা ফিরেছে?

হ্যাঁ ফিরেছে।

একটু দিন তো ওদের—আবার আট-দশ লাইন—

হ্যালো—

বলুন।

আমি সুকুমার দাস বলছি।

বলুন।

এফ এমে আপনার সাক্ষাৎকার শুনেছি। আপনি যে আমার গাঁয়ের লোক জানতামই না।

তারপর এত কথা যে তিনি বাধ্য হয়ে শুধু শুনে যান। হুঁ হাঁ করেন। কতক্ষণে ফোনের আবদার শেষ যে হবে!

আপনাকে আমাদের বাড়ির সবাই দেখতে চায়। গাড়িতে নিয়ে আসব। কবে সুবিধা হবে।

আপনাকে জানাব। আপনার ফোন নম্বরটা দিন, আসলে যে-ভাবেই হোক এসব আবদার থেকে আত্মরক্ষার তাঁর উপায় থাকে না বলেই তিনি ফোনের নম্বর চেয়ে নেন, আর দু-পাতা যে তাকে শেষ করতেই হবে। ঘড়ির দিকে তাকান—রমলা ঠিক বাথরুমে ঢুকে গেছে। সে বের হয়ে এলেই তাঁকে চানের ঘরে ঢুকতে হবে।

নাতনীদের খাওয়া হলেই সিঁড়ি ধরে উপরে উঠে যায়। তারা গিয়ে যে যার বিছানায় শুয়েও পড়ে। তাঁকেও উপরে উঠে যেতে হবে। তাঁরও খাওয়াদাওয়ার পর একটু গড়িয়ে না

নিলে, শরীরের জড়তা কাটে না। আর দু-পাতার মধ্যে গল্পটা শেষ করতে হবে—কিন্তু হাতে যে সময় নেই। সন্ধ্যায় কাগজের লোকটি আসবে—তিনি যে কী করেন!

এখন বাড়িটা বলতে গেলে খালি। বড়ো বউমাও বের হয়ে গেছে। পার্থর স্কুল চারটায় ছুটি হয়। বাড়ি ফিরতে ফিরতে পাঁচটা। আসলে পাঁচটার পরই সবাই ফিরতে শুরু করে। কুচির কাজই তখন বারান্দায় বসে থাকা—রান্নার মেয়েটাও চলে আসে, ঘরে ঘরে কুচি পছন্দমতো জলখাবার দিয়ে আসে। কিন্তু এই দুপুরে বাড়িটা খুবই নির্জন। বেদানা নাতনীদের ঘরে ভোঁস ভোঁস করে ঘুমায়। কোনো দরকারে তাকে ডেকে তোলারও সাহস হয় না।

বউমাদের আসকারায় এই মহিলাটি যে মাথায় চড়ে যাচ্ছে। বউমাদের কাছে ভিজে বেড়াল, আর প্রিয়নাথের কাছে যেন ব্যাঘ। কিছু বলারও থাকে না। বউমারাই তার টাকা জোগায়। খাওয়ার খরচা তো সরকারি। প্রিয়নাথকে সমীহ করার কোনো কারণই থাকতে পারে না। কারণ প্রিয়নাথই বোঝেন এই মহিলা কেনাকাটার নামে কীভাবে টাকা সরায়। তিনি এটা জানেন বলেই আরও বেশি তাঁর ওপর খাপ্পা।

এই যেমন—

ক-কেজি আলু?

পাঁচ কেজি!

প্রিয়নাথ বোঝেন, মহিলাটি দামেও মারে, ওজনেও মারে। যতটা পারেন তিনি নিজে কেনাকাটা করার চেষ্টা করেন। বাজারেও সঙ্গে নিয়ে যান—এটাও বেদানার ক্ষোভের কারণ। যাই হোক, তাঁকে তাড়াতাড়ি গড়াগড়ি দিয়েই উঠে পড়তে হবে। বাকি দু-পাতা লিখে ফেলতে না পারলে, সম্পাদককে দেওয়া কথা ঠিক রাখতে পারবেন না।

তাও তিনটে বেজে গেল। হাতমুখ ধুয়ে লিখতে বসবেন সবে, দরজায় ডোর বেল বাজল, কে এল! কারও তো আসার কথা না।

তুই।

কী করব, চলে এলাম।

নিপুকে যে এস টি ডি করলাম, সে কিছু বলেনি। বাড়িতে কত রকমের অশান্তি জানিস' ! তোর বউদির এক কথা—কতকাল টানবে? তোর নাম শুনলেই কেমন হিস্টিরিয়াগ্রস্ত হয়ে পড়ে। এক কথা, পল্লব যেন এ বাড়িতে আর না আসে। আমি কী যে করি না!

পল্লব চুপচাপ বসেই আছে। মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। অভাবের তাড়নায় পাগলা। পাঁচটা মুখ, উপার্জন করার কেউ নেই। পল্লবের পুত্ররাও বড়ো হয়ে গেছে, বেকার, পল্লব সামান্য একটা চা-এর দোকান সম্বল করে, আর মাথার উপরে দাদা তো আছেই, এই ভরসায় সুদিনের অপেক্ষায় বেঁচে আছে।

বউদি কোথায়? পল্লব কেমন চোরের মতো কথাটা বলল।

উপরে। ঘুমিয়ে আছে।

পল্লব কিছুটা যেন স্বস্তি বোধ করছে, যাক ঘুমিয়ে আছে।

তখনই প্রিয়নাথ বললেন, কটার গাড়িতে এলি?

সকাল আটটার গাড়িতে।

তখনই মনে হল সিঁড়ি ধরে কেউ নামছে। রমলা হলে ভয়ঙ্কর কাণ্ড বেধে যেতে পারে। অসুস্থ রমলা মাঝে মাঝে মানসিক অবসাদে ভোগে। তখন যে কী হয় তাঁর প্রিয়নাথ বোঝেন তাঁর ভাই-বোনদের প্রতি রমলার প্রচণ্ড উষ্মা আছে। তাঁর ভাই-বোনদের আর্থিক সঙ্গতি কম। তবু সবার চলে যায়—পল্লবের দু-বেলা অন্ন জোটানোই কঠিন। মাসে মাসে সে এসে উদয় হবেই, তবে এবারে সাংঘাতিক বিপদের মধ্যে আছেন, রমলা বলেই দিয়েছে, এলে এবার ছেড়ে কথা বলব না। ভেবেছে কী!

তাড়াতাড়ি তিনি উঠে গেলেন। চুপিসারে দেখলেন, না রমলা নয়। বেদানা। বোধ হয় কারও ফেরার কথা আছে, ফলের রস কিংবা দই-এর শরবত করতে নামতে পারে।

তিনি ডাকলেন, বেদানা, শোনো।

বলেন।

এদিকে, শোনো।

বলেন।

কিছুতেই আসছে না। শুধু বলেন বলেন করছে।

পল্লব এয়েছে। চা করে দাও। ডিম ভেজে দিও। চারপিস রুটি সেঁকে দাও।

বেলা তিনটের সময় ভাতের বন্দোবস্ত করাও কঠিন। ভাতের কথা বললে, তিনি মুখ ঝামটাও খেতে পারেন—কেমন আতঙ্কের মধ্যে আছেন। পল্লব প্রায় চোরের মতোই বলল, কিছু খাব না। ছটার ট্রেন ধরব। ভাত খেতে গেলে দেরি হয়ে যাবে।

পল্লবও বোঝে চুপি চুপি কাজটা না সারতে পারলে দাদার সমূহ বিপদ। এতদূর থেকে এসেছে ভাইটা, কিছু না খেয়ে গেলে মন তাঁর ব্যাজার হয়ে যাবে—

তখনই প্রিয়নাথ না বলে পারলেন না, আমার জন্য চা হচ্ছে—কত আর সময় লাগবে’ ! এই বেদানা, আমাদের দু-কাপ চা করে দাও। বেদানা বলল, কাপ তো একটা—

কেন আমার কাপ কী হল।

আপনারটাই আছে, আর কাপ নেই।

তার মানে, এই তো ট্রেতে কাপ মেলা, এটাতে দাও।

এটা বউদির কাপ। ওঁর বাবা এ-কাপে চা খান এলে। বউদির বারণ আছে। প্রিয়নাথ কেন যেন উন্মত্তের মতো ডাইনিং হলে ঢুকে গেলেন। দেওয়ালের কাবার্ডে থরে থরে সাজানো দামি সব কাপ ডিশ। কাচের ভেতর থেকে জ্বলজ্বল করছে। তিনি প্রায় খেপে গিয়েই বললেন, এই তো সেদিন এক ডজন কাপ ডিশ কিনে দেওয়া হল, কোথায় গেল’ !

আমি কী করে বলব, কোথায় যায়? সরকারি জিনিস, যে যার মতো চা খায়, ভাঙে। কেউ কি দেখার আছে।

কাবার্ড থেকে বের করে নাও।

বেদানা খুবই তাচ্ছিল্যের গলায় বলল, আমি ধরি, আর মুখ ঝামটা খাই। বউদিরা রেখে দিয়েছে, ওদের আত্মীয়স্বজন এলে তারাই বের করে দেয়। চাবি তাদের কাছে।

তোমার মাসিমার কোপ থেকে বের করে দাও।

দাঁড়ান চাবিটা নিয়ে আসছি।

প্রিয়নাথ আঁতকে উঠলেন, এই বাড়িঘর তাঁর। এই বাড়িটা করার সময় সবার সুযোগ-সুবিধার কথা ভেবে করেছেন, সংসারের জোয়াল এখনও তাঁর ঘাড়ে। তাঁর নিজের কেউ এলে, এই যেমন তাঁর বন্ধু-বান্ধব, অনুরাগী পাঠকও হতে পারে, রমলা সঙ্গে সঙ্গে নেমে আসবে। কাপ ডিশ বের করে দেবে, তারা চলে গেলে আবার তুলেও রাখবে। এজমালি বাড়ি, এজমালি সংসার, সবই তাঁর, অথচ কিছুতেই তাঁর অধিকার নেই। তাঁর গরিব আত্মীয়স্বজনরা এলে, কারও সাড়া পাওয়া যায় না।

বেদানা সিঁড়ি ধরে উঠছে।

এই শোনো, তোমাকে যেতে হবে না। এক কাজ করো, আমার কাপটায় পল্লবকে চা দাও, আর গেলাসে না হয় আমাকে দাও। তোমার মাসিমাকে আর ডেকে তুলতে হবে না।

অথচ ভিতরে এতই খেপে আছেন, এত তীব্র কষ্ট হচ্ছে যে, লাঠি দিয়ে কাবার্ডের সব কাপ ডিশ কাচ ভেঙে দিতে পারলে তিনি যেন কিছুটা ধাতস্থ হতে পারতেন। এমনকী গোটা বাড়িটায় আগুন জ্বালিয়ে দিতে পারলে আরও ভালো হত। অথচ পারছেন না। শেকড় ছাড়া জীবনে তিনি নিজেই যেন আজ উৎপাতের শামিল। রমলা জেগে গেলে আর

এক কেলেঙ্কারি—দেরাজ খুলে দিয়ে বললেন, তোর যা লাগে নিয়ে যা। এই প্রথম মনে হল তাঁর, পল্লব যতটা পারে তুলে নিয়ে গেলে তিনি যেন আজ নিজেকে প্রকৃতই হালকা বোধ করবেন।

পল্লব চলে গেল।

জানলায় বসে আজ তাঁর আর একটি শব্দও লেখার ইচ্ছে হল না। শুধু আকাশ দেখছিলেন, তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতাটি আজ অভুক্ত। পায়ে পায়ে বড়ো হয়ে ওঠা স্নেহ মায়া মমতা তাঁকে তাড়া করছিল। অজ্ঞাতেই কখন যে তিনি অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠেছেন।

অ্যালবাম

আমাদের কিছুই আর ভালো লাগছিল না। জাহাজ কবে দেশে ফিরবে জানি না। মাসের পর মাস দরিয়ার ভাসছি। বন্দরে মাল নামাচ্ছি। মাল তুলছি। জাহাজঘাটায় তবু দিন কেটে যায়। জাহাজে নানা কিসিমের কিনারার মানুষ উঠে আসে। তাদের সঙ্গে আলাপ হয়। কেউ আসে—সস্তায় টোবাকো নিয়ে। কেউ সেকেন্ড হ্যান্ড মার্কেট থেকে কেনা কোট-প্যান্ট জ্যাকেট—কিংবা গাউন। তারপর বিকেলে ছুটি হলে ঘুরে বেড়াও। কার্নিভালে যাও। সস্তায় মদ গেলা যায় সি-ম্যান মিশানগুলিতে। ফলে দিন কেটে যায়। সবচেয়ে খারাপ লাগে জাহাজ সমুদ্রে ভেসে গেলে। যতদূর চোখ যায় শুধু নীল জলরাশি।

সেই কবে কলকাতা থেকে জাহাজে সাইন করে উঠেছি—আর দেশে ফেরার নাম নেই।

ব্যাংক লাইনের জাহাজ এরকমেরই। মাতামুণ্ডু ঠিক নেই। জাহাজ কোথায় যাবে, কবে ছাড়বে, কোন বন্দরে কতদিন লেগে যাবে এবং কবে জাহাজ আবার কোথায় যাচ্ছে দুদিন আগেও জাহাজিরা জানতে পারে না। জাহাজ ছাড়ার চব্বিশ ঘন্টা আগে বোর্ডে নোটিশ ঝুলত—কোথায় জাহাজ যাবে, আমরা খবর পেতাম।

ইদানীং বুড়ো ডেকসারেঙ ছাড়া সবাই বেশ মনমরা। ইঞ্জিন সারেঙও বেশ আছেন। যেন সদ্য দেখছেন—আরে বোঝো না কেন—কত দেশ, কত মানুষ সারা দুনিয়া চষে বেড়াচ্ছ, সোজা কথা যত লম্বা সফর তত লম্বা বোটখানা । নামার সময় এককাড়ি টাকা পাবা সোজা কথা। তা ঠিক—যত, লম্বা সফর তত বেশি টাকা—শেষের দিকে দেড়-দু'গুণ টাকা কোম্পানিকে গচ্চা দিতে হয়। তবু ব্যাং লাইনের জাহাজে একবার বের হলে কবে দেশে ফেরা যাবে কেউ বলতে পারে না। সারেঙের এক কথা, কোম্পানির মর্জি। বিনি মাগনায় তো কাজ করছ না। তবে এত মুখ গোমড়া কেন বুঝি না। জাহাজে ওঠার সময় মনে ছিল না! সাইন কে করতে।

সারেঙসাবও যে মিথ্যা চোটপাট করছেন না বুঝি। আমাদের মাথা গরম, জাহাজ যাচ্ছে, মাটি টানার কাজে। ব্রিটিশ ফসফেট কোম্পানির সঙ্গে নাকি চুক্তি সারা। অস্ট্রেলিয়ার উপকূলে ফসফেট এনে ফেলতে হবে। নিউ ক্যাসেল, সিডনি, জিলঙ—এমন সব বন্দরের

নামও শুনেছিলাম। জাহাজ অকল্যান্ডের জাহাজঘাটায় ভিড়ে আছে। খবরটা এনেছে কোয়ার্টার মাস্টার হাপিজুর। সে-ই পিছিয়ে এসে বলল, হয়ে গেলা ন-দশ মাস কাবার।

তার মানে আরও ন-দশ মাস! সারেঙসাব খবরটা পেয়ে খুশিই দেখলাম। দু-আড়াই বছর—মাথা খারাপ হয়ে যাবার যোগাড়—শুধু জল আর নীল আকাশ, ঝড় সাইক্লোন। কখনো গভীর বৃষ্টিপাত অথবা জ্যোৎস্নারাতে গভীর সমুদ্রে আমাদের ডেকে বসে থাকা। ঘুম আসে না।

সবচেয়ে খারাপ লাগছে বেচারা সতীশের কথা ভেবে। সবে বিয়ে করে ব্যাটা জাহাজে এসে উঠেছে। কলকাতার ঘাটে সে সাইন করার পরও রাতে জাহাজে থাকত না। তা নতুন শাদি, সারেঙসাবের কোমলমতিতে টুটাফাটা দাগ থাকতে পারে—তিনি বলতেন, যা। সকাল সকাল চলে আসিছ। কেউ যেন টের না পায়। জাহাজ ছাড়ার আগে সে একদিন বউয়ের রান্নার হাত কত মিষ্টি, পরখ করবার জন্য আমাদের বাড়ি পর্যন্ত নিয়ে গেছিল। ভারি সুন্দর মিষ্টি দেখতে লাজুক। সতীশের মা-বাবাও খুব খুশি আমরা যাওয়ায়। রবিবার বলে সারাদিন সতীশের বাড়িতে চুটিয়ে আড্ডা, তাস খেলা, এবং প্রায় সোরগোলের মধ্যে তার বউকে দেখেছিলাম—চুপিচুপি সতীশকে ফাঁক পেলেই ডেকে নিয়ে যাচ্ছে। ফিরে এল মসকরা—কি দিল' !

কি দেবে আবার' !

শালো, তুমি কি করে এলে বল' !

আরে না, তোরা কখন খেতে বসবি জানতে চাইল।

ফের মিছে কথা' !

সতীশ বেচারা হেসে ফেলত।

বল কি করেছিস' ! বউটাকে একদণ্ড বিশ্রাম দিচ্ছিস না' !

জাহাজ মাটি টানার কাজ নিয়েছে শুনে সেই সতীশ খুবই ভেঙে পড়ছ। খুব হিসেবি সতীশ।

বউ-এর জন্য টাকা বাঁচাচ্ছো। বন্দরে নেমে কেনাকাটা যা-কিছু বউকে খুশি করার জন্য। বন্দরে যে-কদিন থাকা হয়, রোজ বউকে একটা চিঠি। সাঁজবেলায় সবাই যখন শহরে ঘুরতে বের হয়, সে তখন ব্যাংকে শুয়ে বউকে চিঠি লেখে। কখনো লুকিয়ে বউ-এর ছবি দেখে। লুকিয়ে না দেখে উপায়ও নেই। কারো সামনে পড়ে গেলে, ফটোটা নিয়ে টাটানি শুরু হয়। এটা সতীশ একদম পছন্দ করে না। তার একটা যে গোপন পৃথিবী আছে, সেটা যেন খোলামেলা হয়ে যায়। সে জাহাজে উঠে তার বউ-এর ছবিগুলি না

দেখালেই ভালো করত। বিয়ের সময় তার যত ছবি তোলা হয়েছিল, তার সব কপি সঙ্গে এনেছে। সে না দেখালে অবশ্য আমরা জানতেও পারতাম না। সমুদ্র সফরে এই ছবিগুলি তার সঙ্গে আছে। বন্দর এলেই সে ছবিগুলি দেখার সুযোগ পায়। এক ফোকসালে আমরা আছি। চারটা ব্যাংকে চার বাঙালিবাবু। সতীশ, নিমাই, অপরেশ আর আমি। সমুদ্রে নানা কাজ থাকে। সকালে একসঙ্গে উঠতে হয়। ডেকে জল মারতে হয়। তারপর চা-চাপাটি খেতে হয়। তারপর কশপের ঘরে খেতে হয়। স্টোর রুম থেকে যে-যার মতো দড়িদড়া বের করে নেয়। তক্তা বের করে নেয়। কারও রঙের কাজ, কারো চিপিংয়ের কাজ। কেউ ফোকসালে অবশ্য তখন কাজে ফাঁকি দিয়ে ঢুকে যেতে পারে। তবে ডেকসারেঙের সতর্ক নজর। তারপর দুপুরে ভাত-ডাল-সবজি, গোস্ত। আবার কাজা। পাঁচটা না বাজলে কাজ থেকে ছুটি হয় না। তখনও ফোকসালে লোকজন থাকে। সে যে গোপনে বউ-এর ছবি দেখবে, তারও উপায় নেই। একমাত্র ফুরসত মেলে জাহাজ ঘাটে ভিড়লে। সবাই বন্দরে নেমে গেলে ফোকসাল ফাঁকা।

এ-সময়টাতেই তার সুযোগ। সে জাহাজঘাটায় এক-দু-দিন বন্দরে যে নামে না, তা নয়। তবে তার কাছে বন্দরের সুন্দরী যুবতীদের আকর্ষণের চেয়ে বউ-এর ফটো দেখার আকর্ষণ অনেক বেশি। সে এই করে পনেরো-ষোলো মাস জাহাজে কাটিয়ে দিয়েছে। কখনো বৌকে চিঠি লিখে, কখনো তার বউ-এর চিঠি পড়ে, ছবি দেখে তার সময় কেটে যাচ্ছিল। মাঝে মাঝে সে হাই তুলত। রাতে এপাশ-ওপাশ করত। ঘুমোতে পারত না। উঠে জল খেত। ঘুম ভেঙে গেলে একদিন টের পেয়েছিলাম, সতীশ ফোকসালে নেই। গেল কোথায়? বাথরুমে যেতে পারে। বেশ ঠান্ডা পড়েছে। কনকনে শীত। আমরা কম্বল মুড়ি দিয়ে ঘুমাচ্ছি। জাহাজ যাচ্ছে ফিজিতে। সেখান থেকে মাটি কাটার কাজ শুরু হবে। ফিজি থেকে প্রায় দেড়-দু-হাজার মাইল আরও ওপরে অজস্র ফসফেটের দ্বীপ আছে। সেইসব দ্বীপ থেকে সফেট বোঝাই করে অস্টেলিয়ার উপকূলে খালাস করতে হবে। কনকনে শীতে ফোকসালের বাইরে কোথায় গেলা। বাথরুমে যেতে গেলে সিঁড়ি ভাঙতে হয়। যদি গিয়ে থাকে, ফিরে আসবে। কিছুটা মানসিক অবসাদে ভুগছে সতীশ, টের পাচ্ছিলাম। জাহাজে এটা মারাত্মক রোগ। আমরা সতীশকে সাহস দিতাম। বলতাম, দেখতে দেখতে কেটে যাবে কটা মাস। এত ভেঙে পড়ছিস কেন ! সে কথা বলত না। সিগারেট টানত ঘনঘন। মাঝে মাঝে পোর্টহোলে দাঁড়িয়ে সমুদ্র দেখত।

সেই সতীশ না নেমে এলে ভয়ের। কম্বল মুড়ি দিয়ে আর তো শুয়ে থাকা যায় না। আবার কাউকে ডাকাও যায় না। হয়তো দেখা যাবে সতীশ গ্যালিতে কনকনে ঠান্ডা থেকে শরীর গরম করার জন্য চা বানাচ্ছে। কিংবা রেলিঙে দাঁড়িয়ে, নিশীথে সমুদ্র দেখতে দেখতে দেশের কথা ভাবছে। ঘুম না হলে আমরাও ডেকে উঠে গেছি কতদিন। ফল্কার

ওপর মাদুর পেতে শুয়ে থেকেছি। মাস্তুলের আলো দুলছে। জাহাজ দুলছে। মনে হচ্ছে আকাশ কখনো ঝপাত করে মুখের সামনে নেমে এসেছে। আবার ঝপাত করে উঁচুতে উঠে গেছে। এটা দেখতে দেখতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি টের পাইনি। গরমের সময় প্রায় জাহাজিরাই ফোকসাল থেকে উঠে আসে। উপরে সমুদ্রের ঠান্ডা হাওয়া। বেশ আরাম বোধ করা যায়। কিন্তু এই প্রচণ্ড ঠান্ডায় উপরে উঠে গেলে হাত-পা টাল মেরে যায়। সারা গায়ে কনকনে শীতের সূচ বিঁধতে থাকো কখন গেল, কোথায় গেলা! আর তো শুয়ে থাকা যায় না। কম্বল গায়েই সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠে গেলাম। গ্যালির দরজা বন্ধ। মেসরুমের দরজা বন্ধ। ব্রিজে সেকেন্ড অফিসার আর কোয়ার্টার মাস্টার। কাচের ঘর বলে, বুঝতে কষ্ট হয় না—কোয়ার্টার মাস্টার হুইলে হাত রেখে দূরের সমুদ্র দেখছেন। সেকেন্ড অফিসার ব্রিজে পায়চারি করছেন। এখন সেকেন্ড অফিসারের ডিউটি মানে, রাত একটার ওয়াচ চলছে। গেল কোথায় ! ইঞ্জিন রুমো! সেখানে তার কী কাজ থাকতে পারে! বাথরুম খালি, গ্যালি বন্ধ, মেসরুমের দরজাও বন্ধ। ডেক, ফলকা, এলিওয়ে সব খালি—এই নিশীথে জেগে থাকার কথা একমাত্র ইঞ্জিন রুমে যারা ডিউটি দেয়।

খুবই ফাঁপরে পড়ে গেলাম।

কোথায় আর যেতে পারে এই ঠান্ডায়। ঝড়ো হাওয়ায় সমুদ্র বেশ ক্ষেপে উঠেছে। আকাশে মেঘ নেই, তবু বরফঠান্ডা ঝড়ো হাওয়া। কম্বল উড়িয়ে নিয়ে যেতে চাইছে।

তারপরই মনে হল, মেসরুম তো বন্ধ থাকায় কথা নয়। দরজা কে বন্ধ করল ! রাতের পরিদাররা তো ওয়াচ শেষ করে হাতমুখ ধুয়ে মেসরুমে বসে সিগারেট খায়। দরজা খোলা থাকারই কথা। সারা জাহাজ ঘুরে যখন কোথাও পাওয়া গেল না, ছুটে এলাম, যদি মেসরুমে দরজা বন্ধ করে কিছু করে বসে। দরজা দেখি ভিতর থেকে বন্ধ। ডাকলাম, কে ভিতরে? সাড়া নেই।

অগত্যা পোর্টহোল দিয়ে উঁকি দিতেই দেখি সতীশ তাস সাজাবার মতো ফটোগুলি সাজিয়ে বসে আছে। প্রায় বেঘোরে পড়ে গেছে ছবিগুলি দেখতে দেখতে—এক তরুণীর স্তন নাভি অধর আরও গভীর অভ্যন্তর ভেসে বেড়াচ্ছে বোধহয় সতীশের ....

ডাকলাম, এই, কি হচ্ছে, হ্যাঁ। বসে বসে কী করছিস। এই তোমার কাজা! হ্যাঁ বউকে দেখছ সবার গোপনে বউকে দেখছ। আমরা তোমার বউকে খেয়ে ফেলব।

সতীশ কেমন চমকে গেল। সে ভাবতেই পারেনি, গ্যালির উলটোদিকের পোর্টহোলে কেউ এতে উঁকি মারতে পারে। এত উপরে উঠে .... পোর্টহোলে কেউ মুখ গলাবে—কার এত দায়—সমুদ্রের ঝড় উড়িয়ে নিলে রক্ষা করবে কে? আমাকে এতটা বিপদের মুখে ফেলে দেওয়া যেন তার ঠিক হয়নি। সে দু-হাতে তাড়াতাড়ি সাপটে ফটোগুলি তুলে

ফেলল। তারপর দৌড়ে এসে পোর্টহোলের কাছে দাঁড়াল। চোখেমুখে প্রচণ্ড ক্লেশ ফুটে উঠেছে। ভয়ে সচকিত গলায় বলল, নাম, নেমে যা লক্ষ্মী ভাইটি। ঝড়ে উড়েফুড়ে গেলে কেলেঙ্কারি।

দরজা খোল।

খুলছি। তুই নাম। তোর ভয়ডর নেই।

জীবনের মায়া নেই' !

দরজা খোল।

খুলছি।

পোর্টহোল থেকে নামছি না দেখে সে যেন অগত্যা দরজা খুলে দিল। একলাফে নেমে এল দরজায়।

কী করছিলি' !

সে ঠোঁটে আঙুল রেখে বলল—হিস।

তারপর বাইরে বের হয়ে বলল, কাউকে বলিস না। কেমন অপরাধীর গলা। নিজের বৌ-এর ফটো লুকিয়ে দেখা কী এমন অপরাধ বুঝলাম না। সে এই ফটো দেখে সারা সফর কাটিয়ে দিতে পারলে মন্দ কি' ! কিন্তু যা আমাদের ভাবিয়ে তুলছে, তা জাহাজে থাকলে, সবাইকে ভাবিয়ে তুলতে পারে। সে হাসে না। কথা বলে না। কাজে কোনো জুস পায় না। খেতে পারে না ভালো করে। অনিদ্রা। এগুলো জাহাজির ভালো লক্ষণ নয়।

সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় সতীশ বড়ো কাতর গলায় বলল, কাউকে বলিস না।

খেপে গেলাম। বোধহয় চিৎকার করেই উঠতাম। এত রাতে তবে আর একটা নাটক হয়ে যাবে পাশাপাশি কোন পালে যারা থাকে, তারা দরজা খুলে ছুটে আসতে পারে। নানা প্রশ্ন করতে পারে। কারণ দীর্ঘ সফরে জাহাজিদের মাথা ঠিক থাকে না, সমুদ্রে ঝাঁপ দেয়, কেউ উন্মাদ হয়ে যায়—ঠিকঠাক আর দেশে ফেরা হয়ে উঠে না। সতীশকে নিয়ে অনেকের মনেই এ-ধরনের সংশয় দেখা দিয়েছে। হয় আমাকে, নয় অপরেশকে সারেঙ ডেকে সতীশের খোঁজখবর নেয়। দেশ থেকে ওর চিঠি এল কিনা, চিঠিতে কোনো খারাপ খবর আছে কিনা—সতীশ দিন-দিন কেমন হয়ে যাচ্ছে। আমরাও বলছি, না তো, দেশ থেকে তো চিঠিপত্র ঠিকই আসছে। বউ-এর জন্য লম্বা সিল্কের নাইটি কিনেছে বলতে পারতাম। কিন্তু সারেঙসাব বুড়ো মানুষ—তাকে এমন খবর দিলে যেন সতীশকে ছোটো করা হবে। ওর বৌয়ের মর্যাদা রক্ষা হবে না। কিছু না অশালীন ইঙ্গিত থেকে যায় এমন খবরে' ! কাজেই চুপ করে যেতাম। কিন্তু ফোকসালে ঢুকে দেখি অপরেশ, নিমাই বসে আছে। ওরা

হয়তো আমাদের খুঁজতে উপরে উঠে যাবে ভাবছিল। আমাদের দেখেই বলল, কি রে, কোথায় গেছিলি এত রাতে' ! কিছু বললাম না। চুপ করে থাকলে সন্দেহ বাড়ে। আমাকে নিয়ে তাদের ভয় নেই। কারণ তারা জানে, আমি কিছুটা খোলামেলা স্বভাবের। আমার খুব-একটা শুচিবাই না থাকলেও—কোনো নারীসংসর্গে যেতে যে রাজি না তারা জানে। তারা নিজেরাও বন্দরে নারীসংসর্গ করে না। কারণ দুরারোগ্য ব্যাধির ভয় কার না থাকে। ডালভাত খাওয়া বাঙালি যেমন হয়ে থাকে—বরং আমাদের উপাস্য দেবী বলতে কিছু নারীর উলঙ্গ অ্যালবাম। যা দেখলে মানসিক অবসাদ থেকে আত্মরক্ষা করা যায়। জাহাজের একঘেয়ে খাওয়া, একঘেয়ে সমুদ্রযাত্রা, একঘেয়ে ঝড়-সাইক্লোন, নীল আকাশ, এবং নক্ষত্রমালা—সবই বড়ো তিক্ততার সৃষ্টি করে। সেখানে বন্দরে কোনো নারীর হাতছানি অবহেলা করা খুব কঠিন। সতীশের শুচিবাই তাকে কিছুটা আলগা করে রেখেছে আমাদের কাছ থেকে। নারী সম্পর্কে সে কোনো অশ্লীল কথা পর্যন্ত বলে না। আমাদের প্রিয় অ্যালবাম থেকে তাকে কত চেষ্টা করেছি নরনারীর সংসর্গের ছবি দেখাতে। ওটা ছুঁলেও যেন পাপ। দেখলে নরকবাস। অথচ আমরা জানি, আমাদের শুচিবাই কম। আমরা এইসব ছবি নিয়ে হেসেখেলে মজা করতে পারি। এতে বোধহয় থাকে কঠিন সব উপসর্গ থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায়। আমরা সহজেই তারপর জাহাজ ঘাটে ভিড়লে শিস দিয়ে নেমে যেতে পারি—সুন্দরী যুবতীকে ফুল উপহার দিতে পারি—কার্নিভালে ঢুকে যে-কোনো যুবতীর সঙ্গে রঙ্গরসে মজে যেতে পারি—শুধু সহবাস ছাড়া আমাদের যেন আর কিছুতেই আপত্তি নেই। আমরা এজন্যও বাকি ন-দশ মাস জাহাজে থাকব ভেবে ভেঙে পড়ছি না।

অপরেশ যে বেশ খেপে আছে, বোঝাই গেল।

সে উঠে গিয়ে ফোকসালের দরজা বন্ধ করে দিল। দরজা বন্ধ করলে বাইরে থেকে ভেতরের কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া যায় না।

অপরেশ ব্যাং-কে বসে একটা সিগারেট ধরাল। তারপর তাকাল সতীশের দিকে। সতীশ তার ব্যাং-কে এসে শুয়ে পড়েছে। কম্বলের ভিতর খামে সব ফটো, সেগুলি বালিশের নীচে লুকিয়ে ফেলেছে। আমি লক্ষ করছি—অপরেশ ফুঁসছে।

অপরেশ গজগজ করছে, শালা মরবে। শালার মগজে বীর্য উঠে মরবে। বেটার কোনো ওয়ে-আউটই নেই। জাহাজে কেন মরতে এলি' ! বিছানায় কোনো দাগ লাগে না' ! সব বউ-এর জন্য জমা করে রাখছিস! জমা করলে থাকে, থাকলে পাগলের মতো উঠে যাস। কী হাড়কাঁপানো শীত' ! তার মধ্যে লুকিয়ে বউ-এর ফটো দেখতে উঠে গেলি' !

ঠিক ধরে ফেলেছে অপরেশ।

আমার দিকে তাকিয়ে বলল, কোথা থেকে ধরে আনলি' !

বললাম, মেসরুম থেকে।

একসঙ্গে থাকলে, আর এতদিন এক ফোকসালে থাকলে মায়া-দয়া জন্মাতেই পারে। চিন্তা হতেই পারে। তাছাড়া সতীশের সুন্দরী বউকে আমরাও দেখেছি—একদণ্ড কাছছাড়া হয় না। কিন্তু এটা যে কতবড় বিপজ্জনক খেলা একজন জাহাজির পক্ষে, ভেবেই অপরেশ ক্ষুব্ধ।

সে সোজা উঠে এল।—এই ওঠ। বলে সতীশের হাত ধরে টানাটানি করতে থাকল।

নিমাই বলল, ছাড়ো তো অপরেশদা। এত রাতে আর ঝুটঝামেলা ভাল্লাগে না।

আর ও তো মরবে।

মরবে কেন!

শোন, এমন অনেক দেখেছি! জানিস, মাথায় বীর্য উঠে গেলে পাগল হয়ে যায়। দিওয়ানা হয়ে যায়।

যা, কী যে আবোলতাবোল বকছ না?

এই উঠবি, না শুয়ে থাকবি। তোর সতীপনা বের করছি। এই নিমাই বের কর তো। ঘাড় ধরে দেখাব।

সতীশ কম্বলের নীচ থেকে হাতজোড় করল, দাদা ক্ষমা কর। আমি পারব না।

পারতে হবে। ওঠ বলছি। অনেক সতীপনা সহ্য করেছি। এখন মেসরুমে শালা, পরে সমুদ্রের তলায় যাবি—তোর তো নিরিবিলি জায়গা চাই। তুই সব করতে পারিস।

সতীশ মটকা মেরে পড়ে আছে।

অপরেশের মাথা গরম হয়ে গেছে। সে এমন একটা কাজ করে বসবে বুঝতে পারিনি। এক ঝটকায় বালিশের তলা থেকে ফটোভরতি খামটা তুলে নিল।

আর নিতেই ছুটে গেল সতীশ।

সব ফেলে দেব।

অপরেশ জেটির উপরে উঠে পোর্টহোলের কাচ খুলতে লাগল।

ওর মুখে এক কথা, আগে দ্যাখ, না দেখলে ফেলে দেব।

নিমাইকে বলল, আরে বের কর আমাদের অ্যালবাম। যেটাকেই দেখা, সব এক। তার বউ-এরটা আলাদা নয় বুঝোক। ওষুধ প্রয়োগ না-হলে বাঁচবে না। ব্যাটা সাধুপুরুষ। বউ ছাড়া কিছু বোঝে না। আট-দশ মাস সফর-করা অপরেশ আমাদের চেয়ে অভিজ্ঞ। সে বলতেই পারে। জাহাজের অসুখ সম্পর্কেও সে বেশি খবর রাখে। সতীশ অপরেশের হাত

ধরে টানাটানি করছে। অপরেশ হাতটা পোর্টহোলের বাইরে রেখে দিয়েছে। ছেড়ে দিলেই সমুদ্রের নীল জলে প্রপেলারের চাকায় তছনছ হয়ে গভীর জলের অন্ধকারে ভেসে যাবে।

সতীশের কাতর অনুনয়, দোহাই অপরেশদা। পায়ে পড়ি।

দ্যাখ তবে। এই নিমাই ওর সামনে অ্যালবামটা মেলে ধর। ব্যাটা দেখুক লজ্জা ভাঙুক।

নিমাই দেখল, অ্যালবাম খুলে দিলেও সতীশ তাকাচ্ছে না।

অপরেশের হুঙ্কার, ঠিক আছে, নে এবার ঠিক ফেলে দিচ্ছি। দেখি তারপর কী থাকে তোর। বউ মগজে সেঁটে আছে।

ফেলবে না দাদা। প্লিজ, পায়ে পড়ছি।

তাকা। দ্যাখ। দিল তোর সাফ হয়ে যাবে।

ঠিক যেন ধর্মগ্রন্থ খুলে রেখেছে নিমাই। সতীশ বলল, কী নোংরা ছবি' !

দেখ না ! নোংরা হোক। তবু দেখ। আমাদের ধর্মগ্রন্থ এটা, বুঝিস' ! পাঠ কর। ভালো করে দ্যাখ। জীবনেরও ধর্মগ্রন্থ।

সতীশ দেখছে।

দ্যাখ।

সতীশ দেখছে নিমাই অ্যালবামের পাতা উল্টে যাচ্ছে।

সতীশের আর খেয়াল নেই।

এই তবে সব ! সতীশ কেমন দেখতে দেখতে নেশায় পড়ে গেল।

অপরেশ বলল, যা, ব্যাং-কে বসে দেখ। সতীশ ব্যাং-কে বসে দেখতে থাকল। কী মজা লাগছে। নারে' ! মহাকাব্যের উৎপত্তিস্থলটা দ্যাখ বাবা ভালো করে।

সতীশ তাকাচ্ছে না। নিবিষ্টমনে দেখছে। ইস, কী নোংরা। কেউ এভাবে ছবি তুলতে পারে। এদের লাজলজ্জা নেই দাদা' ! কী কুৎসিত। বমি পাচ্ছে।

শালা বমি পাচ্ছে তোমার ! মারব এক থাপ্পড়। যা এবার বালিশের নীচে রেখে শুয়ে পড়। অনেক জ্বালিয়েছ। আর না। বউ-এর ফটোগুলো আমার কাছে থাকল। দরকার পড়লে চেয়ে নেবে।

অবশ্য শেষ পর্যন্ত দরকার পড়েনি।

অপরেশই কলকাতার ঘাটে ফটোগুলি ফিরিয়ে দিয়েছিল। বলেছিল, বউকে বলবি, আর-একদিন নেমন্তন্ন করে যেন খাওয়ায়। আমরা তো খারাপ। কে কত ভালো জানা আছে' ! পাগল হসনি রক্ষে। এবারে অ্যালবামটা ফেরত দে।

পাচ্ছি না।

মিছে কথা বলছিস' !

ধরা পড়ে গিয়ে সতীশ বলল, এটা থাক দাদা আমার কাছে। তুমি না-হয় আর-একটা কিনে নিও।

স্বপ্নবৎ

শৈশবে সাঁকো পারাপার ছিল আমাদের প্রিয় খেলা। অবশ্য শৈশব না কৈশোরকাল এখন আর তা ঠিক মনে করতে পারছি না। আমি, কুট্টি মাসি, কুট্টি মামা, ছোটন দাদু সবার ছিল এটা বড়ো প্রিয় খেলা। শীত গ্রীষ্মে মামার বাড়ি যাবার এই এক আগ্রহ ছিল।

মামার বাড়ি যেতাম মা-র সঙ্গে। শীতে গ্রীষ্মে কখনো বর্ষায় মাতামহের চিঠি আসত। মাতামহের সেই গোপনীয় চিঠি একবার দেখে ফেলেছিলাম। মা এই চিঠি এলেই আড়ালে কাঁদতে বসতেন। চিঠিটাতে কী এমন দুঃসংবাদ থাকত, জানি না। বড় জ্যাঠামশায় তখন বৈঠকখানা ঘর থেকে খড়ম পায়ে বের হয়ে ডাকতেন, বাহার, বাহার আছিস!

বাহার চাচার সাড়া পাওয়া যেত গোয়ালঘরের পেছনে। বলত, যাই কর্তা।

বাহার চাচাকে তিনি বলতেন, মেজবউ কান্নাকাটি করছে। বাপের বাড়ি যাবে বলছে। দিয়ে আয়। দিনক্ষণ দেখে দিচ্ছি।

ব্যাস, আমার তখন মজা। কারণ মামার বাড়ি গেলেই সাঁকো পারাপারের খেলা শুরু হয়ে যাবে। এই এক মজা যেমন আমাকে তাড়া করত, সঙ্গে এক আতঙ্কও ছিল গভীর। মুখ ব্যাজার হয়ে যেত সেসব দৃশ্যের কথা মনে হলে।

যেমন, মাতামহের চিঠিতে লেখা থাকত, তোমার গর্ভধারিণী আবার গর্ভবতী। এই গর্ভবতী শব্দ মাকে কিছুটা বোধ হয় ত্রাসের মধ্যে ফেলে দিত। চিঠিটা পড়েছি জানতে পেরে, মা একবার খুব মেরেছিলেন আমাকে।

মা, দিদিমার দ্বাদশ বর্ষের প্রথম সন্তান। আমি মা-র পঞ্চদশ বর্ষের একমাত্র জাতক। আমার বয়স তখন আট-দশ হতে পারে, কিংবা দশ-বারো হতে পারে—সে যাই হোক, দিদিমা যে যুবতী সে বয়সেও টের পেতাম। একটা চুল পাকেনি। চোখ বড়ো বড়ো—প্রতিমার মতো মুখ। মায়ের রং আশ্চর্য রকমের লাবণ্যে ভরা। কুট্টিমাসি, আমার বছর দু-তিনের বড়ো। ছোটন দাদু মা-র কনিষ্ঠ খুড়ামশাই। আমার মা-র চেয়ে আট-দশ বছরের ছোটো।

তবু মা তাকে আপনি আজ্ঞে করতেন। মামার বাড়ি গেলে প্রণামের ধুম পড়ে যেত। মা-র একমাত্র সন্তান বলে আমাকে ছেড়ে তিনি কোথাও এক রাত কাটাতে পারতেন না। আমার মাতামহের পিতৃদেব দ্বিতীয়বার দ্বার পরিগ্রহ করেন। ছোটন দাদু তার দ্বিতীয় পত্নীর সন্তান। মাতামহের পিতৃদেবকে আমি দেখিনি। বাড়ির বৈঠকখানায় তাঁর একটি তৈলচিত্র আছে। খড়ম পায়, দীর্ঘকায় সুপুরুষ, খালি গায়ে কোঁচানো ধুতি পরে দাঁড়িয়ে আছেন। সাদা গোঁফ, চোখে চশমা, গলায় সাদা ধবধবে উপবীত। মাথায় লম্বা শিখাটি পর্যন্ত ছবিতে ধরা আছে। চোখ বিস্ফারিত, সাদা মারবেল পাথর বসানো চোখে এবং তাতে মনে হত দুটো বেতুন ফল বসানো আছে। তৈলচিত্রটির সামনে যেতে আমার ত্রাস সৃষ্টি হত কেন জানি না। কাছে গিয়ে দাঁড়াবার সাহস হয়নি। তেজস্বী চেহারা, গম্ভীর এবং গর্জন তেলের মতো চকচকে।

আর সবচেয়ে বিস্ময় সৃষ্টি করত, হাতে তাঁর এক গণ্ডা অতিকায় ইলিশ। শিল্পী এই ইলিশ কেন হাতে রেখেছেন জানি না। গাঁয়ের কুলদা আচার্য ছবিটি এঁকেছিলেন। মা কথায় কথায় এমন বলতেন। এত দাপট ছিল তাঁর বাঘে-গোরুতে এক ঘাটে জল খেত। তিনি মেঘনার ইলিশ পছন্দ করতেন। গাঁয়ের রথতলায় তিনি হাট বসিয়েছিলেন যাতে মেঘনা থেকে জেলেরা সোজা হাটে চলে আসতে পারে। হাটে তিনি যেতেন, সবচেয়ে বড়ো এবং তাজা এক গণ্ডা ইলিশ কিনবেন বলে। গৃহভৃত্য সঙ্গে থাকলেও তিনি নিজে হাতে ঝুলিয়ে ইলিশ আনতেন। হয়তো কুলদা আচার্যের কাছে এই দৃশ্যটাই বড়ো গুরুত্ব পেয়েছিল। মানুষটিকে বুঝতে হলে, এক গণ্ডা ইলিশ হাতে ঝোলানো রাখা দরকার তিনি হয়তো এমন ভেবেছিলেন—গুরু বংশ বলে কথা' ! আমার সব সময়ই মনে হয়েছে মাতামহের পিতৃদেব কাজটি ভালো করেননি। তাঁর আঠারোটি সন্তান এবং জীবিত অবস্থায় ষোলোটি সন্তানের দাহকার্য সম্পন্ন করেছেন। দুই স্ত্রী গত হয়েছিলেন। আমার মাতামহ এবং ছোটন দাদুকে ছাড়া শেষ বয়সে তাঁর আর কেউ ছিল না। পিতার অসম্পূর্ণ কাজটি মাতামহ শুরু করে দিতেই তিনি নিশ্চিন্তে দেহত্যাগ করতে পেরেছেন এমন মনে হত আমার।

তিনি যে বিশাল বিত্তের অধিকারী, তাঁর চিহ্ন রথতলার মঠ, প্রাসাদতুল্য বাড়ি, সামনে সবুজ ঘাসের লন, ঘাটলা বাঁধানো দিঘি—এবং নদীর পাশে এক বিশাল অরণ্য। বৈঠকখানায় মেহগিনি কাঠের চেয়ার, শ্বেতপাথরের টেবিল, পালঙ্ক—তাকিয়ার ঠেস দিয়ে অম্বুরি তামাকের ধোঁয়া গিলে চোখ বুজে বিত্ত-বৈভবের কথা হয়তো ভাবতেন, এ-হেন দৃশ্যেরও দু-একটা ছোটোমাপের তৈলচিত্র আঁকিয়ে রেখেছিলেন।

তিনি একটি কালীবাড়িও প্রতিষ্ঠা করে যান। ধুতুরা ফুলটি এবং চারটি করবী গাছ নিজ হাতে রোপণ করেন। কালীবাড়িটি বিশাল জঙ্গলের মধ্যে। বর্তমানে আমার মাতামহ

সেবাইত। জাগ্রত দেবী তিনি। শনি মঙ্গলবারে জোড়া পাঁঠা বলি, তার পূজা হোম লেগেই থাকে। পাশেই নদী। ছাগল বামনি। বোধহয় মেঘনার খাড়ি নদী এটা—মেঘনা থেকে বের হয়ে মাতামহের গাঁয়ের পাশ দিয়ে বিশ-বাইশ ক্রোশ দূরের শীতললক্ষ্যায় গিয়ে মিশেছে। সাঁকোটা তারই ওপর। বাঁশের সাঁকো। বর্ষায় নদী হয়ে যায়। জলের খরস্রোতে সাঁকোটি ভেসেও যায়। বর্ষার শেষে নদী শীর্ণ হতে হতে যখন দু-পাড় খুবই কাছে এসে যায়, সাঁকোটি তৈরি হয়। বাঁশের সাঁকো। নীচে দুটো করে বাঁশ ফেলা থাকে। নদীতে আট-দশ গজ অন্তর বাঁশের খুঁটি পুঁতে দেওয়া হয়। এভাবে সাঁকোটি উপরের দিকে কিছুটা উঠে গিয়ে ফের নীচের দিকে নামতে শুরু করে। পঞ্চাশ ষাট গজ, কি তারও বেশি হতে পারে সাঁকোর পাশে লম্বা বাঁশ টেনে দেওয়া—নদী পারাপারের জন্য। বাঁশ ধরে সন্তর্পণে হেঁটে যেতে হয়। খুঁটি নড়ে। বেশ ঝাঁকুনি খায়, অথচ হুমড়ি খেয়ে পড়ে না। আট-দশজন লোক পারাপার হয় একসঙ্গে।

রথতলার মাঠে বিশাল একটি বকুল বৃক্ষ। এটি কে রোপণ করেছিলেন, কিংবা অবহেলায় বেড়ে উঠেছিল কি না আমাদের জানা নেই। কালো কালো ডাল, অজস্র শাখাপ্রশাখায় জায়গাটা দিনের বেলাতেও অন্ধকার হয়ে থাকে। দূরের পথিকরা গাছের গোড়ায় খর রোদ থেকে বাঁচার জন্য দু-দণ্ড জিরিয়ে নেয়। মাতামহের বাড়ি থেকে জঙ্গলের ভিতর দিয়ে একটা পথ আছে। অন্দরমহল থেকেও সেই পথ ধরে এই বকুল বৃক্ষের তলায় আসা যায়। আমার কুট্টি মাসি বকুল ফল এবং ফুল দুই ভালোবাসে। আমার সঙ্গে কুট্টি মাসি মাঝে মাঝে বকুল ফুল তোলার জন্য গাছটার নীচে এসে দাঁড়াত। ফুল এত অজস্র যে বর্ষার প্যাঁচপ্যাঁচে ফুলের গন্ধ। কাদা থেকে ফুল তোলা যেত না। আমরা গাছের শাখাপ্রশাখায় নজর রাখতাম। ফুল এসে মাটিতে পড়ার আগেই ধরে ফেলতাম। মাটিতে পড়লে কাদা লাগবে ভয়ে এটা করা হত। কিংবা গ্রীষ্মের দাবদাহে ফুলের ওড়াউড়ি কেমন নেশা ধরিয়ে দিত কুট্টি মাসিকে।

বিকেল বেলাতে কুট্টি মাসির সাঁকো পারপারের খেলা শুরু। আমরা সমবয়সীরা তার সঙ্গী। তার কথামতো না চললে, দুপদাপ পা ফেলে জঙ্গলের ভিতর দিয়ে ছুটে পালাত। তারপর সত্যি-মিথ্যা নালিশ তার। এবং অকপটে এমন মুখ ব্যাজার করে নালিশ দিত যে আমরা শুনে আহাম্মক বনে যেতাম।

সাঁকো পারাপারের নেশা আমার কম না। আগে কুট্টি মাসি সাঁকোর ওপর উঠে টলতে টলতে হাঁটত। হাতলের বাঁশ না ধরে হাঁটত। প্রায় পৌঁছে যাচ্ছে। আমরা সাঁকোর গোড়ায় দাঁড়িয়ে। আমরা পারি না, কারণ বিকেল থেকেই খেলার শুরু। কেউ কিছুটা গিয়ে, কেউ মাঝপথে হাতলের বাঁশ ধরে ফেলি। কুট্টি মাসি বিনা অবলম্বনে টলতে টলতে পার হয়ে যাচ্ছে, এটা আমার সহ্য হত না। আমি সাঁকো ঝাঁকিয়ে দিতাম। সঙ্গে সঙ্গে কুট্টি মাসি

আত্মরক্ষার্থে হাতলের বাঁশ ধরে ফেলত। না ধরলে বিশ-বাইশ ফুট গভীরে জলে কাদায়, কচুরিপানায় ডোবাডুবির কেলেঙ্কারি।

কে ঝাঁকাল।

এক কথা, না আমরা ঝাঁকাইনি।

মিথ্যুক। বলেই কান ধরে টানাটানি করতে এলে বলতাম, মাসি কুকুর।

ব্যাস হয়ে গেল। রাস্তায় জোড়া কুকুর দেখলেই মাসির মাথা খারাপ।

তাড়া তাড়া।

ঢিল নিয়ে ছুটছি। কুকুর দুটোকে তাড়িয়ে না দিতে পারলে, চোখের সামনে থেকে অদৃশ্য করে দিতে না পারলে বাড়ির সবার ভোগান্তি। শুয়ে থাকবে মাসি। খেতে বসলেই ওক উঠবে।

শ্রাবণ-ভাদ্রে কুট্টি মাসির জোড়া কুকুরের ভয় এত যে তার ঘরের দক্ষিণের জানালা বন্ধ রাখতে হয়। কারণ জানালা খুললে লিচু বাগান এবং হাটের দোকানপাট সহ রাস্তা ভেসে ওঠে এবং জোড়া কুকুরও। জানালাটা শ্রাবণ-ভাদ্রে এ-জন্য বন্ধ করে রাখা হয়। আমার কুট্টি মাসি ফ্রক ছেড়ে শাড়ি পরার পর থেকেই এটা হয়েছে। ন-মাসি ফ্রক পরে। আমার ছোটো। অন্না মাসি তারও ছোটো। মামা মাসি মিলে বারো তেরোজন। শুধু বারো বলতে পারি না, আবার তেরোও বলতে পারি না। বারো বললে মিছে কথা হবে, তেরো বললেও মিছে কথা হবে। কারণ মাতামহীর গর্ভের সন্তানটিকে বাদ দিলে বাক্যের অপলাপ হবে।

মাতামহ তান্ত্রিক মানুষ। মাথার বিশাল শিখা। সকাল বেলায় প্রাতঃস্নান, স্তোত্র পাঠ। বর্ষায় নদীর ঘাটলায় অবগাহন—সূর্য প্রণাম থেকে কালী কবচ পাঠ—হাতে এক ঘটি জল নিয়ে মঠের শিবের মাথায়, কালীমন্দিরের চার করবী গাছে এবং ধুতুরার জঙ্গলে জল ছিটিয়ে বাড়ি ফেরেন। গরদের কাপড় পরনে। ঘরে তাঁর পাঁজিপুঁথি, দূর দূর গ্রাম থেকে শ্রাদ্ধ, অশৌচ, পাকা দেখা বেং অন্যান্য শুভ দিন, যাত্রা শুভ না অশুভের ভিড়। মূল প্রাসাদের বাইরে বিশাল উঠান। বড়ো বড়ো গোলা, ধানের, মুসুরির, মুগের। তার সংলগ্ন ঢেঁকিশালা। অধিরথ দাদুর তত্ত্বাবধানে সব। পাঁঠা বলি থেকে, জমিজমা চাষ আবাদ দেখার দায় তার।

কাকভোরে খড়ম পায়ে মাতামহ তার ঘর থেকে বের হলে হৃৎকম্প দেখা দিত আমাদের। উঁচু লম্বা এবং এত ফর্সা যে রক্তচন্দনের প্রলেপ চকচক করত কপালে। শিখাতে একটি লাল জবা দোদুল্যমান। গ্রামটা বিশাল, সাহা, পাল, ধোপা, নাপিত, বাদ্যকার এবং আচার্য ব্রাহ্মণ বলতে এক ঘর—আর বাদবাকি জেলেপাড়ার বাসিন্দা। ব্রাহ্মণ পরিবার বলতে আমার মাতামহ এবং তাঁর পরিবার। পরিবারের নানাবিধ লোক

মিলিয়ে ত্রিশ একত্রিশ। মামা বলতে কুট্টি মামা। আর সব মাসি। পাঁচ মাসির বিয়ে হয়ে যাওয়ায় পরিবারের জনসমষ্টি কিছুটা ভাটার দিকে। কুট্টি মাসির সম্বন্ধ আসছে। পছন্দ হচ্ছে না। কারণ পাত্রপক্ষ কী করে খবর পেয়ে যায় মাসির মাঝে মাঝে মাথা খারাপ হয়ে যায়। অস্বাভাবিক আচরণ। খাওয়া-নাওয়া বন্ধ। খেতে বসলে বমি পায়।

শ্রাবণ ভাদ্রে রোগের লক্ষণ প্রকাশ। শীত এলে নিরাময়। এ-ছাড়াও এই রোগের প্রকোপ বাড়ে মাতামহীর গর্ভধারণে। কারণ, গর্ভধারণের শেষ দিকে আমার মাকে আসতেই হয়। মাতামহীর সেই চিঠির কথা আগেই বলেছি—একবার চিঠিটি দেখেই বুঝেছিলাম, বার বার এই একই বার্তা থাকে, তোমার গর্ভধারিণী আবার গর্ভধারণ করেছেন। তুমি কাছে থাকলে তিনি মনে বল পান। বড়ো পুত্রার অনুমতি সাপেক্ষে তোমার আসা বাঞ্ছনীয়।

বড়ো পুত্রার অনুমতি সাপেক্ষে অর্থাৎ আমার বড়ো জ্যাঠামশাইর অনুমতি নিয়ে যাত্রা করার নির্দেশ থাকত চিঠিতে। আগে শুনেছি, মাতামহ মাকে চিঠি দিতেন না। বাবা প্রবাসে থাকেন, তাঁকে চিঠি দেবার প্রশ্নই নেই। গৃহকর্তা বর্তমানে বড়ো জ্যাঠামশাই। ঠাকুরদা বেঁচে থাকতে তাঁর কাছেই চিঠি দিতেন। সবই শোনা কথা।

আমার মাও বোধ হয় গর্ভধারিণীর গর্ভধারণে সংকোচ বোধ করতেন। আগে শুনেছি গুম মেরে যেতেন। ঠাকুমা টের পেয়ে বলতেন, মেজো বউমার শরীর বোধ হয় ভাল নেই। কিংবা বলতেন, বাপের বাড়ি থেকে কী দুঃসংবাদ এল কে জানে' ! বড়ো জেঠির তত্ত্বতালাশ শুরু হয়ে যেত এবং ক্রমে জ্যাঠামশাইর কানে কথাটা উঠলে বাহার চাচাকে দিয়ে ডুলিতে মাকে পাঠিয়ে দিতেন। আমাদের গাঁয়ের ছাড়া বাড়িতে সাত-আটজন লোক পালকি নিয়ে শীত গ্রীষ্ম বসবাস করত। বর্ষাকাল এলে সুদূর মুঙ্গের বলে একটি দেশ আছে সেখানে চলে যেত। গাঁটাগোট্টা মোটা গোঁফ, বেঁটে মতো লোকগুলি মুঙ্গেরের মানুষ—খুব অচেনা জায়গা নয়—কারণ বই-এ তখনকার দিনে মুঙ্গেরের ভূমিকম্প কথাটা লেখা হয়ে গেছিল। আমরা স্কুলের পাঠ্য বই থেকে মুঙ্গের নামক স্থানটির পরিচিতি লাভ করে ফেলেছি। লোকগুলিকে চিনতে অসুবিধা হত না। ওদের দেশোয়ালি ভাষা আমরা একদম বুঝতাম না। তবে ভাঙা বাংলা বলতে পারত বলে রক্ষা। ডুলি কাঁধে যাবার সময় আমি আর বাহার চাচা অনেক পেছনে পড়ে থাকতাম। তারা মাঠ পার হয়ে খাল নদী বিল পার হয়ে কোনো গাছতলায় অপেক্ষা করত। আমরা গাছতলায় পৌঁছালে আবার তারা রওনা দিত। মা শুধু একবার ডুলির কাপড় তুলে মুখ বার করে আমাকে দেখে নিশ্চিন্ত হতে পারতেন।

বর্ষায় কোনো অসুবিধা ছিল না। ঘাট থেকে নৌকা ছেড়ে দিলেই হল। পাল তুলে দিলেই হল। বর্ষার জল থই থই করছে। আমি আর মা ছই-এর ভিতর। কাঠের পাটাতনে

সাদা ফরাস পাতা বিছানা। দুদিকে কাঠের দরজা। দরজা খুলে প্রায়ই আমি বাইরে এসে বসতাম। বাহার চাচা তামাক খেতে খেতে আমার মাতামহের যশ করতেন খুব। সাচ্চা আদমি বলতেন মাতামহকে। আমি গর্ব বোধ করতাম।

এমন একজন মাতামহের প্রতি কুট্টি মাসি খুব রুষ্ট ছিলেন ধরতে পারতাম। মাতামহকে সহ্য করতে পারতেন না। তাঁর কী অপরাধ তাও ধরতে পারতাম না। কথায় কথায় কুট্টি মাসি বলত, যাব যেদিকে দু-চোখ যায় বের হয়ে?

আমি বলতাম, যাও না কেন?

যাব কী করে। দেখিস না, কুকুরগুলি কী জ্বালায়।

তা হলে একমাত্র কুকুরের ভয়ে কুট্টি মাসি দেশান্তরী হতে পারছেন না। কুকুরের উপদ্রব নেই কোথায় ! এমন জায়গা আমারও চেনা নেই যে বলি, কুট্টি মাসি, আমি চিনি, যাবে' ! কুকুরের উপদ্রবে পড়তে হবে না এও ভেবে পাই না, জোড়া কুকুর দেখলেই মাসি এত খেপে যায় কেন। এক কথা, মার মার। লাঠি পাচ্ছিস না ! বলে কোত্থেকে একটা বাঁশের লাঠি দিয়ে বলত, ঠেঙা। হাত-পা নুলো করে দে। কী রে দাঁড়িয়ে থাকলি কেন' !

কামড়াবে মাসি।

দে আমাকে। বলে লাঠি নিয়ে উন্মাদের মতো ছুটে যেতেন। অধিরথ দাদু দেখলে ছুটে যেত। বলত আবার মাথা খারাপ হয়েছে দেখছি। ইস করছেন কী কুট্টি মাসি। মরে যাবে যে। কুকুরগুলিও বেহায়া আবার ঠিক কুট্টি মাসির জানালায় এসে দাঁড়িয়ে থাকবে। একবার এক জোড়া কুকুরের পেছনে তাড়া করতে গিয়ে আমি আর ছোটন দাদু সেই ভূতুড়ে দেশটায় গিয়ে পড়েছিলাম। নদীর পাড়ে শ্মশান, চালাঘর, তার পাশে আঁশশ্যাওড়ার জঙ্গল—নানারকমের ঢিবি। জায়গাটায় গেলেই গা ছমছম করত। কারণ এ-জায়গাটা কোনো রাক্ষসের রাজত্ব মনে হত। আমি, মাতামহ, ছোটন দাদু, কুট্টি মামা এর আগেও দুবার এসেছিলাম জায়গাটায়। ছোটন দাদুর মাথায় হাঁড়ি। কুট্টি মামার কাঁধে কোদাল। মাতামহের কোলে মৃত শিশু। শিশুটি আমার মাসি হতে পারত। ছোটো ছোটো দুটো নীলচে পা কাঁথার ফাঁকে বের হয়ে আছে। আমরা তাকে জঙ্গলে পুঁতে রাখব বলে যাচ্ছিলাম। আমার হাতে কিংবা মাথায় কিছু ছিল না। না গেলেও চলত। ভয়ে আমি কুট্টি মাসির ঘরে পালিয়েছিলাম। বার বার ডাকছেন মাতামহ, দিবানাথ, দিবানাথ' ! তারপরে তেতে উঠেছিলেন, পুংগির ভাই গেল কোথায়' ! সাড়া পাচ্ছি না' ! মাতামহীর শোকার্ত চিৎকারের মধ্যেও তিনি নির্বিকার। পরিহাসচ্ছলে যেকথা বলে থাকেন, আমাকে সেদিন খোঁজাখুঁজির সময় সেই বাক্য উচ্চারণ। মারও ইচ্ছা নয় এমন শবযাত্রায় আমি সঙ্গী হই। তিনি

জানতেন, কার ঘরে আমি আশ্রয় নিতে পারি। জেনেও চুপ করেছিলেন। ভয়ডর বলে কথা। অথচ মাতামহের ইচ্ছের বিরুদ্ধে তিনি কিছু বলারও সাহস রাখেন না।

উঠানে তিনি এবং প্রতিবেশীরা।—অধিরথ দাদু কোদাল নিতে পারতেন, হাঁড়িও। আমাদের কারও যাওয়ারই দরকার পড়ে না। কিন্তু বামুনের মড়া, ছুঁলে জাত যাবে—এবং শুদ্ধাচারী মানুষের বাড়ি বলে সবাই তটস্থ। ছোঁয়াছুঁয়ি হয়ে না যায়। একপাশে আলগাভাবে দাঁড়িয়ে আছেন। আর ডাকছিলেন, দিবানাথ তোমার সঙ্গে যাওয়া দরকার। প্রকৃতি কাউকে ক্ষমা করে না। তুমি সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছ। তুমি বুঝতে পারছি আতঙ্কগ্রস্ত। কোথায় পালিয়ে আছ জবাব দাও।

লম্বা বারান্দা পার হয়ে অন্দরমহল। সেখান থেকে আর্ত কান্না ভেসে আসছে, বাবারে কোথায় গেলি রে' ! আমার কী হবে রে। আমার সোনার চাঁদকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ। শোকার্ত মাতামহী বাবা বলে কেন আর্তনাদ করতেন আমার কাছে বিস্ময়। মা বারান্দা ধরে নীচে নেমে বলেছিলেন, দিবানাথের শরীর ভালো নেই বাবা।

সে কোথায়' !

কুসুমের ঘরে।

কুট্টি মাসির নাম কুসুম।

ফুলের নামে সবার নাম। কেবল কুট্টি মাসির নাম কুসুম। মা-র নাম নিতে হয় না, ছেলেবেলায় এই শিক্ষা পাওয়ার দরুন বুঝি ফুলের সঙ্গে মেয়েদের নামের কোথাও একটা মিল থেকে গেছে। মাতামহীর প্রতিমার মতো মুখ মেয়েরাও পেয়েছে। এত ঘন চুল, আর ছবির মতো ঘরবাড়ি মিলে, বাড়িটা অপ্সরা।

মাতামহর গলায় গাম্ভীর্য এ ত যে, শেষ পর্যন্ত আর পালিয়ে থাকতে পারিনি। তিনি অধিরথ দাদুকে দিয়ে আমাকে মন্দিরে পাঠালেন। আমাকে উলঙ্গ হয়ে মন্দির থেকে ফুল বেলপাতা তুলে আনতে হবে। ফেরার সময়ও উলঙ্গ। আমার জামা প্যান্ট অধিরথ দাদুর হাতে। তিনি মন্দিরের সামনে গেট খুলে বলেছিলেন, নিশ্বাস বন্ধ করে দৌড়ান। মন্দিরের চারপাশে বিশাল পাঁচিল। মন্দিরটি এক কোনায়। মন্দিরের বাইরে খোলা আকাশের নীচে একটি থান আছে। থানটি তেল সিঁদুরে মাখামাখি। চত্বর বাঁধানো থানের ওপর বাসি ফুল বেলপাতা। মাতামহ মন্দিরের পূজা শেষ করে থানে পূজা দিতেন। মন্দির গর্ভে করালবদনা দেবীমূর্তি। কষ্টি পাথরের। তার রক্ত জিভ লকলক করছে। মাথায় সোনার মুকুট এবং নাকে একটি বৃহৎ নোলক। সাধারণের প্রবেশ নিষেধ। যার যা মানত থানে। মন্দির গর্ভে প্রবেশের অধিকারী আমার মাতামহ এবং তার অনুপস্থিতিতে ব্রাহ্মণদির বিজয় চক্রবর্তী। তিনি সম্পর্কে আমার মেসো হন। বর্ষাকালে মাতামহ শিষ্যবাড়ি ঘুরে বেড়ান। সে

এক এলাহি বন্দোবস্ত। ঠাকুর চাকর, দুজন মাঝি এবং একটি পানসি নৌকায় তাঁর বিলাস ভ্রমণ। শীতেও বের হয়ে পড়েন—অর্থাৎ মাতামহীর গর্ভধারণের সময় কাল বুঝে তিনি পর্যটনে বের হতেন।

বিশাল পাঁচিল দিয়ে ঘেরা মন্দিরের ঢোকার সদর দরজাটি তালাবন্ধ থাকত। অসময়ে মানত দিতে এলে পাঁচিলের বাইরে থেকে পয়সা ছুঁড়ে দিতে হত থানে। জাগ্রত দেবী বলে কেউ থানের পয়সা তুলে নিতে সাহস পেত না। কেউ কেউ পাঁচিল টপকে জোড়া পাঁঠা ছেড়ে দিয়ে যেত। অধিরথ দাদুর কাজই ছিল পয়সা এবং পাঁঠা সংগ্রহ করে নিয়ে যাওয়া। মন্দিরে মাতামহ আসতেন দুপুরে। পূজা শেষ করতে বেলা গড়িয়ে যেত। রাতে পঞ্চপ্রদীপ, শঙ্খ এবং ধূপের সমারোহ। ঢাকি ঢাক বাজাত। অঞ্চলের মানুষজন চত্বরে দাঁড়িয়ে দেবী দর্শন করতেন। মাতামহ কেমন অন্য এক গ্রহের বাসিন্দা হয়ে যেতেন। চামরের হাওয়ায় দেবীর ফুল বেলপাতা যেন ওড়াউড়ি শুরু করে দিত। মাতামহের সঙ্গে আমি, ছোটন দাদু, কুট্টি মামা একমাত্র প্রবেশের অধিকার পেয়েছিলাম। ধোওয়া জামা প্যান্ট পরার পর চরণামৃত তিনি আমাদের শরীরে ছিটিয়ে দিতেন। ছড়িয়ে দিলেই আমরা পুণ্যবান হয়ে যেতাম। পঞ্চপ্রদীপ জ্বালাতে পারতাম। ধুনুচিতে নারকেলের ছোবড়ায় আগুন দিতে পারতাম। এবং কোশাকুশি এগিয়ে দেবারও অনুমতি মিলে যেত।

অধিরথ দাদুর কথামতো পাঁচিলের গেট থেকে নিশ্বাস বন্ধ করে থান থেকে ফুল বেলপাতা তুলে এনেছিলাম। বিশাল এক অরণ্যের ভিতর দিয়ে পথ। বড়ো বড়ো শাল জারুল এবং বট বৃক্ষের ভিতর অরণ্যটি সব সময় ভীতির উদ্রেক করে। একা এই পথ ধরে কখনো নদীর পাড়ে আসতে সাহস পেতাম না। বনজঙ্গলের ভিতর ঢুকে অধিরথ দাদুকে বলেছিলাম, জামা-প্যান্ট দাও। আমার লজ্জা করছে।

অধিরথ দাদু হেসে বলেছিলেন, এতটুকুন ছেলের কিসের লজ্জা !

বোঝাই কী করে নির্জন মন্দিরের সামনে উলঙ্গ হয়ে ফুল বেলপাতা তুলে আনা একরকমের, আর বাড়ির ভিতর উলঙ্গ হয়ে ঢোকা অন্য রকমের। মা মাসির, গাঁয়ের অন্য নাবালিকার ভিড়ের মধ্যে উলঙ্গ থাকতে কার না লজ্জা হয় ! অধিরথ দাদু মুচকি হাসছিলেন।

সবচেয়ে ভয় কুট্টি মাসিকে। আমাকে উলঙ্গ দেখলেই গোপনে শাসাবে, তুই কি মানুষ' ! না পাঁঠা। আমি মুখ ব্যাজার করে ফেললে ঠিক বলবে, আসলে তুই অপদেবতা। ওঝা বদ্যির বশ। তোর কী দোষ' !

কুট্টি মাসি আমার সুখদুঃখ টের পায় খুব । কারণ মামাবাড়ি গেলে, কুট্টি মাসির অজস্র ফুটফরমাস খাটতে হত।

এই সেমিজটা দে।

খালি গা। সুপরি ওঠার মতো স্তন। আমার কোনো বিকার সৃষ্টি হয়নি। সেবারে মাতামহীর সূতিকা গৃহে সাঁঝ লাগার সঙ্গে মা স্নান সেরে ঢুকে যেত। ঢুকে যাবার আগে দরজার সামনে একটি অগ্নিকুণ্ড সৃষ্টি করা হত। মাতামহ অগ্নিকুণ্ডের পাশে বসে বটুক ভৈরব স্তোত্র পাঠ করতেন। মা সূতিকা গৃহে ঢুকেই দরজা বন্ধ করে দিতেন। ভিতরেও থাকত একটি অগ্নিকুণ্ড। দিবানিশি গাছের গুঁড়ি পুড়ছে। সকালে মাতামহী কালোজিরে বাটা আর ঘি দিয়ে অগ্নিকুণ্ডের দিকে পিঠ রেখে খেতে বসতেন। কোনায় ছেঁড়া কাপড়ের মধ্যে মাংসের ডেলার মতো পড়ে আছে শিশুটি। হাত পা নাড়ছে, কখনো গগন ফাটিয়ে আর্তনাদ। মাতামহী সঙ্গে সঙ্গে বুকে তুলে বিশাল স্তনে সন্তানের মুখ ঠেসে ধরতেন। মা সূতিকা গৃহে ঢুকে গেলে আমি একা। কুট্টি মাসি তখন আমার সব। আমার সঙ্গী। এক সঙ্গে খাওয়া, এক সঙ্গে ঘাটলায় গিয়ে বসে থাকা, গাছ থেকে চাঁপা ফুল পেড়ে আনা—সব। এবং শোওয়ার সময় তার পালঙ্কে আর একটা বালিশ রেখে বলত, কীরে ভয় পাবি না তো' ! ভয় কী। তোর মা নেই, আমি তো আছি। তখন আমার মনেই হত না কুট্টি মাসি আমার চেয়ে দু-তিন বছরের বড়ো। এমনকী পড়াশোনার কথাও বলতেন। অঙ্কগুলো করেছিস' ! তোর ছুটির পড়া কখন করবি? টেবিলে সেজবাতি জ্বালিয়ে আমার পাঠ্য বই-এর সামনে ঝুঁকে বসতেন। আমি গেলে, মা গেলে যে কোনো কারণেই হোক কিছুটা স্বাভাবিক থাকতেন। বাড়ির আমসত্ত্ব, নাড়ু, সন্দেশ আমাকে চুরি করে খাওয়াতে ভালোভাসতেন। এ-জন্য হতে পারে, কিংবা কুট্টি মাসির শরীরের কোনো হেতু থেকেও হতে পারে। আমি প্রায় তাঁর কাছ ছাড়া হতাম না।

আমাদের সাঁকোর খেলাটা সে-জন্যই এত প্রিয় ছিল। মাতামহ বাড়ি থাকলে কুট্টি মাসি, বনজঙ্গল পার হয়ে নদীর পাড়ে চলে আসতে পারত। আমার সঙ্গে কুট্টি মাসি থাকলে স্বাভাবিক থাকবে এই ধারণা থেকেও বিধিনিষেধের বেড়া কিছুটা আলগা করে দিতেন মাতামহ। অসূর্যম্পশ্যা নারী। শাড়ি পরার সঙ্গে এ গৃহে নারীরা অসূর্যম্পশ্যা হয়ে যায়। বুকে সুপারির মতো স্তন ওঠার সঙ্গে শাড়ির ছিল গভীর সম্পর্ক। ফ্রক পর নিষেধ। সতর্ক নজর মাতামহের। মাতামহী কিছুটা আলগা স্বভাবের। তার পানের ডাবর এবং সুপারি কাটার জাতি সামনে থাকলে তিনি স্থিরচিত্ত থাকতেন। রান্নাবাড়ি সামলাবার দায় একজন ঠাকুরের। সেই মাতামহীর লিস্টি মতো জলখাবার থেকে ভোজনের ব্যবস্থা করে থাকে। ঘরের ভিতর বিশাল পালঙ্ক। খাটের পায়াগুলি সিংহের থাবা যেন। এক পাশে কাঠের একটা বিশাল সিন্দুক। দেড় মানুষ উঁচু সিন্দুকটির কপালে অজস্র সিঁদুরের ফোঁটা। একটা কড়াতে মালি সোলার এক জোড়া কদম ফুল। প্রশস্ত ঘরের জানালা এত ছোটো যে

বাইরের আলো ভালোভাবে প্রবেশ করতে পারত না। আমাদের যখন তখন ঢোকা ছিল বারণ।

আমি সেবারে হাতে বাসি ফুল বেলপাতা নিয়ে বাড়ি ঢুকতে সংকোচ বোধ করছিলাম। অথচ তার আগের বার ঘাটলায় গেলেই জামা প্যান্ট খুলে দিঘিতে সাঁতার কাটার নেশা ছিল। কিন্তু সেবারে আমি রাজি না।

অধিরথ দাদু বলেছিলেন, আপনার কী হয়েছে। দাঁড়িয়ে থাকলেন' !

আমার কী হয়েছে বোঝাই কী করে' ! আমার লজ্জা করে বলার পরও যদি তিনি জোর খাটান আমি যাই কোথায় !

অবশ্য আমি জানি এই নিয়ম।

এর আগের বার কুট্টি মামার ওপর ভার পড়েছিল। কুট্টি মামা সহজেই থানের আশীর্বাদী ফুল বেলপাতা নিয়ে উলঙ্গ অবস্থায় হাজির হয়েছিলেন। আমার পালার সময়, পারছি না। কুট্টি মামা পারলেন, আমি পারছি না। কিংবা সেবারে কুট্টি মামাকে না পাঠিয়ে আমাকে কেন পাঠানো হল আশীর্বাদী ফুল বেলপাতা আনতে বুঝে উঠতে পারছিলাম না।

অধিরথ দাদু আমার গোঁ দেখে বিপাকে পড়ে গেছিলেন। ওদিকে মাতামহ অপেক্ষা করছেন জানি।

অধিরথ দাদুর ওপর বিরক্ত হতে পারেন। সেই ভয়েই হয়তো বলেছিলেন, দাঁড়িয়ে থাকবেন না ঠাকুর। দেরি হয়ে যাচ্ছে। কর্তার মাথা গরম হলে কী হয় জানেন। তিনি কাউকে আস্ত রাখেন না। অধিরথ দাদু আলগা দাঁড়িয়ে আছেন। পাঁঠাবলির সময় তাকে নিষ্ঠুর মনে হয়। রক্তচক্ষু হয়ে যায়। আমার ওপর বোধ হয় সে-ভাবে হম্বি-তম্বি করারও অধিকার নেই। তবে টের পাচ্ছিলাম, চোখ নিষ্ঠুর প্রকৃতির হয়ে উঠছে। হাতে রামদা থাকলে এই গভীর বনজঙ্গলে দেবীর নামে উৎসর্গ করে দিতে পারেন। আতঙ্কে আমি কেঁদে ফেলেছিলাম। অভিযোগ, আমাকে কেন' ! কুট্টি মামা এল না কেন।

কুট্টি মামা বড়ো হয়ে গেছে না' !

বড়ো হয়ে গেছে তো কী হয়েছে' !

উপনয়ন হয়ে গেছে ঠাকুরের। তিনি পারবেন কেন' !

ইস কুট্টি মাসির সামনে পড়লেও রক্ষা থাকবে না। মাতামহের অনুপস্থিতিতে আমাকে বিড়াল কুকুরের মতো তাড়া করবেন। কী কারণে একবার প্যান্ট ছাড়ার সময় উলঙ্গ হয়েছিলাম—কুট্টি মাসির সে কী ক্ষোভ।—কুকুর' ! কুকুর কোথাকার। আমি তাড়াতাড়ি প্যান্ট পরে ফেললে মাসি আমাকে জড়িয়ে ধরে আদর করেছিলেন।

চুমু খেয়েছিলেন কপালে। তারপর আমাকে নিয়ে দৌড়ে নদীর পাড়ে এসে সাঁকো পারপারের খেলা শুরু করে দিয়েছিলেন।

শিশুটিকে নির্জন ঝোপ জঙ্গলে পুঁতে দেবার আগে এই আশীর্বাদী ফুল বেলপাতা দরকার।

দরকার নতুন হাঁড়ি পাতিলের।

দরকার পঞ্চ শস্যের।

মন্ত্রপূত জবাফুল দেওয়া হয় হাঁড়িতে।

অপদেবতার ছড়াছড়ি। পর পর শিশুমৃত্যু। পেঁচোয় পাওয়া যাবে বলে। প্রাথমিক কর্তব্য শিশুটিকে বাড়ি থেকে নিয়ে যাওয়া। যতক্ষণ থাকবে মাতামহী পাগলের মতো প্রলাপ বকবে। এবং তার চিল কান্না গগনভেদী তীর্যক বজ্রপাতের মতো। সারা বাড়িতে অস্বাভাবিক আচরণ চলছে। কুট্টি মাসির এ-সময় ফিটের ব্যামো দেখা দেয়। গর্ভসঞ্চারের পর থেকেই কুট্টি মাসি কেন খেপে যায়, আর ক্রমে এই খেপে যাওয়া অস্থিরতায় ডুবে গেলে, কুট্টি মাসির দাঁত লেগে যায়। হাত পা ঠান্ডা হয়ে আসে।

বাড়ি থেকে মৃত শিশুটি নিষ্ক্রান্ত হলে সবাই চুপ মেরে যায়। গৃহে কেউ বসবাস করে মনে হয় না। কুট্টি মাসি কেমন আছে কে জানে' ! সুন্দর সরল চোখ এই মৃত্যু পর্বে হিংস্র হয়ে ওঠে। হাতের কাছে যা পায় ছুঁড়ে ফেলে। বাড়িতে ভাঙচুরের পর্বটিও শুরু হয়। মাতামহ জানেন, শিশুটিকে মাটি না দেওয়া পর্যন্ত বাড়ির অস্বস্তি কাটবে না। সে-জন্যও অধিরথ দাদু অপেক্ষা করতে পারছিলেন না। আমাকে একা ফেলে কবর দিতে যেতে পারছেন না। গিয়ে বলতে পারছেন না, ঠাকুরের পোঁ, ন্যাংটা হয়ে বাড়ি ফিরবে না।

তারপরই রুদ্রমূর্তি।

ঠাকুর ভাবছটা কী' ! হাঁটো। না হাঁটলে ঠাং ভেঙে দেব।

বুঝতে পারি ক্রোধ সীমাহীন। আর উপেক্ষা করা ঠিক হবে না। কড়া ভাষা ব্যবহারের রীতি শুরু হয়ে গেছে। আপনি থেকে তুমিতে নেমে এসেছে। ভয় প্রদর্শন করছে। জানো ইচ্ছে করলে তোমাকে পাঁজা কোলে করে নিয়ে যেতে পারি' ! জানো ইচ্ছে করলে তোমাকে নদীর জলে চুবিয়ে মারতে পারি। এক কোপে দু-খান করে দিতে পারি। আমি পারি না হেন কাজ নেই। হাঁটো' !

অগত্যা আর কী করা' ! আমার কান্না পাচ্ছিল। ফুঁপিয়ে কাঁদছিলাম জঙ্গলের ভিতর দিয়ে হাঁটছি। এক হাতে ফুল বেলপাতা, অন্য হাতে চোখের জল মুছছি। লজ্জায় কান্না পায় সেই প্রথম টের পেয়েছিলাম। তারপর মনে হয়েছিল যেন, ঠিক লজ্জা না, আমাকে উলঙ্গ

থাকতে বাধ্য করা হচ্ছে। ক্ষোভ হতেই পারে। ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ কে সহ্য করে' ! ক্ষোভবশত কান্নার উদ্রেক। জামা-প্যান্ট পরে গেলে অশুচি ভাববেন মাতামহ। অশুচি অবস্থায় থান থেকে ফুল বেলপাতা সংগ্রহ করা বিধর্মীর লক্ষণ। অধিরথ দাদুর ওপর ক্রোধে আচ্ছন্ন হলে তাঁরও রক্ষা থাকবে না। অধিরথ দাদু আমার পেছনে।

কারণ কে জানে কখন কোন ঝোপ জঙ্গলে লুকিয়ে পড়ব। ডেকে সাড়া পাওয়া যাবে না। বাড়িতে হুলুস্থূল কাণ্ড। যতক্ষণ না শিশুটির সদগতি হচ্ছে, বাড়িটা নরক হয়ে থাকবে।

ছোটাছুটি। জল জল। হাওয়া কর। তামার পয়সা আন। দাঁত লেগে গেছে কুসুমের। লবঙ্গ পোড়াও। চোখে জলের ঝাপটা দাও। যতক্ষণ না ফুল বেলপাতা নিয়ে যাব, কুট্টি মাসি বিসর্জনের প্রতিমা হয়ে মেঝেতে পড়ে থাকবেন।

বোধহয় সেই কষ্টদায়ক অনুভূতিও আমাকে সেবারে তাড়া করে থাকতে পারে। আমি বেশ পা চালিয়ে বাড়ির কাছে হেঁটে এসেছিলাম। তারপর দৌড়ে বাড়ি ঢুকে পলকে হাঁড়ির ভিতর ফুল বেলপাতা রেখে ঘরের ভিতর অদৃশ্য। জামা-প্যান্ট পরে নিষ্ক্রান্ত হলে, মাতামহ বলেছিলেন, অনুসরণ করো।

মা কোত্থেকে ছুটে এসে পাগলের মতো ডাকতে থাকলেন, দিবানাথ, বাবা দিবানাথ একটু দাঁড়া বাবা।

আমি দাঁড়ালে কোমরের ঘুনসিতে হাত দিয়ে কী যেন খুঁজলেন। তারপর নিশ্চিন্ত হয়ে বললেন, যাও।

এতটা নিশ্চিন্ত হবার কারণ, আমি আবার কোনো অশুভ আত্মার প্রভাবে না পড়ে যাই। অশুভ আত্মার প্রকোপ বাড়িটার চারপাশে ঘোরাঘুরি করছে—বিশেষ করে সেই নির্জন নদীতীরের পরিত্যক্ত ছাড়াবাড়িতে শিশুদের সদগতির আশ্রয়টি যে মোটেই নিরাপদ নয়, মা বিশ্বাস করতেন। আমার ঘুনসিতে তিনি কী খুঁজছিলেন। তাও জানি। জালের কাঠি ঘুনসিতে বাঁধা থাকলে অশুভ আত্মার নজর লাগে না এমন বিশ্বাস তাঁর প্রবল। আমার ঘুনসিতে একটা জালের কাঠি, ফুটো তামার পয়সা আর রুদ্রাক্ষ গাঁথা আছে। ঘুনসি ছিড়ে গেলে এটা ওটা হারায়। মা আবার যত্নের সঙ্গে ঘুনসিতে তা জড়িয়ে দেন। আমার অনুসরণের পালার সময় মা-র হয়তো মনে হতে পারে প্যান্টের সঙ্গে ঘুনসিটাও খুলে গেছে। আপদের তো শেষ নেই।

বাড়ি থেকে নিষ্ক্রান্ত হলেই বনজঙ্গল। সরু রাস্তা হাটে যাবার। হাট পার হয়ে ক্রোশ খানেক গেলে শ্মশান এবং নদীর চড়া। চড়াটা বর্ষায় ডুবে গেলে পাশের ছাড়াবাড়ি সম্বল। হেমন্তের সময় ছিল। সেটা। গাছপালার ভিতর দিয়ে সবার আগে মাতামহ, পেছনে আমরা। একেবারে শেষে অধিরথ দাদু। চড়ার মাটি তুলে হাড়িটা বসিয়ে দেওয়া হল।

কাঁথা কাপড়ের মধ্যে মাতামহের পক্ষকালের জাতক। গত তিন চারদিনই বাড়ির কারও ঘুম ছিল না। শিশুটির মধ্যে ভূতুড়ে কান্নার লক্ষণ প্রকাশ পেতেই ওঝা গুনিন সব ছুটে এসেছে। কিম্ভুতকিমাকার পোশাক। নখ, বড়ো বড়ো দাঁত বের হয়ে আছে। ঝোলায় ঝাঁটা থেকে কুরুণ্ডি গাছের মূল। হোমিওপ্যাথ ডক্তারও ঘুরে গেছেন সাইকেলে—যেখানে যত ওঝা বদ্যি আছে সবার কাছে খবর চলে গেছিল। দিঘির পাড় ধরে উঠে আসছিল।

কে আসে?

গুনধর ওঝা আসে।

কে আসে?

নিকু' গুনিন আসে।

খবর যায় অন্দরমহলে। আমরা সন্ত্রস্ত দিনরাত। কুট্টি মাসির নাওয়া খাওয়া বন্ধ। অরাজক অবস্থা।

জাতকের খিঁচুনি ধরে গেছে। হাত পা ছুঁড়ছে। দাপাচ্ছে। বুকের দুধ মুখে দিচ্ছে না। দিন রাত মা পায়ের ওপর রেখে, কখনো বুকে রসুন তেল মেখে দিচ্ছে। হাত মুঠো করে পৃথিবী বিদীর্ণ চিৎকারে যখন সারা বাড়ি তটস্থ মাতামহ তখনও নির্বিকার। তার পূজা আর্চা হোমের কোনো খামতি নেই। মন্দিরে আরতি হচ্ছে—পঞ্চপ্রদীপ জ্বলছে। ধূপদীপের গন্ধ এবং জোড়া পাঁঠাবলি। মৃত্যু শেষ কথা নয়। ডুব মাত্র অশৌচ। নদীর ঘাটে ডুব দিয়ে ফিরে এলে, বাড়িটা আবার ক্রমে স্বাভাবিক হয়ে উঠত। মাতামহীর শোক থাকত সপ্তাহকাল। তারপর তিনি ধীরে ধীরে উঠে বসতেন, খেতেন। খোঁজখবর নিতেন সবার। তারপর দেখতাম পায়ে আলতা পরে পাট ভাঙা শাড়ি পরে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল আচড়াচ্ছেন। মুখে পাউডার মাখছেন। সুঘ্রাণ উঠছে শরীরে।

চুল উঠে যাচ্ছে গোছা গোছা।

মাতামহীর মুখে চোখে উদ্বেগ।

ডাকতেন, চাঁপা, চাঁপা' !

মা কাছে গেলে চিরুনি থেকে চুল গোছ করে তুলে আনতেন। দলা পাকাতেন। তারপর মাকে দেখাতেন।

আমার সব চুল উঠে যাচ্ছে' !

মা বলত, কত চুল তোমার মা' !

চুল আর আছে' ! সব যে উঠে গেল' ! কী হবে' !

মাতামহী চুলের গোলাটায় থুতু ছিটিয়ে জানালার বাইরে নিক্ষেপ করার সময় মাতামহর খোঁজ নিতেন।

আমি ঠিক বুঝতাম না, কেন এই খোঁজ।

তারপরই বৈঠকখানা দেখতাম খালি হয়ে যেত রাত দশটা না বাজতেই। বৈঠকখানার পালঙ্কে বিছানা হত না। মাতামহ অন্দরে শোবেন ঠিক হয়ে যেত।

কুট্টি মাসি দরজায় দাঁড়িয়ে বলত, দিদিকে ডাকল কেন রে' !

দিমিমার চুল উঠে যাচ্ছে।

বাবা কোথায়?

জানি না তো' !

রাত দশটায় কুট্টি মাসি আমাকে দাদুর বৈঠকখানা দেখে আসতে বলতেন।

আমি দৌড়ে অন্দরের উঠোন পার হয়ে দরদালানের বাইরে চলে আসতাম। একটা হ্যাজাক জ্বালিয়ে রাখা হয় বারান্দায়। বৈঠকখানায় মাতামহের শুতে শুতে রাত বারোটা—সেদিন দেখি, বৈঠকখানার দরজা জানালা দশটা বাজতেই বন্ধ হয়ে গেছে। কেমন নিঝুম পরিবেশ। ছাদের মাথায় জাম গাছের একটা বড়ো ডাল জ্যোৎস্নায় শুধু জেগে আছে। ভয়ে গা সিরসির করে উঠলে দৌড়ে পালাতাম। আর আশ্চর্য কুট্টি মাসিকে খবরটা দিতেই বলত, যা তোর মার সঙ্গে গিয়ে শুয়ে থাক। বলে মুখের উপর দরজা বন্ধ করে দিত। কেন যে আমার দিকে তাকাতেই তখন চোখে জ্বালা ফুটে উঠত জানি না।

মাকে গিয়ে বলতাম, মা কুট্টি মাসি দরজা বন্ধ করে দিয়েছে। আমি কোথায় শোব?

আসলে মামাবাড়িতে গেলে আমরা কোথায় কে শোব ঠিক করে দিতেন মা। কুট্টি মাসির আবদার রক্ষার্থেই আমি, আন্না মাসি, কুট্টি মাসি এক পালঙ্কে শুতাম। এতে কুট্টি মাসির মধ্যে বেশ স্বাভাবিক স্বভাব ফুটে উঠত। আমরা বিকালে কোনোদিন এককা দোককা খেলতাম। কিংবা পাশান্তি। অধিরথ দাদুর পঙ্গপালও আমাদের সঙ্গে তখন জুটে যেত। কখনো গভীর জঙ্গলে ঢুকে গেছি। কুট্টি মাসি ঝোপ জঙ্গলের নড়ানড়ি দেখে টের পেত কে কোথায় আছে। সেই কুট্টি মাসির অস্বাভাবিক আচরণ দেখে ক্ষোভ হত—বলতাম, আর কোনোদিন শোব না। দরজা বন্ধ করে দিলে কেন' ! কুট্টি মাসি আমার দিকে অপলক তাকিয়ে বলত, সোনা আমার। রাগ হয়েছে। রাগ কার ওপর এত। তোরা তো কুকুর বেড়ালের অধম।

আমি এসে মাকে নালিশ দিতাম।

মা বলতেন, বলুক গে' ! ওর কি মাথার ঠিক আছে। ওর কথা ধরিস না।

সেবারে কেন যে মাকে সহসা প্রশ্ন করেছিলাম, জানো মা দাদুর বৈঠকখানায় কেউ নেই। দাদু কোথা। দরজা জানালা বন্ধ।

অন্দরে।

অন্দরে কোথায় মা?

তিনি এতে অস্বস্তি বোধ করতেন। বলতেন, রাত হয়েছে শুয়ে পড়। বকবকানি আর ভালো লাগছে না।

আমিও নাছোড়বান্দা দাদুর শোওয়া বসার বিষয়টিতে যেন কোনো পারিবারিক মর্যাদা জড়িত থাকত। দাদুর কাজকামে আমার অশেষ কৌতূহল। সেই দাদুর অন্তর্ধান আমার কাছে বিস্ময় ছিল। মাতামহীর মহলে মাতামহকে আমি খুব কমই দেখেছি। কিংবা কোনো কারণে মাতামহীর পরামর্শ দরকার হলেও তিনি বাইরে দাঁড়িয়ে গলা খাকারি দিতেন। ঘরে ঢুকতেন না। সেই মাতামহ বৈঠকখানায় নেই, বৈঠকখানায় থাকলে জানালা খোলা থাকত। একটা সেজবাতি জ্বলত। না কিছু ছিল না।

বলতাম, জানো মা বৈঠকখানার সব দরজা জানালা বন্ধ। সেজবাতি জ্বলছে না। বারান্দায় অধিরথ দাদু শোয়, সেও নেই।

মা না পেরে বলত, তোমার দাদুর শরীর খারাপ। ভিতর বাড়িতে তিনি শুতে গেছেন। ভিতর বাড়িতে' ! কোথায়।

ইস তুই এত জ্বালাস। তুই কী রে। দাদুর বয়স হয়েছে না। শরীর খারাপ হতে পারে না। একা মানুসটা বৈঠকখানায় পড়ে থাকবে' ! দেখে কে' ! তুই ঘুমাবি, না বকবক করবি।

বুঝতাম, মা মাতামহর প্রসঙ্গ নিয়ে একদম কথা বলতে চান না আর। চুপ মেরে পাশ ফিরে শুয়ে পড়তাম। কুট্টি মাসির পাশে শুলে হুটোপাটির শেষ থাকত না। এ ওর চাদর টেনে, বালিশ টেনে কাড়াকাড়ি শুরু হত। জানালার দিকে কেউ ভয়ে শুতে চাইত না। কারণ জানালা দিয়ে গাছপালার ফাঁকে দূরের হাটবাজার দেখা যায়, আর ক্রোশ খানেক গেলে শ্মশান দক্ষিণের বাতাসে মরা পোড়ার গন্ধ পর্যন্ত কখনো ভেসে আসত। রাত হলেই ঝোপ জঙ্গলে জোনাকি জ্বলত, শেয়াল ডাকত বড়ো জঙ্গলে, শ্মশান থেকে যে সব মৃত আত্মারা ভেসে আসত তারা সহজেই জানালা গলিয়ে হাত বাড়াতে পারে। এমন আতঙ্কে আমরা সবাই কাবু। কুট্টি মাসি জানালার পাশে শুত—যেন তার ভয়ডর কম। কিন্তু সকালে ঘুম ভাঙলে দেখতাম, জানালার পাশে আমি। খেপে যেতাম। ঠিক ঘুমের ঘোরে কুট্টি মাসি আন্না মাসি আমাকে চ্যাংদোলা করে জানালার পাশে এন ফেলে রেখেছে' ! খেপে গেলে

কুট্টি মাসি বলত, তোর যা শোওয়া, কখন কাকে লাথি মারিস ঘুমের ঘোরে। কখন কাকে টপকে যাস ঘুমের ঘোরে—আর যত দোষ আমার' !

বিশ্বাসও করতে পারতাম না, আবার অবিশ্বাসও করতে পারতাম না। আমার শোওয়া ভালো না, মা বলতেন। খাটের এক পাশে শুলে শেষ রাতে আর এক পাশে গিয়ে পড়ে থাকি। মশারির ফাঁকে ঠ্যাং ঝুলে থাকে। মা নাকি ঠ্যাং তুলে দেয়। ঘুমের ঘোরে লাথি ছুঁড়ে মারি, কত যে অভিযোগ' !

অথচ পরদিন সকালে ঘরে শুয়েই শুনতে পাই মাতামহ ভরাট গলায় স্তোত্র পাঠ করছেন। তাঁর ক' উদাত্ত। ভোর রাতের দিকে শুকতারাটি জ্বলজ্বল করছে। খড়মের খটাস খটাস শব্দ উঠছে। স্তোত্রপাঠ, নীল আকাশের শুকতারা, এবং গাছপালা পাখির ওড়াউড়ি মিলে বাড়িটায় অন্য একটি গ্রহ তৈরি হত।

কে বলবে মাস খানেকও হয়নি, এ-বাড়িতে একটি শিশুমৃত্যু হয়েছে। তার কথা কেউ আর মুখে উচ্চারণই করে না। অথচ বীভৎস দৃশটি ভাবলে গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। হাঁড়ির মুখে ঢুকছে না। মাতামহ মট মট করে শিশুটির হাত পা ভেঙে দিতেন। ঘার মটকে দিতেন। তারপর ভিতরে ঢুকিয়ে মালসায় ঢেকে হাঁড়িটি গর্তে রাখতেন। মাটি চাপা দিতেন। তাঁর বোধ হয় অভ্যাস হয়ে গেছিল। বিষয়টি তাঁর কাছে মন্দিরে জোড়া পাঁঠা বলি দেবার চেয়ে বোধ হয় বেশি গুরুত্ব পেত না। নদীর ঘাটে এসে স্নান পর্ব সারা হত। বটুক ভৈরবের স্তোত্র পাঠ হত। আমরা ফিরতাম। মনে হত সেই শিশুটি হাঁড়ির ভিতর ঘুমিয়ে আছে। কিংবা তার দু-বাহু খুঁজছে হাঁড়ির ঢাকনা খুলে আবার পৃথিবীর গাছপালার ভিতর শ্বাসপ্রশ্বাস নেওয়া যায় কিন না।

সব চেয়ে আতঙ্কে পড়ে যেতাম কুট্টিমাসির ডাকে।

আমায় ডাকতেন, দিবানাথ, দিবানাথ।

আমি সাড়া দিলে বলতেন, এদিকে শোন।

ঘরে গেলে বলতেন, বাবা কোথায় জানিস?

মাতামহ বিকালে সেদিন বাড়ি ছিলেন না। কার্য উপলক্ষে দু-ক্রোশ দূরে দুপতারার হাইস্কুলে গেছেন। স্কুলের নির্বাচন। তিনি একজন প্রার্থী। তিনি বলতে গেলে অঞ্চলের সব। ইউনিয়ন বোর্ডের সভাপতি। বাড়িতে বৈঠকখানার পাশে একটি অস্থায়ী টিনের ঘরে নীল বাক্স। ডাকঘরটির মাথায় জালালি কবুতর। সামনে বড়ো বড়ো অর্জুন গাছ—এবং মানুষজনের চলাচল। কর্মব্যস্ত মানুষটির সঙ্গে দু-জন সঙ্গী থাকত সব সময়। তারা যখন নেই, তিনিও বাড়ি নেই। খবরটা মাসিকে দিতেই বলেছিল, চল। দেখে আসি।

কী দেখে আসবে!

মাসির তখন কী তাড়া' ! প্রায় গোপনে জঙ্গলের রাস্তা ধরে ছুটে যেতেন। তার চুল উড়ত। শাড়ির আঁচিল উড়ত। কারণ সাঁঝ লাগার আগে ফিরতে হবে। আশ্চর্য মাসির সঙ্গে গেলে আমরা আর সেই শিশুটিকে খুঁজে পেতাম না। গর্ত খালি। হাঁড়ি ভাঙা। মালসা দূরে পড়ে আছে। শিশুটির কোনো চিহ্ন নেই। দেখতে পেতাম সামান্য দুরে দুটো কুকুর হিজ মাস্টারস ভয়েস হয়ে বসে আছে। ঠোঁট চাটছে।

গেল কোথায়?

মাসি বলত, দেবদূত হয়ে উড়ে গেছে। আমার বিশ্বাস করতে ভালো লাগত। কুকুর দুটির পাশ দিয়ে হেঁটে আসতাম। মাসি তাকিয়েও দেখত না। মাসির চোখে জল চিক চিক করত।

এবারে আমরা আবার যাচ্ছি।

সেই গর্ভধারিণীর গর্ভধারণের খবর।

শতকাল। ডুলিতে মা, আমি আর বাহার চাচা পেছনে। খাল পাড় হয়ে যতদূর চোখ যায় শুধু আখের জমি। সড়ক ধরে কিছুটা গেলেই আখের জমিতে হারিয়ে যেতে হয়। রাস্তার জ্ঞানগম্যি না থাকলে, সারাদিন আখের জমিতে ঘুরেও বাড়ি ফেরার পথ খুঁজে পাওয়া যায় না। তবে বড়ো হয়ে যাওয়ায় এবং সঙ্গে বাহার চাচা থাকায় ভয়ডর কম। একই দৃশ্য দেখতে হবে জানি। আমার উপনয়ন হয়ে গেছে। এবারে আর মন্দিরের থান থেকে ফুল বেলপাতা নিয়ে আসার ভার আমার ওপর পড়বে না। কুট্টি মাসিকে দেখার আগ্রহ এবং সাঁকো পারাপারের খেলা আমাকে অধীর করে তুলছিল।

সাঁঝ লেগে গেছিল। কারণ বেহারা চারজন আখের জমিতে পড়ে দিক নির্ণয় করতে পারছিল না। মাঝে মাঝে হাঁকছিল, কই হ' ! আখের জমির ভিতর চারজন বেহারা আর ডুলিতে আমার মা। মাঠের বিশাল নিমগাছটার নীচে অপেক্ষা করার কথা। আমরা গেলে যাত্রা করার কথা। কিন্তু গিয়ে অবাক, কেউ নেই। ফাঁকা মাঠে একটা গাছ। কিছু বক এবং হরিয়াল পাখি বসে আছে। ভয়ে আমার মুখ চুন হয়ে গেছিল। বাহার চাচা বললেন, তাজ্জব বাত। কিছু করারও নেই। কারণ চারপাশে শুধু আখের জমি দিগন্ত প্রসারিত। সবুজ এবং কখনো ঘন ঘোর কৃষ্ণবর্ণ হয়ে আছে মাঠ। বাহার চাচা নিমগাছের মগডালে উঠে গেলেন। দূরে কী দেখতে পেয়ে কিংবা ত্রস্ত গলা শুনতে পেয়ে হেঁকে উঠলেন—হই! হই শব্দটা টেনে এত লম্বা করে বলেছিলেন যে মনে হয়েছিল দূরে আখের খেতে ঝড় উঠে গেছে। খস খস শব্দ। মট মট শব্দ। আখ গাছ ভেঙে কেটে হু হুমনা করে এগিয়ে আসছে কারা।

আসলে দূর থেকে নিমগাছের মাথা দেখা যেতেই পারে কিংবা বাহার চাচার সেই স্ফীত গলায় চিৎকার তাদের কর্ণগোচর হতে পারে। ফাঁকা মাঠে শব্দের সমারোহ প্রবল হয়—

দূরের শব্দভেদী বাণ শ্রুতিগোচর হতেই তারা দিক নির্ণয় করে থাকতে পারে। এগিয়ে এলে দূরে আখ জমির উপরে নিমগাছটি দৃষ্টিগোচর হতে পারে—সে যে কারণেই হোক দু-মানুষ লম্বা আখের জমি থেকে ডুলি নিয়ে নিষ্ক্রান্ত হতে পারায় গলদঘর্ম বাহার চাচা স্বস্তি বোধ করেছিলেন। আমার শুকনো মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। আমরা আবার যাত্রা করি।

বেশ রাত হয়ে গেছে। দিঘির পাড়ে হ্যাজাক নিয়ে প্রতীক্ষায় অধিরথ দাদু। দুর্ভাবনা তাদেরও ছিল—রাস্তায় কোনো দৈব দুর্বিপাকের শিকারের ভয় তো আছেই। আর এই সব দুশ্চিন্তার মধ্যে মা ডুলি থেকে নেমেই মাতামহীর ঘরে ছুটেছিলেন।

মাতামহী পা ছড়িয়ে বসে আছেন। আমি প্রণাম করতে গেলে রে রে করে উঠলেন তিনি। এ-সময় প্রণাম নিতে নেই। কুট্টি মাসিকে দেখতে পাচ্ছি না। দেখতে পাওয়ার কথাও নয়। এ-সময় তিনি ঘরের বারই হন না। মা আসায় সবদিক সামলাতে পারবে—মাতামহী কিছুটা নিশ্চিন্ত। কে দেখে!

আমি কুট্টি মাসির মহলে যেতেই দেখলাম বেশ বড়ো হয়ে গেছে। আমাকে দেখে এগিয়ে এল না। প্রণাম করতে গেলে বলল থাক হয়েছে। শোন, তুই এসেছিস ভালো হয়েছে। আমি তো ভাবলাম, তুই এবারে আসবি না। কী যে ভালো লাগছে। তোর তো উপনয়ন হয়ে গেছে।

উপনয়ন হয়ে গেলে কি মানুষের দ্বিতীয় জন্ম শুরু হয়। জানি না' ! তবে খাওয়া-দাওয়ার পর, দেখি আমার শোওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে ছোটন দাদুর ঘরে। পালঙ্কটা ছোটো। দু-জন শুতে পারে। তবু আপাতত রাতের মতো এই ব্যবস্থাই থাকল। ....শীতকাল, জড়াজড়ি করে শুয়ে থাকলে ওম বেশি। রাতটা সে-ভাবেই কাটল। এখন কটা দিন আবার বাড়িতে আগের পরিস্থিতি। এবারে মাতামহীর মাঝে মাঝে ফিট হচ্ছে। দিন যত এগিয়ে আসতে থাকল, মাতামহীকে নিয়ে টানাপোড়েন বাড়ছে। এক দিন মা কিঞ্চিৎ রুষ্ট গলায় চেঁচামেচি করতেই ছুটে গেছিলাম। আড়ালে দাঁড়িয়ে যা শুনলাম স্তম্ভিত।

মানুষটার কী দোষ বল। রাগ করিস কেন বুঝি না।

তাই বলে....মা কেমন কাঁপা কাঁপা গলায় কথা বলছিল।

মা আবার বলছিল, আমি জানতাম।

মাতামহী বলছিল, আমি তো চেষ্টা করছি সামলাবার।

মার গলা—বাবার চিঠি পেলে অস্থির হয়ে পড়তাম। শেষমেশ কী যে কপালে লেখা আছে। আর বলি নবীন ভট্টাচার্যের আক্কেল নেই। ঘোরাঘুরি করছে!

তোর বাবার খুব পছন্দ।

মরণ!

মার এই মরণ কথাটি যে ঘৃণা বিদ্বেষ থেকে প্রসূত টের পেতে কষ্ট হল না।

মরণ বলছিস কেন! তার শরীর বলে কথা। তাকে দোষ দিচ্ছিস কেন। আর ঠিক এ-সময়ে বনজঙ্গল পার হয়ে ঢাকের বাদ্য শুরু হয়ে গেল। সেখানে দেবীর আরতি হচ্ছে। ধূপ দীপ জ্বলছে। মাতামহ গদগদচিত্তে মাতৃ আরাধনায় মত্ত। আর কিছু শুনতে পেলাম না।

সব আমার কাছে স্পষ্ট না হলেও ঘোর বিপত্তি দেখা দিয়েছে পরিবারে বুঝতে পারি। এই আশঙ্কা হয়তো মা আরও আগেই টের পেয়েছিলেন। গুরু বংশের দোষ। চিঠি পেলেই সব আশঙ্কা প্রবল হত। মাতামহী আর পারছেন না তবু চেষ্টা যদি ধরে রাখা যায়।

আর তখনই দেখি আমার ঘাড়ে কার নিশ্বাস পড়ছে। অন্ধকারে কে? মুখ ঘুরিয়ে ছায়া মতো যাকে দেখলাম—তিনি কুট্টি মাসি। অন্ধকারেও চোখ জ্বলছে টের পেলাম।

আমি বললাম, তুমি!

এই প্রথম আমার হাত টেনে মাসি নিয়ে যাচ্ছে। ঘরে ঢুকিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল। তারপর হতাশ গলায় বলল, কী বুঝলি!

আমি তো স্পষ্ট কিছু জানি না। জানি না বললে ভুল হবে যেন সবই বুঝি। তবু কেন যে বললাম, বুঝতে পারছি না।

তুই একটা ম্যাড়া।

আর কী বলি! ঘর থেকে প্রায় ধা ক্কা দিয়ে বের করে দিল।

তারপর ক-দিন আমরা সেই লুকোচুরি খেলায় মত্ত হয়ে গেলাম। বিকালে সাঁকো পারাপারের খেলা। এবারের খেলা জমে উঠল এই কারণে, সবাই আমরা বাঁশ না ধরেই নদী পারাপার করতে পারছি। মাসি একটু দ্রুত পারে। প্রায় দৌড়ে পার হয়ে যায়। তার আঁচল বাতাসে ওড়ে বলে কোনো ব্যালেন্স খুঁজে পায় আঁচল ওড়ার মধ্যে। আমাদের তা নেই—এখনও সতর্ক পা ফেলে পার হতে হয়। আঁচল উড়লে, খসে পড়লে মাসির স্তন দেখে কখনো মুগ্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকি। মাসি আঁচল সামলে নেমে আসে সাঁকো থেকে। আমার দিকে তাকিয়ে কটাক্ষ হানে।

সেদিন আমরা বাড়ি ফিরছি। প্রচণ্ড ঠান্ডা। শীতে নদীতে স্নান করে হি হি করে কাঁপছি। ক-দিন ধরে সূতিকা গৃহটি পবিত্র করার কাজে মাতামহ খুব ব্যস্ত ছিলেন। ঘরটি স্থায়ী। মা বলতেন, আমিও নাকি এই ঘরটিতেই ভূমিষ্ঠ হয়েছি। মাসিরাও গর্ভসঞ্চার হলে এই গৃহে প্রবেশ করতেন। কুট্টি মাসির বিয়ে হলে সেও আসবে সন্তান ভূমিষ্ঠের কারণে। এ-সব

ভাবলে গা সিরসির করত আমার। মাতামহ সূতিকা গৃহটি নতুন করে তৈরি করেছেন। এবার চণ্ডীপাঠ হয়েছে। হোম-যজ্ঞ, দ্বাদশ ব্রাহ্মণ ভোজন সব করা হয়েছে। বেড়ার গাত্রে বেতপাতা, এবং মটকিলার ডাল গুঁজে দেওয়া হয়েছে। বড়ো বড়ো শুকনো কাঠের গুঁড়ি এনে ফেলে রেখেছিলেন। তবু রেহাই নেই। শীতে আন্ধকার নদীতে অবগাহন সেরে ফিরছি। অধিরথ দাদু আগে। হাতে হ্যাজাক। আমার কাঁধে কোদাল। এবার গর্তটি করার ভার মাতামহ আমার ওপর ছেড়ে দিয়েছিলেন। একটু বেশি পরিমাণে গর্ত খুঁড়লে তিনি রুষ্ট কণ্ঠে বললেন, কতদূর যাবে! কতদূর যেতে চাও? আমি এর সঠিক অর্থ ধরতে পারিনি বলে কোদাল চালাচ্ছিলাম। এক ভূতুড়ে ঘোর আমার মধ্যে প্রবেশ করছে। যেন প্রোথিত করার মধ্যে কোনো ফাঁক না থাকে। তারপর সব নামিয়ে দেওয়ার পর কাঁটা গাছ দিলাম কিছু ওপরে। মাতামহ দাঁড়িয়েই আছেন। আর কিছু বলছেন না। কেবল ফেরার পথে বললেন, প্রকৃতিই হেতু। তুমি বড়ো বেশি ভিতু স্বভাবের।

ভিতু স্বভাবের এটা টের পেলাম রাস্তায় ফেরার সময়। মনে হচ্ছিল শিশুটি আমার পায়ে পায়ে হেঁটে আসছে। যেন আমার হাত ধরে হাঁটতে চাইছে। মাঝে মাঝে এমন ঘোর সৃষ্টি হচ্ছিল যে অন্ধকারে কাকে খুঁজছিলাম। কাঁপছি, দাঁত ঠকঠক করছে শীতে না আতঙ্কে বুঝতে পারছিলাম না।

বাড়ি ফিরে আগুনে হাত স্যাকার পর ঘরে ঢুকতেই দেখি মাতামহীর মাথা কোলে নিয়ে মা মেঝেতে বসে আছেন। মাতামহীর চোখ দিয়ে দর দর করে জল পড়ছে। কুট্টি মাসি ছুটে বের হয়ে একটা গরম চাদরে আমার শরীর ঢেকে দিল। তারপর বলল, চল খাবি।

আমার খেতে ইচ্ছে করছিল না। বমি পাচ্ছিল।

কুট্টি মাসি মাকে বলল, দিদি ও তো একা শুতে ভয় পাবে। অধিরথ কাকু শোবে ছোটন কাকুর ঘরে। আমি ওকে নিয়ে যাচ্ছি।

মাসি আমাকে লেপে জড়িয়ে নিলেন। তারপর গভীর রাতে টের পেলাম, মাসি সম্পূর্ণ উলঙ্গ। আমার হাত নিয়ে স্তনে এবং নাভিমূলে নরম উলের গভীর উষ্ণতায় ডুবে গেলেন। শেষে যেন পাগলের মতো আমাকে আঁচড়ে কামড়ে শেষ করে দিচ্ছিলেন। আমি সাড়া দিতে পারছিলাম না। ভয় আতঙ্ক এবং জন্মমৃত্যু রহস্য আমাকে এত আচ্ছন্ন করে রেখেছিল, সকালে উঠে বিষয়টি স্বপ্নবৎ ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারিনি।

সেবারেই মাসি আরোগ্য লাভ করলেন এবং তাঁর বিবাহ পাকা হয়ে গেল।

কাল-ভুজঙ্গ

নিশি ফিসফিস করে ডাকল, 'সোনামণি, অ সোনামণি।'

সোনামণি কোনো উত্তর করল না। মানুষটা বারান্দায় বসে সোনামণিকে ডাকছে। সোনামণি উঠনে কচু সেদ্ধ করছে। দু'মেয়ে সোনামণির। অঙ্গি বঙ্গি দুই ছানাপোনা উনুনের ধারে কচু সেদ্ধ হবার আশায় বসে রয়েছে। উদোম গায়ে বসে আছে। আর অভাব সোনামণির নিত্যদিনের। সারা অঞ্চল জুড়ে খরা আর খরা। বর্ষা নেই। বৃষ্টি হচ্ছে না। বৃষ্টির আশায় মানুষটা বারান্দায় বসে আকাশ দেখছিল। বর্ষা এলেই ফসল ফলবে। ঝোপে-জঙ্গলে শাকপাতা গজাবে। অন্ন নেই পেটে, মানুষের অন্ন না থাকলে মাথা ঠিক থাকে না। সুতরাং নিশির ডাকে সোনামণি বিরক্ত হচ্ছিল।

'কিছু বুলছিলম রে সোনামণি', খর গলায় ফের ডেকে উঠল নিশি।

তবু সোনামণি জবাব দিল না। মানুষটা খাবার লোভে অমন করছে।

'আমি কি তুর কেউ না রে সোনামণি? 'এবার সোনামণি খেপে গেল। 'তু আমার ভাতার নিশি।' রাগলে সোনামণির কাণ্ডজ্ঞান থাকে না। মরদকে ভাতার, আসলে ভাতার অথবা গালাগাল—মরে না কেন, যম কি নেই, হা ঈশ্বর, তুর মুখে আগুন—এ সব বলে সোনামণি কেমন সুখ পায়। সুখ পায়। সুখ পেলে তখন কাণ্ডজ্ঞান থাকে না। হাঁটুর ওপর কাপড় তুলে কটুবাক্য বর্ষণ। বারান্দা থেকে অল্প জ্যোৎস্নায় নিশি টের পেল—সোনামণি এবার হাঁটুর ওপর কাপড় তুলে কটুবাক্য বর্ষণ করবে। ভয়ে নিশির গলা প্রায় কাঠ হয়ে গেল। সে ভয়ে ভয়ে বলল, 'রাগ করিস না সোনামণি। তুকে একটা কথা বুললে রাগ করে লিবি না তো !'

'মরণ'—সোনামণি মুখের ওপর ঝামটা মারল একটা। মাঠে এখন আগুন জ্বলছে, পেটে আগুন—মানুষটার চোখে আগুন। সোনামণি এই প্রখর খরার দিনে নিশির চোখে আসঙ্গলিপ্সা দেখে ভয় পেয়ে গেল।

'মরণ বুলছিস সোনামণি। মরণ বুলতে লাই রে। মরণ বুললে স্বামীর ঘরে আগুন লাগে। ঢোল বাজায় যে মানুষ, যে মানুষ বাড়ি বাড়ি পূজা-পার্বণে ঢোল বাজায়, কাঁসি বাজায় তারে মরণ বুলতে নাই।' তারপর বারান্দা থেকে সন্তর্পণে নেমে খোলা মাঠের দিকে মুখ করে

বলল, 'তুই সোনামণি নিশির সঙ্গে মাঠে যাবি। বড়ো মাঠ। মাঠের দক্ষিণ সামুতে সরকারি খামার। খামারে বাবুরা বীজের ধান্য বুনেছে। সোনামণি রে সোনামণি, কী ধান্য, কী ধান্য' !' বলে নিশি একটা ঢোঁক গিলল। নিশি, যে ঢোল বাজায় পূজা-পার্বণে, যে কাঁসি বাজায় পূজা-পার্বণে, মুচিরাম হিঁদে যার বাপ ছিল, পাঁচ কাঠার জমির ওপরে যার ঘর ছিল, যার এখন কিছুই নেই—সব বন্ধক নিয়েছে ভালোমানুষের ছা শশী। শশী এখন বাবু, বাবু শশী খামারে এখন দারোয়ানের কাজ করছে।

সোনামণি বলত—'নাগর আমার !'

সেই নাগরের বিয়েতে, কন্যার অন্নপ্রাশনে ঢোল বাজিয়েছে নিশি। পাপ মুছে পুণ্য তুলে দিয়ে এসেছে, আর ধান্যদূর্বা ঢোলের উপরে—নিশি কত মঙ্গলকামনা করেছে শশীর। সেই শশীবাবু দু-গণ্ডা টাকায় জমি বন্ধক রেখে সোনামণি সহ নিশিকে বিবাগী করে দিল।

নিশির দুই মেয়ে, অঙ্গি বঙ্গি। ওরাও পূজা-পার্বণে নিশি ঢোল বাজাতে গেলে ছোটো গামছা পরে সঙ্গে সঙ্গে যায়। বাপের সঙ্গে বাড়ি বাড়ি কাঁসি বাজায়। কিন্তু, খরা প্রবল খরা। এখন আর কে কার পাপ মুছে পুণ্য নেয়। তাই অঙ্গি বঙ্গি, দুই মেয়ে কচু সেদ্ধ পাতে তুলে খুব তারিয়ে খাচ্ছে।

বোধহয় দুই মেয়ের তারিয়ে তারিয়ে খাওয়া দেখেই নিশি আগুন হয়ে উঠেছিল। পেটে আগুন, পিঠে আগুন, সারা মাঠময় শুধু আগুন ছড়িয়ে আছে—ক্ষুধার আগুন। নিশি ক্রমশ ধৈর্য হারিয়ে ফেলছিল—'অ সোনামণি, শুনতে পেছিস।'

দুই মেয়ের খাওয়া দেখে সহ্য হচ্ছে না মানুষটার। সোনামণিও আগুন হয়ে আছে ভিতরে ভিতরে। সে দাঁত শক্ত করে বলল, 'শুনতে পেছিস নাগর'।

সব শুনতে পেয়েছে, তবে! সে এবার গলে গলে পড়ল। 'অরে সোনামণি, অ সুমি, তবে দে, দুটা খেয়ে লিলে শান্তি পাই।'

'হা আমার মানুষ রে !' বলে সোনামণি কপালে করাঘাত করল। প্রায় বিলাপের মতো সুর ধরে বলতে থাকল, 'হায় ছানাপোনা পাখ-পাখালির হয়, গাছের পাতা মাছের মাথা হেথা-হোথা যা মিলে লিয়ে আসে, ছানা-পোনার কষ্টে পাখ-পাখালির ঘুম থাকে না চোখে—আর তু এক মনুষ্যের ছানা, মেয়ে দু'টা খেয়ে লিচ্ছে তর সহ্য হচ্ছে না !'

'অরে সোনামণি, অরে সুমি, তুই এমন করে রেতের বেলা বিলাপ করিস না। বিলাপ করলে মাঠে-ময়দানে মড়ক লেখেছে ভেবে সকলে ছুটে আসবে। আমি এক মানুষ, ঢুলি মানুষ, আমার দুই মেয়ে অঙ্গি বঙ্গি, ঢুলি মানুষের অমঙ্গল বইতে নাই।' নিশির ইচ্ছা হল, ঘরে ঢুকে ক্ষিধের জ্বালায় ঢোলটা কাঁধে নিয়ে মাঠে নেমে যায়। মেয়ে দুটো কচু সেদ্ধ খাচ্ছে। সোনামণি কাঠের হাতা নিয়ে বসে রয়েছে, ওরা পাতেরটুকু শেষ করে ফেললেই

বাকিটুকু ঢেলে দেবে। নিশির ঢোল নিয়ে ছুটতে ইচ্ছা হল মাঠে, তারপর ঢোলের উপর বোল তুলে, ছররা ছুটিয়ে, মাঠে-ময়দানে আগুন ছড়িয়ে দিতে ইচ্ছা হল। ক্ষুধার আতঙ্কে সোনামণির গলা টিপে ধরতে ইচ্ছা হল।

বড়ো দুঃসময়। না আছে পূজা, না আছে পার্বণ। দেশের লোক আকালে আকালে গেল। কী করবে, কাকে দোষ দেবে, সে ভেবে পেল না। তা ছাড়া মনে হল, রেগে গিয়ে লাভ নেই। বরং ঠান্ডা মাথায় পেটে হাত রেখে বসা যাক। উঠনের ওপর চুপচাপ বসে থাকলে সোনামণির দয়া হতে পারে। সে সোনামণিকে সেজন্য আর বিরক্ত করল না। উঠনের উপর সে হাঁটু গেড়ে বসে থাকল। মনে হল শশীর কথা। শশীর জমির কথা। সরকারি খামারে বীজের জন্য ধান ছড়িয়ে রেখেছে শশী। ধানের কথা মনে পড়তেই নিশির সবটুকু জ্বালা মুহূর্তে উবে গেল। সে এবার গিয়ে হাত পেতে দাঁড়াল সোনামণির কাছে। 'দে, একটু দে। পেটের জ্বালা নিবারণ করি। দে, দোহাই তুর বাপের সোনামণি, দে একটু দে, পেটের জ্বালা নিবারণ করি। দিলে তুর আয়ু বাড়বে সোনামণি। পুণ্য হবে তুর। সতীলক্ষ্মী হয়ে মরবি।' তারপর খুব কাছে গিয়ে কানের কাছে মুখ নিয়ে বলল, 'যাবি তু, যদি যাস তবে সোনার ধান্য তুলে লিব। শশী কাদামাটিতে বীজের ধান্য ছড়িয়েছে। যাবি তু! তু আর আমি দু-পাখিতে সারা রাত ঠুকরে ঠুকরে ধান্য তুলে লেব।' সোনামণিকে বড়ো তাজা মনে হচ্ছে এখন। স্বপ্নে দেখছে যেন। নিশি এবার সুযোগ বুঝে বলে ফেলল, 'দে সোনামণি, দে একটু খাই। খেয়ে পেটের জ্বালা নিবারণ করি।' সঙ্গে সঙ্গে সোনামণি কেমন রেগে গেল। শক্ত হয়ে বসে থাকল। সারা দিনমানে এই কচু সেদ্ধ সম্বল। সে নিশিকে আড়াল দেবার জন্য হাঁড়িটা পেছনের দিকে টেনে নিল।

বড়ো দুঃসময়। বড়ো বেহায়া নিশি। সে ঘুরে গিয়ে সামনে বসল। তারপর সেই আগের মতো হাত বিছিয়ে বলল, 'আমি ঢুলি মানুষ সোনামণি, আমারে তু ছোটো করে লিচ্ছিস। তু আর আমাতে এত ভালোবাসা, তু আমারে ছোটো করলে ধম্মে সইবে না।'

তখন অঙ্গি ডাকল, 'বাপ।' বঙ্গি ডাকল, 'বাপ।'

তখন সোনামণি টিনের ভাঙা থালায় অবশিষ্ট কচু সেদ্ধ দু-ভাগ করে নিশির পাশে খেতে বসে গলে। 'লে খা। ইবারে কী বুলবি বুল।'

'সোনার ধান্য আছে গ মাঠে।' নিশি কচু সেদ্ধ মুখে আলগা করে দেবার সময় কথাটা বলল। এমন করে বলল, যেন স্বপ্নে দেখা গুপ্তধনের খবর দিচ্ছে।

'কোথায়?'

'শশীর খামারে।' নিশি দুলে দুলে এত বড়ো খবরটা ভালো করে এবার শোনাল সোনামণিকে।

অঙ্গি বলল, 'আমি যাব বাপ !'

বঙ্গি বলল, 'আমি যাব বাপ।'

'দেখলি ত !'

সোনামণি ঢকঢক করে জল খেল। তারপর এনামেলের তোবড়ানো ঘটিটা পাশে রেখে বলল, 'গেলে কী অধম্মটা হবে শুনি।'

'ধরা পড়ে যাব।'

'চুপি চুপি যাব। কেউ টেরটি পাবে না। ওরা খুঁটে খুঁটে ধান তুলে লিবে।'

অঙ্গি বঙ্গি দুই মেয়ে। সুদিনে দুর্দিনে এই দুই মেয়ে। সুদিনে ফসল কাটা হলে মেয়ে দু-টো মাঠময় ঘুরে বেড়ায়। কোন মাঠের কোন সামুতে ইঁদুরে গর্ত করে ধান চুরি করে নিয়েছে তার খবর বয়ে আনে ঘরে। তখন নিশি আর ঢোল কাঁধে লয় না। মাথায় ফেটি কাঁধে কোদাল। নিশুতি রাতে দুই মেয়ে সঙ্গ দেয়। সরু হাতে অঙ্গি বঙ্গি দুই মেয়ে গর্তের ভেতর থেকে গুচ্ছ গুচ্ছ ধান তুলে আনে অথবা ওরা পাহারা দেয়। মাঠময় চোখ সজাগ করে রাখে—বাপ কে যেন আসে! সাপ, ওটা কী? বাপ কোদালে যেন কী লেগে আছে—অক্ত লেগে আছে। অক্ত বাপ, কীসের অক্ত! ইঁদুরের' ! তখন হেই হেই করে নিশির চিৎকার, না রে না, ইঁদুর-বাদুড় কিচ্ছু নয়, মা বসুন্ধরার কন্যা মামনসার বাহন ভুজঙ্গ। কালো রঙের ভূজঙ্গ—চিকচিক করছে, আর মাথাটা দোলাচ্ছে। কিন্তু সেবারে কী হল বাপ। কোদাল মেরে মেরে হয়রান নিশি, মাটির তলায় কোন সুদূরে ইঁদুরে ধান টেনে নামিয়েছে টেরটি পাওয়া যাচ্ছে না। কোথাও ধানের গুচ্ছ নেই একটা। হায় হায়, পরিশ্রম বৃথাই গেল। রাগে দুঃখে গান ভেসে এল নিশির গলায়, সময়ে ওটা সুখের গান ছিল—হায় মা, কে কার তবে চুরি করে হে মা ঈশ্বরী। কিন্তু নেই, ধান গর্তের ভিতর কোথাও নেই—প্রায় মাঠ চষে ফেলেছে নিশি, নিশুতি রাতে অঙ্গি বঙ্গির ভয় ধরে গিয়েছিল, তখন নিশির নজর হক করে থেমে গেল। গর্তের মুখে আলিসান ভুজঙ্গ। কালো রঙের ভুজঙ্গ। কোদাল মারলে সামান্য লেজটুকু কাটা যাবে। গোটা শরীর গর্তের ভিতরে। হায় তবে সব যাবে। ভিতরে সোনার ধান্য আছে গ মা জননী। তবে ইবারে কী করি। বলে এক হ্যাঁচকা টান লেজ ধরে। হাত বিশেক দূরে আলিসান ভুজঙ্গটা ভুঁইয়ে পড়ে থাকল কিছুক্ষণ। তারপর যায় কোথায়। নিশি দেখল, ভুজঙ্গটা ওকে তেড়ে আসছে। ঠিক মনে হল সোনামণির মতো তেড়ে আসছে। নাকে নথ ছিল সোনামণির, বালির চরে সোনামণি হক করে কাকে কামড়ে দিয়েছিল—বুঝি শশীকে, বুঝি নিশিকে এখন কামড়ায়, নিশি ছুটতে থাকল, ঘুরতে থাকল। নিশি এঁকেবেঁকে চলতে থাকল। আর হাঁকতে থাকল—অঙ্গি বঙ্গি ধান তুলে লে। আমি

ভুজঙ্গরে ডাঙায় তুলে আড়াল করে লিচ্ছি। নিশি আলের ওপর দিয়ে ঘুরে ঘুরে ছুটতে থাকল।

অঙ্গি বঙ্গি নাছোড়বান্দা। ওরা যাবেই। মৃগয়াতে বাপ যাবে, সঙ্গে মা সোনামণি যাবে—ওরা যাবে না কেমন করে হয়।

সুতরাং অঙ্গি গেলে, বঙ্গি গেল। সঙ্গে মা সোনামণি এক কাপড়ে মাঠে নেমে গেল। কিছু আর সম্বল নেই সোনামণির। এক কাপড়ে, এক আঁচলে ওকে সব সংগ্রহ করে আনতে হয়। নিশি কাঁধে গামছা ফেলে, কোমরে নেংটি এঁটে সকলের আগে আগে চলল। আর গান ধরল, সুখের গান। কে কার তরে চুরি করে হে মা ঈশ্বরী!

গহন মাঠ। দূরে লণ্ঠন নিয়ে শশী খামারে উঠে যাচ্ছে। সে মাঠের ভিতর একটা ভাঙা টিন বেঁধে রেখেছে। টিনটা থেকে থেকে বেজে উঠেছিল। একটা দড়ি, লম্বা দড়ি মাথার উপর দিয়ে টিনটা বাজায়। নদী থেকে, বিল থেকে পাখ-পাখালি উড়ে আসার সম্ভাবনা। বীজধান বুনে শশীর চোখে ঘুম নেই। যখন দেশে আকাল, যখন দেশে শস্য মিলছে না—ইঁদুরে-বাদুড়ে শস্য খেয়ে নিতে কতক্ষণ। শশী খামারে বসে এখন শুধু টিন বাজাবে। নিষুতি রাতে শব্দটা বড়ো ভূতুড়ে মনে হয়—মনে হয়, কেউ যেন মাঠময় আকালের ঘন্টা বাজাচ্ছে। পাখপাখালিরা আকালের ভয়ে আর নদী বিল থেকে উঠতে সাহস পায় না।

ওরা তখন তারকাঁটার বেড়াটা পার হচ্ছিল। ঠিক তখনই টিনটা বেজে উঠল। ঝরঝর করে বেজে উঠল। মাথার ওপর দড়িটা অনেক দূরে টেলিগ্রাফের তারের মতো চলে গেছে। শশী খামারে বসে দড়ি টানছে। নিশি পায়ের ওপর ভর করে দেখাল—'ওই যে হোথা, ভুঁইয়ে সোনার ধান্য।'

অঙ্গি বলল, 'কোথা রে বাপ?'

বঙ্গি বলল, 'কুনঠিতে?'

নিশি বলল, 'হুই যে, দেখতে পেছিস না !'

ওরা পা টিপে টিপে হাঁটছিল। শশীর দড়ি ওদের মাথার ওপর। বীজধানের জমিতে বাঁশের খুঁটি। খুঁটির মাথায় ভাঙা টিনটা ঝুলছে। জ্যোৎস্না ছিল সামান্য। কোথাও একটা পাখি ডেকে ডেকে তেপান্তরে হারিয়ে যাচ্ছে। সোনামণির বড়ো ভয় করছিল। শশীর ভয়। দড়ি ধরে শশী বসে আছে। ভয়ে সোনামণির বুকটা শুকিয়ে উঠছে। নিশি ফিসফিস করে ডাকল, 'কোনো কথা লয় সোনামণি। কথা বললে শশী টের পাবে। ধরা পড়লে জেল হাজতবাস। গেরস্থের ঘরে চুরি লয়, সরকারি ধান্য, বীজধান্য, ধান্য থেকে হেথা হোথা সব পুণ্য উঠবে।'

অঙ্গি ডাকল—'বাপ।'

বঙ্গি ডাকল, 'বাপ'।

আর সঙ্গে সঙ্গে ওরা চারজনই আলের ওপর উপুড় হয়ে গেল। টিনটা ঝরঝর করে বাজছে। আকালের ঘন্টা বাজাচ্ছে শশী। ঘন্টাটা ক্রমাগত বেজে চলেছে। শশী কি টের পেল—পাখ-পাখালি উড়ে এসে বসেছে। আকালের ঘন্টাও পরানে ডর ধরাচ্ছে না! যেন শশী শরীরে সমস্ত শক্তি ক্ষয় করে দড়ি টানছিল। যেন প্রাণপণ ঘন্টাধবনি করছিল। ভয়ংকর শব্দটা গ্রাম মাঠ পার হয়ে বিলের দিকে নেমে যাচ্ছে। তখন কে যেন কেবল বলছিল, হুই হোথা নিশি রে, সোনার ধান্য পড়ে আছে রে! ওরা হামাগুড়ি দিয়ে এগুচ্ছিল। শুধু একটু যেতে পারলেই হয়। ওরা প্রাণপণ হামাগুড়ি দিতে থাকল, গোসাপের মতো ওরা এগোচ্ছিল। শুকনো জমি, উত্তাপে সব ঘাস জ্বলে পুড়ে গেছে। ওদের হাঁটু থেকে, কনুই থেকে রক্ত ঝরছিল। ওদের হুঁশ ছিল না, ওরা বীজ ধানের জমি নাগাল পাবার জন্য অধীর এবং জীবধানের ভুঁই নাগাল পেয়ে নিশি আনন্দে প্রায় কিছুক্ষণ জমিতে হাত রেখে মড়ার মতো পড়ে থাকল।

সোনামণি ডেকে উঠল, মানুষটা কতকাল অন্নের মুখ দেখেনি, কতকাল ওরা অন্নভোজন করেনি, সোনামণি ভয়ে ডেকে উঠল, 'হেই।' মাথার চুল ধরে টানল। 'হেই, কী হয়েছে তুর!' সোনামণির ভয়, নিশি দুবলা নিশি এত দূর আসতে গিয়ে ফুসফুসটা জখম করে ফেলেছে। ফুস করে হাওয়া বের হয়ে গেলে আর কী থাকল।

'নিশি। অঃ নিশি।' সোনামণি ফের ডেকে উঠল।

নিশি এবার চোখ মেলে তাকাল এবং খপ করে হাতটা ধরে ফেলল সোনামণির। তারপর ভুঁইয়ের ভিতর, কাদা জমির ভিতর নেমে গেল। ওরা প্রায় চারটা পাখির মতো খুঁটে খুঁটে যেন ধান খেতে থাকল। খুঁটে খুঁটে খুব সন্তর্পণে—আলগোছে হাত বাড়িয়ে তুলে আনল ধান। একটা ধান, দুটো ধান, একসঙ্গে পাঁচটা সাতটা ধান তুলতে পারছে না। পাঁচটা সাতটা ধান তুলতে গেলে এক মুঠো কাদা উঠে আসছে। জ্যোৎস্না প্রায় মরে আসছিল। ওরা ধানের চেয়ে কাদা তুলে ফেলছিল বেশি। শশী খামারে বসে দড়ি টানছে তো টানছেই। এক মুহূর্তের জন্য থামছে না। থামলেই ওরা চারটা পাখি ভুঁইয়ের সঙ্গে মিলে যাচ্ছে। হাতে পায়ে কাদা, শরীরে কাদা—সর্ব অঙ্গে কাদা লেগে আছে। চোখ মুখ দেখলে এখন কে নিশি কে সোনামণি, আর কে অঙ্গি বঙ্গি বোঝা দায়।

ঠিক পাখির মতো ওরা এক পা দু-পা করে এগুচ্ছিল। কাদার ভিতর হামাগুড়ি দিচ্ছিল। ধান খুঁটে যে যার গামছায় রাখছে। সোনামণি ধান তুলে আঁচলে রাখছে। ধানের সঙ্গে কাদা আর জমি থেকে জল শুষে আঁচলটা ক্রমশ ভারী হয়ে উঠছে। ধান সামান্য, কাদা জলে গামছা ভরে গেল নিশির। সে কী করবে ভেবে পেল না। ধীরে ধীরে সোনামণির কাছে

বুদ্ধির জন্য উঠে গেল। কাছে গিয়ে দেখল সোনামণি গোসাপের মতো কাদা হাটকাচ্ছে। শরীরে কোনো বাস রাখেনি। সোনামণি অঙ্গ ছোলা মুরগির মতো। গোটা শরীরটা ভুঁইয়ে বিছিয়ে রেখেছে। সে তাড়াতাড়ি ধান তুলে নিচ্ছে। কারণ শশীকে বড়ো ভয় সোনামণির। শশী বড়ো চেনা মানুষ কঠিন মানুষ। মনে হতেই দাঁত শক্ত হয়ে গেল সোনামণির। কাপড় হাঁটুর ওপর তুলে কটুবাক্য বর্ষণ করতে ইচ্ছা হল। বেইমান শশী, নেমকহারাম শশী। লজ্জা শরম মানুষটার দিন দিন উবে যাচ্ছে। পয়সা হাতে আসতেই শশী তবলা ডুগি কিনে বোলানের একট দল করে ফেলল। ওস্তাদ শশী সোনামণিকে তাড়ি খাবার লোভ দেখাল। সোনামণির সোনার ধান্য চুরির লোভে নিশি বাড়ি না থাকলে শশীর ঘুরঘুর করা বেড়ে যেত। 'শশী—তুমি গোলাম হে শশী।' সোনামণির চোখে আগুন জ্বলছিল, জিভ ভয়ে শুকিয়ে আসছিল, আর সেই এক সিংহের খেলা দেখানো চোখ সোনামণির। সামান্য দূরে অঙ্গি বঙ্গি। সেচের জল বীজের ধান, সেই ধান তুলে এদিকেই এগিয়ে আসছে অঙ্গি বঙ্গি। আর সেই মানুষ নিশি, কুঁড়ে মানুষ বসে বসে সোনামণির তামাশা দেখছে। সোনামণি খ্যাঁক করে উঠল।

নিশি আমতা আমতা করে বলল, 'গামছাটা ভরে গেল সোনামণি। ধান লেবটা কীসে।'

'হা রে আমার মরদ।' সোনামণি ফের দুঃখে দাঁত শক্ত করে ফেলল। এখন বচসার সময় না। নাচন-কোদনের সময় নয়। এখন শুধু ধান তুলে নেবার সময় নিশিকে বসে থাকতে দেখে আগুনের মতো ওর শরীর জ্বলে উঠছিল। সে কী ভাবল, কী দেখল নিশির, তারপর সহসা নিশির নেংটিটা হ্যাঁচকা টানে ছুঁড়ে ফেলে দিল দূরে। ঠিক যেন এক ভুজঙ্গ এখন ভুঁইয়ের মাঝে পড়ে আছে চিত হয়ে।

নিশি বলল, 'হ্যা ল সোনামণি, হ্যা ল সুমি, আমি নিশি, আমি ঢোল বাজাই পুজা-পার্বণে, আমারে তুই উলঙ্গ করে দিলি' !'

'মরদের কথা শুন !' সোনামণি ধান রেখে শাড়িতে মুখ তুলে কথা বলল। 'আমার সাধু রে।' সুমি ফের সাঁতার দিল কাদার ভিতর। 'কিছু জানে না মরদ।' খুঁটে খুঁটে কিছু ধান তুলে আনল। 'অঃ আমার গাজনে সন্ন্যাস লিয়েছে রে, জয় মহাদেবের বাচ্চা রে! যা যা ওটা বিছিয়ে যা পারিস তুলে লেগা।' সোনামণি আর তাকাল না নিশির দিকে। মাথার উপর এখন আর দড়িটা নড়ছে না। বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়েছে। 'শশী তুমি বড়ো চতুর হে' ! তুমি নিশিকে টাকা দিয়ে বশ করেছ।' আর তখন চারিদিকে খরা, আগুনের মতো ঝিল্লি মাঠময়, গোরু বাছুর জলের জন্য হন্যে হয়ে ঘুরছে। 'আর শশী তুমি বড়ো চতুর হে। তাড়ির খোঁজে তুমি শশী বনবাদাড়ে ঘুরঘুর করছিলে।'

নিশি সেদিন বাড়ি ছিল না। অঙ্গি বঙ্গি নিশির সঙ্গে ঢোল বাজাতে চলে গিয়েছিল দূর গাঁয়ে। তখন সোনামণি, একা সোনামণি বন-বাদাড়ে, ঝোপে-জঙ্গলে কচু কদু খুঁজে মরছে। তখন হনুমানটা গাছ থেকে লাফ দিয়ে একেবারে সামনে নেমে ভূতের মতো পথ আগলে দাঁড়িয়ে থাকল। আর যায় কোথায় সোনামণি। সে ঝোপের ভেতর থেকে বলল, 'অঃ ভালোমানুষের ছা, দেখ তো গাছে ওটা কী?' আর যখন লোকটা গাছ দেখতে গিয়ে বলল, 'কই কোথাও তো কিছু দেখতে পেছি না রে, সোনামণি, কই রে, কী দেখালি তুই, কী দেখাবি তুই আমারে.....' তখন সোনামণি তাড়াতাড়ি ঝোপ থেকে বের হবার ফাঁক খুজছে। বের হবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছে। সব লতাপাতার ঝোপ। কোনোরকমে লতাপাতা গা থেকে সরিয়ে মাঠে নেমে যাবার চেষ্টা করছে। এবং বলছে, 'দ্যাখ দ্যাখ গাছের মাথায় পাখি, পাখিটা ডিম পাড়ছে দ্যাখ।' কিন্তু হায়, মানুষটা গাছ দেখছে না, সে সোনামণিকে দেখছে—'আমি বলি ঝোপের ভিতর কী খচখচ করে, দেখি নিশির বউ সোনামণি।' বলে মুখটা ঝোপের কাছে নিয়ে হা হা করে হেসে উঠল। কথা শুনে সোনামণি বলল, 'অত হাস্য ভালো লয় শশী।' কেমন শুকনো গলায় কথাটা বলল এবং ঝোপের ভিতর একটা পাখি হয়ে বসে থাকল। চিৎকার করতে পারল না। কেউ কোথাও নেই। এই ভর দুপুরে এত বড়ো মাঠে খরা বলে কেউ নেই। আগুন জ্বলছে মাঠে, শশীর সুদের কথা মনে হল। সঙ্গে সঙ্গে শশী সেই যেন এক আলিসান ভুজঙ্গ—হামাগুড়ি দিয়ে ঝোপের ভিতর ঢুকতে চাইছে। সোনামণি বলল, 'অ মা গ !' বলে ফুড়ুত করে মাঠের ভিতর উড়ে যেতেই খপ করে আলিসান ভুজঙ্গটা ওর একটা পা কামড়ে ধরল যেন। 'পাখি গাছে ডিম পাড়ে, বড়ো বড়ো ডিম, মুরগির মতো ডিম।' তারপর সোনামণির শরীরের ভিতর কোথাও না কোথাও ডিম আছে, মুরগির ডিম লুকানো আছে, সোনামণি শরীরে মুরগির ডিম লুকিয়ে রেখেছে—আর যায় কোথায়, শশী ডিমের জন্য, ডিম বের করার লালসায় ওকে তছনছ করে দিতে গিয়ে দেখল, সোনামণি ওর হাতে কামড় বসিয়ে দিয়েছে।

সোনামণির চোখ দুটো কাল-ভুজঙ্গের মতো ফোঁস ফোঁস করছিল তখন। সোনামণির কাণ্ডজ্ঞান ছিল না। কচু কদু ফেলে সোনামণি একসময় ছুটতে থাকল।

নিশি এখনও পাশে বসে রসেছে। ওকে সোনামণি টান মেরে উলঙ্গ করে দিল। সে রাগে দুঃখে প্রায় কথা বলতে পারছিল না। সোনামণিকে বড়ো ভয় তার। তবু কাতর গলায় বলল, 'আমি ঢোল বাজাই, পাপ ফেলে পুণ্য আনি, তু আমারে সোনামণি উলঙ্গ করে দিলি।'

সোনামণি ধান দেখে রসে বশে আছে। ওর সব দুঃখ কষ্ট এই ধান, এত ধান হরণ করে নিয়েছে। সে উল্লাসে প্রায় নীচু গলায় গান ধরে ছিল, 'হায় মা, কে কার তরে চুরি

করে হে মা ঈশ্বরী।’ তারপর বলল, ‘কত সোনার চান্দে পরান কান্দে....অ নিশি তু আমারে মেরে ফেল রে।’

কীসে কী কথা হয়, নিশি বোঝে না। সোনামণি এখন প্রায় পাগলের মতো হাসছে। কথা বলছে। কথা তো নয়, যেন সুর ধরে চড়ক পূজার দিনে মেলার শুনি মাসির মতো কণ্ঠ খুলে দিয়েছে। বিরক্ত হয়ে নিশি বলল, ‘তর পরান এত উথাল-পাথাল করে কেন রে সোনামণি?’

তখনই খামারবাড়িতে কার গলা যেন হেঁকে উঠল, ‘ও সামুতে কার গলা পাই হে। এত রাতে কার গলা পাই হে।’

সোনামণি গলা চিনতে পেরে বলল, ‘হেই হেই নিশি, কী বুলছে শুনে লিচ্ছিস।’

‘কী বুলছে?’

‘বুলছে, কার গলা পাই হে।’

নিশি, দুবলা নিশি তাড়াতাড়ি করে মাথায় পোঁটলা তুলে ছুটতে থাকল। মেয়ে দুটো বাপের পেছনে ছুটতে থাকল। যাবার সময় নিশি বলছিল, বুলেছি না অত হাস্য ভালো লয়।’

‘ও সামুতে কে কথা বলে হে? জবাব লেই কেন হে।’

অন্ধকারে মনে হল শশী দানবের মতো থপথপ করে খামারবাড়ি থেকে নেমে আসছে। আকালের ঘন্টা ওর হাতে এখন বাঁধা নেই। অথবা মনে হল, কালো কুচকুচে এক ভুজঙ্গ পাখি ধরার জন্য নেমে আসছে। সে খুব জোরে হাঁকছিল না। কারণ ফাঁদের ভেতরে পাখি ধরা পড়েছে—ও যেন গলা শুনে আকালের ঘন্টা বাজাতে বাজাতে সব টের পাচ্ছিল। সুতরাং সে চোর চোর বলে জোরে পর্যন্ত চেঁচাল না।

চাঁদের আলোটুকু পর্যন্ত মরে গেছে। নিশুতি রাতের অন্ধকার তেমনি ভয়াবহ। বিলে সেই এক পাখি এখনও ডাকছে। আর গাদাজলের ভিতর সোনামণির পায়ের শব্দ ভেসে বেড়াচ্ছিল। সে নিশির সঙ্গে ছুটে যেতে পারল না। নিশি ছোট্ট এক পুঁটলি মাথায় করে দ্রুত চলে গেল। কিন্তু সোনামণির পুঁটলি ভারী, সে কিছুতেই বোঝাটা মাথায় তুলতে পারল না। দূরে নিশি ছুটছে। অঙ্গি বঙ্গি ছুটছে। সোনামণি মাথায় তুলে নেবার জন্য আরও দুবার চেষ্টা করল। বার বার চেষ্টা করল। বার বারই জলে কাদায় পড়ে যাচ্ছে সোনামণি, পা হড়কে যাচ্ছে, পা শক্ত করে কাদার ভিতর দাঁড়াতে পারছে না। পালাবার জন্য বোঝা নিয়ে সে টানাহ্যাঁচড়া করতে থাকল—টেনে টেনে বোঝাটা ভুঁইয়ের এক পাশে নিয়ে আসার চেষ্টা করল—পারল না। চোখ মুখ ক্রমশ শুকিয়ে আসছে ভয়ে। ক্রমশ সোনামণির হাত দুর্বল হয়ে যাচ্ছে। শশী এখন সেই দানবের মতো অথবা সেই এক আলিসান ভুজঙ্গ খাব খাব

করছে। যেন বড়ো উল্লাস শশীর, আর হায় সোনামণি সামান্য এক প্রাণ, কাদার ভিতর পাখির মতো ধরা পড়ে গেল।

শশী রসিকতা করে যেন হাঁকল, 'সাহস তো বড়ো কম লয় হে! জবাব দিচ্ছ না

ক্যানে !'

সোনামণি বুঝল, এত বড়ো বোঝা ওর তুলে নেবার ক্ষমতা নেই। বুঝল, এত কষ্টের সংগ্রহ, প্রাণের চেয়েও মুল্যবান পুঁটলিটি ফেলে গেলেও রেহাই পাবে না। এখন ছুটতে গেলেও ধরা পড়ে যাবে।

শশী এখন হাত দশ দূরে দাঁড়িয়ে আছে। সে আর এগুল না। সে বোধ হয় দাঁড়িয়ে পাখিটার তামাশা দেখছিল। কাদার ভিতর হুটোপুটি দেখছিল। শেষে দরাজ গলায় যেন পাখি আর পালাতে পারবে না, এমন এক দরাজ গলায় হাঁকল, 'কে ভুঁইয়ের ভিতর হুটোপুটি করছে হে।'

অন্ধকারে সোনামণি কী করবে ভেবে পেল না। ভয়ে উত্তেজনায় অস্থির সোনামণি। তবু ছুটে একবার দেখতে পারে। এখনও সময় আছে। যখন আর উপায় নেই, শশীই ওর কাল-শশী.....ওকে ধরে ফেললে দুবলা নিশিকে নিয়ে পর্যন্ত টানাটানি হবে তখন মাঠের ভিতর দিয়ে ছোটাই ভালো। সে ওর সোনার ধান্য ফেলে ছুটতে থাকল।

'কে আছ হে! দ্যাখ, দ্যাখ, চোর পালাচ্ছে। খামারে চোর পড়েছে।' শশী এই বলে হাস্য ছড়াল। তারপর শশী চোর ধরার মতো অন্ধকারে সোনামণির পেছন পেছন ছুটতে থাকল। সোনামণি আপ্রাণ ছুটছে, অন্ধকারে ছুটছে। তার কাঁটার বেড়া সামনে। বেড়াটার সামনে সোনামণি পথ পেল না পালাবার। শশী চোরের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল। কিন্তু সোনামণির গা পিছল, কাদাজলে গা পিছল। পাঁকাল মাছের মতো সোনামণি শশীর শক্ত বাহু থেকে হড়কে গেল। হড়কে গিয়ে দিক-বিদিক জ্ঞানশূন্য সোনামণি। সোনামণি অন্ধকারে ছুটছে, যেদিকে ভুঁই আছে সেদিকে ছুটছে। সেই অন্ধকারে মাঠের ভিতর দাঁড়িয়ে দু-হাত উপরে তুলে জনহীন প্রান্তরে শশী চিৎকার করে উঠল, 'তুমি সোনামণি, তুমি জানো না আমি শশী, আমি কাল-শশী। তোমাকে আমি ফাঁদে ফেলেছি হে সোনামণি।' ফাঁদের কথা শুনে সোনামণি আর ছুটতে পারল না। হাত-পা অসাড় হয়ে গেল। চারিদিকে অন্ধকার, চারিদিকে তার কাঁটার বেড়া আর সেই আকালের ঘন্টা কে যেন কেবল বাজিয়ে চলেছে। 'হা মা ঈশ্বরী আর ছুটতে লারছি।' বলেই সে ভুঁইয়ের ওপর লুটিয়ে পড়ল। জমির পাড়ে দাঁড়িয়ে শশী হা হা করে সেই হাস্য ছড়াল। খাকি হাফ-প্যান্ট পরা শশী কাদার ভিতর নেমে গেল। উদোম গায়ে শশী সোনামণিকে সাপটে ধরল। কিন্তু হড়কে যেতেই শুকনো জমি থেকে ধুলো মাটিতে হাত শুকনো করে এল। তারপর ফের কাদার

ভিতর নেমে সোনামণিকে মরা মাছের পাখনা ধরে টানার মতো একটা হাত টেনে তুলল ওপরে। তারপর কানের কাছে মুখ নিয়ে বলল, 'আমার ভুঁইয়ে খোলা গায়ে মুরগি ওড়ে, এ কী তাজ্জব হে! কিন্তু কোনো জবাব নেই। কাদার ভিতর মড়ার মতো পড়ে আছে সোনামণি। শশী শরীরের ভিতর হাত দিয়ে কীখুঁজল, শেষে হাঁটু গেড়ে পাশে দু-হাত রেখে কাদা থেকে টেনে তোলার চেষ্টা করতে গিয়ে দেখল, বড়ো পলকা শরীর সোনামণির। সে তাকে কাঁধে তুলে নিল। দূরের মজা দিঘিতে ধুয়ে পাকলে নেবার জন্য শশী হাঁটছিল। দু-পা যেতেই সোনামণি কাঁধ থেকে হড়কে নীচে পড়ে গেল। আর শশী শক্ত করে ধরতেই সোনামণি যেন প্রাণ পেয়ে গেল। সে আবার ছুটছে। শশীর শরীর ভারী, সে কাদার ভিতর ছুটতে পারছিল না। সোনামণির পলকা শরীর সে সামান্য আরামে প্রাণ পেয়ে গেল, সে উড়ে উড়ে পাখির মতো ভুঁইয়ে খেলা দেখাতে থাকল শশীকে। সে প্রায় উড়ে উড়ে ছুটতে থাকল। সে এই কাদার ভিতর শশীকে ঘুরিয়ে মারছে। সেই যেমন নিশি একদিন এক মাঠে এক ভুজঙ্গ নিয়ে ঘুরে ঘুরে খেলা করছিল, মাঠের ভিতর তেমনি সোনামণি এক ভুজঙ্গ নিয়ে কাদায় ভুঁইয়ে লড়ছে। কিন্তু হায়, এ খেলা বিষম খেলা। ভুজঙ্গ পাখি ধরার জন্য লড়ছে, পাখি প্রাণ বাঁচানোর জন্য লড়ছে। ফাঁদের ভেতরে পাখি। শুধু ছটফট করা যায়। সোনামণি খেলায় শেষ পর্যন্ত হেরে গেল। কারণ পা হড়কে পড়ে গিয়ে সে কাদার ভিতর আটকে গেল। শশীরও তর সইছে না। সে হাঁটু মুড়ে কাদার ভিতর বসেই বলে উঠল, 'খোলা গায়ে মুরগি ওড়ে, গাস কত সুখ রে।'

সোনামণি জবাব দিল না। মরা গোসাপের মতো চিত হয়ে পড়ে থাকল। কারণ এতটুকু শক্তি আর সোনামণির অবশিষ্ট ছিল না। সামান্য সেটুকু শক্তি সে শুধু বিলাপের জন্য, সে নীচে পড়ে শুধু বিলাপ করতে থাকল, হ্যাঁ রে নিশি, তুই আমারে ফাঁদে ফেলে চলে গ্যালি রে! হ্যাঁ রে নিশি, আমার সোনার ধান্য চুরি যায় রে !'

শশী বলল, 'সোনার ধান্য আমার।'

সোনামণি বলল, 'সোনার ধান্য আমার। তু আমার সোনার ধান্য চুরি করে লিচ্ছিস।' বলেই হক করে শশীর গলাটা কামড়ে ধরল। ভালোমানুষের ছা শশী মুরগির মতো, জবাই করা মুরগির মতো উঠে দাঁড়াল। দু-তিনটে বড়ো লাফ দিল কাদার ভুঁইয়ে, পাগলের মতো দু-হাত উপরে তুলে ঘুরে ঘুরে শেষে এক আলিসান ভুজঙ্গের মতো লুটিয়েপড়ল। সোনামণি, সামান্য এক প্রাণ-পাখি শশীর মতো দানবের, যে আকালের ঘন্টা বাজাত, প্রাণ হরণ করে চলে গেল। তখন থেকে থেকে পাখির ডাকটাও কমে গেছে, থেকে থেকে শশীর হ্যারিকেনটা খামারে দপদপ করে জ্বলছিল, শুধু জ্বলছিল। তেপান্তরের পাখিটা শূন্যে তখন উড়ছিল, ঘুরছিল আর বুঝি বলছিল—আকালের ঘন্টা কে বাজায় দেখ।

মৃত্যুচিন্তা

বয়সটা তাঁর বড়ো খারাপ প্রিয়তোষ বোঝেন। এই বয়সে একা থাকলেই তাঁর যত মৃত্যুচিন্তা মাথায় ঢুকে যায়।

কেবল ভাবেন আর কত দিন!

প্রশ্নটা নানাভাবে তাঁকে তাড়া করে। মৃত্যুচিন্তা তাঁকে বড়োই পীড়া দেয়। মায়ের মৃত্যুর পরই এটা তাঁর বেশি হয়েছে। মৃত্যুকষ্ট কী যে সাংঘাতিক, তাঁর মনে হত মা ঘোরে পড়ে আছেন, হুঁশ নেই, মাঝে মাঝে হাত-পা নাড়ছেন, হাত কাঁপছে, বুক প্রচণ্ড ওঠানামা করছে —মুখ লালা গড়াচ্ছে, কাউকে চিনতে পারছেন না, চোখে জল, তিনি মৃত্যুকষ্ট সহ্য করতে পারছেন না। আত্মীয়স্বজনেরও ভিড়, হঠাৎ এটা যে কী হল! ভালোই তো ছিলেন, স্বপাকে খেতেন, অসুখ-বিসুখ ছিল না, সহসা মাথা ঘুরে পড়ে গিয়ে সে যে ঘোরের মধ্যে গিয়ে ঢুকলেন—আর সাড়া নেই। স্যালাইন অক্সিজেন চলছে। নার্সিংহোমে ঢুকতে একটা ঝাউগাছের ছায়ায় প্রিয়তোষ দাঁড়িয়ে থাকেন। মা-র কষ্ট দেখতে হবে ভেবেই তাঁর আর সিঁড়ি ধরে উপরে উঠতে ইচ্ছে হত না। কাছে থাকলে কষ্ট বাড়ে। আত্মীয়-স্বজনরাও চাইত না, মায়ের পাশে তিনি বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকেন। তাঁর তো বয়স হয়েছে।

আর কী যে হয়, কিছুটা তিনি পলাতকের মতোই প্রায় তখন দেশের বাড়িতে ফিরতেন। সুনন্দা বলত মা ভালো হয়ে যাবে, তুমি এত ভাবছ কেন। ভালো যে হবে না তিনি জানেন। তবু সুনন্দা কিংবা ভাইরা তাঁকে কিছুটা আগলে রাখত। দৌড়-ঝাঁপ তারাই করছে। শুধু টাকা-পয়সার বন্দোবস্ত রাখা ছাড়া তাঁর আর কোনো দায়ই ছিল না। মৃত্যুর সঙ্গে মা-র লড়ালড়িটা ছিল মাসাধিককাল।

তাঁর মাঝে মাঝে মনে হত, মা এই ঘোরের মধ্যে মৃত্যুকষ্ট কি টের পাচ্ছেন! না টের পাচ্ছেন না। এক সাবলীল নৌকা যদি ঝড়ে নদীর কিনারায় উলটে পড়ে থাকে, তার দিকে আর কে তাকায়! ঝড় অথবা অতি নিবিড় স্নেহ কি এই ঘোরের মধ্যেও জীবনকে জড়িয়ে রাখে।

মা কি বলতে চান, বড়ো কষ্ট, আমি আর পারছি না রে। এই শরীর কিছুতেই মুক্তি দিচ্ছে না রে। গলায় ফাঁসের দড়ি ঝুলিয়ে আমাকে তোরা দোলাচ্ছিস কেন? ফাঁসটা আলগা

করে দে। আমাকে মুক্তি দে।

এই মাসাধিককাল তার মনে হত, বড়োই ভয়ংকর দুঃসময়, কষ্ট, অতি কষ্ট, এবং গলা টিপে হত্যা করার চেয়েও প্রবল এক কষ্ট অথবা কি কোনো সুখ, জড়তার সুখ মাকে আচ্ছন্ন করে রাখছে! মা হয়তো কোনোই মৃত্যুযন্ত্রণা অনুভব করছেন না। অকারণ সবাই মায়ের কষ্ট দেখে চোখের জল ফেলছে।

মৃত্যুযন্ত্রণার মধ্যে ঢুকে না গেলে কেউ বোঝেই না মৃত্যুর ভাষা কী হয়, কীভাবে বদলায়।

মৃত্যুর মধ্যেও কি সুখ থাকে?

জীবনে যে সুখ নিত্যবহ, মৃত্যুযন্ত্রণাও কি শরীরে অন্য সুখ এনে দেয়! তিনি জানেন না, জীবিতরা কেউ জানে না, মৃত্যুর এই অবচেতন অন্ধকারে কোনো নীল ভূখণ্ডের স্বপ্নে মা বিভোর হয়ে গেছেন কি না।

তারপর যা হয় সাদা চাদরে মুখ ঢেকে দেওয়া হয়।

সুনন্দা ডাকছিল, তিনি কোথায় গেলেন।

কেউ বলল ঝাউ গাছটার নীচে বসে আছেন।

আসতে বল। তিনি তাঁর বড়ো পুত্র। গঙ্গাজল দিক।

জেঠু শিগগির উপরে যাও। ঠাকুরমার মুখে জল দিতে হবে। প্রিয়তোষ সাড়া দিতে পারনেনি। কিছুতেই তিনি মায়ের মরা মুখ দেখতে রাজি না। কেউ তাকে নিয়ে যেতে পারেনি। কখন সবার অলক্ষে তিনি তাঁর দেশের বাড়ির দিকে চলে গেছিলেন নিজেও টের পাননি।

রিকশায় যেতে হয়।

দেড় ক্রোশ পথ যেতে হয়।

গাছপালা, ধানের মাঠ এবং পাকা সড়ক পড়ে বাড়ি যেতে। রিকশায় বসে কেমন একাকিত্বে ডুবে যাচ্ছিলেন— এই নয়, মা নেই বলে, বয়েস হলে সবাইকে যেতে হয়, এক জীবন থেকে অন্য জীবনে, অথবা কোনও জীবনেই হয়তো নয় মৃত্যু শেষ কথা বলে, জন্মের আগেও কিছু নেই, মৃত্যুর পরও কিছু থাকে না, সময়ের এক মধ্যবর্তী সময় জীবন নামক এক অস্তিত্বে ক্ষণিক লড়লড়ি, আসলে মৃত্যুকষ্টই তাঁকে বেশি পীড় দিচ্ছে।

কখনো নদীর মতো প্রবহমান আর্তির কথা— অথবা জীবন তো শেষ হবেই, জীবনের শেষ কথা বলেও কিছু নেই— অথচ কী সুন্দর এই গ্রহ, কত পাখপাখালি উড়ে যাচ্ছে, চাষিরা মাঠে যাচ্ছে, কয়েদবেল গাছ থেকে এক বালক ফল চুরি করে পালাচ্ছে কিংবা

জীবনের নিত্য ম্রিয়মাণ অস্তিত্ব এই আকাশ এবং নক্ষত্রের আলোতে ভেসে যায়। কুয়াশায় ডুবে থাকে ঘাস, ওড়ে প্রজাপতি, দূরে কোনো বনাঞ্চলে শোনা যায় হরিণের পায়ের শব্দ, অতি দ্রুত গতি তার, সৌরমণ্ডলে এই গ্রহে আছে শুধু প্রাণ। এবং যৌনতাই তার জন্মের কারণ, যৌনতার নির্যাসই প্রাণ এবং প্রাণের নির্যাসই মৃত্যু।

তিনি রিকশায় চড়ে যাবার সময় এমন সব যাবতীয় চিন্তায় মগ্ন হয়ে যাচ্ছিলেন। মা এবং তাঁর শৈশব অথবা বালিকা বয়সের চাঞ্চল্য এবং বড়ো হয়ে ওঠার মধ্যে ছিল, এক অতীব আশ্চর্য ধারাবিবরণী, স্বামী, শ্বশুর এবং পুত্ররা, কন্যারা তারপর ধীর প্রবাহে এক বংশাবলি তৈরি হয়ে গেল।

২

সেদিন প্রিয়তোষ ফিরছিলেন, সন্ধ্যা হয়ে গেছে, খালপাড় ধরে কিছুটা হেঁটে বড়ো রাস্তায় উঠে, বাস স্ট্যান্ড পার হয়ে, এক সরু চিলতে বস্তির রাস্তা পার হয়ে আবার বড়ো রাস্তায় পড়ে এবং কিছুটা গেলে তার বাড়ির রাস্তা, বেশ হন হন করেই হেঁটে যান, বয়সের ভারে তাঁর হৃদযন্ত্রটি দুর্বল না হয় তাই ডাক্তারের পরামর্শে এই সান্ধ্যভ্রমণ এবং সরু চিলতে রাস্তায় হঠাৎ কে যেন তখন ডাকল, বাবু—আবছা অন্ধকারেও চিনে ফেলতে তার কষ্ট হল না। মেনকা।

তুই মেনকা না?

হ্যাঁ। আজ্ঞে ...

তিনি কিছুটা থমকে গেলেন।

কতকাল পর দেখা। বয়স হয়েছে, তবু মেনকা যুবতী। তাঁর বাড়ি থেকে উধাও হয়ে যাবার পর মাঝে মাঝে বাস স্ট্যান্ডে মেনকার সঙ্গে দেখা যে না হয়েছে তা নয়, মেনকা ভিড়ের মধ্যে লুকিয়ে থাকার চেষ্টা করেছে, কোনো পুরুষ—যুবকই হবে, সঙ্গে থাকতে পারে, এই পাঁচ-সাত বছর পরে দেখা হলে যা হয়, প্রিয়তোষ ইচ্ছে করেই না দেখার ভান করে হেঁটে যেতেন, ধরা পড়ে গেলে মেনকা লজ্জায় পড়ে যেতে পারে, এমন সাত-পাঁচ ভেবেই তিনি ভিড়ের মধ্যে বলতেন না এই মেনকা, তুই এখানে দাঁড়িয়ে, এখানে কী করছিস! মেনকা বলে ডাকলেই যেন মেয়েটা অপ্রস্তুত হয়ে যাবে—

এভাবেই একদিন দেখেছিলেন, বাইকের পেছনে মেনকা, তার পুরুষ বন্ধুটি খুবই সাবলীল, মাথায় হেলমেট, প্রায় মেনকাকে উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে, ভাবতেন, জীবন, জীবন রে। ছুটছে।

এভাবেই মাঝে মাঝে আরও দু-একবার দেখা গেছে তাকে, প্রিয়তোষ শেষের দিকে খুব সেজেগুজে তাকে বাস স্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে থাকতেও দেখেছেন। শ্যামলা রঙের মেয়ে, চোখে আশ্চর্য ধার, আর মুখখানি ভারি সুন্দর, প্রিয়তোষের কষ্ট হত দেখলে।

তার স্মৃতি তাঁকে পীড়া দিত। সুনন্দাকে এসে বলতেন, জানো মেনকাকে দেখলাম?

কোথায়?

কিছু বললে না?

না।

মেনকা তোমাকে কিছু বলল না?

না।

তুমি ডাকলে না কেন?

আমাকে না দেখার ভান করলে ডাকি কী করে!

ও তো ওরকমেরই। যা জ্বালিয়েছে!

কী জ্বালিয়েছে বল। ছেলেমানুষ, মা নেই, বাবা নেই, স্নেহময়ী তোমাকে দিয়ে গেল, মাসিমা আমার দশবাড়ি কাজ, এটুকুন মেয়েকে রাখবেই বা কে বলুন। আপনার কথা মনে পড়ল। এটুকুন মেয়ে হলে কী হবে খুব চালাক। মুখের কথা না খসতেই দেখবেন সব কাজ সারা।

আর প্রিয়তোষের তো সায় ছিল না। সত্যি তো সাত-আট বছরের মেয়েটা কতটা আর সংসারের কাজে আসতে পারে!

সুনন্দা বলেছিল, থাকুক না। কী সুন্দর মিষ্টি মুখখানি দেখ। দেখে তোমার মায়া হয় না!

সত্যি ভারি মিষ্টিমুখ। একখানা পুঁটুলি সম্বল করে এসে উঠেছিল।

আবছা মতো অন্ধকারে মেনকা তাঁর দিকে তাকিয়েই আছে। এই রাস্তায় কিছু পাকা বাড়ি, পাট্টা পাবার পর কেউ কেউ পাকা বাড়ি তুলেছে। বস্তি এলাকাটা খালপাড় ধরে একেবারে মহিষবাথানের কাছাকাছি চলে গেছে। অধিকাংশের জীবিকা রাজমিস্ত্রির, জোগানেরও কাজ করে কেউ। প্লাম্বার মিস্ত্রির থেকে ফুটপাথে হকারি সবই চলে। কেউ কেউ বড়ো রাস্তার নাগালে বাড়ি বলে ঝুপড়ির মধ্যেই মিঠাইমন্ডার দোকানও করেছে। চাউমিনের দোকানও আছে। এলাকার বিস্তার এত বড়ো যে কেউ কাউকে সঠিকভাবে চেনে বলেও মনে হয় না। বাড়ির কাজের মেয়েরাও এই এলাকার। স্বামী রাজমিস্ত্রি না হয়

জোগানের কাজ করে। ফ্ল্যাটবাড়িরও অন্ত নেই। প্রায় সারাদিন রাস্তায়, মোড়ে, বাসস্ট্যাণ্ডে মেলার মতো ভিড়।

প্রিয়তোষ বললেন, তুই কোথায় থাকিস এখন?

মেনকা মাথা নীচু করে কী বলল, ঠিক শুনতে পেলেন না। আজকাল তিনি কানেও খাটো। মেনকা যে ভালো আছে, এটা তিনি অন্তত বুঝতে পারছেন। কপালে সিঁদুরের টিপ বড়ো করে। ওর পেছনেও কেউ যেন দাঁড়িয়ে আছে। মেনকার হাতে বালা, গলায় হার, চুলের প্রজাপতি ক্লিপ আবছা অন্ধকারেও স্পষ্ট। দামি সেন্টেরও গন্ধ পাচ্ছিলেন। যাক মেয়েটার একটা হিল্লে হয়েছে। পাঁচ-সাত বছর কেউ একই ছাদের তলায় থাকলে মায়া না পড়ে যায় না। মেনকা উধাও হয়ে গেলে প্রিয়তোষ আতান্তরেই পড়ে গেছিলেন। খোঁজাখুঁজি, থানা কিছুই বাদ দেননি।

স্নেহময়ীর এক কথা, না আসেনি। ওকে তো জানেন বাবু, দু-মাস টাকা দিলেন, ওর মাস মাইনে। আপনাকে সোজা বলে দিল, না বাবু দেবেন না। আমার টাকা, আমার হাতে দেবেন। তিনি আবার মেনকাকে টাকা দিলে তার এক কথা। আমি টাকা দিয়ে কী করব! রেখে দিন, পরে নেব। আমি তো খাই পরি, দরকার পড়লে নেব। এমনও যে পাসবই করে দেবেন, একটা বাচ্চা মেয়ের পাসবই করাও যে কঠিন। মেয়েটি থাকে ভালো, খায় ভালো, এত বড়ো তিনতলা বাড়ি , ফুলের বাগান, রান্নাঘর সবই প্রায় বলতে গেলে তার হেফাজতে। প্রিয়তোষের সময় নেই, অফিস আড্ডা, সুনন্দার সময় নেই, সকালে স্কুল, টিউশান, বিকেলে রাতে— বাড়িতে ঠিকা ঝি ঠিকা রান্নার লোক, তাঁর দুই পুত্র হোস্টেলে থাকে—একজন আই. আই. টি. আর একজন মেডিক্যাল কলেজে, সময়ে উদয় হয়, সময়ে আবার বিদায়ও নেয়। কন্যে বিয়ে হয়ে মার্কিন মুল্লুকে। সুনন্দাই স্নেহময়ীকে বলেছিলেন, দ্যাখ তো একটা মেয়ে যদি পাও, থাকবে, খাবে, ফুটফরমাস খাটবে, আমি তো একদণ্ড সময় পাই না।

আর মেনকা দু'-পাঁচদিন যেতে না যেতেই সুনন্দার ন্যাওটা হয়ে গেল। প্রিয়তোষের বসার ঘরে ও উঁকি দিতে থাকল, মিষ্টি মুখখানা দেখলে প্রিয়তোষের কী যে মনে হত, হতচ্ছাড়ি মেয়েটা এ বয়সেই সব খুইয়েছে, কাজেই আবদার করলে এটা ওটা তিনিও কিনে দেন। তাকে বইখাতাও কিনে দিয়েছেন—রোজ সকালে তাঁর কাছে এসে বসতেও বললেন, তার পরেই শুরু হল উৎপাত। ডাকলে আর সহজে সাড়া পাওয়া যায় না।

এই মেনকা, তুই কোথায়?

রান্নার মেয়েটা বলল, ডাকলে সাড়া পাবেন না বাবু। সে কি আর এখানে আছে! পাঁচিলে উঠে ঘোরাঘুরি করছে।

প্রিয়তোষ খুবই ক্ষুব্ধ হতেন।

আয়, পড়েটড়ে হাত-পা যে ভাঙবে! বইখাতার কথা বললেই কোথায় যে গা ঢাকা দেয়। ডাক! আর ডাক।

তাকে তখন খুঁজেই পাওয়া যেত না।

সুনন্দা বাড়ি নেই, সকালে তাঁর স্কুল। তাঁর নিজের কাজ কাগজের অফিসে। দুটোয় বের হতে হয়, সুনন্দা স্কুল করে বারোটার মধ্যে ফিরে আসে। সুনন্দা বাড়ি এলেই মেয়েটার উৎপাত তত থাকত না। কিন্তু বই-খাতার কথা বললে, সুনন্দার কাছেও পালিয়ে বেড়াত।

আর সবই ভালো, কেবল পড়ার কথা বললে নানা উৎপাত। এসে বসবে ঠিক, তারপর রাজ্যের গল্প, জানো বাবু আমার বাবা তো মাহিন্দারের কাজ করত। আমার মা দশবাড়ি খেটে খেত। আমাদের একটা টালির ঘর ছিল জানো! বৃষ্টি হলে, উঠোন জলে ভেসে যেত। মা আমি বারান্দায় বসে বৃষ্টি দেখতাম। মা আমি বারান্দায় বসে কাঁঠাল বিচি ভাজা খেতাম। বৃষ্টি ভিজে মাঠে বাপের ভাত দিয়ে আসতাম। বড়ই সুদিন ছিল গো বাবু। প্রিয়তোষ ধমক দিতেন, পড় অ আ। পড় ক খ। খাতায় রুল টেনে নে।

তখনই একদিন মেনকা বলে ফেলল, তুমি বাবু ভালো না।

বলে কি পুচকে মেয়েটা! এত সাহস! তার পরই মনে হয় ছেলেমানুষ, ছেলেমানুষ ভাবলেই রাগ কম হয়ে যায় প্রিয়তোষের।

আমি ভালো না?

না।

কেন!

আমার মুখে কী দেখ বল তো? আমার লজ্জা হয়।

ওরে বাপ রে, তোর এত পাকা কথা। আমি তোকে দেখি—আমার কেন যে তখন নিজের ছেলেবেলার কথা মনে হয়। আমিও যে তোর মতো ছোটো ছিলাম। আমি তাকালে তোর লজ্জা হবে কেন?

হবে না! তুমি পুরুষ মানুষ না!

প্রিয়তোষ আচ্ছা বিপাকে পড়ে গেলেন।—ঠিক আছে তাকাব না। রুল টেনে অ আ ক খ লেখ।

বাবু!

আবার বাবু! রুল টান বলছি।

আমাকে বাবু আলতা কিনে দেবে?

সে দেব। একদম আর কথা না।

প্রিয়তোষ সকালবেলাটায় সব কাগজগুলি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেন। সকালবেলায় এটাই তাঁর বড়ো কাজ। কোনো খবর মিস করলেন কি না, খবর মিস করলে কীভাবে খাওয়ানো যাবে খবরটা, এমন নানা চিন্তা তো থাকেই, আর পায়ের কাছে দু-পা ছড়িয়ে মেনকা, সে তার নখ দেখে, পা দেখে, সামনেই বড়ো আয়না, নিজের মুখ দেখে।

আমায় নেলপালিশ কিনে দেবে বাবু?

দেব। পড়ার সময় তোর নেলপালিশের কথা মনে হল!

কী করব মনে হলে, দত্তবাবুর মেয়ে জানো, রোজ নখে নেলপালিশ লাগায়, কী সুন্দর লাগে দেখতে।

আচ্ছা ফ্যাসাদ, তোর নেলপালিশ চাই, আলতা চাই, সেফটিপিন চাই, মাথার প্রজাপতি ক্লিপ চাই, মাসিকে বলতে পারিস না? পড়ার সময় তোর যত আবদার।

মাসিকে বলব কেন? মাসি দেবে কেন! তুমি এনে দেবে। তুমি না আনলে নেলপালিশে কোনো মজা থাকে না। আমার বাবা থাকলে ঠিক কিনে দিত জানো! জানো, আমাদের বাড়িতে বাবা পরি নামাতে পারত! পরি দেখতে খুব সুন্দর হয়, তাদের পাখা থাকে। যেখানে সেখানে খুসিমতো উড়ে যেতে পারে। আমার খুব উড়তে ইচ্ছে করে।

মারব এক থাপ্পড়। পড়তে বসলেই তোর দেখছি ওড়ার কথা মনে হয়।

তুমি আমাকে মারবে?

হ্যাঁ মারব।

সেদিনই সুনন্দা স্কুল থেকে ফিরলে বলেছিল, তুমি নিয়ে বসাও। আমাকে দিয়ে হবে না। এ মেয়েকে পড়ানো আমার কম্ম নয়।

একবার ভেবেছিলেন স্নেহময়ীকে ডেকে পাঠাবেন। না হবে না, পড়তে বসালে ওর উড়তে ইচ্ছে করে, নিয়ে যাও, কিন্তু ওই এক ল্যাঠা, মেয়েটার ওপর কেমন মায়া পড়ে গেছে। বাড়িটায় এখন তাঁরা দু-জন, মেয়েটা আসায় তিনজন, পুত্ররাও বাড়িতে এলে যাই করে, বেঁচে থাকতে মাকে তোষামোদ করে কতবার নিয়ে এসেছেন। মাসখানেক থাকলেই হাঁপিয়ে উঠত। ভাইরাও যে যার সংসার নিয়ে ব্যস্ত, অথচ তাঁর যে সবাইকে নিয়ে থাকতে ইচ্ছে হয়। এসব কারণেই, আর স্নেহময়ীকে ডেকে পাঠাননি। আছে, থাকুক, বয়স হলে একটি পাত্র দেখে বিয়েও দিয়ে দিতে পারেন— তাঁর সে ক্ষমতা আছে। পুত্ররা ক্যামপাসেই

চাকরি পেয়ে যাবে। কেউ আর তাঁর ওপর নির্ভরশীল নয়—এবং এসব কারণেই মেনকা তাঁর দুর্বলতা টের পেয়ে একদিন বলেই ফেলল, আমি যাত্রা দেখতে যাব।

ইদানীং যে বায়নার বহর বেড়েছে, সুনন্দাও টের পাচ্ছিলেন। প্রিয়তোষকেও হুমকি দিয়েছে, তুমি আর তার মাথাটি খাবে না। লিপস্টিক কিনে দিলে। রুপোর চেলি বানিয়ে দিলে—

বলল যে।

বললেই দিতে হবে।

তুমি সুনন্দা নিজেই তো তাকে আলতা কিনে দিয়েছ? দোকানে নিয়ে গিয়ে ফ্রক, জুতো, যখন যা চায়। চাইলেই দিতে হবে। এখন বোঝ ঠ্যালা, বলছে যাত্রা দেখতে যাবে। কার সঙ্গে যাবে তাও জানি না।

সুনন্দা এমন কথায় তেলেবেগুনে জ্বলে উঠেছিল—না যাবে না। বাবু যায় না, আমি যাই না। তেনার এখন যাত্রা দেখার বায়না।

তোমরা যাও না বলে, আমিও যাব না, সে আবার কেমন কথা।

প্রিয়তোষ কেন যে খেপে গেছিল, পা খোঁড়া করে রেখে দেব। গিয়ে দেখ না! টিকিটের পয়সা কে দিল! কোথায় কার পায়ের তলায় চেপ্টে থাকবি, কে খুঁজবে?

ভজা।

ভজা!

ভজাকে চেন না।

প্রিয়তোষ সুনন্দার দিকে তাকাল, সুনন্দা প্রিয়তোষের দিকে। মেনকা বড় হয়ে যাচ্ছে। তবু চোখ গরম করলে ভয় পায় এখনও। প্রিয়তোষ অফিসে বের হওয়ার আগে মেনকাকে ডেকে বলে গেলেন, তুই যাবি না। বারণ করে গেলাম। মনে থাকে যেন। ভজাটা কে শুনি!

তুমি কি সবাইকে চেন? ভজা জোগানের কাজ করে!

খুবই উত্তপ্ত হয়ে যান প্রিয়তোষ। সুনন্দাকে ডেকে বললেন, তোমার ঘরে নিয়ে শোবে। এ মেয়ে সব পারে।

দরজার কাছ থেকে আবার ফিরে এলেন, এই মেনকা!

সাড়া নেই।

আবার ডাকলেন।

হঠাৎ দরজার আড়াল থেকে মুখ বার করে বলেছিল, ডাকছ কেন?

বইখাতা আন।

সে খুবই বাধ্য মেয়ের মতো ছুটে বইখাতা নিয়ে এসেছিল। কতকালের যেন যুগ্ম চেষ্টায়, কোনো রকমে বাংলা পড়তে পারে। লিখতে পারে। যোগ বিয়োগ করতে পারে। ইংরেজি এক বর্ণ শেখানো যায়নি। হাই ওঠে তার।

হাই তুলছিস!

কী করব হাই উঠলে বল!

নে, এই টাস্ক থাকল। দশটা যোগ, দশটা বিয়োগ অঙ্ক থাকল। বিকেলে ঘুম থেকে উঠেই পড়তে বসবি। তারপর মাসিকে দেখাবি?

আমি যাত্রা দেখতে যাব না?

না। যাবি না।

মেয়েটা আজকাল তার পছন্দমতো কাজ না হলে অবাধ্য হয় প্রিয়তোষ জানেন। আর পড়ার ব্যাপারে তো তার সাত খুন মাপ। তিনি বললেন, বাড়ির বার হবি তো হাত-পা বেঁধে ফেলে রাখব। ভেবেছিস কি। অফিস যাওয়ার সময় সুনন্দাকেও সতর্ক করে দিয়ে গেলেন।

সুনন্দা ডাকছেন, এই মেনকা তোর হল?

মেনকা অন্য ঘরে পড়ছে। হাতের লেখা লিখছে, যোগ-বিয়োগ করছে! তেনারও হয়েছে, পড়তেই চায় না, তাকে রাজ্যের যোগ-বিয়োগ দিয়ে গেছে। দেরি তো হবেই।

সুরন্দা ফের ডাকলেন, তোর হল?

হচ্ছে মাসিমা।

সুনন্দা বুঝতে পারছিলেন এত সময় লাগার কথা না। সাঁজ লেগে যাবে। ধূপধুনো দিতে হয়। সুনন্দা তাঁর ছাত্রীদের বললেন, তোমরা জেরক্স নিয়ে যাবে, নোট লিখে জেরক্স ফেরত দিয়ে যাবে। আমি আসছি।

ঘরে চুপি দিয়ে সুনন্দার মাথায় হাত।

কীসের অঙ্ক, কীসের পড়া! মেনকা বইয়ের ওপর বসে অঙ্কের খাতায় পা রেখে আলতা পরছে পায়ে। নখে নেলপালিশ লাগানো হয়ে গেছে। পাউডার স্নো একটা বইয়ের ওপর সাজানো। ঘরে ঘরে আয়না। সে আলো জ্বেলে আয়নার সামনে সাজছে। বাবু শখ করে রুপোর চেলি করে দিয়েছিল পায়ের, তাও পরেছে। পা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখছে।

এই তোর পড়া! আসুক তোর বাবু! তুই কী করে যাত্রা দেখতে যাস দেখি। কোথাকার ভজা, সেই বেশি হয়ে গেল। বড়ো হচ্ছিস, নিজের ভালোমন্দ বুঝবি না?

কোথায় বড়ো হলাম! তোমাদের যে কী অলুক্ষুণে কথা বাপু!

মেয়েটার সঙ্গে কথায় পারা মুসকিল। ছাত্রীরা চলে গেলে নীচের দরজায় তালা লাগিয়ে দিলেন। তিনি মেনকার সঙ্গে আর একটা কথা বললেন না। মেনকা তার নিজের ঘরে থম মেরে বসে আছে। তারপর চিৎকার, আমি যাব না, কোথাও যাব না। আমার কোনো ইচ্ছে থাকতে নেই। কেবল দাসী-বাঁদির মতো খেটে মরব। তোমরা পেয়েছ কি। আর তারপরই সিঁড়িতে পায়ের শব্দ পেলেন, কোথায় যাচ্ছে! সুনন্দা দ্রুত নীচে নেমে অবাক। নতুন ফ্রক গা থেকে খুলে পুরোনো ফ্রক গায়ে একটা মাদুরে শুয়ে আছে। ঠোঁটের লিপস্টিক ঘষে তুলতে গিয়ে সারা মুখ তার লাল-নীল চিত্র-বিচিত্র হয়ে আছে। মাদুরে শুয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

প্রিয়তোষের ফিরতে বেশ রাত হয়। কাগজের অফিস। কোন খবর যাবে, কোন খবর যাবে না, মোটামুটি কাগজের লে-আউট সেরে বাড়ি ফিরতে রাত বারোটা বেজে যায়। কলাপসিবল গেটের তালার ডুপ্লিকেট চাবি থাকে তাঁর কাছে। বাইরে থেকে তিনি নিজেই খুলে ভেতরে ঢোকেন। আর তখনই প্রিয়তোষের মাথা খারাপ। গেট খোলা। এত রাতে গেট খোলা! যাত্রা ভাঙতে রাত দুটো, মেয়েটা কি সত্যি যাত্রার নাম করে ভজার সঙ্গে পালাল। এতটুকুন মেয়ের শরীরে গরম ধরে গেছে।

সেই অন্ধকার আবছা মতো জায়গা থেকে মেনকা একটু এগিয়ে এল, বাবু আমার বড়ো ছেলে। প্রণাম কর। কিশোর ছেলেটি তাকে প্রণাম করলে তিনি বললেন, তুই কোথায় থাকিস?

আমার দু-ছেলে বাবু। ছেলেরা মাসির কাছেই থাকে। আমি টাকা পাঠাই।

কেন তোর বর কিছু করে না!

কিছুই বলল না মেনকা, মাথা নীচু করে রাখল।

কোথায় থাকিস, কী কাজ করিস!

দরিয়াগঞ্জে আছি বাবু।

প্রিয়তোষ আর একটা কথা বলতে পারলেন না। হন হন করে হাঁটার চেষ্টা করলেন, তিনি মেনকার কাছ থেকে সত্যি যেন নিষ্কৃতি চাইছেন। দরিয়াগ' তো খুবই খারাপ জায়গা। নরম একটা শরীরে গরম ধরে গেলে এই হয়—শেষে তুই পতিতালয়ে!

প্রিয়তোষের আরও বয়স বাড়ে। মেনকাকে দেখার পর তাঁর বয়স যেন এক লাফে অনেকটা বেড়ে গেল। সেই মৃত্যুর দিকে ধাবমান সবাই। ঘর সংসার প্রিয়জন—এবং ধাবমান অশ্বের মতো জীবন পরিক্রমা। এমনিতেই বয়স যত বাড়ছে তত অনিদ্রার শিকার হচ্ছেন। ঘুমের বড়ি খেলে ঘুম হয় ঠিক তবে গভীর নিদ্রা হয় না। হালকা চালের নিদ্রায় তিনি অদ্ভূত বিদঘুটে স্বপ্নও দেখেন। মেনকার খোঁজ এভাবে শেষ পর্যন্ত পাবেন, এবং যৌনতা, মানুষজন, গোরু, ভেড়া সবাইকে তাড়া করছে— সারা রাত মায়ের মৃত্যুদৃশ্যও চোখে ভেসে গেল। কখনো মায়ের মুখ, কখনো মেনকার মুখ, কখনও সুনন্দার মুখ। সবাই যেন যৌনতার ঘোরে যে যার বংশাবলি তৈরি করে যাচ্ছে।

এভাবে তাঁর দিন যায়, বছর যায় এবং এভাবে বছরের পর বছর এক নিদ্রাহীন জগতে ঢুকে যান। রাতে বিছানায় যেতেই তাঁর আজকাল কেমন আতঙ্ক হয়। দেশবাড়ির সঙ্গেও সম্পর্ক আলগা হয়ে গেছে। শুধু শৈশবের কথা মনে হলে তাঁর অন্নকষ্টের দিনগুলির কথা মনে পড়ে। বর্ষায় কিংবা বৃষ্টির দিনে টালির ঘরের বারান্দায় বসে কাঁঠাল বিচি ভাজা খাওয়ার কথা মনে পড়ে। মা তাঁর আঁচলে কাঁঠাল বিচি ভাজা নিয়ে বসে আছেন। তাঁরা ভাইবোনেরা বৃষ্টিঝরা বিকেলে মার আঁচল থেকে খুঁটে খুঁটে তুলে নিচ্ছে ভাজা বিচি। নিখোঁজ বাবা মাঝে মাঝে আসেন, আবার চলেও যান। কাকা, জ্যাঠারাও ভালো নেই। ছিন্নমূল হলে যা হয়। অদৃষ্টের ওপর ছেড়ে দিয়ে তাঁরা অন্ন সংস্থানের অথবা বলা যায় অর্থ সংস্থানের খোঁজে বের হয়ে পড়েছেন। মেনকা যখন দু-পা ছড়িয়ে কাঁঠাল বিচি ভাজা খাওয়া কী যে মজা, এমন বলত, তখন কেন জানি মেয়েটা তাঁর নাড়ি ধরে টান দিত।

সুনন্দাও অসুস্থ সেই কবে থেকে। অসুস্থ বলে পাঁচ-সাত বছর একসঙ্গে শোওয়াও হয় না। বাড়ির দোতলার বারান্দা কাচ দিয়ে মুড়ে নিয়েছেন। সেখানেই তিন বাই ছয় একটি খাট পাতা। পরদা ঝুলিয়ে আলাদা শোওয়ার ব্যবস্থা করে সেখানেই রাত যাপনের ক্লান্তি দূর করতে হয়।

বারান্দার ঠিক মুখের ঘরটায় সুনন্দা শোয়। দরজা খোলা থাকে। জিরো পাওয়ারের আলো জ্বেলে রাখা হয়। সুনন্দার মাঝে শ্বাসকষ্ট প্রবল হলে, পুত্ররা, পুত্রবধূরা আসে, বাড়িটা আবার ভরে যায়—এবং এভাবে নার্সিংহোমে অথবা বছরে দু-বছরে একবার হাসপাতালেও রেখে আসতে হয়।

এই করে দিন যত যায় তত প্রিয়তোষ একা হয়ে যান। তাঁর কিছু আর ভালো লাগে না। সুনন্দার হতাশ মুখ এত কাতর করে রাখে, তাঁর মনে হয় তিনি নিজেও কখনো অসুস্থ হয়ে পড়তে পারেন। তখনই কেন জানি মায়ের মৃত্যুযন্ত্রণার ছবিটা পর্দার মতো ভেসে ওঠে। সুনন্দার বেশি বাড়াবাড়ি হলে আয়াও রাখা হয়।

বাড়িটা তাঁর বড়ো, বেশ বড়ো। তিনতলা বাড়িটা দুই পুত্র এবং সুনন্দার থাকার জন্য নিজে তদারকি করে নির্মাণ করেছিলেন। সেগুন কাঠের দরজা জানলা। দোতলার ঘরগুলিতে, এমনকী তিনতলার ঘরগুলিতে পাথরও বসিয়েছিলন। বাবার তখন বড়ো আক্ষেপ, প্রিয়তোষ বাড়িটা করলে, দেশের বাড়িতে করলে কি ক্ষতি হত! সুনন্দা নারাজ। এমন গণ্ডজাগায় মানুষ থাকে! তুমি কী খেপেছ! আমার ছেলেমেয়েরা ওখানে থাকতেই পারবে না। আর দশরথের পুত্র সেজে বাহবা না নিলেও চলবে। অনেক তো করেছ।

বছর ছয় হয়ে গেল, বাড়ির বাইরে স্নোসেম, ভিতরে ডিসটেম্পার— তারপর ধীরে ধীরে তিনি কী করে যে বাড়িটার কথাও যেন ভুলে গেছেন। এই বাড়ির প্রতিটি ইটকাঠের সঙ্গে তাঁর রক্তের সম্পর্ক। সুনন্দা অসুস্থ হয়ে যাওয়ার পর ধীরে ধীরে সব কেমন তাঁর অর্থহীন হয়ে গেল। একতলার ঘরগুলি কোনোটা বসার, কোনওটা ডাইনিং স্পেস হিসেবে ব্যবহার করা হয়, দোতলার ঘরগুলি এখন ফাঁকা, তিনতলার ঘরগুলিও। পুত্ররা, পুত্রবধূরা থাকত, নাতি-নাতনিরা থাকত—এখনও এলে থাকে, তারা কিছুই নিয়ে যায়নি। খাট, আলমারি, বুক সেলফ, টিভি সবই পড়ে আছে। বছরে ছুটিছাটায় আসতেই হয়, তখন সবই ঠিকঠাক না থাকলে তারা শোবে কোথায়, থাকবে কোথায়। ওরা যে আসে ওতেই খুশি প্রিয়তোষ। খোঁজখবর যথেষ্টই নেয়। প্রিয়তোষের কাজ ঠিকা মেয়েটা এলে পরিত্যক্ত ঘরগুলির দরজা খুলে দেওয়া, ঘর মোছার কাজ হয়ে গেলে ফের দরজা বন্ধ করে দেওয়া। পুত্ররা, পুত্রবধূরা এলে বিন্দুমাত্র অসুবিধা না হয় তিনি সেজন্য প্রায় সব সময় তটস্থ হয়ে থাকেন। বড়ো কন্যা সহ দুই পুত্র, দুই বউমা। নাতি-নাতনি গোনাগুনতি। তখন কাজের লোকই বেশি। কাজের লোকরা সকাল থেকে ব্যস্ত। তাদেরও থাকা-খাওয়া তখন এ বাড়িতে।

পুত্রদের যার যার আলাদা ঘর—দোতলা তিনতলার সব ঘরই সুনন্দা তাদের দিয়ে দিয়েছেন। এইসব করে যখন একটা ঘর এবং সামনের ব্যালকনি সম্বল করে সুনন্দার সঙ্গে প্রিয়তোষের দিন কাটছিল, তখনই অসুখটার ছোটোখাটো উপসর্গ দেখা দিতে থাকল। তিনি পাশ ফিরলে সুনন্দার ঘুম ভেঙে যায়, ঘরে হাঁটাহাঁটি করলে সুনন্দার ঘুম ভেঙে যায়। অসুস্থ মানুষের অনিদ্রা হলে আরও খিচখিচে স্বভাব হয়ে যাওয়া স্বাভাবিক। আবার মশার উৎপাত থাকায় রাতে মশারি তুলে বের হলে, মশা ঢুকলে তখন আর এক অশান্তি। আলো জ্বানিয়েও মশাটাকে খুঁজে পাওয়া যায় না। তারপর যা হয় কুপিত হয়ে পড়েন সুনন্দা। তাঁর আসকারাতেই পুত্ররা এত স্বাধীন, বউমারা খুশিমতো আসে থাকে, চলেও যায়, তিনি কিছু বলেন না, এমন ম্যাদামারা মানুষের এমনই পরিণতি হবে, বেশি কি! এসব কারণেই এই বারান্দায় শেষে তিনি তাঁর শেষ নির্বাসনে এসেছেন। অন্য ঘরে থাকাও যায় না। রাতে কখন শ্বাসকষ্ট শুরু হবে ঘুমের মধ্যে, শ্বাসকষ্ট আর কাশি, কাছাকাছি না থাকলে ওষুধ কিংবা পাফের ব্যাগ কে এগিয়ে দেয়।

সুনন্দার কাছ থেকে সরে এসেছেন ঠিক, তবে ঘুম হয় না।

এই বুঝি কাশি শুরু হল।

এই বুঝি টান উঠে গেল। যথাসময়ে সব হাতের কাছে দিলে একেবারে নিরাময়। ইচ্ছে করলেই প্রিয়তোষ আলাদা ঘরে শুতে পারেন না।

পুত্ররা সবাই কৃতী। বউমাদেরও ভালো উপার্জন। এসব সত্ত্বেও তাঁর কেন যে মনে হত বাড়ির বাইরে কেউ চলে গেলে বাড়িটা তার আরও খালি হয়ে যাবে। সুনন্দা যথেষ্ট চেষ্টা করেছেন, তিনিও। কাউকে আটকাতে পারেননি। মেনকাকেও না।

সুনন্দা আর তিনি সংসার তৈরি করেছেন ঠিক—বংশাবলিও, সবাইকে নিয়ে জড়িয়েও ছিলেন এবং সবার গতি হয়ে গেলে, তাঁর কেন যে মনে হয় রাস্তা হারিয়ে ফেলেছেন। মায়ের মৃত্যুদৃশ্যও তাঁকে তাড়া করে, এত কিছু করা, ফুল ফোটানো, বাগান আগলে রাখা, গোরু বাছুর ঢুকে না যায়, সতর্ক পাহারা—শেষে যে কী হয়, বাগানের এক কোনার মালির ঘরটিতে তিনি যেন বসে আছেন। সবাইকে তাঁর অপরিচিত মনে হয়, কোনো বীজ বপনের সাক্ষ্য নেই, সবই যেন নিজস্ব গতিতে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে।

মাঝে মাঝে মায়ের মৃত্যুদৃশ্য তাড়া করলে, তিনি দম বন্ধ করে বোঝার চেষ্টা করেন, কতটা মৃত্যুকষ্ট। শ্বাস বন্ধ করে একবার আয়নার সামনে বসেছিলেন, চোখ যে ফেটে বের হয়ে আসছে। সঙ্গে সঙ্গে শ্বাস ছেড়ে দিলে, কী আরাম, বেঁচে থাকার আনন্দ টের পান। আজকাল এই খেলাটাও তার জমে উঠেছে। এই আছি, এই নেই। সেকেন্ড মিনিটের তফাত। বেঁচে থাকতে হলে একটা কিছু তো চাই।

একদিন সুনন্দা হাউহাউ করে চিৎকার করছিল, তোমার কী হয়েছে! স্থির হয়ে বসে আছ, নিশ্বাস বন্ধ করে—এই কী করছ, তুমি কি আমাকে মেরে ফেলবে। এভাবে শ্বাসবন্ধ করে কেউ বসে থাকে!

দেখছি।

কী দেখছ?

মানে দেখছি।

মানে। মানে তোমার বের করছি। সঙ্গে সঙ্গে পুত্র-কন্যাদের ফোন করতে গেলে তিনি হেসে ওঠেন। আরে যোগাভ্যাস করছি।

যোগ্যভ্যাস।

হ্যাঁ, যোগাভ্যাস বোঝ। মৃত্যুকে বোকা বানাতে চাই।

সুনন্দা কেঁদে ফেলে।— তুমি পাগল হয়ে যাচ্ছ।

ধুস! প্রিয়তোষ তাড়াতাড়ি আয়নার সামনে থেকে সরে যান। এই আয়নার সামনে মেনকা সেজেছে, সুনন্দা সেজেছে। পুত্র পুত্রবধূরা, নাতি নাতনিরাও। তারা উড়ে যাবার পর, আয়নাটার কাজও যেন ফুরিয়ে গেছে। আয়নার সামনে এখন তিনি নতুন সাজে দাঁড়িয়ে থাকতে চান। আয়নায় তো আর কেউ মুখ দেখে না। আয়নাটাই বা কী ভাবে?

রাস্তায় বের হলেও, তাঁর সমবয়সিদের সঙ্গে দেখা হয়।

কী খবর দাদা?

তুমি কেমন আছ প্রিয়তোষ বল।

ভালো, খুব ভালো।

আমি তো তোমার মতো ভাল নেই।

শরীর গোলমাল করছে?

করলে তো বাঁচা যেত।

তবে! আপনার পুত্র-পুত্রবধূ তো সঙ্গেই থাকে। নাতি-নাতনিরাও। খুব জমিয়ে আছেন। বাজার করছেন, নাতিকে স্কুলে দিয়ে আসছেন, বংশাবলি ঠিক রাখার জন্য সব দায়ই পালন করছেন।

প্রিয়তোষের সামনে গলা নীচু করে বললেন, শান্তিরক্ষা করছি। ঘাড় ধা ক্কা দিয়ে বের করে দিলে এ বয়সে যাবটা কোথায়।

কেন, আপনার বউমা তো দেখলেই বলবে, কাকা ভালো আছেন! কী মিষ্টি কথাবার্তা। আপনার কথাও খুব বলে।

প্রিয়তোষের সময়বয়সি মানুষটি হাসলেন। তারপর আরও গলা নামিয়ে বললেন, পাহারাদার। এত কষ্টের বাড়ি, পুত্র কৃতী, পুত্রবধূ কৃতী, আমি ভাই গোলাম।

গোলাম ভাবলেই গোলাম। বংশাবলি ঠিকঠাক রেখে যেতে হলে এটা শেষ বয়সের বোনাস ভেবে নিন দাদা।

তিনি কেমন বিরস বদনে বললেন, তোমার বউদি গত হয়েছেন। এখন বাড়িতে সারাদিনই একা। কে কী খাবে সবই ঠিক রাখতে হয়। নাতিরাও অর্ডার করবে, আমার যে কি খারাপ লাগে প্রিয়তোষ! খাওয়ার টেবিলে কেউ থাকে না। থালা বাটিতে সব পড়ে থাকে খেলে খাও, না খেলে ফেলে দাও।

বউমা কী করে?

টিভি দেখে।

খাই, আর চোখের জল ফেলি। কোথায় এসে উঠলাম প্রিয়তোষ। তুমি তো ভালোই আছ দেখছি প্রিয়তোষ।

যোগাভ্যাসের ফল।

বউমা কেমন আছে?

ওর শরীরটা জুতের নেই দাদা। ওকে বলেছিলাম, যোগাভ্যাস করতে। আমাকে দাদা তেড়ে এল। বলে কি না তুমি পাগল হয়ে যাচ্ছ।

প্রিয়তোষ বুঝতে পারেন এই বয়সটাই খারাপ। কিছু করার থাকে না। তবু সুনন্দা আছে বলে, তিনি সারারাত তন্দ্রার মতো বিছানায় পড়ে থাকতে পারেন। সুনন্দাকে নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হয়। হাতের এই কাজটা এখনও আছে বলে তিনি একেবারে একা হয়ে যাননি।

সুনন্দা অসুখে ভুগে ভুগে খিটখিটে স্বভাবের হয়ে গেছে। সুনন্দার জরাব্যাধির জন্য তিনিই যেন দায়ী। সারাজীবন আঠার মতো লেগে থাকা, আর এখন আঠা আলগা হয়ে যেতেই যত নষ্টের মূলে নাকি তিনি।

পুত্রকন্যাদের দোষ দিয়েই বা কী লাভ!

এই যে একা হয়ে যাওয়া, কারও সময়ই হয় না একবার উঁকি দিয়ে দেখার, তারাও যে অসহায়, সারাদিন কাজের মধ্যে লড়ালড়ি চলছে, তাদেরও যে চাই বংশাবলি, কেউ সঁতার শিখছে, কেউ গান, কেউ নাচ, স্কুলের পড়াশোনার চাপও তো কম না—একেবারে ল্যাজেগোবরে অবস্থা, তাদের উঁকি দিয়ে দেখার সময় নাই থাকতে পারে। এই উঁকি দিয়ে না দেখার ক্লেশ সুনন্দার থাকতেই পারে! পুত্রদের মানুষ করতে গিয়ে তারও কম হ্যাপা পোহাতে হয়নি—তিনি বোঝেন। কাজের লোকেরা তো খটাখটি লাগিয়ে দিয়ে মজা দেখত। এখন তারাই বাড়িটায় প্রায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করে ফেলেছে। নিজের মানুষ দূরে সরে গেছে, দূরের মানুষ কাছে এসে গেছে। মেনকা চলে না গেলে, সেও তার মাসির জন্য প্রাণপাত করতে পারত—এসব ভাবলেই তিনি শুনতে পান—

এমন মেরুদণ্ডহীন লোক আমি আর কোথাও দেখিনি বাপু। কাউকে কিছু বলবে না।

তিনি খাটে চোখ বুজে পড়ে যাচ্ছেন।

সারাদিন, সুনন্দার অভিযোগ।

সংসার অসার তোমার জন্য।

এমনিতেই অনিদ্রায় ভোগেন, তারপর সুনন্দার অভিযোগ শুনলে, ঘুম আর আসেই না।

এই যে মেনকা রাস্তার মেয়ে হয়ে গেল। এতবার দেখা হল, বলবে তো, তোর মাসিমা তোকে যেতে বলেছে। মেয়েটা আমাকে কি ভালোবাসত!

তিনি শুয়েই আছেন।

তোমার আয়া ফ্লাস্কে একটু গরম জল পর্যন্ত রেখে যায়নি। কতক্ষণে যাবে।

তিনি শোনেন, তারপর উঠে নীচ থেকে গ্যাস জ্বালিয়ে গরম জল করে আনেন।

ফের, চোখ লেগে আসে। তন্দ্রায় আচ্ছন্ন হন।

আরে ঘুমোচ্ছে নাকি! রাতের ওষুধ কোথায়?

ফের আরে ঘুমোচ্ছে নাকি, মশা ঢুকে গেছে মশারিতে।

এই করে তাঁর তন্দ্রা লেগে আসে। আবার ভেঙেও যায়।

শেষে তিনি চোখ বুজে ব্যালকনির খাটে পড়ে থাকেন, আর ভাবেন—এত কষ্টের সংসার, সব ফাঁকা— শেষে সত্যি তিনিও যে কোথায় এসে উঠলেন। যোগাভ্যাস ফের শুরু করবেন নাকি। যোগাভ্যাসে শরীর এবং মনের উন্নতি হয়।

সুনন্দার মশারি খুলে, মশারি ফের টানিয়ে বারান্দা অন্ধকার করে যোগাভ্যাস শুরু করে দিলেন। সেই পালতোলা নৌকার মতো মায়ের মৃত্যুদৃশ্য ভেসে যাচ্ছে। অশেষ যন্ত্রণায় অস্থির। ঘোরের মধ্যে থাকা মানুষ হাওয়ায় যেন ভেসে যাচ্ছে। সাদা চাদরে মুখ ঢাকা— দূরে অনেক দূরে চলে যাচ্ছে সেই দৃশ্য। এক দুই পাঁচ সাত এবং এভাবে যোগাভ্যাস শুরু করলে সেই কষ্ট এবং যা নিদারুণ এবং অশেষ। দমবন্ধ করে বসে থাকা, অর্থাৎ মৃত্যুর সময় শ্বাস খাটো হয়ে আসে, মগজের আলো নির্বাপিত হয়। হৃদযন্ত্রটিও বিকল হয়ে যায়, মৃত্যুর এইসব আবদার রক্ষা করা যে কত বড়ো কঠিন, যোগাভ্যাসে টের পান।

এভাবে এক রাতে সম্ভবত কৃষ্ণপক্ষই হবে, শেষ রাতে পুবের আকাশে কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ দেখতে পেলেন তিনি। ভাঙা চাঁদ, নীল আকাশ, কখনো মেঘের ওড়াউড়ি, আর অজস্র নক্ষত্রের ভিতর চাঁদ, ভাঙা চাঁদ টুকরো হয়ে গেছে, কিংবা ক্ষয় পেতে পেতে অমাবস্যার অন্ধকারে তাঁর জানলায় উঁকি দিয়ে গেল—

কি হে প্রিয়তোষ যোগাভ্যাসে বসেছ।

আজ্ঞে না, শুয়ে আছি।

মিছে কথা বলছ, পদ্মাসনে বসে আছ, আর বলছ কি না শুয়ে আছ? তোমার কি সত্যি মাথা খারাপ হয়ে গেল?

কী করব, ঘুম আসে না, গোপনে যোগাভ্যাস , কেউ দেখে ফেললেই হা হা করে ছুটে আসে। ভোররাতের দিকটা সুবিধা, কেউ জেগে থাকে না। জোরে কথা বলে না। সুনন্দার ঘুম ভেঙে যাবে। তিনি টের পেলে আমার মাথা চিবিয়ে খাবেন। তাকে ফেলে পালিয়ে যাওয়ার সাহস হয় কী করে? তোমার আর গোয়েন্দাগিরি না করলেও চলবে চাঁদু।

দম বন্ধ অবস্থায় বেশি কথা বলা যায় না। কতক্ষণ আর নিশ্বাস আটকে রাখা যায়! মৃত্যুকষ্টকে সহজ করে নেবার এই প্রক্রিয়াটুকু পর্যন্ত ধরা পড়ে গেলে তাঁর রাগ হয়। ভোস করে নাকে মুখে শ্বাস বের হয়ে এলে তিনি টের পান খুবই ঘেমে গেছেন।

তবু যেন কত দিনের সখা, সেই শৈশব থেকে— ক্ষয়ে যাওয়া চাঁদেরই বা দোষ কি!

বলল, কেমন আছ প্রিয়তোষ?

ভালো না। তোমার মতোই পরিণতি।

সেই ক্ষয়ে যাওয়া চাঁদের সঙ্গে কথাবার্তা শুরু হলে যা হয়, ফের প্রিয়তোষ বললেন, আর তো মেরে কেটে পাঁচ-দশ বছর। পূর্বপ্রস্তুতি বলতে পার।

পাঁচ-দশ বছর ভাবছ কেন প্রিয়তোষ? আজ এই মুহূর্তে যদি হয়।

প্রিয়তোষ বললেন, না না সে হবে কেন?

চাঁদের মুখে অস্তমেদুর হাসি।

কেউ যেতে চায় না হে প্রিয়তোষ—যতই ঘুম হোক না হোক বিছানায় পড়ে থাকতে ইচ্ছে হয়। তোমার বয়সে কেউ আর ভালো থাকে না। তোমার ভরা কোটাল শেষ। জীবনের শেষ কোটালের জন্য অপেক্ষা করছ—অথচ যেতে ইচ্ছে হয় না, আবার যোগাভ্যাসেও বসতে ইচ্ছে হয়। আরে এই এই করছ কি, আবার নিশ্বাস বন্ধ করে মেরুদণ্ড সোজা করে— নিশ্বাস আটকে রেখেছ! তুমি কি সত্যি মরতে চাও। আরে, ইস প্রিয়তোষ প্রিয়তোষ।

আমাকে ডাকছ!

হ্যাঁ ডাকছি শুনতে পাও না।

তারপরই এই হালকা মেঘে ছেয়ে গেল আকাশ। সামনের বাড়িঘর হাইরাইজ দালানকোঠা কোনো এক স্বপ্নবৎ দৃশ্য তৈরি করে ফেলে। শ্বাসপ্রশ্বাসের স্বাভাবিক ক্রিয়ায় শরীর সতেজ হয়ে যায়। আরাম। ভারি আরাম—বেঁচে থাকার অনন্ত ইচ্ছেরাও প্রবল ঝাঁকুনি দেয়। গাছপালায় জোনাকি ওড়ে। কুকুরের ডাক শুনতে পান, দূরে রেলের ঝমঝম শব্দ ভেসে আসে। তিনি কেমন হাবাগোবার মতো বিছানায় চুপচাপ বসে থাকেন। আকাশ এবং এই ব্যাপ্ত চরাচরের মুগ্ধতা তখনও শেষ হয়ে যায়নি তবে।

আত্মরতি

এই যাবি টুম্পা!

কোথায়?

মিডনাইট ফ্যাশান শোতে।

ওরে বাপস, এত রাতে।

তোদের ফ্ল্যাট থেকে বেশি দূর না, হেঁটেই যাওয়া যাবে। তুই আমি পালিয়ে—যাবি!

মরতে চাস নাকি।

এখন তো আমাদের মরারই বয়স রে। গেলে দেখা যাবে রবি বর্মার শরীরী নারী, রবি বর্মার বর্ণময় রোমান্টিকতা, রবি বর্মার ইশারাবাহী যৌনতা। সকালের কাগজটা দেখিসনি—শাড়ির ফ্যাশান শো—শাড়ির রং, শরীরের ওপর তার ইঙ্গিতময় বিন্যাস, খসে পড়া আঁচল উদ্ভিন্ন লাবণ্যের হঠাৎ প্রকাশ—শাড়ির ভিতর থেকে ফুটে ওঠে শরীরের উদ্ভাস—সত্যসুন্দর শাড়িতে ধরা দিয়েছেন ইবকল রবি বর্মা। কাগজেই লিখেছে রে। খবরটা পড়ার পর আমার মরে যেতে ইচ্ছে হচ্ছে রে।

যাও মরো গে। সামনে আর দু-মাসও সময় নেই পরীক্ষার—তোকে এখন মিডনাইট ফ্যাশান শোতে পেয়েছে রুবি।

আচ্ছা টুম্পা তোর ইচ্ছে হয় না হালকা শাড়ির ভিতর নিজের শরীর ভাসিয়ে রাখতে? এ শাড়ি শরীর ঢেকেও পৌঁছে দেয় শরীরের বার্তা। এ শাড়ি দর্পিত করে শরীরের ইচ্ছা। এ শাড়ি আবরণ নয়—মধ্যরাতে এ-শাড়িই নারী শরীরের উদ্বোধন, আমি কাগজ থেকেই তোকে পড়ে শোনাচ্ছি রে—আহা কী সুখ, নারীর শরীরকে উত্তীর্ণ করবে উৎসবে। ভারতের টপ মডেলরা হাঁটবেন উৎসবের কোহলসিক্ত ক্ষীণ সরণিতে—রজনী উদ্দীপ্ত আঁচল কখনো উড়বে, খুলবে, খসবে। আলোর মোহময় উদ্ভাসে কখনো চমকে উঠবে অন্তর্বাসের মৃদুভাস উচ্চারণ। শুনছিস তো, কাগজে লিখেছে। কাগজ থেকে পড়ে শোনাচ্ছি। কি রে যাবি! চল না বাবা।

থাম তো রুবি। বাড়িতে টিভি দেখিস না?

কি রে কথা বলছিস না কেন। ফোনটা এত ঘ্যাস ঘ্যাস করছে কেন?

টিভিতে দেখা আর শোতে দেখা এক কথা বল—রবিবারের পাতাটা খুলে দ্যাখ, বিনোদিনী রাধা উলঙ্গ হয়ে শুয়ে আছে। মাথা খারাপ করে দেয়। আমি একটা ন্যুড আঁকছি। পুরুষ মানুষের।

আমি কি বিনোদিনী রাধার চেয়ে দেখতে খারাপ।

কে বলেছে খারাপ। তুই আরও সুন্দর টুম্পা। ভেসে যাওয়া হালকা মসলিনে তোকে জড়িয়ে দিলে তোর নগ্ন শরীরও আশ্চর্য এক শিল্পির আঁকা ছবি হয়ে যাবে।

তুই অসম্ভব নগ্ন থাকতে ভালোবাসিস রুবি। অলকদাকে বল না এঁকে দেবে তোর ন্যুড। বিনোদিনী রাধার চেয়েও তোকে সুন্দর দেখাবে। স কাল বেলায় তোর এত খারাপ খারাপ কথা বলতে ভালো লাগে!

মারব টুম্পা। একদম বাজে কথা বলবে না। অলকদা তোমার আমার মতো বসে নেই। রেবাদির সঙ্গে চুটিয়ে প্রেম করছে।

তাতে কি হল। অলকদাকে তো তুই ভালোবাসিস। অলকদার ছবির এগজিবিশানে কী ন্যাকামিটাই না করলি।

কী মিছে কথা। তুই কী রে! অলকদা রেবাদি উটিতে বেড়াতে গেছে। অলকদাকে রেবাদি ছাড়া ভাবাই যায় না। অলকদাকে দিয়ে ন্যুড আঁকাতে যাব কেন! ও কি আমাকে আর ভালোবাসে। ভালো না বাসলে নগ্ন হওয়া যায় বল।

রাখ তো বাজে কথা, স কালবেলায় তোর মাথায় কি ঢুকেছে বল তো রুবি। এত আজেবাজে বকছিস। আমার জেরক্সগুলি করিয়েছিস?

তুই কবে আসবি? আজই আয় না। কগজে বিনোদিনী রাধা, আমি তুই, ওফ যা জমবে না! জানিস আমার ছোটোকাকা এসেছেন। তুই তো চিনিস।

আমি কাউকে চিনি না—চেনার দরকারও নেই। টি কে-র নোটগুলো তোর কাছে আছে?

সব আছে টুম্পা। তোকে কতদিন দেখি না রে। আয় না, দু-জনে দুপুরে খেয়ে জড়াজড়ি করে ঘুমাব। আসবি। হালকা মসলিনে আমরা বিনোদিনী রাধা হয়ে যাব। কুয়াশায় ভেসে যাব।

আসলে রুবি এবং টুম্পার এখন উড়ে বেড়াবার বয়স বলা যেতে পারে, আবার উড়ে বেড়াবার বয়স নাও বলা যেতে পারে। নিজেরা নিজেদের নিয়ে অদ্ভুত মজা করতে তারা ভালোবাসে। কিছুটা উচ্চবিত্ত পরিবারের বলা যায়, তবে মধ্যবিত্ত মূল্যবোধও তাদের কম

না। দু-জনের মধ্যে নিবিড় বন্ধুত্ব এবং অদ্ভুত সব ইচ্ছের কথা অনায়াসে তারা একজন আর একজনকে বলতে পারে।

এমনকী স্বপ্ন দেখলেও এবং স্বপ্নটা যদি শরীর নিয়ে হয় এই যেমন, টুম্পা প্রায়ই স্বপ্ন দেখে সমুদ্রে ভেসে যাচ্ছে। একজন পুরুষ সঙ্গীও সমুদ্রে ভেসে যাচ্ছে। জ্যোৎস্না রাত এবং বড়ো বড়ো ঢেউ—শরীর হালকা, সায়া শাড়ি ব্লাউজ গায়ে না থাকলে শরীর তো হালকা হবেই এবং সে দেখতে পায় একটা দ্বীপ, দ্বীপে পুরুষটি তাকে পাঁজাকোলে করে হেঁটে যাচ্ছে, তারপর বালিয়াড়ি সে এবং পুরুষটির মধ্যে যদি কোনো রমণের ছবি থাকে তাও রুবিকে টুম্পা অকপটে বলে যাবে— টুম্পার একটাই কষ্ট, পুরুষটির মুখ সে চিনতে পায় না। এই আত্মপ্রকাশের মধ্যে কোনো অশিষ্টতা আছে তারা মনে করে না।

স ক্কাল বেলায় এত ফাজিল কথা বলতে পারিস! তুই কী রে রুবি। হালকা মসলিন পাব কোথায়। সুতরাং এ-সব ফাজিল কথা ছেড়ে আসল কথায় আসা যাক—আসলে মেয়েরা যেমন হয় আর কি।

গল্পটা বর্ষাকাল দিয়ে শুরু করলেই বোধ হয় ভালো হয়। এই আকাশ ঝকঝকে তকতকে, এই মেঘ বৃষ্টি, বর্ষার আকাশের মতোই দুই বন্ধুর প্রীতি এবং সৌন্দর্য, কেমন এক অমায়িক রূপও অনুধাবন করা যায়— ওদের কোনো অলকদাও নেই রেবাদিও নেই। সব বানানো, রুবি ন্যুডও আঁকে না, আসলে সে ছবিই আঁকে না তবু তারা দু-জনেই সুযোগ পেলে একসঙ্গে বের হয়, রবিঠাকুরের জন্মদিনে শুচিশুদ্ধ হয়ে জোড়াসাঁকো যায়, কিংবা বাংলা আকাদেমিতে কবিতা পাঠের আসরেও শ্রোতার ভূমিকা পালন করে, কোনো কবি সুপুরুষ হলে দুই বন্ধুতে ঠাট্টাতামাসা করতেও ভালোবাসে—দারুণ কবিতা, গালে রেশমের মতো দাড়ি—আজকে কবিকে আমি রেহাই দিচ্ছি না। সঙ্গে সঙ্গে রুবিও বলবে, আমিও না। যা হয় হবে।

এ মা, তুই কী রে! আমার পছন্দের জিনিস তুই চুরি করবি। আমি তাকে রেহাই দিলে তোর কি সুবিধা হয়! ঠিক আছে আমি দেখি আর কাউকে পাই কি না। একমাত্র বিনোদিনী রাধার আশ্চর্য সুন্দর চিত্রশিল্পটি ছাড়া এ-গল্পের আর কোনো সারবত্তা নেই।

আসলে রুবির এ-সবও ফাজিল কথা—অথবা বলা যায় কথার কথা, মেট্রোতে ভালো বই থাকলে তারা একসঙ্গে দেখে, এমনকী বেড়াতে যদি যায় কেউ কারও বাড়িতে—নিজের নিজের ঘরে টিভি চালিয়ে ইংরেজি অর্ধ-উলঙ্গ বই তারা দেখে, তবে কেউ দরজায় নক করলেই উঠে যায় এবং চ্যানেল পাল্টে ডিসকভারিতে এসে যায়, আসলে পড়াশোনার চাপ যথেষ্ট, তাই একটু সময় নিয়ে খেলা—আসলে গল্পটা কেন যে শুরুই করতে পারছি না —বুঝছি না, এমন দু-জন অকপট মেয়েকে যদি কোনোদিন কোনো পাহাড়ে কিংবা

সমুদ্রতটে দেখে ফেলা যায়—তবে তাদের কথা কী-ভাবে যে প্রকাশ করা যায়, এই সব ভেবেই যখন কলমের ডগায় দুই সুন্দরী ভেসে যায় তখন তাদের খারাপ ভাবতে আমার একদমই ভালো লাগে না—গল্পটা যদি এ-ভাবে শুরু করি—

আহা কী বৃষ্টি!

বর্ষার বৃষ্টি এই আসে এই যায়। রুবি এমন সুন্দর একটি চিত্রশিল্প নিয়ে অপেক্ষা করছে সে একা বাড়িতে থাকে কী করে! বের হবার সময় টুম্পার মনেই হয়নি শেষে সারাদিনই তাকে বৃষ্টি তাড়া করবে।

বর্ষার বৃষ্টি এই আসে এই যায়।

বাড়ি থেকে বের হবার সময় টুম্পার এমনই মনে হয়েছিল। রবিবারের পাতায় বিনোদিনী রাধার হালকা অনাবৃত ভেসে যাওয়ার ছবিটা সেও দেখেছে—তবে একা, কেন যে সে রুবির অনুরোধ অগ্রাহ্য করতে পারেনি। দু-জনে একসঙ্গে বসে দেখার মজাই আলাদা।

সে বৃষ্টি মাথায় বের হয়ে পড়েছে। বৃষ্টি কিংবা নরম রোদ অথবা বিকেলের ঘোর অন্ধকারে ছাতা মাথায় মেয়েদের এমনিতেই বড়ো রহস্যময়ী মনে হয়। যেন ঘাস ফুল পাখির মতো তারা ঝড়ের বাতাসে উড়ে যাচ্ছে। বাড়ি থেকে বের হবার সময়ও টুম্পার মনে হয়েছিল বর্ষার বৃষ্টি এই আসে এই যায়। রাস্তায় বের হলেই বৃষ্টি উধাও হয়ে যাবে। কারণ মেঘ পাতলা। সূর্য মেঘের ফাঁকে দু-একবার যে উঁকি মারেনি তাও নয়। কেন যে মনে হয়েছিল, এবারে রোদ উঠবে— গানের স্কুল হয়ে রুবির বাড়ি যাবে। রুবি কী এক গোপন সৌন্দর্য তার ঘরে লুকিয়ে রেখেছে, সে গেলে দু-জনে বিকেলের আকাশ দেখতে দেখতে সেই দৃশ্য এবং মগ্নতা দু-জনে নিবিষ্ট হয়ে খুঁজে বেড়াবে। কাগজে বিনোদিনী রাধার ন্যুড ছবিটা রুবি তার আলমারিতে লুকিয়ে রেখেছে। রুবির এক কথা, একা দেখতে ভালো লাগে না, তুই এলে দারুণ মজা হবে। নাভির ঠিক নীচটায় হালকা সোনালি রঙের গভীরে হিজিবিজি কি সব দাগ। স্পষ্ট নয়, আভাসে বিস্তীর্ণ মাঠের মতো ছবিটা শাড়ির হালকা আরামবোধে জড়িয়ে আছে। তুই আসবি তো!

এত আশা নিয়ে বসে আছে রুবি, বৃষ্টি বাদলা যাই হোক, আর বসে থাকা যায় না। বর্ষার সৌন্দর্যই আলাদা। গভীর এক মন্ত্রমুগ্ধ দৃশ্যকাব্যের মধ্যে যেন ঢুকে যাওয়া—সে রাস্তায় নেমে বুঝল, বৃষ্টিটা আজ ভোগাবে।

রুবির দাদা সুযোগ পেলেই আড়ালে তাকে দেখে। সেও দেখে। চোখে পড়ে গেলে দু-জনেই কেন যে চোখ নামিয়ে নেয়। আর ভাবে এই তোমার দাদাগিরি! রুবির একটুকু দেরি হলে ধমকাও, কোথায় গেছিলি! এত দেরি। কোথায় যায়, যেতে চায়, বোঝ না।

রুবিকে নিয়ে তোমার এত দুশ্চিন্তা। কী যে ভাব, তাও যদি সে কোনো তার পুরুষ বন্ধুর সঙ্গে ঘুরত। আমরা তো পুরুষ বন্ধু খুঁজছি—সিনেমা নাটকে কবিতাপাঠে কোথায় না। দুর্গোৎসবের মণ্ডপে মণ্ডপে— শুধু ওই একজনের আশায়। সে যে আমার সঙ্গ নিয়েছে। যখনই একা নির্জনে বসে থাকি, সেও এসে যায়। তাকে ছাড়া একদণ্ড সময় কাটে না, ভেবেই টুম্পা কেমন ব্যঙ্গ করে ঠোঁট উলটাল। ভিড়ের বাসে কেউ না আবার দেখে ফেলে —সে নিজের মনেই হাসছে, এত কী আশ্চর্য গোপন অভিসার তোর কাগজের পাতায় রুবি। কী আবিষ্কারের জন্য এমন পাগল হয়ে উঠেছিস রুবি।

বাড়িতে টুম্পার এমনিতেই আজকাল কেন যে মন টেকে না। কেমন একঘেয়েমি, ছুতোয় নাতায় সে বাড়ি থেকে বের হয়ে পড়তে চায়। আর বের হলেই কেমন এক হাঁফ ধরা জীবন থেকে যেন তার মুক্তি মেলে।

মাকে বাবাকে মিছে কথা বলতেও আটকায় না—এই যাচ্ছি, ছোটোকাকার বাসায়।

মাঝে মাঝেই সে যেমন রুবির বাড়িতে যায়—ছোটোকাকার বাড়িতেও যায়। কোথাও তার আকর্ষণ না থাকলে সে যায় না।

ছোটোকাকার বাড়িতে সে কেন যায় বোঝে। সেখানে তার একজন মামা আছেন। পদার্থবিজ্ঞানের জাঁদরেল ছাত্র। গবেষণা না কি মুণ্ডু ঘরে বসে সারাদিন দরজা বন্ধ করে চালিয়ে যাচ্ছে। দরজা খুললেই দেখতে পায় এক গাদা বই-এর মধ্যে ডুবে আছেন। তাকে দেখলেই বালকের মতো খুশি হয়ে ওঠেন তিনি। তবু সম্পর্কে মামা বলেই গম্ভীর চালে কথাবার্তা বলেন— তার পরীক্ষার প্রিপারেশান নিয়েই কথাবার্তা বেশি, সে গেলে গবেষণার চেয়ে এই দূর সম্পর্কের আত্মীয়াটির প্রতি যে ক্রমশই বেশি আগ্রহ বোধ করছেন, টের পায় টুম্পা। যতই নির্দোষ আলোচনা হোক, টুম্পা তার শাড়ি সামলাতেই ব্যস্ত থাকে।

বাসটা যাচ্ছে।

বাসের ভিড়ও বাড়ছে।

ঠোঁটে তার আবার মজার হাসি ফুটে উঠছে। একবার পরীক্ষায় বসলে হত। আজ পর্যন্ত একজন পুরুষ মানুষকেও বাজিয়ে দেখা হল না। এই শারীরিক পরীক্ষা আর কি। কেউ বাসায় নেই। সে গিয়ে যদি কোনোদিন একা আবিষ্কার করে ফেলে মামাকে, তখন তাঁর আচরণ কেমন হয় এমন কোনো পরীক্ষায় যদি মানুষটাকে ফেলে দেওয়া যায়। ইচ্ছে করলে মানুষটার ভালোমানুষের জারিজুরি নিমেষে হাওয়া করে দিতে পারে।

সে যায় সেই কারণে।

মগজে তাঁর এই সব ছবিই বেশি ভাসে। এই সব অলস ভাবনায় সে তাড়িত হয় বলেই ঘরে তার মন টেকে না। রুবির কাছে যাওয়া এই গোপন অভিসারেও মজা কম না।

কাগজের একটা ন্যুড ছবি, কী আছে—বাথরুমে সে যখন নিজেকে আবিষ্কারে মত্ত থাকে তখনও শরীরে সে যে কী খুঁজে বেড়ায় বোঝে না। এত রহস্যময় শরীর নিয়ে সে যে কী করে।

তার তো বয়স বেশি না। এই কিছুদিন হল ফ্রক ছেড়েছে। ম্যাকসি পরত। বাড়িতে কোনো পুরুষ আত্মীয় এলে ম্যাকসি পরে ঘুরে বেড়ানো বাবা-মার পছন্দ না। সে শাড়ি না পরলে বাবা গুম মেরে যেতেন। তার দিকে তাকাতেনই না। তারপর কিছুদিন সালোয়ার কামিজ—তারপর শাড়ি পরতেই সে কেমন হালকা হয়ে গেল। হালকা হয়ে গেল ঠিকই, তবে চলাফেরায় অস্বস্তি। বাসে ট্রামে সালোয়ার কামিজে খুব সুবিধে। তবে তাকে নাকি শাড়িতেই বেশি সুন্দর দেখায়।

বাসটা চলছে।

বাসটা থামছে।

বাইরে টিপটিপ বৃষ্টি তেমনই পড়ছে।

কন্ডাকটার হাঁকছে, পরেশনাথের গেট।

একজন যুবক ওর পেছন দিয়ে তাকে ঠেলে বের হয়ে গেল। সে রড ধরে আছে। ঠিক যেখানে হাতে ছুঁয়ে দেখা দরকার দেখে গেছে। সে শত চেষ্টা করেও কোমর বাঁকিয়েও রক্ষা পায়নি।

সে খুবই গম্ভীর হয়ে গেল। এ কী অসভ্যতা। তখন কেন জানি সমগ্র পুরুষজাতিটাকেই ঘৃণা করতে শুরু করে। তার রাগ হয়, ক্রোধ বাড়ে— চুলের ঝুঁটি ধরে ঝাঁকিয়ে দিতে ইচ্ছে করে।

ঘাড়ে উষ্ণ নিশ্বাস পড়তেই বুঝল, আবার কেউ পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে। তার কাধের উপর দিয়ে হাত বাড়াবার চেষ্টা করছে। তা ভিড়ের বাস, ঝাঁকুনিতে পড়েটড়ে গেলে হাত পা ভাঙতেই পারে।

মেয়েদের সিটের পাশে সে দাঁড়িয়ে আছে—একটা সিটও খালি নেই।

তার পেছনে যে আবার একজন কোনো পুরুষ—পুরুষ কি নারী, সে শরীরের ঘ্রাণ থেকেই তা টের পায়। তা দাঁড়িয়ে থাকুক, অসভ্যতা করলেই মাথা খারাপ হয়ে যায়। রড না ধরে থাকলে টুম্পার আরও বেশি বিপদের সম্ভাবনা।

অবশ্য পেছনে দাঁড়ানো পুরুষটি তার যে চুলের ঘ্রাণ নিচ্ছে এটা সে ভালোই বোঝে।

এতে টুম্পার অবশ্য আপত্তি নেই।

তবে ভিড়ের চাপে একেবারে পেছন থেকে ঠেসে ধরলে সে খুবই বেকায়দায় পড়ে যেতে পারে। সুযোগ বুঝে কিছু করে ফেললেই তার মাথায় রক্ত উঠে যাবে। পুরুষজাতটাকেই বেহায়া নির্লজ্জ মনে হবে।

মাথা গরম করেও লাভ হয় না। হাসিঠাট্টা বিদ্রুপ তখন সারা বাসে। পুরুষ নারী তখন সব সমান—কেউ প্রতিবাদ করে না। বরং যেন মজা পায়।

এ-সব কারণে বাসে উঠলেই ধরে নিতে হয়, সুযোগ বুঝে যাত্রীদের রুচিমতো সে ব্যবহারযোগ্য হয়ে উঠবে।

তবে সে দেখেছে সবাই সমান হয় না।

সে এখনও বুঝতে পারছে না, লোকটার সত্যিই আর কোথাও রড ধরায় জায়গা আছে কি নেই। ঘুরে দাঁড়াবারও তার ক্ষমতা নেই। সে ঘামছে। তার সব অবয়বে ঘাম চ্যাটচ্যাট করছে। এবং শরীরের কোনা-খামচিতেও ঘাম জমে বিশ্রী গন্ধ উঠেছে কি না কে জানে!

কাজেই পেছনের লোকটা মধ্যবয়সী না যুবা, না প্রৌঢ় সে কিছুই বুঝতে পারছে না। ঘাড় ঘোড়াবারও জায়গা নেই। বাসটা বাদুড়ঝোলা হয়ে ছুটছে।

সে দেখেছে, মধ্যবয়সীরাই বেশি ইতর হয় এবং যুবকরা যতটা পারে গা বাঁচিয়ে চলে। তবে সবাই না।

টুম্পা বুঝতে পারে বয়সটারই দোষ। শরীর যেন ক-বছরে বাতাসে ফুলেফেঁপে উঠেছে।

সে বাসায় ফিরে বাথরুমে ঢুকলে এটা বেসি টের পায়। বাথরুমে নিজেকে খোলামেলা দেখার সময় টের পায় শরীরের স্পর্শকাতর জায়গাগুলো আর বাঁধ মানতে চাইছে না। কাগজে বিনোদিনী রাধার ছবিটা কী কোনো উষ্ণতার ছবি—হালকা ফিনফিনে কোনো কুয়াশায় জড়ানো। সবই অস্পষ্ট দেখা যায়, স্তন, গ্রীবা এবং নাভিমূল। নাভিমূলের দিকটাই শিল্পী আবছা রহস্যময়তায় ঢেকে দিয়েছে। ছবিটায় যে যথেষ্ট যৌনতা বিদ্যমান—এবং সে ছবিটা ইচ্ছা করলে বাড়িতেও দেখতে পারত, কারণ বাড়িতেও সেই কাগজই রাখা হয়, তবে বাবাই প্রথম কাগজটা পড়েন বলে, শেষ পর্যন্ত কাগজটা আর খুঁজেই পাওয়া যায় না—তিনি বোধ হয় চান না, টুম্পার নগ্ন ছবি দেখে মতিভ্রম হোক—কাগজগুলো যে কী করছে। পরিবারে সব বয়সের মানুষই থাকে, সবার চোখে এমন একটা উলঙ্গ ছবি খুবই দৃষ্টিকটু—অথচ সবাই চুপিচুপি ছবিটা দেখার জন্য উদগ্রীব হয়ে থাকে। রুবির বাড়িতে অবশ্য এতটা নজরদারি নেই—রুবি বড়ো হয়েছে, সে সবই বোঝে। কেবল তার বাবা-মাই মনে করে টুম্পা কিছুই বোঝে না। ভিড়ের বাসেও তার খিলখিল করে হেসে উঠতে ইচ্ছে হল।

তার বাবাটা যে কী! ন্যাকা ভাবতে পারত, শত হলেও তার বাবা, বাবাকে আর যাই ভাবা যাক ন্যাকা ভাবতে পারে না। ন্যাকা ভাবলে বাবাকে খাটো করা হয়। লুকিয়ে শেষ পর্যন্ত কাগজের সেই নির্দিষ্ট পাতাটি সে দেখেছে। বাবা পাতাটা লুকিয়ে রেখেও রেহাই পায়নি। তবে সে বিনোদিনী রাধার ছবিতে নিজেকেই আবিষ্কার করেছে। কী এমন রহস্য থেকে গেল যে রুবি ফোন করে তাকে যেতে বলেছে। দু-জনে দরজা বন্ধ করে ছবিটা দেখার এত প্রলোভনই বা কেন রুবির। বাথরুমের বড়ো আয়নায় বলতে গেলে রোজই সে নিজেকে দেখতে পায়—কেবল শরীরে তখন থাকে না কোনো মসলিনের ওড়াউড়ি। এমন নরম হালকা মসলিন শরীরে উড়িয়ে দিয়েই ছবিটার মধ্যে শিল্পী ঝিনুকের তলপেটের মতো উষ্ণতা সৃষ্টি করেছে।

সে তো যতটা রুচিসম্মত পোশাক পরা দরকার তাই পরে। এ-জন্য সে পাতলা ব্লাউজ পরে না। ব্লাউজের নীচে তার অন্তর্বাস ফুটে বের হলে লজ্জা পায়—কখনো তার নিজের বৈভব হাটেঘাটে ফিরি করার স্বভাব নয়। তবু কেন যে মনের মধ্যে কোনো প্রিয় যুবকের মুখ ভেসে উঠলেই বড়ো বেশি কাতর হয়ে পড়ে।

পেছনের লোকটার চাপ ক্রমশ ভারী হচ্ছে। রড ধরে দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না। মুখ না ঘুরিয়েই সে বলল, একটু সরে দাঁড়ান।

সে তার পাছা সরিয়ে নেবারও চেষ্টা করছে। লোকটা কী উজবুক!

আর একটু সরে দাঁড়াতে বলায় মহিলাদের মধ্যে মুখ চাওয়াচায়ি চলছে। টুম্পা মহিলাদেরও তখন কেন জানি নষ্ট চরিত্রের মনে না করে পারে না। এই সামান্য কথায় মুখ টিপে হাসার কি যে হল—সিটে বসে যেতে পারলে পরের সুবিধে অসুবিধার কথা কেউ আর ভাবে না। তারপর কেন যে মনে হল সরে দাঁড়ানোর কথা তার উচ্চারণ করা ঠিক হয়নি। সরে দাঁড়াবেটা কোথায়! বাসে একটা সুচ রাখার পর্যন্ত বুঝি জায়গা নেই।

রড ছেড়ে দিলে লোকটা হয়তো পড়েও যেতে পারে। আবার নাও পড়তে পারে। রড না ধরলেও এত বেশি ঠেস দেওয়া আছে যে লোকটা ঝাঁকুনিতে অনড়ও থাকতে পারে।

ভিড়ের বাসে এই এক জ্বালা।

হাতের ব্যাগটি অবশ্য তার বড়ো সম্বল। স্পর্শকাতর জায়গাগুলি দরকারে আড়াল করার জন্য ব্যাগ থাকলে খুবই সুবিধা। দরকারে হাতের খাতাটি বুকের মধ্যে চেপে রাখে। দরকারে কাঁধের ব্যগটি পেছনের দিকে ঠেলে দেয়। বাবা কাকা মামা মেসো সবার ক্ষেত্রেই আগ্রহটা যে একরকমের সে বোঝে। দোষও দিতে পারে না। মানুষ তো! এমন ভিড়ের বাসে মেয়ে পুরুষ সবাই একসঙ্গে—এত গাদাগাদি সহ্য হবে কেন!

সে যতটা পারল পাছা ঘুরিয়ে দিয়ে আত্মরক্ষার চেষ্টা করছে।

শ্যামবাজারের মোড়ে এসে ভিড়টা পাতলা হল। তবে এখান থেকে বাসটা টপাটপ আরও কিছু যাত্রী তুলে নিল। সিঁথির মোড়ে না যাওয়া পর্যন্ত বোধ হয় তার রেহাই নেই। সিঁথির মোড়ে গেলে বাসটা প্রকৃতই হালকা হয়ে যাবে সে জানে। এর আগে স্টপে বেস্টপে গাড়ি দাঁড়াবে, প্যাসেঞ্জার তুলবে। না উঠলে ড্রাইভার গড়িমসি করবে বাস চালাতে। গালিগালাজ ওদের গা সওয়া। পাত্তাই দিতে চায় না।

কী যে রাগ হয়!

সর্বত্র এক ধরনের নির্লজ্জ আচরণের সে শিকার।

কাকে দোষ দেবে।

সে পেছন ফিরে আর না তাকিয়ে পারল না। লোকটার অর্ধেক শরীর মুখ দেখা যাচ্ছে। ভালো করে দেখা তার পক্ষেও শোভন হবে না।

'একটু সরে দাঁড়ান' বলতেই বাসের সবার কাছে সে লোকটিকে লক্ষ্যবস্তু করে তুলেছে। বেশি কিছু বলে লোকটিকে আর অপ্রস্তুতের মুখে ফেলতে চায় না। হয়তো লোকটির বিন্দুমাত্র সরে দাঁড়াবার জায়গা ছিল না।

প্যাচপ্যাচে গরমে সে অনবরত ঘামছে আর মুখ ঘাড় গলা রুমালে মুছে নিচ্ছে।

আর তখনই সামনের স্টপে মোটকা মতো মহিলাটি প্রায় দু-জনের মতো জায়গা ফাঁকা করে নেমে গেল। টুম্পা টুক করে বসে পড়ল।

সে চোখ তুলে তাকাল।

আরে রুবির ছোটোকাকা যে। ছিঃ ছিঃ কী না মনে করল।

সে তো রুবির ছোটোকাকাকে চেনে।

রুবিদের বাড়ি রথতলায়। রুবির জন্মদিনে সে তার ছোটোকাকাকে দেখেছে। লাজুক প্রকৃতির মানুষ। এমনকী রুবি তাকে তার ছোটোকাকার ঘরে নিয়ে গিয়ে আলাপ করিয়ে দিলেও তিনি তাকে চোখ তুলে দেখেননি।

রুবিই বলেছিল কাকা তার মিলিটারির ডাক্তার। শর্ট কমিশনে ছিলেন, পারমানেন্ট কমিশনে যেতে রাজি হননি। চাকরিটা বোধ হয় তার পছন্দ হয়নি। এখন ভাবছেন, এখানেই চেম্বার খুলবেন। কত বয়স মানুষটার!

আর এক বার দেখবে নাকি চোখ তুলে।

ত্রিশ পঁয়ত্রিশ। কমও হতে পারে। আবার বেশিও হতে পারে।

সে তো বাইশ।

ইস কী যে সব ভাবছে। তার নিজের মধ্যেই এক অদ্ভুত দ্বৈত সত্তা পুরুষের জন্য ক্রিয়া করতে থাকে। বয়সের ফারাক নিয়ে মাথা ঘামাতে কেমন সংকোচ বোধ করছে। একদণ্ড আগে কত কুৎসিত চিন্তা মানুষটি সম্পর্কে। একদণ্ড পরে রুবির কাকাকে দেখার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠছে। দশাসই চেহারা, দীর্ঘকায়, পুরুষের মতো পুরুষ।

তার দিকে তিনি সেদিন ফিরেও তাকাননি।

এই আমার বন্ধু টুম্পা।

অ। হাত জোড় করে নমস্কার। সে দেখতে কেমন একবার যদি চোখ তুলে তাকাতেন। এত অহংকার।

অপমানের শোধ তুললে কেমন হয়!

সহসাই সে কেন যে বলে ফেলল— আপনি বসুন, জায়গা হয়ে যাবে।

না না, ঠিক আছে।

টুম্পা সরে বসে জায়গা করে দিতে চাইছে—কিন্তু তিনি রাজি না।

এসে তো গেছি।

তার বলার ইচ্ছে হল, এসে গেলে কি বসা যায় না। একটুক্ষণ, এই একটুক্ষণেই বড়ো মাধুর্য সৃষ্টি হয় জীবনে, সেটা কি বোঝেন!

মহিলাদের সিটে বসলে কখন না আবার উঠে পড়তে হয়— এমন লজ্জাকর পরিস্থিতির কথা ভেবেই হয়তো তিনি তার অনুরোধ রক্ষা করলেন না। সামনের দুটো স্টপের পর তারা দুজনেই নেমে গেল।

টুম্পা তো জানে রুবির কাকা কোথায় যাবেন। কিন্তু তিনি কি জানেন, সে কোথায় যাচ্ছে! শেষে না পেরে বলল, আমি রুবির বন্ধু। আপনি রুবির ছোটোকাকা না!

তাই নাকি, তাই নাকি!

যেন সে একটা বাচ্চা, বড়ো আদুরে গলায় তাই নাকি তাই নাকি বলতে বলতে নিজের ঘরে ঢুকে গেলেন।

রুবি দৌড়ে এসে কাকার ঘরে উঁকি দিয়ে বলল টুম্পাকে কোথায় পেলে?

ওর নাম বুঝি টুম্পা, কোনো আগ্রহ নেই। বাইশ বছরে যুবতীর পক্ষে এটা যে কত বড়ো অসম্মানের অথবা বড়ো অপমানও বলা যায়, টুম্পা রুবির ঘরে বসে সব শুনে ক্ষোভে জ্বলছিল।

রুবি ঘরে ঢুকে বলল, কি রে টুম্পা, তোর মুখ গোমড়া কেন রে!

কী করে বুঝবে ভিতরে কত জ্বালা তৈরি হয়—এত অবহেলা— একটু আলাপ পর্যন্ত না। এত বড়ো মহাপুরুষ তুমি, আসলে সে যে এই মানুষটার খোঁজেই এসেছে—আমার ছোটোকাকা বাড়ি এসেছে শুনেই সে কেন যে ক-দিন থেকে অস্থির ছিল। কোনোও অজুহাতে একবার ঘুরে এলে হয়, বিনোদিনী রাধার ছবি দেখা একটা অজুহাত ছাড়া কিছুই নয়, দু-জনে একসঙ্গে বসে দেখার মজা, কত আর মজা, এ তো বারবার নিজের শরীরকেই দেখা— বিনোদিনী রাধার প্রায় উলঙ্গ শরীর যতই মসলিনে জড়িয়ে জ্যোৎস্নায় ভেসে থাক— সে তো বোঝে এ-শরীর তারই—সব নারীর।

রুবি দু-কাপ চা নিয়ে বসল তার পাশে—

সেন্টার টেবিলে চা রেখে বলল, এক্ষুনি দেখবি না পরে।

টুম্পা কিছু বলছে না।

কি রে, হলটা কি!

সে বলল, আমি উঠব রুবি।

তোর শরীর খারাপ!

জানি না।

জানিস, ছোটোকাকা না লুকিয়ে ছবিটা সকালে বারবারই উলটেপালটে দেখেছে। কারও চোখে না পড়ুক, আমি ঠিক টের পেয়েছি।

টুম্পা আরও কেন যে অস্থির হয়ে উঠল।

এই চল।

কোথায়!

আমাকে একটা ট্যাক্সি ধরে দিবি।

এই তো এলি! চল ছোটোকাকার ঘরে। কথা বলবি।

তোর ছোটোকাকা কি মহাপুরুষ!

মহাপুরুষ হতে যাবেন কেন। তোর কথা খুব বলে। এবারে ফিরেই বলেছে, তোর বন্ধুর খবর কি রে, ও আর আসে না।

কেমন এক আশ্চর্য স্নিগ্ধতায় তার শরীর মন ভিজে গেল। নিজের ভিতরেই সে গলে যাচ্ছে—বিনোদিনী রাধার ছবিতে কি তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন। ভিতরে সে সত্যি উষ্ণ হয়ে উঠছে।

তবু কি যে হয়, বের হবার মুখে টুম্পা দরজায় উঁকি দিয়ে বলল, যাচ্ছি। আমি বুঝে কিছু বলিনি।

তোমার দোষ হবে কেন। ভিড়ের বাসে সত্যি তো তোমার কষ্ট হচ্ছিল। আমারও উপায় ছিল না। একবার ভাবলাম নেমে পড়ি, ভিড় ঠেলে নামাও যে কঠিন।

টুম্পা বলল, যাই।

তিনি তাকে এই প্রথম দু-চোখ মেলে দেখলেন। আশ্চর্য রোমান্টিক চোখ। পৃথিবীর তাবৎ সুধারসে যেন তিনি উপচে পড়ছেন। চোখের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা কঠিন। তিনি যে তার অন্তর্বাস ভেদ করে সব দেখে ফেলছেন বুঝতে এতটুকু অসুবিধা হয়নি।

বাড়ি ফিরে টুম্পা আরও অস্থির হয়ে পড়ল—কেন যে মনে হচ্ছে, তিনি এখনও বোধ হয় লুকিয়ে সেই নগ্ন ছবিতে ডুবে আছেন। শিল্পীর আঁকা সেই মুগ্ধতায় ডুবে যাওয়া ছাড়া তাঁর বোধহয় উপায়ও নেই। মানুষ তো শরীর নিয়েই বাঁচে। মানুষটার কথা যত ভাবছে তত উতলা হয়ে উঠছে।

সে ভালো করে খেতে পারল না পর্যন্ত।

বাবা ফিরে এসে দেখলেন সে শুয়ে পড়েছে। সে শুনতে পাচ্ছে। টুম্পার কি শরীর খারাপ? কি জানি! মা-র কথাবার্তায় অবজ্ঞার সুর।

দরজা বন্ধ করে না শুলে বাবা হয়তো ঘরে ঢুকে কপালে হাত দিতেন। অসময়ে শুয়ে পড়লে বাবা যে ঘাবড়ে যান কেন এত, সে বোঝে না।

তার বড়োই অসময়।

আবার সুসময়ও। কেন যে সব ভেসে যাচ্ছে।

কিন্তু কেউ তো জানে না, সে একেবারে অবিন্যস্ত হয়ে শুয়ে আছে। সে ক্রমশ অতলে ডুবে যাচ্ছিল। হাতড়ে হাতড়ে নিজেকে খুঁজছে, নিজের মধ্যে।

মণিমালা

তপোময়ের লেখালিখি মাথায় উঠেছে। কিছুই লিখতে পারছেন না। কিছুটা হতাশাও। বয়স হয়ে গেলে এমনই বুঝি হয়। গত তিন-চার মাসে তিনি একটা লাইনও লেখেননি। লেখার কোনো প্রেরণা পাচ্ছেন না— প্রেক্ষিতবিহীন এক শূন্যতার মধ্যে তিনি ডুবে যাচ্ছেন। তিনি চুপচাপ বসে থাকেন জানালায়। স্ত্রী মণিমালা সব টের পায়। আবার সেই অর্থহীন দৃষ্টি। মানুষটা তার জানালায় চুপচাপ কী দেখছে। সেই এক শূন্যতার শিকার তপোময়। মণিমালার ভয় হয়।

কোথাও থেকে ঘুরে এস না!

কোথায় সেটা।

কোনো পাহাড়ে, কিংবা নদীর ধারে।

ঘুরে কী হবে! লিখতে বসলে যে শব্দই খুঁজে পায় না, শব্দরা কেমন হারিয়ে যাচ্ছে। গদ্যের প্রয়োজনে যথার্থ শব্দটি কুয়াশায় কেমন ঢেকে যায়, তুমি ঠিক বুঝবে না মণি— এই ব্যর্থতা যে কী নিঃসঙ্গতা সৃষ্টি করে! বড়ো কষ্ট হয়।

বাজে কথা রাখো তো। আসলে দিন দিন কুড়ে হয়ে যাচ্ছ। যশ প্রতিপত্তি সবই অর্থহীন মনে হলে এটা হয়।

মণি, লেখার চাপ বাড়লে আমার মাথা ঠিক থাকে না।

না লিখলেই পারো। কিছুদিন বিশ্রাম নাও। অনেক তো লিখলে, লেখার চাপে মাথা খারাপ করে বসে থাকলে শরীরের ক্ষতি, বোঝ না।

তপোময়ের মুখে কিঞ্চিৎ হাসির রেখা—এই চারপাশ, এই মানুষজন, এবং এই জীবনের কুহেলিকা তাকে কত কিছু লিখিয়েছে। নাম যশও কম হয়নি। আর কেন যে এ সময়ই এক ভীতি গ্রাস করছে তাঁকে, লেখা যদি নিম্নমানের হয়ে যায়— তার গদ্যের ভাঙচুরে যে আশ্চর্য মোহ আছে যদি তার প্রকাশ আর ঠিকঠাক না হয়! এই শব্দসমূহ যদি চরিত্রের প্রাণ সৃষ্টি করতে না পারে! তাজা এবং জীবনের ঐশ্বর্য যদি চরিত্রে ধরা না যায়— তাঁর জীবনপ্রণালী থেকে জন্মানো শব্দকণার যাবতীয় সৌন্দর্যকে তিনি যদি দক্ষ স্বর্ণকারের

মতো গেঁথে দিতে না পারেন যাতে চরিত্রটি জীবন্ত এবং শ্রীহীনতায় শ্রীময় হয়ে উঠতে পারে— কোনো এক সমালোচক যে তাঁর গল্প সম্পর্কে আরও লিখেছেন—তিনি গল্পের ছাঁচ মানেন না, ক্রাফটের ব্যাকরণেরও ধার ধারেন না— এক আশ্চর্য রোমান্টিক বোহেমিয়ানিজম কাজ করে যায় তাঁর বিবৃতিতে, মাঝে মাঝে বিবৃতির ছলনায় উড়িয়ে দেন জীবনের সব নির্ধারিত সত্যকে। বোধ হয় আঙ্গিক হিসাবে ছোটো গল্পের নিজের দেহেই রয়েছে এক অপরিমেয়তা। কোনো সংজ্ঞায়ই একে ঠিকমতো সংজ্ঞায়িত করা যায় না। এর ব্যাপ্তি বিপুল, সম্ভাবন অসীম, বৈচিত্র্যে অনন্ত। অথবা নক্ষত্রের মতো দূরাতীত রহস্যে ঘেরা এই সব গল্প সেই অনন্তকে স্পর্শ করতে চায়।

আসলে এটাই তাঁর আতঙ্ক যদি গল্পের চরিত্র সেই অনন্তকে স্পর্শ করতে না পারে। শব্দের এত আকাল, সে যে কী করে!

এই সময় সহসা একটা মুখ জানালায় ভেসে উঠল। একজন খোঁড়া মানুষ লাঠিতে ভর করে দাঁড়িয়ে আছেন। মুখ যেন খুবই চেনা। ঠিক চিনতে পারেছেন, গোপাল মামা। স্মৃতিতে গোপাল মামা হাজির হলে তার সব মনে পড়ে। তখন তো তিনি আই. এ. পাস করেছেন সবে। কলকাতায় ভেসে বেড়াচ্ছেন। আত্মীয়স্বজনের বাসায় কখনো দু-বেলা আহার জুটে যেত। চিনি কাকা, টুক্কি পিসি, ভালো কাকা, নেপাল মামা এই সব ছিল তার ঠিকানা। আত্মীয় ঠিক, তবে তাদেরও কিছুটা দারিদ্র্য আছে। একবেলা দু-বেলা থাকার পর তারই সঙ্কোচ হত। বেকার যুবকের যা হয়ে থাকে। গোপাল মামা, নেপাল মামা তার মায়ের দুই ছোটো ভাই। বরানগরের রতনবাবু রোডে, দু-জনই আলাদা থাকে— মামিরা দেখতে খুবই সুন্দরী। নেপাল মামার শিফট ডিউটি। গোপাল মামার নাইট ডিউটি, কাশীপুর গানশেলের ঝালাই-এর কাজ করে। সপ্তাহে মাইনে। ফুরনে কাজ। পঁচিশ-ত্রিশ টাকা হপ্তায়। প্রবল নেশাভাঙের অভ্যাসও আছে। কোনো সন্তান নেই।

দেশ থেকে চিনিকাকার ঠিকানায় বাবার চিঠি এল।

খোকা, তোমার গোপাল মামার চিঠি এসেছে। তুমি কোথায় থাক কলতাতায়, কী করছ, কোথাও চাকরি জোটাতে পারলে কি না, আই. এ. পাস করে বসে থাকা অন্যায়, তোমার বাবাও যে বেকার, এই সব কারণে গোপাল খুবই চিন্তিত। দিদি যে ভালো নেই, অভাবে অনটনে দুবেলা ভাত জোটানো দায়, তার আই. এ. পাস ছেলে কলকাতায় বেকার, সে বিশ্বাসই করতে পারছে না। আই. এ. পাস সোজা কথা! ফ্যাক্টরির বাবুরা আই. এ. পাস তো দূরের কথা, কেউ কেউ কোনও পাসই না। তাদের কী রোয়াব। শেষে তোমার গোপাল মামা লিখেছেন, তপাকে আমার বাসায় আসতে বলবে। আমার সঙ্গে যেন দেখা করে। আমি ফ্যাক্টরিতে চলে গেলে চানু একা থাকে। পাশের বাড়ির রতন বুড়ি অবশ্য

রাতে শোয়। এখানে এলে চেষ্টা চরিত্র করে গানশেলে ঠিক ঢুকিয়ে দিতে পারব। বাবুদের বললে তারা ঠিকই একটা ব্যবস্থা করবে।

ধীরে ধীরে কলকাতায় তাঁর আত্মীয় পরিজনের সংখ্যা বাড়ছে। এই করে গোপাল মামা নেপাল মামারও খোঁজ পাওয়া গেল। এক সকালে পিসিই তাঁকে ঠেলে পাঠালেন, যা একবার তোর মামার বাসায়। তোর পিসেমশাই সুরজমল নাগরমল অফিসে চেষ্টা তো করছে। কথাও দিচ্ছে, কিন্তু কাজ হচ্ছে না। কী করা। দ্যাখ তোর মামারা যদি কিছু করতে পারে।

ঠেলা না খেলে সে পিসির বাসা ছাড়ছে না এমন ভেবেই হয়তো সকালবেলায় ঠেলে প্রায় বাসা থেকে বের করে দিলেন পিসি।

চিনিকাকা আর ভালোকাকা ছাড়া তার আত্মীয় স্বজনরা সবাই যে বস্তিবাসী সে জানে এবং ভেবেছিল গোপাল মামা কিছুটা সচ্ছল, তাঁর বাসাবাড়িতে দালান কোঠা থাকতে পারে।

সেই জোড়ামন্দিরের নস্করবাড়ির বস্তি থেকে রওনা হওয়া গেল। পয়সার তখন খুব দাম। এক আনা দু-আনা হলে অনেকটা রাস্তা যাওয়া যায়। কিন্তু হাঁটার অভ্যাস থাকলে এক আনা দু-আনাও খরচ করতে খারাপ লাগে তার। বলতে গেলে কর্পদ শূন্য সে— জোড়ামন্দির থেকে রতনবাবু রোড হেঁটেই মেরে দেবে ভাবল।

যে কটা আনি, দু-আনি পকেটে আছে থাক। কত যত্ন, আনি, দু-আনি না আবার হারায়। জোড়ামন্দির থেকে বরানগর পর্যন্ত রাস্তাটা তার চেনা। শিয়ালদহ, শ্যামবাজার হয়ে — এতটা হেঁটে ক্লান্ত লাগছিল খুব। খিদেও পেয়েছে। বাজারের পেছনের দিকের রাস্তাটা খোঁজা দরকার। বাজার পার হয়ে বাঁদিকে কাচা সরু গলিতে ঢুকে সে হতবাক। বাড়ির কোনো নম্বর নেই। নালা নর্দমা আর দুর্গন্ধ চারপাশে। মাটির দেয়াল, টালি না হয় খাপড়ার চাল। মশা-মাছিতে ভন ভন করছে। পথ চলতি মানুষজনের বিশেষ সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। এই দুপুরের রোদে বস্তির মধ্যে কোনো আই. এ. পাস যুবা ঢুকে গেলে অস্বস্তিরই কথা। কী না কি মতলবে ঘুরছে।

কাকে চাই?

গোপাল চক্রবর্তী।

গ্যাঁজালু গোপাল, না নাড়ুগোপাল।

আজ্ঞে ল্যাংড়া গোপাল।

গোপাল কে হয় তোমার? এখন আর সে শুধু ল্যাংড়া না। গাঁজা ভাঙও খায়। হাফ সাধু।

আজ্ঞে মাতুল।

কেমন মাতুল।

মায়ের সহোদর ভাই।

সোজা চলে যাও। সামনে গঙ্গা পাবে। শ্মশান পাবে। তার পরেই স্যাঁতলা ধরা বেওয়ারিশ মন্দির। গোপাল ওটা জবরদখল করে আছে। আর গ্যাঁজা যুক্ত আলু হয়ে আছে। গ্যাঁজালো গোপাল বলেই লোকে তাকে চেনে।

শ্মশান!

শ্মশান সংলগ্ন মন্দির।

সে খুবই ঘাবড়ে গেল! গ্যাঁজা যুক্ত আলু বিষয়টা যে কী তাও বুঝল না। তার পর কি না শ্মশান সংলগ্ন মন্দির। যত দূর চোখ যায় সার সার বস্তি তার পর আমবাগান, তার পর নদীর জল, তার পর মানুষপোড়া গন্ধ। খালি পেটে তার কেমন ওক উঠে আসছিল।

২

নদীর পাড়ে বাড়ি।

শ্মশান লংলগ্ন বাড়ি তো নয়ই, বরং আমবাগানের এক কোনায় মন্দির এবং বাড়ি।

ঠিক বাড়িও বলা যায় না, কারণ বাড়িটার একাংশে মন্দিরের ত্রিশূল পোঁতা আছে।

চার পাশে পাঁচিল। কিছু জবাফুলের গাছ। পাঁচিলের পাশ দিয়ে নদীর পাড়ে পাড়ে রাস্তা। রাস্তাটা ধরে হেঁটে গেলে আলমবাজার জুট মিল।

সবে দেশ ভাগ হয়েছে। রিফিউজি বলে খালি জমিতে বসে পড়লেই হল। তবে গোপাল মামা দেশ ভাগের আগেই এ দেশে চলে আসে। দাদুর জমিজমা মেলা। পুত্রের প্রতি বিরাগভাজনের হেতু মাঝে মাঝেই দাদুর সিন্দুক থেকে টাকা চুরি করে উধাও হয়ে যেত। নাবালিকা স্ত্রীকে ফেলে শহরে গঞ্জে ঘুরে বেড়াবার স্বভাব ছিল মামার। সাধুসঙ্গ থেকে জুয়ার ঠেক এবং সব বিষয়ে কেমন বিপরীত ধর্ম।

কলকাতায় চানু মামিকে নিয়ে আসবে বলে একবার দেশে যায়। এবং মামিকে শেষে কোথায় নিয়ে তুলবে এই আতঙ্কে দাদু এবং আত্মীয়স্বজনেরা বাধা সৃষ্টি করলে—গোপাল তার সহধর্মিণীকে নিয়ে রাতে পালায়। চার ক্রোশ রাস্তা হেঁটে বারদির স্টিমারঘাট, তার পর নারাণগ’, তার পর গোয়ালন্দ—সারা রাস্তায় চানুকে এই বলে ভজিয়েছে—তোর ভাবনা কী। ডাইক্লিনিং খুলেছি। সে বাপের টাকা নষ্ট করেনি, বরং চানুর কথা ভেবেই রাতে তার

ঘুম হয় না, দশ টাকা ভাড়ার এক কামরা ঘরও ঠিক হয়ে আছে, সুতরাং অতঙ্গের কোনো কারণ থাকতে পারে না।

কলকাতায় এসে মামার থিতু হতে যে দু-চার বছর কেটেছে, সে খবরও তপার কানে উঠেছে। কারণ তপা বাড়ি গেলেই মা কপালে করাঘাত করে মামার সব কুকর্মের কথা সহজেই বলত।

সব আত্মীয়স্বজনের কাছেই মামার জন্য দাদু যে খাটো হয়ে আছে, আরে চক্রবর্তী দাদা, আপনার বড়ো পুত্র নাকি বউ নিয়ে রাতে পালিয়ে গেছে।

তা গেছে, গেলে কী করব!

মা বলত, তোর দাদুর মুখে চুনকালি। কড়া পাহারা, তুমি যাও ঠিক আছে, চানু যাবে না। কোথায় নিয়ে কোন ঘাটে ফেলবে কে জানে। নিজেরই ঠাঁই নেই তার আবার কলকাতায় বউ নিয়ে থাকার বাসনা। এবং মামা সব রকমের অপকর্মে ওস্তাদ লোক।

পুত্রবধূর কপালে শেষে কী লেখা আছে কে জানে।

দাদু বিষয়ী লোক, তার বড়ো পুত্র শেষে এতটা উচ্ছন্নে যাবে, অভাব তো ছিল না, জমিজমা, কালীবাড়ির বিষয়-আশয় দাদুর পক্ষে একা সামলানোও কঠিন। নিত্যপূজা, শনিবার, মঙ্গলবার মানতের শেষ ছিল না—পাঁঠাবলি, কিংবা কেউ কালীবাড়ির মাঠে পাঁঠাও ছেড়ে দিয়ে যেত, এত সব থাকতেও পুত্রটির দুর্মতিতে কাহিল দাদু, দেশভাগ হয়ে গেলেও এত বিষয়-আশয় ফেলে এ দেশে তার পক্ষে আসা সম্ভব নয়, ছোট পুত্র নেপালও এক সকালে জানিয়ে দিল দাদা চিঠি দিয়েছে, উইমকো ফ্যাক্টরিতে তার কাজ ঠিক হয়েছে। সে চিঠি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রওনা হয়। থাকার এক কামরার বাসায় এসে উঠলে দু-ভাই আর চানু মিলে ঠিক সংসার চালিয়ে নিতে পারবে, গাঁয়ে পড়ে থাকলে পচে মরতে হবে— কে চায় গাঁয়ে থেকে পচে মরতে।

অবশ্য এই সময়ের মধ্যে ডাইক্লিনিং লাটে উঠেছে। বরানগরের বাজারে তরকারি বিক্রির কারবারে লেগে গিয়েও সুরাহা করতে না পারায়, চানুমামিই সাহস জুগিয়ে গেছে।

গানশেলে লোক নিচ্ছে।

কে বলল?

সমর কাকা।

বীরেনবাবু।

উনি তো গানশেলের মনিব। উনি বললেই হয়ে যাবে।

আরে ঠিক হয়ে যাবে। আমাকে বলেছে—বউদি গোপালকে পাঠিয়ে দেবেন। দাদাকে রহমান সাহেব চেনেন।

কী সূত্রে।

দেশের কালীবাড়ির সুত্রে!

রহমান সাবের বাড়ি কোথায়?

দুপতারায় বলল।

হাজি সাহেবের বাড়ির লোক।

অত সব জানি না। বড়দি, মেজদি, সেজদি-র কথাও বলল। সবাইকে চেনে। দেশের মানুষ ছ্যাঁচড়। কাজ করে বেড়াবে। রহমান সাহেবের নিজেরই যেন অপমান।

তার ক্ষমতা কত।

আরে তিনি ওয়েলফেয়ার অফিসার।

বীরেনবাবু তারও চেনা। আলু, পটল, কুমড়ো যখন যা দরকার বীরেনবাবু তার দোকান থেকেই নিতেন। তাজা সবজির সুনামও ছিল—ধার বাকিতে যে যা চেয়েছে দিয়েছেন, ব্যাবসা না বাড়ালে চলে না—যত বেশি বিক্রি তত বেশি লাভ। লাভের গুড়ি পিঁপড়েয় খায়, ধার দেনায় শেষে মাথা খারাপ—উপায়ে জোর কম, বাঁ পা সরু লিকলিকে, তার পর খাটো, হাঁটতে গেলে পা সোজা পড়ে না, ঘুরিয়ে পড়ে তবে গোপাল ল্যাংড়া হলে কী হবে, তার বউ চানু খুবই সুন্দরী, বড়ো কষ্টে থাকে, কী আর করা, চানুর চোখের দিকে তাকালে বড়ো মায়া হয়। দুপতারায় যে গোপালের বাড়ি—ঢাকা জেলার লোক রহমান সাহেব, শ্বশুরের সম্পত্তি, পার্ক স্ট্রিটে বাড়ি, খুবই মেহমান আদমি, সেই সুবাদে বীরেনবাবু রহমান সাবকে বলেছিল, আপনার দেশের লোক তো নেশাভাঙ করে রাস্তায় পড়ে থাকে। আর লম্বাচওড়া বাত ঝাড়ে, আরে আমরা কি ভিখারির জাত, পড়ে আছি না মরে আছি বুঝি না, দুপতারার কালীবাড়ি চেনে না এমন কোন মানিষ্যি আছে। চাকরিটা শেষে হয়ে গেল দুপতারার সূত্রে।

প্রতিবন্ধী বলেও হতে পারে।

সে যাই হোক সরকারি চাকরি। সপ্তায় সপ্তায় মাইনে—মনাঠাকুর কেদার বদরি তীর্থ করতে যাবেন। দশ টাকার ভাড়াটে চানু আছে, গোপাল আছে, ত্রিনাথের মেলা আছে, মন্দিরের পূজা-আর্চনা অসুবিধে হবে না। মনাঠাকুর একা মানুষ। শিবলিঙ্গ পূজা করে নদীর পাড়ে সাধনায় মত্ত, চিনুকে দেখলে তার মাথা ঠিক থাকে না—মেয়েটি বড়োই মিষ্টভাষী, সে তার জপতপে সাহায্যও করে। গোপাল গাঁজাভাঙ খায়, ভাল খোল বাজায়,

ত্রিনাথের সেবার কাজে লাগবে। কী দিনকাল পড়ে গেল গাঁজাভাঙ খায় এমন লোকই ধরা যায় না। ঘাটের লোকজন এ দিকটায় বিশেষ মাড়ায় না, মনা মনে মনে স্যাঙাত খুঁজছিল। গোপাল সেন্ট পারসেন্ট ঠিক লোক। চানুকে রাতে পাহারা দেয়ার জন্য রতনবুড়িকে নিজেই ডেকে পাঠিয়েছিল। কারণ মতিভ্রম বড়োই মারাত্মক ব্যাধি। গোপাল রাতে ডিউটি করে। চানুর পক্ষে জটাজুটধারী মনাঠাকুরের সঙ্গে রাতে একা থাকলে কেলেঙ্কারি হতে কতক্ষণ। সাধন ভজনে বিঘ্ন ঘটে এমন কাজ মনা কখনো করে না।

সেই যাই হোক, বিশ্বযুদ্ধ শেষ। গানশেলে আর বন্দুক কামান তৈরীর ঝামেলা নেই—অর্ডার না এলে কর্তৃপক্ষেরও দায় নেই। তবু বসে থাকলে চলে না। প্রডাকশান চাই—বালতি, মগ, বন্দুকের নল, জোড়াতাপ্পির কাজ আর কি। হাজিরা দিলেই কর্তৃপক্ষ খুশি। সুপারভাইজার মদন সাহেব হা হুতাশ করেন—দেশের কী হাল হল রে। দেশটাকে খণ্ডবিখণ্ড করে বাবুরা সব তালপাতার পাখায় হাওয়া খাচ্ছে। মিনি মাগনায় স্বাধীনতা—যুদ্ধ নেই, বীরত্ব নেই। গান্ধী মহারাজকে খুন করে বীরত্ব ফলানো হচ্ছে। এ দেশের কখনো উন্নতি হয়!

গোপাল তখন মৌতাতে একেবারে ভিজে আছে। ছিলিম বানাচ্ছে। সেও খাবে সাহেবও টানবে।

তার বড়ো দুঃখ।

দীর্ঘশ্বাসও ওঠে।

বুঝলে সাহেব। সব কপাল। দেশ ভাগ না হলে শনি মঙ্গলবারে পাঁঠার মাথা খাওয়াতাম তোমাকে। নেশা করলে ভালোমন্দ খেতে হয়। দুধ, মাংস না খেলে শরীর ঠিক থাকে না। তার পর বড়ো লেদ মেশিনের আড়ালে দুজনে বসে ঝিম মেরে থাকে—কী গোপাল কী বুঝছ। চানুর জন্য চিন্তা হচ্ছে!

এই হল মুশকিল গোপালের। পেটে কথা রাখতে পারে না। চানুর সব কথাই মদন সাহেব জানে। চানুকে নিয়ে সংশয়ও কম না গোপালের।

আর চিন্তা। কী কয় জানেন, তার কোমলাঙ্গে হাত দিতেই দেয় না। বলে কি না আমার কোরণ্ড হয়েছে। কোরণ্ড রোগটা কী সাব?

বীচিতে জল জমেছে। তুমি টের পাও না গোপাল।

খুব কঠিন অসুখ সাহেব?

না না। কবিরাজি দেখাও। সেরে যাবে।

সব তো বুঝি সাহেব। এ দিকে যে মনাঠাকুর ফিরছে না আর । চিঠিপত্রও নাই। কত দিন হয়ে গেল। সব ত্রিনাথের নামে জিম্মা দিয়ে গেছে। শনি, মঙ্গলবারে ত্রিনাথের কীর্তন, খিচুড়ি প্রসাদ, হেমার মাকে রেখে দিয়েছি। চানু একা করে উঠতে পারছে না। এ দিকে ভাগ্না হাজির। আই. এ. পাস। তবে চানু খুব খুশি। শত হলেও সমবয়সি তো। সাহেব এই আপনার পায়ে ধরে বলছি, চানুর জন্য শুধু প্রাণপাত করছি। চানু না থাকলে, আমি যে মরা লোক। তার পরই গোপাল কাঁদতে থাকল—ভাগ্নাটাকে নিয়ে বড় চিন্তায় আছি। কোথাও জুড়ে দিতে না পারলে চানুর কাছে আমার মুখ থাকবে না। আপনি পারেন সাব, জুড়ে দিতে না পারলে চানু বলেছে, তার কোমলাঙ্গে আর হাত দিতে দেবে না।

কথা শেষ হয় না—আমার মেলা পাপ সাহেব। পাপের ফলে কোরণ্ড অসুখ। কী না করেছি। দেশে হারান পালের বউ আমার জন্য কী না করেছে। রাতে বিরাতের শয্যাসঙ্গিনী। মাগির বড়ো খাক ছিল—বাপ আমার সেবাইত, মন্দিরের টাকা-পয়সা লুট করে ময়নাকে দিতাম।

ময়নাটা কে আবার।

সাহেব, তোমাকে ভক্তি করি, তুমি দুর্গাস্তোত্র পাঠ করো। দুর্গাস্তোত্র পাঠ করলে অমৃত লাভ হয়। সেই শয্যাসঙ্গিনীর নাম ময়না।

সাহেব চোখ বুজে আছে। গোপাল অজস্র কথা বলে যাচ্ছে। গাঁজাভাঙ খেলে এক একজনের এক একরকম প্রতিক্রিয়া হয়। কেউ চুপ করে থাকে। কেউ কথা বলে। কেউ পায়ের কাছে হত্যে দিয়ে পড়ে থাকে।

সাহেব হঠাৎ উঠে বসল, বলল, তালে দ্যাশ থেকে ময়নাকে নিয়ে এলেই হয়। যত মেয়েছেলে, তত তীর্থের মাহাত্ম্য। চুল্লি জ্বলছে কাঠ তো লাগবেই। তুমি না পারলে আর কেউ সাপ্লাই দেবে।

৩

সেই থেকে গোপালের মাথায় ক্যাড়া উঠে গেছে। ভৈরবীদের আখড়া বানালে গাঁজা, ভাঙ, মদ, কীর্তনের দল, বলতে গেলে এক বিশাল গ্যানজাম, তার পর পাপীতকী দ্বাদশী ব্রত, বীরাষ্টমী ব্রত, শিবরাত্রি ব্রত, এবং শিবলিঙ্গে আকন্দ ফুল ধুতুরা ফুল এবং বিল্বপত্র দিতে পারলে জমে যাবে জায়গাটা। আর শ্মশানঘাট যখন অনতিদূরে অবস্থিত।

কিন্তু চানুকে কিছুই বলতে সাহস পাচ্ছে না। হেতু চাই। তপাকে দিলে বলালে হয়। তপা নবীন যুবক, মাথার কোঁকড়ানো কেশ ঘাড়ের কাছে নেবে এলেই গৌরাঙ্গ প্রভু হয়ে যেতে পারে। সুশ্রী যুবককে যদি ভজিয়ে এই ত্রিনাথের মেলায় ভিড়িয়ে দেওয়া যায়।

তপার দিকে তাকালেই গোপাল ভাবে, যদি মগ্নভাবে শিবস্তোত্র পাঠ করে তপা, তবে আর দেখতে হবে না। রমণীরা তার মগ্ন স্বভাবে ভগ্ন না হয়ে পারে না।

চানু সকালে উঠেই গঙ্গাস্নান সেরে আসে, তার পর করবীফুল ধুতুরা ফুল এবং অন্য সব ফুল সংগ্রহের আগে গাছে গাছে জল দেয়। কখনো তপাও সকালে গঙ্গাস্নানে যায়, তপা চানুর ন্যাওটা হয়ে গেছে। লম্বা উঁচু হারমাদ চেহারা নারী মাত্রেই পছন্দ করে। চাকরি দেবার নামে তুলে এনেছে। তপা রোজই আশা করে, ঠিক একদিন মামা তার শুভ সংবাদটি নিয়ে আসবে, কে এক পাগলা সাহেব, বলেছেন, আরে তোমার ভাগ্না রত্নবিশেষ। তার কখনো চাকরির অভাব হয়!

মামা, তোমার পাগলা সাহেব আর কিছু বলল!

পাগলা সাহেব নারে, মদন সাহেব। খুব পরিষ্কার মাথা, তোকে নিয়ে আমি এক জায়গায় যাব।

কোথায়?

চল, গেলেই দেখতে পারবি।

তপা যে কী করে। এবং সে না যাওয়ায় পাগলা সাহেব নিজেই হাজির। তার পর তিনি কেন যে বললেন, বিবাহযোগ্য চরিত্রবান পাত্র পাওয়া দুষ্কর।

তপা বুঝল না, কাকে কথাটা তিনি বলছেন।

চানুমামি একটি গৈরিক রঙের শাড়ি পরে বারন্দায় হাজির। মেদবহুল মানুষটি ভাঙা চেয়ারে বসে আছে। গোপাল মামা ফাঁক বুঝে ছিলিম বানাচ্ছে— মামার এই সব অপকর্মের কথা তপা আগেই জানে। এই পরিবেশে ধাতস্থ হতে তার সময় লাগেনি। কাজেই মামা যখন জানালেন, সাহেবের কন্যেটি তোকে দেখতে আসবে, মদন সাহেব নিজেই নিয়ে আসবেন। আরে তুই তো রাজা রে তপা। সাহেবের একমাত্র কন্যে। কথা বলতে লজ্জা করবি না। বিবাহটাও একটা কাজ। মেয়ের দৌলতে তোর ভাগ্য ফিরে যেতে পারে। তোর মামিকে যে রাজি করাতে পারছি না। তা এলে পরে কি আর তাড়িয়ে দিতে পারবে!

সে কোনো উত্তর দিল না।

কীরে কথা বলছিস না কেন?

তপা শুধু নদীর দিকে তাকিয়ে আছে। পাখিদের ওড়াউড়ি দেখছে। আমবাগানের ছায়ায় দাঁড়িয়ে থানের মাহাত্ম্য বোঝার চেষ্টা করছে। নদীতে কত জল, মাঝে মাঝে দখিনা বাতাসে মানুষ পোড়ার গন্ধ আসছে। মানুষ মরে গেলে তাকে পুড়িয়ে দেওয়া একটি পুণ্য কাজ। এসবই মামার বচন। জন্মালেই মরিতে হয়, অমর কে কোথা হয়। ভয়ের কোনো

কারণই থাকতে পারে না। যৌবন জ্বালায় নারীপুরুষের সংসার। সেও এক অগ্নিকুণ্ড। তোর মামি তার জ্যান্ত উদাহরণ। রাতে কাজে যেতে হয়—তোর মামি তখন স্বাধীন। সুদাম খুবই বেইমান জানিস। আমি বাড়ি নেই জানতে পারলেই থানের সিঁড়িতে এসে বসে থাকে। কাহাতক সহ্য হয়। নেশার ঘোরে মামার কোনো কথা বলতে আটকায় না। মাত্রাজ্ঞান হারিয়ে মামির বিরুদ্ধে কুৎসিত গালিগালাজও শুরু করে দেয়।

চানুমামি খেপে যায়।

অনেক ঢ্যামনা দেখেছি বাপু, তোর মামার মতো ঢ্যামনা কোথাও একটা খুঁজে পাবি না, একদণ্ড দেখতে না পেলেই মাথা খারাপ। ঢ্যামনামি আর কত সহ্য করা যায়।

তপা শুধু শোনে। সে কোনো মন্তব্য করে না। কারণ সুদাম মামার গাঁজার আড্ডায় না এলে তাকেই পাঠায় খোঁজ করতে। এই সব নেশাভাঙের আসরে সুদামের যথেষ্ট কদর আছে। সে যথেষ্ট উচ্চস্তরের ছিলিম প্রস্তুতকারক। সেই সুদামের সঙ্গে আবার মামিকে নিয়ে তার সংশয়বাতিক— তপা কেমন বিব্রত বোধ করে। সে কখনো থান ছেড়ে নদীর পাড় ধরে হাঁটা দেয়। কখনো কোনো নৌকায় গিয়ে বসে থাকে। বাবা-মা-ভাই-বোনেরা যে সবাই অপেক্ষা করে আছে ।

মামা একটা লুঙ্গি পরে ফের মন্দিরের চাতালে ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে নেমে আসছে। কারণ মামার কথায় সে কোনো জবাব দেয়নি।

মদন সাহেবের একমাত্র কন্যে। গাড়িবাড়ি সব তোরই হবে। মেয়েটি দীর্ঘাঙ্গী। কমলাক্ষী মেয়ে। খুবই সুন্দরী। খুব ধীর স্থির। দেখতে দোষ কী! প্রকৃতই সে মনোরমা।

তপা উচ্চাকাঙ্ক্ষা। কত স্বপ্ন তার, একটা কাজ হয়ে গেলে, সে রাতের কলেজে ভর্তি হবে। আরও নানা স্বপ্ন। একজন বেকার যুবকের সঙ্গে মনোরমার বিবাহকে সে মামার একটা ফাঁদ ছাড়া কিছুই ভাবে না। সাহেব খুশি হয়ে তাকে একটা প্রমোশনও দিতে পারে। নাইট ডিউটি থেকে রেহাইও দিতে পারে।

তপা না বলে পারল না, মনোরমা-টনোরমা ছাড় তো। বাড়াবাড়ি করলে চলে যাব। নিজেরই কোনো সংস্থান নেই...... কোথাও পেট ভরে খেতে পাই না বলে পড়ে আছি।

—রাগ করিস না। রাগ করলে ঘিলু গরম হয়। আখেরে লাভ হয় না। সেই জন্যই তো তোর হিল্লে করতে চাইছি। সাহেবের ক্ষমতা কত জানিস। বিয়ে করলেই চাকরির পাকা বন্দোবস্ত। সাহেবের খুব পছন্দ তোকে। দ্যাখ তপা, হাতের মোয়া রাস্তায় ফেলে যেতে নেই। চাকরি পেলে দিদি-জামাইবাবুকে কলকাতায় এনে রাখতে পারবি।

চাকরি হবে!

কেন হবে না।

তিনি কি তোমাকে মামা কথা দিয়েছেন!

দিয়েছেন বলেই তো প্রস্তাবে রাজি হয়েছি। তোর মামাকে তো জানিস। তোর চানুমামির মতো দজ্জাল মেয়েছেলেকে সামলায়।

তপা বোঝে, চানুমামি আছে বলেই মামার সব দোষ খণ্ডন করে নিতে পারে। শনিবারের হপ্তা পেলে রেসের মাঠে না গেলেই যে মামার চলে না। এক রাতেই ফতুর। সকালে ফিরতেন টলতে টলতে। কখনো খোঁড়া পা নেশায় বোধহয় অবশ হয়ে থাকত। কোনো রকমে পা টেনে, বারান্দায় উঠেই চানুমামির পা জড়িয়ে ধরত। এই নাক মলছি, কান মলছি, আর যাচ্ছি না। তুই চানু ক্ষমা করে দে।

ধুস! চানুমামি পা সরিয়ে নেয়।

চানু, মানুষের কপাল ঠিক একবার না একবার ফেরে। এবং এই করে রেসের ঘোড়ায় চড়ে দু-চারদিন বুঁদও হয়ে থাকত—যদি কপাল ফেরে তবে গেঞ্জির কারখানা, মামি ম্যানেজার। সব যুবতী মেয়েরা মামির আণ্ডারে কাজ করবে, পায়ের ওপর পা তুলে তার দিন চলে যাবে। এবং ইত্যাকার দিবাস্বপ্নে বুঁদ হয়ে থাকা মামা ইদানীং শিবমন্দির সংলগ্ন ভৈরবীদের আখড়া এবং এমন সব বিদঘুটে পরিকল্পনায় মেতে থাকার পর সহসা তার মাথায় মনোরমা বোধহয় হাজির।

মামিও তাকে বলল, বসেই তো আছিস। বিয়ের কাজটা সেরে রাখলে ক্ষতি কি। মনোরমাকে বিয়ে করলে যদি সাহেব তোকে গানশেলে ঢুকিয়ে দেয় মন্দটা কি আমি বুঝি না। পাল্টি ঘর। আই. এ. পাস, মদন সাহেব ঠিক ভালো পোস্টিং দিয়ে দেবে। আত্মীয়ের বাড়ি দু-মুঠো ভাতের জন্য আর ঘুরে মরতে হবে না। মনোরমাকে দেখলে তোর মাথা ঘুরে যাবে। সুকেশী, গায়ের রং দুধে আলতায়।

গ্যাঁজালু গোপাল অবশ্য অনেক রাত পর্যন্ত চানুর সঙ্গে পরামর্শ করল।

তপা সকালে উঠেই দেখল মামির গঙ্গাস্নান সারা। মামাও আজ মামির সঙ্গে গঙ্গাস্নান সেরে এসেছে। মামা-মামি দু-জনেই গাছে গাছে জল দিচ্ছে। রতন বুড়ি চাতাল ধুয়ে দিচ্ছে। আর প্যান প্যান করছে, হাড়মিনসে আমাকে ফেলে কোথায় যে পালাল!

সকাল থেকেই নানারকম সিধা আসে মন্দিরে। মনাঠাকুর যা পারেনি, গ্যাঁজালু গোপাল, শনি-মঙ্গলবার অহোরাত্র ত্রিনাথের কীর্তন এবং গরিব-দুঃখীদের খিচুড়ি প্রসাদ এবং এই সব সাধুকাজ নিমিত্ত গ্যাঁজালু গোপালের বিশ্বাসযোগ্যতা বেড়ে যাচ্ছে।

তপাকে ডেকে বলল, ওঠ, আর কত বেলা ঘুমাবি। চানটান করে মন্দিরে বোস। মানুষজন তো এমনি আসে না। তোর মুখে সাধুভাব আছে। লম্বা কোঁকড়ানো চুল আর গালের স্বল্প দাড়ি— বুঝিস না নবীন সন্ন্যাসী তুই। আর মনোরমা যদি এখানে উঠে আসে — তবে সোনায় সোহাগা। বিকেলে গোধুলি লগ্নে আমরা পাত্রী দেখতে যাচ্ছি। তোর যা স্বভাব, কোথাও আবার না পালাস। যদি জীবনে ভালো চাস, এ সুযোগ হেলায় হারাস না।

তপা ভাবল, তার তো হারাবার কিছু নেই। পাত্রী না হয় দেখে এসে ঠিক করবে বিয়েতে তার মত আছে কি নেই। তার বিয়ে হবে, বাবা-মা জানবে না। অরাজি হলে মামা যে তাকে এখান থেকে লাথি মেরে তাড়াবে। যাবেটা কোথায়, উঠবেই বা কোথায়, একবেলা, দুবেলা—বেশি হলে এক দু-রাত থাকতে দেবে। সুতরাং পাত্রী দেখতে যাওয়াই বাঞ্ছনীয়।

আর গোধুলি লগ্নে পাত্রী দেখে সে হতবাক। শুধু সুকেশী নয়, সহাসিনীও। সুকুমারীও বলা যায়। মদন সাহেব এবং তাদের আত্মীয়স্বজনরা একবাক্যে স্বীকার করল, একেবারে রাজযোটক। বিশাল হল ঘরে অবশ্য স্তিমিত আলো জ্বালা। ঘরের মেঝে জুড়ে নীল মোটা কার্পেট, একেবারে রাজসিক ব্যাপারস্যাপার। ঘরে আশ্চর্য সুঘ্রাণ। মনোরমা তার দিকে তাকিয়ে আছে। মনোরমার আঁখি পল্লবে মধুর গু'নে তার চোখ ছানাবড়া।

কী, তোর পছন্দ!

তপা গাড় কাত করে দিল। অর্থাৎ সে রাজি।

মনোরমা দাঁড়িয়ে বলল, আপনি তপোময়, আপনার কোনো অপছন্দের কাজ আমি করব না, কথা দিতে পারি। তবে চোখে দেখি না। আপনার মুখ স্পর্শ করে টের পেতে চাই আপনি দেখতে কেমন। স্পর্শ গন্ধ এ-সবই আমার সম্বল। বলে তার সামনে এসে দাঁড়াল, কোনো জড়তা নেই। তপোময়ের নাক মুখ স্পর্শ করে বলল, তপোময় আপনি আমার স্বপ্নের মানুষ। আমার অপেক্ষা সার্থক।

তপোময় বিস্মিত। যথেষ্ট ক্রোধেরও সৃষ্টি হল। মামা-মামি ষড়যন্ত্র করে একজন অন্ধ মেয়েকে তার ঘাড়ে চাপিয়ে দিল।

অথচ হাঁটাচলায় মনোরমা একেবারে স্বাভাবিক। কোনো জড়তা নেই। দীর্ঘাঙ্গী মেয়েটির হাঁটাচলা এত সহজসাধ্য হয় কী করে! মনোরমা কী তঞ্চকতা করছে তার সঙ্গে, কিংবা পরীক্ষা। কিন্তু মুখ দেখে তো মনে হচ্ছে আশ্চর্য সুখানুভূতি সৃষ্টি হচ্ছে তার মধ্যে। ঘরে খুবই সুগম্ভীর পরিবেশ— কারণ সমবেত আত্মীয়স্বজন, এমনকী মদন সাহেবও আশা করতে পারেননি মনোরমা তার দৃষ্টিহীনতার কথা অকপটে স্বীকার করবে। উভয় পক্ষই মনোরমার দষ্টিহীনতা গোপন করে যেতে চেয়েছিল। কারণ তারা জানে মনোরমা খুবই

অনুভূতিশীল— শব্দ, ঘ্রাণ এবং স্পর্শের সাহায্যে তার চলাফেরা নিজ পরিসরে অনায়াস সহজসাধ্য হয়ে যায়। তপার মতো বেল্লিক, পাত্রীটি যে অন্ধ টেরই করতে পারবে না—

তপোময়ের পাশে তখনও মণিমালা দাঁড়িয়ে আছে, আর এখন লিখতে হবে না। কী দেখছ?

গোপাল মামার কথা মনে আছে মণিমামা?

আছে। তিনি না থাকলে তোমাকে পেতাম কোথায়!

আমিও তাই ভাবি। কেউ তা জানে না— তুমি মনোরমা ছিলে। এখন মণিমালা। কেউ তো জানে না, তুমি জন্মান্ধ। চোখে কম দেখতে পাও এমন তারা জানে। বিধাতা তোমার দৃষ্টি কেড়ে নিয়েছিলেন— কিন্তু প্রকৃতি তার রূপ, রস, গন্ধ দিয়ে ভরিয়ে দিয়েছে তোমাকে। এক আশ্চর্য অনুভূতিশীল জগতের তুমি বাসিন্দা।

ঠিক আছে, ওঠ, চানে যাও। বেলা কম হয়নি। আর এ বয়সে আমাকে নিয়ে এত না ভাবলেও চলবে। ঋতবানের চিঠি এসেছে, বউমার বাচ্চা হবে। তুমি দাদু হতে যাচ্ছ।

চিঠিতে কি তুমি জন্মেরও ঘ্রাণ পাও!

জানি না। বলে ঋতবানের পত্রটি তপোময়ের হাতে দিয়ে বলল, বংশে বাতি দিতে আসছে, তিনিই তো কত শব্দ নিয়ে আসছেন। গোপাল মামারও দেখা পেলে। শব্দ খুঁজে পাও না, শব্দের আকাল, বলে মিষ্টি হাসল মণিমালা। তার উদ্ভাসিত চোখেমুখে সেই কোমলাক্ষী যেন ফের জেগে উঠছে। তপোময় বলল, তোমাকে আদর করতে ইচ্ছে হচ্ছে।

ধুস, কী যে করে না, কে দেখে ফেলবে! বলে বালিকার মতো প্রায় ছুটে পালাতে চাইছিল, হাত ধরে তপোময় বলল, আস্তে। পড়ে গেলে আর এক কেলেঙ্কারি।

বিদ্যুৎলতা

আমাদের দেশকালের এবং জীবনযাপনের যাবতীয় দৃশ্য উল্লেখ করা দরকার, এই কারণে যে তার একটা চালচিত্র ইতিহাসের পক্ষে অত্যন্ত জরুরি। যেমন আমাদের একান্নবর্তী পরিবার এবং বাবা-জ্যাঠা-কাকারা প্রবাস থেকে ফিরে বড়ো ঘরে প্রথমে মাথা ঠুকে তারপর গৃহদেবতার বারান্দায় প্রণাম করতেন। বড়ো ঘরে এক বৃদ্ধা বসবাস করেন, কানে শোনেন না, চোখে দেখেন না, অথচ তাঁর অনুমতি ছাড়া তৃণটুকু পর্যন্ত ধরা যেত না। তাঁর কথাই শেষ কথা এবং শেষ দিকটায় দেশে ঋণসালিশি বোর্ড হয়ে যাওয়ায় এবং সংসারের আয় কমে যাওয়ায় প্রাচুর্য আর থাকে না। পিতামহীর বোধহয় প্রত্যয় জন্মে ফজলে হিন্দুদের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে গরিবদের বীচি খাওয়াচ্ছে। পিতামহীর বাপের খুবই প্রভাব-প্রতিপত্তি, কারণ জমি এবং জমিদারিসহ সুদের কারবার, তল্লাটে তাঁর নুন খায়নি এমন মানুষজন কমই আছে, ফজলে তাঁর নানার হাত ধরে কাছারি বাড়িতে এলে বালিকা প্রভাবতী সমবয়সি ফজলেকে যথেষ্ট সমাদর করত। কথায় কথায় আমার পিতামহী বউমাদের শাসাতেন, মনে রাইখ, আমি বরিশাল্যার মাইয়া, আমার চোখে ফাঁকি দিয়া কাম সারবা সেইটা হইব না। শুনতাছি ফজলে দ্যাশের নেতা হইছেন, তুই নেতা হইছসত আমার কি। হিন্দুরা জমিদার জ্যোতদার, সুদের ব্যাবসা করে, ট্যাঁয়া থাকলে সকলেই করে, তগ ট্যাঁয়া নাই ক্যানরে নিব্বইংশা? হিন্দু জাতের যত দোষ। এবং ফজলে গরিব চাষিদের যত্রতত্র খুশিমতো সুদের আদায় পত্রে লাগাম দিতেই, পিতামহীর ঘরে সরকারমশাইর হাজিরার নির্দেশ এল। হাজিরা দিলে জানতে পারা গেল, সরকারমশাই বরখাস্ত হয়েছেন। সুদের কারবারে টাকা খাটিয়ে সুদে-আসলে সব যেতে বসেছে। টাকা খাটিয়ে আর লাভ নেই এমন সিদ্ধান্তে প্রভাবতী স্থিরকৃত হলে, বাপ-জ্যাঠাদের ডেকে বললেন, খাতাপত্র সরকারমশাইর কাছ থাইকা বুইজা ন্যাও। আমি তীর্থে চইলা যামু। বলেই সবার মুখের উপর দরজা বন্ধ করে দিলেন। পরদিন দরজা ভেঙে লাশ বের করা হল এবং আমরা টের পেলাম আমাদের প্রাচুর্য আর থাকছে না। দোল-দুর্গোৎসব বন্ধ হয়ে গেল। বছর না ঘুরতেই বাপ-জ্যাঠারা পৃথগন্ন এবং শেষমেষ, বাড়ির গৃহশিক্ষক বিদায় হলে আমার পিতাঠাকুর ফরমান জারি করলেন, অজুর পড়াশোনা বন্ধ। পড়ার খরচ চালাইতে পারমু না। মা ফ্যাল ফ্যাল করে আমার দিকে শুধু তাকিয়ে থাকলেন।

আসলে বাড়িটা শেষ পর্যন্ত আট শরিকের বাড়ি হয়ে গেল। আমার দাদাকে বড়োমামা এসে নিয়ে গেলেন, সেজোদা ছোড়দা শান্তি চলে গেল নারাণগঞ্জের সেজো জ্যাঠার বাড়ি, পড়ে থাকলাম আমি আর বড়দা মোহন। এবং কোনো বন্দোবস্ত না হওয়ায় পড়াশোনা থেকে ছুটি হয়ে গেল। আমরা দুজন হাওয়ায় উড়তে থাকলাম। পড়া থেকে ছুটি কী যে মারাত্মক স্বাধীনতা। যখন তখন দু-ভাই বঁড়শি ফেলে পুকুরে বসে থাকি, বিকেলে কাবাডি খেলা সরকারদের উঠোনে, কখনো আখচুরি, আর পুকুরে ওয়ারে ওয়া। গাঁয়ের সমবয়সিরাও জুটে গেল। তখনকার গণ্ডগ্রামে পড়াশোনা অবশ্য কর্তব্য কখনো ভাবা হত না। একটাই মাইনর স্কুল ক্রোশখানেক দূরে, হাইস্কুল আরও দূরে—সাত-আট মাইল হাঁটলে অবশ্য আড়াই হাজার হাইস্কুল ধরা যায়, পিতাঠাকুর যখন বলে দিয়েছেন অত পয়সা খরচ করে হস্টেলে রেখে পড়ানোর ক্ষমতা নেই, তখন আমাদেরই বা দোষ কি। আমার বাবা বিষয়ী লোক নন। পালাগান লেখার বাতিক থাকলে যা হয় আর বড়ো জ্যাঠামশাই সেই কবে থেকে নিখোঁজ, নিখোঁজ বাপের ছেলের দায় নিতে আর কে চায় এবং যখন এমতাবস্থা অর্থাৎ আমরা ওয়ারে ওয়া কিরে ওয়া বলে গাছের ডাল থেকে লাফিয়ে জলে ডাইভ দেওয়া শিখছি, সাঁতার জলে নামলে ওঠার নাম থাকত না, ডুব সাঁতার, চিৎ সাঁতার এবং গভীর জলাশয়ের তলা থেকে এক ডুবে মাটি তুলে আনারও প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেল, ঠিক এই সময়ে এক সকালে সম্মানদির ছোটো ঠাকুরদা বাড়ি এসে হাজির। সব শরিকের বউমারাই তটস্থ—কারণ বউদের জন্য পৃথগন্ন, দায় তাদের, ছোটো ঠাকুরদা বৈঠকখানায় ঢুকে আমার সেজোকাকাকে নাগাল পেতেই—

তোরা কি মানুষ!

সেজোকাকা ভালো ছেলের মতো প্রায় করজোড়ে শুধু দাঁড়িয়ে আছেন। আমি কি মরে গেছি মানু!

শত হলেও একমাত্র জীবিত গুরুজন, কী বলবেন সেজোকাকা বুঝতে পারছেন না। থতোমতো খেয়ে গেছেন।

পুকুরে দেখলাম গুষ্টিসুদ্ধু পোলাপানের লগে মোহন অজু। অগ স্কুল নাই। জলে নাইমা পুকুরে ডুব সাঁতার চিৎ সাঁতার দিয়া বারবার পাড়ে উঠে যাওয়া কি পড়ার অঙ্গ? চক্ষু লাল কইরা ফ্যালছে। জ্বর জ্বালা হলে কে দেখবে। সেজোকাকা খুবই কাতর গলায় বললেন, আজ্ঞে না। স্কুল নাই। অজুর বাবা হস্টেলের খরচ দিতে পারব না কইছে। মোহন বলছে সে আর পড়বে না। পড়তে তার ভালো লাগে না।

কি করবে কইছে?

তরকারি বিইচা খাইব কইছে।

খাওয়া বাইর করতাইছি।

২

বারদি গ্রামের নাম শোনেনি এমন মানুষজন হাটেবাজারে পাওয়া কঠিন। কী নাই। বারদি লোকনাথ ব্রহ্মচারীর আশ্রম। ১৯ জ্যৈষ্ঠ মেলা বসে। সাতদিন ধরে হাজার হাজার মানুষ লাবড়া খিচুড়ি পায়েস খায়। পুণ্যার্জনে তীর্থদর্শনে সে এক মহামেলা । এই এলাকার জেলাসমূহের একজন জমিদারও বাদ যায় না। আশ্রমের প্রাঙ্গণে বিশাল মাঠ, সেখানে তাঁবু পড়ে। কাঙাল ভোজন চলে। শক্তি ঔষধালয়ের মথুরাবাবু পর্যন্ত পরিবারসহ সদর থেকে চলে আসেন। বারদির জমিদার চৈতন্য নাগ, অমৃত নাগ—বিশাল বিশাল প্রাসাদের পরে প্রাসাদ—আম জাম জামরুলের বাগান আর ছাগল বামনি নদী, তার কাঠের সাঁকো—সর্বোপরি পশ্চিমবঙ্গের মহান বিপ্লবী নেতা জ্যোতি বসুর পৈতৃক ভিটাও আবিষ্কার করা গেছে। আর বারদির হাইস্কুলের খ্যাতির সঙ্গে আমি আর বড়দাও জড়িয়ে গেছি। ছোটো দাদুর সম্মানদির বাড়ি থেকে আমরা তখন বারদির হাইস্কুলে ভরতি হয়ে গেছি।

গাঁয়ের বিভূতি কবিরাজকে ছোটো ঠাকুরদা বললেন, অবশ্য আমাদের নিয়ে গেছিলেন সঙ্গে, বড়ো ফ্যাসাদে পইড়া গেছি বিভূতি—তুই যদি পারস বারদির বিদ্যালয়ে ভরতি কইরা দে। অমৃত নাগারে তুই কইলেই হইব।

আরে বাব্বা কী বিশাল চকমেলানো বাড়ি বিভূতি কবিরাজের । আর গাছপালা পাখি—কড়ুই গাছ অর্জুন গাছ চন্দন গোটার গাছ এমনকী দারুচিনি ত্রিফলা থেকে আমলকি গাছ, লবঙ্গ গাছের জঙ্গল পর্যন্ত আছে—সামনে বিশাল দিঘি, বাঁধানো ঘাটলা, আর লম্বা একতলা বাড়ি—আস্তাবলে বিশাল বড়ো একটা আরবি ঘোড়া—বিভূতি কবিরাজ অঞ্চলে দশ বিশ পঁচিশ পঞ্চাশ এবং আরও সব সংখ্যা যোগ করে যতই অঞ্চলটা লম্বা হয়ে যাক, আপত্তি নেই, বিভূতি কবিরাজের ঘোড়া ছুটছে তো ছুটছেই। শীত গ্রীষ্মে ঘোড়ায় আর বর্ষায় পানসি নৌকা—নৌকা না বলে নৌবহরই বলা ভালো, রান্নার ঠাকুর এক নৌকায়, এক নৌকায় বড়ো বড়ো কাচের বয়াম, কোনোটার স্বর্ণসিন্দুর কোনোটায় মুক্তাভস্ম আর বায়ুপিত্ত কফ নিরোধক নানাপ্রকারের বড়ি ভরতি বয়াম। ঝোপঝাড় জ্যোৎস্না আর মল্লিকা ফুল আর দিঘি পার হয়ে কিছুটা ভিতরে ঢুকলে মনে হবে অরণ্যে নির্বাসন। এই অরণ্যে একজন দেবীকে কখনো কখনো দেখা যায়। কথিত এই বনদেবী দর্শনে পুণ্য হয়। অপুত্রকের পুত্র হয়, নিখোঁজ স্বামী ঘরে ফিরে আসে। দিঘির চারপাশে এতবড়ো একটা অরণ্য আছে আমি আর বড়দা অবশ্য পরে টের পেয়েছিলাম। কারণ বিভূতি কবিরাজ বড়দাকে বিশেষ পছন্দ করতেন। তুমি কোন ক্লাশে পড়?

এইটে।

তোমার বাবা মহেন্দ্র কত বড়ো কৃতী পুরুষ ছিল জানো?

বড়দার অবশ্য ফের একটা বছর নষ্ট হয়েছে। এবং সাধারণভাবে বড়দা দু-বছরের কমে কোনো ক্লাশ থেকেই উত্তীর্ণ হতে চান না। আমার চেয়ে বড়দা পাঁচ বছরের বড়ো।

তুমি কোন ক্লাশে?

সিকসে।

তিনি বিশাল বারান্দায় একটি ইজিচেয়ারে বসে আছেন। সাঁজবেলা। আমরা বারান্দার একপাশে বসে আছি। ভিতর বাড়িতে যে নানা গুঞ্জন সৃষ্টি হচ্ছে, নানা কৌতূহল—কেউ কেউ মুখ বের করে উঁকিও দিয়ে গেল। আমার ছোটো ঠাকুরদার কোনো নেশা নেই, বিভূতি কবিরাজ ছোটো ঠাকুরদাকে গাঁয়ের বরিষ্ঠ মানুষ হিসাবে সম্মান প্রদর্শন করে থাকেন—ধূমপানের ইচ্ছা হলে ভিতরের ঘরে ঢুকে যাচ্ছেন, আবার বের হয়ে আসছেন, কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাদের ভিতর বাড়িতে ডাক পড়ল—ঘরে ঘরে ঝাড় ল'নের দ্যুতি ছড়াচ্ছে এবং এই নিরবচ্ছিন্ন দ্যুতির মধ্যে এক বিদ্যুৎময়ীকে দেখা গেল।

বিদ্যুৎময়ী হেসে গড়িয়ে পড়ছে—

মোহন আমাকে চিনতে পারছ?

আর মোহন! মোহন মাথা নীচু করে আছে। ঘামছে।

দাদার হয়ে বললাম, আমার দাদা খুব লজ্জা পায়।

এই মোহন তুমি লজ্জা পাও?

বড়দা ঘাড় কাৎ করে বলল, না। যতই দস্যি মেয়ে হও আমি আর ডরাই না।

আমিও তাকে চিনতে পারি। বারদির লোকনাথ মন্দিরের পুরোহিত অর্ঘ্যদাদুর সম্মতিতে আমরা ছোটোঠাকুরদার সঙ্গে এসেছি। সেবারে ঠাকুমাও এসেছিলেন। মেলায় এসে ঠাকুমাই চিঠি দিয়েছিলেন, বিভূতি তোর নাতনিটাকে পাঠাস। আমাদের সঙ্গে কদিন থেকে যাক। আমি নাতি-নাতনিদের নিয়ে এসেছি, মেলায় আমাদের তাঁবু পড়েছে, সেখানে তোর নাতনি আমার সঙ্গে থাকবে। তাকে দেখার বড়ো বাসনা। তখন অবশ্য বিদ্যুৎময়ী ফ্রক পরে। এবং কিশোরী। সে, তাঁবুতে আমাদের সঙ্গে সাত-আট দিন রাত্রিবাসও করে। বড়োদা তাকে নিয়ে মেলায় ঘুরে বেড়াত। মেঘনা নদীর চরে গিয়েও বসে থাকত। দাদা ও রেবাদি পালিয়ে চরে বসে বিন্নির খই লালবাতাসা খেত। আসলে প্রেমের হাতেখড়ি বলা যায়। রেবাদি ঠাকুমার পালিতা কন্যা শেফালি পিসির কন্যে। পিসির অকালমৃত্যুতে ঠাকুমার সেই ভয়ঙ্কর শোকের কথাও আমাদের মনে আছে। বিদ্যুৎময়ী না বলে বিদ্যুৎলতা বললে সেই পূর্বেকার ফ্রক পরা মেয়েটিকে বেশি মানায়। সে আর যে কিশোরী নেই, তরুণী হয়ে

গেছে—তার রূপে আশ্চর্য বাহার আছে, তাকে না চেনার বড়দার কোনো হেতু থাকতে পারে না। সে আমাদের জন্য চিনেমাটির প্লেটে নানারকমের মিঠাই সাজিয়ে রেখেছে। আর বড়দার মুখের দিকে তাকিয়ে মুখে আঁচল চাপা দিয়ে হাসছে।

বড়দা সহসা উঠে দাঁড়াল। বলল, এই অজু চল। আমরা বরং দাদুর পাশে গিয়ে বসি। তারপর রেবার দিকে তাকিয়ে বলল অত হাসার কী হল! এত দস্যুবৃত্তি ভালো না।

রেবাদি বড়দার হাত ধরে বলল, ঠিক আছে হাসব না তুমি যে এত ভিতু জানব কি করে! আমার কী এমন অপরাধ ছিল! আমার যে ইচ্ছা করে। সকালে মেলা থেকে ফেরার দিন তুমিতো কথা বন্ধ করে দিয়েছিলে। আমি কিছুটা হতবাক। বুঝছি না রেবাদি কেন বড়দাকে ভিতু বলছে। সেই তাঁবুবাসের পর তো রেবাদির সঙ্গে আমাদের আর দেখাও হয়নি। যদি কিছু ঘটেও থাকে সেটাতো বছর পাঁচেক আগে বারদির লোকনাথ ব্রহ্মচারীর মেলায়—এতদিন পর সেই স্মৃতির কোনো হাস্যকর ঘটনা কি দাদাকে দেখে রেবাদির মনে পড়ে গেছে। কিংবা রেবাদি কেন যে বলল, আমার পাপটা কি তোমাকে বলতেই হবে। এটা পাপ কাজ, তুই এটা কি করলি রেবা, আমি কি পাপ কাজ করেছি বলতে হবে। আজ না হোক, কোনো একদিন। এবার যাবেটা কোথায়! আমার যে ইচ্ছে করে। তার দাম দেবে না!

তুমি খুব চপল, অসহিষ্ণু রেবা। অজু ছেলেমানুষ। তার সামনে কী আরম্ভ করলে! শোভন অশোভন বুঝবে না। তুমি আর কিন্তু ছোটোটি নেই!

রেবাদি আঁচল দুলিয়ে শিস দিতে দিতে ভিতর বাড়ির দিকে চলে যেতেই আমার কেন যে মনে হল রেবাদি অনেক কিছু জানে, অথচ এটা জানে না মেয়েরা শিস দিলে সংসারের অমঙ্গল হয়। রেবাদি শহরে থাকে। গ্রীষ্মের বন্ধে কিংবা পূজার ছুটিতে আসে। এমনিতেও আসে। এই প্রকৃতির নিরিবিলি গাছপালা, পাখি, আস্তাবলের ঘোড়া, কিংবা দিঘির চারপাশের অরণ্য তাকে টানে। বড়দাকে তাদের বাড়িতে দেখে সে কি কিছুটা বেশি বুদ্ধিমতী সাজার ভান করছে! বাড়িতে ফেরার সময় আমাকে একা পেয়ে বড়দা বলল, তুই কিন্তু ওর সঙ্গে মিশবি না। ভারি পাজি পুচ্ছ পাকা মেয়ে। জেদি। যা কিছু খুশি করতে পারে। আরে যে মেয়ে ঘোড়ায় চড়ে ছুটতে পারে'; শহরে থাকিস বলে এত দেমাক ভালো না।

মিশলে কী হবে বড়দা।

তোকে নষ্ট করে দেবে অজু। শহরের মেয়ে ওরা সব জানে। রেবার স্বভাবচরিত্র ভালো না।

কী জানে!

জানি না, যা। কী জানে', অতশত জানার দরকার নেই। রেবা ডাকলে সাড়া দিবি না।

দাদুর বৈঠকখানা ঘরে আমরা থাকি, একটা চৌকি, দুটো চেয়ার একটা টেবিল, একটা মুলি বাঁশের বেড়া দিয়ে আলাদা পড়ার ঘরের বন্দোবস্ত। বলা ভালো, তখনকার দিনের বাড়িঘর সব টিনের, চৌচালা আটচালা, টিন কাঠের বেড়া, মুলি বাঁশের ছেঁচা বেড়াও থাকে—একমাত্র এ-তল্লাটে একটাই পাকাবাড়ি বিভূতি কবিরাজের—তারপর যতদূরেই যাই না, কেবল দারিদ্র্য চোখে পড়ে। শনের চাল পাটকাঠির বেড়া আর বনঝঙ্গল। কোথাও আর পাকাবাড়ি চোখে পড়ে না, সেই বারদির স্কুলে গেলে চৈতন্য নাগ, অমৃত নাগের জমিদারি, পাকাবাড়ি দালানকোঠা সবই দেখা যায়। দালানকোঠা থাকলেই বাড়ির সম্ভ্রম অন্যরকম। কোনো পাকাবাড়ি থাকলেই মনে হত কোনো সম্ভ্রান্ত পরিবার এ-গাঁয়ে থাকে।

বাড়িতে ছোটোদাদু, ঠাকুমা, দুই পিসি, কাজের লোক ইদা আর দুই কাকি। কাকারা কলকাতায়। দুই বাড়ির মেলামেশা একেবারে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের মতো। রেবার সঙ্গে ছোটোকাকির ইদানীং অর্থাৎ আমরা আসার পর ঘনিষ্ঠতা আরও বেড়েছে। রেবা ফাঁক খুঁজে ঠিক আমাদের ঘরে সবার আড়ালে ঢুকে যাবে, এবং আমার তখন কাজ ঘর থেকে বের হয়ে যাওয়া।

তাদের কথোপকথন এ-রকমের। আড়াল থেকে শোনার চেষ্টা করি, চুমু খেলে দোষ হয়। জড়িয়ে শুলে দোষ হয় মোহনদা?

হয়। দাদার এক কথা।

কী করব বল। আমার যে ইচ্ছে হচ্ছিল, রাতে তাঁবুতে সবাই ঘুমিয়ে আছে। অন্ধকার। নদীর চরে শুধু চুমু খাওয়ায় রাগ করেছ, খারাপ লাগে না। তোমার মান ভাঙাতে পাশে গিয়ে শুয়েছিলাম।

আর কিছু করিসনি।

হ্যাঁ নেড়েচেড়ে দেখছিলাম। কী করব, আমার যে ইচ্ছে করে— কিছুতেই ঘুম আসছিল না। একলাফে জায়গাটা থেকে আমার পালাতে ইচ্ছা করলেও কেন যে নড়তে পারলাম না। বাল্যবয়সে পাপবোধ বেশি মাত্রাতেই থাকে।

গুরুজনদের কথা আড়ালে দাঁড়িয়ে শোনাও পাপ।

একদিন রেবাদি ফুঁসেও উঠল।—তুমি কাপুরুষ মোহন। দাদু আমাকে কী বলেছে জানো, কত বড়ো সম্ভ্রান্তবংশের ছেলে মোহন, দুর্ভাগ্য বছর বছর ফেল করে। দীর্ঘকায় পুরুষ, পাল্টিঘর, তোর সঙ্গে মানাবে। চুমু খেলে পাপ হয়। অন্ধকারে শরীর আমার কেমন পাগল হয়ে উঠেছিল, তুমি আমাকে ক্ষমা করতে পার না? তারপর রেবাদি বলেছিল, আমার দাদু তোমার বাবাকে কত বড়ো কৃতী মানুষ ভাবে জানো! বলে—কত বড়ো কৃতী

মানুষ। বউঠানের কপাল মন্দ, কপালে সইল না। মাথার দোষ দেখা দিল—কম চিকিৎসা করিনি। আর আরোগ্য লাভ করল না। বড়দা বলেছিল, রেবা তুমি চরিত্রহীনা। সতীসাধবী নও। আমি চরিত্রহীনা মোহনদা? রেবাদি ফ্যাঁচ ফ্যাঁচ করে কাঁদতে থাকল। হ্যাঁ হ্যাঁ, চরিত্রহীনা।

আমি জানতাম, ফেরার দিনে কত করে বলেছি চিঠি দিয়ো। শহরের ঠিকানা দিলাম। বান্ধবীর ঠিকানা। চিঠি দিলে না। এতবড়ো সাধুপুরুষকে দিয়ে আমার কী হবে! দাদুকে বলেছি, আর যাই করো, ও কাজটা করো না। বারবার পরীক্ষায় যে ফেল করে, সে আবার মানুষ। পাড়ায় ঘরে ঢুকে দেখি বড়দা কাগজ কেটে ভাঁজ করছে। কিছুক্ষণের মধ্যে কাগজটা একটা দোয়াত হয়ে গেল। বিভূতি পরিবারের বাড়ি এখন আমার অবারিত দ্বার। সবাই আমি গেলে খুশি হয়। রেবাদি ছুটে আসে।

আমি কাগজের দোয়াত দিয়ে বললাম, চিঠি আছে দাদার। চিঠিতে কী লেখা আছে জানি—দাদা লিখেছেন, তুমি তোমার এই দ্বিচারিতার জন্য সারাজীবন ভুগবে। তোমার সন্তানসন্ততি হলে পাপবোধে ভুগবে। রেবাদি আর আমি সেই অরণ্যের ভিতর দিয়ে হাঁটছি। চিঠিটা ছিঁড়ে হাওয়ায় উড়িয়ে দিলে সব কেমন প্রজাপতি হয়ে উড়ে গেল। কী সুন্দর নারে? আয় তোকেও একটা চুমু খাই। কথা নেই বার্তা নেই খটাস করে চুমু খেয়ে বসল। তারপর বলল, তোর দাদাকে বলিস, দাদু আমার পাত্র দেখছে। ওরা জমিদার, মুকুলবাবুর ছোটো পুত্র। ওদের কলকাতায় বাড়ি আছে।

কবিরাজ দাদা তোমার বিয়ে দিয়ে দেবে?

দেবে না? আমি বড়ো হয়েছি না। বছর বছর যে ফেল করে, তার আবার দ্বিচারিতা। এত সংস্কৃত ঘেষা বাংলা সে পায় কোথায়! আমি দ্বিচারিণী হই হব। তোর দাদার শিক্ষা হওয়ার দরকার। তারপর আর কথাবার্তা নেই। কেমন গুম মেরে গেল রেবাদি। তারপর জঙ্গলের গভীরে ঢুকে যেতে থাকলে আমার কেমন ভয় হল, রেবাদি কোথায় যাচ্ছ? তোর দাদাকে খুঁজতে। বলেই একেবারে সায়া শাড়ি খুলে উদোম হয়ে গেল এবং আমার চোখ বিস্ফারিত।

আমি দ্বিচারিণী, এই কথাগুলো বারবারই বলছে। দ্যাখ আমার কী আছে অজু, আমার এমন সুসময়, আর কিনা বলে আমার পাপ, এবং ক্ষেপে যাওয়ার তার মান-ইজ্জতেরও বোধ ছিল না। সে উড়তে থাকল যেন। জ্যোৎস্না রাতে মল্লিকা বনে এক নারীর অপার সৌন্দর্যে আমি মুগ্ধ হয়ে গেলাম।

কখন যে দেখলাম ঘাটলায় রেবাদি বসে আছে নতমুখে। কাছে যেতেই বলল, কী রে তুই আমাকে খারাপ ভাবিসনি ত!

না না, খারাপ ভাবব কেন রেবাদি।

আমার মাথায় যে কী হয়। শরীরে যে কী হয়! তোরা পুরুষমানুষ ঠিক বুঝবি না। দাদুর কত সাধ, এমন সুপুরুষ তুই কোথায় পাবি রেবা। একেবারে বাপের চেহারা পেয়েছে মোহন। মোহনের বাবা মহেন্দ্র ঠিক এরকমই ছিল দেখতে। তারপরই আবার খেপে গেল রেবাদি। ওঠ ওঠ। যা বাড়ি যা। শরীরের আমার আগুন জ্বলছে। কখন কী করে বসি। তুইও আর ছোটো নস অজু। তোর তো ক্লাশ নাইন হল আর তোর অকৃত্রিম দাদা নির্লজ্জ বেহায়ার মতো নাইন থেকে টেনে উঠে আমার মাথা কিনে নিতে চাইছে।

রেবাদির বিয়ের কথা হচ্ছে শুনেই বড়দা কেমন মনমরা হয়ে গেল। কোনো চিঠি দিয়েছে কি না জানতে চাইল। আসলে বিভূতি কবিরাজের নাতনি দাদুর আদরে একটু বেশিই স্বাধীনতা ভোগ করে। একদিন সকালে তাকে অশ্বপৃষ্ঠেও দেখা গেল। সে আমাদের বাড়ির দিকেই আসছে। দাদা পালিয়ে গাব গাছে উঠে বসে থাকল।

মেয়েটার যে মাথার ঠিক নেই, অতি আদরে বাঁদর হয়ে গেছে—বুঝতেই পারে না, এ-বয়সে এ-সব সাজে না। তবে শত হলেও বিভূতি কবিরাজের একমাত্র নাতনি, তার পক্ষে সবই শোভা পায়। শহরে থাকলে নারী-স্বাধীনতারও সুযোগ অনেক বেশি। কাজেই রেবাদির পক্ষে সবই মানিয়ে যায়। আর বড়দা গাবগাছ থেকে নেমে কাগজ ভাঁজ করে একটা নৌকা বানিয়ে ফেলল। তার ভিতর সাধের চিরকুট লিখল—বিবাহ মানুষের অতি পবিত্র কর্তব্য। বিবাহের আগে কোনো শারীরিক সংসর্গ আমাদের ধর্মে পাপ বলে চিহ্নিত হয়। তুমি আসলে সোজা বাংলায় এঁটো পাতা। তোমার কলকাতার পাত্রটির নিতান্ত দুর্ভাগ্য। তুমি যে উচ্ছিষ্ট। তিনি নিশ্চয়ই জানেন না তুমি অগ্রহণীয়।

খামে নয়, কারণ খাম হাতে থাকলেই পরিবারের কারও সংশয় হতে পারে, হাতে কার চিঠিরে! সুতরাং খেলার ছলে, কখনো দোয়াত, কখনো নৌকা, মাঝে মাঝে কাগজের তৈরি অ্যারোপ্লেনের ভূগর্ভে সেই অমূল্য চিঠি গোপনে বড়দা আমাকে দিয়ে পাচার করাত।

তারপর দু-বাড়িতেই থমথমে ভাব। রেবাদি বলেছে, এর শেষ দেখে আমি ছাড়ব অজু। শহরে যাচ্ছি না। কারণ একটাই রেবাদিকে চিঠি না দিয়ে বড়দা অর্থাৎ ঠাকুর ভাই কেমন নিস্তেজ, আহারে রুচি নেই, এবং এক সকালে দেখা গেল পুকুরে নেমে ডুবের পর ডুব দিচ্ছে। পাড়ে আমাকে দাঁড় করিয়ে রেখেছে ডুব গোনার জন্য। একশো হয়ে গেছে—একবার চেঁচিয়ে বলাম একশো হয়ে গেছে, উঠে আসুন। কেবল বললেন, তুই গুনে যা। বাধাবিঘ্ন আমি পছন্দ করি না। সে জানে না আমি কে!

এবং লোকজন জড়ো হয়। দাদা নিরন্তর ডুব দিতে দিতে কখন কাহিল হয়ে গেছে। লোকজন ছুটে আসছে। ছোটো দাদু পড়ে গেছেন বিপাকে। জল থেকে তুলে আনার পর

কিছুটা অজ্ঞান অবস্থা। সে অবস্থায়ই মা-কালী ক্যত্যায়নী, দাদার ওপর ভর করেছেন।

ও বিভূতি, সর্বনাশ।

আমি জানি দাদা। আমারও কী নিস্তার আছে। নাতনি সারারাত চন্দন কাঠের অরণ্যে ঘুরে বেড়িয়েছেন অনেকেই দেখেছে। বলে দেবদেবীর আবির্ভাব হয়—তাই রক্ষা। উলঙ্গ দেবী প্রত্যক্ষ করে মা মা বলে কেঁদেছে। প্রার্থনা করেছে। ওর মাসি মামিরা ওকে শেষে চাদর ছুঁড়ে দিয়ে চ্যাংদোলা করে তুলে এনেছে। ছোটদাদু একটি বড়ো রকমের দীর্ঘশ্বাস নিয়ে বললেন, তোর নাতনির শরীর গরম হয়ে গেছে রে বিভূতি।

এমনই চলছিল সব। বড়দা আজকাল খুব সকালে ওঠেন। প্রাতঃস্নান করেন। এবং মাঝে মাঝে শনিবার মঙ্গলবারে তাঁর ভর ওঠে। বাড়ির সবাই, অর্থাৎ দুই পিসি, ছোটোঠাকুমা থেকে ছোটো ঠুকরদা সবারই ত্রাহি মধুসূদন অবস্থা। ঠাকুর দেবতা নিয়ে ছেলেখেলা করা যায় না। ঘরদোর পবিত্র রাখতেই হয়। বাড়িটা সবসময় উৎসবের মেজাজে থাকে।

বড়দা অর্থাৎ মোহন সাঁজবেলায় পুকুরে নেমে গেলেই আমার অন্তরাত্মায় কাঁপুনি ধরে যেত।

হয়ে গেল।

কী হয়ে গেল!

বড়দা পুকুরে আবার নেমে গেছে।

ছোটঠাকুমা এবং বাড়ির কাজের লোকের সবারই ব্যস্ততা বেড়ে যেত। সারাবাড়ি গোবরজল ছিটিয়ে বাড়িটিকে দেবী আগমনের জন্য প্রস্তুত রাখা হত। বারান্দায় উঠোনে হ্যাজাকের আলো জ্বলত। গাঁয়ের লোকজন ভিড় করত এবং ক্রমে দাদার ওপর দেবী ভর হওয়ার বিষয়টি গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে রটে যেতে থাকল। মানুষজন এমনিতেই ঈশ্বরবিশ্বাসী—তার ওপর জ্যান্তঠাকুর—মা কাত্যায়নী অঞ্চলের কাত্যায়নীর থান খ্যাত দেবী। স্বেচ্ছায় পুণ্যবান ছোটোঠাকুরদার বাড়িতে তাঁর আবির্ভাব হতেই পারে।

আমার অবশ্য কাজ বেড়ে গেল। ভর না ছাই, আসলে ভারাক্কি । দাদার জন্য আমারও লেখাপড়া লাটে ওঠার অবস্থা।

এই অজু বাজারে যা।

এই অজু মোহন আজ খিচুড়ি খাবে বলেছে। পায়েস খাবে বলেছে, খেজুরের গুড় আনবি, বেগুন আনবি—শিংনাথ বেগুন।

কোনোদিন আবার পড়তে বসলেই ছোটোঠাকুরদা ডেকে পাঠাত, শোন মোহন বলেছে আজ কাচকি মাছের ঝোল দিয়ে ভাত খাবে। তার ওপরে আর এক মুশকিল, রোজ রেবাদিকে দাদার খবর দিতে হয়।

আজও স্কুলে যাবে না বলছে তার দাদা?

বলল ত।

কী মনে হয়, ভর উঠবে।

তেমন লক্ষণ দেখছি না।

স্কুলে যাবে না, বাড়ি বসে কী করবে?

ঠাকুর ঘরে বসে গীতাপাঠ করবে।

এই অজু কোথায় যাচ্ছিস!

বেলপাতার ডাল।

খুব জ্বালাচ্ছে তোর দাদা।

কী করি বলো রেবাদি। জানো তো আমার ওপর খুব খাপ্পা।

তোদের বাড়িটা দেখছি চিড়িয়াখানা হয়ে গেলরে। তোদের নিয়ে এল, বারদি স্কুলে ভরতি হলি, তোর দাদা টেস্টে অ্যালউ হল না, তুই হলি, খেপে তো যাবেই!

না রেবাদি সেজন্য নয়।

তবে কী জন্য।

কাল তো তুমি যাওনি। কত লোক বাড়িতে। কত দূর দূর জায়গা থেকে লোক হাজির। অপুত্রকের পুত্র চাই, কন্যের ভালো ঘরে বিয়ে চাই, পুত্রের সামনে কোনো যদি অমঙ্গল থাকে, তার বিধান চাই। মা-কাত্যায়নীর সব বিধান নাকি ফলে যাচ্ছে। কী করে হয়? দোষের মধ্যে বলেছিলাম, মা কালীর গোঁফ থাকে নাকি।

গোঁফ।

হ্যাঁ গোঁফ। সেই গোঁফটি কিছুতেই ছাটবে না। আমি কত করে বললাম, দ্যাখ বড়দা গরদের শাড়ি পরে মেয়েমানুষের মতো বসে থাকিস, ফুল বেলপাতার পাহাড় জমে যায়, সব ভালো, তবে তোর মুখে আর গোঁফ মানায় না। মা কালীর কি গোঁফ থাকে। মা কালীর মুণ্ডমালা থাকে। তুই কী রে বড়দা। রেবা হাসল।

রেবাদি তুমি হাসছ কেন?

হাসব না, কবে যেন একদিন গোঁফের প্রশংসা করেছিলাম। সেই থেকে গোঁফের ওপর খুব নজর। গোঁফ ছেটে ফেললে আমি কি তোর দাদাকে আস্ত রাখব।

ও তোমার ভয়ে।

তবে কী!

তুমি রেবাদি বলতে পার না, অনেক তো হয়েছে, টেস্টে এলাউ হতে পারল না, ভর ওঠলে সূর্যমাস্টারও শুনেছি হাজির হয়। কড়জোড়ে দরজার সামনে বসে থাকে—কখন মা জননী হাতে হাতে প্রসাদ দেবে, আচ্ছা সন্দেশের ঠোঙাটি কে সাপ্লাই করে বল তো। সূর্যমাস্টার ইচ্ছে করলেই এলাউ করে দিতে পারে, দিল না কেন, ভর উঠলে কাত্যায়নী, ভর না উঠলে মোহন মজুমদার। জানিস তোর দাদা হাড়ে বজ্জাত। আমার ওপর প্রতিশোধ নিচ্ছে, আমি অগ্রহণীয়। সব বের করব।

জানো রেবাদি, সারাক্ষণ পাহারা দিতে হয় এখন।

পাহারা। রেবা ঘাটলায় বসে পা নাচাচ্ছিল।—পাহারা কেন?

কোথায় কোনদিকে ছুটবে, কোথায় গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়বে—আর মা মা বলে চেঁচাবে। দু-হাত বাড়িয়ে মা কাত্যায়নীকে খুঁজবে। কোথায় গেলে মা তুমি। আমার আর ভাল্লাগছে না রেবাদি। সামনে পরীক্ষা।

সেই।

আজও সাঁজবেলায় পুকুরে নামবে মনে হয়। আজ তো শনিবার। সামিয়ানা টাঙানো হয়েছে। এবং এভাবে রটে যায়, শনিবার শনিবার ভর ওঠে। দাদা পূজার ঘরে চুপচাপ শুয়ে আছেন। সারাদিন কিছু খাননি। উপবাস। এইসবই ভর ওঠার সংকেত।

কিন্তু দাদা মস্তবড়ো চাঁদের দিকে তাকিয়ে পুকুরপাড়ে বসে থাকলেন। পরনে সেই গরদের শাড়ি—লোকজনের ভিড় বাড়ছে। দাদা কেমন বাহ্যজ্ঞান শূন্য, তারপর ধীরে ধীরে জলে নেমে চেঁচালেন, মা মা, মা-কালী করালবদনা তারপর পুকুরে নেমে ডুব। আজ কি হাজারবার ডুব দেবেন, আমার কাজ পাহারা দেওয়া। একটা হ্যারিকেন হাতে পাড়ে দাঁড়িয়ে আছি। কারণ দিন দিন উপসর্গ বাড়ছে।

জলে নামার আগে বললাম, বড়দা, রেবাদি আসবে বলেছে। তোমার ভর ওঠা দেখবে।

আর যায় কোথায়। এবারে গাবগাছেও সানাবে না—বড়দা ছুটছে। কোথায় ছুটছে জানি না। লোকজনও ছুটছে পেছনে। মা-কালীর ভর না তুলে কোথায় যাচ্ছেন, আপনার আসার ইচ্ছা পূর্ণ হোক মা। দৌড়োতে গিয়ে আমার হ্যারিক্যান নিভে গেল—মাঠ পার হয়ে এক দূরবর্তী কবরখানায় পাশে চলে এসেছি। এবং দাদার যা হয়, শত হলেও সাধক মানুষ

আমার দাদা, গাছপালায় জলে, গাছপালায় ফলে যাকিছ ধরেন সবই মহাকালীর অংশ। জ্যোৎস্নায় আলো অন্ধকারে শুনতে পেলাম, অশ্বখুরের শব্দ। এবং তিনি সকলকেই অর্থাৎ যারা পুণ্যার্থী ভিড় করেছিল অজুদের বাড়িতে জ্যান্ত দেবীর আশায়, তাঁদের কাছে এক বার্তা পৌঁছে দেওয়া হয়েছে—কেউ জায়গা ছেড়ে নড়বেন না, নড়লেই মা-কালীর কোপে পড়ে যাবেন!

কবরখানার পাশে বিশাল এক প্রান্তরে বসে আছি—একটা ঝিল সামনে, জোনাকি জ্বলছে, নানারকমের জলজ ঘাসের সোঁদা গন্ধ। আতঙ্কে আমি কাহিল, এটা তো একটা পরিচিত ভূতুড়ে জায়গা। ভূতেরা এখানে খুশি হলে লাফাতে পারে, ঘাড় মটকে দিতে পারে আর বড়দা বেঁহুশ হয়ে মাটিতে পড়ে আছে।

আমি যে কী করি।

অশ্বখুরের শব্দ আরও শব্দময় হচ্ছে। আবার কখনো ভূতেরা লড়ালড়ি করলে কট কট শব্দ হয় কঙ্কালের হাড়গোড় ঠোকাঠুকি হলে যা হয়।

আর তখনই দেবী আবিভূতা।

তিনি লাফ দিয়ে নামলেন। তারপর প্রান্তরে দাঁড়িয়ে ডাকলেন, কোথায় তোরা। জ্যোৎস্নায় কিছুই স্পষ্ট নয়।

বললাম, রেবাদী কী তুমি?

তোরা কোথায়?

এইত এখানে। খাদের মধ্যে চিৎপাত হয়ে পড়ে আছে। সাধক মানুষ, তার এক কথা, হে মা কালী, হে মা জননী, মানুষের কল্যাণ করো রেবাকে সুখ্যাতি দাও। রেবাদি এসে কী করে বসবে কে জানে।

বিশাল প্রান্তরে রেবাদি তার আলখেল্লার মতো আবরণটি খুলে দেখার আগে বলল, এই তুই যা তো—দ্যাখ কোনো লোকজন ছুটে আসছে কি না। এসে বলবি সাধক মোহনচাঁদের নিষেধ আছে, আর এগুবেন না।

আবরণটি খুলে একেবারে দাদার সামনে গিয়ে দাঁড়াল রেবাদি। কারণ দাদা যে-কোনো সময় ছুটে পালাতে পারে। রেবাদিকে বাঘের মতো ভয় পায়। কাপুরুষ কোথাকর। আমাদের দেশ বলেই সাধক, মহাপ্রভু সাজার তোমায় সুযোগ মিলেছে বোঝ? কোথায় আমার শরীর অপবিত্র, কোন জায়গায় বলো! মানুষ কখনো অপবিত্র হয়। অগ্রহণীয় হয়। এস—ঘোড়ার পিঠে বেঁধে ছেড়ে দেওয়া যেত—কিন্তু অজুটা যে একা পড়ে যাবে। আর

কোনো পাগলামি নয়। আর যদি ভর ওঠে, মা-কাত্যায়নী বলে হুংকার দাও সত্যি আমি মুকুলবাবুর ছোটোপুত্রকে বিয়ে করে কলকাতায় চলে যাব। অনেক সহ্য করেছি।

দাদা সেই থেকে ভালো হয়ে গেলেন। তার ঠাকুর-ঠুকুর, মা-কালী কাত্যায়নীর পাগলামিও সেরে গেল। মানুষের শরীর কখনো অপবিত্র হয় না। রেবাদিই দাদাকে জ্যোৎস্না রাতে শরীর দেখিয়ে বুঝিয়ে দিল।

অবলম্বন

ঝুপঝুপ করে বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল।

টুকু ধরফর করে উঠে বসল তক্তপোষে। কখন মেঘ করেছে আকাশে টের পায়নি। দাবদাহ চলছে। চৈত্র গেল, বৈশাখের মাঝামাঝি, এক ফোঁটা বৃষ্টি নেই। গরমে দিনরাত হাসফাঁস, লু বইছে। দরজা জানালা খোলা রাখার উপায় নেই। গরম বাতাসে গায়ে জ্বলুনি, প্যাঁচপেচে ঘাম। আর এ-সময় ঝুপঝুপ করে বৃষ্টি পড়ছে ভাবা যায় না।

টুকু দৌড়ে তক্তপোষ থেকে বারান্দায়, তারপর উঠোনে। তারে মেলা সায়া শাড়ি, বিছানার চাদর, বালিশের ওয়াড় টেনে আবার ঘরে। হাওয়া দিচ্ছে। ঠান্ডা হাওয়া। টুকুর শরীর জুড়িয়ে যাচ্ছে ঠান্ডা হাওয়ায়।

তাপরই মনে হল, দুদুমণি কোথায়। ঘর খালি। কুকুরটা বারান্দায় শুয়ে আছে। বৃষ্টি পড়ছে বলেই হয়তো লেজ নাড়তে নাড়তে উঠোনে নেমে গেল। দুদুমণি বাড়ি থাকলে, কুকুরটা বাড়ি ছেড়ে কোথাও যায় না। সে থাকলেও। কেউ একজন না থাকলে বাড়িতে কুকুরটাও থাকে না। কুকুরটাও বাড়িতে! দুদুমণি গেল কোথায়।

সে গেলে কুকুরটা পেছনে ল্যাকপ্যাক করে হাঁটে।

দুদুমণি গেলে কুকুরটা পেছনে ল্যাকপ্যাক করে হাঁটে।

সেই কুকুর বাড়িতেই আছে। কুকুরটাই তাদের এখন পাহারাদার। দুদুমণি একা রোদে কোথায় বের হয়ে গেল।

আমগাছতলায় থাকতে পারে। ঝড় উঠবে আশঙ্কায় যদি বুড়ি গাছতলায় ছুটে যায়। আম, জাম, জামরুলের গাছ বাড়িটার চার পাশে। কাঁঠাল গাছও আছে। লেবু সফেদা গাছ, যে দিনের যে ফল দাদু নিজ হাতে লাগিয়ে গেছেন। একটা আম চুরি গেলে দুদুমণির চোপার শেষ থাকে না।

টুকু রেগে গেলে, বুড়ি মরতে গেছে ভাবে। ঝড়ে আম পড়বেই। লোকজন সব তাঁদের তাও তার জানা। ঝোপজঙ্গলে লুকিয়ে থাকারও স্বভাব আছে পাড়ার বাচ্চাকাচ্চাদের। দুপুরে বিকেলে কোথা থেকে যে পঙ্গপালের মতো তারা উড়ে আসে বোঝা দায়। দুদুমণি

লাঠি হাতে তাড়া করবে। পারে। একদিকে তাড়া করলে অন্যদিকের বোপ থেকে উঠে আসে তারা। না পারলে চেঁচামেচি, ওরে টুকু সব সাফ করে দিল। না পারলে, ওরে নধর সব শেষ করে দিল। কে বেশি বিশ্বাসী তখন বোঝা ভার। সে না নধর। আর নধরও হয়েছে তেমনি, কোথা থেকে লাফিয়ে বের হয়ে আসবে। ছুটে যাবে, ঘেউ ঘেউ করবে। মুহূর্তে গাছপালা সাফ।

আজ তেমন কিছু হলে নধর নিশ্চিন্তে বারান্দায় শুয়ে থাকতে পারত না। দুদুমণি গাছতলায় থাকলে সেও গাছতলায়। ঝুপঝুপ বৃষ্টিতে মুহূর্তে ঘর বাড়ি ঠান্ডা হয়ে গেল। আকাশে মেঘের ওড়াউড়ি। ঝড়ও উঠে গেল। অথচ দুদুমণির কোনো সাড়া পাওয়া গেল না।

সে দরজা পার হয়ে উত্তরের বারান্দায় গেল। না দুদুমণি নেই।

বারান্দায় ছোট্ট চালাঘর, টালির ছাউনি, মাটির মেঝে, উনুনে কাঠপাতায়, রান্না, দুদুমণির খাওয়া খুব তাড়িয়ে তাড়িয়ে—একবেলা আহার, সহজে পাত থেকে উঠতে চায় না। যদি খেতে খেতে ঘুমিয়ে পড়ে, রাগ হলে টুকুর এমনই সব মনে হয়।

সে বারান্দা থেকে অগত্যা নেমে গেল।

বৃষ্টি পড়ছে। বৃষ্টিতে ভিজতেও আরাম লাগছে। কিন্তু দুদুমণি গেল কোথায়। তাকে না বলে কোথাও যায় না। অবশ্য যায় না বললে ভুল হবে, এই নগেনের বাড়ি থেকে আসছি বলে, কোথায় কার বাড়ি গিয়ে বসে থাকবে বলা মুশকিল। এক বাড়ি থেকে আরও দশ বাড়ি ঘুরে বেশ বেলা করেই হয়তো ফিরে এল—তারপর দশরকমের কৈফিয়ত দিয়ে এক গ্লাস জল ঢকঢক করে খাওয়া।

খেতে খেতে গ্লাস নামিয়ে বলা, আমি তো বসে থাকি না দিদি, কাকে দিয়ে কী উদ্ধার হয়, তাই সমরেশের বাড়ি হয়ে এলাম.....

টুকু বিরক্ত হলে না বলে পারে না, দয়া করে থামবে বিরজাসুন্দরী। বকর বকর ভালো লাগছে না। কখন রাঁধবে, কখন খাবে। আমি রাঁধলে মুখে রোচে না।

হয়ে যাবে। তুই চান করে দু-বালতি জল তুলে রাখ। পুকুর থেকে ডুব দিয়ে এলাম বলে।

সে রেগে গেলে দুদুমণি আর দুদুমণি থাকে না, বিরজাসুন্দরী হয়ে যায়।

রাগ হয় না! জোরে হাঁটতে পারে না, কানে শোনে না, চোখে দেখে না ভাল, কোথায় গিয়ে মরে পড়ে থাকবে—এই এক দুশ্চিন্তা তার। রাগ জল হতে অবশ্য সময় লাগে না—কেমন অপরাধী বালিকার মতো তখন কথাবার্তা বিরজাসুন্দরীর।

আমার কী দোষ। নগেনের বউ যে খবরটা দিল।

আবার খবর।

তা দিলে কী করব। ওদেরই বা দোষ কী, ওরা তো জানে তোর জন্য আমার মাথা খারাপ। রাতে ঘুম নাই।

টুকু বুঝতে পারে তখন, হয়ে গেল, সেই এক প্যাচাল সাতকাহন করে বলা, কাকে না ধরেছে তার খবর দেওয়া, কেউ তো মাথা পাতছে না, রাগ করলে হয়।

এই খবরের কথা শুনলেই টুকুর মাথা গরম।

আবার মরতে গেছিলে! তোমাকে কতবার বলেছি, আমার জন্য তোমাকে ভাবতে হবে না। আমার এক পেট চলে যাবে।

তোর এক পেট, তুই মেয়েমানুষ না। সোমত্ত মেয়ের কখনো এক পেট থাকে।

টুকু জানে বিরজাসুন্দরীর মুখে এমনিতেই আগল নেই। সোমত্ত মেয়ের এক পেট মানতেই রাজি না। বিয়ে না হলে মেয়েমানুষ হয়ে কাজ কী।

তুই কি পুরুষমানুষ, তোর এক পেট হবে!

পেট কথাটা কানে বড়ো লাগে। এমন কতরকমের কথা হয়—সে পছন্দ করছে না, বিরজাসুন্দরী হন্যে হয়ে ঘুরুক। তার অপমানের দিকটাও বিরজসুন্দরী বোঝে না। সকালেই কথা কাটাকাটি হয়েছে—মালা-তাবিজের কথাও উঠেছে, কবজ ধারণ করলে, পাত্রপক্ষ আর ফিরে যাবে না। কোথায় কার কাছে খবর পেয়েছে, কিংবা পালন কাকার পরামর্শেও বিরজসুন্দরী যে মাথা মুড়িয়ে আসেনি কে বলবে।

গন্ধর্ব কবচ সোজা কথা না! বিরজাসুন্দরী বিড়বিড় করে নিজেই প্যাচাল শুরু করে দিয়েছিল।

টুকুর আর সহ্য হয়নি।

তাগা তাবিজ পরতে হয় তুমি পরবে। আমার পেছনে লাগবে না বলে দিলাম। তাবিজ গলায় ঝুলিয়ে বসে থাক। দেখতে হয় তোমাকে দেখুক।

তোকে কিছু বলেছি। এতো চোপা।

তবে কাকে বলছ?

নধরকে বলছি। একটা কুকুর সেও বোঝে আমার কষ্ট, তুই বুঝবি কী, তোর কি কোনো ভাবনা আছে! খাস আর ঘুমাস।

টুকু বুঝেছিল, দুদুমণিকে বুঝিয়ে লাভ নেই। যা ভাববে শেষ পর্যন্ত তা করবে। স ক্কাল বেলায় কোনো তিক্ততাই সুখের হয় না। বড়োমাসিও বুঝিয়েছে তাকে, মা আমার কী করবে বল। তোকে কার কাছে রেখে যাবে, এই ভাবনাতে ঘুম নেই চোখে। মার এক কথা, আমি চোখ বুজলে টুকুর কী হবে!

টুকু যে বোঝে না এ-সব তো নয়। ঠিকই বোঝে। পছন্দ হলেও দাবিদাওয়া নিয়ে আটকে যায়। তার হয়ে এই খরচের বহর কেউ নিতে রাজি না। পাসটাস করা ছেলের খাঁইও কম না। সরকারি চাকুরের তো মেলা দাম। তার একটা দুটো পাস থাকলেও না হয় কথা ছিল, তার তো কিছুই নেই। মায়ের মুখ মনে পড়ে না, বাবারও সে দোষ দেয় না, একা মানুষ, সংসার সামলাবে কে? বাবা তার নিজের সংসার, স্ত্রী বাচ্চাকাচ্চা নিয়েই জেরবার। বছরে দু-বছরে তাকে দেখতে এক আধবার চলেও আসে। এই আসাও যে কত গোপনে, সে তার বাবার মুখ দেখলেই টের পায়।

বাবা এলে চোরের মতো বসে থাকে বারান্দায়। বাবা কথা কম বলে—তখন দুদুমণির মুখের কামাই নেই। বাবাকে দেখলে আরও খেপে যায়। সোমত্ত মেয়ে আর কালসাপ সমান, তুমি না তার বাপ, রাতে ঘুমাও কী করে বুঝি না। ভাত হজম হয় কী করে বুঝি না।

টুকু তখন ভারি বিড়ম্বনায় পড়ে যায়।

দুদুমণি তুমি থাকবে?

বিরজাসুন্দরী থামবার পাত্র, আগুনে ঘি পড়ে যাবার মতো ছ্যাঁত করে জ্বলে উঠবে।

থামব। চিতায় উঠে থামব। আলগা সোহাগ দেখাতে কে বলে! কীসের টানে আসে! কর্তব্য অকর্তব্য বলে কথা। আমি হলে মুখ দেখাতে পারতাম না। এ কেমন বাপ, দায় আদায় বোঝে না।

সে না পেরে, বাবাকে সান্ত্বনা দেয়, তুমি কিছু বাবা মনে কর না। দুদুমণির মাথাটা গেছে। এই নাও গামছা, পুকুরে ডুব দিয়ে এস। দুপুরে খেয়ে যাবে।

বাবা বাধ্য ছেলের মতো উঠে যায়। পুকুর থেকে ডুব দিয়েও আসে। মেয়ের টানে যে আসে বোঝাও যায়। খেতে বসলে, সে পাখার হাওয়াও করে। সে তার সুন্দর কারুকাজ করা আসন পেতে দেয়। ঝকঝকে কাঁসার গ্লাসে জল, দুদুমণি চোপা করে ঠিক, তবে জামাই আদরে যে খেতেও দেয় তাও সে বোঝে।

কুমড়োফুলের বড়া করেছি। আর দুটো নাও।

বাবা কুমড়োফুলের বড়া খেতে ভালোবাসে। গন্ধরাজ লেবু খেতে ভালোবাসে। দুদুমণির এতটুকু কার্পণ্য নেই। জামাইটির কথা ভেবে যে তিনি এক দণ্ড আগে তেতে উঠেছিলেন, যা খুশি মুখে আসে বলে গেছেন, খাওয়ার পাত দেখে মনেই হবে না।

একটু আমের আচার দে তোর বাবাকে।

আর একটুকরো মাছ দে।

মুড়িঘন্ট কেমন হয়েছে?

পায়েসটুকু খাও। তাও যে আস, এই আমার অনেক। সম্পর্ক তো চেষ্টা করলেও মুছে ফেলা যায় না। আমি আর ক-দিন, চেষ্টা তো কম করছি না।

বাবা কোনো কথারই জবাব দেবে না। অপরাধ বোধ সে বোঝে। খোঁড়া মেয়েটার দুর্ভাগ্য তাও বোঝে। চুপচাপ খেয়ে উঠে বাবা আবার বারান্দায় জলচৌকিতে গিয়ে বসলে, দুদুমণিই বলবে, টুকু বিছানাটা করে দে। একটু গড়াগড়ি দাও। বেলা পড়লে রওনা দেবে।

ঝড়ের সঙ্গে বৃষ্টি এল, ঝড়ের সঙ্গে বৃষ্টি চলেও গেল।

গাছের নীচে ভাঙা ডালপালা, আমের কুশির ছড়াছড়ি—আম ডাঁসা হতে সময় লাগে, হনুমানের উৎপাতে কিছু রাখাও যায় না। মানুষের উৎপাত তো আছেই। গাছে আম ডাঁসা হতে থাকলেই বিরজাসুন্দরী চঞ্চল হয়ে পড়ে। দিবানিদ্রাও যায় না। হাতে লাঠি নিয়ে ঠুকঠুক করে গাছতলায় গিয়ে বসে।

যদি গাছতলায় বসে থাকে। টুকু দরজায় শেকল তুলে দিল।

ঝড় বৃষ্টির মধ্যে গাছতলায় বসে থাকবে। হয় কী করে। তবে বিরজাসুন্দরীর অসাধ্য কর্ম কিছু নেই। ঝড়ে গাছ থেকে আম পড়তেই পারে, ঝড় বৃষ্টিতে ছুটে যেতেও দ্বিধা করবে না। যদি বাগানে ঢুকে বসে থাকে, বৃষ্টিতে ভিজে গেছে ঠিক। ঝুড়িতে আম তুলেও রাখতে পারে। খোঁজাখুঁজির তো শেষ নেই। ঝোপ জঙ্গলে দু-একটা থেকে যদি যায়, ভিজে গিয়েও হাতড়াতে পারে। সহজে গাছতলা থেকে আসার পাত্র যে নয় ভেবেই টুকু ডাকল, দুদুমণি তুমি কোথায়। অবেলায় বৃষ্টিতে ভিজে শরীর খারাপ হবে বোঝো।

কোনো সাড়া নেই।

গাছগুলি সব পর পর দাঁড়িয়ে আছে। টুকু মাথায় সামান্য আঁচল টেনে, উঠোন পার হয়ে কাঁঠাল গাছটার নীচে এসে দাঁড়াল। ঝিরঝির করে বৃষ্টি পড়ছে, গরমের এই বৃষ্টিতে বসুন্ধরা ঠান্ডা। গাছপাতা থেকে টুপটাপ জল পড়ছে। দু-তিন বিঘে জমি জুড়ে বাঁশঝাড়, ফলের গাছগাছালি, হলুদের জমি সবই ঠান্ডা মেরে গেছে। কিন্তু গাছতলায় দুদুমণি নেই। ভাঙা ডালপালার ছড়াছড়ি। ঝড়টা জোর হয়েছে ঘুমের মধ্যে টের পায়নি। কিংবা তার মনে

হয় সে জেগেই ছিল, সে তো বৃষ্টি পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার থেকে সায়া সেমিজ শাড়ি তুলে নিয়ে ঘরে রেখেছে, ঝড় প্রবল হলে সে টের পেত। কিংবা ঝড় শুকনো ডালপালা খসিয়ে উড়ে গেছে, তারপর ঝুপঝাপ বৃষ্টির শুরু। টিনের চালে বৃষ্টির ফোটায় মনোরম শব্দ শুনেই হয়তো তার ঘুম ভেঙে গেছে।

গাছতলায় দুদুমণি নেই। বাঁশঝাড়ের দিকেও গেল, বাড়িটার সঙ্গে বিরজাসুন্দরীর এতো ভাব যে কখন কোথায় গিয়ে চুপচাপ বসে থাকবে বলা যায় না। অবলম্বন বলতে, সে আর এই বাড়ির গাছপালা। পাতা থেকে শুকনো ডাল সবই বড় দরকারি—সবই জড় করে রাখা স্বভাব। কোথায় কী জড় করছে কে জানে। পুকুরপাড়ের দিকটায় যদি থাকে। নারকেল গাছগুলি দুদুমণির চিরশত্রু। কচিকাচা ডাবও গাছে রাখা যায় না। কে যে কখন সব চুরি করে নিয়ে যায়। এই গাছগুলি নিয়ে বিরজাসুন্দরী ঝড় ফাঁপড়ে আছে।

না নেই। সব ফেলে, না বলে না করে উধাও।

কী যে করে!

ফের বারান্দায় উঠে দরজার শেকল খুলে টুকু ভিতরে ঢুকল। তারপর রান্নাঘরে ঢুকে অবাক। বিরজাসুন্দরীর সাদা পাথরের রেকাবিতে ভাত, কালো পাথরের বাটিতে ডাল, ভাজাভুজি যেমনকার তেমনি পড়ে আছে। কিছু মুখে দেয়নি।

টুকুর বুকটা ছাঁত করে উঠল।

না খেয়ে বের হয়ে গেছে!

কোথায় যেতে পারে? তার মাথা গরম হয়ে যাচ্ছিল—ঠিক আবার কোনো ধান্দাবাজের পাল্লায় পড়ে গেছে। ঘটক সেজে সবাই উপকার করতে আসে।

তা ঠাইনদি, পাত্র বড়োই সুপাত্র। আপনার টুকুকে একবার দেখতে চায়। বলেন তো পাত্রের বাবা মাকে আসতে বলি।

তখন বুড়ির যে কী হয়! সাপের পাঁচ পা দেখে। এরা যে টাকা হাতড়াবার তালে থাকে কিছুতেই বিরজাসুন্দরীকে বোঝানো যাবে না। গাড়ি ভাড়ার নাম করে পালান কাকাই কতবার টাকা নিয়ে গেল। ঠিকমতো দুধ জোটে না, কৃপন স্বভাবের বিরজাসুন্দরী ফোকলা দাঁতে হাসিটি জুড়ে দিয়ে বলবে, যার কেউ নেই, তার ভগমান আছে, তোরা আমার ভগমান।

এখন যে আর এক ভগমানের পাল্লায় পড়ে গেছে টুকুর বুঝতে অসুবিধা হয় না।

গন্ধর্ব কবচ। সকালেই একবার বিড়বিড় করে বকেছে, হাতে গলায় যেখানেই হোক তিথি নক্ষত্র দেখে ধারণ করতে হবে। আজই সেই তিথি নক্ষত্রের সময় যদি উপস্থিত হয়,

কে জানে তারই টানে বের হয়ে গেল কি না।

যা খুশি করুক।

কিন্তু টুকু যাই বলুক, তারই হয়েছে জ্বালা। বড়োমামা মাসেহারা পাঠিয়ে খালাস। মাসের এক তারিখও পার হয় না, রাস্তায় গিয়ে বসে থাকবে। পিওন সুবলসখা যদি সাইকেলে যায়। রাস্তায় দেখা হয়ে গেলে বলবে, খোকার টাকা হয়েছে?

রোজ রোজ কে আর জবাব দেয়, জবাব না দিলেই মাথা গরম বিরজাসুন্দরীর।—তোর বাপের টাকা, বাপ ঠাকুরদার চোদ্দোগুষ্টির উদ্ধার। তারপর টুকুকে ভিজা গলায় বলবে, যা না পোস্টঅফিসে, সাইকেলে যেতে কতক্ষণ। দীনুকে বলবি মাসের আট তারিখ, মানি অর্ডারের নাম গন্ধ নেই।

তখনই বিরাম মাঝির বাউন্ডুলে ছেলে শরদিন্দুকে দেখে টুকু অবাক। টুকু বারান্দা থেকে মুখ বার করে দেখল, শরদিন্দুই। সবাই বলে খ্যাপা। সে ভাবে বাউন্ডুলে। লোকে খ্যাপা বললে তার রাগ হয়। লোকের কী দোষ, বাপই বলে বেড়ায়, মাথা খারাপ, ছেঁড়া ফাটা জামা কাপড় পড়ে বেড়ায়, আমার কীসের অভাব! মাথার দোষ না হলে কেউ এ-ভাবে ঘুরে বেড়াতে পারে। নিখোঁজ ছিল কতদিন। মাঝে মাঝেই নিখোঁজ হয়ে যায়। আগে থানা পুলিশ, ঘুরাঘুরি শেষ ছিল না। এখন সব হয়ে গেছে। দুদুমণি খোঁজ খবর নিতে গেলে এক বাক্যে সারা—পুত্র আমার পর্যটনে বের হয়েছে ঠাইনদি। পর্যটন ফেরে বাড়ি ফিরবে।

এবারে পর্যটন সেরে ফিরে এলে বিয়ে দিয়ে দাও। ঘর বাড়িতে শেকড় না গজালে থাকবে কেন! মন উড়ুউড়ু। তোমারও তো এই বয়েসটা ছিল, বোঝো না কষ্টটা কীসের।

সব বুঝি ঠাইনদি। তবে দেবেটা কে। একখানা কলসি সঙ্গে দিলে সুবিধে হয়। পুত্র আমার মূত্রের সমান ঠাইনদি। কিছু আর ভাবি না। যা আছে কপালে হবে।

এ-কথা বলতে নাই। দশটা না পাঁচটা, এক ব্যাটা তোমার। মুখে আগুন দিতেও লাগবে। কবিরাজ দেখাচ্ছিলে না।

ও নিজেই ধন্বন্তরী, বলে কিনা, সব উজাড় হয়ে গেছে, কিচ্ছু নেই, ধাপ্পা, লোক ঠকানো ব্যাবসা। আনারসের ডিগ চিবিয়ে খাচ্ছে—সঞ্জিবনী সুধা পান করছে ভাবে। ঘরে ক-দিন মানুষ থাকে—ঘর তার ভালো লাগে না। মা জননী চোখের জল ফেললে এক কথা, জগজ্জননী বৃহৎ ব্যাপার। মহাবিশ্ব নিয়ে তার কারবার ঠাইনদি। লেখাপড়াই ব্যাটার কাল বুঝলেন ঠাইনদি। আপনার বউমারে কত বুঝিয়েছি, দ্যাখো আমি মুদির ব্যাটা, নম নম করে আতপ চাউল ছিটাতে জানলেই হয়, বেশি বিদ্যার দরকার নাই। শুনল না, শহরে পাঠাল দিগগজ করতে, নে এবারে বোঝ—মাথায় কাকের বাসা নিয়ে হাজির। যখন তখন ডিম পাড়ছে আর এদিক ওদিক উড়ে যাচ্ছে। সাধ্য কী আটকায়।

দুদুমণির কার সঙ্গে কী কথা হয় বাড়ি ফিরে বলা চাই। শরাটা আবার পাগল হয়ে গেছে টুকি। বাড়ি থেকে পালিয়েছে—বিরাম বাজারে যাবার সময় বলে গেল, টুকুর কাছে যদি যায়, খবর দিতেন। সে তো কবেকার কথা। মাসখানেক হয়ে গেল। শরা দেশান্তরী হয়েছিল, ফিরে এসেছে তবে।

এদিকেই আসছে। বাড়ি ঢোকার রাস্তা থেকেই চিৎকার করছে, জয় টুকুদির। কতদিন তোমাকে দেখি না টুকুদি। থাকতে পারলাম না। ভাবলাম যাই দেখি, টুকুদির হাতের যশ দেখি। ওই যে তুমি কাঁথায় চন্দ্র সূর্য নামিয়ে আনবে বলেছিল, সেই বল কাল। চন্দ্র সূর্য নামাতে পারলে!

টুকুর সূচিশিল্পে যশ আছে। সুচসুতোর মধ্যে প্রাণের রস সঞ্চার না করতে পারলে এমন ছবি নাকি ফুটে ওঠে না। দু-দুবার তার হাতের কাজ প্রদর্শনীতে প্রাইজ পেয়েছে। নকশি কাঁথার বাজার আছে এমনও শুনেছে সে। কাঁথার ফুল ফল গাছের ছায়া আকাশ এবং চন্দ্র সূর্য নিয়ে পড়ে আছে শরার কথাতেই। কত খবর রাখে, তা ঘোরাঘুরি করলে খবর না রেখেই বা উপায় কী!

শরাই কলেজ একজিবিশনে প্রায় জোরদার করেই দুটো তার হাতের কাজ নিয়ে যায়। শরা জোরজার না করলে হত না। শরা এক সকালে এসে ডেকেছিল, টুকুদি আছ?

কে?

আমি শরা টুকুদি। তুমি কোথায়?

ঘরের ভিতর টুকু ঝাঁট দিচ্ছিল। সে ঝাঁটা হাতে নিয়ে উঁকি দিলে বলেছিল, ও বাবা হাতে ঝাঁটা, ঝাঁটাপেটা করবে! কী দোষ করেছি!

তোর আজ কলেজ নেই।

কলেজেই যাচ্ছি। কলেজ কম্পাউন্ডে মেলা বসবে। বই-এর মেলা—সঙ্গে হস্তশিল্প। ভাবলাম টুকুদির কাছ থেকে দুটো হস্তশিল্প নিয়ে যাই—চোখ ধাঁধিয়ে দেই।

হয়েছে থাক। বোস।

সাইকেল থেকে নামাল না পর্যন্ত।

কই দেখি।

পাগলামি করবি না।

আচ্ছা তুমি কী টুকুদি! আমি তোমার সঙ্গে মিছে কথা বলতে পারি! ঘরে পড়ে থাকলে কে মর্ম বোঝে। দেখই না দিয়ে।

না কিচ্ছু হয়নি। তুই যা।

কেন ওই যে দুটা ময়ূর উড়ে যাচ্ছে, ওটা দাও। আর পাহাড় ঝরনা নদী আছে যেটায় ওটা দাও।

বোকার মতো কথা বলবি না তো! বাড়ি বসে থাকি, কিছু নিয়ে থাকতে হয়। দুদুমণির মতো তোরও দেখছি আমার সবকিছুতেই যশ খুঁজে পাস।

যশ না থাকলে কে কার প্রশংসা করে! দাও তো। আমার সময় নেই। মেলা কাজ। আমরা আর্টসের ছাত্ররা স্টল নিয়েছি আলাদা। ওখানে বাঁধিয়ে রাখব। লোকে আমার টুকুদির কাজ দেখে ভিড়মি খাবে—কী আনন্দ। দেরি কর না টুকুদি। ঝাঁটা ফেলে শিল্পটুকু দাও তোমার।

এরপর আর পারে!

নে নিয়ে যা। হারবি না কিন্তু। হারালে দুদুমণির চোপার চোটে ভূত পালাবে বলে দিলাম। যা মুখ!

বড়ো ছেলেমানুষী স্বভাব শরদিন্দুর। বয়সে তার বয়সিও না, বড়ই হবে, অথচ সেই ছেলেবেলা থেকেই টুকুদি টুকুদি করে। আর সে বামুনের নাতিন বলে হেয় জ্ঞান করার স্বভাব আছে তার। মাঝির বেটা কলেজে পড়ে এটাও হেয় জ্ঞানের কারণ হতে পারে। অথবা কিছুই হয়তো নয়, অভ্যাস, কেউ যদি দিদি দিদি করে আনন্দ পায় সে বাধা দেবার কে?

শরার এখন সাইকেলখানা কোথায় টুকু জানে না। এমন সুন্দর ছেলেটার মাথা খারাপ ভাবতেও খারাপ লাগে। না ভেবেও উপায় নেই, কলেজ কবেই ছেড়ে দিয়েছে। বই পড়ে, তবে ভারী ভারী বই। এই সব বইই নাকি তার মগজে ঘুণপোকা ঢুকিয়ে দিয়েছে। তার এক কথা, টুকুদি, এই মহাবিশ্বটি বড়ো আজব কারখানা। ভাবলে মাথা ঘোরায়। কত আজগুবি কথাও যে শরা বলে।

উঠোনে দাঁড়িয়েই শরা এদিক ওদিক চুপি দিল। কেউ নেই। গেল কোথায়! সে ফের ডাকল, গেলে কোথায় টুকুদি, তোমার জয় দিলাম। মুখখানাও দেখলাম বারান্দায়, তারপর কোথায় অদৃশ্য হয়ে আছ।

সে সাড়া দিল না।

দুদুমণি না খেয়ে না বলে কোথায় চলে গেছে, খারাপ লাগে না! সে যে গলার কাঁটা দুদুমণির তাও বোঝে। তাই বলে গন্ধর্ব কবচ, হয়! মানুষের বিবেক সাফ না থাকলে কিছু হয় না। বিবেক সাফ থাকলে কি শেষে শরা হয়ে যেতে হয়।

টুকুদি তোমার আবার জয় দিচ্ছি। একবার বের হও না। কতদিন পর এলাম, একবার ঝলমলে দেবী মুখখানা দেখি। আরে বাবা, গাছে তোমাদের কত আম। ওই গাছটা কথা বলতে পারে। গাছে রাশি রাশি আম ঝুলছে, কাঠবিড়ালি উঁকি দিয়ে আছে। কাক শালিখ উড়ে আসছে—তাজ্জব ব্যাপার, আর গ্রহপুঞ্জ ঘুরছে টুকুদি। একটা ফলের মতো ঝুলে আছে, ঘুরছে ঘুরছে। ছবিটা ভারি মজার না টুকুদি। চন্দ্রসূর্য নামল?

না বের হলে রক্ষা নেই। সারাক্ষণ উঠোনে দাঁড়িয়েই বকবক করবে।

বের হয়ে টুকু বলল, কবে ফিরলি? মন ভালো নেই, বকবক করিস না, বাড়ি যা।

চন্দ্র সূর্য নামল!

কাঁথার নকশাতে চন্দ্র সূর্য চায়—গাছপালা, ফল ফুল পাখি চায় শরা। খোঁজ নিতে এসেছে, কাঁথাখানায় কাজ শেষ, না বাকি আছে। সে দেখতে চায়। মন কেমন নরম হয়ে গেল টুকুর বলল, বোস।

বলে টুকু একখানা জলচৌকি এগিয়ে দিল।

ঠাইনদিকে দেখছি না।

কোথায় গ্যাছে। মুখে কিছু দিল না, ঘুম থেকে উঠে দেখি নেই। চা খাবি।

দাও। লিকার দেবে। দুধ দেবে না।

কোথায় ছিলি এতদিন।

কুরুক্ষেত্র গয়াগঙ্গা সব ঘুরে এলাম। পৃথিবীটা একটা মস্ত ব্যাপার, অতি ক্ষুদ্র অণু তবে এমনিতে কিছু বোঝা যায় না। ব্রহ্মাণ্ড বোঝ? ব্রহ্মাণ্ড রোজ লক্ষ কোটি আন্ডা দিচ্ছে জানো। কুম্ভীচক্রে ঘুরছে। কত লক্ষ কোটি বিশ্ব নিয়ে মহাবিশ্ব—ভাবলে মাথা খারাপ।

মাথা খারাপের আর কাজ নেই। বাড়ি যা।

চা খাই। কতদিন পর এলাম। তোমার কাছে বসতে ইচ্ছে করছে। তাড়িয়ে দিচ্ছ কেন।

টুকু খড়কুটো জ্বেলে আলগা উনুনে চা করল, দু-কাপ চা, এক কাপ শরাকে দিতে গেল বারান্দায়। শরা নেই।

এই গেলি কোথায়!

এই এখানে দিদি। আমগাছতলায় দাঁড়িয়ে সাড়া দিচ্ছে।

চা ঠান্ডা হয়ে যাবে।

শরার এই এক দোষ। বাড়িটায় এলে যেতে চায় না। গাছপালার ছায়ায় ঘুরে বেড়াতে ভালোবাসে। এতটা জমি ফুলের বাগান বাঁশঝাড় নিয়ে বাড়িঘর কম মানুষেরই আছে। জমি

কেউ রাখছে না—বেশি দরদামে জমি বেচে দিচ্ছে। বড়োমামা বাপের জমি বেচে দিতে রাজি না। চলে যখন যাচ্ছে, জমি ভাগ করে কী হবে। ছোটোমামা মেজমামা গাইগুঁই করলে কী হবে, তাঁর এক কথা। মা বেঁচে থাকতে জমি ভাগ হবে না। জমি বন্টননামা না হলে যা হয়, পড়ে আছে—দুদুমণির রাজত্বে কেউ বড়োমামার ভয়ে হাত দিতে সাহস পাচ্ছে না। এতে বিরজাসুন্দরীর তেজ আরও বাড়ছে।

না খেয়ে কোথায় বের হয়ে গেলেন!

শরা এখন না এলেই যেন ভালো ছিল। মিল খোলা থাকলে বেলার আন্দাজ মাথায় থাকে। বন্ধ বলে মিলের ভোঁ বাজে না। হাতঘড়িটা তপনকাকার দোকানে পড়ে আছে। খুবই স্লো যাচ্ছে ঘড়ি। কটা বাজে বুঝতে পারছে না। বৃষ্টি হয়ে যাওয়ায় বেশ ঠান্ডা বাতাস দিচ্ছিল। সাইকেল বের করে একবার বড়ো মাসিকে খবরটা দেওয়া দরকার। বাড়ি খালি রেখেই তাকে যেতে হয়। নধর অবশ্য বারান্দায় শুয়ে থাকবে। বলে গেলেই হল, আমি আসছি। বিরজাসুন্দরী কোথায় না খেয়ে বের হয়ে গেল, মাসিকে খবরটা দিতে হয়। সারমেয়টি খুবই অনুগত—কী করে যে সব বোঝে! বের হবে ঠিক করছিল, শরা এসে হাজির। কী করে যায়।

টুকুদি তোমার বিয়ের কিছু হল! শরা বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে কথাটা বলে ফেলল। শরা সবই জানে, বিরজাসুন্দরী তাকে নিয়ে আতান্তরে আছে, তাও জানে, মাঝে মাঝে এই প্রশ্নটা প্রতিবেশীরাও কেন যে করে ফেলে। আগে চেঁচামেচি করা, বিয়ের কথা বললে গা জ্বলে যাবারই কথা। তাকে নিয়ে সবাই মজা করছে ভাবত, শরাও বলত, শরার কথায় রাগ করতে পারত না। শরাকে খুব ব্যাকুল দেখাত। সামান্য খুঁত আছে শরীরে। তাই বলে কী মেয়েদের বিয়ে হয় না!

চা-এর কাপ নামিয়ে কী ভেবে টুকু থামল। খুব গরম চা। খেতে তার খারাপ লাগে। তাড়াতাড়ি থাকলে প্লেটে ঢেলে খায়। এখন তাড়াহুড়ো নেই, কতদিন পর শরা এসেছে। তার ভালোই লাগছিল। দেশ বিদেশ ঘুরে এলে দাড়ি গজিয়ে যায়। প্যান্ট সার্ট নোংরা হয়ে যায়। ছেঁড়া তালিমারা প্যান্ট পরেও চলে আসে। বোধহয় সে এখন বাড়িতেই আছে। চুল শ্যাম্পু করেছে। গোঁফ রেখেছে। মুখে চোখে সরল বালকের মতো মনে হয় দেখলে। টুকু যা বলবে তাই বিশ্বাস করবে।

তুমি হাসলে যে টুকুদি।

হাসব না। আমার কবেই বিয়ে হয়ে গেছে। তুই খবরই রাখিস না। তুই এতো বোকা।

বিয়ে।

হ্যাঁ বিয়ে।

কার সঙ্গে।

গাছের সঙ্গে।

গাছের সঙ্গে বিয়ে হওয়াটা কী ভালো টুকুদি।

ভালো মন্দ বুঝি না। তুই আর কোনোদিন বলবি না, টুকুদি তোমার বিয়ের কী হল! কী ঠিক তো!

শরা কী ভাবল কে জানে। সে উঠে পড়ল। গাছের সঙ্গে বিয়ে হয়ে যাওয়ায় সে ক্ষুণ্ণ হয়েছে, অন্তত টুকু শরার মুখ দেখে এমনই ভাবল।

আমি যাই। নীলুমাসির খবর কি! আসে?

আসে।

সুধাদি চলে গেছে?

সুধাদি প্রাইমারি ইস্কুলের মাস্টারনি। কোনো খবরই রাখিস না। সুধার বর তাকে ফেলে চলে গেছে।

সুধাদিকে বল, আমি ফিরে এসেছি। কোথাও আর এখন যাচ্ছি না। তোমার নকশিকাঁথায় চন্দ্র সূর্য নামলে আসব।

বোস। এখন যাবি না। একবারে নরেন সাধুর কাছে ঘুরে আয়। মনে হয় বিরজাসুন্দরী সেখানে গিয়ে বসে আছে। আমার সাইকেলটা নিয়ে চলে যা। না গেলে মাসিকে খবর দিতে হবে। বিরজাসুন্দরী ধনুরাঙা পণ, কিছুতেই ঘরের খুঁটি করে রাখবে না। আমাকে তাড়াবে।

কোথায় তাড়াবে।

কী জানি। যা, বসে থাকিস না।

বড়ো অনুগত শরা। সে সাইকেল বের করে বিরজাসুন্দরীর খোঁজে বের হয়ে গেল।

সঙ্গে সঙ্গে নধরও সাইকেলের পেছনে ছুটতে থাকলে, শরা ডাকল, টুকুদি দ্যাখ তোমার নধর আমার পিছু নিয়েছে। ঘেউ ঘেউ করছে। তোমার সাইকেল ধরেছি বলে রাগ করছে।

টুকু ডাকল, নধর এদিকে আয়। শরা সাইকেল নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে না। এক্ষুনি ফিরে আসবে। আয় বলছি।

নধর এক লাফে বারান্দায় উঠে পায়ের তলায় শুয়ে লেজ নাড়তে থাকলে টুকুর চোখে জল এসে গেল।

দুদুমণি না খেয়ে কোথায় বের হয়ে গেল!

বড়মামা লিখেছে, টুকু কিছু করুক। এত দাবিদাওয়া—দেবে কোত্থেকে। আমার ঘাড়েও তো তিন তিনটি মেয়ে।

কিছু করুক। কী করবে বুঝতে পারছে না। সকালে কটা বাচ্চা বাড়িতে এসে পড়ে যায়। অজ আম ইট-অ পড়ায়। ক খ লিখতে শেখায়—নামতা পড়ায়। মাত্র পাঁচ টাকা করে পায়। এতে তার ত্রিশ টাকা উপার্জন হয়। তারপর আর কি করা যায়—সে সাইকেলে মাসির বাড়ি যাবার সময়, অথবা শহরে যদি যায়, চারপাশের লোকজন দেখে—কেউ বসে নেই। সে কোনোদিন ভাবে বড়ো রাস্তায় মোড়ের মাথায় চায়ের দোকান দিলে কেমন হয়। বিরজাসুন্দরীকে কথাটা বলতেই, কী চোপা—চায়ের দোকান দিবি! কী বললি, তুই, মজুমদারের নাতনি চা-এর দোকান দিয়েছে! মান সম্মান তুই বুঝবি না। তোর মামারা জানতে পারলে আগুন জ্বলে যাবে। তাদের বাড়ির মেয়ে চায়ের দোকান দিয়েছে রাস্তায়! শেষে তুই আরও কি দোকান খুলে বসবি কে জানে।

আরও কী দোকান খুলে বসবি কথাটাতে কত কুৎসিত ইঙ্গিত দুদুমণি বোঝে না। চায়ের দোকান, এই যেমন, তার যা সামান্য টাকা আছে, টালির চাল, বাঁশের বেড়া, দুটো টুল, একটা কেটলি, কিছু গ্লাস আর একটা বড়ো মাটির হাঁড়ি, গামলা—হয়ে যাবে মনে হয়েছিল। একটা স্বপ্ন। তার কাঁথাখানার কাজ শেষ হলে আরও কিছু পয়সা আসবে। শরাই মাধববাবুর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছিল। শহরে হস্তশিল্পের একটি দোকান আছে তার। ভালো দামই দেবে। তবে বড়ো সময় লাগে, দিনরাত স্বপ্ন না দেখলে নকশি কাঁথার চন্দ্র সূর্য নামে না। করে যে শেষ হবে, কবে যে নামবে, কখনো জ্যোৎস্না রাতে উঠোনে নকশিকাঁথাখান মাদুরে বিছিয়ে বসে থাকে।

বাড়ি থেকে বিশেষ বেরও হতে পারে না। সামান্য খুঁড়িয়ে হাঁটে বলে মানুষের নজর বড়ো বিপাকে ফেলে দেয়। সে হেঁটে গেলে—এতো কী দেখার আছে বোঝে না। হাঁটাহাঁটি যেটুকু পাড়ার মধ্যে। পাড়া থেকে বের হলে সাইকেল, পরিচিত কেউ ডাকলে, সে মাটিতে এক পা রেখে সাইকেলে বসেই কথা বলে। কত উড়ো কথা কানে আসে, অপরিচিত যুবকদের চোখ তাঁর খুঁড়িয়ে হাঁটার মধ্যে আনন্দ খোঁজে। সেটা যে কী সে ভালোই বোঝে।

মাসির বাড়িতে বড়ো আয়নায় তার খুঁড়িয়ে হাঁটার মধ্যে কোনো যৌনতার ছবি থাকে কিনা সে সুযোগ পেলেই খুঁজে দেখে। সে ঘাড় ঘুরিয়ে নিজেকে দেখে। তার পেছনটা বড়ো বেশি দোল খায়। এমনিতে সে স্থূলকায় নয়, শরীরের গড়ন খুবই তার মজবুত। ঈশ্বর তাকে লাবণ্য এবং সুষমা দুইই দিয়েছেন। খুঁড়িয়ে হাঁটার জন্য পেছনটা তার একটু বেশি ওঠানামা করে। মানুষের লুব্ধ দৃষ্টি তার দিকে এতো কেন তাও বোঝে।

দোকানের কথাতে বিরজাসুন্দরীর একদিন কী চোপা! চায়ের নেশা না ছাই, তোর নেশাতেই দোকানে ভিড় বাড়বে। এটা বিরজাসুন্দরী দশভাতারির মতো ভাবে। নাতনি দশভাতারি হলে বিরজাসুন্দরীর মরণ। গলার ফাঁস।

বিরজাসুন্দরী কেন, মামাদেরও চটাতে সে সাহস পায় না। তার সমবয়সিরা কেউ বসে নেই। সবাই স্বামীর ঘর করছে। তারা বেড়াতে এসে খোঁজখবরও নেয়। কোলে কাঁখে বাচ্চা থাকে। স্বামীর এলেম কত কোলে কাঁখে বাচ্চা নিয়ে এসে দেখিয়ে যায়।

বিরজাসুন্দরী মনে মনে তখন খুবই অপ্রসন্ন। আমার টুকুর বিয়ে হচ্ছে না, তোরা শরীর খালি করে মরদ নিয়ে পড়ে আছিস, টুকুর কি আমার শরীর নাই।

তারও খারাপ যে লাগে না তা নয়। তার তো একজন পুরুষ সত্যি দরকার। সে কাকে অবলম্বন করে বাঁচবে। তার শরীর এতো মজবুত, যে রোগ বালাই পর্যন্ত নেই। শরীরে রোগ ভোগ থাকলেও কিছু নিয়ে সে থাকতে পারত। কত রাতে যে তার ঘুম হয় না। এ-পাশ ও-পাশ করে। উঠে জল খায়। বিরজাসুন্দরী ঠিক টের পায়।

সে রাতে উঠলেই টের পায় বিরজাসুন্দরী জেগে আছে।

বাইরে যাবি।

না।

উঠলি যে।

জল খাব।

দুগগা দুগগা।

জল খাওয়ার সঙ্গে দুগগা দুগগা বলার কি আছে টুকু বোঝে না। পরে ভেবে দেখেছে, দুদুমণি টের পায়—এই জলতেষ্টা কেন। এতো রাতেও টুকু না ঘুমিয়ে থাকে কেন। জল তেষ্টা পায় কেন!

সকালে উঠেই টুকু দেখতে পায়, দুদুমণি পাটভাঙা সাদা থান পরে, নামাবলি গায়ে দিয়ে কোথায় বের হচ্ছেন।

কী হল, সাত সকালে কোথায় যাচ্ছ।

যাচ্ছি মরতে।

কোথায় কার কাছে মরতে যাচ্ছ বলে যাবে না।

না, বলে যাব না।

না বলে গেলে, দেখবে এসে আমিও বাড়ি নেই।

বুড়ি জব্দ।

হরতুকির কৌটাটা আবার রাখলাম কোথায়। টুকুদিদি, খুঁজে দে না। আমি এক্ষুনি ফিরে আসছি। কোথাও বের হলেই তুই এতো ফোঁস করিস কেন। আমিতো চেষ্টা করছি।

না আর চেষ্টা করতে হবে না। বের হবে না। তোমার জন্য মুখ দেখাতে পারি না। কী রে তোর দুদুমণি সকালে উঠেই কোথায় বের হল। যা গরম পড়েছে—কী রোদ, ছাতা মাথায় কোথায় যাবে! তোর দুদুমণির গোরু খোঁজা চলছে, কবে যে শেষ হবে।

এটা যে প্রতিবেশীদের কটাক্ষ, দুদুমণি কিছুতেই বোঝে না। দুদুমণি শুনতে পেলে বলবে, তা মা যা বলেছ, গোরু খোঁজাই সার, পাচ্ছি না। এসব কথা শুনলে তার সত্যি মরে যেতে ইচ্ছে হয়।

সুধার বাবা যে যেতে বলল!

বলুকগে।

বিরজাসুন্দরী অগত্যা সেদিন বারান্দায় বসে পড়েছিল। কিছুটা সান্ত্বনা দেবার মতো যেন বলা, আরে বিবাহ কী সহজ কথা, সাত মন ঘি না পুড়লে পাকা কথা হয় না। বিধির নির্বন্ধ, তাই বলে তো হাত পা গুটিয়ে বসে থাকতে পারি না, কপালের নাম গোপাল তাও বুঝি—যখন হবার ঠিকই হবে, তবে মন যে মানে না।

তুমি যাবে না সোজা বলে দিলাম। অনেক বিভ্রাট বাধিয়েছ, লোক হাসিয়েছ। সুধার বাবা উদ্ধার না করলেও চলবে।

লোক হাসালাম! কবে?

হাসালে না, যাকে রাস্তার দ্যাখ তার কাছেই বলবে, তোরা আমার ভগবান। কাকে না বলেছ, পালান কাকা, অধীর কর্মকার, মানিক দাস কে না সুযোগ বুঝে তোমার কাছ থেকে টাকা হাতিয়ে নিয়ে গেছে। আমাকে তুমি কী ভাব। যাবে না বলে দিলাম—এক কথা।

আমার অন্য কাজ আছে। তোর জন্য ভাবতে আমার বয়েই গেছে।

কী কাজ বল, আমি করে দিচ্ছি। কাকে খবর দিতে হবে বল, ডেকে নিয়ে আসছি। তুমি আমার পাত্রের খোঁজে এক পা বাড়ি থেকে বাড়িয়েছ তো, আমার মরা মুখ দেখবে।

তখনই বুড়ির কী কান্না।

তুই কী বললি টুকু, মরা মুখ, তোর মা নেই, আমার কেউ নেই, থাকলে তুই এতো বড়ো কথা বলতে পারতিস! তাপরই ঘরে ঢুকে গায়ের নামাবলি তক্তাপোষে ফেলে দিয়ে একেবারে নিরাসক্ত গলায় কথাবার্তা, আমার কী, এতো যার মান, তাকে বিয়েটা করবে কে! দু-দিন বাদে ফেরত দিয়ে যাবে।

সেই থেকে অনেকদিন চুপচাপই ছিল। কোথাও বের হত না। আজ কী হল কে জানে, আবার বের হয়ে পড়েছে।

কুকুরটার দিকে টুকুর চোখ গেল।

বেইমান।

দু-জনে ঠিক শলাপরামর্শ করেই বের হয়েছে। না হলে, নিশ্চিন্তে নধর বারান্দায় শুয়ে থাকতে পারে।

এই কোথায় গেছে দুদুমণি?

লেজ নাড়ছে। একবার চোখ তুলে তাকে দেখল। আবার মুখ গুঁজে দিল পেটের দিকে।

তোমার আরাম বের করছি।

বলেই টুকু তাড়া লাগাল কুকুরটাকে। কুকুরটা লাফ মেরে উঠোনে নেমে গেল।

বের হ। যেদিকে চোখ যায় চলে যা। দুদুমণি গেছে, তুইও যা। থেকে কী হবে!

তখনই শরা সাইকেল চালিয়ে সোজা উঠোনে ঢুকে গেল।

গেছে?

নরেন সাধুর কাছে গেছে।

শরা সাইকেল থেকে লাফিয়ে নামল। তারপর বলল, এক গ্লাস জল দাও টুকুদিদি। নরেন সাধুর থানে মচ্ছব। ঠাইনদি পর্যন্ত খাটছে।

টুকুর মাথা গরম হয়ে গেল। দণ্ডি খাটছে এই বয়সে। বুড়ি মরবে। কুলো মাথায় রোদে বৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে সারাদিন মন্দির প্রদক্ষিণ করা সোজা! মানত করেছে বুড়ি। মানত না করলে সাধুর পাল্লায় পড়ে গেছে। সর্বস্ব যাবে। খায়ওনি। নরেন সাধু তুমি মানুষ! ঠাকুরের নামে দুদুমণিকে দণ্ডি খাটাচ্ছ, তোমার পাপ হবে না। গন্ধর্ব কবচ পেতে হলে দণ্ডি খাটতে হয়, বললেই হয়েছে! বিরজাসুন্দরী না খেয়ে, তাকে লুকিয়ে তবে সেই গন্ধর্ব কবচ আনতে গেল। দুদুমণি তাকে নিয়ে কত অসহায় এটি ভাবতে গিয়ে তার দু-চোখ ভিজে গেল। যে যা বলছে, করে যাচ্ছে।

টুকুদি, নরেন সাধু জানোয়ার।

টুকু কী করবে বুঝে পাচ্ছে না। সে ভিতরে কেমন অস্থির হয়ে পড়ছে। সেখানে তার ছুটে যাবারও ক্ষমতা নেই। সাধুর থানে শনি মঙ্গলবারে পাঁঠা পড়ে। তিথি নক্ষত্র বুঝে লোকে হত্যে দেয়। যার যা মনস্কামনা পূর্ণ হয়। বাজার পার হয়ে রাজবাড়ির রাশতলায় এখন সাধুর আশ্রম। গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, মাথায় লম্বা টিকি, টিকিতে জবাফুল বাঁধা।

জরা ব্যাধি মৃত্যুর হাত থেকে মানুষ রেহাই পেতে চাইলে থানে যেতেই হয়। মানত করতে হয়।

সাধুর চেলা কালীপদই একদিন বারান্দায় বসে বলে গেছে, ঠাইনদি, সব গ্রহ নক্ষত্রের অবস্থানে হয়। টুকুর কুষ্ঠিটা দেবেন, বিচার করে দেখব।

কালীপদ আচার্য বামুন। গ্রহরাজ বলতে কথা। গাছের পাকা পেপে থেকে, কাঁঠালের দিনে কাঁঠাল, আমের দিনে আম সবই সে পায়। দাদু বেঁচে থাকতেও দেখেছে, কালীপদ এলে, ফল- মূল তার হাতে তুলে দিয়ে দাদু তৃপ্তি পেতেন। গ্রহরাজ সন্তুষ্ট থাকলে বাড়ির অমঙ্গল হয় না। কুষ্ঠি ঠিকুজিও সেই করে দেয়। বাড়িতে তার আগমন সব সময়ই শুভ সময়ের কথা বলে। তাকে নিয়ে আতান্তরে পড়ে গেছে বিরজাসুন্দরী সে ভালই জানে। সেই বলে গেছে বোধহয়, সাধুর কাছে যাবেন, বিধান মতো তাঁর কাজ করে দেখুন—ফল হাতে নাতে পাবেন।

ইদানীং টুকু দেখেছে, দুদুমণি, সূর্যস্তব পাঠ করছেন। সকালে উঠে সূর্যপ্রণাম। শেষে এই দণ্ডি খাটা। সে খেপে যাবে শুনলে—ভেবেই হয়তো লুকিয়ে চলে গেছে।

কী শরা।

একবার বড়ো মাসিকে খবরটা দিতে হয়।

এই শরা চলত আমার সঙ্গে।

কোথায় যাবে?

বড়োমাসিকে খবরটা দিই। দুদুমণির মাথা খারাপ হয়ে গেছে।

নীলুমাসিকে এখন পাবে? স্কুল আছে না। স্কুল থেকে কি ফিরেছে!

সে বলল, কটা বাজে।

ঘড়িতে সময় দেখে বলল শরা, চারটা বেজে গেছে।

আকাশ মেঘলা বলে কটা বাজে বুঝতে পারছিল না টুকু। মাসি বাড়িতে এখনও ফেরেনি। মেসো ফিরতে পারে। মেসোর স্কুল বাড়ির কাছেই। খুব টিউশানি করে, এখন গরমের ছুটি বলে তাও নেই। মেসো বাড়ি থাকতেই পারে। তবে ক্লাবে গিয়ে বসে থাকলে মুশকিল। বোনটাও বাড়ি থাকলে এক্ষুনি চলে যেতে পারত। কলেজ হোস্টেলে থাকে বলে বাড়ি খালি পড়েই থাকে। কেউ না থাকলে, যা হয়, তালা দিয়ে যায় মাসি। মেসোর কাছে ডুপ্লিকেট চাবি থাকে, তবে তার যে একদণ্ড আর এই বাড়িতে থাকতে ইচ্ছে হচ্ছে না। এক্ষুনি ঘরের দরজায় শেকল তুলে তালা দিয়ে বের হয়ে পড়তে পারলে বাঁচে।

ক্রোশখানেক রাস্তা সাইকেলে যেতে দশ বিশ মিনিট—কিন্তু গিয়ে যদি দেখে কেউ নেই, রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকতে হবে।

মেসোদের দিকটাই পাকা রাস্তা, টাইম কলের জল, কারেন্ট সব আছে। পাকা বাড়ি একতলা। ছাদের সিঁড়ি করবে বলে ইট বালি সিমেন্ট তুলে রেখেছে। গরমের ছুটিতে সিঁড়িটা করে ফেলবে। বারান্দায় গ্রিল। উঠোনে ঢুকে ভিতরের বারান্দার দিকটায় যাওয়া যায়। মেসো মাসি কেউ না ফিরলেও তার অসুবিধা হয় না। গ্রিলের ফাঁক দিয়ে হাত ঢোকালেই সদর দরজার চাবি।

মাসিই বলেছে, আমরা না থাকলেও অসুবিধা নেই। কোথায় চাবিটা থাকে দেখিয়ে দিয়েছে। দুদুমণির কত খবর থাকে, এ-বেলা ও-বেলা তাকে মাসির বাড়ি যেতেই হয়। কিন্তু রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকলেই সবার চোখ তার ওপর। টুকু এসেছে আবার। ঠিক বিরজাসুন্দরী মেয়ের কাছে খবর পাঠিয়েছে, টুকুর পাত্রের একটি খোঁজ পাওয়া গেছে। প্রতিবেশীরা জানালা খুলে তাকে দেখলেই টুকুর গা জ্বালা হয়। আজকাল সে চোরের মতো সবার আড়ালে মাসির বাড়ি ঢুকে যায়—সাঁজ লাগলে চুপিচুপি বের হয়ে আসে। সিঁড়ির মালমশলাতে উঠোন ভরতি—সে শত চেষ্টা করলেও চাবিটার নাগাল পাবে না। সেই রাস্তায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে হবে।

কিন্তু আজ সে মরিয়া।

এই শরা চল আমার সঙ্গে।

টুকু ঘরে ঢুকে শাড়ি সায়া পাল্টে নিল। মুখে সামান্য প্রসাধন করল। তারপর দরজা টেনে শেকল তুলে তালা লাগিয়ে দিল।

তকে বের হতে দেখে নধর কোথা থেকে হাজির।

সঙ্গে যাবে।

কারও যেতে হবে না। মনে মনে কুকুরটার দিকে তাকিয়ে গজ গজ করছে টুকু। তাছাড়া খালি বাড়ি রেখে সে যেতেও পারে না। শরাকে পাঠাতে পারত, খবর দিয়ে আয়, দুদুমণি নরেন সাধুর থানে গণ্ডি খাটছে। খবর পেলে মাসি নিজেও ছুটে আসতে পারে। মাসকাবারি রিকশাওয়ালাকে খবর দিলেই হল, রিকশায় চড়ে মেসো না হয় মাসি চলে আসতে পারে। কিন্তু সে একটা কিছু করতে চায়। শরাকে দিয়ে খবর পাঠালে আর দশদিনের মতোই তার প্রতিবাদের কোনো গুরুত্ব থাকবে না। মাসি এসে বলতেই পারে, মা কী করবে! দাদারা মাথা পাতছে না—বড়দা লিখবে, আমার সময় কোথায়, টাকা পয়সা যা লাগে জানাবে। তোর মেসোই বা কী করবে। তারই বা সময় কোথায়। কত সম্বন্ধ এল, দানবের মতো দাবি দাওয়া সব। কে মেটাবে অত খাই।

এ-সব কথা শুনলে টুকুর যে মাথা হেঁট হয়ে যায় কেউ বোঝে না। কোনো কথাই আর তার শুনতে ভালো লাগে না।

টুকু বলল, এই শরা চল। তোর নীলুমাসিকে খবরটা দিতে হবে। আমরা সাইকেলে যাব আর আসব।

সাইকেলে! আমার তো সাইকেল নেই।

তোর সাইকেল না থাকলেও চলবে। তুই না হয় আমি রডে বসব।

তোমার নিন্দামন্দ হবে টুকুদি।

হোক। আমার আর নিন্দামন্দের বাকি আছে কি। মাসিকে খবরটা দিই। নাতনির জন্য বুড়ি নরেন সাধুর থানে দণ্ডি খাটছে। বুড়ি মরবে। আমি কেন মরার ভাগী হতে যাব।

শরাকে খুবই বিচলিত দেখাচ্ছে। টুকুদি রডে বসবে না সে বসবে বুঝতে পারছে না। যেই বসুক লোকেরা চোখ টাটাবে।

টুকুদি আমাকে না নিয়ে গেলে হয় না।

না হয় না।

এই অবেলায় বের হবে? আমাকে নিয়ে বের হলে যে লোকে তোমারও মাথাটি খারাপ ভাববে। তোমার নিন্দামন্দ হবে। লোকে কুকথা বলবে।

তুই যাবি, না বকবক করবি।

শরা আর কী করে। টুকুদির চুলের গন্ধ পাবে রডে বসলে। এই লোভেই যেন সে সাইকেলে চেপে বসল। টুকু রডে বসে বলল, বড়ো সড়কের দিকে চল।

ওদিকটায় তো ফাঁকা। ওখানে যাওয়া ঠিক হবে না। মাসির বাড়ি যাবে না!

টুকু খেপে যাচ্ছে।

তুই কি আমার গার্জিয়ান। নাম।

শরা ভয়ে ভয়ে সাইকেল থামিয়ে নেমে পড়ল। রাস্তায় লোকজন তাকে দেখছে। কাউকে সে গ্রাহ্য করছে না।

চৌধুরীমামা আড়তে যাচ্ছেন, তাকে দেখেই বলল, টুকু না?

টুকু বলল, বড়ো সড়কে যাচ্ছি।

শরা ঘাবড়ে গেল। টুকুদির মামারা জানতে পারলে তাকে লাঠিপেটা করতে পারে। এতো বড়ো আস্পর্ধা, টুকুকে সাইকেলের রডে বসিয়ে কলোনি ঘোরা হচ্ছে। এত সাহস

হয় কী করে। অথচ টুকুদির কথা সে অগ্রাহ্য করতে পারে না। সে হতাশ গলায় বলল, টুকুদি বাড়ি চল। মাথা গরম কর না। আমি না হয় মাসিকে খবরটা দিয়ে আসছি।

টুকু সাইকেলে চেপে শুধু বলল, রডে বোস। কোনো কথা না। দশ ভাতারের খোঁজে যাচ্ছি। এক ভাতার নিয়ে আমার পেট ভরবে না। বুঝতে চেষ্টা কর।

মেজাজ টুকুদির খুবই অপ্রসন্ন। এতেক খারাপ কথা টুকুদি কখনো বলে না। কী সুন্দর স্বভাব টুকুদির। আর সেই কিনা বলছে, দশ ভাতারের খোঁজে যাচ্ছি। তার যেন এ-বড়ো অচেনা টুকুদি। দুদুমণি দণ্ডি খাটতে না গেলেই পারত। এমন সুন্দর মেয়ের বর জুটছে না, খোঁড়া বলে কী তার কোনো মূল্য নেই। দুদুমণি বাজিয়ে বেড়াচ্ছে সর্বত্র, টুকুদির পাত্র জুটছে না। টুকুদি যে বলল, গাছের সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেছে। সবকিছুই বড়ো রহস্যজনক ঠেকছে।

টুকু কলোনির ওপর দিয়ে সাইকেল চালিয়ে যাচ্ছে। টুকুকে সবাই চেনে—কুমুদ মজুমদারের নাতনি, পা খোঁড়া মেয়েটার বিয়ে হচ্ছে না। স্কুলের মাঠ পার হয়ে তেলিপাড়ায় আসতেই শরা বলল, তুমি এখানে দাঁড়াও, মাসিকে খবরটা দিয়ে আসছি।

না। কোনো খবর দিতে হবে না।

টুকু সোজা বড়ো সড়কের দিকে উঠে গেল। তারপর সাইকেল থেকে নেমে কিছুটা ঘোরের মধ্যে যেন হেঁটে গেল।

শরা সাইকেল নিয়ে টুকুদিকে অনুসরণ করছে।

একবার না পেরে বলল, তোমার কী হয়েছে টুকুদি।

এই যে ছোটো জায়গাটা দেখছিস, দাদু আমার নামে দিয়ে গেছে। এখানটায় কিছু একটা করতে হবে। এই একটা চা-এর দোকান টোকান। বাস স্ট্যান্ড, সারের গুদাম, সরকারি কোয়ার্টার কত কিছু হচ্ছে। রাস্তার ধারে তুই আমি মিলে কিছু একটা করতে চাই। এক ভাতারের হাত থেকে তো বাঁচি! দশ ভাতারি হয়ে বেঁচে থাকাও অনেক গৌরবের। চা-এর নেশার চেয়ে আমার নেশা নাকি মানুষের বেশি! দেখি না দোকান করে। জলে ডুবে যাচ্ছি। তুই না হয় আমার খড়কুটো হয়েই থাক। কি পারবি? রাজি। টুকু প্রায় এক নিশ্বাসে কথাগুলো বলে হাঁপাতে থাকল।

তোমার কোন কথাটা আমি রাখিনি টুকুদি। কিন্তু তোমার গাছটা রাগ করবে না?

গাছ! টুকু হা হা করে হাসল। —তুই রাজি কি না বল।

বললে যে গাছের সঙ্গে তোমার বে হয়ে গেছে।

বোকা কোথাকার। গাছ কখনো রাগ করে। না সে রাগ করতে জানে। তুই রাজি আছিস কি না বল। তুই রাজি থাকলে গাছটা মাটিতে লেগে যাবে মনে হয়।

তখন সারা আকাশ ম্লান অন্ধকারে ডুবে যেতে যেতে সহসা রূপালি বন্যায় ভেসে গেল। আবিষ্কারের মতো মনে হল—গাছটা লেগে যাবে। জীবনে সামান্য সূর্যালোক। এইটুকুই টুকুর আজ বড় বেশি দরকার। জমিটায় সে হাঁটুমুড়ে বসে পড়ল। জমিটা তার নিজের, নিজস্ব। চা-এর দোকান, মানুষজন, ভিড় এবং ব্যস্ততা—এক টুকরো স্বপ্ন। শরা না এলে এই স্বপ্নটুকু যেন খুঁজে পেত না।

টুকুদি ওঠো। দুটো একটা তারা ফুটছে। চল মাসির বাড়ি হয়ে যাই।

তুই বোস আমার পাশে। আমার কোথাও আর যেতে ইচ্ছে করছে না। ঘাস থেকে দুটো একটা ফুল তুলে খোপায় গুঁজে দিতে থাকল টুকু।

বৃদ্ধ ও প্রতারক

তিনি কী করবেন বুঝতে পারছেন না। আজকাল তাঁর কিছু মনেও থাকে না। বয়স হলে যা হয়। সকালে দেশ থেকে মেজভাই দেবীপদর ফোন পেয়ে তিনি কিছুটা উতলা। তাঁর দেশে যাওয়া দরকার। তাঁর কথায় দেবীপদর পুত্র বাবু রাজনীতির শিকার, এবারের পঞ্চায়েতে ছাপ্পা ভোট দিতে গিয়ে ধরা পড়েছে। তারপর মারধর যা হয়, এখন সে বিছানায়। বিরোধীদলের লোকেরা তার লাশও ফেলে দেবে এমন আতঙ্ক ছড়িয়ে গেছে। এই বিড়ম্বনার হেতু যে তিনি এমনও ফোনে অভিযোগ করেছে। এটাই তিনি মনে করতে পারছেন না।

বিড়ম্বনার হেতু তিনি কেন হবেন!

বাড়ির সঙ্গে যোগাযোগ মায়ের মৃত্যুর পরই কমে গেছে। মা বেঁচে থাকতে বছরে অন্তত দু-তিনবার দেশে যেতেন। দেশের লোকজনদের সঙ্গে দেখা করারও টান বোধ করতেন। গোটা একটা গ্রামই দেশভাগের পর প্রায় একসঙ্গে না হলেও সামান্য এদিক-ওদিকে এই দেশে এসে চেনাজানা লোকের খোঁজ করতে গিয়ে দেখা গেল পুরো গ্রামটাই বাবা-জ্যাঠার টানে হাজির। আমার বাবা-জ্যাঠারা আবার চিঠি দিয়েও জানিয়েছিলেন, ও-দেশে হিন্দুরা থাকতে পারবে না। দাঙ্গা ধর্ষণ অগ্নিসংযোগ লেগেই থাকবে। ইজ্জত রক্ষার্থেও হিন্দুস্থানে তোমাদের চলে আসা দরকার। এখানে সবই সস্তা। ফাল্গুন-চৈত্রে এক পয়সায় দু সের বেগুন পাওয়া যায়। সতেরো টাকায় এক মন চাল। বাজারে দেশের সবরকমেরই মাছ পাওয়া যায়। এমনকি কাচকি মাছ পর্যন্ত। সামান্য দু-পা হেঁটে গেলে ভাগীরথী, প্রতিদিন নদীতে ডুব দিলে পুণ্য অর্জনেও অসুবিধে হয় না। সস্তায় জমি, সস্তায় চাল, ডাল, মাছ এবং পুণ্যসঞ্চয় এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো আর।

ফলে যা হবার হয়েছে।

চেনাজানা এবং দেশের আত্মীয়স্বজন প্রায় একলপ্তে জমিজমা কিনে, বাড়িঘর করে একসঙ্গে আছে সেই কবে থেকে। বিপদে-আপদেও আছে, পালাপার্বণেও আছে।

বিড়ম্বনার হেতু তিনি কেন, দেবীপদ তার বিরুদ্ধে এমন অভিযোগ কেন তুলছে ফোন করেই জানতে পারতেন। কিন্তু কেন যে তাঁর মনে হল—বাবুর সঙ্গে দেবীপদও সন্ত্রাসের

শিকার। বিরোধীদলের লোকজনদের নিকেশ করে দেবার সঙ্গে ক্ষমতা দখলের জোর লড়াই হচ্ছে—সে ভাবতে পারে তিনি কাছে থাকলে যতই সন্ত্রাস হোক, তার কিংবা বাবুর কেউ ক্ষতি করতে পারবে না। তাঁর ব্যক্তিত্ব এবং সম্ভ্রান্ত আচরণে প্রতিবেশীরা কমবেশি সবাই আকৃষ্ট হয়। এবং তাঁর খ্যাতিরেও সবাই শরিক হতে চায়। দ্যাশের লোক সোজা কথা।

তবে ইচ্ছে করলেই যাওয়া যায় না। সংসারের অজস্র হ্যাপায় তিনিও যথেষ্ট নাস্তানাবুদ। তার নাতি-নাতনিরা স্কুলে কলেজে পড়ে। যা দিনকাল সতর্ক নজর না রাখলেও হয় না। সে যাই হোক দেবীপদর এতবড় বিপদে তার পাশে থাকা দরকার। তা ছাড়া বাবু গত সাত-আট বছর তাঁর বাড়িতেই ছিল। এবং বাড়িটায় তিনতলা মিলিয়ে দশটি ঘর, বাঁধা মাইনের দু'জন চব্বিশ ঘন্টার লোকও আছে। প্রায় হোটেলের মতো হয়ে গেছে তাঁর বাড়ি। অসুখেবিসুখে ভালো চিকিৎসার দরকার হলে, দেশের ভাইবোন, আত্মীয়স্বজন সবারই চাকরির খোঁজে কিংবা চাকরির সূত্রে থাকার অস্থায়ী বন্দোবস্ত এই এক ঠিকানা—কী আর করবে। বড়দার শরণাপন্ন হলে সব ঠিক হয়ে যাবে।

আসলে আমার বড়োপুত্রটি শহরের সবচেয়ে বড়ো হাসপাতালের অভিজ্ঞ চিকিৎসক, থাকা-খাওয়া এবং পরামর্শও পাওয়া যাবে ভেবেই তারা আসত। সম্প্রতি কয়েকবছর ধরে জেলা সদরেই চিকিৎসার যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে বলেও হতে পারে, আবার আত্মাভিমানও মানুষের জাগ্রত হতে পারে, কারণ কে এখন আর কোনও গলগ্রহ হয়ে বেড়ায়। তবে তাঁর কপাল মন্দ, ভাইপো বাবুকে কোথাও অনেক চেষ্টা করেও চাকরির সুযোগ করে দিতে পারেননি। কোনওরকমে হায়ার সেকেন্ডারি পাশ করে বসেছিল, সে কলকাতায় তাঁর বাড়িতে উঠে এসেছিল একটা ক্যামেরা সম্বল করে। দেবীপদও জানিয়েছে, বাবুর ফটোগ্রাফির হাত ভালো, তুমি চেষ্টা করলে ঠিক কোনও চ্যানেলে ঢুকিয়ে দিতে পারবে। বাবু বিয়ের অন্নপ্রাশনের ছবি তুলে বেড়ায়, এ-লাইনে এত প্রতিযোগিতা যে সে পেরে উঠছে না। বিশ-বাইশ হাজার টাকায় এতসব সস্তা ভালো ক্যামেরা পাওয়া যায় যে শুনেছি সিরিয়ালের ছবিও সেইসব ক্যামেরায় তোলা যায়।

সমাজে তিনি যথেষ্ট প্রতিষ্ঠিত বলে প্রথমেই তিনি মৃণাল নন্দীকে ফোন করলেন।

আজ্ঞে বলুন ভবেশদা।

তুমি তো সিনেমার লোক, ছবির এডিটিং-এর জন্য রাষ্ট্রপতি পুরস্কারও পেয়েছ। এদিকে দেশ থেকে কাঁধে ক্যামেরা ঝুলিয়ে জ্যাঠার বাড়িতে ভাইপো হাজির। কোনও চ্যানেলে ছবি তোলার যদি সুযোগ করে দিয়ে পারে।

মৃণাল শুধু বলল, চেষ্টা করবে—তবে সিনেমা কিংবা সিরিয়ালের ছবি তোলার কাজটা খুব সহজ নয়—বাবুকে তবু দেখা করতে বলল সে। তারপর একদিন বলল হল না দাদা। খুবই কাঁচা হাত। ওকে বরং সরকারি ব্যবস্থায় ফটোগ্রাফির অ আ ক খ শিখে নিতে বলুন। ইয়ুথ হস্টেলে এ-মাসেই একবছরের সেশন শুরু হচ্ছে। ওটা শেষ হলে চিত্রবাণীতে ভর্তি করে দিন। বছর দু-এক পরে আমার সঙ্গে যেন দেখা করে।

বাবুর চোখ দুটো মানুষকে সহজেই আকৃষ্ট করে। বাবু এখানে থাকবে শুনে তার জেঠিও খুশি। শত হলেও বাড়ির ছেলে, না-ও করা যায় না। তারপর এই থাকা না-থাকার বিষয়টা সবই নির্ভর করে জেঠির পছন্দ-অপন্দের উপর। সুতরাং তিনি যখন রাজি, বাবু থেকে গেল। দেবীপদকে জানালেন বাবু এখানেই থাকবে। আপাতত কোনও কাজের ব্যবস্থা করা যায়নি।

তারপর লিখলেন, ছবির বিষয়ে এখানে দুটো কোর্স আছে, সেটা শেষ করুক। বাবু তো বলল, অ্যাডমিশন এবং মাইনে নিয়ে প্রথম দফাতেই যে টাকাটা লাগবে সেটা তুমি দেবে।

এখানে বলে রাখা ভালো, সে-সময়ে দেবীপদর বাড়িতে কোনও ফোনের সংযোগ ছিল না। মোবাইলও নেই। তার, ফলে চিঠি না লিখেও ভাবল বাবুর উপায় নেই। তবে খুব জরুরি বার্তা থাকলে এস টি ডি বুথ থেকে করা যায়। বাড়ি থেকে বেশ দূরে—শত হলেও দেশের বাড়ি তাঁর প্রত্যন্ত গ্রাম জায়গায়, জমিজমা এবং ফলের গাছও কম নেই। সবই ভাইরাই ভোগ করে। দিন যত যাচ্ছে, জিনিসপত্রের দাম বাড়ছে, দেবীপদ এবং কালীপদ শুধু মাঝে মাঝে জানায়, গাছ বিক্রি করতে হবে, বাড়িতে ভাইপোদের একটি সাইকেল দরকার, ফল বিক্রি হয়, পুকুরের মাছও বিক্রি হয়। ভবেশ জানেন, ভাইরা অভাবী, একজনের মুদি দোকান, অন্য দুজন সরকারি অফিসে চতুর্থ শ্রেণির কর্মী, বাবা বেঁচে থাকতে চিঠিতে তাদের কথা থাকত—তারা যে লেখাপড়া করতে চায় না, সে কথাও থাকত।

অতীত কথনে দেখা যায় ভবেশবাবুও নানা ঘাটের জল খেয়ে শেষমেশ এই শহরে, একটি বিখ্যাত দৈনিকের সহসম্পাদক এবং লেখালেখিতে প্রভূত অর্থ উপার্জনও হয়।

ক্রমে সব দায় তারই মাথার উপর যেন। বাবার চিঠিতে শুধু আক্ষেপ, তাঁর পুত্ররা ক্রমে অমানুষ, তার মাসোহারায় আর চলে না—পুত্ররা বিয়ে থা করে বাবা বেঁচে থাকতেই পৃথগন্ন। তাদের পুত্রকন্যাদের দায়ও ভবেশবাবুর ওপর। ভবেশবাবুর নামে পরিবারে তখন গগন ফাটে। ভাইঝিদের সম্বন্ধ দেখতে এলে ভবেশবাবুর নাম কথাবার্তায় জড়িয়ে দিত, এবং পনের টাকার জন্য ভাবনা নেই, বড়দা আছে না। আপনাদের মেয়ে পছন্দ কি না বলুন। আবার বিয়েই শেষ নয়, কন্যা গর্ভবতী, সদর থেকে ডাক্তার বলে দিয়েছে জরায়ুতে

জলাভাব, পুরো দশ মাস চালাতে গেলে জরায়ুর জলাভাবে শিশুটির মৃত্যু অবধারিত এবং অকাল প্রসবের সম্ভাবনা এবং অবধারিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করতে পারেন ভবেশই। কলকাতা শহরের হাসপাতালে এবং নার্সিংহোমে অস্ত্রোপচারের পর যে ইনকিউবেটরে রাখা হবে তা শুধু বড়ো হাসপাতালে কিংবা দুই-একটি অতি বৃহৎ নার্সিংহোমে দুর্লভ সুযোগ পাওয়া যায়—তবু বড়দা যখন আছেন তিনি শিশুটির প্রাণরক্ষার্থে যথাবিহিত ব্যবস্থা গ্রহণে সক্ষম।

সারাজীবন এ ধরনের নানা হ্যাপা মাথায় বয়ে বেড়িয়েছেন। শেষবেলায় ভাইপো হাজির এবং তাকে একটি কাজে ঢুকিয়ে দেওয়া যে কত কঠিন কাজ হাড়ে হাড়ে টের পেয়ে বলেছিলেন, তুই বাবু দেশে ফিরে যা। পার্টি কর। পার্টি না করলে এখন চাকরি হয় না। কতদিন হয়ে গেল, এত ভালো ছবি তুলিস, তবু কোনও চ্যানেল, কিংবা কাগজে তোর চাকরি হয় না। ভবেশ বুঝল, দেবীপদ এইসূত্রেই বোধহয় তার দিকে অভিযোগের আঙুল তুলেছে। সে পার্টি করতে না বললে, তার পুত্র রাজনীতি নিয়ে যে জীবনেও মাথা ঘামাত না—এখন রাজনীতি করতে গিয়ে তার প্রাণসংশয়, কে সামলাবে—যার পরামর্শে তাকে ছাপ্পা ভোট দিতে বাধ্য করা হয়েছিল, পার্টি না করলে ছাপ্পা ভোট দিতে কেউ জোরজার করত না—সুতরাং দেশে গিয়ে এ-বিষয়ে পার্টির লোকদের সঙ্গে কথা বলতেই হয়—

তারপর কেন যে মনে হল বাবুকে তিনি দেশে স্টুডিও করে দিয়েছিলেন। স্টুডিওতে ছবি তোলার সুযোগে তার ছেলে লেখাপড়া জানা মেয়ের সঙ্গে প্রেম করে এবং বিয়ের আগেই মেয়েটি গর্ভবতী হয়, অবশ্য ঘুণাক্ষরেও জানানো হয়নি, তবে কথা ভেসে আসতে কতক্ষণ—

ছোটোভাই জানিয়েছিল, ভয়ংকর বিপদ দাদা। তুই বাবুর বিয়েতে মাথা গলাস না। বাবু বংশের কলঙ্ক।

ভবেশ খুবই দুঃখ পেয়েছিলেন। পুত্রবৎ ভাইপোটিকে এ-ধরনের কলঙ্কে লিপ্ত করা ছোটোর উচিত না—তারপর দেবীপদর সেই চিঠি, দাদা তুই শিগগির আয়। আমার মাথা ঠিক নেই। জাত-বেজাতের প্রশ্ন নিয়ে দেবীপদ তার পুত্র বাবুকে কুলাঙ্গার এবং অন্য যাবতীয় যা গালাগাল আছে সবকিছুর উল্লেখ করেছে—তিনি অনুমতি না দিলে পুত্রের বিবাহ সম্পন্ন হবে না, কারণ মাথার উপর দাদাই আছেন, তাঁর অনুমতি পেয়ে গেলে দেবীপদ আর কাউকে ভয় পায় না।

রাস্তা ভালো থাকলে তাঁর দেশের বাড়ি ঘন্টা পাঁচেকের রাস্তা। রাস্তা ভালো কি মন্দ তাও তিনি ঠিক জানেন না। যোগাযোগ না থাকলে যা হয়। তবু খোঁজখবর নিয়েছেন। বর্ষায় রাস্তা ভালো থাকার কথাও নয়।

তিনি বের হবার আগে মনোরঞ্জনকে ডেকে পাঠালেন। বাড়ির ড্রাইভার মনোরঞ্জনকে কোথায় ডিউটি দেওয়া হয়েছে তিনি জানেন না। নিয়মিত বেরও হন না তিনি। তাঁর যে দেশে যাওয়া খুবই দরকার তাও কাউকে বলেননি। দেবীপদও ফোন করেছে, সে কথাও কাউকে জানানো হয়নি। ছোটোপুত্র অবনকে শুধু ফোনে জানিয়েছিলেন, তাঁর গাড়ির দরকার। কার গ্যারেজে তাঁর গাড়ি, মনোরঞ্জন কোথায় অবনই বলতে পারে। অবনের গ্যারেজে, না প্রীতমের গ্যারেজে, কিংবা গাড়িতে কারও বের হবার যদি কথা থাকে, অবনই সব বলতে পারবে। পুত্ররা সবাই আলাদা থাকে। তাদের নিজস্ব আলাদা গাড়ি। বউমাদেরও গাড়ি আলাদা। কেউ কলেজে, কেউ হাসপাতালে কেউ করপোরেট হাউসে আছে। বাবুর জন্য তাদের কোনও দায় ছিল না। সবাইকে তিনি বলেছেন, প্রীতম তো বলেই দিল তোমার এই বংশপ্রীতি ছাড়ো। এত ঠকেও তোমার শিক্ষা হল না। দেশের জমি তো শুনেছি ভাইরা তোমার সব দখল করে নিয়েছে।

ভবেশ বলেছিলেন, ওরা নেবে না তো কে নেবে। তোমরা দেশের বাড়িতে গিয়ে থাকবে?

থাকব না কেন। একটা বাড়ি করে রাখলে ছুটিছাটায় বেড়াতে যেতে পারতাম। দাদুর জমিজমায় আমাদেরও ভাগ আছে। ওটা তোমার পিতৃভূমি। তোমার কষ্ট হয় না বাবা।

এটা ঠিক, তাঁর অংশের জায়গা ছোটো দখল করে নিয়েছে। ছোটো বন্টননামাতেই রাজি নয়। তাঁরা পাঁচ ভাই। তিনি এবং মেজ মেট্রিক পরীক্ষা দিয়েই গ্রাম থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়েছিলেন। মেজ বাড়ির সঙ্গে কোনও যোগাযোগই রাখে না। সে বোম্বাই শহরে বিশাল বাড়ি গাড়ি নিয়ে আছে। স্ত্রী আই এ এস। একমাত্র পুত্র দেরাদুনে মিলিটারি কলেজে পড়ে। ছোটো তিন ভাই-এর মধ্যে জমি বাড়ি নিয়ে চাপা বিবাদের সৃষ্টি হয়েছে। প্রীতমের কথায় তিনি বুঝেছিলেন বাবুকে দেশ থেকে তুলে আনায় তারা বেজায় অখুশি। এবং তখনই ভবেশ বুঝতে পারেন—বাবুর চাকরির ব্যাপারে তার পুত্ররা মোটেই আগ্রহী নয়।

ভবেশ এখন বুঝতে পারেন, তিনি গরিব বাবার পুত্র। মেলা ভাইবোন নিয়ে বাবা তাঁর মুখাপেক্ষী ছিলেন। বাবার হতদরিদ্র চেহারা এখনও মনে করতে পারেন ভবেশ। মায়ের বিষণ্ণতা—সবই মনে পড়ে তার। মায়ের দুই পুত্র বড়ো মেজো পার পেয়ে গেলেও ছোটো তিনপুত্র দেবীপদ, নিরাপদ, কালীপদ গাঁয়েই পড়ে থাকে। পরে বাবা বেঁচে থাকতেই তারা পৃথগন্ন হয়ে যায়। বাবা-মার দায়িত্ব শেষ পর্যন্ত তাকেই বহন করতে হয়। সেই সূত্রেই বাড়ি যাওয়া আসা। ভাইপোরা কে কী করছে খবর নেওয়া। ছোটো তো পঞ্চাননতলায় মুদিখানা করবে বলে বাবা তাঁকে একবার ডেকে পাঠিয়েছিলেন।

বাবার কথা ফেলাও যায় না।

দোকান করতে টাকাকড়ির ব্যবস্থা তাকেই শেষ পর্যন্ত করতে হয়।

দেবীপদ অবশ্য সদরে একটা সরকারি কাজ জুটিয়ে নিয়েছিল। সে এখন তারই পেনশনে চলে। তার দুই মেয়ের মোটামুটি সচ্ছল পরিবারেই বিয়ে দিয়েছে। শুধু পুত্রটিকে সামলাতে পারছিল না।

গাড়ি যাচ্ছে। মনোরঞ্জন বলল, গাড়িতে উঠবেন সার?

দেখি।

দেশের অবস্থা কী জানিই না। মনে মনে ভাবলেন।

আসলে দেবীপদর পুত্র বাবু সব অর্থেই বাবু। মিথ্যে কথায় বাবু, ফুটানিতে বাবু, খাওয়াতেও বাবু। অলস এবং কুঁড়ে এটাও টের পেয়েছিলেন ভবেশ।

কীরে খেলি না।

আমি খাই না জেঠু।

কইমাছ খাস না।

মাথা নীচু করে কথা বলার স্বভাব।

আরে কত দাম জানিস! ভবেশ সব কাজ থেকে অবসর নিলেও প্রতিদিনের বাজার করার অভ্যাস ছাড়তে পারেননি।

খুব কাঁটা কই মাছ।

কাঁটা। কোন মাছে কাঁটা নেই বলতে পারিস!

পমফ্রেট, পাবদা, তপসে মাছ দিলে খুঁটে খুঁটে খেত। ভবেশ ভাইপোকে দিয়ে মাঝে মাঝে বাজার করাতেন, তাজা মাছ আনতে বলতেন। কিন্তু সে কোনওরকমে বাজারের থলে ফেলে দিয়ে বলত, যা চড়া দাম। মাগুরমাছের কেজি তিনশো টাকা। বাজার ঘুরে দেখতেন ভবেশ—দেশি মাগুর আনেনি বাবু, হাইব্রিডের মাগুর নিয়ে এসেছে। দেশি আর হাইব্রিডের মাগুরের দাম আকাশ-পাতাল তফাত।

গাড়ি যাচ্ছে।

মনোরঞ্জন ভবেশের সঙ্গে কথা বলতে বিশেষ সাহস পায় না। তিনি কিছু বললে সে শুধু উত্তর দেয়।

হরিণঘাটার বাজার পার হয়ে গাড়ি যাচ্ছে।

মনোরঞ্জন, কোথাও বসে চা খেলে হত।

একেবারে রানাঘাটে গেলে হয় না। আপনি কি সার রাস্তার দোকানের চা খেতে পারবেন!

সব পারব।

তার যে কত কথা মনে হচ্ছে।

পাঁচ-সাত বছরে বাবুর উপর বিশ্বাস হারিয়েই বলেছিলেন—যা দেশে গিয়ে পার্টি কর। পার্টি না করলে, আজকাল চাকরি হয় না।

আসলে কি তিনি শেষ পর্যন্ত ভাইপোটিকে জাহান্নামে যাবার রাস্তা বাতলে দিয়েছিলেন।

মানুষের তো সময় একভাবে যায় না।

একদিন হঠাৎ ভবেশ দেখেন একতলা থেকে বাবু উঠে এসেছে।

বাড়ি যাব।

হঠাৎ।

সেই যে গেল আর ফিরল না।

দেবীপদকে ফোন করলে বলেছিল, তুই দাদা চিন্তা করিস না। বাবু হারিয়ে যাবার ছেলে না।

তা হবে হয়তো।

পাঁচ-সাত বছরের সম্পর্ক। বছরের বেশি সময়টা আমার কাছেই থাকত। তিনি ভাবলেন।

কীরে গেছিলি?

হ্যাঁ গেছিলাম।

কী বলল, শুভ!

আমাকে নেবে বলল।

শুভ দূরদর্শন নিউজ এডিটর। আট-দশ জন ফটোগ্রাফার নেবে। ভাইপোটির সুযোগ হতে পারে ভেবেই ফোন। তারপর অ্যাপ্লিকেশন, শুভ ফোনে শুধু বলল, দাদা দেখছি কী করা যায়। কেউ ঝেড়ে কাশে না।

একদিন তো বলল বাবু, জানো জেঠু আমাদের প্যানেল হয়ে গেছে। আমার নাম আছে।

শুভ তবে তার কথা রেখেছে। শুভ কি তাকে কোনও কথা দিয়েছিল! সেই প্যানেলই সার। পরে শোনা গেল, প্যানেল বাতিল। শুভকে ফোন করে আর তাকে ধরা গেল না।

তবু তিনি শুভকে ছেড়ে দেবার পাত্র নন। একদিন নিজেই গলফগ্রিনে হাজির। দূরদর্শনের লোকজন তাঁকে দেখে অবাক। তিনি তো কোথাও আজকাল বের হন না। সহসা দূরদর্শনের অফিসে হাজির। কোনও বিশেষ অনুষ্ঠানের কথাও তাঁরা জানে না। লাইফপ্রোগ্রাম যদি হয়—এসব ভাবার সময়ই তিনি এসেছেন শুনে শুভ নিজেই বের হয়ে এল, এবং তার ঘরে নিয়ে গিয়ে বসিয়েছিল।

শুভর এক কথা, দাদা হল না।

কেন হল না।

আমি তো একা না। কমিটিতে আরও অনেকে আছে।

তোমার উপর আমার ভরসা ছিল। তুমি না বললে এত দামি ক্যামেরা কিনে দিতাম না। প্যানেলে তো ওর নাম ছিল।

শুভ খুবই ইতস্তত করছে।

খুলে বলবে তো! তোমার ফোনেও সাড়া পাওয়া যায় না। কী ব্যাপার বল তো।

বাবুর ভালো নাম, অতুল।

সে বলল, অতুল নিজের নাম-ঠিকানা পর্যন্ত ঠিকঠাক লিখতে পারে না। ছবির হাতও কাঁচা। সামান্য কথাবার্তায় ওর অবজ্ঞা ধরা পড়ে।

তা বেশ। সে তো কথা বলবে না। ছবি তুলবে। ও তো হায়ার সেকেন্ডারি পাশ।

না পাশ না। সার্টিফিকেট দিতে পারেনি। মিনিমাম কোয়ালিফিকেশন না থাকলে কী করি!

ভবেশ খুব দমে গিয়েছিল।

প্যানেলে ওর নাম আছে বলল।

শুভ বলল, এসব কথা থাক। চা খান। আমার নিজেরই অস্বস্তি হচ্ছে দাদা। কী বলব!

চা খাচ্ছি। তুমি দ্বিধা কর না।

প্যানেলই হয়নি।

অতুল যে বলল প্যানেলে ওর নাম আছে।

মিছে কথা। ও হায়ার সেকেন্ডারি পাশও না।

বল কি!

আরও সব কুকীর্তির সাথী তিনি। বাবুকে নানা কাজেই লকারের চাবি দিতে হত। অনেক সময় তার কাছেই চাবি পড়ে থাকত। বাবু যে এতবড়ো চাটুকার এবং প্রতারক, সে চলে গেলে ভবেশ টের পেলেন।

বাবুর চাটুকারিতাই তার মধ্যে এক অন্ধস্নেহ প্রশ্রয় পাচ্ছিল।

কারও কথাতেই গুরুত্ব দেননি।

ছোটোভাই কালীপদও সতর্ক করে দিয়েছিল, ওকে বাড়িতে রাখা ঠিক না।

দেবীপদর সঙ্গে কালীপদর মুখ দেখাদেখি বন্ধ। সে বাবুর নিন্দা করতেই পারে। এরা সবাই তাঁর টাকার লোভে নানাভাবে তাঁকে ভজিয়েছে। একসময় কালীপদ বছরের পর বছর তাঁর টাকায় সংসার নির্বাহ করত। এখন সেই পৈতৃক ভিটা থেকে তাঁকে উৎখাত করেছে। এই কিছুদিন আগে কালীপদ এসে আট হাজার টাকা নিয়ে গেল। জমির উপর দিয়ে আট ফুটের একটি রাস্তা বের করতে না পারলে, বন্টননামা করা মুশকিল। রাস্তার মুখে কালীপদ ঝুপড়ি বানিয়ে থাকে—তা সরিয়ে নেওয়ার জন্য সেও অনেক টাকার দাবি জানায়। বাড়ির বন্টননামার জন্য খেপে খেপে কত যে টাকা নিয়ে গেছে এরা। পাঁচ ভাই দু বোনের জন্য জমি বন্টননামার এই এক নাটকেই তিনি জেরবার। নোংরামি এবং ছ্যাঁচড়ামির শেষ ছিল না। অথচ এরা সবাই তাঁর পায়ে পায়ে বড়ো হচ্ছিল। মা বাবা ভাইবোন ছাড়া তার অন্য কোনও জগৎ ছিল না তখন।

তখনই গাড়িটা থামল।

মনোরঞ্জন বলল, হাতমুখ ধুয়ে নিন। আপনাকে নামতে হবে না। আমি নিয়ে আসছি। বউদিরা সঙ্গে কিছু দিল না, কী খাবেন।

না। তোমাকে কিছু করতে হবে না। চল তুমিও খেয়ে নেবে।

মনোরঞ্জন বলল, ভিড়। আপনার কষ্ট হবে।

রাখো তো ভিড়। খিদেয় পেট চোঁ চোঁ করছে।

মনোরঞ্জন অবাক হয়ে গেল। সে তাঁকে অনেক অনুষ্ঠানে নিয়ে যায়। তাঁর গুণগ্রাহীরা ভিড় করলে সে নিজেও গর্ববোধ করে। এতবড়ো মানুষটা কিনা বলছে একই টেবিলে খাবে।

কী হল, এসো।

মনোরঞ্জন আর কী করে!

বাবু অথবা ভালো নামে অতুল, সত্যি কি জুয়া খেলে।

দেবীপদ ঘুণাক্ষরেও জানায়নি।

তিনি নানা কাজে কিংবা তাঁর লেখালেখি নিয়ে এত ব্যস্ত থাকেন যে চারপাশে কী হচ্ছে টের পান না। একদিন টের পেয়েছিলেন, কিছু পাঁচশো টাকার নোট লকারে কম। তিনি টাকাপয়সা লকারে সাধারণত এক জায়গায় রাখেন না। লকারে তার অনেক জরুরি ফাইল আছে, তার ভিতরে ভাগে ভাগে টাকা রেখে দেন।

আর মুশকিল তাঁর দুর্বল স্মৃতিশক্তি। কাউকে দিতে পারেন, অন্য কাজে খরচ করতে পারেন, তিনি তো তাঁর উপন্যাসের চরিত্রের পেছনেই সারাজীবন বেশি ছোটাছুটি করেছেন। এবং তাঁর এটাই নেশা। লেখার সময় তিনি তাঁর চরিত্রগুলির সঙ্গে তুমুল ঝগড়াও বাঁধিয়ে দেন। চরিত্ররা তখন তার স্বজনের মতো। এবং বাবুও কি গল্পের শেষে চরিত্র হয়ে যাচ্ছে। আসলে একজন প্রতারককে নিয়ে তিনি কোনও গল্প লেখেননি। এটা তো একজন প্রতারকের গল্প হয়ে যাচ্ছে।

ফোনটা প্রথম দিল্লি থেকেই এসেছিল।

কে?

আমি হীরক বলছি কাকা।

বল।

বাবু না কি তোমার কাছে আছে?

ছিল, এখন নেই।

চলে গেছে!

হীরক তাকে যে কিছু খবর দিতে চায়।

তিনি বললেন, বাবু কী করেছে আবার।

ও কিন্তু জুয়াড়ি! জুয়া খেলে। ওকে রেখ না। তুমি কাকা সতর্ক থাকবে।

আর সতর্ক থাকা! বংশের ছেলে ছেলে করেই তো চোখের উপর তিনি দেখলেন তার প্রতারণার ছবিগুলি।

বাবু মোবাইলে ফোন করে কার সঙ্গে কথা বলছে। ওর স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলতে পারে। বাবু তো বিয়ে করার পরও নানা অজুহাতে এখানে এসে থাকত। এখানে থাকার সময় তাঁর সূত্রে অনেক বিখ্যাত লোকজনদের সঙ্গেও বাবুর পরিচয় হয়েছে। ছবির অনেক খুচরো কাজ তাকে দিতেই পারে। কিন্তু খুব তর্ক করছে ফোনে। মনে হয় কেউ তাকে হুমকি দিচ্ছে। তিনি একতলায় বসার ঘরে, বাবু বারান্দায় শেষ করে দেব। বাবু চেঁচাচ্ছে।

কী শেষ করে দিবি।

আরে দেখ না জেঠু, বলছি সুদের টাকা আগামী মাসে দিয়ে দেব। মানছে না। আমাকে রাস্তায় দেখে নেবে বলছে।

সুদ! কীসের সুদ।

আর বল না। বাজারে কি কমপিটিশন। স্টুডিও থাকলেই হয় না। কমপিউটর রাখতে হয়। তুমি আর কত দেবে জেঠু। সুদে টাকা নিয়ে একটা কমপিউটার কিনেছি।

তিনি বিব্রত। চুপ করে আছেন। দেবীপদর পেনশনে সংসার চলে, দেবীপদ তাই বলেছে। বাবু তার বাবাকে এক পয়সাও দেয় না। উপার্জনের টাকা বাবু কী করে দেবীপদও জানে না। বিয়ে করেছে। একটা মেয়ে হয়েছে, সংসারে দায়িত্বশীল না হলে চলবে কেন?

তিনি বিরক্ত হয়ে বলেছিলেন, ফোনটা দে। আমি কথা বলি।

বাবু কী ভাবল, তারপর বলল, তোমার সঙ্গে কথা বলবে না বলছে।

কেন বলবে না।

কী করে বলবে। সাহস নেই তোমাকে বলে। তারপরই ফোন কেটে দিল।

কী বলছে!

বলছে, টাকা না দিলে রাস্তায় হামলা করবে।

বলিস কী। তোর বাবা জানে। আগে তো বলেছিলি, আমাদের এলাকায় কোনও স্টুডিও নেই। এখন বলছিস আরও দুটো ছবির দোকান হয়েছে।

সবারই কমপিউটার আছে। আমার নেই। বাজারে কী প্রতিযোগিতা তুমি বুঝবে না।

কত টাকা ধার করেছিস।

কী যে হয় তাঁর। বাবুর বিমর্ষ মুখ দেখলেই তিনি ঘাবড়ে যান। বংশের ছেলে রাস্তায় যদি খুনজখম হয়ে যায়—কেমন ভিতরে তিনি আতঙ্কে পড়ে গেলেন।

কত টাকা ধার?

তোর আয় কত মাসে?

ঠিক থাকে না। তোমাকে জেঠু কী বলব। যা রোজগার, সবই সুদ দিতে চলে যায়।

বাবুর মুখে তিনি খুবই হতাশার ছাপ ফুটে উঠছে দেখতে পান।

ছেলেটা না শেষে বেঘোরে মারা পড়ে। তিনি একটা চেক লিখে দিয়ে বললেন, এটা

ভাঙিয়ে নে। মনে হয় হয়ে যাবে। তারপর বললেন, কত সুদ দিস? তারপর বললেন, মাসে না বছরে?

মাসে চার পার্সেন্ট সুদ।

এটা তো বেআইনি। ওদের লাইসেন্স আছে?

জেঠু তোমার সময় আর নেই। এখন বে-আইনি আইনি বলে কিছু নেই। ওদের দল আছে। থানা পুলিশ হাতে। সরকারও মনে করে, বেকার যুবক সব, খুনজখম না করে পয়সা উপার্জন হলেই হল। খেয়ে বাঁচতে হবে তো। বেকারি দূর করতে সরকার এখন সব মেনে নিচ্ছে। দালালি করুক, প্রমোটারি করুক, মস্তানি করুক শুধু কেউ খুনজখম না হলেই হল!

তিনি বললেন, ঠিক আছে, আমাকে না জানিয়ে আর সুদে টাকা নিবি না।

না না। আর নিই, যা শিক্ষা হল।

শিক্ষা কথাটাতে তাঁর হাসি পেয়েছিল। বাপ-ঠাকুরদার কথা মনে হল। সেই বংশের ছেলে কী হয়ে যাচ্ছে। তবু রাস্তায় যদি আনা যায়, অথবা বাগে আনা যায়।

গাড়ি যাচ্ছে।

মনোরঞ্জন বলল, সার ঘুমিয়ে পড়েছেন।

না না, কিছু বলবে!

সারগাছি পার হলাম।

তাই তো দেখছি। চারপাশে ধানের জমি সব সবুজ হয়ে আছে। আদিগন্ত মাঠ—আগে এইসব জমিতে লঙ্কার এবং আখের চাষ হত। আখচাষ আর হয় না। পলাশির চিনিকল বন্ধ হয়ে যাওয়ার পরই আখচাষ বন্ধ হয়ে গেল। কত লোক বেকার হয়ে গেল।

আসলে নিজের সঙ্গেই তিনি কথা বলছেন।

সার সোজা বাড়ি যাবেন?

দেখি।

বাবুর বউটার চাকরি হলেও তিনি বেঁচে যান। তারপরই মনে হল তার ভাইবোন আত্মীয়স্বজন, কে নয় যে তাকে হিপনোটাইজ করে অর্থ উপার্জন করেনি। ছোটোভাই কালীপদ শেষদিকে মাসে মাসে টাকা নিতে আসত। তিনি বিরক্ত হতেন, এভাবে কতদিন যে চলবে। বাড়ি থেকে বাবা তাকে বের করে দিয়েছিলেন, ত্যজ্যপুত্র করেছিলেন—সে তার বউ দুই পুত্র এবং এক কন্যাকে নিয়ে পাহাড়েই ঘর ভাড়া করে থাকত। তিনি বাবার

চিঠিতে খবর পাবার পরই ছুটে গিয়েছিলেন, বাবাকে বুঝিয়ে বাড়ির এক কোণায় কালীপদর থাকারও বন্দোবস্ত করে দিয়েছিলেন।

তারপর আবার সেই ভিক্ষা।

না আর পাবি না।

দাদা তোর তো মেলা টাকা।

পণের টাকাটা দিবি।

আর দেব না। এই দিয়ে দিয়ে তোদের গরিব করে রেখেছি। নিজেদের আত্মনির্ভর করে তুলতে পারলি না।

আর আসব না। শুধু কথা দে তোর ভাইঝির বিয়ের পণের টাকাটা দিবি।

পণের টাকা দিতে পারব না। পুলিশে খবর দেব।

ধূর্ত কালীপদ কত সহজে বলল, ওই হল। বিয়ের খরচ আর কত লাগে। ছেলের দাবিও কম। একটা দোকান করবে বলে পণ নিচ্ছে। তুই যেভাবেই দিস, দিলেই হল। এত নগদ টাকা তুই না দিলে কে দেবে? না দিলে বংশের কলঙ্ক হবে।

তোর ভাইঝি পালানোর ধান্দা করছে কলোনির অবনী পালের পোলার লগে। পালালে তুই মুখ দেখাতে পারবি। এতে বাপ-ঠাকুরদার কলঙ্ক না।

আর সঙ্গে সঙ্গে তিনি যে কত সহজে বাপ-ঠাকুরদার সম্মান রক্ষার্থে বিয়ের সব খরচই দিলেন।

এবং তারপরই যে কালীপদ এবং তার দুই পুত্র তাঁকে চরম শাস্তি— তার পিতৃভূমি কেড়ে নিল। তখন পাড়ায় ফোন এসে গেছে, মোবাইলও হয়ে গেছে। ফোনেই কালীপদ জানাল, সামনে মোট আঠারো কাঠা জমি সে দখল করে আছে। সেই দখলনামাই বন্টননামা। বাকি জমি আর ভাইবোনেরা যা খুশি করুক। তার জমিতে কেউ ঢুকলে খুন হয়ে যাবে।

এই সেদিনও বাবু, তার স্ত্রী দময়ন্তীর জেলা পরিষদে কাজ হবে বলে টাকা নিয়ে গেছে। ঘুষ দিতে হবে সত্তর হাজার। দিলেই কাজ হয়ে যাবে। তিনবার এস এস সি পরীক্ষা দিয়েও শিক্ষকতার কাজ পায়নি। অর্ধেক টাকা আগাম দিতে হবে। আটজনের চাকরি, ঘুষ কত টাকা! বাবুর সেই এক হিপনোটাইজ, টাকাটা বাগিয়ে চলে গেল। তিনি ঘুষ এবং পণ এই দুই বিষয়কেই ঘৃণা করতেন। বংশের গৌরব রক্ষা করতে গিয়ে সব বিসর্জন।

সার।

আপনি কাঁদছেন!

না তো!

চোখ জলে ভেসে যাচ্ছে।

গাড়ি বাড়িতে ঢুকবে?

না।

কোথায়।

হোটেলে।

হোটেল থেকেই ফোন, দেবীপদ তোর বউমার চাকরি হয়েছে?

নারে দাদা, কোথায় চাকরি!

টাকা নিয়ে এল, জেলাপরিষদে চাকরি।

সব মিছে কথা। আমার সব শেষ। তুই কোথায় উঠেছিস। তুই আসবি বলে তোর বউমা রান্না করে বসে আছে।

বাবুটা এত মিছে কথা বলতে পারে। দময়ন্তীর চাকরি যদি হয়ে যায়, সেই ভেবে টাকাটা দিলাম। এখনকার বাজারে চাকরি পেতে হলে ঘুষ দিতে হয় জানি। কিন্তু জেলাপরিষদে কোনও লোকই নেওয়া হবে না, সে ঘুষটা দেবে কাকে।

তুই আয়, আমি তোকে আনতে যাচ্ছি। গাড়ি এনেছিস।

তোকে আর আসতে হবে না দেবীপদ, আমি যাচ্ছি। এবং তিনি চানটান করে ফ্রেশ হয়ে বাড়ি গেলেন ঠিক, তবে সীমানায় ঢুকলেন না। দেবীপদকে ডেকে পাঠালেন নেপাল করের বাড়িতে। এই একজনই পরিচিত কাছের মানুষ তার দেশের, গেলে এখনও বাইরে ছুটে আসে। জড়িয়ে ধরে।

ফোনেই বলল, বড়দা সে গ্রাম আর নেই, সেই মানুষও নেই। হাওয়া পালটে গেছে। আগে পার্বণে উৎসবে আমাদের মেলামেশায় কোনও বাধা ছিল না—এখন অন্যরকম। যে যত ফন্দিবাজ, ফুটানিবাজ, তারাই আদর্শের বুলি কপচায়। আপনার বাবু তো জুয়া খেলে সব উড়িয়ে দিয়েছে। পঞ্চায়েত ভোটে দাঁড়িয়েছিল।

ও নাকি ছাপ্পা ফোট দেওয়ায় মারধর খেয়েছে।

দেবীপদ জোরজার করেই তাঁকে বাড়ি নিয়ে গেল। সবাই দেখা করে গেলেও, দেবীপদর পুত্রটির পাত্তা নেই। কোথায় গেল!

দেবীপদ বলল, ক'দিন থেকে বের হচ্ছে সাইকেলে। কোথাও গেছে। পার্টি করলে বসে থাকার উপায় থাকে না দাদা। স্টুডিওটা বিক্রি করে দিল। কী করে খাবে বল। আমারও তো বয়েস হয়েছে। পেনশনের টাকা আর কতদিন বল!

তিনি দেবীপদকে বললেন, একটাই জীবন, সবাই আমরা একজীবনের অধিকারী। তার বাইরে কিছু নেই। আগেও নেই পেছনেও নেই। তোর পুত্রের মুখে জাদু আছে। কথা বেচে সে ঠিকই খাবে। এখনও যা পরিস্থিতি, নষ্ট না হয়ে গেলে টিকে থাকা কঠিন। শুনছি তো পঞ্চায়েতে তার দল জিতবে, সে জিতবে। তারপর দেখা যাবে আরও বড়ো জায়গায় চলে গেছে। ছাপ্পা ভোট দিতে গিয়ে মার খেয়েছে, এখন তো কোনও প্রমাণই পাওয়া গেল না। সবাই ওর তো গুণগানই করছে।

দেবীপদ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, দাদা যে সময়ে যা মানায়।

পাখির বাসা

কদিন ভ্যাপসা গরমের পর সকালের দিকে বেশ বৃষ্টি হয়ে গেল। চরাচর মনে হল মুক্ত হয়ে গেল ভ্যাপসা গরম থেকে। বেশ ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে। কালবৈশাখীর তাণ্ডব এবারে একদিনও দেখা গেল না। জলবায়ুর কোনও পরিবর্তন কি না কে জানে। প্রিয়নাথ রোজই বের হন, বিকালে যতদূর পারেন হেঁটে যান। পার্কে বসেন। একটা সাঁকো পার হতে হয়। নড়বড়ে সাঁকোটা পার হওয়ার সময় সতর্ক থাকেন। ছ'টা বাজে, অথচ কণ্ঠদিন কি যে সূর্যের তাঁত—কেমন গরম লু বইত। আজ আরাম, আকাশ মেঘলা, গাছগুলির ফাঁকে চোখ খুলে আকাশ দেখলেন। পাতলা মেঘের ছড়াছড়ি। তার আজ হেঁটে যেতে ভালোই লাগছিল।

বয়েস হয়ে গেছে বলেই বাড়ি থেকেও সতর্ক করে দেওয়া হয়—বেশি রাত কোরো না, সাঁকো সাবধানে পার হবে। তিনি হাসেন। তার বয়সিরা অনেকে হাতে লাঠি সম্বল করেছে, তিনি এখনও ঋজু। তার অসুখ বিসুখ নেই বললেই চলে। তিনি তাঁর বংশগতির জন্য গর্ব বোধ করেন। বংশানুক্রমিক জিন নামক বস্তুটি তাকে যে এতটা শক্ত সমর্থ রেখেছে, এটাও তিনি বোঝেন।

ছিমছাম তার বাড়ি, প্রশস্ত রাস্তা, কেয়ারি করা ফুলের বাগান এবং বাসস্টপ পার হয়ে গলি মতো রাস্তায় ঢুকে গেলেন—সারাদিন বারান্দায় কিংবা নিজের ঘরে কাজে কর্মে লিপ্ত থাকতে ভালো লাগে না। বাইরে বের হলেই মনের মধ্যে সুবাতাস বয়ে যায়। তিনি প্রফুল্ল বোধ করেন। আর তখনই দেখলেন, পার্কের এক কোণায় ঝোপের মতো আড়ালে দুজন নারী পুরুষ অশালীন অবস্থায় বড়োই কাতর হয়ে আছে। তার যে এত কৌতূহল এ-বয়সে আসা উচিত নয়, ওদের দিকে নজর দিতেই এটা টের পেলেন। এমন কি সেই নরনারী তাকে দেখে বিন্দুমাত্র বিচলিতও বোধ করল না। অবশ্য প্রিয়নাথ এই সব পার্কে এলে এবং ঘুরতে ফিরতে এমন দৃশ্য মাঝে মাঝেই দেখে ফেলেন। মাঝে মাঝে আফশোসও করতেন—একটু যে নিরিবিলি হাঁটবেন, কিংবা কোনও বেঞ্চে গিয়ে বসবেন তারও উপায় নেই। তার মতো বয়সি মানুষেরা দেখতে পেলেই হাঁকবে—আরে কী দেখছ। মিলেনিয়ামের শুরুতে এ-সব যে বিন্দুমাত্র বিস্ময়ের নয় প্রিয়নাথ। সোজা নাক বরাবর তাকিয়ে এদিকটায় চলে এসো। বেঞ্চি এখনও খালি আছে। দেরি হলে দখল হয়ে যাবে।

প্রিয়নাথ ভাবলেন, এসবের উপাদানে গঠিত সমাজ কেমন হবে। কোন ধারা স্পষ্ট হবে আগামী হাজার বছরে—।

বয়েস যত বাড়ছে, চারপাশের বিজ্ঞান প্রযুক্তি এবং যৌনতা কিংবা যৌনতাই প্রাণের নির্যাস এবং প্রাণের নির্যাস মৃত্যু—এ-সব চিন্তা ঘুরপাক খেলেই মনে হয় যন্ত্রপাতি এবং খাপে খাপ লেগে যাবার মতো মানুষ বোধ হয় এই সহস্রাব্দেই নিজের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ খুশিমতো তৈরি করে নিতে পারবে।

বৈদ্যনাথ তাঁর দিকেই এগিয়ে আসছেন। কিছুটা কিচর প্রকৃতির মানুষ বৈদ্যনাথ। তার রসিকতা কখনও মাত্রাতিরিক্ত মনে হয়। সান্ধ্য ভ্রমণের দোসর। কিছু বলাও যায় না। সে বোধ হয় কাতর প্রকৃতির নরনারীর দৃশ্য আরও স্পষ্ট দেখার জন্য অছিলা করে তাঁর দিকে এগিয়ে আসছে। প্রিয়নাথ বাধ্য হয়ে বললেন, বোসো, আমি যাচ্ছি। বলে তিনি কী যেন খুঁজলেন।

আকাশে দুটো একটা নক্ষত্র ভাসমান। দূরে, চারপাশের সুসজ্জিত অট্টালিকা সমূহ ভেদ করে পাখির ঝাঁক উড়ে আসছে। শহরের উপর দিয়ে একটা কালো বর্ডার তৈরি করতে করতে তারা চলে যাচ্ছে। আর তখনই কেন যে মনে পড়ল, তাঁর বাড়ি যাবার রাস্তায় আজ সকাল থেকেই নো এন্ট্রি বসানো হয়েছে। মোড়ের রাস্তাটায় পুলিশও আজ ব্যস্ত।

তিনি বেঞ্চিতে বসার সময় পতিতপাবনবাবু সরে বসে জায়গা করে দিলেন। এ দিকের বেঞ্চিগুলিতে চার পাঁচজন অনায়াসে বসা যায়। নীচে ঘাসেও বসা যায়। তবে সকালে বৃষ্টি হওয়ায় মাটি বেশ স্যাঁতস্যাঁতে। তিনি বসার সময়ই বললেন, আজ সকালে ভারী একটা মজা হয়েছে হে।

আগে ঠিক হয়ে বোসো। তারপর মজার কথা শোনা যাবে। চারপাশে এত মজা থাকতে, তোমার গলির মধ্যে শেষে মজা ঢুকে গেল সে কি হে। হলধর সান্যাল একটু ঝুঁকেই কথাটা বললেন।

আসলে এখন জ্যোৎস্না ওটার সময়। এত বড়ো মাঠে শুক্লপক্ষের রাতগুলি খুবই সুন্দর। যেমন আবছা মতো জ্যোৎস্নার এক কুয়াশা সৃষ্টি হয়। অস্পষ্ট রহস্যময়তা, নারীর প্রথম দিবসে পুরুষের রতিক্রিয়ার মতো।

বৈদ্যনাথ মাথার টুপি খুলে খানিকটা চুলকে নিলেন। টাকমাথা ঢেকে রাখার এই প্রয়াস বেঞ্চিতে বসে থাকলে রক্ষা করা যায় না। হলধর বললেন, টুপিটা আমার হাতে দাও। তারপর আরও আরামে চুলকাও। আরাম, বুঝলে আরামই এ-বয়সে একমাত্র কাম্য। কিন্তু প্রিয়নাথবাবু, আপনার মজার কথাটা শোনা হল না। সিগনালিং পোস্টের মাথায় কখন কোকিল একটা বাসা বানিয়ে ফেলেছে।

প্রিয়নাথবাবু, কোকিল তো বাসা বানায় না। ওই হল কাক। স্ত্রী কাকেরই বোধহয় কাজ। এটা ঠিক বাসাটি কোনও স্ত্রী কাকের কম্ম না কোনও অন্য পাখির করা সেটা বলা অবশ্য মুশকিল। বারান্দা থেকে স্পষ্ট দেখাও যায় না। আমাদের রঘু হাঁপাতে হাঁপাতে এসে বলল, কর্তা! মন্দিরের রাস্তায় নো এন্ট্রি পড়ে গেছে। গাড়ি বাস কিছুই ঢুকতে দিচ্ছে না পুলিশ। রাস্তার মাথায় একটা পাখি বাসা বানিয়ে ডিমে তা দিচ্ছে।

বৈদ্যনাথ টুপি মাথায় দিয়ে সমস্যার জট খোলার চেষ্টা করলেন, ভি আই পি-র আগমন ঘটছে কি না দ্যাখ।

ধুস! প্রিয়নাথ ধুস শব্দটি বলে তার বাড়ির রাস্তাটি যে প্রশস্ত নয়, কোনও ভি আই পি যাবার রাস্তাও নয়, বড়ো রাস্তায় জ্যাম হলে গলিঘুঁজি ধরে বের হয়ে যেতে গেলে রাস্তাটির খুব দরকার হয়। দরকারে বাসটাসও যায়। আর ট্যাক্সি কিংবা হাতে টানা রিকশাও ঢোকে। কেন যে নো এন্ট্রি, খুবই অর্থহীন।

তা হলে মজাটা কী হল! পতিতপাবনবাবু মজা খুঁজছেন।

সেই। তবে মজা আছে। আচ্ছা পুলিশের টুপি লোহার না পেতলের হয়? টুপি মানে হেলমেট। আপনারা জানেন? প্রিয়নাথ লোহা না পেতল জানতে চাইছেন। খুবই সমস্যা। লোহা না পেতল, বলা খুবই মুশকিল। সবাই চুপ। —ওই হবে একটা। মজা তো আর লোহা কিংবা পেতলে আটকে নেই।

তা অবশ্য নেই। সেই আপনার মতো বৈদ্যনাথবাবু সারাদিন পুলিশই বা এই উত্তপ্ত গরমে রোদের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকে কী করে। মাথা চুলকাতেই পারে। সিগনালের থামে মাঝে মাঝে টুপিটা রেখে দেবারও স্বভাব। হাওয়া না খেলে মাথা ঠান্ডা রাখা যায় না। ডিউটি শেষে পুলিশের কেন যে মনে ছিল না টুপিটা সঙ্গে নিয়ে যাওয়া । তবে মানুষ মাত্রেই ভুল হয়। হয় কি না—প্রিয়নাথ সবার সমর্থন চাইলেন।

আপনি বলে যান।

প্রিয়নাথ বললেন, বুঝলেন পুলিশটির ফের হপ্তা দুই পর আবার সেই পোস্টের নীচে ডিউটি। ডিউটি দিতে এসেই মনে পড়ে গেল, আছে, টুপিটা তো এখানেই সে ফেলে গেছে।

হলধর চেঁচিয়ে উঠল, অফিস কি ভ্যারাণ্ডা ভাজছিল। পুলিশের টুপি গায়েব, পুলিশের কখনও চাকরি থাকে।

বৈদ্যনাথ না বলে পারল না, হলধর কোন যুগে বাস করছ। রাতে প্রায়ই তো মার্কিন মুল্লুক থেকে ফোন আসে। পুত্ররা ফোনে তোমার কুশল নেয়। মনে হয় পাশের বাড়ির

লোকের সঙ্গে কথা বলছ। কী, ঠিক কি না। যুগের হাওয়া কত বদলেছে বোঝ না। খুনেরই কিনারা হয় না, আর একটা সামান্য টুপি...প্রিয়নাথ আপনি বলুন।

প্রিয়নাথ বলল, সেই। আমি অবশ্য বলতে পারব না—টুপি হারালে পুলিশের কী শাস্তি হয়। শাস্তি হয়েছিল কি না তাও জানি না। তবে পুলিশটির কর্তব্যবোধ খুব যে প্রখর বুঝতে অসুবিধা হয় না। পুলিশের এটুকু পরিবর্তন কি খুব বেশি মনে হয়। টুপি খুঁজতে গিয়ে দেখে তার মধ্যে একটা পাখির বাসা। আর গণ্ডাখানেক ছোটো ছোটো ডিম। মানে এগ। রতিসুখের স্মারক। পুলিশ রোয়াকে উঠে উঁকি দিয়ে দেখার পরই গোলমাল হয়ে গেল। টুপিটা একটা পাখির বাসা হয়ে গেছে। ডিম ফুটে বাচ্চা না হলে, বাচ্চা উড়ে না গেলে টুপিটা তুলে নিলে তাকে সবিশেষ পাপের ভাগি হতে হবে। বাসাটা ভেঙে দেওয়া উচিত না—পুলিশও ভাবছে বুঝুন।

পাপ কেন?

পাপ হবে না! জীবন নিয়ে খেলা। টুপি সাফ করতে গেলে বাসাটাও সাফ করতে হয়। পাখি বসবে কোথায়, ডিমে তা দেবে কোথায়। শুধু কি ডিম, ডিমের মধ্যে যে জীবনের কথা আছে। টুপি হারিয়ে তো খারাপ ছিল না, টুপি পেয়েও মজা। টুপি আর বলাও যায় না, একটা বড়ো পাখির বাসাই মনে হয়, এটুকু পরিবর্তনে পুলিশ বেচারা ধন্ধে পড়ে গেল। টুপি না ডিম সে কাকে রক্ষা করে!

হলধর বিরক্ত হয়ে বলল, শেষে কী হল! মজা কোথায়?

কী বুঝেছে পুলিশ, সেই জানে। সে রোয়াক থেকে নেমে হঠাৎ চেঁচিয়ে বলল, চুউপ! পাখি ডিমে তা দিতে আসবে। কোনও শোরগোল বরদাস্ত করা হবে না।

তা পাখি ডিমে তা দিতে আসতেই পারে প্রিয়নাথবাবু। পাখি কি গোলমাল পছন্দ করে না! তা তো বলতে পারব না। পুলিশ বলতে পারবে। রাস্তাটা পাহারা দেওয়ার দায়িত্ব তার। কাকে ঢুকতে দেবে কিংবা দেবে না, সেই ঠিক করবে। সে চায় না কোনও গণ্ডগোলে পাখি উড়ে না আসুক, পাখিরও তো প্রাণের ভয় আছে। বেচারা ভুল করে সিগনাল পোস্টে না হয় বাসা বানিয়ে ফেলেছেই—তাই বলে তার ডিমের তো অনিষ্ট সাধন করা যায় না। এর একটা মানবিক দিকও আছে। পাখি গণ্ডগোল সহ্য করতে নাও পারে।

বৈদ্যনাথ ফোড়ন কাটল, ভারী দায়িত্ববোধ দেখছি পুলিশের।

হলধর বলল, আপনি কি দেখেছেন পাখি দুটোকে?

আজ্ঞে না। তবে গুজব নানা প্রকার। পাড়াসুদ্ধু গুজব— গুজবের তো মাথামুণ্ডু থাকে না, বিশেষ করে স্ত্রী জাতির ক্ষেত্রে— পাখি ঠিক পাখি নয়, পাখি ঠিক ওড়েও না। বাতাসে কুয়াশার মতো ভেসে থাকে। তারপর ঝুপ করে বাসাটার উপর বসে পড়ে। ঠোঁট আছে

তবে খুবই ভোঁতা, চোখ দুটো চিংড়ি মাছের মতো। লেজের দিক বিস্তৃত, তবে মনে হয় স্বর্ণ পুচ্ছ—

আপনি দেখেছেন কি না বলুন।

না দেখিনি। বাড়ির মেয়েরা বলাবলি করছিল। রাস্তায় নো এন্ট্রি লাগিয়ে দিয়েছে। মানুষজন যেতে পারে, হাঁটতে পারে, তবে জোরে কথা বলতে পারে না। পুলিশের সতর্ক চোখ কানকে ফাঁকি দিয়ে রাস্তায় ঢোকাও মুশকিল—পাশের জানালায় একটা বাচ্চা মেয়ে বেলুনে ফু দিচ্ছিল— ফটাস। পুলিশ ছুটে গেছে জানালায়। লাঠি তুলে হাঁকছে পিনড্রপ সায়লেন্ট। ডিমে তা দিচ্ছে—রতি সুখের অন্তিম নির্যাস, ডিম, তারপর ছানা, ছানা হাওয়ায় উড়ে গেলেই পুলিশ স্থির সিদ্ধান্ত নিয়েছে টুপিটা নিয়ে গিয়ে সেরেস্তায় জমা দেবে।

পতিতপাবনবাবু চুপচাপ শুনছিলেন, আসলে বয়েস হলে যা হয়— অবসর জীবন, সময় কাটে না। বিকেলবেলাটায় বেড়াতে বের হলেই মনে হয় সবার সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে। বাজার দর, রাজনীতি, খুন, ধর্ষণ, এই তো সেদিন, হাসপাতালে এক মহিলা, তার মেয়ে জাতকটিকে জানালা দিয়ে ঝোপের মধ্যে ফেলে দিল, অপরাধ তার পেটে মেয়ে কেন জন্মাল, শতকটি শুরু হতে না হতেই যত সব বিতিকিচ্ছিরি কাণ্ড, আর প্রিয়নাথবাবুও আছেন— রাজ্যের আজগুবি খবর নিয়ে বুড়োদের আসর মাতিয়ে রাখার স্বভাব—খারাপ লাগে না শুনতে। সময়ই কাটে না, তবু মাঝে মাঝে এই পার্কটায় খোলামেলা নারী পুরুষের আবির্ভাব ঘটে—দূর থেকে আড়ালে এ-সব দেখার মধ্যেও মজা আছে। এই তো সেদিন এক যুবতী তার প্রেমিক পুরুষের পেছনে ধাওয়া করছিল। যুবক ছুটে পালাচ্ছে— রাতের জ্যোৎস্না, তারা তো ভাবলেন, কী না কী হয়েছে! ছুটে গেলে তাজ্জব। নারী অথবা পুরুষের শরীরে কোনওই আব্রু ছিল না।

প্রিয়নাথ বলেছিলেন, এই হল গে নারী জাতি— প্রিয়নাথের এমনই স্বভাব, সে কত যে খবর রাখে। বইয়ের পোকা হলে যা হয়। সারাদিন অবসর জীবনে পত্রপত্রিকায় ডুবে থাকলে, প্রিয়নাথেরই বা দোষ কোথায়!

তখন তার প্রশ্ন করার হক থাকতেই পারে, মানুষ, জৈবপ্রযুক্তি, অর্থনীতি আর বিজ্ঞান— এ-সবের উপাদানে গঠিত সমাজ কেমন হবে? আগামী হাজার বছরে কোন ধারা স্পষ্ট হবে? মেসিন কি মানুষের চেয়েও বেশি বুদ্ধিমান হবে! মেসিনই কি মানুষ তৈরি করবে, এমনকী বুদ্ধিমান অথবা চেতনা সম্পন্ন। এতটাই যে তার শরীর বদলানো যাবে নাট বল্টুর মতো? কিংবা নরনারীর সম্পর্ক—প্রিয়নাথ আসলে এই আড্ডার প্রাণ। সে এ-সব নিয়েই বেশি কথা বলতে ভালোবাসে।

আজ যে কী হল প্রিয়নাথের।

তার বাড়ির রাস্তায় নো এন্ট্রি। সেখানে নৈঃশব্দ বিরাজ করছে। মানুষজন পা টিপে টিপে রাস্তা পার হয়ে যাচ্ছে। সামান্য গণ্ডগোল হলেই পুলিশের তাড়া খাচ্ছে। তাড়া খেয়ে দৌড়াচ্ছে, আর মাঝে মাঝে পুলিশ বেচারা মাথায় হাত দিয়ে তার হেলমেট খুঁজছে। মাথায় নেই এবং সঙ্গে সঙ্গে পাখির বাসাটার দিকে চোখ। পাখিটা ডিমে তা দিচ্ছে—কী যে মধুর!

পতিতপাবন না বলে পারলেন না, আরে একটা হতকুৎসিত পাখির জন্য পুলিশের এত তাড়া কেন বুঝি না। পাখি ডিমে তা দেবে, তার কোনও উপদ্রব না থাকে, সেজন্য কেউ রাস্তায় নো এন্ট্রি ঝুলিয়ে দিতে পারে! পুলিশ যানবাহন মানুষজন তাড়া করতে পারে! রহস্যটা কি প্রিয়নাথ!

রহস্য! পুরুষ ডুবছে। প্রিয়নাথ হাই তুলে বললেন।

ডুবছে মানে।

পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা আর থাকছে না। পুলিশ স্ত্রী পাখিটাকে এত তোল্লা দিচ্ছে কেন বোঝ না!

নারীতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা হবে বলছ প্রিয়নাথ। সেই আদিসভ্যতার মতো। জননী ঘিরে রাখছে সব কিছু।

ওরকমই কিছু। নারীত্বের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা হতে যাচ্ছে— আগামী হাজার বছরে নারী তার হারানো ক্ষমতা উদ্ধার করবে। আরে পুরুষ! বাদ দাও। আমাদের সময় একরকম ভাই চলে গেল কিন্তু আগামী দিনে ভয়ংকর এক জীবন পুরুষের। বোঝাই যায় তার নারীর চেয়ে বুদ্ধি কম, নারীর চেয়ে তার অসুখ বিসুখ বেশি। তার পরমায়ু পর্যন্ত গড়ে নারীর চেয়ে কম। কোন দিক থেকে তোমরা লড়বে ভাবছ, নারী খুবই দুর্বল প্রজাতি—হুঁ! দেখলে সেদিন জ্যোৎস্নায় বীরপুঙ্গব নারীর তাড়া খেয়ে কেমন ছুটছিল।

পাখিটাতো পুরুষ পাখিও হতে পারে প্রিয়নাথ।

তুমি হলধর, অতিমাত্রায় একটি গর্দভ বিশেষ। পুরুষ পাখি ডিমে তা দেয় কখনও! স্ত্রী পাখি না হলে, পুলিশের কি দায় ছিল, নো এন্ট্রি ঝুলিয়ে দেবার! অজ্ঞাতে এটা পুরুষের প্রস্তুতি পর্ব—পুলিশ মানুষের সভ্যতার পাহারাদার। সেই প্রথম টের পেয়েছে। তার কোনও দোষ নেই। সভ্যতা টিকিয়ে রাখতে হলে নারীজাতির ইচ্ছাই সব মেনে নিতে হবে।

সহসা সবাই চুপ হয়ে গেল। প্রিয়নাথের কথাবার্তা শুনে না, তাদের আর কোনও প্রশ্ন ছিল না, নানা কারণেই এই চুপচাপ বসে থাকা সম্ভব। জ্যোৎস্নায় পার্ক পার হয়ে রাস্তায় আলো জ্বলতে দেখল সবাই। এই পার্কটায় জায়গায় জায়গায় কৃত্রিম ঝোপ সৃষ্টি কোনও নগরপালের নির্দেশে কি না তারা তাও জানে না। হাঁটতে হাঁটতে এই পার্কটায় আড্ডা দিতে আসা কোনও অদৃশ্য যৌনতার খোঁজে— এমনও হতে পারে। পাশের বেঞ্চ থেকে

নিবারণবাবু উঠে যাবার সময় বললেন, আড্ডার বিষয় কী ছিল, আপনারা সবাই এত চুপচাপ।

আড্ডার কী বিষয় ছিল আজ নিবারণবাবু জানতে চায়। রোজই কোনও না কোনও বিষয় নিয়ে যে আড্ডা শুরু হয়, তবে শেষ পর্যন্ত বিষয় যে এক থাকে না, এও ঠিক তবে আজ বিষয়টা একটু মাত্রাতিরিক্ত ভাবেই নারী বিষয়ক হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রিয়নাথই বলেছিলেন, আজকাল খবরের কাগজে কত সব মজার মজার খবর বের হয়—বিজ্ঞানীরা নাকি বলছে, এই সহস্রাব্দ স্মরণীয় হবে নারীত্বের জয়লাভে। পুরুষের পেশিশক্তি আর কাজে লাগবে না। মস্তিষ্কই সব।

হলধর বলল, আড্ডার বিষয় ওই একরকম গতানুগতিক। প্রিয়নাথের রাস্তায় নো এন্ট্রি ঝোলানো হয়েছে। সেই নিয়েই কথা বলছিলাম। আপনি যাচ্ছেন?

হ্যাঁ যাই। কাজের মেয়েটার যাবার সময় হয়ে গেছে। না গেলে প্যান প্যান করবে। নোটিশও দিয়ে দিতে পারে, অন্যালোক দেখুন বাবু। আমার পোষাবে না। একা মানুষ বুঝতেই পারেন।

আর কেউ কোনও কথা বলছে না বলে, হলধরও বলল, আমরাও উঠব।

নিবারণবাবু চলে গেলে, পতিতপাবন না বলে পারলেন না, রেখেছিস তো রক্ষিতা। একা কোথায়। মাঝবয়সি—মেয়েটা তো তোকেও সামলায়, বাড়িও সামলায়।

এটা আপনার ঈর্ষা পতিতপাবনবাবু। একা বেঁচে থাকা তো সত্যি কষ্ট।

কেন আমাদের প্রিয়নাথ আছে না! তার ছেলে মেয়ে, নাতি নাতনি ভরা সংসার।

প্রিয়নাথ বললেন, আছি। ওই আর কি! আমরাও এবারে উঠি। রাত হয়েছে। আজকাল একটু দেরি হলেই বাড়িতে চিন্তা শুরু হয়। অথচ আমার কেন যে বাড়ি যেতেই ইচ্ছে হয় না।

প্রিয়নাথকে বড়ো বেশি ম্রিয়মাণ দেখাচ্ছে। সবাই উঠলেও প্রিয়নাথ উঠল না। মাথা গোঁজ করে বসে আছেন।

কী হল, যাবে না!

তোমরা এগোও।

আসলে প্রিয়নাথের কেন জানি একা থাকার স্পৃহা জন্মাল। পার্কের গেট পর্যন্ত এক সঙ্গে যেতে পারতেন, সেখানে রিকশায় উঠলেই খালের সাঁকো, তারপর কিছুটা হেঁটে গেলেই বাড়ি। এখন আর তার প্রতীক্ষায় কেউ বসে থাকে না। চিন্তা হয় ঠিকই, একটা আস্ত মানুষ হারিয়ে গেলে চিন্তা হবারও কথা। চিন্তা, আর প্রতীক্ষা যে এক না।

তা হলে যাচ্ছি?

তোমরা হাঁটো। আমি একটু পরে যাচ্ছি।

আসলে প্রিয়নাথ কী করবেন বুঝতে পারছেন না। তাঁর কিছু ভালোও লাগছে না। এই সহস্রাব্দের শুরুতে নারীত্বের সাম্রাজ্যবিস্তারের পূর্বাভাস দিয়ে আড্ডা শুরু হয়েছিল ঠিকই, মেয়েদের পরমায়ু বেশি, জরা ব্যাধি কম কিন্তু নিজের জীবনে সুধা শুরুতেই থায়রয়েড, ব্লাডপ্রেসার, শেষে মস্তিষ্কের রক্তক্ষরণে হঠাৎ ফাঁকি দিয়ে চলে গেল। অথচ আশ্চর্য, সুধা সারাজীবন তাকে মুগ্ধ করে রেখেছিল শরীর দিয়ে। সুধা নেই, তিনিও নেই। সব কেমন ফাঁকা অর্থহীন।

তিনি ভাবলেন, ডিম ফুটে ছানা হয়। আসলে সেক্স। অথচ কী আশ্চর্য সেক্সের আবির্ভাব বিবর্তনের চাপে। কোথায় যেন পড়েছিলেন। কোটি কোটি বছর আগে কোনও এক সময় প্রাণীজগতে যৌনতা এসেছিল নেহাতই একটা দুর্ঘটনা হিসাবে। কোথায় যেন পড়েছিলেন। স্ত্রী প্রজাতিই তার আদি স্বাক্ষর।

তিনি হাঁটছিলেন।

লক্ষ কোটি বছর আগেকার কোনও এক ঘোরের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছিলেন প্রিয়নাথ। প্রাণীজগতের সেই চরম মুহূর্তে নারীর পুরুষ তৈরির মুহূর্তে তিনি যেন নারীর শরীর থেকে বের হয়ে আসছেন। অজগর সাপ যেন উগলে দিচ্ছে তাঁকে। কী সব দেখলেন, চারপাশে শুধু ঢেউ, কিংবা পাহাড় কিংবা বালিয়াড়ি। অতিকায় অজগর যেন উগলে দিয়ে তাকে শুঁকে দেখছে। যেমন গাভী তার বাছুরকে জন্মের পরে লেহন করে—শরীর তাঁর লাল ঝোলে মাখামাখি। নারীর পুরুষ নির্মাণ এমনই কোনও হেতু থেকে।

তিনি হাঁটছিলেন। রিকশা নেবার কথা, তা নিতে ভুলে গেছেন। বিশাল পাঁচিল, তার পাশে বিজ্ঞান ভবন, তার পাশে সরকারি কর্মচারীদের বিশাল বিশাল হাইরাইজ বিল্ডিং—তার ভিতর পোকা মাকড়ের মতো অজস্র সংসার, এবং অজস্র জৈবিক তাড়না। নারীর পরিতৃপ্ত থাকার আয়োজন। তিনি হাঁটছিলেন, সুধা কত কষ্ট করে সারাজীবন তাকে ভালোবাসতে চেয়েছে। অসুখবিসুখে সে তার কর্তব্য করে যেতে বিন্দুমাত্র অবহেলা দেখায়নি। বড়ো কষ্ট হয় একা ফাঁকা ঘরে ঢুকতে। বিশ্বাসই করতে পারেন না, সুধা নারী প্রজাতির আদিম অস্তিত্ব। প্রেম এবং সৌন্দর্য ছিল তার নদী তীরে বালুবেলার মতো। সুধার জন্য সহসা তার বড়ো কষ্ট হতে থাকল—সুধার মৃত্যুদৃশ্যে তিনি বড়ো কাতর হয়ে পড়লেন। তাঁর গলা বুজে আসছে। তিনি সাঁকো পার হয়ে গেলেন। বাড়ির রাস্তায় দেখতে পেলেন সেই পাখির বাসাটা। তার আর হাঁটতে ইচ্ছে হল না। এই গ্রহের আদি এবং

অনন্ত ইচ্ছের কাছে মাথা নত করে পাখির বাসাটার নীচে বসে পড়লেন। তাঁর বাড়ি ঘরের কথা মনে থাকল না।

জলচোর

মেয়ে দুটো যায় কোথায়? কে জানে কোথায় যায়। তামাটে অন্ধকারে বিবর্ণ মেয়ে দুটো হেঁটে যায়। কেউ কোনও প্রশ্ন করে না। তবে যখন-তখন মানুষজন সুযোগ পেলেই তাড়া করে। থাকে খালপাড়ের বস্তিতে। বস্তি উচ্ছেদ হবার কথা। বস্তি উচ্ছেদ হলে কোথায় যে যাবে!

কী হবে অত সব ভেবে। কেউ কারও জন্য ভাবে না। যে যার তালে আছে। কিশোরী মেয়েটি বড়ো হতে হতে এই সার বুঝেছে। কেউ চেনে না, কোথায় থাকে, কী খায়। কেউ জানে না বললে ঠিক বলা হবে না—সহদেব জানে। বন অফিসের গৌরাঙ্গ চেনে, আরও অনেকে। সারাদিন রাস্তায় ঘুরে বেড়ালে যা হয়। ন্যাড়া মাথা, ফ্রক গায়, লম্বা এক কিশোরী আর তার কনিষ্ঠ বোন কাজল, কাজলের হাত ধরে সাঁজ লাগার আগে গাছপালার ছায়ায় তারা দুষ্ঠজনেই আকাশে তারা খুঁজে বেড়ায়।

আকাশে তারা খুঁজে পেলেই তারা হাঁটে।

অন্ধকার তাদের বড়ো প্রিয়। অন্ধকারে মিশে গেলে কেউ টেরই পায় না, শিল্পা আর কাজল বাবুদের বাগান থেকে অথবা বাবুদের কিছু উচ্ছিষ্ট খাবার, যদি কেউ দয়া করে হাতে দেয়, সহজেই কোঁচড়ে লুকিয়ে বস্তির ঝুপড়িতে ঢুকে যেতে পারে। সারা শহরের দেয়ালে, রাস্তার মোড়ে মোড়ে অজস্র ভোটের প্রচারপত্র উড়ছে—অন্ধকারে সেই সব প্রচারপত্র সহজেই বস্তার ভিতর ঢুকিয়ে দিতে পারে আর আড়ালে এই সব চুরিচামারি-সহ জলের জন্যও সকাল-বিকেল লাইন দেয় তারা।

শেষ পর্যন্ত খালপাড়ের বস্তি উচ্ছেদ হয়। কাজল আর শিল্পাকে নিয়ে তার বাবা-মা খালের ও-পাড়ে আস্তানা খোঁজে। আস্তানা পেয়েও যায়। বাড়িউলির একটাই শর্ত, কাজলের মাকে কাগজকুড়ানি হলে চলবে না। কাজলের বাবাকেও নোংরা ঘাঁটাঘাঁটি করলে বস্তিতে ঢুকতে দেওয়া হবে না। আর কী করা, সেই শর্তেই রাজি। বাড়িউলি শাসায়, এটা বাবা খালপাড়ের বস্তি পাওনি, এটা হানাপাড়ার বস্তি। লাইনের কলে জল আসে, ইলেকট্রিকে বাতি জ্বলে—হুসহাস অট্টসুহাস হয়ে যাও ক্ষতি নেই—আসলে খোলা নর্দমার অন্ধকারে মলমূত্র ত্যাগের যথেষ্ট সুবন্দোবস্ত আছে। এত সুবিধে কি খালপাড়ের বস্তিতে আছে।

শিল্পার বাবা বিজয় মাথা নাড়ে, তা ঠিক।

কাজলের মা মালিনীও মাথা নাড়ে—মাসিমা ঠিক বলেছেন, জঙ্গল ছাড়া খালপাড়ের বস্তিতে কোনও আব্রু ছিল না। আমার মেয়ে দুটোকে কাগজকুড়ানির বেটি কয়, গাইল্যায়, শিল্পা তো বড়ো হয়েছে, কাগজকুড়ানির বেটি বললেই সে হেস্তনেস্ত করে ছাড়ে। বড়ো চণ্ড রাগ, একদম বুঝদার না। যেখানে সেখানে জঙ্গলে ঢুকে কম্ম সারতে হয়।

টালির ঘর, পাকা মেঝে, সুইচ টিপলে আলো, শুধু কল টিপলে জল পাওয়া যায় না। বস্তি এলাকাতে একটি মাত্র টিউকল, কবে থেকে খারাপ হয়ে পড়ে আছে। বস্তির ঘরগুলিতে লাইনের কল থেকে জল আসে। জলের চাপ খুবই কম, ফলে জলের খুব আকাল। তায় আবার চৈত্র-বৈশাখের রোদের তেজ—তাপে ভাপে সব পুড়ে যাচ্ছে।

সকাল থেকে লাইনের কলে মারকাটার ভিড়, ঘটি বাটি জেরিক্যান প্লাস্টিকের বালতি যার যা আছে হাজির—তারপর কে আগে কে পরে, কার লাইনে কে ঢুকে গেছে এই নিয়ে বচসা, মারামারি ভাঙচুর—নিত্য এই এক আগুনজ্বলা গ্রীষ্মে দাবদাহের মতো সবাই জ্বলছে।

শিল্পা, কাজল দুই বোন খুব খুশি, কারণ তারা আর কাগজকুড়ানির বেটি নয়। এখানে উঠে এসে তাদের ইজ্জত বেড়েছে, তার মা-বাবা বিজয় আর মালিনী সকালে বের হয়ে যায়, রাত করে ফেরে। নোংরা ঘাঁটাঘাঁটি করে তারা কাগজ কুড়ায় দেখলে কে বলবে! ছুতার মিস্ত্রি, রাজমিস্ত্রি, যোগাড়ে, প্লাম্বার মিস্ত্রিদের এই বস্তিটায় শিল্পা আর কাজলকে কাগজকুড়ানির বেটি বলে কেউ হাঁক দেয় না। শুধু জলের আকাল ছাড়া বস্তিটা বড়োই সুবন্দোবস্ত হয়ে আছে তাদের কাছে। বাবা-মাও কোনও এক পুকুরে ডুব দিয়ে আসে, তারাও চলে যায় হেঁটে হেঁটে—বালির পুকুরে ডুব দিয়ে আসে—কিন্তু উপার্জন বাড়ে না। একটা ঘরের ভাড়া দিতেই উপার্জনের সব টাকা প্রায় উড়ে যায়।

খালপাড়ের বস্তিতে লুকিয়ে চুরিয়ে কিংবা হাতসাফাইয়ের উপার্জন থেকেও তারা বঞ্চিত। খালপাড়ের গাছপালার পাহারাদার গৌরাঙ্গদার সঙ্গেও আর দেখা হয় না, দেখা হলেই, এই শিল্পা আয়। শোন। চা বিস্কুট খাবি? চিনাবাদাম খাবি? ফুলুরি খাবি! কাজল ছুটে পালাত। —দিদি যাস না, লোকটা ভালো না—তোর গায়ে পায়ে হাত দেবে। ক্ষুধার তাড়নায় শিল্পা বেচাল, গায়ে পায়ে হাত দিলে কিংবা ফ্রকের নীচে, সে যে আরামই পায়। তবে বস্তি এলাকাতে কিংবা দূরের কিছু এলাকায় জল পৌঁছে দিলে, জেরিক্যান পিছু আট আনা এক টাকা উপার্জন হয়। এই এক কৌশল, কিন্তু রাস্তার কলে বাড়িউলি সব সময় একটা নল লাগিয়ে রাখে। প্রভাব প্রতিপত্তি থাকলে সব হয়।

জল চাই, জল জল করে দুই বোন হন্যে হয়ে ঘুরছে—খালপাড় হয়ে বৈশাখীর ঘেরা পাড়ে কল আছে, কিন্তু সেখানে দু বোনের এই প্রখর রোদে যাওয়াই কঠিন, তবে তারা ছুটে যায়, কারণ তারা ছুটে না গেলে অত দূরে জলের নাগাল পায় না, তারপর সারিসারি জলের লাইন তো আছেই। কী যে করে। সর্বত্র জলের হাহাকার।

আর এ-সময়েই কাজল ডাকল, দিদি রে।

শিল্পা বলল, কী?

ওই দ্যাখ। জলের ট্যাংকি!

কার?

বাবুদের।

তাদের ঘর পার হয়ে, কিছুটা বনজঙ্গল পার হয়ে গেলে পাঁচিল। হলুদ রঙের বাবুদের বাড়ি। একতলার ছাদে জলের ট্যাংকি। ট্যাংকি থেকে সোজা বাবুদের কলতলায় পাইপ—কল খুলে দিলে জলের ছড়াছড়ি।

২

তারকবাবু বাড়ি ফেরার পথে দুধের ডিপো থেকে দু-প্যাকেট দুধ নেন। সঙ্গে থাকে দিনরাতের কাজের লোক সরজু। আজ খেয়াঘাটের সহদেবকে বলেছিলেন, দুধের প্যাকেট সে যেন তুলে রাখে। অনেকটা আজ হেঁটেছেন। সকালে সময় পান না বলে বিকেলে, এই সল্ট লেক এলাকায় খেয়া পার হয়ে চলে আসেন। তারপর হাঁটেন। যতদূর খুশি হাঁটা যায়। এই শহরটায় মানুষজন কম। গাড়িঘোড়ার উৎপাত কম। দুর্ঘটনার ভয় কম। প্রশস্ত রাস্তা ধরে নির্বিঘ্নে হাঁটা যায়। খেয়াঘাটে হাঁটার শুরু ফুটব্রিজে শেষ। এভাবে দু-বার হাঁটলেই দুক্রোশ হয়ে যাবার কথা। হিসাবের বাইরে কিছুটা বেশি রাস্তা হেঁটে ফেরার সময় মনে হল, আজ একটু তাঁর বেশ দেরিই হয়ে গেছে। বেশ রাত হয়ে গেছে।

খেয়াঘাটে ফিরে দুধের প্যাকেট সহদেবের কাছ থেকে নেবার সময়ই দেখলেন, সেই ন্যাড়া মাথার মেয়ে দুটো চুটিয়ে ঝগড়া করছে। চারপাশে জনমজুরের ভিড়। খাল সংস্কার হচ্ছে—ঝুড়ি ঝুড়ি মাটি উঠছে। দু-পাড়ে মাটির পাহাড়।

এই শিল্পা, পয়সা দিলি না? সহদেব চেঁচাচ্ছে।

আমাদের পয়সা লাগে না। শিল্পার নির্বিকার জবাব।

পয়সা লাগে না! দাঁড়া দেখাচ্ছি।

সহদেব এ-পাশে বসে সাঁকো পারাপারের পয়সা নিতে নিতে বলল, দেখলেন বাবু, মেয়েটার কী তেজ!

তেজের কী দেখলে, কবে পয়সা দিয়েছি বলো! পয়সা দেব না। শিল্পা দৌড়ে চলে যাচ্ছিল। সহদেব খাঁচা থেকে নেমে একলাফে মেয়েটার হাত ধরে ফেলল।

সাঁকো পার হতে গেলে চার আনা পয়সা লাগে। মেয়ে দুটো ঠায় দাঁড়িয়ে পয়সা নিয়ে অবলীলায় ঝগড়া করছে। —হাত ধরলে কেন, গায়ে হাত দিলে কেন?

তারকবাবু বললেন, দাও, প্যাকেট দাও। দেরি হয়ে গেছে। বাড়ির লোক চিন্তা করবে।

ততক্ষণে আরও সব লোকজন জমা হয়ে গেছে। এরা ঘাটেরই লোক। পয়সা তোলে। মেয়ে দুটো পয়সা দিচ্ছে না, অথচ যথেষ্ট রোয়াব।

আমি তোর হাতে হাত দিয়েছি? সহদেবের কেমন মিনমিনে গলা।

দিয়েছ তো।

এত ইজ্জত কাগজকুড়ানির মেয়ের! আজ তোদের দুটোকেই বেঁধে রাখব, দাঁড়া।

কাগজকুড়ানির মেয়ে, তো তোমার বাপের কী! আমরা কাগজকুড়ানির মেয়ে! তুমি কী! মেথর ডোম মুচি। হাত ছাড়ো বলছি। গাছের মরা ডাল, কুকুর বেড়ালে পেস্যাব করে তোমার মুখে।

তারকবাবু মেয়ে দুটোকে চেনেন, তার একতলা বাড়ির পাশে ইদানীং একটা ছোট্ট বস্তি গজিয়ে উঠছে। বস্তিতে মেয়ে দুটো নতুন আমদানি। লাইনের কলে জল এলে হাতে জেরিক্যান না হয় বালতি—লাইন দিয়ে সকাল বিকাল দাঁড়িয়ে থাকে।

তোর মা বাবা তো কাগজ কুড়াত, এত ইজ্জত থাকলে পয়সা না দিয়ে সাঁকো পার হতেছিস ক্যানে?

বলছি না, পয়সা আমাদের লাগে না। কবে পয়সা নিয়েছ বলো?

তা ঠিক। সহদেব মনে করতে পারে মালিনী সুঠাম সুন্দরী না হলেও গায়ে গতরে যে কোনও পুরুষকেই লোভে ফেলে দেবার মতো। মালিনী থাকত বাপের সঙ্গে। বুড়োর কাশির ব্যামো। বাবুদের বাড়ি কাজ করে তখন মালিনী বুড়ো বাবাকে খাওয়াত। দু-দুবার বাবুরা তাকে গর্ভবতী করেছে। শিল্পা, কাজল আরও দু-তিনটে—তবে বাঁচল না, মরে গেল। বিজয় বাউণ্ডুলে মানুষ। ছেঁড়া চটের বিশাল ব্যাগটা মাথায় করে সে চলে আসত, এবং পয়সা কড়ি দিয়ে মালিনীকে হাত করেছিল—তারপর দুষ্ঠজনেই কাগজকুড়ানির কাজে লেগে গেল।

মালিনীর সুবিধা অসুবিধায় সে নিজেও তাকে পয়সা দিত—সেই পয়সা গায়ে গতরে উশুল করা ছাড়া তার উপায়ও ছিল না। দেশে বউ ছেলে মেয়ে পড়ে থাকলে, সেই বা যায় কোথায়।

সেই এক অষ্ট প্যাঁচ।

তারকবাবু দেখলেন, এখানে আর তাঁর থাকা ঠিক হবে না। তিনি বললেন, আমি যাচ্ছি সহদেব।

না বাবু আপনি থাকেন। মেয়েটো আমাকে ফাঁসাতে চায়।

ফাঁসাতে! বলো গায়ে হাত দিলে কেন! আমার ইজ্জত নিলে কেন।

সহদেব ঠিক জানে না, মেয়েটা কার— মালিনীর চোখ দুটো বড়োই টানে তাকে। সেও তো মালিনীকে এককালে যথেষ্ট ভোগ করেছে। এই মেয়ে দুটো কার?

তারকবাবু বললেন, ছেড়ে দাও। আমি ওদের পয়সা দিয়ে দিচ্ছি।

কারণ তারকবাবু বুঝতে পারছেন, মেয়ে দুটোর পক্ষেও মানুষজন কথা বলছে।

না সহদেবদা, তোমার এটা উচিত কাজ হয়নি। তুমি কিন্তু ফেসে যাবে। আজকালকার আইন তো জানো না।

রাখ রাখ, আইন আমার দ্যাখা আছে। ওর মায়ের বেলায় আইন ছিল কোথায়! পয়সা না দিয়ে পালাচ্ছে ছুটে গিয়ে ধরেছি!

কেন ধরেছ? মেয়েটার চোখে যে ধার উঠে গেছে জানো না? ধার উঠে গেলে, মেয়েরা কী চায় পুরুষ কী চায় বোঝো না! এই, কোথায় যাবি চলে যা তোরা।

শিল্পা অনড়।

চোখমুখ শিল্পার জ্বলছে।

আমি কাগজকুড়ানির মেয়ে। জানো, আমরা খালের ওপারে বাসা ভাড়া নিয়েছি।

তখনই তারকবাবু বললেন, আমি তোদের চিনি। তোরা জলের জেরিক্যান হাতে ছোটাছুটি করিস। তোর বাবা কী করে? পাশের বস্তিতে তোরা থাকিস।

ও মা, তুমি সেই বাবু! তোমাকে চিনতেই পারিনি, এই কাজল বাবুকে প্রণাম কর, সে নিজেও সাস্টাঙ্গে তারকবাবুকে প্রণাম করতে এলে তিনি পা সরিয়ে নিচ্ছিলেন—আরে তোরা করছিস কী! ঠিক আছে, ঠিক আছে!

কাজল বলল, ক্যারে দিদি।

তুই কি রে। একতলা বাড়ির বাবু। মনে নেই জানালা থেকে বাবু তাড়া দিচ্ছিলেন, এই তোরা কে রে? জঙ্গলে ঘাপটি মেরে কী করছিস! হাতে জলের পাইপ কেন?

কাজল বুঝতে পেরে কেমন বড়ো বড়ো চোখ করে দেখল বাবুকে। বাবু কি টের পেয়েছে, ইদানীং তারা বাবুর লাইনের কলে প্লাস্টিকের পাইপ গুঁজে দেয়। টের পেলেই সর্বনাশ। বাবুর জলের ট্যাঙ্ক থেকে কলতলায় পাইপ নেমে এসেছে এটা প্রথম কাজলই টের পায়।

দিদিরে! কাজল চেঁচাল।

ফের কাজলের চেঁচামেচি—জল, জল, কত জল!

রাস্তার কল থেকে পাইপ গুঁজে কিংবা পাশের জমির মধ্যেও আছে জলের লাইন, এক কোণায় ইটের ঘর তুলে বাবুদের ড্রাইভার মহসিন কাকা বউ-বাচ্চা নিয়ে থাকে, সময়ে অসময়ে সুযোগ পেলে সেখানেও জলের পাইপ লাগিয়ে নিতে পারে তারা, তবে এই খরায় খা খা করছে সব, জলের চাপ নেই, মহসিন কাকার কল কিছুটা উঁচু জায়গায় বলে জলের চাপও কম—তবু কাকিমা ভালো মানুষ বলে, তাদের ডাক-খোঁজ করে—এই কাজল, এই শিল্পা, পাইপ লাগিয়ে দে তাড়াতাড়ি, জল কিন্তু চলে যাবে। এত জল দিয়ে তোরা কী করিস?

আর যা হয়, লাগিয়ে দিতে দিতেই শেষ। জেরিক্যান ভরে না, তার পর এই সারাদিন ধরে জল নিয়ে মারামারি চলে। তারা দুষ্ঠবোন জেরিক্যান নিয়ে দূরে দূরেও চলে যেত, মাথায় করে জল নিয়ে আসত—তারপর কাজলের জলের ট্যাঙ্ক আবিষ্কার—সে যে কত বড়ো বিপাক থেকে রক্ষা, শুধু তারা দুষ্ঠবোনই জানে।

৩

এই এলাকাটা মানুষজন এত গিজগিজ করবে, তারকবাবু কস্মিনকালেও ভাবেননি। তাঁর বাড়ির পেছনে লাইনবন্দি কাঁচা-পাকা ইটের ঘর, ঝুপড়িও আছে। সরকারের খাস জমি হলে যা হয়। পার্টিরও মদত আছে। গরিবগুরবো মানুষ যাবে কোথায়। কাজেই তাঁর পেছনের বাড়িউলি সোহাগী বলতে গেলে পার্টির মদতে কাঁচা-পাকা ঘর তুলছে, আর ভাড়া বসিয়ে রোজগার বাড়াচ্ছে। সোহাগীর নিজেরও যথেষ্ট অভাব অনটনের সংসার। তারও দোষ দেওয়া যায় না। গু-মুতের গন্ধে তিনি নিজেও অতিষ্ঠ হয়ে ওঠেন। জলনিকাশি ড্রেনে গু-মুত ধুয়ে দিলে কেউ টেরও পায় না, চট দিয়ে অথবা পলিথিন ঘেরা এই মলমূত্র ত্যাগের ঝুপড়িগুলোর মানুষদের মলমূত্র কোথায় যায়! শুধু পরিবেশ দূষণ ছাড়া এদের আর কোনও অপরাধ আছে বলেও তিনি মনে করেন না।

আবার সহদেবেরও দোষ দেওয়া যায় না, ঘাটের ডাক নিতে সরকারের ঘরে পয়সা জমা দিতে হয়। পারানির কড়ি দিয়ে সরকারের পয়সা উসুল করতে হয়। সহদেব তার ভাই-বেরাদর মিলে মালিকের হয়ে ঘাট সামলায়। পয়সা উপার্জন না হলে সে-ই বা মালিককে কী দেয়, আর মাগ-ছেলে নিয়ে সংসারই বা করে কী করে!

সংসার এই এক অষ্টপ্যাচে মাতাল। ছেড়ে দাও। হুজ্জুত করে কিছু হবে না গরিব মানুষ, কোথায় যাবে!

তারকবাবুকে সহদেব সমীহ করে। তারকবাবু তার একতলার বাড়িতে হোমিওপ্যাথি ডাক্তার, নামযশ আছে—অসুখেবিসুখে সহদেবকে তাঁর কাছে আসতেই হয়।

না বাবু, আজ ছাড়ছি না। আমি ডোম, মুচি, মেথর। আরে তোরা কী। দিল তো তুলে। পারেনি রুখতে। খালের ধারে ঝুপড়ি বানিয়ে থাকলি, কাগজ কুড়িয়ে বেড়ালি, খালের পাড়ে যতদূর দেখা যায়, ঝুপড়ি উঠছে তো উঠছেই। কেউ বাধা দিচ্ছে না। পুলিশ মাসোহারা পেলে কে আর বাধা দেবে বলুন! ওর বাপকে পইপই করে বলেছি, বিজয় এইসা দিন নেহি রহেগা। মেয়ে দুটোকে হতে দেখলাম, বড়ো হতে দেখলাম, খাল কাটা শুরু হল, উচ্ছেদ হয়ে কোথায় যে চলে গেল! আজ দেখি তেনারা হেলেদুলে নগর ভ্রমণে বের হয়েছেন! সাঁজ লেগে গেছে বাবু—তোরা কোথায় যাবি বল! সোমত্ত মেয়ে—

শিল্পা চিৎকার করছে, যেখানে খুশি যাব, তোমার ঘিলু ফাটে কেন। তুমি আমাদের কে? কাগজকুড়ুনির মেয়ে বলে গাল পাড়লে কেন? আমার গায়ে হাত দিলে কেন?

সহদেব বলল, ডাক্তারবাবু দেখছেন, মেয়ে দুটোর কী চোপা। আপনি সাক্ষী। আপনার সামনে সব ঘটেছে। বলুন পয়সা না দিলে কেউ ছাড়ে! আমাকে আইনের ভয় দেখাচ্ছে।

শিল্পা বলল, ভগবানের দিব্যি, কবে সাঁকো পার হতে তুমি পয়সা নিয়েছ বলো? বলো কেন আমার গায়ে হাত দিলে!

পয়সা নিইনি, কেন নিইনি জানিস না। তোর মাকে ডেকে আন। খালপাড় হয়ে তোদের পাখনা গজিয়েছে। ইজ্জত বেড়েছে। কাগজ কুড়ানির মেয়ে বললে গায়ে এখন ফোসকা পড়ে। হ্যাঁ এত বেইমান তোরা! আপদে-বিপদে কে দেখত তোদের বল! কত অকথা কুকথা বললি, লোকে মজা দেখছে—খালের এ পাড়ে ছিলি, নিজের মানুষ ভাবতাম। ও পাড়ে উঠে গেলি নিজের মানুষ কেন ভাবব বল!

মজা দেখবে না! তুমি কি ভালোমানুষ, বলো, তুমি ভালোমানুষ! পয়সা মাগনা দিয়েছ না! মা আমাকে সব বলেছে।

সহদেব চুপসে গেল।

তারকবাবু ভিড়টাকে বললেন, বাবারা আপনারা যান, কিছু হয়নি। সহদেবকে আমি অনেকদিন থেকে চিনি—পয়সা না দিলে তার তো রাগ হবেই। পয়সা না দিয়ে পালালে তাকে ছুটে গিয়ে ধরলে দোষের না। তার তো হিসাবের কড়ি, সরকারের ঘরে জমা, মালিকের ঘরে জমা, পুলিশের কাছে জমা, এত জমার পরে এরা চার-পাঁচজন ভাগে আর কত পায় বলুন বাবারা! তারকবাবু ভাবছেন—শিল্পা শত হলেও কিশোরী, গায়ে গতরে কলাগাছ, গায়ে হাত দিলে অ্যাটেম্পট টু রেপ-ও হয়ে যেতে পারে। এই শিল্পা, তোর গায়ে সহদেব হাত দিয়েছে?

আজ্ঞে না বাবু।

সহদেব যেন পারলে তারকবাবুর পায়ে গড়িয়ে পড়ে। দিনকাল খারাপ—তারকবাবু জানেন, এই সেদিন তার এক কাছের মানুষ দেবীপদ বাসা ছাড়ছে না বলে বাড়িউলি সোজা থানায়— অ্যাটেম্পট টু রেপ বলে ডাইরি— পুলিশকে পয়সা খাওয়ালে যা হয় দেবীপদকে আটক করে সোজা আদালতের কাঠগড়ায়— আট দিনের হাজতবাসের পর ছাড়া পেয়েছে। বাড়িতে অশান্তি, দেবীপদ ছাড়া পেয়ে নির্বাক হয়ে গেছে। সারাদিন অন্ধকার ঘরে বসে থাকে—কারও সঙ্গে কথা বলে না।

তারকবাবু বেশ ক্ষুব্ধ গলায় বললেন, তবে যে তুই বললি গায়ে হাতে দিয়েছে!

বলব না। সবার সামনে আমার ইজ্জত নিলে আমার রাগ হয় না। আমাকে কাগজ কুড়ানির মেয়ে বলে গাইল্যায়! আমার রাগ হয় না বাবু!

৪

চারপাশে জলের যতই হাহাকার থাকুক, তারকবাবুর বাড়িতে সবসময় জল। লাইনের জল তো আছেই— বাড়িতে ডাবল সিলিন্ডারের মোটর ফিট করা টিউকলও আছে। বাড়িটায় মানুষজন মেলা, লাইনে জল নেই তো টিউকল চালিয়ে জল তুলে ফ্যালো রিজার্ভারে।

পৈতৃক বাড়িতেই তারকবাবু থাকেন, একসময় বাজারের মুদিখানায় বসতেন, ভাইপোরা লায়েক হয়ে গেলে তিনি আর সেদিকে যান না। সংসারে তিনি একা মানুষ, তবে কী যে হয়, সংসারের সুবিধা অসুবিধার সঙ্গে তিনিই জড়িয়ে গেছেন। ভাইপো ভাইঝিরা তাঁর অভিভাবকত্বেই মানুষ। দাদা বৌঠানও বেঁচে নেই, ছোটো ভাই মৃদুলকে বছর দুই হল দোকানেই জুড়ে দিয়েছেন, তার কথা ছাড়া এ-বাড়ির কুটোগাছটিও কেউ নাড়তে সাহস পায় না।

একতলা বাড়িটায় মেলা ঘর, দুটো বাথরুম, জল চাই—কত যে জল লাগে— দোকানের কাজের লোকেরাও থাকে, তার ডিসপেনসারিতে যে ছেলেটা কাজ করে, পুরিয়া বানায়—এবং তাঁর নির্দেশ মতো ওষুধ দেয়, সেও থাকে। সুতরাং সেই বাড়ির কেউ যদি সকাল বেলাতেই এসে খবর দেয়, কাকা চাবিটা দাও, রিজার্ভারে জল নেই। এক্ষুনি টিউকল থেকে জল তুলতে হবে। সাতটা না বাজলে লাইনে জল আসবে না।

বাড়িটায় জলের খুব অপচয় হয় বলে, তিনি টিউকলের চাবিটি নিজের কাছে রাখেন। হিসাব করে বিকেলের দিকে টিউকল থেকে জল তোলেন। লাইনের জলে রিজার্ভার যাতে ভর্তি থাকে, সে-জন্যই এই সতর্কতা। তা ছাড়া রোজ পনেরো বিশ মিনিটের জন্য টিউকল থেকে জল না তুললেও চলে না—অব্যবহারে টিউকলটি নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

সবে ঘুম থেকে উঠেছেন তিনি। ভাইঝি বীথি এসে হাজির। সেই খুব সকালে ওঠে, কারণ তাকে বাস-ট্রেন ঠেঙিয়ে সকালে কলেজ করতে হয়। বছর দুই ধরে সেখানে সে পার্টটাইম করছে। দুষ্ঠবারের বার বীথি স্লেট ও পেয়ে গেছে। শিগগিরই ফুল টাইম চাকরি হয়ে যাবে। খুবই মেধাবী এবং পরিশ্রমী, আর ঠিক তখনই তিনি কেন যে সেই কিশোরী মেয়েটির মুখ সামনে ভেসে উঠতে দেখলেন— কাজলের হাত ধরে শিল্পা জঙ্গলের দিকে ছুটছে। হাতে সেই লম্বা প্লাস্টিকের পাইপ, তারা জল খুঁজে বেড়াচ্ছে।

জল নেই কেন? তারকবাবু যেন ভারি বিড়ম্বনায় পড়ে গেছেন।

বীথি বলল, যা বাড়ি, কে কোথায় কল খুলে রেখেছে। চাবিটা শিগগির দাও, আমার লেট হয়ে যাবে।

তা হতে পারে, রান্নাঘর, বাথরুম, ডাইনিং স্পেস, বারান্দায় সর্বত্র বেসিনের ছড়াছড়ি। কার গোয়াল, কে বা দেয় ধোঁয়া। এজমালি সংসারে যে রকমটা হয় আর কি!

কেউ কল খুলে রাখতেই পারে। সারা রাত ধরে জল পড়লে রিজার্ভারে আর জল থাকে কী করে?

বীথিকে চাবিটা দিয়ে তিনি সব বেসিনের কল ঘুরিয়ে দেখলেন, না সবই ঠিক আছে, কোনও কলই খোলা নেই—সব কলই বন্ধ। বিকালে রোজই ফুলট্যাংকি করে রাখেন, কালও রেখেছিলেন, ছাদে ইটের গাঁথনি দিয়ে বিশাল রিজার্ভার, একবার সকালে ভরে রাখলে যত লোকই থাকুক সারাদিন অপর্যাপ্ত জল। অধিকন্তু দোষায় বলেই বিকেলে জল তোলেন ফের। যা জলের হাহাকার চলছে, কখন কী ঘটবে, জল নেই, মাটির নীচেও জল নেই—জল না থাকলে যে কী অপরিসীম কষ্ট, বস্তির মেয়ে দুটোকে দেখে টের পেয়েছেন।

সবই ঠিক আছে, তবু এত জল গেল কোথায়। কোনও কলেরই মুখ খোলা নেই। নীচের রিজার্ভারও খালি। বাড়ির পেছনের দিকেও একটা জলের কল আছে, অবসর

সময়ে তিনি একটি ফুলের বাগানও তৈরি করেছেন, নানা জাতের ফুল, পাইপ লাগিয়ে সরজু বাগানে জল দেয়। ঠিকা কাজের মেয়েটিও বাইরের কলটি কাঁড়ি কাঁড়ি বাসন ধোওয়ার জন্য ব্যবহার করে— ছাদ থেকে সোজা একটি পাইপ নামানো আছে— ট্যাংক থেকে জল নিলে পাইপের মুখে জলের চাপ বাড়ে, তারপর বাড়ির নালা-নর্দমা সাফ রাখার জন্য প্রচুর জলের দরকার হয়।

জল না থাকলে কী অশান্তি সৃষ্টি হয় তাও তিনি জানেন। এত জলের সরবরাহ থাকা সত্ত্বেও জল নিয়ে ত্রাসে আছেন বলেই বাধ্য হয়ে ডাবল সিলিন্ডারের দুশো ফুটের একটি নতুন কল আট-দশ বছর আগে করে রেখেছেন। একশ ফুটের কলটি তুলে দুশো ফুটের নতুন কল বসিয়ে নিশ্চিন্তই ছিলেন— তবে যা অবস্থা যে ভাবে চারপাশে হাইরাইজ ফ্ল্যাটবাড়ি হচ্ছে, তাতে করে শেষ পর্যন্ত দুশো ফুটের জলের লেয়ারটিও যে ঠিকঠাক থাকবে বলা যাচ্ছে না। গভীরতম গভীর নলকূপ বসিয়ে যদি জল না মেলে কী যে হবে— আসলে তারকবাবু এই সব দুশ্চিন্তায় প্রায়শই ভোগেন। চৈত্র-বৈশাখে জলের আকাল এমনিতেই থাকে, কিন্তু এবারে যেন হাহাকার একটু বেশি মাত্রায়। ভালোয় ভালোয় বর্ষা নামলে ভাববেন, দুশো ফুটের কলটিকে চারশো ফুটের লেয়ারে ঢুকিয়ে দেবেন।

তারপর!

তারপর আটশ ফুটের লেয়ারে।

তারপর?

কোথাও জল পাওয়া যাচ্ছে না।

তারপর, তারপর কী হবে!

বাড়ির মানুষজন বুঝবে না। জল অপচয় করলে আখেরে আর জলই পাওয়া যাবে না। জল নিয়ে সবাইকে পস্তাতে হবে।

বাড়িটায় তিনি কিছুক্ষণ হম্বিতম্বি করে বেড়ালেন—এক বালতি জলে স্নান সারতে হবে, এমনও ফরমান জারি করলেন, তবু কেন যে দ্বিধায় আছেন, কাল বিকেলে ট্যাংক ভর্তি করে রেখেছেন, অথচ সকালে খালি।

ফের মেয়ে দুটোর মুখ ভেসে উঠল, হাতে জেরিক্যান। হাতে, কলে নল লাগিয়ে জল তোলার পাইপ, যদি তাঁর ট্যাঙ্ক থেকে তারা জল চুরি করে, করতেই পারে—কলতলার দিকে যদি রাতে ট্যাংকের পাইপের মুখে নল ঢুকিয়ে কল ছেড়ে দেয়—তবে হড়হড় করে জল সব নেমে যাবে, তিন-চার মিনিটে বালতি, জেরিক্যান ভরে যাবে, এক বালতি জল যদি বস্তিতে এক টাকায় বিক্রি হয়, তবে মেয়ে দুটোর অনেক পয়সা হয়ে যায়—সারাদিন জলের ধান্ধায় যে কেন ঘোরে, এতক্ষণে যেন সব টের পেলেন।

কলতলার শেষ দিকটায় তাঁর পাঁচিল—পাঁচিলে সারি সারি পেরেক পোঁতা, চোরের উপদ্রব থেকে বাড়িটাকে রক্ষা করার জন্যই এত বেশি সতর্কতা—ইতিমধ্যে পাঁচিলের এক জায়গায় কাঠ কিংবা ইট দিয়ে পিটিয়ে পেরেক সব সমান্তরাল করে রেখে গেছে কেউ। এই বাড়িটা এমন যে, ঢুকে গেলে বের হবার রাস্তা থাকে না, চোরেদের বুদ্ধির দৌড় তাঁর চেয়ে বেশি, পাঁচিলের প্লাস্টার খসিয়ে মেরামতেরও দরকার ছিল, হবে হচ্ছে করে বছরখানেক পার হয়ে গেল—সেই জায়গাটা দিয়েই শিল্পা ঢুকছে, কোনও গাছের ডালে কিংবা পেয়ারা গাছও আছে একটা, তার উপর উঠে কলতলায় ঢুকে মধ্যরাতে কল থেকে জল চুরি করা খুবই সহজ। —তিনি হেঁটে গিয়ে সব দেখলেন, তারপর পাঁচিলের উপর দুটো আলগা ইট রেখে দিলেন, অন্ধকারে কেউ ঢুকলেই হাতে লেগে ইট পড়ে গেলে জখম হবে, অথবা শানের উপর ইটের শব্দে তিনি জেগে যাবেন—এমনই সব ভাবতে ভাবতে বাড়ির ভিতর ঢুকে গেলেন—জল চুরি বন্ধ না করলে, সকালে আবার ট্যাংক খালি।

হলও তাই, তবে দু-দিন পরে। ইটের জায়গায় ইট ঠিকই আছে, মেয়ে দুটোর উপর তিনি ক্ষেপে যাচ্ছিলেন। কাগজ কুড়ানির মেয়ে বলায় কী তেজ। সহদেবকে ফাঁসাতে পর্যন্ত চেয়েছিল, মেয়েদের গায়ে হাত দিলে পুরুষমানুষের যে হাজতবাস হয় সে খবরও শিল্পা রাখে বোধ হয়।

জোর করে মেয়েমানুষের গায়ে হাত দিলে অ্যাটেম্পট টু রেপ হয়ে যায় শিল্পা মণি পিসির টিভি থেকে জেনে ফেলেছে বোধ হয়।

পাড়ায় চায়ের দোকান মণির সঙ্গে যে শিল্পার সবিশেষে ভাব আছে তারকবাবু তা টের পেয়েছেন।

তোর সঙ্গে আলাপ হল কী করে? এইতো সেদিন বস্তিতে উঠে এল। মণিকে কথায় কথায় মেয়ে দুটো সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিলেন।

বা রে, ওর বাবা-মা আমার দোকানে চা খায়—আমার দোকানে জল সাপ্লাই করে। রাতে সুযোগ পেলে দুষ্ঠ বোন গিয়ে আমার ঝুপড়িতে বসে থাকে, টিভি দ্যাখে। আমি তো সব জানি।

ওর বাবা মা কাগজ কুড়ায়?

তা জানিনে। বলে না কিছু। আমার ব্যাটার গায়ে কী সব—

তোর ছেলের জামা খোল। আরে সারা গায়ে ঘা। এত পাঁচড়া! বস, ওষুধ দিচ্ছি।

তা হলে সহদেব মিছে কথা বলেনি। মেয়ে দুটোকে রেখে বাবা-মা বের হয়ে যায়। স্নান মণির বাড়িতেই হয়তো তারা সারে—এই বস্তিতে যখন ঢোকে, কেউ টেরই পায় না, শিল্পার বাবা-মা সারাদিন কাগজ কুড়ায়। এই বস্তিতে উঠে আসায় শিল্পা মনে করে তাদের

মান সম্মান বেড়েছে। কেউ জানেই না, তারা কাগজকুড়ানির মেয়ে। উচ্ছেদ হওয়া খালপাড়ের আস্তানায় একরকম, আর বস্তিতে বাসা ভাড়া নিলে তাদের কাগতাড়ুয়া বলে এমন সাহস কার! শিল্পা নিজেও দু-চার টাকা উপার্জনের ধান্দায় আছে। জল বেচে টাকা হয়, ওই বস্তিতে উঠে এসে টের পেয়েছে।

মাঝে মাঝে ট্যাংক সকালে খালি করে দিলে কার না রাগ হয়! এত ইজ্জত তোর, কাগজ কুড়ালে ইজ্জত যায়! জল চুরি করলে ইজ্জত যায় না, না! দাঁড়া মজা দেখাচ্ছি। কারণ তারকবাবু রাতে পাহারা দিয়েও ধরতে পারছেন না । কলেরই মুখ বন্ধ করে দিতে পারেন, কিন্তু জমাদার এসে জল পাবে কোথায়, বাগানেই বা সরজু জল দেবে কী করে!

তিনি তবু সরজুকে বললেন, প্লাম্বার মিস্ত্রি ডেকে কলটা খুলে ফেল। দেখি জল চুরি যায় কী করে!

সরজু আমতা আমতা করে বলল, বাবু, খুলে ফেললে বাসনকোসন ধোওয়ার জল পাবে কোথায়, জমাদার জল পাবে কোথায়?

লাইনের জলে যেটুকু হয় হবে। তুই খুলে দে। ট্যাংকের পাইপের মুখ সিল করে দে। দেখি হারামজাদি মেয়ে দুটো জল পায় কোথায়।

হলও তাই। সরজু মিস্ত্রি এসে কলপাড়ের ট্যাংকের পাইপ সিল করে দিয়ে গেল। জল চুরির আতঙ্কে তারকবাবুর অনিদ্রা রোগ—কলের মুখ খুলে ফেলায়, পাইপের মুখ সিল করে দেওয়ায় এখন তিনি মনে মনে ফুরফুরে জ্যোৎস্নায় বিচরণ করেন, বোঝ এবার—হলে কী হবে বিকালবেলায় হাঁটতে বের হলে বোঝেন সত্যি জলের আকাল কত—লাইন দিয়ে সারি সারি পেতলের কলসি, প্লাস্টিকের বালতি, মেটে হাঁড়ি, পলিথিনের জেরিক্যান মানুষজন, ভিড় বচসা মারামারি—চুল ধরে টানাটানি—তার উপর চারদিন হয়ে গেল ডিপটিউবেলের মোটর খারাপ হয়ে গেছে বলে লাইনেও জল নেই—মেরামতির কাজে এসে বড়ো মিস্ত্রির জবান, জল নেই, সার। লাও ইবারে ঠ্যালা বোঝো!

জল নেই। ফেরার সময় দেখেন কাজলের হাত ধরে শিল্পা এই ত্রিসন্ধ্যায় কোথায় রওনা হয়েছে। চুল উসখো খুসকো, ফ্রক ছেঁড়া কপাল ফোলা, হাতে ব্যান্ডেজ, জলের লাইনে মারামারি করে শেষে এই দুর্দশা—কেমন মায়া হল তাঁর। কী রে হাতে কী হয়েছে।

মেরেছে।

কারা?

বাবুরা।

কেন মারল?

জল চুরি করি বলে।

তোরা জল চুরি করিস।

করব না, দেখুন না বাবু কী হয় আপনাদের। তেষ্টায় আমাদের মরণ, আপনাদেরও মরণ হবে একদিন। কেউ বাদ যাবে না।

তোরা যাবি কোথায়? সাঁজ লেগে গেছে। ওলাওঠা দেবীর কাছে। শীতলা মন্দিরে যাব।

শিল্পা বলল, তিনি আমাদের ঠাকুর-দেবতা। খিদে পেলে খেতে দেয়, জল লাগলে জল দেয়, যা চাই দিয়ে দেয়। দেবীর এক কথা, এত তার খাবে কে! সে একলা খেলে চলবে কেন—সবাইকে দিয়ে থুয়ে, মানুষজন বাঁচিয়ে না রাখলে দেবী যে একা হয়ে যাবে! আমরা দেবীকে পাখি প্রজাপতি ধরে দি! দেবী এতেই খুশি।

কোথাকার কোন দেবী, তার কথায় তারকবাবুর কেমন হুঁশ ফিরে এল। সবাইকে বাঁচিয়ে না রাখলে, মানুষ নিজেও তো বাঁচে না। সবাইকে দিতে না পারলেও এ দুটো মেয়ের জলের তেষ্টা তিনি সহজেই নিবারণ করতে পারেন—

তিনি ডাকলেন, এই শোন।

কে শোনে কার কথা! দৌড় দৌড়। মেয়ে দুটো মুহূর্তে খালপাড়ের জঙ্গলে অদৃশ্য হয়ে গেল।

আজও ফিরতে তারকবাবুর রাত হয়েছে। কেন যে মনে হল শীতলামন্দির ঘুরে যাবেন। অনেকদিন যাওয়া হয়নি। শত হলেও ওলাওঠার দেবী, দেবদেবীকে মান্য করতে হয়। আর মেয়ে দুটো যদি সেখানে যায়—জীবনের নানা কুহকে ক্ষত-বিক্ষত হতে হতে হাঁটছেন, মেয়ে দুটোর কীই বা দোষ। কারা শিল্পার হাত ভেঙে দিয়েছে, ওরা নিমেষে পালালই বা কোথায়! খালের দুষ্ঠধাকে বনজঙ্গলে, তাকে দেখলে শিল্পা কাজল আরও গভীর জঙ্গলে ঢুকে যেতে পারে—যদি মনে করে তিনি তাদেরই খুঁজে বেড়াচ্ছেন। জলচোর তারা। ধরে নিয়ে যদি বেঁধে রাখেন, কিংবা ঠ্যাং ভেঙে দেন।

আর তখনই দেখলেন, বনজঙ্গলের অভ্যন্তরে একটি জরাজীর্ণ টিনের চালার সামনে কাজল হাঁটু গেড়ে বসে। মন্দিরটি ধসে পড়েছে। দেবদেবীর প্রতি মানুষের যথেষ্ট অবহেলা —খালের মাটি তোলা হচ্ছে, মাটির অভ্যন্তর থেকে দেবীর মুখ যেন গজিয়ে উঠছে—খাল সংস্কার হলে এমনই যেন হবার কথা।

মাটির ঢিবিতে দাঁড়িয়ে কাজলকে বলছে শিল্পা—

বলো, মা আমাদের কী দোষ! আমার দিদির হাত ভেঙে দিয়েছে। ওদের তুমি শাস্তি দাও মা।

কাজল দিদির হয়ে নালিশ জানাবার সময় বলল, মা আমরা আর জন্মে যেন কাগজকুড়ানির মেয়ে হয়ে না জন্মাই। মা আমরা যেন আর জন্মে দুধেভাতে থাকি। আমাদের মা-বাবাকে দ্যাখো। মা বৃষ্টি দাও। গাছপালা মানুষজন সব পুড়ে যাচ্ছে মা। গাছপালা সব জলে ভিজিয়ে দাও। জল না থাকলে যে প্রাণ বাঁচে না মা। পাখি প্রজাপতিরা জল না পেলে মরে যাবে মা।

বল কাজল, তোর দিদির যেন সুন্দর একটা বর হয়। পরিবার পরিজন নিয়ে যেন সুখে ডালভাত খেতে পায়।

শিল্পা যা যা বর চাইল, কাজল তার হয়ে সব বর মেপে নিল দেবীর কাছে।

তারকবাবু অবাক। শিল্পা নিজে কিছু চাইছে না—কাজলকে দিয়ে বলাচ্ছে। তিনি প্রায় যমদূতের মতো কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। তাদের আশ্বস্ত করে বলেন, কী রে শিল্পা কাজলকে দিয়ে দেবীর কাছে বলাচ্ছিস, তুই নিজে বলতে পারছিস না।

শিল্পা কেঁদে ফেলল, আমিও ভালো না বাবু, আমি লুভি, পেটুকে, খালপাড়ের বাবু আছে না, গৌরাঙ্গদা, সে বাদাম ছোলা খাইয়ে শরীরে আমার কি খুঁজে বেড়াত—আমি বাবু আরাম পেতাম। দেবী কেন আমাকে বর দেবেন—আমি অশুচি না! আমি বর চাইলে দেবী রাগ করবে। ঠাকুর-দেবতা ছাড়া আমাদের যে কেউ নেই বাবু।

বয়ঃসন্ধি

জগদীশ পাঁচটা না বাজতেই ঘুম থেকে উঠে পড়েন। খড়ম পায়ে বাইরে বের হয়ে সূর্যপ্রণাম, তারপর নুয়ে এই বসুন্ধরা এবং যাকে তিনি জগজ্জননী ভাবেন তাঁদের উদ্দেশে চোখ বুজে কিছুক্ষণ ধ্যান, ফের ঘরে ঢুকে পেতলের গাডুটি হাতে নিয়ে হাঁটা দেন— সামনের সুপারিবাগানে ঢুকে যান, কিছুদূর হেঁটে গেলেই ঝোপের মতো জায়গায় তিনি অদৃশ্য হন। তারপর নদীর জলে অবগাহন, স্তোত্রপাঠ এবং ফেরার পথে মঠের শিবলিঙ্গের মাথায় একটি ধুতুরা ফুল এবং নদীর জল ঢেলে শিবস্তোত্র পাঠ করেন।

এত সকালে তার পুত্র অরণির ওঠার অভ্যাস নেই। দেশের বাড়িতে মাইনর পাশ করে বসেছিল, গতকাল তাকে নিয়ে তিনি তাঁর কর্মস্থলে চলে এসেছেন। স্থানীয় স্কুলে ক্লাশ এইটে ভর্তি করে দেবার ব্যবস্থাও হয়ে গেছে। রাতে পথশ্রমে অরণির বোধ হয় ভালো ঘুম হয়নি। সারারাতই ছটফট করেছে। বাড়ি ছেড়ে থাকারও কষ্ট কম না। ভোররাতের দিকে ঘুমিয়ে পড়ায় তিনি তাকে এখনও ডেকে তোলেননি। মনে মনে স্তোত্রপাঠ করছেন, এবং খড়ম পায়ে হাঁটাহাঁটি করলে অরণির ঘুমের ব্যাঘাত ঘটতে পারে—যতক্ষণ না হরমোহন নাজিরখানার দরজা খুলে দেবে, তিনি ঘর ছেড়ে যেতেও পারেন না।

অরণিকে তাঁর কিছু কথা বলার আছে। তাকে ঘুম থেকে তোলাও দরকার। ডাকতে কষ্ট হচ্ছিল, অঘোরে ঘুমোচ্ছে, অথচ সব না বলে গেলেও চলবে না। তাকে ঘুম থেকে উঠে হাতমুখ ধুয়ে বগলে বই নিয়ে জমিদারবাবুর পুত্রদের ঘরে চলে যাওয়া দরকার। সেখানে মাস্টারমশাই তাদের পড়াতে আসেন। অরণিও তাদের সঙ্গে পড়বে।

একবার, ভাবলেন ডাকেন। বলেন, অরু উঠে পড়ো। কারণ সকাল হয়ে গেছে। হাতমুখ ধুয়ে নাও। তোমার দেরি দেখলে বিশু চলে আসতে পারে। এ-বাড়িতে কেউ এত দেরি করে ওঠে না।

বাড়ি থেকে খুব সকালে রওনা হয়ে, কিছুটা পথ হেঁটে, বাকি পথ স্টিমারে যখন এই কাছারিবাড়িতে এসে উঠেছিলেন তিনি, তখন রাত হয়ে গেছিল। স্টিমারের আলোতে সুপারিবাগান এবং জমিদারদের খানিকটা প্রাসাদ ছাড়া অরণির চোখে কিছুই দৃশ্যমান ছিল

না। আমবাগানের পরিত্যক্ত কাছারিবাড়িতে অরণিকে একা থাকতে হবে ভেবে সে খুবই মনকষ্টে ছিল। কিছুটা আতঙ্কও চোখেমুখে লক্ষ করেছেন তিনি।

এখন ঘুম থেকে উঠেই দেখতে পাবে, সুপারিবাগান পার হয়ে নদীর জল কলকল ছলছল—নদীর পাড়ে গেলে ছবির মতো দেখতে জমিদারবাবুদের গ্রামটিও সে দেখতে পাবে। প্রাসাদগুলির জাঁকজমক অরণিকে অবাক না করে পারে না। নদীটি এত বিশাল আর নদীর চর, পাখির ওড়াউড়ি নিয়ে এত ব্যস্ত যে নদীটিকে দেখলেই ডুব দিতে ইচ্ছে হয়। তিনি এক আনা জমিদার দেবকুমারবাবুর আমলা। প্রাসাদ, দিঘি সহ নদীর পাড়ে তাঁর এলাহি ব্যবস্থা। ফুলের রকমারি বাহারও কম নেই বাড়িটাতে। অরণি ঘুম থেকে উঠে হাই তুললেই দেখতে পাবে সামনের সুপারিবাগান পার হয়ে পণ্যতোয়া নদীটির জল, জলে ঢেউ, পালতোলা সব নৌকা।

গ্রামের পাশে নদী থাকলে স্থানমহিমা যে কত বেড়ে যায়, অরণি ঘুম থেকে উঠলেই বুঝতে পারবে।

তখনই তিথি জানালায়—ও বাববা, অরুদা তুমি ঘুমোচ্ছ, তুমি কি গো। কত লোক কত দূর দেশে চলে গেল, এখনও তোমার ঘুম ভাঙল না।

জগদীশের মনঃপুত নয়, তিথি তাকে ডেকে জাগিয়ে দিক—কিন্তু, এতই চঞ্চল, আর হতভাগ্য মেয়েটি, যে তাকে তিনি কোনও কড়া কথাই বলতে পারেন না। আর এত কাজের, আসলে সে চলে এসেছে, বিছানা তুলে ঘর ঝাঁড় দিয়ে চলে যাবে। অরু আসায় এ-ঘরে তার যেন দায়িত্ব আরও বেড়ে গেছে। ওর বাবা গোরাচাঁদকে বাড়িঘর করার মতো কিছুটা জমি পাইয়ে দেওয়ার পর থেকে গোরাচাঁদের বউ যমুনার কৃতজ্ঞতার শেষ ছিল না। আগে যমুনা করে দিত, তিথি বড়ো হয়ে যাওয়ায় সে এখন করে দেয়। জিলিপি, তেলেভাজার দোকানের জায়গাটিও তিনি ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। বাজারের ওই একফালি জায়গা নবকুমারবাবুকে বলে ব্যবস্থা না করে দিলে গোরাচাঁদ একপাল ছেলেপিলে নিয়ে অথৈ জলে পড়ে যেত। তবে জগদীশের পছন্দ নয়, তিনি আগে মানাও করতেন, তাতে যমুনা কিংবা গোরাচাঁদের দুজনের মুখই বারী ব্যাজার হয়ে যেত। ভুঁইঞামশাইর মর্জিতেই জমিদারি চলে, তিনি এটুকু সেবা না নিলে, তারা কার কাছে গিয়ে দাঁড়াবে।

তিনি আর তারপর থেকে, কাজ করে দিলে মানা করেন না, কাজের কথা ভুলে গেলে ডেকে মনেও করিয়ে দেন না। নিজেই করে নেন। কোনওদিন তিথি হয়তো সকালেই নদীর পাড়ে গিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, ঘাটে পুণ্যস্নান থাকলে, নদীর জলে ডুব দিয়ে হয়তো পয়সা তুলছে। পয়সা সংগ্রহের উত্তেজনায় মনেই নেই, সকালে এক বালতি জল ভুঁইঞাকাকার ঘরে তুলে রাখতে সে ভুলে গেছে।

জগদীশ তখন নিজেই জল তোলেন।

জগদীশ তখন নিজেই ছাড়া জামাকাপড় ধুয়ে তারে মেলে দেন। এ-সব কাজের জন্য তিথি কিংবা যমুনার উপর নির্ভর না করে নিজে করে নিতে পারলে কিছুটা আত্মতুষ্টিতেও ভোগেন।

তারপরই হয় মুসকিল।

গোরাচাঁদ শুনে খেপে গেছে, কোথায় তিথি, কোথায় গেছে। ভুঁইঞামশাই তারে কাপড় মেলছে, সারাদিন ছুক ছুক করে বেড়ান, তোর এত লোভ! বউকেও বলবে , তুমি খেয়াল রাখতে পার না, তিথি ছেলেমানুষ, তার দোষ কি! ইস কী যে হবে!

জগদীশের কানেও কথা উঠে আসে।

ইস মেয়েটাকে গোরা গোরুখোঁজা খুঁজছে।

কেন? ও কী করেছে! অন্দরে থাকতে পারে। গোরাকে ওখানে খোঁজ নিতে বলো।

না ওখানে নেই।

ওখানে না থাকলে, নদীর চরে শালুক তুলতে যেতে পারে।

না সেখানেও যায়নি।

তবে গেল কোথায় মেয়েটা। এক দণ্ড চুপ করে বসে থাকতে পারে না। নদীর ঘাটে পুণ্যস্নান, মেলার চরে পালতোলা নৌকার ভিড়। মানুষজনও মেলা। পায়ে হাঁটা পথে, স্টিমারে কেউ কেউ এসে নেমে থাকে। মঠের চারপাশে ভিড় থাকে, তারপর মানুষজন নদীর ঘাটে পুণ্যস্নান সেরে চলে যাবে বাজারের দিকটায়। সড়ক ধরে, একপাশে, বিশাল সব প্রাসাদ ফেলে সোজা হেঁটে গেলেই বাজার—চরের উপর দিয়েও হেঁটে যাওয়া যায়, তারপর বিন্নির খই লালবাতাসা খেয়ে যে যার নৌকায় কিংবা হাঁটাপথে বাড়ির দিকে রওনা হবে। অষ্টমী স্নানেই বেশি ভিড়, ছোটখাটো পুণ্যস্নানও বছরে যে কিছু না থাকে—তাও নয়। তিথির তখন কেমন দিশেহারা অবস্থা। নদীর জলে ডুব দিয়ে পয়সা তুলবে। দুটো পাঁচটা যা পায়, সেই দিয়ে সেও বিন্নি খই লালবাতাসা কিনে কোঁচড়ে নিয়ে খাবে আর নদীর পাড়ে ঘুরে বেড়াবে। আর নদীর পালতোলা নৌকা, যেমন, কাঁঠালের কিংবা আনারসের তালের নৌকাও থাকে, এই সব নৌকার দিকে তাকিয়ে আপন মনে নদীর সঙ্গে কথা বলবে। নৌকার ব্যাপারিদের সঙ্গে কথা বলবে।

এই তিথি!

সে অবাক হয়ে তাকাবে।

তুই এখানে দাঁড়িয়ে আছিস? কী খাচ্ছিস!

কি খুশি তিথি। সে তার কোঁচড় খুলে দেখাবে।

যা বাড়িতে, তোর খাওয়া বের করবে।

তিথির চোখ মুখ শুকিয়ে যায়।

জগদীশ জানেন, গোরাচাঁদের ওই এক দোষ। বড়ো চণ্ড রাগ তার। মাথা গরম হয়ে গেলে সে ভালোমন্দ বোঝে না, মেয়েটার সজল চোখও তখন তাকে আটকাতে পারে না। বড়ো নির্মম হয়ে ওঠে।

জগদীশের এই হয়েছে মুশকিল। মেয়েটাকে ধরতে পারলেই গোরাচাঁদ টেনে হিঁচড়ে বাড়ি নিয়ে আসবে।

তুই মেয়ে খেয়ে খেয়ে মরবি! ভুঁইএ্যামশাইর ঘরে জলে তুলে রাখিসনি! ছাড়া কাপড় কেচে তারে মেলে দিসনি। তোর এত নোলা।

জগদীশ এই সব জানেন বলেই, তিথিকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না শুনলেই কিছুটা হতভম্ব হয়ে গিয়ে বলেন, কোথায় গেল। তারপর নিজেই খুঁজতে বের হয়ে যান, গোরাচাঁদের ভয়, মেয়েটার জন্য তার সব না শেষে যায়। বাবুদের অনুগ্রহে জমিদারিতে তার আশ্রয়। একখানা নোটিস ঝুলিয়ে দিলেই তার সব গেল। তিথি তার সর্বনাশ না করে ছাড়বে না।

জগদীশ সুপারিবাগানের এক কোণায় গিয়ে ডাকবেন, গোরাচাঁদ, গোরা আছিস?

আজ্ঞে উনি তো তিথিকে খুঁজতে গেছেন।

যমুনা দরজার বাইরে একগলা ঘোমটা দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

ওকে বলবে, তিথির গায়ে যেন হাত না তোলে। হাত তুললে খুব খারাপ হবে। আমার মনে হয় মঠের ঘাটে গেছে। পুণ্যস্নান হচ্ছে, মেলা বসেছে, তালপাতার বাঁশি বাজছে, মেয়েটার মন ঘরে টিকবে কেন!

মেলায় নেই।

তা হলে জলে আছে। আমি যাচ্ছি, দেখছি খুঁজে পাই কি না।

আর তখনই তিনি ঠিক দেখতে পান গোরাচাঁদ নদীর পাড় থেকে মেয়েটাকে হাত ধরে টেনে আনছে। নদীর জলে সারা সকাল ডুবে ডুবে পয়সা খুঁজেছে, চোখ দেখেই বোঝা যায়। তারপর পাড়ে উঠে নদীর হাওয়ায় ফ্রক শুকিয়েছে তাও বোঝা যায়, শুকনো ফ্রক দেখে, বিন্নির খই, লালবাতাসা কোঁচড়ে নিয়ে নদীর পাড়ে ঘুড়ে ঘুরে কিছুটা খেয়েছে, বাকিটা ভাইবোনদের জন্য লুকিয়ে নিয়ে আসার মতলবে ছিল, তাও বোঝা যায় ওর এক

হাতে কোঁচড় ধরে রাখার চেষ্টায়। হাত টানাটানিতে না আবার কোঁচড়ের মুঠি ফসকে যায়, যতই গোরাচাঁদ তার মেয়েকে টেনে আনার চেষ্টা করুক না, তিথি তার কোঁচড় ছাড়ছে না।

গোরাচাঁদ জগদীশকে দেখেই থমকে গিয়েছিল। তিথির হাতও ছেড়ে দিয়েছিল।

ভুঁইঞামশায় আমার কী হবে। যমুনা খবর পাঠাল, আপনি তারে কাপড় মেলেছেন, তিথি সকালে বেপাত্তা। চরণকে বসিয়ে ছুটে এসেছি। এই দেখুন কী কাণ্ড!

দেখেছি। কি রে তিথি কটা পয়সা হল!

তিথির সব ভয়ডর নিমেষে জল।

সে মুচকি হেসে বলল, পাঁচ পয়সা।

এত জল ঘাঁটলে জ্বর হবে যে। বাবার কথা শুনিস না কেন!

তিথি বড়ো বড়ো চোখে তাকিয়ে শুধু তাঁকে দেখছিল।

কোঁচড়ে কী আছে?

খুবই আহ্লাদের গলায় বলল, খই বাতাসা। বলে, কোঁচড় মেলে দেখাল।

যা বাড়ি যা। বাড়ি থেকে গেলে বলে যাবি। তুই বড়ো হয়ে যাচ্ছিস বুঝতে পারিস না।

বড়ো হয়ে যাওয়ার কথায় তিথির কী লজ্জা। সে প্রায় পড়িমরি করে ছুটতে থাকল। কোঁচড় দু-হাতে সামলে, সেই মুলিবাঁশের বেড়া দেওয়া ঘরটার দিকে ছুটতে থাকলে তার ভাইবোনগুলো বেরে হয়ে এল প্যাক প্যাক করতে করতে।

গোরাচাঁদ আপসোশের গলায় বলল, বলেন, এই কর্মনাশা মেয়েকে নিয়ে আমি কী করি! কোথায় যাই।

তিথিকে দেখতে দেখতে জগদীশের পলকে মনে পড়ে যায় সব। চোখের সামনে বড়ো হয়ে উঠছে। ছেঁড়া ফ্রকে তাকে খারাপও দেখায় না। মেয়েটার দস্যিপনায় তার বাবা অস্থির। নতুন ফ্রক কিনে দিলে দু-চার মাসও যায় না। ওর বাবাও পেরে ওঠে না। বউঠান, তুলির পুরানো ফ্রক থাকলে মাঝে মাঝে ওকে ডেকে দেন। কি খুশি তখন। ফ্রকটা ছোড়দি গায়ে দিত, সেই ফ্রক সে গায়ে দিচ্ছে। আর যা হয়, তখনই তার কত আবদার সবার কাছে, গাছপালা, জীবজন্তু, পাখপাখালি সবাই তার বন্ধু হয়ে যায়। সে যেন ফ্রকটা গায়ে দিয়ে ইচ্ছে করলে উড়ে বেড়াতেও পারে।

তখন সর্বত্র তার চোখ।

কে রে। কে সুপারির বাগানে ঢুকেছিস।

সে তেড়ে যায়।

গরিবগুর্বো মানুষেরা এই সব ভুস্বামীদের উচ্ছিষ্ট খেয়ে যে বেঁচে থাকে জগদীশ ভালোই জানেন। সুপারির খোল বাগানে পড়ে আছে, কেউ টেনে নিয়ে যাচ্ছে, তিথির জ্বালায় তা নিয়ে যাওয়া কঠিন। বাবুদের বাড়ির সব কিছুর উপরই তার যেন হক আছে।

সুপারির খোল নেবে সাধ্য কি!

তার চেঁচামেচির শেষ থাকে না।

অমলদা, দ্যাখো এসে আমাদের সুপারির বাগানে কে এসে ঢুকেছে।

কারও সাড়া না পেলে সে খোল নিয়ে গরিব মানুষটির সঙ্গে টানাটানি শুরু করে দেবে।

এটা আমাদের, তুই মেঘা কোন সাহসে বাগানে ঢুকলি! ভুঁইঞাকাকাকে দাঁড়া খবর দিচ্ছি।

এই হয়, সুপারির বাগানে হাওয়ায় পাকা সুপারি ঝরে পড়ে। গাছের ডগা থেকে খোল খসে পড়ে। যাওয়া আসার রাস্তায় গরিব মানুষদের চোখ কান শকুনের মত সজাগ। শব্দ হলেই হল, তাল পড়তে পারে, নারকেল পড়তে পারে, সুপারির খোল পড়তে পারে এত বড়ো মহলার মধ্যে কোথায় কী পড়ে থাকে কারও খেয়াল থাকার কথা না কিন্তু তিথির সব খেয়াল থাকে— বিশাল এলাকায় আম জাম জামরুল গাছেরও অভাব নেই— তিথির মতো কেউ খবর দিতে পারে না, কোন গাছে কী ফল ধরে আছে, কোন গাছে কত আম পেকে আছে। তিথির জ্বালায় গাছের ফল পাকুড় কুড়িয়ে নিয়ে কারও হাওয়া হয়ে যাবার ক্ষমতাই নেই। সে কেড়েকুড়ে সব এনে বউঠানের কাছে জিম্মা দেবে।

আর নালিশ, জান, নিয়ে পালাচ্ছিল। বাতাবি লেবুটা গাছের নীচে কখন পড়ে আছে, আমিও জান খেয়াল করিনি। শ্রীশ ধরের ব্যাটা নিয়ে পালাচ্ছিল। আমাকে দেখে ফেলে দৌড়েছে।

তিথি ঘরে ঢুকে গেছে ততক্ষণে। সে তাঁর বিছানা মশারি গুটিয়ে কাঠের তাকে তুলে রাখছে। তিথির ডাকাডাকিতে অরু বিছানায় উঠে বসল। নতুন জায়গা—এটা একটা কাছারিবাড়ি কিছুই বোধহয় তার মনে ছিল না। চোখ কচলে হাত-পা ঝাড়া দিতেই বুঝল সে তার বাবার কর্মস্থলে— তিথিকে দেখে তার সব মনে পড়ল— রাতের অন্ধকারে কেমন সবকিছু রহস্যাবৃত ছিল, এই সকালবেলায় সে বিছানা ছেড়ে নামার সময়ই দেখল, সামনে সুপারিবাগান, তার ভিতর দিয়ে নদীর পাড়, চড়া সাদা কাশফুলের ওড়াউড়ি। বাবার স্নান জপতপ সারা। কারণ বাবা একটি ফতুয়া গায়ে দিয়ে চুল আচড়াচ্ছেন আয়নায়। সে কিছুটা যে উৎফুল্ল হয়ে উঠেছে বোঝা যায়। দরজায় দাঁড়াতেই বুঝল, চারপাশে বড়ো বড়ো সব আমগাছ, তার ডালপালায় কাছারিবাড়িটা তপোবনের মত।

তিথি বলল, দাঁড়াও জল এনে দিচ্ছি।

অরুর ভীষণ হিসি পেয়েছে। সে তিথির কথার তোয়াক্কা করছে না। সিঁড়ি ধরে নীচে নেমে গেল টের পেল মেলা ঝোপজঙ্গলও আছে কাছারিবাড়ির চারপাশে। তারপর বেশ বড়ো মাঠ, বাঁশের বেড়া, সেখানে ফুলের সব গাছপালা, সাদা রঙের ছোটখাটো প্রাসাদও চোখে পড়ল। সব ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে, যেন নদীর পাড় ধরে যতদুর চোখ যায়, সবই বড়ো সুন্দর করে সাজানো গোছানো।

জগদীশ বের হবার সময় বললেন, তুমি গোলঘরে চলে যাবে অরু। হাত মুখ ধুয়ে নাও। বইখাতা নিয়ে যাবে। অমল কমলের ঘরে পড়বে।

রাতে খেতে বসে সবাইকে সে দেখেছে। অমলদা তার চেয়ে বেশ বড়োই হবে। ক্লাশ নাইনে পড়ে। কমল তার বয়সি, কমলদা ঠিক বলা যায় না, সমবয়সিকে সে দাদা বলতে রাজি না। সবাই অবশ্য এখানে বাবু হয়ে গেছে। অমলবাবু, কমলবাবু, কারণ জমিদারি যতই সামান্য থাক, ঠাটবাট আছে পুরো মাত্রায়। খেতে বসেই টের পেয়েছে বাড়িটায় আশ্রিতজনেরও অভাব নেই। লম্বা রান্নাঘরে আসন পেতে সারি সারি পাত পড়েছে। ঝি চাকরেরও অভাব নেই। একটা ধিঙ্গি মেয়েকে কোলে করে তুলে এনেছে—ঘুম থেকে তুলে খাওয়ানোর ফ্যাসাদও সে টের পেয়েছিল। কোল থেকে নামিয়ে দিলে সে বুঝেছিল ইনিই সেই ছোড়দি, গায়ে সাটিনের ফ্রক, ফ্রকের ফাঁক দিয়ে হাতির দাঁতের মত দুটো লম্বা ঠ্যাং বের হয়ে আছে। মাথায় লাল রিবন বাধা, কিছুতেই চোখ খুলছে না—আসনে বসিয়ে দিলেও ঢুলছে। সবাই তাকে খাওয়াবার জন্য যে বড়োই ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল, এবং সে না খেলে বাড়িতে মহামারি শুরু হয়ে যাবে যেন, আহ্লাদ আবদারেরও শেষ ছিল না।

এই তুলি কী হচ্ছে! ইস জলের গ্লাসটা দিলি তো ফেলে। এ কি রে বাবা, কিছুতেই মুখে দিচ্ছে না।

পাশে যিনি বসে তুলিকে খাওয়াবার চেষ্টা করছেন তাকে সে চেনে না। পরে অবশ্য তিথি বলেছে, বড়োবাবুর সম্পর্কে মাসি হয়—এই বাড়িতেই থাকেন।

তারা যখন খাচ্ছিল—তিথি রোয়াকে বসেছিল, নুন জল লেবু সে পাতে পাতে দিয়েছে। কাঁচালঙ্কা দিয়েছে। পায়ে আলতা পরা বউটিকে বাবার বউঠান, ভাতের টাগারি এগিয়ে দিচ্ছেন পরিবেশনের জন্য। সারাক্ষণ বউমা বউমা করছেন। এই নাও মাছভাজা। বড়ো বড়ো কইমাছ ভাজা পাতে পাতে। ডাল পাতে পাতে। আলু পটলের ডালনা, পাখির মাংস, আর ছোট বাটিতে এক বাটি দুধ সবার। ঘোমটায় ঢাকা মুখ, আর নিষ্প্রভ হারিকেনের আলোতে বউটির মুখ সে দেখতে পায়নি, তবে আলতা পরা পা দু-খানি তার এত সুন্দর একেবারে দুধে আলতায় যার রং সে যে খুবই সুন্দরী তাতে তার কোনও সন্দেহ ছিল না। সে মাথা নিচু করে বাবার পাশে চুপচাপ খাচ্ছিল, আর তুলির আবদারে বিরক্ত হচ্ছিল।

কী দিয়ে খাবি?

খাব না।

পাখির মাংস দিয়ে খা।

না খাব না।

তবে কী দিয়ে খাবি?

কিছুই খাব না।

দুধ মেখে দিচ্ছি।

দাও।

দু-গ্রাস খেয়েই কেমন ওক তুলে দিচ্ছে।

অরুর বলতে ইচ্ছে হচ্ছিল, মারব থাপ্পড়।

তিথির বয়সিই হবে। সারা বাড়ির মানুষজন, একটা পুঁচকে মেয়ের খাওয়া নিয়ে যেন অস্থির হয়ে পড়েছিল। আদরে আদরে যে মাথাটি গেছে অরুর বুঝতে অসুবিধা হয়নি।

তিথি রাতে খেয়েছে কি না জানে না।

খেতেও পারে, নাও পারে।

তার বাবা জামিদারবাবুর আশ্রিত। বাড়ির কাজে কিংবা গিন্নিমার ফুটফরমাস খেটে না দিলে যে তাদের সবই যেতে পারে।

তিথি কি সেই আতঙ্কেই থাকে।

একদিন সে স্কুল থেকে ফিরে না বলে পারেনি, এই তিথি শোন।

তিথি তার ঘরে জল তুলে দিয়ে গেছে। তার পর সে ছুটছিল বাড়ির আন্দরের দিকে। কাছারিবাড়ির পরে মাঠ, ঘাসের লন এবং দুটো জবাফুলের গাছ পার হয়ে পাঁচিলের দরজায় হয়তো ঢুকে যেত। তার জলখাবার, এই যেমন কখনও তেলমাখা মুড়ি, অথবা চিড়ে ভাজা, সঙ্গে বাদাম ভাজা কিংবা নাড়ু, কখনও ফুলুরি অথবা ফুলকপির সিঙারা, যা তাঁকে দেয়, সে নিয়ে আসে।

তিথি জবাফুল গাছের নীচে দাঁড়িয়ে বলল, ডাকছ কেন?

শুনে যা।

আমার এখন শোনার সময় নেই।

আছে। শুনে যা বলছি।

অরুদা কোনও কারণে রেগে যেতে পারে, সে ইতস্তত করছিল, গাছের নীচ থেকে নড়ছিল না।

শুনে যা বলছি।

কি যে করো না। কী হয়েছে? কখন সেই সকালে দুটো মুখে দিয়ে গেছ, না খেলে পিত্তি পড়বে না। আমি আসছি।

না আসছি না। আগে আয়।

অরু স্কুলের জামাও ছাড়েনি। এত নজর মেয়েটার। কখন সে ফিরবে সেই আশায় হয়তো নদীর পাড়ে কিংবা সুপারি বাগানে হেঁটে বেড়ায়। না হলে, সে ফিরেই দেখতে পাবে কেন, এক বালতি জল আর কাঁসার ঘটিটি সিঁড়িতে রাখা আছে। না হলে ফিরেই দেখবে কেন, তার জামা প্যান্ট ভাজ করা, চকির এক কোণায় সাজিয়ে রাখা, চাঁপা ফুল তুলেও একটা কাচের গ্লাসে জলে ডুবিয়ে রাখে। এই ঘরের সব সৌন্দর্য তৈরি হয় তার হাতে। সে যা কিছু এখানে সেখানে ফেলে রাখে, তিথির কাজ তা গুছিয়ে রাখা।

এজন্য অরুর নিজের উপরও রাগ হয়। কিন্তু মুশকিল, কমলদা কিংবা বিশুদা ডাকলে তার ছুটে যাবার অভ্যাস— শীতে ব্যাডমিন্টন, বর্ষায় স্কুলের মাঠে ফুটবল, কিংবা স্কুলের প্রতিষ্ঠা দিবসে নাটক, এ-ছাড়া কত যে আকর্ষণ, মেজদা ঢাকা থেকে এলে তার সঙ্গে শিকারে যাওয়া, অথবা নদীর চরে ডাল ফেলে রাখা হয়, জোয়ারের জলে ডুবে যায় ডালপালা, ভাটার মুখে জল নামার আগে সব ডালপালা ঘিরে ফেলা হয় বাঁশের বানা দিয়ে। জল নেমে গেলে, সেই ডালপালা সরিয়ে দিলে জলে কাদায় তাজা মাছের ছড়াছড়ি। গলদা চিংড়ি, কালিবাউশ, ভেটকি থেকে কই পুঁটি ট্যাংরা কিছুই বাদ থাকে না। দাদারা পছন্দমতো মাছ ঝুড়িতে তুলে দিতে বলে, জেলেরা মাছের ঝুড়ি বাড়ি পৌঁছে দেয়, সে আর তিথি তার পেছনে পেছনে ছোটে।

তখন তার মনেই থাকে না, সে তিথির জন্য কাজ বাড়িয়ে রেখে যাচ্ছে। বই খাতা সব চকিতে ছড়ানো ছিটানো। কলম পেনসিল, জিওমেট্রি বক্স যেখানে সেখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে থাকে। স্কুল থেকে ছুটে আসে। যেন সে তাড়াতাড়ি বের হতে না পারলে তার মজা উপভোগ করার সময় পার হয়ে যাবে। তিথি আছে, সে-ই সব করবে।

সেই সব তুলে রাখে। সাজিয়ে রাখে। জিওমেট্রি বক্স খোলা, বাক্সের সব কিছু এলোমেলো, তিথির কাজই হল, ঠিকঠাক তুলে রেখে দেওয়া। এত যে মজা উপভোগ করতে পারে তিথি আছে বলেই।

তিথি কেমন ভীরু পায়ে লন পার হয়ে এগিয়ে আসছে।

সে বুঝতে পারছে না তার কী দোষ।

অরু সিঁড়ি থেকে নড়ছে না।

তিথি অত্যন্ত ভীরু মুখেই বলল, আমি কী করেছি?

আগে কাছে আয়।

তিথি ভয়ে কাছে যাচ্ছে না।

বলোই না। আমি তো কাছেই আছি।

ঘরে আয়।

না ঘরে ঢুকব না।

ঢুকবি না?

তুমি কি আমাকে মারবে?

তোকে মারতে পারলে ভালো হত। তুই কখন রাতে বাড়ি যাস? সারাদিন বাবুদের বাড়িতে পড়ে থাকতে ভালো লাগে?

তিথি মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে।

রাতে তুই রোয়াকে বসে থাকিস কেন? তুই কি রাতে বাবুদের বাড়িতে খাস। তোকে কি তারা দু-বেলা খেতে দেয়।

দেবে না কেন? যখন যা বেশি হয় দেয়। সবাই খেলে কিছু তো পড়ে থাকেই। আমি আলাদা থালায় তুলে রাখি। ওতেই পেট ভরে যায়।

সারাদিন ধরে বাবুদের বাড়ির সবার উচ্ছিষ্ট খাবার খেয়ে বেড়াস? তোর খারাপ লাগে না।

বারে, খারাপ লাগার কি আছে। তুমি কি এজন্য আমাকে ডেকেছ? আমার কত কাজ জান? তুমি জান, ছোড়দির আজ পুতুলের বিয়ে। আমি না গেলে সব কাজ পড়ে থাকবে। পুতুলের জামা কাপড় আমি না গেলে পরাবে কে! দেরি হলে রাগ করবে। আমাকে খামচে দেবে। আমার ফ্রকও ছিঁড়ে ফেলতে পারে। ছোড়দির বেজায় রাগ জান? আমাকে কী বলেছে জান?

কী বলেছে।

তুমি নাকি ছোড়দিকে দেখলেই পালাও।

মিছে কথা।

ছোড়দি মিছে কথা বলে না। ছোড়দি তো কাউকে ভয় পায় না। মিছে কথা বলতে যাবে কেন?

পালাই! বেশ করেছি। বলবি বেশ করেছি।

ছোড়দির সঙ্গে কথা বলো না কেন? তাই তো খেপে যাচ্ছে। তোমাকে দূর থেকে দেখলেই বলবে, দাঁড়া না অরুকে আমি মজা দেখাচ্ছি। ভুঁইঞাকাকাকে বলে এমন মার খাওয়াব না, জীবনেও ভুলতে পারবে না।

তিথি তার সঙ্গে এতদিন নিজের কথাই বলেছে—সে কারও নিন্দামন্দে থাকে না। তুলির কোনও কথাই এতদিন বলেনি। আজ কি তিথি বুঝতে পেরেছে, সে উচ্ছিষ্ট খেয়ে বেড়ালে, তার অরুদাকে ছোটো করা হয়। অরুদাকে বিশ্বাস করে সে কি তাকে নিজের মানুষ ভেবে ফেলেছে।

তিথি বলল, ঠিক আছে পরে কথা হবে। বলেই ছুট। একদণ্ড আর দাঁড়াল না। বাটিতে মুড়ি আর দুটো সন্দেশ নিয়ে এসে হাজির। ঘরে আলাদা তার কাঁসার গ্লাস আছে, কুঁজো থেকে গ্লাসে জল ভরে একটা টিপয়ে রেখে বলল, আমি যাচ্ছি অরুদা। দরজা খোলা রেখে উধাও হবে না। শেকল তুলে দিয়ে যাবে। কুকুর বিড়ালের উৎপাত আছে বোঝ না।

তারপর আর তিথি একদণ্ড দাঁড়াল না। বড়ো বেশি লাফিয়ে লাফিয়ে হাঁটে, লাফিয়ে লাফিয়ে দৌড়ায়। তিথি দৌড়ে মাঠ পার হয়ে লনের ভিতর ঢুকে গেল। অরু বাইরে দাঁড়িয়েছিল, তিথি একসময় পাঁচিলের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল।

তার এখন তাড়াতাড়ি খেয়ে বের হয়ে যাওয়া দরকার। দেরি হয়ে বিশুদা, অমল, কমল সবাই তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। শহর থেকে মেজদা নতুন র্যাকেট নিয়ে এসেছে। কর্ক এনেছে এক ডজন। শীতের শেষাশেষি নদীর পাড়ে নেট টানিয়ে আজ থেকে ব্যাডমিন্টন খেলা শুরু হবে। সে সঙ্গে না থাকলে বাঁশ, খোনতা কে নিয়ে যাবে। সে একজন আমলার পুত্র, এ-কাজটা তারই করা উচিত।

গোলঘরে যাবার সময়ই ভাবল, তিথিকে বড়ো বড়ো কথা না বললেই পারত। তিথি খারাপ পেতে পারে। তিথি এ-ভাবে বাবুদের উচ্ছিষ্ট খেয়েই বড়ো হয়ে উঠেছিল। কেন যে মনে হল বাবাও তার উচ্ছিষ্টভোজী এবং সেও। তার মুখে অত বড়ো কথা শোভা পায় না। তিথি তার কথা শুনে ভাগ্যিস হেসে ফেলেনি।

তারপরই মনে হয় কাজ করলে মানুষ ছোটো হয়ে যায় না। হাতে র্যাকেট নিয়ে সেও খেলবে। খেলার নামে তার মধ্যে ঘোর সৃষ্টি হয়। নদীর পাড়ে যখন তারা নেট টানিয়ে খেলছিল, তখন আর নিজেকে কিছুতেই খাটো ভাবতে পারেনি। ফেরার সময় মনে হল সে রাজ্য জয় করে ফিরছে।

তবে তুলি বাবাকে মিছে অভিযোগ করে মার খাওয়াবার পরিকল্পনা করছে, ভাবতেই ভারি দমে গেল। তুলির সঙ্গে যাও ইচ্ছে হয়েছিল, দেখা হলে একদিন কথা বলবে, তাও

আর বোধ হয় হবে না। কী বলতে কী ভেবে নেবে কে জানে। আর তুলিকে সে কি কথা বলবে? তুমি ভালো আছ? তুমি দেখতে খুব সুন্দর। খুব বোকা বোকা কথা। তুলির সঙ্গে কথা বলার মতো ভাষাই তার জানা নেই।

সবাই চলে গেছে, নদীর পাড়ে মানুষজন কমে আসছে দূরে স্টিমার ঘাটে গ্যাসবাতি জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। ঘাটে যাত্রীদের ভিড় আছে। রাত আটটায় স্টিমার আসবে, যাত্রী নামবে, যাত্রী উঠবে। আশরাফ সারেঙ জাহাজ ভর্তি করে লোক তুলে নিয়ে যাবে। তার খুবই ইচ্ছে হয়েছিল, আশরাফ সারেঙের সঙ্গে ঘাটে গিয়ে একদিন দেখা করে। কিন্তু হয়ে ওঠে না। গোলঘরে তখন সবার সঙ্গে তাকেও পড়তে বসতে হয়। মাস্টারমশাই প্রাসাদের বড়ো বড়ো জানালা দেখিয়ে বলেন, এই হচ্ছে আয়তক্ষেত্র। ঘরের মেঝে দেখিয়ে বলেন, এই বল বর্গক্ষেত্র— যার চারটি বাহুই সমান।

পড়াশোনার পীড়নও তার কম নয়। ক্লাশে পড়া না পারলে ঠিক বাবার কানে কথা উঠে যায়।

ভুঁইঞামশায় আছেন?

দ্বিজপদ সার এসে হাজির।

তোমার বাবা কোথায়।

সে বুঝতে পারে দ্বিজপদ সার নালিশ জানাতে এসেছেন। সে দরজা খুলে সামনের বারান্দায় একটা টিনের চেয়ার বের করে দেয়। তারপর বাবাকে খুঁজে বেড়ায়। ইংরাজি গ্রামার ট্রান্সলেশনে সে কাঁচা, তার নাকি মনোযোগেরও অভাব আছে— দ্বিজপদ সার সে-সব কথা বলতেই হয়তো এসেছেন। সে তার বাবাকে খুঁজতে গিয়ে নিজেই হারিয়ে যায়।

এ-ভাবে সে কতদিন কত কারণে নদীর পাড়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে। কাছারিবাড়িতে ঢুকতে ইচ্ছে হয় না। বাড়ির জন্য মন কেমন করে তখন। পূজার ছুটিতে সে বাড়ি যেতে পারবে, পূজারতো এখনও অনেক দেরি। নতুন উপসর্গ তুলি। তাকে ভয় দেখিয়েছে, তুলি মিছে কথা বলে না। তুলি কাউকে ভয় পায় না। ভয় না পেলে যেন মিছে কথা বলা যায় না।

নদী থেকে হাওয়া উঠে আসছে। জোয়ারে নদীর জল বাড়ছে। দেখতে না দেখতে বর্ষা এসে যাবে। বর্ষার নদী বিশেষ করে এই কোয়ালা নদীতে কুমির পর্যন্ত ভেসে আসে। তিথিই তাকে একদিন খবর দিয়েছিল, জমিদার হেমন্ত রায়চৌধুরির বৈঠকখানার বারান্দায় শ্বেতপাথরের টেবিলে একটা কুমিরের ছাল আছে। তিথি তাকে সেখানে একদিন নিয়ে যাবে, এমনও কথা দিয়েছে।

নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে থাকলে কত কথা মনে হয়। আর কত পাখির ওড়াউড়ি, কোথা থেকে আসে, কোথায় যায় সে কিছুই জানে না। বর্ষা এলে দু-পাড়ের চর ডুবে যায়। নদীর ঘাটগুলিতে যত সিঁড়ি আছে, সব জলে ডুবে যায়। তিথিই সব খবর দেয় তাকে। কিন্তু তুলির খবরটা না দিলেই পারত। এমন সুন্দর মেয়েটা এত কুবুদ্ধির ডিপো ভাবতেই তার কষ্ট হচ্ছিল।

তবে বাবা তাকে কখনই গায়ে হাত তোলেনি। বাবাকে বলে মার খাওয়ানো সহজ না। বাবা কি পুতুল! সে সাহস পায়। ঘাটলার সিঁড়ি থেকে উঠে দাঁড়ায়। আকাশ আর মেঘমালায় ঢেকে আছে চারপাশ। দুটো একটা নক্ষত্রের প্রতিবিম্ব জলে ভাসছে। ছলাত ছলাত জলের শব্দ। গুন টেনে নিয়ে যাচ্ছে মাঝিরা। কত দূর দেশে চলে যায় কত লোক। সেও চলে এসেছে—তিথির জন্যই হোক কিংবা এই গ্রাম, মাঠ, স্কুল, মজা খাল বিশাল সব প্রাসাদ আর বাবুদের জাঁকজমক, যেমন জমিদার হেমন্ত রায়চৌধুরীর আস্তাবলে বিশাল দুটো আরবি ঘোড়া এবং ঘোড়ায় চড়ে নদীর পাড় ধরে হরিশবাবুর ছোটা, কে না দেখেছে, সে জানেই না, এক আশ্চর্য আশ্বারোহী কদম দিতে দিতে বিন্দু থেকে বিন্দুবৎ হয়ে যেতে পারে। হরিশবাবু দেশে এলে তিথি তাকে নিয়ে নদীর পাড়ে ছুটে যাবেই। কারণ হরিশবাবু বিকেলে ঘোড়ায় চড়ে নদীর পাড়ে হাওয়া খেতে বের হন। তিথি তাকে গোপনে একটা চিরকুট ধরিয়ে দেয়। চিরকুটে কী লেখা থাকে সে জানে না। তিথি চিরকূট হোক, চিঠি হোক খুবই গোপনে হরিশবাবুর হাতে দিয়ে দেয়। ঠিক ঘাটলার পাশে কদম দিতে দিতে তিথির সামনে এসে দাঁড়াবেন। তারপর ভারি সতর্ক নজর। ঘোড়ার উপরেই তিনি বসে থাকেন। নুয়ে তিথির চিঠিটা নিয়েই দিঘির পাড় ধরে অদৃশ্য হয়ে যান। আসলে অরুর মাঝে মাঝে কেন জানি মনে হয় কোনও স্বপ্নের পৃথিবীতে সে এসে উঠেছে। বাড়ির জন্য প্রথম প্রথম খুবই মন খারাপ করত, কিন্তু দিন যতো যাচ্ছে, তত তার মনে হয় মন খারাপ আর আগের মতো হয় না। সে তো দেখতে পায় তুলি সাটিনের ফ্রক গায় দিয়ে মাথায় সুন্দর লাল রিবন বেঁধে কখনও সুপারি বাগানে, কখনও নদীর চরে, ঘুরে বেড়াচ্ছে। সঙ্গে কেউ থাকে। সে কাছে থাকে না, ঝোপ জঙ্গলের আড়াল থেকেই তুলিকে সে দেখতে বেশি ভালোবাসে। তুলি কাছাকাছি এলেই সে দৌড়ে পালায়—যদি তুলি টের পেয়ে যায়, সে চুরি করে চরের উপর একটা জ্যান্ত পরির ওড়উড়ি দেখছিল—ধরা পরলে কেলেঙ্কারির একশেষ—সে না পালিয়ে থাকে কী করে।

তুলি মিছে কথা বলে না, অরু ঠিকই বলেছে।

তুলি ঠিক টের পেয়েছে সে তাকে দেখে, তাকে দেখার জন্য নদীর পাড়ে কিংবা কাছারিবাড়ির বড়ো বড়ো আমগাছের আড়ালে সে দাঁড়িয়ে থাকে। কখনও বাবুদের সঙ্গে স্টিমারঘাটে গেলেও সে যে তুলির পিছু নেয় তাও টের পেতে পারে। কখনওই তুলির

সামনে যেতে সাহস পায়নি। রান্নাবাড়িতেই কখনও রাতে সে কাছ থেকে তুলিকে দেখতে পায়। রোজদিন দেখা হয় না। তুলি আগে খেয়ে নিলে দেখা হওয়ার কথাও নয়, তার যে কি হয়, সে রান্নাবাড়িতে মাথা নীচু করেই খায়। চোখে চোখ পড়ে গেলে কত বড়ো বেয়াদপি, সেটা সে বোঝে। তুলি অপছন্দও করতে পারে। বাড়ির একজন আমলার পুত্রের এত আস্পর্ধা হয় কী করে। সাটিনের ফ্রকের নীচে তুলি আজকাল টেপ দেওয়া জামাও পরে।

তুলির এত সে জানে, তুলি কেন জানবে না, তুলিকে দেখলেই সে পালায়।

কাছারিবাড়ির দিকে সে হেঁটে যাচ্ছে। বাবার সঙ্গে তার কমই দেখা হয়। বাবার ছুটি ছাটা নেই। রবিবার শনিবার নেই। সেই আটটায় গিয়ে নাজিরখানায় বসেন, তক্তাপোষে সাদা ধবধবে ফরাস পাতা— দু-তিনটে তাকিয়া, সামনে কাঠের একটা বড়ো ক্যাশবাক্স, দেয়ালের দিকে গোটা দুই লম্বা টুল, লোকজন সব সময় বাবার কাছে বসেই থাকে— আদায়পত্র, কিছু সুদেরও কারবার আছে, নদী থেকে বড়ো রকমের রোজগার আছে বাবুদের—নদীর ডাক হয়—ইলিশমাছের জো পড়লে আদাইয়ের পরিমাণ বাড়ে।

সকাল বেলাতেই ভিতর বাড়ি থেকে একটা লম্বা ফর্দ চলে আসে। বাবা ফর্দ মিলিয়ে সব কিছু নিয়ে আসার জন্য হরমোহনকে বাজারে পাঠিয়ে দেন। যার যা দরকার, বাবার কাছে দরকার মতো সব চিরকুট আসে। লম্বা খেরো খাতায় বাবা সব খরচখরচা এবং আদায় কী হল সব টাকার জমা খরচ তুলে রাখেন। সাঁজবেলায় দেবকুমারবাবু কিংবা নবকুমারবাবুর কাছে সারা দিনের খরচা খরচা এবং আয়ের হিসাব অর্থাৎ খেরো খাতাটি সম্বল করে বাবা তাদের কাছে চলে যান। মামলা মোকদ্দমা অথবা তালুকের প্রজাদের বাদবিসংবাদে বাবাকেই ছুটতে হয়।

যত তার কথা রাতে।

তোমার কোনও অসুবিধা হচ্ছে না তো অরু?

আজ্ঞে না।

বাড়ির জন্য মন খারাপ করছে না তো?

আজ্ঞে না।

মন দিয়ে লেখাপড়া করবে। পড়া বুঝতে না পারলে দ্বিজপদকে বলবে।

তখনই একদিন সে তার বাবাকে কেন যে বলল, আচ্ছা বাবা আমার জামা প্যান্ট আমি কেচে নিতে পারি না।

পার।

সকালে তিথির জল তুলে দিয়ে যাওয়ারও কিন্তু দরকার হয় না। আমিই তুলে রাখতে পারি।

ইচ্ছে করলে সবই করা যায় অরু। এতে স্বাবলম্বী হওয়া যায়। সব কিছু নিজে করে নিতে পারার মতো বড়ো কিছু নেই।

আমি তিথিকে ঘরে ঢুকতে বারণ করে দেব।

কেন? কে কী করেছে।

কিছু করেনি। তিথির কত কাজ ভিতর বাড়িতে। সে সব করে কখন।

অঃ এই কথা। তবে তিথি কী দমবার পাত্র। আমার তো মনে হয় না রাজি করাতে পারবে।

বাবার কথাই ঠিক।

সে তিথিকে নিষেধ করেছিল।

শোন তিথি, এই কাজটুকু তোর না করলেও চলবে।

তিথি বড়ো বড়ো চোখে তাকিয়েছিল তার দিকে। যেন কিছুই বুঝতে পারছে না।

জলটল আমিই তুলে রাখব। বিছানা করে নিতে আমার অসুবিধা হবে না। জামা প্যান্ট গোলা সাবানে কাচতে কতটুকু সময় লাগে বল।

ঠিক আছে করে নেব। করতে পারলে তো ভালোই। তারপরই তিথি সিঁড়ি ধরে নামার সময় ভেংচি কেটে বলল, কত মুরদ। জানা আছে। তিনি সব করে নেবেন তা হলেই হয়েছে।

কিন্তু তিথি বোধহয় শেষে অবাকই হয়ে গেছিল, সে তো ছেড়ে দেবার জন্য বসে নেই। সে যখন দেখল, কোনও কাজেই তার ত্রুটি থাকছে না, কেমন দিন দিন বিমর্ষ হয়ে যেতে থাকল। স্কুলে যাবার সময় দেখতে পায় তিথি সিঁড়িতে গালে হাত দিয়ে বসে আছে, স্কুল থেকে ফিরেও দেখতে পায় গালে হাত দিয়ে বসে আছে। কাজের কোনও খুঁতই ধরতে পারছে না, ক্ষোভে কী করবে ভেবে পাচ্ছে না। আর একদিন এসে দেখল, সারা ঘর তছনছ করে রেখেছে কে। মেঝেতে বালতির সব জল ঢেলে দিয়েছে কেউ। ঘরে ঢুকেই অরুর মন খারাপ। তিথির কাজ। তিথিই শেকল খুলে সব তার তছনছ করে দিয়ে গেছে। কাজ কেড়ে নেওয়ায় তার বোধ হয় সহ্য হচ্ছে না।

তিথি! তিথি!

সে দরজার বাইরে লাফিয়ে নেমে গেল।

তারপর তিথিদের বাড়ির দিকে ছুটল।

না কোথাও তিথি নেই।

কোথায় গেল মেয়েটা?

অরু কাউকে বলতেও পারছে না, আমার ঘর তিথি তছনছ করে দিয়েছে। বইটই পেনসিল খাতা সারা চৌকিময়। জলে ভাসছে মেজে। কাঁসার ঘটি, গ্লাস গড়াগড়ি খাচ্ছে চৌকির নীচে। এটা যে তিথিরই কাজ বলে কী করে।

শেষে সে তিথিকে খুঁজে পেল সুপারি বাগানের ভিতর। গাছগুলো খুবই পাতলা, দূর থেকেও দেখা যায় ভিতরে কেউ বসে থাকলে। তখন সূর্য অস্ত যাচ্ছে নদীতে। নদীর জল তেমনি ছলাত ছলাত। পাড় ভাঙারও শব্দ পেল। হরিশবাবুর ঘোড়াও ছায়ার মতো দূরে ভেসে উঠল।

অরু ছুটে যাচ্ছে।

সুপারি বাগানের ভিতর দিয়ে সোজা ছোটা যায় না। সে এ-গাছ ও-গাছ ডাইনে বাঁয়ে ফেলে বাগানে ঢুকে যাচ্ছে।

আর ডাকছে, এই তিথি, এখানে লুকিয়ে থেকে রক্ষা পাবি ভাবছিস! তোর বাবাকে ডেকে সব না দেখাচ্ছি তো আমার নাম অরু না। তোর এত জেদ!

এই কি কাছে গিয়ে কী দেখছে।

তিথি গাছের গুঁড়িতে বসে আছে মাথা নীচু করে। ডাকলেও সাড়া দিচ্ছে না।

অরু জোর করেই মুখ দেখার জন্য তিথিকে চিৎ করে দিল। তিথি বিন্দুমাত্র জোরাজুরি করল না। কারণ তিথি বোকার মতো ভেউ ভেউ করে কাঁদছে—আমি কী করব বলে দাও। আমি কী নিয়ে থাকব বলে দাও।

অরু হতভম্ব। বুঝতে পারছে না, সে হাসবে না রাগ দেখাবে। আমি কী করব, কী নিয়ে থাকব—এত পাকা পাকা কথা মেয়েটার, এটুকুন মেয়ে কেমন সুন্দর সাজিয়ে গুছিয়ে কথা বলতে পারে। তিথির পক্ষেই সম্ভব?

নে ওঠ। ঘরে চল। যে হাতে সব তছনছ করেছিস সেই হাতে সব সাজিয়ে রাখ। স্টিমার ঘাট থেকে বাবা ফিরে এলে মুশকিলে পড়ে যাবি।

তিথি হি হি করে হাসতে হাসতে উঠে বসল, তারপর ছুটতে থাকল, যেন সে জয়লাভ করে খুবই খুশি—ছোটার মধ্যে তিথির এত সজীবতা থাকে যে বিস্মিত না হয়ে পারা যায় না। এক বিনুনি বাঁধা, মার্কিন কাপড়ের ঢোলা সেমিজ গায়ে, উসখো খুসকো চুলে মেয়েটার লাবণ্য যেন আরও বেড়ে যায় তখন। আর তখনই মনে হয়েছিল, তিথি চিৎ হয়ে পড়ে

থেকে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল ঠিক, আবার সঙ্গে সঙ্গে এমন চোখে ওকে দেখছিল যেন কিছু একটা হয়ে যাক। আর কিছু না হোক, অরুদা তাকে আদর করলে সে আপত্তি করবে না।

এই সব মনে হলেই তিথির জন্য তার কষ্ট হয়। সে ধীরে ধীরে হাঁটে। তার কিছু ভালো লাগে না। অমলদা যাবার সময় তাকে ডেকে গেছে, এই অরু ঘাটলায় গিয়ে আবার বসলি কেন? পড়াশোনা নেই।

সে সাড়া দেয়নি। কিন্তু গোলঘরে সবাই পড়তে চলে যাবে। তাকেও হাতমুখ ধুয়ে মাস্টারমশাইর সামনে গিয়ে পড়তে বসতে হবে, সে না গেলে, দাদারাই খুঁজতে বের হবে। কাছারিবাড়িতে এসে খুঁজবে তাকে।

সে পা চালিয়ে হাঁটছে। সুপারি বাগান পার হয়ে কাছারিবাড়ির মাঠে ঢুকতেই মনে হল কারা যেন মাঠে তার জন্য অপেক্ষা করছে। কাছে গেলে দেখল তিথি আর তুলি। তুলিকে সঙ্গে নিয়ে এসেছে। তার সঙ্গে তুলির ভাব না হলে তিথি বোধ হয় স্বস্তি পাচ্ছিল না।

তিথি বলল, কোথায় একা একা ঘুরছিলে! জান সাঁজবেলায় তেঁতুলতলা দিয়ে কেউ আসে না। জায়গাটা ভালো না। একা একা তেঁতুলতলা দিয়ে চলে এলে!

আসলে রাস্তা সংক্ষিপ্ত করার জন্যই সে জঙ্গলের ভিতর দিয়ে তেঁতুলতলার নীচ দিয়ে উঠে এসেছে। জায়গাটা যে ভালো না সেও শুনেছে। ছোটোপিসিকে এখানে একবার ভূতে ধরেছিল—সাঁজ লাগলে রাস্তাটা দিয়ে কেউ বড়ো আসে না। তুলির আক্রোশের কথা ভাবতে গিয়ে এতই দামে গিয়েছিল, তার কোনও কিছুই প্রায় খেয়াল ছিল না। সেই তুলি অরুর পাশে দাঁড়িয়ে আছে ঠিক, তবে তাকে দেখছে না। আকাশের দিকে তাকিয়ে প্রিয় কোনও ক্ষেত্র খুঁজে বেড়াচ্ছে যেন।

তিথি না পেরে বলল, এই ছোড়দি, অরুদাকে কী বলবে বলেছিলে?

কী বলব?

কেন, বললে না, চল তো, অরুর সঙ্গে আমার কথা আছে।

কখন বললাম?

জানি না বাবু, তা হলে আসার কী দরকার ছিল। অরুদা তুমি যাও। হাতমুখ ধুয়ে পড়তে বসোগে।

অরু যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। সে পা বাড়াতেই তুলি বলল, সেদিন মাঠের আড়ালে দাঁড়িয়ে কী দেখছিলে?

কবে?

মনে নেই তোমার। আমি চরের বালিতে বাণীপিসির সঙ্গে হাওয়া খাচ্ছিলাম।

অরু সোজাসুজি বলল, না। মনে নেই।

না, আচ্ছা নাই মানলাম। তারপরই বলল, আমি বাঘও না ভালুকও না। আমার সঙ্গে কথা বললে জাত যাবে না। কি মনে থাকবে?

কী কথা বলব?

কথার কি শেষ আছে। আমাকে চুরি করে দেখলে খুব রাগ হয় আমার জান?

ঠিক আছে আর দেখব না।

তিথি বলল, তুমি ছোড়দিকে তবে সত্যি চুরি করে দ্যাখো!

কী বলব, ও যখন বলছে—

ও বললেই তুমি মেনে নেবে। এ কেমন কথা। চুরি করে দেখার কী আছে!

অরু কিছুটা সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল। এই চুরি করে দেখার মধ্যে কি কোনও অন্য অনুভূতি কাজ করে। সে বড়ো হয়ে যাচ্ছে। সে নিজেকে যতই আড়াল করে রাখুক তার ভিতর একজন নারী যে স্বপ্নে বড়ো হয়ে উঠছে বুঝতে পারে। এই সব গোপন কথা যদি সত্যি ফাঁস হয়ে যায়, তবে সে মুখ দেখাবে কী করে। বাবা যে তবে খুবই জলে পড়ে যাবেন। সেদিনের ছেলে, ক্লাশ এইটে সে পড়ে, তার মধ্যে একজন নারী স্বপ্নে বড়ো হয়ে উঠলে যে রোগব্যাধির পর্যায়ে পড়ে। কলঙ্কও কম না।

তখনই তুলি বলল, আমি কাউকে কিছু বলতে যাচ্ছি না। আমার পুতুলের বিয়ে আজ। তুমি খাবে। তিথি এসে তোমাকে নিয়ে যাবে। না গেলে রাগ করব।

পুতুলের বিয়ে নিয়ে অরুর আর এক ধন্দ। সে যাবে । কী খাবে? সে যাই হোক অরু বুঝল, সে তুলিকে দেখে যা ভাবে, তুলিও তাকে দেখলে তেমনই কিছু একটা ভাবে। তুলি তার বিরুদ্ধে খুব বেশি কিছু রটাতে সাহস পাবে না। তুলি নিজেও ভিতরে ভিতরে বড়ো হয়ে যাচ্ছে। তুলিও তার শরীর নিয়ে ঠিক কিছু ভাবে।

এ-ভাবে সন্ধ্যার ম্লান অন্ধকারে অরুর মুখ রক্তাভ হয়ে গেল। ভিতরে এক অতীব স্পৃহা শরীরের কোষে কোষে ঢেউ তুলে দিচ্ছে। সে কোনওরকমে কাছারিবাড়িতে ঢুকে তক্তপোষে বসে পড়ল।

হাতমুখ ধোয়ার কথা মনে থাকল না।

কেমন ভ্যাবলু বনে গেছে যেন।

মনে হয় তার জীবনে এই প্রথম এক পালতোলা নৌকা এসে হাজির। নৌকায় উঠে গেলেই এক রহস্যময় দেশ, শরীরে সুঘ্রাণ—হাতে পায়ে জংঘায় পদ্মফুলের ছড়াছড়ি। নরম

পাপড়ি, কোমল ত্বকের ভিতর ফুটে থাকা নরম পাপড়ির স্পর্শে তার শরীরে বিদ্যুৎ খেলে যাচ্ছে। সে হাত পা টান করে একটা বালিশ টেনে শুয়ে পড়ল। কেমন অসাড় হয়ে যাচ্ছে তার শরীর।

তখনই দ্বিজপদ সারকে অরুর নামে নালিশ।

সার দিন দিন অরু ফাঁকিবাজ হয়ে যাচ্ছে। এখনও তার আসার নামগন্ধ নেই। কখন পড়তে বসবে!

দ্বিজপদ বুঝতে পারেন, যতক্ষণ তিনি পড়ান, ততক্ষণ বাবুদের ছেলেরা হাজতখানায় বসে থাকে। অরু না আসায়, তাদের ক্ষোভ বাড়ছে। হাজতখানার আর এক কয়েদির পাত্তাই নেই। সার শুধু একবার বলেছিলেন, অরুর কি শরীর খারাপ!

কমল বলল, ডাহা ফাঁকিবাজ সার। পড়ার নামে মাথায় বাজ পড়ে। কী করছে, কাছারিবাড়িতে! দেখে আসব সার?

দ্বিজপদ হাসলেন। আসলে পড়া থেকে ফাঁকি দেবার সুযোগ খুঁজছে। ভুঁইঞামশায়ের পুত্রটি পড়াশোনায় বেশ ভালো। পড়াশোনায় অরুর যথেষ্ট আগ্রহও আছে। যথাসময়েই সে চলে আসে। দ্বিজপদ ঘরে ঢুকে আর কাউকে দেখতে না পেলেও, অরুকে দেখতে পান। দ্বিজপদ ঘরে ঢুকলে সে উঠে দাঁড়ায়। নম্র স্বভাবের ছেলেটির পড়াশোনার ভার ভুঁইঞামশায় তার হাতেই ছেড়ে দিয়েছেন, সে যদি না আসে, চিন্তারই কারণ। আমবাগানের এক কোণায় কাছারিবাড়িতে একাই তাকে থাকতে হয়। দ্বিজপদ কী ভেবে বললেন, ঠিক আছে। আমিই দেখে আসছি।

এতে সবাই একবাক্যে সায় দিল, সেই ভালো সার।

অর্থাৎ তিনি যতক্ষণ না থাকবেন, ততক্ষণই তাদের রেহাই।

বিশু বলল, আমি যাব সঙ্গে।

কী দরকার!

কমল বলল, টর্চ নিলেন না?

তা সাপখোপের উপদ্রব আছে। নদীর পাড়ে বাড়ি। ঝোপজঙ্গল, কোথাও কোথাও প্রাসাদের ধ্বংসস্তূপও আছে। বিষধর, ভূজঙ্গের উৎপাতও কম না। তিনি কী ভেবে টর্চ বাতিটা সঙ্গেই নিলেন।

ঘর থেকে বের হলেই দুটো করবীফুলের গাছ, তারপর একটা হাসনুহানার গাছ। গাছটায় দু একটাই ফুল ফোটে। ফুলের তীব্র গন্ধ ছড়ালেই বোঝেন, গাছে কোথাও ফুল ফুটেছে। মাথায় অনায়াসের ডিমের মতো লম্বা ঘন পাতায় ঝোপ সৃষ্টি করে রেখেছে?

গাছটার নীচ দিয়ে যাবার সময় তিনি খুব সতর্ক থাকেন। কেন যে মনে হয় যে কোনও মুহূর্তে পাতার ঝোপ থেকে পোকামাকড় লাফিয়ে পড়বে। খুবই দুর্লভ ফুলের গাছ। দিনের বেলাতেও ফুল খুঁজে বের করা কঠিন—অথচ ফুল যে ফুটেছে, গন্ধেই টের পাওয়া যায়। বিষধর সাপেদের বড়ো প্রিয় এই ফুলের ঘ্রাণ। একেবারে রাস্তার উপর গাছটা জমিদারবাবুরা না লাগালেই পারতেন। তিনি কী ভেবে গাছটার নীচে ঢুকে যাবার আগে টর্চ মেরেও দেখলেন। প্রায় বিশাল ছত্রাকার হয়ে আছে গাছের মাথাটি। ঘন সবুজের সমারোহ।

গাছটা পার হলেই সবুজ লন। শীত বসন্তে নীল রঙের বেতের চেয়ার টেবিল পাতা থাকে। বাবুরা বিকালে হাওয়া খান এখানটায় বসে। নদীর জলে নৌকা ভাসে। রাতে স্টিমারের সার্চলাইটে কেমন নীলাভ দেখায় এলাকাটা। বাবুদের আত্মীয়স্বজনও কম না। এখানে বসে তাস পাশার আড্ডাও জমিয়ে তোলার ব্যবস্থা থাকে।

দ্বিজপদ যাচ্ছিলেন, তার ছাত্রটি কাছারিবাড়িতে একা একা কী করছে, শরীর যদি খারাপ হয়, এই সব ভেবেই আমবাগানে ঢুকে গেলেন। এক ইটের দেয়াল, মাথায় টিনের চাল, আটচালার উপরে গাছের ডালপাতায় জায়গাটা খুবই অন্ধকার হয়ে আছে। মূল বাড়ি থেকে বড়োই আলগা এই কাছারিবাড়িটি। অরু ছেলেমানুষ সে এমন একটি পরিত্যক্ত জায়গায় একা বসে থাকতেও ভয় পাবে।

সে কি ঘরে নেই?

দরজা খোলা?

টর্চ মেরে দূর থেকেই সব টের পাচ্ছেন।

কেউ হারিকেনও জ্বালিয়ে দিয়ে যায়নি।

দ্বিজপদ কিছুটা দ্রুতই হেঁটে যেতে থাকলেন।

ঘরে ঢোকার আগে ডাকলেন, অরু আছিস! অরু।

কোনও সাড়া নেই।

তাজ্জব। ছেলেটা গেল কোথায়?

ভিতরে টর্চ মারতেইদেখলেন, অরু শুয়ে আছে একটা লম্বা সাদা চাদরে মুখ মাথা ঢেকে। সে কি ঘুমাচ্ছে।

এই অসময়ে!

এই অরু, অরু।

অরু ধড়ফড় করে উঠে বসল।

ঘরে অন্ধকার করে শুয়ে আছিস, কী ব্যাপার। শরীর খারাপ!

টর্চের আলো চোখে পড়ায়, অরু তাকাতে পারছিল না। সে হাতে চোখ আড়াল করে বোঝার চেষ্টা করল, কে তাকে ডাকছে!

তার যে কী হয়েছিল! সে কী বলবে। লজ্জায় মাথা নীচু করে বসে থাকা ছাড়া তার যেন আর অন্য কোনও উপায় নেই। সার নিজে চলে এসেছেন। এতে সে আরও শঙ্কিত হয়ে উঠল। সে ঘরে কখন ঢুকে গেছে, কখন চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়েছিল—শরীরে তার যেন কীসের ঘোর উপস্থিত। চোখ মুখ জ্বালা করছিল, এবং শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গে আশ্চর্য এক ঝড়ের আভাস। ঝড়ে তাকে বড়োই বিপর্যস্ত করে দিয়ে গেছে—সে কিছুটা যেন চৈতন্যও হারিয়েছিল—এক গভীর অন্ধকারে নিমজ্জিত পৃথিবীতে সে স্বপ্নের বালিহাঁস হয়ে গেছিল। কোনও শিকারের দৃশ্য, সে মজবুত হাতে হাঁসটার ডানা, কিংবা পালক ছিঁমড়ে ছিঁড়ে খেয়েছে।

লজ্জায় সে কথা বলতে পারছিল না।

কী হয়েছে? শরীর খারাপ অরু?

আজ্ঞে। সে কথা বলতে পারছে না।

ভয় পেয়েছিস?

আজ্ঞে ... সে কথা বলতে পারছে না।

ঘরে হ্যারিকেনও জ্বালিসনি!

আজ্ঞে আমি যাচ্ছি সার।

আয়। তোর একা থাকতে ভয় করলে, কারও এ-ঘরে থাকা দরকার। সত্যি তো, তুই থাকিস কী করে। ঠিক আছে, ভুঁইএঞামশায়কে বলছি।

আজ্ঞে না সার বলবেন না। আমার একা থাকতে ভয় করে না। আপনি বাবাকে কিছু বলবেন না।

হারিকেন ধরা।

সে চৌকি থেকে নেমে হারিকেন ধরাল।

এখন তার ধীরে ধীরে সবই মনে পড়ছে। তিথি হারিকেনের চিমনি মুছে তেল ভরে রেখে গেছে। দরকারে সে জ্বালিয়ে নেয়। নিবিয়ে দেয়। আজ ঘরে ঢুকে কিছুই মনে ছিল

না। শরীরে ঘোর উপস্থিত হলে এমনই বুঝি হয়—সে তার দ্বিতীয় সত্ত্বা আবিষ্কার করে কেমন নির্বোধ হয়ে গেছে আজ।

সে খুবই ধীর পায়ে বই খাতা নিয়ে ঘর থেকে বের হবার আগে আলো কমিয়ে দিল হারিকেনের। তারপর দ্বিজপদ সারের পিছনে প্রায় চোরের মতো হেঁটে যেতে থাকল। তার মনেই থাকল না, তুলি তার পুতুলের বিয়েতে খেতে বলেছে। বড়োলোকের মেয়ে তুলি, তার পুতুলের বিয়ে—সেখানে একমাত্র নিমন্ত্রিত অতিথি বোধহয় সেই ছিল। কারণ সকালে অরুর গালিগালাজে প্রায় ভূত ভেগে যাওয়ার মতো অবস্থা। তুমি কী অরুদা! ছোড়দি কত আশা নিয়ে বসেছিল, তোমাকে সে সামনে বসিয়ে লুচি পায়েস খাওয়াবে। তুমি পাত্তাই দিলে না। ভুঁইঞাকাকার সঙ্গে রান্নাবাড়িতে খেতে ঢুকে গেলে! তোমার কপালে অনেক দুঃখ আছে।

অরু খেপে গিয়ে বলল, আমার কপালে না তোর কপালে!

বারে, আমার কী দোষ!

হরিশবাবুকে ছোটোপিসির চিরকুট গোপনে পাচার করিস, ওটা বুঝি দোষ না।

তুমি অরুদা নিষ্ঠুর। জান, ছোটোপিসি বালবিধবা?

জানব না কেন? তাই বলে তোকে দিয়ে চিঠি পাচার করাবে! জানতে পারলে তোর কী হবে জানিস?

কী হবে?

অন্দর থেকে তোকে বাবুরা তাড়াবে।

জানবেই না, জানতে দেবই না। তুমি ছাড়া আর কেউ যে জানে না।

চিঠিতে কী লেখা থাকে জানিস?

হ্যাঁ, জানি।

বড়ো অকপটে তিথি স্বীকার করে ফেলল।

কী লেখা থাকে বলত!

স্বপ্নের কথা লেখা থাকে। জান স্বপ্নের কথা পড়তে নেই, পড়লে অভিশাপে পাথর হয়ে যেতে হয়। আমি পাথর হয়ে যাই, তুমি কি চাও?

তারপর তিথি আর দাঁড়াল না। সুপারি বাগান পার হয়ে নদীর চরায় কাশবনের ভিতর অদৃশ্য হয়ে গেল। কেন যে গেল! তিথি কী চায়! সে কিছুটা দৌড়ে গিয়েও ফিরে এল।

তার সাহস নেই। তিথির সঙ্গে নদীর চরে কাশের জঙ্গলে হারিয়ে গেলে বড়ো পাপ কাজ হবে। সে ধীরে ধীরে কাছারিবাড়িতে উঠে গেল।

থার্ড ক্লাস

জহর দাঁড়িয়েই আছে স্টেশনে। টিকিটের ঘন্টাও পড়ে গেছে। লোকজন লাইন দিয়েছে টিকিট কাউন্টারে।

সে পকেট হাতড়ে টিকিট ঠিক জায়গায় রেখেছে কি না, যদি হারিয়ে যায়, এখানে ক্রসিং আছে, সব সময় কেমন এক সন্ত্রাস যেন তাকে তাড়া করছে। সে রেলে চড়েনি, রেলে তার কোথাও যাওয়া হয়নি। ভাঙা সাইকেল তার সম্বল।

কত লোকজন প্ল্যাটফরমে, ভিড় ঠেলে লোকজন বের হয়ে আসছে, সে কাউকে চেনে না, একবারে অপরিচিত এক পৃথিবী যেন। সে যে এই প্ল্যাটফরমে একজন আগন্তুক, বুঝতেও তার কষ্ট হয় না। চায়ের স্টল পার হয়ে প্ল্যাটফরমে সামনের দিকে চলে গেলে ঠেলাঠেলি কম। বাক্সপ্যাটরাও মেলা, এমন সময় সুন্দর একটি ঘ্রাণও ভেসে এল, এক তরুণী প্রায় তার সামনে দাঁড়িয়ে, একটা অতিকার কুকুরের বকলস হাতে। চোখে কালো চশমা, তার চার পাশে যারা আছেন তারাও সবাই যেন সুমহান ব্যক্তিত্বের অধিকারী। সে বুঝল, তার মতো একজন অকিঞ্চিৎকর মানুষ এখানে দাঁড়িয়ে থাকলে ধমক খেতে পারে —তার ভয়ই হচ্ছিল। অস্বস্তিও আছেই, সে একা, খুবই ব্যাজার মুখে সে যেন জায়গাটা থেকে পালাতে পারলে বাঁচে। কুকুরটা যে ভাবে জিভ বের করে হাহা করছে, হাত থেকে ছুটে গেলেই তার গলা কামড়ে ধরতে পারে।

নিতাই যে কোথায় গেল!

রেলের টিকিটেই মেলা পয়সা গেছে—দু টাকা দশ আনা—সোজা কথা। বাড়তি প্ল্যাটফরম টিকিট কে কাটে! প্ল্যাটফরম টিকিট কাটার কথা নিতাই-এর। প্ল্যাটফরম টিকিট কাটতে সে রাজি না।

তার এক কথা, আমি ঠিক বের হয়ে যাব। তুই ভাবিস না ত।

সে ট্রেনে ওঠার বিষয়ে কলেজ বন্ধুদের সঙ্গে পরামর্শ করতে পারত, তবে সে যে গাঁইয়া এমন প্রমাণিত হয়ে গেলে, সে শুধু নিজেকে খাটো করবে না, মা বাপও খাটো হয়ে যাবে। গরিব পিতামাতার সন্তান এটা যে সমাজ সংসারে কত বড়ো অপবাদ নিতাই বোঝেই না। জামা-প্যান্টের যা ছিরি, তাতে যে কেউ যেন নিতাইকে কান ধরে

প্ল্যাটফরমের বাইরে বের করে দিতে পারে। গায়ে ঠঁরিফিউজি গন্ধ থাকলেও হয়েই গেল, সেই ছেলে কিছুতেই প্ল্যাটফরম টিকিট কাটবে না। একতাল পয়সা বাঁচিয়ে ছোলা-মটর কিনে খেতে খেতে হাঁটতে হাঁটতে বাড়ি চলে যাবে। মাথায় নিশ্চয় তার এমন ফন্দি কাজ করছে।

যখন কিছুতেই রাজি না, জহর বলেছিল, দে, সুটকেস দে। ওটা আমি নিতে পারব। ট্রেন ঢুকলে তোকে প্ল্যাটফরমে থাকতে হবে না। যা বাড়ি যা।

কেন?

কেন কি আবার, হয় টিকিট কাটবি, নয়ত চলে যাবি। আমাকে রেলে চড়া তোকে আর শেখাতে হবে না। গাড়িতে আমি ঠিক উঠতে পারব। তুই যা। প্ল্যাটফরম টিকিট না কাটলে জানিস বাবুরা তোকে পুলিশে দেবে।

তুই যা বলার পরই তার কেন জানি মনে হল নিতাই চলে গেলে সে ভারি একা হয়ে যাবে।

গেল কোথায়!

সে চারপাশে খুঁজছে নিতাইকে।

নিতাই তার সুটকেস হাতে নিয়ে কোথায় যে ভিড়ের মধ্যে ঘুরছে।

এই ট্রেনটায় যে খুবই ভিড় হয় সে জানে। প্ল্যাটফরমের এ-মাথা ও-মাথা মানুষজনে গিজ গিজ করছে। অথচ প্ল্যাটফরমের এদিকটায় একেবারেই ফাঁকা। কিছু দামি বাকস-প্যাটরা সহ সেই তরুণী, এবং সাহেব সুবোর মতো কিছু ভারি সুপুরুষ দেখতে যাত্রী, মেয়েটির দিকে তাকালেই মনে হয় গোটা এলাকাটাই তাদের খাস তালুক। এদিকটা বুঝি কারও দাঁড়াবার কিংবা ঢোকবার নিয়ম নেই।

তখনই সেই তরুণী চশমা খুলে ইশারায় তাকে ডাকছে।

এইরে, খুবই বুঝি বেয়াদপি হয়ে গেছে, নিতাই যে কোথায় গেল! তার হতাশ চোখ মুখ, তারপরই দেখল কুকুরটা ছেড়ে দিয়ে তিনি এদিকেই এগিয়ে আসছেন। পরনে নীলরঙের লতাপাতা আঁকা পাতলা ফিনফিনে শাড়ি, গ্রীষ্মের দাবদাহ থেকে শরীর জুড়াবার পক্ষে যথেষ্ট, হাতকাটা ব্লাউজ এবং বগল তুললে, বগলের লোমও দেখা যায়, সে নিজেই কেন জানি এই অসভ্যতা পরিহার করার জন্য কিছুটা দূরে দূরে সরে দাঁড়াবার সময় শুনল, তুমি জহর না!

সে তাকায় না। কারণ তাকালে যেন সে আরও কুণ্ঠিত হয়ে পড়বে।

তুমি আমাদের বাড়িতে কাকার কাছে আসতে না?

সে ঠিক বুঝতে পারছে না, কে তার কাকা, কার কাছে সে যেত!

শোভন সোমকে চেন না! আমার কাকা, এখন দেখছি ভাজা মাছটি উলটে খেতে জান না।

তার কিছুটা হতভম্ব অবস্থায়। শোভন সোম, সে তো এলাহি বাড়ি, এলাহি প্রাসাদ!

এখানে দাঁড়িয়ে আছ কেন? কোথায় যাবে?

আজ্ঞে গাড়িতে উঠব। গাড়ির জন্য দাঁড়িয়ে আছি। সে জানে তার পোশাক আসাকে ভালো না, সে গরিব বাবার ছেলে, এখানে দাঁড়াবার বোধ হয় হক নেই তার, অথচ মেয়েটি তাকে বেশ ভালোই চেনে, অথচ সে তাকে চেনে না, কোথায় দেখেছে, তাও বুঝতে পারছে না আর এমন সুন্দর মেয়েটা তাকে কেন যে চিনতে গেল আর এখানেই বা দেখা হওয়ার কী দরকার ছিল। ট্রেনে সঙ্গে সঙ্গে উঠতে না পারলে বসার জায়গা পাওয়া যাবে না মেয়েটা বোধহয় তাও টের পেয়ে গেছে। জেলা কংগ্রেসের মুখপত্র সাপ্তাহিক পত্রিকার প্রেস বয় সে। শোভন সোম, করিম সাহেবের কাছে লেখালেখির সূত্রে প্রুফের কপি নিয়ে তাঁদের কাছে তাকে ঘোরাফেরা করতেই হয়। সে যায়, তবে প্রাসাদের মতো বিশাল দু মহলা বাড়িটায় কারা থাকে সে জানেই না। তার কৌতূহলও নেই। সে শোভন সোমের কাছে যায়, কাজ হয়ে গেলে চলে আসে। বাড়ির এক তলায় একটি বড়ো হলঘরে সে দেখেছে সাদা মারবেলের টেবিলমাথার উপর ঝাড়লণ্ঠন, রিন রিন শব্দ, কিছু জালালি কবুতরের ওড়াওড়ি—আর ঘরটা এত বড়ো যে ঢুকলেই বুক হিম হয়ে যেত আর বাড়িটার উঠোনে বড়ো বড়ো টবে গোলাপ, জিনিয়া, সূর্যমুখী, টগর কত না ফুলের সমারোহ। আর তার মধ্যে কোন গাছে কী ফুল ফুটে থাকল দেখার সাহসই হত না।

সে ঘাড় গুঁজে গেটের ভেতর সাইকেল নিয়ে ঢুকে যেত।

তারপর বারান্দায় সাইকেল রেখে চুপি দিত।

তিনি আছেন।

সে বলত, কাকা আমি জহর।

এসো।

এই কবিতাটা কম্পোজে দেওয়া গেল না।

কেন?

ও হয়নি কিছু।

তিনি তার মতামতকে অগ্রাহ্য করতে পারতেন, তবে হয়নি কিছু বোধ হয় বলা ঠিক হয়নি। কিছুটা যে বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে সে তাও বুঝতে পেরেছিল। সব লেখাই সে

একবার পড়ে দেখে। বানান ভুল থাকলে ঠিক করে দেয়। কিংবা গদ্য দুর্বল হলে সে তাতেও কলম চালায়। প্রাথমিক নির্বাচন বলতে গেলে সেই করে থাকে। তবে কবিতাটি ফেরত দেওয়া উচিত কাজ যে হয়নি, শোভন কাকার মুখ দেখেই সে টের পেয়েছিল।

কী হল বোসো।

সে দাঁড়িয়েই ছিল।

যদি ছাপতেই দেওয়া না যায়, তবে তুমি কী করবে।

আসলে কাগজটা যে জেলার মুখপত্র, এবং খবর কম থাকলে, কিংবা বিজ্ঞাপন কম পেলে, গল্প কবিতাও মাঝে মাঝে ছেপে দেওয়া, জায়গা ভরাট করার জন্য, তিনি ভালোই জানেন। গল্প, কবিতা সেই দেখে থাকে। কাজেই তিনি তাকে যেন বাহবাই দিলেন, যে যা দেবে তাই ছাপাতে হবে তোমাকে কে বলেছে।

সেই।

ঠিক আছে কবিতাটি ফেলে দাওনি ত!

আজ্ঞে না।

দিয়ে দেবে আমাকে। আমাকে দিল, কী করি! ওতো শুনেছি তোমাদের কলেজ ম্যাগাজিনেও লিখেছে। আমাকে পড়িয়েছে। ছন্দের মিলটিলও মন্দ না।

আপনি যদি বলেন, কমপোজে পাঠিয়ে দেব। খুবই কুণ্ঠিত চিত্তে কথাটা সেদিন সে না বলে পারেনি।

আরে না না। কবিতা বিষয়টাই আমার কাছে রাবিশ। যাকগে, প্রুফগুলো রেখে যাও।

তারপর তিনি ড্রয়ার টেনে দুটো লেখা বের করে বললেন, আমাদের জঙ্গীপুরের প্রতিনিধি লেখা দুটো পাঠিয়েছে। বের হবার সময় ফের মনে করিয়ে দিলেন, কবিতাটি ফেরত দিও। কবিতা বুঝলে না, যিনি লেখেন, তার মনে হয় ইহজন্মে আর এমনটি লেখা হয়নি। অত সোজা বলো, কবিতা লেখা—যত্তসব খেয়াল।

শোভন কাকার প্রাসাদতুল্য বাড়িটার একতলায় কেমন পাথরের মতো হিম ঠান্ডা। ঘরগুলো এত বড়ো, আর এত উঁচু ছাদ যে, সে একা ঢুকলে শরীর কেমন নিস্তেজ হয়ে পড়ত। কত উঁচু সেই সব বাড়িবরগা, লম্বা রডে পাখা ঝুলছে, সারা ঘরে দেওয়াল আলমারি, আর আলমারিগুলো বইয়ে ঠাসা। সবই আইনের বই, সোনার জলে বাঁধানো, কবেকার পুঁথিপত্র এবং বারান্দা ধরে এগিয়ে গেলে, কোথাও বড়ো বড়ো তৈলচিত্র—যেন শোভন সোমের একতলাটি কোনও বন্দি রাজকুমারের—যে পাথর হয়ে গেছে—কোনও সাড়াশব্দও পাওয়া যায় না। দু-একজন কাজের লোকের দেখা পাওয়া যায়, তারা, দেয়াল

কিংবা জানালা, মেঝে পরিষ্কার করছে, বাগানে দু-একজন মালিও দেখা যায়। কাজ করে যাওয়া নীরবে, একতলায় ঢুকলে তার এমনই মনে হত।

আর দোতলার দিকে অবশ্য সে চোখ তুলে তাকাত না।

কারণ সেখানে সব পরির মতো মেয়েদের মুখ দেখা যায়, এক সময় চারপাশে চিক ফেলা থাকত তাও বোঝা যায়। তবে সেই চিকের বাহার না থাকলেও নারীকণ্ঠে সরগরম হয়ে থাকে বারান্দা। কোথাও কেউ নাচছে, কেউ গাইছে, কেউ ছুটছে।

তার যে কৌতূহল নেই বলা যাবে না।

তবে সে দোতলার দিকে চোখ তুলে কখনও দেখে না।

কে দৌড়ায়, কে সিঁড়ি ধরে লাফিয়ে নামে দেখা তার কখনও হয় না।

চোখে চোখ পড়ে গেলে কী যে ভাববে!

সে বাড়িটায় গেলে সুন্দর ঘ্রাণ পায়।

শোভনকাকার ভাইঝি কি সেই কবি! মেলা ভাইঝি, সারাক্ষণ ওপরে কিচির মিচির শব্দ, শোভন কাকার দাদা-কাকাও থাকতে পারে, কাকিমা-দিদিমাও থাকতে পারে—মেলা ঘর, মেলা মানুষজন—আর ঠাকুর, চাকরতো আছেই—কোনও ঘরে ক্যারাম খেলা হচ্ছে, সে তাও টের পেত।

তার একবার বলার ইচ্ছে ছিল, তোমার নাম।

তোমার বলা কি ঠিক হবে।

প্রাসাদতুল্য বাড়িটার দোতলায় মেয়েটির মুখ সে কখনও দেখেছে বলেও মনে করতে পারে না—আর যা হয়, বাড়ির মেয়েদের সবারই যেন নীলাভ চোখ—দেখলে সব মেয়েদের একই রকমের মনে হয়।

জহর কত কিছু যে ভাবছে।

সারা প্ল্যাটফর্মের যাত্রীর এত ভিড়, অথচ এদিকটায় ফাঁকা কেন সে বুঝতে পারছে না।

গরমে সে হাসফাঁস করছিল।

কপালে ঘাম, সে নিতাইকে খুঁজছে। প্ল্যাটফরম টিকিট কাটতে এত সময় ত লাগার কথা না।

তখন আবার কথা শোনা গেল। কারণ উঁচু লম্বা মেয়েটি তার দিকে তাকিয়েই আছে।

তোমার সঙ্গে আর কেউ কি আছে?

জহর আছেও বলতে পারে, আবার নেইও বলতে পারে।

কী বলবে বুঝতে পারছে না।

তারপর অনেক কিছু ভেবে বলল, আছে।

সে কোথায়?

প্ল্যাটফরম টিকিট কাটতে গেছে।

গাড়ি আসারও ঘন্টা পড়ে গেল।

তাই তো, কী যে করি!

এখানে দাঁড়ালে উঠবে কী করে! দেখছ না কী ভিড়!

তার বলার ইচ্ছে হল, তুমি উঠতে পারলে আমি কেন উঠতে পারব না।

মেয়েটি কী বুঝে কাকে ডাকল।

বেশ একজন মনোরম যুবক কাছে এসে বলল, একে চেন?

কে?

জহর সেন।

কী হবে তাঁকে দিয়ে। তাঁকে চিনে।

কিছু হবে না, আখেরে কাজে লাগতে পারে। গণরাজ কাগজের গল্প-কবিতা দ্যাখে। নিজেকে খুব বেশি বোদ্ধা ভাবে।

জহর বলল, আমি আসি।

সে কেমন ভর পেয়ে গেছে। তার উপর মেয়েটি কেন যে এত খাপ্পা হয়ে গেল, মেয়েটি গরমে যে কাহিল তাও বোঝা যায়, স্বল্পবাস এবং হালকা শাড়ি সায়া পরে দাঁড়িয়ে থাকায় অবশ্য সে কণ্ঠবার তাকে দেখার যে চেষ্টা করেনি, তা নয়, তবে এ-জন্য এত খাপ্পা হওয়ার কথাও না, মেয়েদের দিকে অসভ্যের মতো তাকিয়ে থাকলে রাগ হবারই কথা। সে যখন এইসব ভাবছিল, তখনই মেয়েটি বলল, যেই থাকুক, এখানে আর দাঁড়িয়ে থেকো না। ট্রেন ফেল করবে বলে দিলাম। বেশি বোদ্ধা হলে শেষে পস্তাতে হয়।

ট্রেন ফেল করবে কেন, সে বুঝতে পারছে না।

তখনই সুচারু এক মুখের বয়স্ক মহিলা ডাকছে, এই প্রীতি ওখানে কার সঙ্গে কথা বলছিস!

মেয়েটি সহজভাবেই জবাব দিল, জহরের সঙ্গে—গণরাজ কাগজে কাজ করে। আমাদের বাড়িতে কাকার কাছে আসে। কাগজের প্রেসবয়।

প্রীতি!

প্রীতিলতা—

নামটা মনে পড়েছে।

প্রীতিলতা সোম। সুযোগ পেয়ে যথেচ্ছ উপহাস প্রীতিলতার, সে প্রেসবয়, সে বেশি বোদ্ধা—একজন তৃতীয় শ্রেণির যাত্রীর পক্ষে যে এটা শোভা পায় না তাও আভাসে ইঙ্গিতে বলে দিল।

প্রীতি তাঁকে দেখেছে, সে তাঁকে দেখেনি। প্রীতিলতা তাঁকে বিলক্ষণ চেনে।

মেয়েটা যে কী! সে যখন প্রীতির এত চেনা, কবিতা তার হাতে দিলে কী ক্ষতি ছিল—মেয়েটা জানে না, কবিতা হোক, গল্প হোক কিংবা কোনও জঙ্গীপুর সংবাদদাতার লেখাও সে ঠিকঠাক করে দেয়—প্রীতির কাকা কিংবা মামা যেই দিক, শেষ পর্যন্ত লেখাটি তার হেফাজতেই চলে আসবে।

অবশ্য ভাবতে পারে তার কাকা শোভন সোম জেলার প্রভাবশালী মানুষ, কাগজের অন্যতম সম্পাদক শহরের বনেদি পরিবারের মেয়ে প্রীতি, তার পক্ষে এক চালচুলোহীন যুবকের হাতে কবিতা দেওয়া যে আদৌ শোভন নয়, প্রীতির দোষও দেওয়া যায় না, আর সে জানতও না, শোভনকাকার ভাইঝি প্রীতি জানলে সে কখনওই কবিতাটি ময়লার ঝুড়িতে ফেলে দিতে সাহস পেত না।

আশ্চর্য সেই মানুষটি। কবিতাটি কম্পোজে না দেওয়ায় বিন্দুমাত্র তিনি বিরক্ত হননি। বরং সে ঠিক কাজই করেছে, কাকার আচরণে এমনই মনে হয়েছিল তার, কেবল ফেরত দেবার কথা ছাড়া আর কোনও কথা হয়নি।

সে যথাসময়ে কবিতাটি শোভন সোমকে ফিরিয়েও দিয়েছিল—

কবিতার দুটো একটা লাইনও সে মনে করতে পারছে। কিছুটা অশ্লীলতার গন্ধ আছে বলেই কবিতার কিছুটা মনে করতে পারছে।

ঘুম আসছে না।

আসে না ঘুম।

আগুন জ্বলে শরীরে—

ভারী আগুনের ভিতর

থাকি বসে।

আমার শরীর আলগা

হয়, হয় বেদনার ঝুড়ি

সব খুলে নিলে আরাম

এবং শান্তি।

শরীর আগুন হয়ে

থাকে ...

না আর মনে পড়ছে না।

আসলে কবিতাটিতে আছে মধ্যরাতে নারীর ঘুম ভেঙে গেলে যা হয়।

জল তেষ্টা পায়।

শরীর কোনও কারণে বিবশও হতে থাকে। ঘরে একা থাকলে যাবতীয় পোশাক-আসাকে আগুন ধরিয়ে বসে থাকার ইচ্ছে হয়, হয়তো। এবং কোনও নগ্নতার যে আভাস ছিল কবিতায়, সে তা বোঝে।

কবিতাটি ভালো কি মন্দ সে বিচার করার অধিকার যে তার নেই জহর ভালোই জানে। তবে একটি জেলার সংবাদপত্রে কবিতাটি ছেপে দিলে, জ্ঞানকাকা বিরক্ত হন যদি, কিংবা অহিকাকা, যেন কবিতাটি ছেপে দিলে সেও কম সেয়ানা নয় এমন সবাই ভাবতেই পারে।

অথবা জ্ঞানকাকা বলতেই পারেন, কাগজটায় ছাইপাঁশ কেন যে ছাপিস।

কিংবা নিরঞ্জনকাকাও বলতে পারেন, জহর কি আছে রে কবিতায়। আমাকে বুঝিয়ে দে। তুই যে ছাপতে দিলি, তোর কি একবারও মনে হয়নি শ্যামাদা কাগজটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়েন। রক্ষণশীল মানুষ, কবিতাটি পড়লে তিনি বিরক্ত হতে পারেন।

জেলা কংগ্রেসের সভাপতি শ্যামাপদ ভট্টাচার্যকে সে অফিসে প্রায়ই দেখে থাকে। বড়োই দীর্ঘকায় মানুষ, এবং এমন সুপুরুষ সে জীবনে কমই দেখেছে। ঈগল পাখির মতো নাক তাঁর, আর গৌরবর্ণ এবং সে তাঁর বাড়িতেও গেছে। জেলায় সব গণ্যমান্য মানুষের ভিড়, এবং সে প্রায় চোরের মতো বাড়ির ভিতর ঢুকে যেত, যেন ধরা পড়লেই তাঁকে কৈফিয়ত দিতে হবে। পুত্রদেরও সে দেখে থাকে, সবাই প্রায় দীর্ঘকায় এবং শোভনকাকার বাড়ির মতো এ-বাড়িটায় ঢুকলেও প্রাচীন বনেদিয়ানার গন্ধ পায়।

এইসব কথা কেন যে দ্রুত সে ভেবে ফেলতে পারছে, আর চারপাশে খুঁজছে শয়তানটিকে। গাড়ি আসার সময় হয়ে যাচ্ছে। কোথায় যে গেল নিতাই! প্রীতি তাঁকে দেখে কিছুটা যেন মজা ভোগ করছে, তার এই অসহায় অবস্থা যেন কবিতাটি না ছাপার দুর্ভোগে পড়ে রয়েছে। সে কিছুটা সরেও গেছে, কিন্তু প্রীতির চোখ সে এড়াতে পারছে না। প্রীতির সঙ্গে তার আত্মীয়স্বজনও আছে—গাড়িতে তুলে দেবার জন্য সঙ্গে কাজের লোকেরও যে

অভাব নেই—যেন এই প্ল্যাটফরমের সব যাত্রীরাই সোমবাড়ির মেয়েবউরা কলকাতায় যাচ্ছে বলে দর্শনীয় কোনও ঘটনার জন্ম দিচ্ছে।

সে বড়োই ফাঁপড়ে পড়ে গেল।

তখনই প্রীতি প্রায় চিৎকার করে বলল, আরে করছ কী, এটা তোমার দাঁড়াবার জায়গা নয়। ফার্স্ট ক্লাস সেকেন্ড ক্লাস কামরা এখানে দাঁড়ায়। শিগগির পিছনে দিকে চলে যাও। দেখছ না হুড়মুড় করে সব ছুটছে। পেছনে ছুটে যাও। সামনের দিকেও ছুটতে পার। আচ্ছা একটা ক্যাবলাকান্ত—না পারা যায় না!

আসুক নিতাই। ক্ষোভে জহরের মেজাজ বিগড়ে গেছে। যেন নিতাইকে পেলে এই প্ল্যাটফর্মে ফেলেই একচোট পেটাবে। সে ক্যাবলাকান্ত! ফার্স্ট ক্লাস সেকেন্ড ক্লাস কামরার সামনে তাঁর দাঁড়াবার অধিকার নেই।

ফার্স্ট ক্লাস সেকেন্ড ক্লাসের কামরাগুলি কোথায় থামে সে তাও জানে না। থার্ড ক্লাসের যাত্রী সে। থার্ড ক্লাসের যাত্রীর পক্ষে এর চেয়ে ভালো বোকামি বোধ হয় আর হয় না। সে গাড়ি ফেল করতে পারে, ভিড়ের ট্রেনে গাড়িতে ওঠাই কঠিন। প্রীতি তাঁকে তাড়া লাগাচ্ছে —আরে এখানে নয়, ওদিকে, পেছনে ছোটো। শিগগির ছোটো।

কবিতা তো অনেক দূরের ব্যাপার, থার্ড ক্লাসে ওঠার বিষয়টাই সে জানে না, সে যে খুবই অর্বাচিন আভাসে ইঙ্গিতে তাও বোধ হয় বুঝিয়ে দিতে চায়। আসলে এটা যে কত বড়ো অপমান নিতাই যদি বুঝত। তুই বুঝবি না, আমি একা থাকলে ঘাবড়ে যাই। ভিড়ের মধ্যে তুই হারিয়ে গেলি। আর সে তখনই দেখল দূরে সিগনালের ওপারে গাছপালার ভেতর দিয়ে রেলগাড়ি এগিয়ে আসছে। ইঞ্জিনের ধোঁয়া দেখা যাচ্ছে। এবং গাছপালার মধ্যে ধোঁয়া মিশে যাচ্ছে। বড়ো স্টেশন বলে গাড়িটা এখানে মিনিট দশেক দাঁড়ায়। কামরার ভিতর ঢুকতে না পারলেও দাঁড়িয়ে ঠিক চলে যেতে পারবে। সে যেন কিছুটা সাহস ফিরে পেল।

সিট দখলের জন্য ছোটাছুটি শুরু হয়ে গেল। সে কোনদিকে যাবে তাই বুঝতে পারছে না। নিতাই না এলে সে যেতেও পারছে না। নিতাই এখানে এসেই তাকে খুঁজবে। সে ঠিক আসবে—তারপর ধীরেসুস্থে যে করেই হোক ট্রেনে ওঠা যাবে। তাড়াহুড়ো করে লাভ নেই। বসার জায়গা না পেলেও তার চলবে।

প্রীতি যেন তার ওপর আরও বেশি খেপে যাচ্ছে। ট্রেন ইন করছে, অথচ কোনও হুঁশ নেই, দাঁড়িয়েই আছে, তাঁকে আহাম্মকও ভাবতে পারে, ভাবুক, যা খুশি ভাবুক। সেও কেমন এক ধরনের মজা ভোগ করতে থাকল। ট্রেন ইন করছে, কামরায় ওঠার জন্য হুড়োহুড়ি মারামারি শুরু হয়ে গেছে। জানালা দিয়ে কেউ বাক্স, রুমাল, কাগজ যে যা

পারছে ছুঁড়ে দিচ্ছে। প্রীতির আত্মীয়স্বজনরাও সামনের কামরায় উঠে গেল। কুকুরটাও লাফিয়ে কামরায় উঠে গেল, প্রীতির সেই যুবক চেঁচাচ্ছে—আরে উঠে এসো। দাঁড়িয়ে থাকলে কেন!

কিন্তু প্রীতি উঠছে না।

জহর কিছুটা যেন জয়লাভ করার স্পৃহাতে মরিয়া হয়ে উঠল।

আপনি উঠে পড়ুন। আমার জন্য দাঁড়িয়ে থাকবেন না। নিতাই এলেই আমি ঠিক উঠে পড়ব। আরে দাঁড়িয়ে থাকবেন কেন?

প্রীতি যে তার বোকামিতে খেপেই আছে —আমার খুশি। তারপরই প্রীতি কেমন কিছুটা হাঁপিয়ে ওঠার মতো বলল, ট্রেন ছাড়তে দেরি নেই। এসো আমার সঙ্গে, প্রায় যেন জোর করে তাঁকে তাঁরা কামরায় তুলে নিয়ে যাবে। আর তখনই দাদা রে দাদা রে বলে কেউ ডাকতে ডাকতে এদিকে আসছে। সে বলল, নিতাই আসছে। আপনি উঠে পড়ান।

শিগগির চলে আয় দাদা। একেবারে জানালার ধারে সিট। সুটকেস রেখে এসেছি। পাশের লোককে বলে এসেছি, আমার দাদার সুটকেস। দাদা কলকাতা যাবে। নিতাইকে অনুসরণ করার আগে সে প্রীতির কাছে গেল—বলল, উঠে পড়ুন, আর দাঁড়িয়ে থেকে কী হবে! ওই দেখুন ভেতর থেকে কুকুরটা গলা বাড়িয়ে আপনার জন্য ভুক-ভুক করছে। খুবই বিচলিত বোধ করছে—আমি যাই। নিতাই তাঁর দাদাকে নিয়ে ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে গেল। প্রীতি কী করবে বুঝতে পারছে না। ক্ষোভে দুঃখে না অপমানে চোখ তাঁর সজল হয়ে উঠছে, তাও বুঝতে পারছে না। সে দাঁড়িয়ে আছে—একা।

মাশুল

সম্পর্কে জোটন বিবি আবেদালীর দিদি হয়। কিছুদিন পূর্বে পর্যন্ত জোটন বিবি ছিল, এখন বেওয়া হয়েছে। জোটনের সব সমেত তিনবার নিকাহ। তালাক অথবা স্বামীর মৃত্যুর পর জোটন প্রতিবার আবেদালীর কাছে চলে আসে। আবেদালী তখন লতা এবং খড়ের সাহায্যে উত্তর দুয়ারী ছোট্ট খুপরি ঘরটা তুলে দেয়—এই পর্যন্ত আবেদালীর সঙ্গে সম্পর্ক। তারপর কিছুদিন ধরে জোটনের জীবন-সংগ্রাম, ধান ভেনে দেওয়া, চিড়া কুটে দেওয়া পাড়াপ্রতিবেশীদের এবং যখন বর্ষাকাল শেষ হয়, যখন হিন্দু গৃহস্থ ঘরে পূজা-পার্বণ শেষ, তখন জোটন গ্রামের অনেক দুঃখী ইমানদারদের সঙ্গে ভাতের হাঁড়িটা ধুয়ে-পাকলে জলে নেমে পড়ে, এবং সকল পাটখেত চষে বেড়াতে থাকে শালুকের জন্য। শালুক শেষ হলে আবেদালীর কাছে নালিশ—দ্যাশে কি পুরুষমানুষ নাইরে আবেদালী?

সেই জোটন সোলার ছোট্ট ঝাঁপটা টেনে ঘর থেকে মুখ বার করল। এখনো ভোর হয়নি, সারারাত জোটনের চোখে ঘুম নেই। মসজিদে সামুর বাপ আজান দিচ্ছে, জোটন ঘরে বসে অন্ধকারে ছেঁড়া হোগলা এবং ছেঁড়া কাঁথাটা ভাঁজ করে এক পাশে রেখে দিল। অন্ধকার কাটছে না, সুতরাং ঘরের আসবাবপত্র অস্পষ্ট—শিকাতে দুটো হাঁড়ি, দুটো সরা—দুদিন থেকে জোটনের ভাত নেই, দুদিন ধরে জোটন শালুক সিদ্ধ করে খাচ্ছে। জোটন সরা তুলে হাত দিল এবং অনুভব করতে পারল কিছু শালুক সিদ্ধ এখনো হাঁড়িতে আছে। সে অন্ধকারে বসেই শালুকগুলো খেতে থাকল। শুকনো বলে গলায় আটকাচ্ছে—একটু জল খেল জোটন। আবার দরজা ফাঁক করে যখন আকাশ দেখল—আকাশ পরিষ্কার, মোরগেরাও ডাকছে—জোটন দরজা খুলে বাইরে এসে দাঁড়াল।

মসজিদের ওপাশটায় সূর্য উঠছে। আবেদালী বদনা হাতে মাঠ থেকে উঠে এল। আবেদালীর বিবি জ্বালালী পাতা দিয়ে উঠোনের এক কোণায় ভাত রান্না করছে। আবেদালীকে দাওয়ায় বসতে দেখে জোটন বলল, কীরে, মানুষটা ত কাইলয় আইল না।

—না আইলে আমি কি করমু! আবেদালী জোটনের এই ইচ্ছায় বিরক্ত। তিন-তিনবারের পর ফের নিকাহের শখ।

দুদিন না খেয়ে জোটনও ভয়ানক হয়ে উঠেছে। সে আবেদালীকে উদ্দেশ্য করে বলল, দন্দি যাওনের সময় মানুষটার খোঁজ কৈরা যাবি। মানুষটা বাইচা আছে না মরছে, কবি আইয়া।

—কমু গ কমু! আবেদালী দেখল জোটনের মুখ ভয়ানক শুকনো। দুদিন না খেতে পেয়ে জোটনের চোখ কোটরাগত। —তুই দুফরে আমার ঘরে খাইস। আবেদালী এবার জ্বালালীর মুখটা দেখল। সূর্য উঠছে বলে রোদের রং জ্বালালীর খড়খড়ে মুখটা আরও খড়খড়ে করে দিচ্ছে এবং আবেদালীর এমত কথায় জ্বালালীর মুখটা ফোটকা মাছের মতো ফুলতে থাকল। —আরে আরে করতাছস কী! তর গাল যে ফাইট্টা যাইব।

জোটন বুঝতে পেরে বলল, নারে থাউক। আমার খাওনের লাগে কি আছে।

আবেদালী বুঝল জোটন খাবে না। সে দেখল, জোটন উঠোন থেকে নেমে যাচ্ছে। জোটন রাস্তায় নেমে গেল এবং সড়ক ধরে হাঁটল না। যেখানে এখনো ধানখেতে জল আছে অথবা খেতের আল জাগছে সেইসব পথ ধরে কি যেন খুঁজতে খুঁজতে চলছে।

জোটন এইসব নরম মাটির আশ্রয়ে কচ্ছপের ডিম খুঁজছে। এই সময়ে কচ্ছপেরা ডিম পাড়বে মাটির আলে। জোটন এ-সময়ে এসব মাটির আশ্রয় থেকে ডিম বের করে পশ্চিমপাড়ায় উঠে যাবে ভাবল এবং ডিমগুলি দিয়ে বলবে, আমারে এক টুকরি চাইল দিয়েন। সে এক দুষ্ঠ করে বিলেন জমির অনেক আল ভাঙতে থাকল। সূর্য বিশ্বাসপাড়ার ফাঁক দিয়ে অনেক উপরে উঠে যাচ্ছে। ধানগাছের শিশির, ঘাসের শিশির, কলাই খেতের শিশির সব বিন্দুবৎ হয়ে পড়ছে এবং ইতস্তত রোদের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে। মানুষটা গতকাল এল না, সে পুঁটলি বেঁধে বসে ছিল, মৌলভি সাবকে বলা ছিল, সাক্ষী ঠিক ছিল—অথচ মানুষটা এল না। মুশকিলাশান নিয়ে মানুষটা উঠোনে ডেকেছিল একদিন, এটা আবেদালীর বাড়ি না? আবেদালী, জ্বালালী এবং সকলে ফোঁটা নিয়েছিল—জোটনও উঠেছিল, ফোঁটা নিয়েছিল—পীরের দরগায় লোকটা থাকে, উঁচু, লম্বা, গোটা গোটা চোখ—নাভির নীচে সাদা দাড়ি নেমে গেছে, গায়ে শতছিন্ন, মাথায় ফেট্টি এবং গলায় বিচিত্র রকমের মালা-তাবিজ। জোটন ফকির মানুষটার মহববতের জন্য প্রথম দর্শনে বিস্মিত এবং শীতের নরম রোদ যেন তাকে গভীর রাত পর্যন্ত আচ্ছন্ন করে রেখেছিল সেদিন।

জোটন আলের ধারে ধারে তীক্ষ্ণ নজর রেখে হাঁটছে। কচ্ছপের ডিম এখানে নেই, সে হাঁটতে থাকল। সে ইতস্তত তাকাল এবং কয়েক গুচ্ছ ধানের ছড়া কাপড়ের নীচে লুকিয়ে ফেলল। ওর পাশ দিয়ে কামলারা অন্য জমিতে উঠে যাচ্ছে—জোটন বসে পড়ল—যেন সে যথার্থই কচ্ছপের ডিম সংগ্রহ করছে। সে উঠছে না। কামলারা অন্য জমিতে এখন ধান কাটছে। জোটন ধান কাটছে না। হাতের ধারালো শামুকটা সে পেটের নীচে গুঁজে

রেখেছে। জোটন অন্য জমিতে কামলাগুলোকে দেখার জন্য গোড়ালিতে ভর করে উঁকি দিল—জমিটা কার স্থির করার ইচ্ছায়। দূরের গাইগুলোকে জলে নেমে যেতে দেখল—মানুষটা এল না, সেই মুশকিলাশানের মানুষটা। তেরোটি সন্তানের জননী জোটন আবার মা হবার জন্য এই আলে দাঁড়িয়ে কেমন ছটফট করতে থাকল। চল্লিশ বছরের রমণী জোটন খোদাকে যেন এই ধানের জমিতে খুঁজছে—খোদার মাশুল উঠছে না গতর থেকে, এমতভাব এখন।

দুদিন পেটে ভাত নেই—আফশোস। দুদিন হাজারদির বিলে গ্রামের অন্য অনেক দুঃখী ইমানদারদের সঙ্গে শালুক তুলেছে, দুঃখী হলেই ইমানদার হবে, খোদাকে স্মরণ করবে—এমনও একটা বিশ্বাস আছে জোটনের। এই যে এখন জোটন শামুকের ধারালো মুখটা দিয়ে কট করে আর একটা ধানের ছড়া কাটল এবং কোঁচড়ে লুকিয়ে ফেলল—যেন পেটের খিদে ভয়ানক দুঃসহ, খোদার কাছে নিজের গোনাগারের জন্য জোটন মোনাজাত করল—হায়রে খোদা, পেটের জ্বালায়, গতরের জ্বালায় সব হয়। সুতরাং জমির মালিককে যেন বলার ইচ্ছা, ভয় করবার কিছু নেই, আর কিছু না হোক জোটনের ইমান আছে। তোমার শক্ত ধানের ছড়া কাটছি না, আলের উপর যেসব ছড়া নুয়ে আছে শামুকের ধারালো মুখে তাই আশ্রয় পাচ্ছে। হাসিমের বাপ নয়াপাড়ার নিমগাছ অতিক্রম করলে জোটন কট করে আরো একটা ধানের ছড়া কেটে কোঁচড়ে লুকাল। এবং এ-সময় মালতির কথা মনে হল। নরেন দাসের ছোটোবোন মালতি বিধবা হয়ে ঘরে ফিরেছে। মালতির দুঃখবোধে জোটন পুবের বাড়ির বোন্নাগাছটার ফাঁক দিয়ে নরেন দাসের তাঁতঘর দেখল। তাঁতের শব্দ শুনতে পাচ্ছে—মাকুর শব্দ এবং চরকার শব্দ। জোটন কট করে অন্য একটা ধানের ছড়া কাটতেই পিছন থেকে কে যেন চীৎকার করে উঠল—এই জুটি, মাথার খুলি ভাইঙ্গা দিনু।

জোটন মুখ ঘুরিয়ে দেখল ঈসম আসছে। সে কাঁচুমাচু হয়ে বলল, না ঈসম ভাই, আমি এহানে কিছু করতাছি না।

—তুমি আসমান দ্যাখতাছ। যা বাড়ি যা। কথা বাড়াইস না।

সুতরাং বাড়ি উঠে যাওয়ার মতো করেই জোটন হাঁটতে থাকল, কিন্তু যেই ঈসম মসজিদের কূয়াতে জল তোলার জন্য বালতি নামাল—জোটন টুক করে আলের ঠঁপরে বসে ধানগাছের ছায়ায় নিজেকে ঢেকে ফেলল, তারপর হামাগুড়ি দিয়ে যেতে যেতে দেখল এক জায়গায় হাত লেগে মাটি সরে গেছে এবং সাদা গোল গোল ডিম বের হয়ে পড়ল। মুখ উজ্জ্বল করে জোটন এবার উঠে দাঁড়াল। ইমান এবং মুশকিলাশানের লম্ফটাকে উষ্ণ করছে। দূরে দূরে সব ধান কাটা হচ্ছে। ধানের আঁটি বাঁধছে মুনিষেরা, ওরা গাজির গীত গাইছে। দূরে দূরে গানের স্বর-তরঙ্গ, নরেন দাসের বিধবা বোন মালতি এবং গত রাতের নিষ্ফল প্রতীক্ষা জোটনকে নিদারুণ তীব্র তীক্ষ্ণ যন্ত্রণায় কাতর করছে। মালতির বিয়ে হবে

না, বাকি জীবন গতরের কোনো মাশুল দেবে না—আল্লা নারাজ হবে—এই গতর মাটির মতো, পতিত ফেলে রাখলে গুনাহ। জোটন এইজন্যই মালতির জীবনকে, ধর্মকে না-হক কাফেরের মতো ভাববার ইচ্ছায় শরীরের জড়তা কাটাতে গিয়ে দেখল, বোন্নাগাছের নীচে মালতি দাঁড়িয়ে আছে—চুপ এবং নিঃসঙ্গ। ওর শরীরের সাদা থান ভোরের হাওয়ায় উড়ছে। জোটন মালতিকে দেখে তাড়াতাড়ি সব কটা ডিম ভিজা জামার ভিতর থেকে তুলে আঁচলে বেঁধে ফেলল।

অন্যদিন হলে জোটন মালতির সঙ্গে অন্তত কিছু কথা বলত। কিন্তু আজ মালতির এই নিঃসঙ্গতা যথার্থই ওকে পীড়িত করছে। একটা অহেতুক অপরাধ বোধে মালতির সঙ্গে যে কোনো কথাই বলতে পারল না। জোটন এই পথ ধরেই গেল—অপরিচিতের মতো তামুকের খেতে উঠে গেল। দেখল, মালতি বোন্নাগাছ পার হয়ে লটকনগাছের নীচ দিয়ে পুকুরপাড়ে দাঁড়াল এবং হাঁসগুলোকে জলে সাঁতার কাটতে দেখে কেমন আনমনা হয়ে গেল। জোটন আর দাঁড়াল না। এখানে দাঁড়ালে কষ্টটা বাড়বে। তারপর শালুক খেয়ে শরীরে শক্তি পাচ্ছে না। সে তাড়াতাড়ি নরেন দাসের বাড়ি পার হয়ে গ্রামের রাস্তায় হাঁটতে থাকল। বকুলগাছটা অতিক্রম করে ঠাকুরবাড়ির সুপারি বাগান। সে সন্তর্পণে বাগানে ঢুকে গাছতলায় সুপারি খুঁজতে থাকল। জোটন সুপারিকে গুয়া বলে। সে খুঁজে খুঁজে কোথাও যখন একটাও সুপারি পেল না, সে গাছের মাথার দিকে তাকাল এবং প্রার্থনার ভঙ্গিতে বলল, আল্লা একটা গুয়া দ্যা। সব গাছগুলোর মাথায় সুপারি ঘন এবং হলুদ রঙের। হলুদ রঙের এই সুপারির খোসা ছাড়িয়ে একটা শাঁস মুখে দেবার বড়ো শখ জোটনের। সে দেখল একটা কাঠঠোকরা পাখি এ-গা, ও-গাছ করছে। আহারে আল্লারে একটা দ্য না রে। তখনই বুড়ো ঠাকুরুনের গলা শুনতে পেল সে। জোটন চুপচাপ বাগানের পাশে ঘন চড়ুইগাছের জঙ্গলে নিজেকে লুকিয়ে ফেলল। জোটন অনেকক্ষণ এই ঝোপের ভিতর পাখিটার বদান্যতার জন্য বসে থাকল। পাখিটা উড়ছে, জোটন ঝোপের ফাঁক দিয়ে দেখতে দেখতে উত্তেজিত হতে থাকল। পাখিটা সুপারির উপর এবার ঘন হয়ে বসল, দুটো ঠোকর মারল এবং সঙ্গে সঙ্গে তিন-চারটে সুপারি গাছের গোড়ায় ছড়িয়ে পড়ল—য্যান মাণিক্য। যেন জোটনের সমস্ত দিনের ইচ্ছা এখন এই গাছটার ছায়ায় রূপ পাচ্ছে। জোটন চারপাশটা ভালো করে দেখল। পুকুরঘাটে বুড়ো ঠাকুরুন স্নান করছে। সে সব দেখছে, অথচ তাকে কেউ দেখতে পেল না। সে তাড়াতাড়ি গাছটার নীচে ছুটে গেল। সুপারি তিনটে আঁচলে বেঁধে সে হাঁটছে। সে বৈঠকখানা পার হয়ে ঠাকুরবাড়ির ভিতরে ঢুকে গেল। ডাক দিল—বড়মামি আছেন নাকি? বলতে বলতে সে পাছ দুয়ারে ঢুকে অসুজঘরের সামনে দাঁড়াল। বলল, ধনমামি—একবার মাণিক রে দ্যাখান। মাণিকের

লাইগ্যা কাসিমের ডিম আনছি। বড়মামিকে দেখে বলল, কাসিমের ডিম রাইখ্যা এক টুকরা চাইল দ্যান। চাল পেলে বলল, দুইডা পান নিমু বড়মামি।

—নে গা। গাছতলায় মেলা পান পৈড়া আছে।

জোটন জালগুলো আঁচলে বাঁধল। এবং বড়োঘরের পিছনে ঢুকে আলকুশি লতার কাঁটাঝোপ পার হয়ে একটা শ্যাওড়া গাছের নীচে দাঁড়াল। পানের লতা গাছটাকে জড়িয়ে আছে, সে দু-হাতে যতটা পারল পান কুড়িয়ে নিল, ছিঁড়ে নিল। সে বাড়ির উপর দিয়ে গেল না। সে আলকুশি লতার ঝোপ ভেঙে মাঠে নেমে গেল। জল-কাদা ভেঙে ফের পূবের বাড়ির পুকুরপাড় ধরে ধানখেতের আলে উঠে যাবার সময় দেখল মালতি আকাশ দেখছে। জোটন এবার মালতিকে ফেলে চলে যেতে পারল না। সে একটু হেঁটে এসে মালতির পাশে চুপ করে বসল। ডাকল—মালতি।

মালতি কথা বলল না। মালতি কাঁদল। জোটন মালতির মুখ দেখতে পাচ্ছে না অথচ বুঝল মালতি চোখের জল ফেলছে। জোটন ফের ডাকল, মালতি কান্দিস না। কাইন্দা কী করবি! সব নসিব রে মালতি।

মালতির শরীরে ব্লাউজ নেই। মালতির সন্তান নেই। যে সালে বিলের জলে কুমির আটকা পড়ল সে সালেই মালতির বিয়ে হল। নরেন দাস বিয়েতে খরচ-পত্তর করেছিল। সুতরাং চার সাল হবে মালতি গ্রাম ছেড়ে শহরে গিয়েছিল। ফুটফুটে রাজপুত্রের মতো বর, ছোটোখাট মানুষের চোখদুটো যেন জোটন ইচ্ছা করলে এখনো স্মরণ করতে পারে। বিয়েতে জোটন তিনদিন ধরে গলা পর্যন্ত খেয়েছিল, ঢেকুর তুললে এখনো যেন সে-গন্ধ উঠে আসবে। নরেন দাস নর্সিন্দি থেকে চারটে ডেলাইট এনে ঘরে-বাইরে সকল স্থানে জ্বেলে আলোয় আলোময় করে, নরেন দাস চোখের জল ফেলতে ফেলতে বলেছিল বরের হাত ধরে, মালতির মা নাই, বাপ নাই, তুমি অর সব। নরেন দাস অনেকক্ষণ চৌকিতে পড়ে কেঁদেছিল। সকলে চলে গেল, বাড়ি ফাঁকা ফাঁকা ঠেকল—তবু নরেন দাস দুদিন তক্তপোশ থেকে উঠল না। ছোটো বোনটা এ বাড়িতে যেন প্রজাপতির মতো ছিল। তবু সারাদিন উড়ত, উড়ত। গাছের ছায়ায়, পুকুরের পাড়ে পাড়ে, লটকন গাছের ডালে ডালে মেয়েটা যেন নীলকণ্ঠ পাখি খুঁজে বেড়াত।

জোটন উঠে পড়ল। মেয়েটা শোকে কাঁদছে, কাঁদুক। ওর তিন নম্বর খসমের কথা স্মরণ করতে গিয়ে গলা বেয়ে একটা শোকের ছায়া উঠে আসতে থাকল। বেলা বাড়ছে। পেটে ভয়ানক খিদে। যে চাল আছে জোটনের দু-ওক্ত হয়ে যাবে। সে হাঁটবার সময় গোপাট থেকে কিছু গিমা শাক সংগ্রহ করল। তারপর আবেদালীর ঘর অতিক্রম করে উঠোনে উঠেই তাজ্জব বনে গেল—যে মানুষটা কাল রাতে আসেনি, যে মানুষটার জন্য সে

প্রায় সমস্ত রাত জেগে বসেছিল, সেই মানুষটা ছেঁড়া মাদুরে নামাজের ভঙ্গিতে বসে তফন সেলাই করছে। নীল কাঁথার মতো ঝোলা, মুসকিলাশানের লম্ফ, ভিন্ন ভিন্ন সব তাবিজের মালা, কুঁচ ফলের মালা এবং পুঁতির হাড় এইসব বিচিত্র বস্তুর সমন্বয়ে এখন ফকিরসাব যেন ঘোড়-দৌড়ের পীরের মতো।

জোটন ফকিরসাবকে উদ্দেশ্য করে বলল, সালেমালেকুম !

ফকিরসাব এতক্ষণে জোটনকে দেখতে পেল এবং বলল, ওয়ালেকুম সেলাম।

জ্বালালী ঘরের কোণে ঘোমটা টেনে বসে আছে। জোটনেরও ইচ্ছা হল এ সময় বড়ো ঘোমটা টেনে ছোটো ঘরটায় বসে থাকে। কিন্তু খিদমতের অসুবিধা হবে ভেবেই যেন সরমের জন্য দিল খুলে দিতে পারল না। সে জ্বালালীর ঘরে ঢুকে বলল, মানুষটা খাইব, কী যে খাওয়ামু!

জোটনের এই গোপনীয় কথা ফকিরসাব শুনতে পেলেন।—আমার জন্য ভাইবেন না। দুইডা শাক ভাত কৈরা দ্যান। দেখেন নিশ্চিন্তে ক্যামনে খাইয়া উডি।

জোটন বলল, জ্বালালী দুইডা পুডির শুঁটকী দ্যা।

জোটন রান্নার জন্য সোলার-পারা থেকে এক আঁটি সোলা নামিয়ে আনল। ঘরের পিছনে সোলাগুলোকে মড়মড় করে ভাঙল এবং ভাঁজ করে ঢুকতে গিয়ে দেখল—ফকিরসাব এখনো তফনে তালি মারছেন বসে, বেড়ার ফাঁক দিয়ে জোটন ফকিরসাবের প্রশস্ত বুক এবং কবজি দেখে—গতরে খোদার মাশুল উশুল হতে বেশি সময় নেবে না—সুতরাং, সুখী মনে জোটন রান্না করতে বসল। দু-সাল হল গতর বেশরমভাবে প্রায় রাতে বেইমানী করতে চাইছে। রাতে যতবার এমন হত জোটন ছেঁড়া মাদুরে বসে আল্লাকে স্মরণ করে গতরের এইসব বেওয়ারিশ ইচ্ছাকে তাড়াতে চাইত। দুষ্ঠ-দুবার তালাক পেয়ে জোটন যেন বুঝতে শিখেছে ওর শরীরের খাক মেটাবার শক্তি পুরুষদুটোর ছিল না—সুতরাং তালাক দিল—বলল, ইবলিশের গতর কেবল খাই-খাই। সে ফের উনুনে কিছু সোলা গুঁজে দিল এবং ফকিরসাবের শরীর দেখল বেড়ার ফাঁক দিয়ে। সমস্ত চালটাই সে রান্না করছে। দুজনের মতো ভাত। সে শুঁটকি মাছ দুটোকে আগুনে পুড়িয়ে নিচ্ছে, সে অনেকগুলো লাল চাঁটগাই লঙ্কা বেটে নিচ্ছে পাথরে, বড়ো বড়ো দুটো পেঁয়াজ কেটে শুঁটকি দুটোকে মড়-মড় করে সানকির এক পাশে গুঁড়ো করে রাখল তারপর লঙ্কা, পেঁয়াজ, নুন এবং শুঁটকির ভর্তা বানাতে গিয়ে জিভে জল এল। এখন সে ইচ্ছা করলে দুজনের ভাত যেন একা খেয়ে নিতে পারে। কিন্তু বাড়িতে মেহমান—সে তার ক্ষুধাকে নিবৃত্ত করল কিছুক্ষণের জন্য। ভাতের ফ্যানা টগবগ করে ফুটছে। সোঁদা সোঁদা গন্ধ ভাতের। সে ফ্যানটা গেলে একটা সানকিতে যত্ন করে রাখল, নুন মেশাল—সবটা ফ্যান পিছন ফিরে চুকচুক করে গিলতে

থাকল—আহাঃ। এতক্ষণে যেন চোখ তার দৃশ্যমান বস্তুগুলোকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে, ফকিরসাবকে পিরের মতো মনে হল—দরগার পির এই ফকির সাহেব। জোটন নিজের শরীরের দিকে নজর দিয়ে বুঝল, এ শরীরও ভয়ানক শক্ত সমর্থ। ফকিরসাবকে কাবু করতে খুব একটা আদা নুন লাগবে না। জোটন মনে মনে হাসল। বেড়ার ফাঁক দিয়ে ডাকল, ফকিরসাব সান করতে যান। আমার খানা পাকান হৈয়া গ্যাছে।

ফকিরসাব সব তল্পিতল্পা সঙ্গে নিয়েই ঘাটে গেল, এমনকি মুশকিলাশানের আধারটাও। জোটন এই ঘরে বসে কাকের শব্দ পেল, আকাশে রোদ, গাছে এবং শাখা-প্রশাখায় রোদ। জাফরি রঙের ছায়া ঘরের পিছনে। বেত ঝোপে বোলতার চাক—নীচে বোন্নাগাছের ঘন জঙ্গল, ফকিরসাব হাসিমদের পুকুরে স্নান করতে গেছে। জোটনবিবি গাজির গীত ধরল গুন-গুন করে। জোটনবিবির স্বপ্ন জাগছে চোখে, বেত ঝোপে বেথুনের মতো এই স্বপ্ন কবে টস-টস করে পাকবে... জোটন রঙের ছবি ভাবতে পারছে না—স্বপ্নটা গাজির গীতে গায়ানদারের হাতের ছড়ি যেন, চাঁদের মতো মুখ করে চ্যাপটা নাকে চোখে জোটনের সকল সুখকে দ্যাখতাছে।

জোটন তাড়াতাড়ি পাশের একটা গর্ত থেকে ডুব দিয়ে এল। চুলের জল ঝেড়ে ডুরে শাড়ি পরে ভাঙা আয়নায় নিজের সুন্দর মুখটি দেখল, উজ্জ্বল দাঁতের পাটি দেখে রাতে পিরের দরগার সুখের হীরামন পাখির কথা মনে করে কেমন বিহ্বল হতে থাকল। ফকিরসাহেব ছেঁড়া মাদুরে বেশ পরিপাটি করে খেতে বসলেন। ভিজে লুঙ্গি সিম লতার মাচানে শুকোচ্ছে। তিনি খেতে বসে দুবার আল্লা উচ্চারণ করে আকাশ দেখলেন—আকাশ পরিষ্কার, বড় তকতকে এই উঠোনে ঝকঝকে আকাশের নীচে বসে গবগব খেতে পারলেন না। যেমন পরিপাটি করে বসছেন তেমনি ধীরে-সুস্থে এক সানকি মোটা ভাত শুঁটকির ভর্তা দিয়ে কিঞ্চিৎ মেখে মেখে বেশ তারিয়ে তারিয়ে খেতে থাকলেন। নীচে দুটো-একটা ভাত পড়ছে—তিনি আঙুলের ডগায় তুলে সন্তর্পণে মুখে ঢুকিয়ে দিচ্ছেন, যেন এই মোটা ভাত ফুরিয়ে গেলে আর পাওয়া যাবে না—আল্লার বড়ো অমূল্য ধন। সানকির ভাতটা শেষ, করতেই দেখলেন, জোটন আর এক সানকি ভাত এনে সামনে রেখেছে। তিনি সে ভাতটাও পরিপাটি করে শেষ করলেন। এবং ভাতের অপেক্ষায় ফের বসে থাকলেন। সহসা আবিষ্কারের ভঙ্গিতে তিনি মাদুরের এবং সানকির সংলগ্ন ভাতটিও আঙুলের চাপে তুলে মুখে দিয়ে বসে থাকলেন। নামাজের ভঙ্গিতে এই বসে থাকা ভাবটুকু ফকিরসাবের বড়ো আরামদায়ক। এইসব জোটন ঘরের ভিতর থেকে লক্ষ করে সরমে মরে যাচ্ছে। সে হাঁড়ির ভিতর হাত দিল। শেষ দুমুঠো ভাত সানকিতে তুলে শেষ ভর্তাটুকু তার কিনারে রেখে মাদুরের উপর রেখে দিল। ফকিরসাব বললেন, বস হৈব। ইবারে আপনে গিয়া খান।

জোটন ঘরের এক কোণায় বসে থাকল। ওর মাথাটা ঘুরছে। সে খুঁটিতে হেলান দিল। কোমর থেকে ডুরে শাড়িটা খসে পড়ছে। আবেদালি নেই, জববর নেই, থাকতে বলত— আমার ঘরটা বন্ধক রাইখ্যা এক প্যাট ভাত দ্যা। সে ক্ষুধার যন্ত্রণায় থাকতে না পেরে গিমা শাকগুলো সিদ্ধ করল এবং খেল। সে কিছু অকালপক্ক বেথুন এনে খেল। এ সময় উঠোনে গাছের ছায়া দীর্ঘতর হচ্ছে। কাক-শালিকেরা প্রায় সকলে ডালে, ঝোপ-জঙ্গলে যেন ঝিমোচ্ছে। ফকিরসাব ছেঁড়া মাদুরে পড়ে ঘুমোচ্ছেন। জোটন আর বসে থাকতে পারল না। শরীরের জড়তায় সে ডুরে শাড়ির আঁচল পেতে মেঝের উপর পেট রেখে ঘুমিয়ে পড়ল।

বিকেলবেলাতে যখন উঠোনের উপর দিয়ে পাখিরা ডেকে গেল, যখন সাত-ভাই-চম্পা পাখিরা লাউ মাচানের নীচে কিচ-কিচ করল অথবা ধানের আঁটি নিয়ে কামলারা সড়কের উপর কদম দিচ্ছে তখন জোটন ক্লান্ত এবং উদ্বিগ্ন শরীরটাকে টেনে টেনে তুলল। ফকিরসাহেব হুকা খাচ্ছেন বসে। সব পোটলা-পুঁটলি যত্ন করে বাঁধা, যেন তিনি এখন উঠবেন, শুধু হুকা খাওয়াটা বাকি। জোটন এবার থাকতে পারল না। ঘর থেকেই বলল, ফকিরসাব আমারে লৈয়া যাইবেন না।

ফকিরসাব ঝোলাঝুলি কাঁধে নিতে নিতে বললেন, আইজ না। অন্যদিন হৈব। কোরবান শেখের সিন্নিতে যামু। কবে ফিরমু ঠিক নাই। উঠোন থেকে নেমে যাওয়ার সময় দরজার ফাঁকে জোটনের শীর্ণ মুখে দুঃসহ ব্যথার চিহ্ন ধরতে পেরে উচ্চারণ করলেন—আল্লা রসুল, আহা এই ইচ্ছার সংসারে আমরা কতদূর যাব, আর কতদূর যেতে পারি ; ফকিরসাহেব ওইমতো চিন্তা করলেন। তিনি হাঁটতে হাঁটতে ধরতে পারলেন, জোটনের চোখদুটো এখনো ওকে অনুসরণ করছে অথবা যেন জোটন দেখল হাঁসের পালক মালতির শরীরে— ইচ্ছার জল সব গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ছে অথবা পিরের শরীর গাজির গীতের গায়ানদারের লাঠি য্যান... হাঁটতাছে....হাঁটতাছে, চাঁদের মতো মুখ করে চ্যাপটা চ্যাপটা নাকে চোখে জোটনের সকল দুঃখকে দ্যাখতাছে। জোটন এবার ডুকরে কেঁদে উঠল—আল্লারে, তর দুনিয়ায় আমার লাইগ্যা কেয় বুজি নাইরে।

শত্রুপক্ষ

সকালেই অরূপার গলা পাওয়া গেল।

সে কী যেন বলছে। বেশ জোরে জোরে। কিছুটা তিরস্কারের ঝাঁঝ আছে কথায়।

সাধারণত এত সকালে কেউ বাড়িতে জোরে কথা বলে না। তিরস্কার তো নয়ই। জোরে কেউ কথা বললেই সে রেগে যায়।

তার তো বাড়িতেও থাকার কথা না। স্কুলে চলে যাওয়ার কথা।

আজ স্কুলে গেল না কেন তাও বুঝতে পারছি না।

সকাল আটটার আগে আমার সাধারণত ঘুম ভাঙে না। শীতের সকাল দেখতে না দেখতে বেলা হয়ে যায়। অরূপার মর্নিং স্কুল। কখন সে স্কুলে বের হয়ে যায় টেরও পাই না। কারণ নিঃশব্দে অরূপা সিঁড়ি ধরে নামে। চা করে এবং খায়। তার এই সকালে বের হয়ে যাওয়ার দরুন কারও বিন্দুমাত্র অসুবিধে হয়, কিংবা ঘুম ভেঙে যাক, সে চায় না। অরূপার সহজে স্কুল কামাইও করে না। শরীর খারাপ হলে সে আগেই জানিয়ে দেয়, জ্বরজ্বালা যাই হোক না, স্কুলে যে সে যাচ্ছে না জানতে আমার অসুবিধে হয় না।

সে ইংরেজির শিক্ষিকা। সে মনে করে ছাত্রীদের সম্পর্কে তার আলাদা একটা দায় আছে।

এমনিতেই স্কুলে ইংরেজি পড়ানো নিয়ে সরকার যেভাবে বিরূপ হয়ে উঠছে এবং সরকার যেভাবে স্কুল থেকে ধীরে ধীরে ইংরেজি তুলে দেবার তালে আছে তাতে সে ক্ষুব্ধ। গোড়াতে ইংরেজি পড়িয়ে যাদের শেষ পর্যন্ত কিছু হয় না, ক্লাস সিক্স থেকে ইংরেজি পড়িয়ে তাদের কতটা উপকার হবে অরূপা বুঝতে পারে না।

অরূপার এখন শত্রুপক্ষ, সরকার।

ইংরেজি তুলে দেওয়ার বিষয় ছাড়া তার যেন আর কোনও অভিযোগ নেই।

আবার অরূপার গলা পাওয়া গেল।

শত্রু, সব শত্রু।

আমি সব শুনতে পাচ্ছি।

কে শত্রু? সরকার, না আমি, ঠিক বুঝতে পারছি না। রেগে গেলে তার মুখে এক কথা, জানা আছে—সবাই একরকম। তুমি সাধু সেঝে কাঁহাতক আর জ্বালাবে।

সংসারে এমনই বুঝি হয়। অরূপার মান-অভিমান বোঝাও ভার। কেন যে হঠাৎ হঠাৎ বিরূপ হয়ে যায় তাও বুঝি না।

আজ এমন শত্রুপক্ষকে নিয়ে পড়েছে, যে স্কুল পর্যন্ত কামাই করতে বাধ্য হয়েছে। কাজের মেয়েটিকে বলছে, দ্যাখ তো এবার এল কিনা।

না, আর শুয়ে থাকা নিরাপদ নয়। সামান্য জটিলতা থেকে কীভাবে যে দক্ষযজ্ঞ শুরু হয়, এবং একমাত্র আসামি বলতে এই মহাপুরুষটি, ঠিক অভিযোগের অজুহাত শেষ পর্যন্ত আমার উপরই বর্তাবে।

বললেই হল, তুমি শুয়ে থাকতে পারলে! বাড়িতে কত বড়ো সর্বনাশ, আর তুমি শুয়ে শুয়ে মজা উপভোগ করছ, তুমি মানুষ না অপদেবতা!

কাজের মেয়েটি বোধহয় অরূপার কথায় বিশেষ গুরুত্ব দেয়নি, তা যে কোনও কারণেই হোক অরূপা চেঁচাচ্ছে, তোকে কী বললাম, কাকটা আবার এল কিনা দ্যাখ।

না, মারাত্মক কিছু নয়। সামান্য একটা কাক। আজ তবে একটা কাক নিয়ে অরূপা দুশ্চিন্তায় ভুগছে, স্কুলে ইংরেজি পড়ানো নিয়ে নয়।

আড়মোড়া ভেঙে লেপ-টেপ সরিয়ে উঠে পড়লাম। ডাকলাম, এই লক্ষ্মী, লক্ষ্মী— চা দে।

ঘুম থেকে উঠে আমার এক কাপ চা চাই। চা না হলে শরীরের জড়তা কাটে না। শুতে শুতে রাত বারোটা হয়ে যায়। পড়াশোনার বাতিক থাকলে যা হয়। এখন বদ অভ্যাসটি এমন হয়েছে যে একটু সকাল সকাল শুলে রাত একটা দুটোর আগে ঘুম আসে না।

কিন্তু কারও কোনও সাড়া পেলাম না।

খাট থেকে নেমে চটিতে পা গলাতে গেলাম।

নীচে সাড়া নেই কেন, এমন তো হয় না!

শালটা গায়ে জড়িয়ে বেশ জোরেই হাঁকলাম, আমার চা, চায়ের কী হল?

নীচ থেকে ঝাঁজের গলা, রাখো তোমার চা, এই লক্ষ্মী, খবরদার চা-ফা এখন হবে না। তোর কাজ তুই কর—যা গাছটার নীচে দাঁড়িয়ে থাক। এলেই ঢিল ছুঁড়ে মারবি—শেষের কথাটা আমাকে না কাকটাকে উদ্দেশ্য করে বুঝতে পারলাম না।

বাড়িটার কথা এবারে বলা যাক।

বাড়িটা আমার দোতলা। উপরতলায় থাকি। নীচে বসার ঘর, ডাইনিং হল, কিচেন, সামনের খোলা বারান্দায় একটি বোগে ভেলিয়ার গাছ ঢাউস একটি টবে ডালপালা মেলে অজস্র ফুল নিয়ে ফুটে আছে। আমার পড়ার বাতিক, আর অরূপার গাছ লাগাবার বাতিক। আপাতত এই সকালে আমি উপরে, ও নীচে।

মানুষ নানারকমের দুশ্চিন্তা নিয়ে বাস করতে এমনিতেই একটু বেশি ভালোবাসে। দুশ্চিন্তা না থাকলে মানুষের বেঁচেও সুখ নেই। তাও সামান্য একটা কাক, সাতসকালে কাকটা এমন কী উপদ্রব শুরু করল যে অরূপার এত মাথা গরম!

আর অরূপা এও জানে সকালে ঘুম থেকে উঠে হাতের কাছে চা না পেলে মেজাজ গরম হয়ে যায়। অথচ কারও সাড়া নেই—কী করছে ওরা?

খেপে গিয়ে বললাম, কাকটা কি তোমার মাথার চুল ঠুকরে তুলে নিচ্ছে। কোনও সাড়া নেই।

চুল ঠুকরে তুলে নিলেই দেখছে কে। মরেছি কি বেঁচে আছি, তাও কি কেউ দ্যাখে। এ বাড়িতে কারও তো কুটো গাছটি নেড়ে দেখার অভ্যাস নেই। মুখে মারিতং জগৎ— কখন থেকে শুধু চা আর চা করছে। নীচে এসে দ্যাখ, শুধু হুকুম করে খালাস। এমন লক্ষ্মীছাড়া বাড়ি—কাকটাও টের পেয়েছে।

এরপর আর উপরে চায়ের আশায় বসে থাকা ঠিক না। নিশ্চয়ই বাড়িতে কাকটার উপদ্রবে সবাই তটস্থ। চাদরটা ভালো করে জড়িয়ে নীচে নামতেই হল,—নীচে ঠান্ডা একটু বেশি।

নীচের করিডোরে উঁকি দিলাম। কাউকে দেখা যাচ্ছে না। ডাইনিং স্পেস পার হয়ে খোলা বারান্দায় চোখ গেল—দেখি অরূপার হাতে একটা লম্বা ঝুল ঝাড়ার বাঁশ—রণ-রঙ্গিনী চেহারা।

লক্ষ্মী ধারে কাছে কোথাও নেই।

হলটা কী তোমাদের। সক্কালবেলায় শেষে একটা কাকের পেছনে লেগেছ!

লাগব না! গাছটাকে কী করেছে দ্যাখো।

খোলা বারান্দার টবের সেই বোগেনভেলিয়া গাছটা—শহরের বাড়ি-ঘরে যা হয়, জায়গা কম, অথচ ইচ্ছে অনেক—যেখানে যতটুকু ফাঁকা জায়গা, নানা গাছ আর ক্যাকটাসে ভর্তি। টবটায় বোগেনভেলিয়ার ঝোপ—শীত বসন্তে যেন ফুলের দ্যাখরে বাহার। তবে বছর দুই-তিন আগে গাছটা তেমন ফুল দিচ্ছিল না। গাছ বুড়ো হলে এমনই হয় বলেছিলাম।

আমার দিকে তাকিয়ে অরূপা শুধু বলেছিল, তোমার মুণ্ড হয়।

বুঝতে পারলাম অরূপা আমার সিদ্ধান্ত মানতে রাজি না।

সে সার এনে গুঁড়ি খুঁড়ে এবং গত বর্ষার কিছুটা ডালপালা ছেঁটে গাছটাকে আবার সতেজ করে তুলেছে। এটা যে বুড়ো গাছ বোঝাই যায় না এখন। ফুলও এসেছে ঝেঁপে। গোটা বারান্দা এবং বাড়ির আলাদা সৌন্দর্য গড়ে তুলেছে গাছটা। বাড়িটার কথা কারও মনে থাকলেও, একবার দেখলে গাছটার কথা কেউ ভুলতে পারে না। গেরস্থের রুচিবোধের প্রশংসা করতেই হয়।

যেন এই বোগেনভেলিয়া গাছটা বাড়ির প্রাণ। আর কারও কাছে না হলেও, অরূপার বুঝতে কষ্ট হয় না।

এটা অরূপার স্বভাব। যেখানে যেটুকু ফাঁকা জায়গা সেখানেই ফুলের গাছ। পেছনের খালি জায়গায় রজনিগন্ধা, গন্ধরাজ, কাঠমালতী ফুলের গাছও লাগিয়েছে অরূপা। কামিনী ফুলের গাছটা লাগাবার সময় না বলে পারিনি—তুমি কি পাগল! কামিনী ফুলের গাছ কত বড়ো হয় জানো?

সঙ্গে সঙ্গে গলায় ঝাঁজ—সরো তো, কাজের নামে অষ্টরম্ভা, কেবল পেছনে লাগা। আমাকে তুমি শেখাতে এস না।

তা অবশ্য ঠিক, সে জানতেই পারে, কারণ বি. টি কলেজের একটা কামিনী ফুলের গাছের নীচেই অরূপার সঙ্গে প্রথম আলাপ আমরা তখন বিটি ট্রেনিং, কলেজের আলাদা ছাত্রাবাসে থাকি। একসঙ্গে কমিউনিটি ডাইনিং হলে খাই, ক্লাস করি একই হলঘরে। ডাইনিং হলে যেতে, ক্লাসরুমে যেতে, এমনকি ক্যান্টিনের রাস্তায় যেতেও গাছটা পড়ে। গাছ কত বড়ো হয়, আমাদের সংসারই তার প্রমাণ। গাছ কত বড়ো হয় বলা বোধহয় খুবই অনুচিত কাজ হয়েছে।

আসলে গাছটার নীচে দাঁড়িয়েই সে ডেকেছিল—এই যে শুনুন।

আমাকে না অন্য কাউকে, বুঝতে পারিনি। তবু ঘাড় ফিরিয়ে দেখতে গেলে হাতের ইশারায় ডেকেছিল, শুনুন না।

মাসখানেক হল ছাত্রাবাসে তখন আমরা আছি। একজন সুন্দরী যুবতী ডাকলে এমন কোন মহাপুরুষ আছে যে সাড়া না দিয়ে থাকতে পারে! আমিও পারিনি। যতদিন যতবার সে আমার খোঁজ করেছে, ততবারই দেখেছি, সে দাঁড়িয়ে আছে কামিনী ফুলগাছটার নীচে। বর্ষা আসতে না আসতেই টের পেলাম, গাছটা আর একা নেই, ডালপালা ঝাঁকিয়ে অজস্র রেণুর মতো সাদা ফুলে ছেয়ে গেছে। ফুলের সুঘ্রাণে চারপাশটা ম-ম করছে।

অবশ্য সেসব কবেকার কথা—বিশ-বাইশ বছর আগেকার স্মৃতি। অরূপা আর কামিনী ফুলের গাছটা কেন যে আমার স্মৃতিতে এখনও সমার্থক হয়ে আছে বুঝতে পারি না।

সে যাই হোক বাড়িটা করার পর যেখানে যেটুকু ফাঁকা জায়গা ছিল সব শান বাঁধানো হয়ে যেতেই অরূপা ক্ষেপে গেল—এটা কী করলে! একটু মাটি নেই।

চারপাশের পাঁচিল আগেই তোলা হয়ে গেছে। চারকাঠা জমি, জমির এদিক ওদিক কিছু ফাঁকা জায়গা রাখলে যেন ভালোই হত। গৃহপ্রবেশের দিনই অরূপা বলল, বাড়িতে না থাকলে এমনই হবে জানতাম। আমার মতামতের কোনও দাম নেই।

তারপরেই অভিযোগ, একটু মাটি রাখলে না, ফুল ফলের গাছ না লাগালে বাড়িটা কখনও বাড়ি মনে হয়!

কথাটা মিছে না। কিন্তু অরূপা বোঝে না—আগাছা সাফ করার লোক শহরে কম। বৃষ্টিবাদলার দিনে এত বুনো ঘাস জন্মায় যে সাফ করে কুল করা যায় না। পোকামাকড়ের উৎপাতও থাকে। এসব আছে বলেই তিনকাঠা জমিতে বাড়ি করে বাকি ফাঁকা জায়গা ইট সিমেন্ট দিয়ে বাঁধিয়ে ফেলেছি। অরূপার আগ্রহও বজায় থাকবে, তাকে বলেছিলাম, তোমার জন্য সুন্দর সব টব বানিয়ে দেব। যত পার ফুলের গাছ লাগিও। এবং অরূপার ইচ্ছেতেই বারান্দায় বিশাল ঢাউস টব, পেছনেও আছে ফুলের টব। এবং অরূপার ইচ্ছেতেই মাটি ফেলে কিছুটা জায়গা করে দেওয়া হল—কোথাও সে মরসুমি ফুলের চাষ পর্যন্ত করেছে।

কিন্তু বারান্দা এবং পেছনের ঢাউস দুটো টব তাকে যথেষ্ট নাড়া দিয়েছে। কী লাগানো যায়! অর্থাৎ এমন গাছ লাগাতে হবে—যাতে বাড়ির সৌন্দর্য বাড়ে অথচ গাছের ডালপালায় বাড়িটা না ঢেকে যায়।

এরপর বারান্দার ঢাউস টবটায় সে কোথা থেকে সব ক্যাকটাস এনে লাগাতে থাকল। ক্যাকটাসগুলোর কপাল খারাপ—বছরখানেক যেতে না যেতেই অরূপার কেন যে মনে হয়েছিল, এমন সুন্দর ছিমছাম বাড়িটায় ক্যাকটাস বেমানান। এটা তার আরও মনে হয়েছিল চন্দননগরে আমার কাকার বাড়ি গিয়ে। বাড়িটা ঘুরে দেখল, বোঝাই যায় তিনি খুবই শৌখিন মানুষ, তাঁকে তার নিজের বাড়িটা না দেখালেই নয়, এবং তিনি এসে বললেন, খোলা বারান্দার টবে ক্যাকটাস কেন? বাড়ির সামনে ক্যাকটাস লাগাতে নেই। বরং এখানে একটা বোগেনভেলিয়া লাগিয়ে দাও। ফুল ফুটলে বাড়িটার এক আশ্চর্য আকর্ষণ তৈরি হয়।

বোগেনভেলিয়া লাগাবার সময় তার সতর্কতা ছিল প্রখর। অবশ্য শুধু বোগেনভেলিয়া কেন, সব ব্যাপারেই। ভালোবেসে একজন বেকার মানুষকে বিয়ে করার পর থেকে সে চারপাশের কীটপতঙ্গ সম্পর্কে বড়ো সজাগ ছিল। সজাগ ছিল বলেই আমার বাড়ি হয়েছে, কৃতী মানুষ হয়েছি—ছেলেরা জয়েন্ট দিয়ে কৃতী হবার মুখে।

নার্সিংহোম থেকে বের হচ্ছি, সবই অবশ্য কবেকার কথা, বৃষ্টি পড়ছিল, অরূপা ডাকল, এই যে শোনো—সেই গলা যেন, সেই কামিনী ফুলের গাছটার নীচে সে আমায় যেভাবে ডাকত। কোলে তার নবজাতক, মহীয়সীর মতো তাকে কোলে নিয়ে বসে আছে।

চলে যাচ্ছ, পাজিটা যা জ্বালায়! বললে না তো কী রকম হয়েছে দেখতে!

ভালোই তো! বেশ সুন্দর!

চলে আসছি, ফের ডাকল, এই যে শোনো।

বলো।

এতদিন ছিল অরূপা, এখন একেবারে রাজমহিষী।

অর্ডার—

যাবার সময় রথের মেলা থেকে একটা কামিনী ফুলের গাছ নিয়ে যাবে।

গাছ!

হ্যাঁ চারাগাছ। বলেই আমার কোলে তুলে দিয়ে বলল, একটু আদর কর না। লজ্জা এবং সঙ্কোচ দুই তখন আমাকে কাতর করেছে। কী যে করি!

কামিনী ফুলের গাছটা না থাকলে, তার ফুল না ফুটলে, তার সুঘ্রাণ না ছড়ালে সে আমরা কেউ কাউকে চিনতামই না।

গাছটা লাগানো খুবই জরুরি।

কোথায় লাগাব?

আমি যাই। দুজনে লাগাব। অরূপার দুচোখ দুষ্টুমিতে ভরা।

কপর্দকশূন্য অবস্থা থেকে দুজনের মিলিত সংগ্রামে বিশ-বাইশ বছরে এতদূরে আসা কম মানুষের সৌভাগ্যেই ঘটে। এসবের জন্য সব কৃতিত্বই অরূপার প্রাপ্য। বাড়ির গাছপালা সম্পর্কে যেমন সজাগ, ছেলেদের সম্পর্কেও তেমনি। আসলে অরূপা বোধহয় ভেবেছে, জীবনটাই ফুলের বাগান। তার জন্য জল চাই, সার চাই, আগাছা বেছে দিতে হয়। এই আন্তরিকতাই আজ আবার তাকে নতুন একটা বিপাকের মুখে ফেলে দিয়েছে। সেটি একটি সামান্য কাক।

আরে ছুটছ কেন, পড়ে যাবে তো। ঝুলঝাড়ার বাঁশ নিয়ে ছুটতে গেলে আমার এমনই মনে হল।

সঙ্গে সঙ্গে গলায় ঝাঁজ—সরো, সরো, সব শত্রু, শত্রু শত্রু। এই তো বড়োটা হোস্টেলে গেছেন—ইঞ্জিনিয়ারিং আর কেউ পড়ে না। বাড়ির কথা কারও মনে থাকে না। একটা চিঠি

পর্যন্ত নেই, বাড়ির কারও হুঁশ আছে।

আরে গেছে, চিঠি দেবে। পোস্টঅফিসেরও তো গণ্ডগোল হতে পারে। ছেলেমানুষ।

বাড়ির সবাই ছেলেমানুষ? আমার হয়েছে মরণ—

কাকটা কোথায় জানি না। কথার সোজা জবাব দিচ্ছে না। বাঁকা-ত্যাড়া জবাব—রাগ হয় না! সক্কাল বেলা, এক কাপ চা পর্যন্ত নেই। লক্ষ্মী কলপাড়ে—কী করছে সেখানে?

যাই হোক কিছুটা বেহায়ার মতোই বললাম, কাকটা কোথায়? কী ক্ষতি করছে তোমার?

আমার মাথা চিবোচ্ছে! তোমার তাতে জল ঢালতে হবে না।

ঝুলঝাড়ার বাঁশটা হাতে নিয়ে অরূপা খোলা বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে। চোখে জ্বালা। যেন কাকটা এসে কখন বোগেনভেলিয়া গাছটায় বসবে এবং সে তাকে আড়াল থেকে মারবে সেই অপেক্ষায় আছে। এতক্ষণে লক্ষ্মী আমার হাতে চায়ের কাপ ধরিয়ে দিয়ে গেছে—এমনকী আমি যে তার পাশে দাঁড়িয়ে চা খাচ্ছি তাও খেয়াল নেই। আমিও অরূপার এধরনের ছেলেমানুষি ক্ষোভে মজা পাই—পৃথিবীতে সবকিছু এত অনিত্য অথচ তার মধ্যে অরূপার হাবভাব যেন, বাড়িটা থেকে সে কোনওদিনই নড়বে না, তার একই রকম বয়স থাকবে। একই দুর্ভাবনা থাকবে। একই আন্তরিকতা থাকবে—পৃথিবীতে মেয়েরা বোধহয় সব কিছু এতটা চিরস্থায়ীভাবে বলেই সামান্য একটু এদিক ওদিকেই তারা সহজে ভেঙে পড়ে।

যাই হোক আমি বললাম, কাকটা কী ক্ষতি করেছে তোমার?

কী আবার করবে! কাল সারাদিন গাছটায় এসে ঝাপটাচ্ছে। গাছটার কী কালশত্রু রে বাবা!

ঝাপটালে ক্ষতির কী?

ক্ষতি! আমার মুণ্ড। এই লক্ষ্মী, শিগগির ওদিকে যা।

পাঁচিলটার পাশে গিয়ে কামিনী ফুল গাছটার আড়ালে বসে পড়।

তা হলে কাকের প্রতিপক্ষ এখন দুজন। দুজন দু'দিক থেকে কাকটাকে জব্দ করবে বলে বসে আছে। আমি তৃতীয় পক্ষ হতে চাইলে গলায় আবার ঝাঁজ।—তোমাকে দিয়ে হলেই হয়েছে!

কেন হবে না?

তোমাকে দেখলে কাকটা আরও বেশি মজা পাবে।

কেন মজা পাবে!

পুরুষমানুষের নির্বুদ্ধিতা ওরা ঠিকই টের পায়।

তার মানে?

মানে আর কী? অতশত বলতে পারব না।

কাকটা কি মেয়ে কাক?

তবে আর বলছি কী!

কী করে বুঝলে?

বা রে, বুঝব না! কাল থেকে গাছটায় ঝাপটাচ্ছে আর যাবার সময় ঠোঁটে ডাল নিয়ে উড়ে যাচ্ছে।

ডাল নিয়ে উড়ে যাবে কেন? কাকটার কি শত্রুতা আছে তোমার সঙ্গে?

কী জানি, কার কী শত্রুতা কখন কীভাবে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে, আমি কী করে বুঝব!

আর সেই সময় ঠিক উড়ে এল কাকটা। উড়ে এসে বসল পাশের বাড়ির কার্নিশে। গাছটার সঙ্গে তবে সত্যি শত্রুতা আছে কাকটার। গাছটাকে প্রায় ন্যাড়া করে দিয়েছে। আরও অবাক, কিছু বোঝার আগেই গাছটা থেকে ছোঁ মেরে একটা ডাল মুখে নিয়ে উড়ে চলে গেল। দুজন প্রতিপক্ষ ঠায় দাঁড়িয়ে। কিছুই করার বিন্দুমাত্র সময় পেল না।

কাকটা উড়ে যাচ্ছে। ডালের সর্বত্র লাল সাদা ফুল। হালকা সরু তারের মতো ফুলের ডাল—বড়ো হালকা, সহজেই মট করে ভেঙে নেওয়া যায়।

অরূপা আর অপরূপা থাকল না। সেই এক অরূপা হয়ে গেল। হা-হা করে উঠল—দেখলে তো! দাঁড়িয়ে তামাশা দেখছ, একবার তেড়ে গেলে না!

আমি বললাম, অরূপা বুঝছ না কাকটা বাসা বানাবে। নিতে দাও না।

বাসা!

হ্যাঁ তাই। মাঘ-ফাল্গুন মাসে এরা বোধহয় গর্ভবতী হয়।

তাই বলে আমার অমন সুন্দর গাছটাকে ন্যাড়া করে দেবে! ফুলের ডাল নিয়ে উড়ে যাবে! আর কোথাও কিছু পেল না।

সবাই তো সুন্দর ফুলের ডালপাতা দিয়ে বাড়িঘর সাজাতে চায়। কাকটার দোষ কোথায়?

অরূপা ক্ষিপ্ত হয়ে বলল, কাকের আবার সুন্দর অসুন্দর কী! তুমিও যেমন। আসুক ফের, দেখাচ্ছি মজা!

তখন কাকটা পাশের বাড়ির নিমগাছটায় বসে আছে। ঠোঁটে ফুলের ডাল। উড়বার জন্য ঘাড় বাঁকিয়ে এদিক ওদিক তাকাচ্ছে। প্রথমে মনে হয়েছিল, নিমগাছের ডালেই বোধহয় বাসা বানাচ্ছে।

অরূপা বলল, তাড়িয়ে দিয়ে এস না। মনে হয় ওই গাছটাতেই থাকে কাকটা। দূরে কোথাও তাড়িয়ে দিলে পথ ভুল করে আসতে পারবে না। যাও না গো!

এমন অনুরোধ উপেক্ষা করি কী করে! নামতে যাব, দেখি কাকটা আবার উড়তে শুরু করেছে। এখন পাঁচিল না টপকালে চলবে না। হাতে ইটের টুকরো—হুস করলেই কাক উড়ে পালায় জানি। আর তখনই দেখি কাকটা ফের উড়তে শুরু করেছে। ঠোঁটে ফুলের ডাল। উড়তে উড়তে পাশের বাড়ির পেয়ারা গাছের ডালে বসে গেল।

অরূপাকে বললাম, কাছে কোথাও কাকটা বাসা বানাচ্ছে। বাসাটা ভেঙে দিতে পারলে কাকটার উচিত শিক্ষা হবে।

অরূপাও বলল, চল তো দেখি। লক্ষ্মীর হাতে এখন ঝুল ঝাড়ার বাঁশ, সেও লাফিয়ে বাড়ির পেছনে ঢুকে গেল।

কিন্তু হাতে একগাদা কাজ। সক্কাল বেলায় একটা কাকের পিছু ধাওয়া করলে, কত দূরে নিয়ে যাবে কে জানে! মনে মনে খুবই বিরক্ত। কিন্তু সংসারের শান্তি বলে কথা, অরূপার অনুরোধ উপেক্ষাও করতে পারছি না। বললাম, আমি দেখছি, ডালটা নিয়ে কোথায় যায়—লক্ষ রাখছি।

এতক্ষণে মনে হল, অরূপা খানিকটা নিশ্চিন্ত হয়েছে। কাকটাকে তাড়িয়ে নিয়ে গেলে কিংবা তার পিছু ধাওয়া করলে এদিকে আসতে আর সাহস পাবে না। চুপিচুপি তাড়া করতে গিয়ে দেখি বাড়ির পেছনে কামিনী ফুলের গাছটায় কাকটা নিশ্চিন্তে উড়ে এসে বসেছে। আর দেখলাম, গাছটার মাথায় পরিপাটি করে সে তার বাসা বানাতে ব্যস্ত। বোগেনভেলিয়ার ডাল দিয়ে সে তার বাসস্থান গড়ে তুলছে। পাশে আর একটা কাক—বাসাটা ভেঙে না দিলে সমূহ বিপদ। এত কাছে বাসা বানাবার উপকরণ থাকতে কাকটা দূরে উড়ে যাবে ভাবাই যায় না। সন্তর্পণে ঘরে ঢুকে ঝুল-ঝাড়ার বাঁশটার খোঁজ করতেই অরূপা বলল, কী ব্যাপার? পেলে?

বললাম, এই লক্ষ্মী, দে তো। পেয়েছি।

অরূপা বলল, কী পেয়েছ?

বাসাটা।

কোথায়?

এতক্ষণে লক্ষ্মী এসে বাঁশটা আমার হাতে তুলে দিয়েছে।

আমি ছুটে বাড়ির পেছনটায় বের হয়ে গেলাম। পেছনে অরূপা কেবল বলছে, কোথায় যাচ্ছ।

আরে, তোমার সেই কামিনী ফুলের গাছটায় কাকটা বাসা বানাচ্ছে। তোমার বাড়িতেই তার সংসার।

অরূপা থমকে গেল। তারপর কী ভেবে সঙ্গ নিল। যেতে যেতে বলল, বাঁশটা আমাকে দাও।

অরূপা চাইতেই পারে। এত জ্বালিয়েছে, তার সাধের ফুলগাছ ন্যাড়া করে দিয়েছে কাকটা—তাকে শায়েস্তা করার অধিকার তারই।

আর কেবল প্রশ্ন, কোথায়, কই দেখছি না তো!

গাছটার নীচে নুয়ে কিছুটা এগিয়ে ডালপালার মধ্যে মাথা গুঁজে কানে কানে বললাম, ওই দ্যাখো গাছের মাথায়।

অরূপা কী দেখল কে জানে! তারপর আমার হাত থেকে ঝুল-ঝাড়ার বাঁশটা কেড়ে নিয়ে ঘরে ঢুকে গেল।

ছোটো পুত্রও তখন নেমে এসেছে, কেবল বলছে, কী হয়েছে বাবা?

আমি বললাম, কিছু না।

শুধু জোরে ডাকলাম, কী হল অরূপা, দাও।

না, এবারেও সাড়া পাওয়া গেল না।

ভিতরে ঢুকে বললাম, দাও। কোথায় রাখলে বাঁশটা!

অরূপা কিছুটা ক্ষোভের গলায় বলল, নিজের কাজ কর গে। ওটা আছে, থাক না। বাড়িতে গাছ থাকবে, পাখি থাকবে না, সে কী করে হয়! বলে মুচকি হেসে সিঁড়ি ধরে সে বাঁশটা নিয়ে উপরে উঠে গেল।

ছোটো পুত্রও সিঁড়ি ধরে মাকে অনুসরণ করছে, আর কেবল বলছে, কী হয়েছে মা—বাঁশটা দিয়ে বাবা কী করবে?

কী করবে তিনিই জানেন। তোমার বাবা তো ওইরকমেরই!

বিপ্রটিকুরী যাত্রা

বিপ্রটিকুরী যাত্রা নিয়ে বাড়ি গরম—সকাল থেকেই কথা বললেই জয়ন্ত চটে যাচ্ছে। বিরক্ত।

আরে বিপ্রটিকুরী কোথায়, কোন স্টেশনে নামতে হবে, সেখান থেকে কোন বাস ধরতে হবে সেসবের বিন্দুবিসর্গ জানা নেই! এরা কী ভাবে! তুই গেছিস, তোর বাবাকে বল দিয়ে যেতে। না, আমায় তিনি যেতে লিখেছেন। মেসোমশাই আমাকে নিয়ে যান। আমি কি বসে আছি। বাড়ির লোকজনও হয়েছে তেমনি! মাসিমা ফোন করেছে ভাগীরথীকে নিয়ে আসতে। মাসিমার সঙ্গে যাবে, আবার চলে আসবে। চলে আসবে যখন আসবে। আমি যেতে পারব না। আমার কি বাড়িতে দাসখত দেওয়া আছে!

ভিতর থেকে জবাব আসছে, মাথা গরম করছ কেন বুঝি না। অফিস থেকে উপরতলার মাসিমাকে ফোন কর না? ফোন করলেই জানতে পারবে। বলে দেবে সব।

—ফোন করেছি। মাসিমা নেই। কবে আসবেন তাও বলেননি। মেয়ে না কার বাড়ি গেছেন। না আমি বুঝি না, তুই গেলি মাসিমার সঙ্গে, চলে এলি না কেন! কোথায় বিপ্রটিকুরী সেখানে যেতে হবে! বাড়ি অচল—বোঝ! বাড়ি থাকলে তো তুই ভাগীরথী এটা করলি না, ওটা করলি না, না তোকে দিয়ে হবে না! হবে না, হবে না করেও তো পাঁচ বছর কাটিয়ে দিলে। দু-এক হপ্তার জন্য গেলে মাথা গরম। এত করে বলি—পেছনে লেগ না, গেলে আর আসবে না। নাও ছোটো বিপ্রটিকুরী।

—ও তো আসতেই চাইছে। ওকে না নিয়ে এলে আসবে কী করে! তোমার কথাবার্তা শুনে তো মনে হয় বিপ্রটিকুরী এ গ্রহের নয়। অন্য কোনো গ্রহে। বাড়ি অফিস করলে এই হয়। কোথাও যাবার কথা হলেই মাথায় বাজ পড়ে। মাসিমা তো একবার বলেছিল, বিপ্রটিকুরী যেতে হলে বোলপুরে নামতে হয়। সেখান থেকে বাসে। বোলপুর গেলেই খবর পেয়ে যাবে।

জয়ন্ত অফিস বের হবার মুখে জুতোর ফিতে বাঁধছিল। সে রা করছে না। সত্যি একটা আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছে তার মধ্যে বিপ্রটিকুরীর নামে। বাড়িতে আর কেউ নেই যে যাবে।

বড়োছেলে চাকরি নিয়ে বাইরে। ছোটোমেয়ের পরীক্ষা—যেন পরীক্ষা না থাকলে মাধুই যেত ভাগীরথীকে আনতে। তুমি পুরুষমানুষ পার না, দেখ আমি মেয়ে হয়ে পারি কি না।

জয়ন্ত ভেবে দেখল, অশান্তি করে আর লাভ নেই। সময়ে চা, সময়ে জলখাবার, চানের গরম জল। পাঁচ-সাত বছর থেকে ভাগীরথী সংসারে কার কী দরকার সব এত জানে যে রাগ করে ছেড়ে দিলেই আর এক ফাঁপরে। ভাগীরথী মতিলালের মাসির সঙ্গে ফিরে না আসায় ধরেই নিয়েছিল ওর বাবা বিয়ের ব্যবস্থা করছে। মেয়েটি বড়ো ঠান্ডা মেজাজের। কথা কম বলে, এত কালো যে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকলেও তাকে দেখা যায়। কালোর মধ্যে আরও গভীর কালো ছাপ মানুষের।

আর এও আশ্চর্য ভাগীরথী অন্ধকার বড়ো ভালোবাসে। অন্ধকারে চুপচাপ বসে থাকারও একটা নেশা আছে। কিছু চাইতে জানে না। বাড়ি থেকে তার চিঠি এলে পড়ে শোনানো হয়, ওতে সে খুশি না অখুশি ঠিক বোঝা যায় না। একটাই দোষ, বেশি খায়। পাঁচ-সাত বছর শহরে থেকেও বেশি খাওয়ার অভ্যাস পালটাতে পারেনি। বিশ-বাইশ দিনে টের পেয়ে গেছে ভাগীরথী না থাকলে সবাই বিশ বাঁও জলে। জয়ন্ত নিজেও। আজই সে অফিসে জেনে নেবে বোলপুর কোন ট্রেনে গেলে সুবিধা। কতক্ষণ লাগে। ফিরে আসা যাবে কি না, না বোলপুরে হল্ট করতে হবে। কোথাও না বের হয়ে কখন কোথাকার কোন ট্রেন ছাড়ে কিছুই জানে না। অফিসে এসে সে জানল, শান্তিনিকেতন এক্সপ্রেসেই সুবিধা। ন-টা চল্লিশে ট্রেন। বারোটার মধ্যে পৌঁছে গেল, ঘন্টাখানেক বাসে—এই আড়াইটে ধরে নেওয়া যাক, বোলপুরে ফিরতে চারটে। পাঁচটা সাড়ে-পাঁচটায় ট্রেনে, না হয় বাসে বর্ধমানে—তারপর কলকাতা। কলকাতা মানেই নিশ্চিন্তি। শেষে পৌঁছে যাওয়া।

সকালে সেদ্ধ ভাত খেয়ে জয়ন্ত বের হয়ে পড়ল। আসলে সে ভীতু স্বভাবের। রওনা হবার সময় মাধু বলল, চাদর নিয়েছ তো! এখানে শীত নেই, গাঁ-জায়গায় শীত লাগতে পারে। বাইরে বের হচ্ছ, সঙ্গে বেশি টাকা রেখো।

জয়ন্ত মুখ ব্যাজার করে রেখেছে! যেন সে নির্বাসনে যাচ্ছে। কে বলবে এই সে এক মানুষ, গাঁয়ে জন্মেছে গাঁয়ে বড়ো হয়েছে। শহরে এসে বাড়িঘর করার পর নিজের গাঁয়ে ছাড়া আর কোথাও যেতে ভালো লাগে না—এমনই স্বভাব তার—আর তারই মধ্যে ফ্যাসাদের মতো বিপ্রটিকুরী হাজির—ঝকমারি আর যাকে বলে! খুব সে মিশুকেও নয়। একা একা সারাটা দিন—না, ভাবতে গেলেই মাথা গরম হয়ে যাচ্ছে। তবু যাবে, মরণ হয় সেও ভালো, বুঝবে নিজেদের কাজ নিজেরা করে নিতে না পারলে কী বিপাকে পড়তে হয়। হাতের কাছে জল, গ্যাস, ফ্রিজ এতসব আছে তবু কেউ কুটোগাছটি নাড়বে না। এই ভাগীরথী, বিছানা করেছিস? এই ভাগীরথী জামা-প্যান্ট ভিজিয়ে দে। এই ভাগীরথী জুতো পালিশ করে দে। সবার ফরমাস। আর পারেও মেয়েটা। মুখে রা নেই। চুপচাপ সবাইকার

ফাইফরমাস খেটে দুপুরের খাওয়া হলে ওর বিশ্রাম। তখন সে বাথরুমে অনেকক্ষণ ধরে চান করবে, অনেকক্ষণ ধরে রান্নাঘরে বসে খাবে—তারপর ছাদে উঠে রোদে চুল শুকোবে। চুলও বটে, কালো আর ততোধিক ঘন। খোঁপা বাঁধলে বিশাল। অবসর সময়টায় সারাক্ষণ চুলের যত্ন। চুলই তার গর্ব। যা দেখবার মতো চুল—এই অহংকার ভাগীরথী করতেই পারে।

মাঝে মাঝে জয়ন্ত ভাবে, এই ভাগীরথী তাহলে সংসারটা ধরে রেখেছে। পাঁচ বছরে দুবার গেছে, দুবারই মতিলালের মাসির সঙ্গে ফিরে এসেছে। এবারেও বলেছিল, চলে আসবে। এল না বলে দুশ্চিন্তা—তা বিয়ে-টিয়ে দিলে খবর দিতে বলা হয়েছিল। খবর এসেছে, আমাকে নিয়ে যান।

জয়ন্ত একবার ভেবেছিল টাকা মানিঅর্ডার করে দেবে। ওর বাবা যেন দিয়ে যায়। কিন্তু মাধুর এক কথা—না, অভাবী মানুষ, টাকা পাঠালেই খরচ করে ফেলবে। তাছাড়া ওর বাবা গাঁয়ের বাইরে যেতে চায় না। কলকাতায় এলে হারিয়ে যাবে, আর তার ফেরা হবে না, এমনও নাকি আতঙ্ক আছে। ভাগীরথীর অসুখের সময় এটা জয়ন্ত আরো বেশি বুঝেছে। শত হলেও পরের মেয়ে—সে জানিয়েছিল, ভাগীরথী হাসপাতালে। এপেনডিসাইটিস অপারেশন। তবু কেউ আসেনি। খবর নেয়নি। এই পরের মেয়ে এমন যে সে নিজের পুরো নামটাও বলতে পারে না। বলবে—আমার নাম ভাগু।

ভাগু কী?

ভাগু কী এই কথায় ভাগীরথী চেয়ে থাকে। তার বাবার ঠিকানা মাধুর কাছে আছে। মাধুই মাসে মাসে ওর বাবার নামে টাকা পাঠিয়ে দেয়। বাবার নাম মোহন দাস। সুতরাং ভাগু দাসী। ভাগু যে আসলে ভাগীরথী বিপ্রটিকুরী না গেলে জয়ন্ত জানতেই পারত না। সেই ভাগু গ্যাসে রান্না করে। মাধু তাকে হাতে ধরে সব শিখিয়েছে। রান্না, ঘরমোছা থেকে সব। কাপড় কাচাও। ভাগু মোটামুটি সব কাজ একাই সামলাতে পারে। অথচ ভাগু কিছু চাইতে জানে না।

জয়ন্ত হাওড়ায় এসে শুনল, শান্তিনিকেতন এক্সপ্রেস যাবে না। বুধবার শান্তিনিকেতন এক্সপ্রেস ছাড়ে না। কেমন মাথা গরম হয়ে গেল। অফিস ছুটি করে বের হয়ে পড়েছে। বোলপুরে আর কোন ট্রেনে যাওয়া যায়! সে খোঁজ নিতে, থাকল। বাইরে বের হলে সে টের পায়, সেও আর এক ভাগু। এত লোকজন, এত কাউন্টার, এত গাড়ি যে, কোনটায় উঠে শেষে কোথায় গিয়ে উঠবে ভাবতেই কেমন আতঙ্কে পড়ে গেল। সে একজন চেকারকে সামনে পেয়ে খুবই বিনয়ের সঙ্গে বলল, স্যার একটা অ্যাডভাইস চাইছি।

জয়ন্ত মধ্যবয়সী মানুষ, এবং অভিজাত চেহারা। অ্যাডভাইস চাইছে! চেকার ভদ্রলোকও গলে গেল।—বলুন।

—বোলপুর যাব। শান্তিনিকেতন এক্সপ্রেস ছাড়ছে না—কোন ট্রেনে গেলে সুবিধা হবে।

—দানাপুর এক্সপ্রেসে যেতে পারেন।

—কটায় ছাড়বে।

—এগারোটা ত্রিশে।

মাথায় বাজ। সে বলল, কতক্ষণ লাগবে?

—ঘন্টা তিনেক।

তাহলে আজ আর ফেরা যাবে না। আসলে সে যতক্ষণ ফিরে আসতে না পারছে, ততক্ষণ ভূতের মতো ফেরার আতঙ্কটা মাথায় চেপে বসে থাকবে। অজানা অচেনা জায়গায় থাকারও বিড়ম্বনা। নিজের ঘর-বাথরুম ছাড়া সে কিছু বোঝে না। বাইরে বের হলে এই অস্বস্তিগুলি আছে। এত রাগ হচ্ছিল মাধুর উপর যে সে আর কোনো কথা বলতে পারছে না।

মাধুর জন্যই ভাগু মাঝে মাঝে বাড়ি যাবার তাড়া বোধ করে। বোকা বলে অপমান বুঝবে না কেন!—তোকে দিয়ে হবে না। এখন কেন ছুটতে হচ্ছে! ভাগুকে বোকা অচল বললে রাগ করে যখন, বলতে যাও কেন! সে বলল, এর আগে কোনো ট্রেন নেই? আমি আজই ফিরতে চাই।

চেকার ভদ্রলোক বললেন, তুফানে চলে যান। বর্ধমান নেমে কোনো লোকাল পেয়ে যেতে পারেন। এক্ষুনি ছাড়বে।

যেন কিছুটা অস্বস্তি কেটে গেল। গাড়িতে উঠে দেখে তিলমাত্র জায়গা নেই। ইস দুঘন্টা এইভাবে ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে! কত ধানে কত চাল। এ-সময় সে যেন নিজেকে কষ্ট দিয়ে বাড়ির উপর প্রতিশোধ নিচ্ছে। ভাবছে ফিরে গিয়ে এক চোট নেবে।

ট্রেন ছেড়ে দিল। একটুও হাওয়া ঢুকছে না। সে হাঁসফাঁস করছে। বিপ্রটিকুরী যাত্রা এমন একটা মারাত্মক বিষয় আগে যদি জানত! দুর্ভাগ্য কাকে বলে।

বর্ধমানে নেমে শুনল, না কোনো লোকাল নেই। সেই দানাপুর এক্সপ্রেসের জন্যই বসে থাকতে হবে।

প্রচণ্ড খিদে পেয়েছে। রাস্তার জলটল সে খায় না। জন্ডিস থেকে উঠেছে বছরও পার হয়নি। রেলের ক্যান্টিনে খেয়ে নিলে হয়। আর খাওয়া জুটবে কিনা তাও জানে না। একা কোথাও বের হলেই সে বড়ো অসহায় বোধ করে। সে কী করবে ভেবে পাচ্ছে না। তবু

রেলব্রিজ পার হয়ে ক্যান্টিনে খেতে গিয়ে বুঝল, এত মোটা চালের ভাত তার সহ্য হবে না। এত বিশ্রী রান্না যে সে কোনোরকমে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে কিছুটা খেল, বাকিটা সে ফেলে রাখল। জোড়া ডিমের ঝোল। বোঁদা লাউয়ের ঘন্ট। নেড়েচেড়ে উঠে পড়ল। জীবনে একটা সময় সব সহ্য হত, আর এক জীবনে সবই অসহ্য। মানুষের শরীরে যে এত বিশ্রী গন্ধ থাকে ভিড়ের ট্রেনে সে টের পেয়েছে। গাঁয়ের মানুষজন, গরিব, জনমজুর—সব যেন কাক-চিল হয়ে চারপাশে উড়ছে। দানাপুর এক্সপ্রেস কখন আসবে!

তার পাশে এত মানুষজন, তবু এত একা কেন বুঝছে না। আসলে অভ্যাস মানুষকে খুবই আলগা করে দেয়। এই ভিড়ের মানুষজনের সঙ্গে সে নিজেকে যেন মেলাতে পারছে না। কারো সঙ্গে কথা বললে হয়—কী নিয়ে বলবে! রাজনীতি, না কারো কোনো আগ্রহ নেই। ক্রিকেট টেস্ট চলছে। কেউ ট্রানজিস্টার কানে লাগিয়ে শুনছে না। সব মানুষকে মনে হচ্ছে সত্যি আলাদা গ্রহের।

দানাপুর এলে মাথায় হাত। কোনো কামরায় সে উঠতে পারছে না। ঠেলা খেয়ে নেমে আসছে। গাড়ি ছেড়ে দেবার সময় হাতল ধরে ঝুলে পড়ল। কপালে যা আছে। গুসকরায় গিয়ে মনে হল সে আর পারছে না। যে-কোনো মুহূর্তে কিছু একটা হতে পারে। পাশের লোকটা বলল, আর একটা স্টেশন! সামনে বোলপুর। জয়ন্ত আবার লাফিয়ে হাতল চেপে ধরল। মাঠের ভেতর দিয়ে হুইসেল বাজিয়ে ট্রেন যাচ্ছে। সে কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। হুহু করে হাওয়া বইছে। যেন তাকে উড়িয়ে দেবে। সে চোখ বুঁজে ছিল।

—বিপ্রটিকুরী কতদূর।

—কেউ জানে না কতদূর।

জয়ন্ত বলল, কে জানে?

—এগিয়ে যান। তারপর কে যেন বলল, বাসস্ট্যান্ডে যান—খোঁজ নিন।

—বিপ্রটিকুরীর বাস কটায়?

—এই আসে এই যায়, একজন বলল।

—কোথায় পাওয়া যাবে?

—এখানে না। দূরপাল্লার বাস এখান থেকে ছাড়ে।

সন্ধ্যা হয়ে গেল। চায়ের দোকানদারকে সে বলল, তুমি জান ঠিক সকাল পাঁচটায় বিপ্রটিকুরীর বাস!

—তাই তো মনে হয় স্যার।

—ঠিক কটায় বলতে পার না?

—না স্যার। ঠিক বলা যাবে না। বাসের মর্জি।

আর যাই করা যাক, আজ আর যাওয়া হবে না। চেনাজানা নেই, অজ্ঞাত পরিচয় একজন মানুষকে কে আশ্রয় দেবে! বিপ্রটিকুরী থেকে হাঁটা পথে ক্রোস-খানেক। কেউ বলল, মশায়ের মাথা খারাপ। ফিরে যান। দেখছেন না, যেখানে সেখানে খুনখারাবি হচ্ছে, অচেনা লোক দেখলেই সন্দেহ। জয়ন্ত তাড়াতাড়ি একটা রিকশাকে ডেকে বলল, কাছে কোথাও কোনো ভালো হোটেল আছে ভাই।

—আছে স্যার। যোগমায়া হোটেল। চলুন। ফাস্ট ক্লাস!

আর ফাস্ট ক্লাস, এখন বলির পাঁঠা—কী যে রাগ হচ্ছে। জয়ন্তর মুখ থমথম করছে। হোটেলে ঢুকে ঘরভাড়া ত্রিশ টাকা, খাওয়া খরচ আলাদা। হোটেলের ভিতরের দিকে উঠোনে গাছপালা, গোরু-মোষ। ঘরটার লাগোয়া মেয়েদের বাথরুম। সারারাত দরজা খোলা-বন্ধ করার শব্দ। এটাচড বাথ বলতেই হোটেলওয়ালা কেমন ঘাবড়ে গেছিল। লোকটা বলে কী!

কিছু করার নেই। সারা রাত অনিদ্রায় কাটাতে হবে। বিছানায় চাদরে দুর্গন্ধ। জয়ন্ত কোনোরকমে বলল, এক গ্লাস জল খাওয়াতে পারো ভাই। হোটেল বয় জল আনল, ঘোলা। যা হয় হবে। সে আর পারছে না। এ-সময় দেখল উঠোনে একটা বড়ো মোষ চড়াচ্ছে, ছর ছর করে শব্দ। কোনোরকম রাতটা কাটিয়ে শেষ, পর্যন্ত জীবন নিয়ে বিপ্রটিকুরী রওনা হতে পারলে হয়। ভাগীরথী তোর কী যে এত দরকার পড়ল বুঝি না। থেকে গেলি। মতিলালের মাসির সঙ্গে ফিরে গেলে তোর মেসোর এই ভোগান্তি হয় না। রাতে সেই মোটা চালের ভাত। কাঁকর মেশানো। দাঁত আস্ত থাকছে না। আসলে জয়ন্ত বুঝতে পারছে, বিশ-বাইশ বছর আগের জয়ন্ত আর সে নেই। নিশ্চিন্ত চাকরি, স্ত্রীর চাকরি, বাড়িঘর বানিয়ে হালফ্যাসানের মানুষ সে। পূজার ছুটিতে বের হলে বার্থ রিজার্ভ করা ট্যুরিস্ট লজ বুক করা অথবা কোনো বনে-জঙ্গলে ঢুকে গেলে সঙ্গে ফরেস্ট অফিসারের গাড়ি। টিফিন, জল সব সঙ্গে। রাগ করে সে কিছুই সঙ্গে নেয়নি। যাবে কী করে জানে না, কোথায় যাচ্ছে জানে না, সবই যখন অনিশ্চিত, তখন আর টিফিন কতটা নিশ্চয়তা দেবে!

হোটেলওয়ালাকে সে বলল, দেখুন পাঁচটায় বাস—আপনার জানাশোনা কোনো রিকশা আছে, আগে বলে রাখলে বাস ঠিক ধরিয়ে দেবে? টাকার জন্য ভাববেন না।

—এই গোদা! শোন বাবু কী বলছে! গোদা হাজির।

—বাবু পাঁচটার বাস ধরবে। ধরিয়ে দিবি। পারবি কি? গোদা ঘাড় কাত করে চলে গেল। আর চারটেয় উঠে হাতমুখ ধুয়ে ব্যাগ কাঁধে নিয়ে বের হতেই দেখি করিভোরে

গোদা বসে আছে। কোলাপসিবল গেট খুলে রিকশা বের করে বলল, কোথায় যাওয়া হবে বাবুর?

এইরে! কোথায় যাওয়া হবে। সে বলল, বিপ্রটিকুরীর বাস ধরব পাঁচটায়।

—রাত থাকতে বাস ছাড়ে! কার বাস?

ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি সময়ে ভোর পাঁচটায় কতটা অন্ধকার থাকে তার জানা নেই। তবু পাঁচটার বাস না ধরতে পারলে জীবনেও বোধহয় বিপ্রটিকুরী বাস সে আর ধরতে পারবে না। ভয়, কৌতূহল এবং অস্বস্তি নিয়ে সে রিকশায় উঠে বসল। গোদা ঠিকই বলেছে। রাস্তায় একটা লোক নেই। কুকুর বাদে কিছু দেখা যাচ্ছে না। সে সাড়ে-চারটেয় বের হয়েছে। সে বলল, গোদা ভাই, তুমি জান বিপ্রটিকুরী কোথায়? গোদা মাথা-কান গামছায় ঢেকে নিয়েছে। আর ঠান্ডা হাওয়ায় শুনতেও পাচ্ছে না বোধহয়। সে বলল, এই গোদা কোথায় নিয়ে যাচ্ছ! তার মনে হল গোদা ঠিক পথে যাচ্ছে না। গোদার কি কোনো কু-মতলব আছে। এখনো রাত, অন্ধকার, সব নিঝুম।

ইতস্তত জোনাকির মতো আলো, ঘরবাড়ি কোথাও স্পষ্ট, কোথাও আবছা। গোদা এত নীরব যে সে সওয়ারি নিয়ে যাচ্ছে, না মরা কুকুর নিয়ে যাচ্ছে বোঝা যাচ্ছে না। জয়ন্ত কেমন ভয় পেয়ে চিৎকার করে ডাকল, এই গোদা কোথায় ছুটলি বাবা!

—এই যে এসে গেছেন বাবু।

সত্যি সে এসে গেছে। কাল সাঁঝবেলাতে কী ভিড়, মানুষজন খুরিতে চা খাচ্ছে। এখন একেবারে ফাঁকা। লম্বা বেঞ্চগুলি আর ছেঁড়া ত্রিপল ছাড়া কিছু নেই, মাথার উপর গাছটা অশ্বত্থ হবে, পাখির কলরব, দুটো কুকুর উনুনের ভিতর থেকে হামাগুড়ি দিয়ে বের হয়ে এল। আর কোনো কাক-প্রাণী নেই—গাড়ি নেই, রিকশা নেই, কেমন এক মৃত শহরে দাঁড়িয়ে আছে যেন জয়ন্ত। গোদা বলল, বাস এলেই উঠে পড়বেন। বাস এলেই উঠে পড়তে বললে কেন। গোদা দাঁড়াল না। আসলে সে নিজের মধ্যে আছে তো! অচেনা জায়গায় ভূতুড়ে অন্ধকার তাকে কেমন গ্রাস করছিল। শুধু কুকুর দুটো আছে। ঘড়ি দেখে সে আরো মুষড়ে পড়ল। বের হবার সময় সাড়ে-চারটে দেখেছে, এখন চারটে। এ কিরে বাবা, কাঁটা পেছনে ঘুরছে! ঘড়ি পর্যন্ত বিভ্রাট করছে! না কি চারটেয় বের হয়েছে, মাথা গরম বলে, অনিদ্রা গেছে বলে চোখের ভুল। এইসময় গা-টা তার কাঁটা দিয়ে উঠল।

বুধবার শান্তিনিকেতন বন্ধ সে জানত না। বুধবার দেরিতে রাত শেষ হয় এখানে—সে জানত না। বুধবার ঘড়ির কাঁটা পেছনের দিকে হেঁটে যায় জানত না। গোদা পাঁচটা টাকার বিনিময়ে তেমাথায় দাঁড় করিয়ে দিয়ে চলে গেছে। এখন যে কেউ এসে তাকে বলতে পারে, যা আছে দিন। সে ঠিকই করেছে, সব দিয়ে দেবে। কোট খুলে দেবে। হাতঘড়ি

খুলে দেবে। বেশি টাকা যা আছে দিয়ে দেবে। রাত এত নিশুতি হয়, রাত এত নির্জন হয়, রাত এমন বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে এর আগে সে টের পায়নি। তেমাথা জায়গা কোনোদিন ভালো হয় না। ছেলেবেলার সংস্কার আবার মাথায় পোকা হয়ে ঢুকে গেছে।

রাস্তার আলো, দূরে মাঠ পার হয়ে বাড়ি-ঘরের আলোর রহস্য ক্রমেই ভূতুড়ে হয়ে উঠছে। গাছপালার পাতা ঝরছে। সামান্য ঘূর্ণিঝড় উঠল। না—আর এভাবে দাঁড়িয়ে থাকলে সে পড়ে যেতে পারে। ঠকঠক করে কাঁপছে। ঘড়ি দেখবে, তাও ভয় হচ্ছে। যদি দেখতে পায় কাঁটা সাড়ে-তিনটের ঘরে ঢুকে গেছে। আধঘন্টা হয়ে গেল, তবু আকাশ ফর্সা হচ্ছে না। সে রাস্তার আলোতে আবার ঘড়িটা দেখবে ঠিক করল। যা হয় হবে। বের হবার সময়ই মনে হয়েছে, বিপ্রটিকুরী বড়ো বেশি অচেনা জায়গা। আর তখনই দেখল, দুটি জীব দুলতে দুলতে এদিকে এগিয়ে আসছে। ঘোড়া, গোরু না কুকুর, না ঘোড়া নয়, ঘোড়া এভাবে হাঁটে না, গোরুও নয়, গোরু এভাবে হাঁটে না। কুকুর অত যদি বড়ো হয় তবে তার যাও সাহস অবশিষ্ট আছে সেটুকু নীল হয়ে যাবে। মানুষজন যদি কখনো এখানে আসেই দেখতে পাবে কেউ ভয়ে মরে পড়ে আছে।

ধীরে ধীরে বেশ চালে আসছেন। যত আসছেন, তত জয়ন্ত বড়ো বড়ো চোখে দেখছে। ও—তেনারা দুজন গাধা। রাত থাকতেই বের হয়ে পড়েছেন। সব জোড়ায় জোড়ায়। এক জোড়া কুকুর উনুন থেকে উঠে পথ শুঁকতে শুঁকতে চলে গেল। একজোড়া গাধা চলে গেল। তারপরই গেল একজোড়া ঢাকি। চোখের উপর দিয়ে চলে গেল। সে ডাকল, তারা সাড়া দিল না।

সে বোধহয় ভিরমি খেত। আর তখনই পাশের একটা দোকানের ঝাঁপ উঠে গেল। লোকটা বের হয়ে তার সামনেই পেচ্ছাপ করতে বসল। গাছের অন্ধকারে তোকে দেখতে পাচ্ছে না। সে ডাকল, ও দাদা—আপনি কি আবার ঘুমোতে যাচ্ছেন? লোকটার ঘুমের ঘোর কাটেনি বোধহয়। বলল, কে?

—বিপ্রটিকুরীর বাস ধরব আশায় বসে আছি। কটা বাজে।

লোকটা বিন্দুমাত্র দাঁড়াল না। দৌড়ে ঘরে ঢুকে গেল। ঝাঁপ বন্ধ করে দিল। ঘড়ি দেখতেই হয়। যা হয় হবে। ঘড়িটা চলছে। অথচ ঘড়ির কাঁটা পেছনের দিকে ঘুরছে। আবার যদি তাই দেখে! হয় হোক ভেবে তবু সে যা দেখল। চলছে—সামনে চলছে। সাড়ে চারটে—এবারে সে কিছুটা সাহস পেয়ে গেছে। আসলে উদ্বেগ, দুর্ভাবনা এবং ভয় তাকে সারারাত জাগিয়ে রেখেছে। সে আসলে বের হয়েছে চারটের আগে। ঘড়িতে সাড়ে-তিনটে দেখতে সাড়ে-চারটে দেখেছে। এখন আর তার ভয় লাগছে না। ভাগীরথীকে নিতে এসে এটা সে কত বড়ো ধৈর্যের পরীক্ষা তার বাড়ির লোক যদি বুঝত।

পাঁচটার বাস এল সাড়ে-সাতটায়। একজন বলল, পাঁচটায় বাস বিপ্রটিকুরী থেকে ছাড়ে। সাড়ে-ছটায় আসে। সাড়ে-সাতটায় রওনা হয়।

—একখানা বাস।

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

তা শেষ পর্যন্ত বাসে সে সামনের দিকে সিট পেয়ে গেল। একটা ব্রিজ পার হয়ে বাসটা থেকে নেমে সামনে কিছু ঘরবাড়ি পার হতেই দুপাশে শীতের মাঠ। তার ভালো লাগছিল। এখন ভাগীরথীকে নিয়ে ঠিক ঠিক ফিরতে পারলে হয়। ভাগীরথীর আঁচলে তার ঠিকানা লিখে একটা কাগজে গিঁট মেরে দিতে হবে। এত হাবা কিছুতেই বাপের নাম, নিজের নাম, তার নাম মনে রাখতে পারে না। নিয়ে যাবার সময় পথে হারিয়ে গেলে আর এক কেলেঙ্কারি। পরের মেয়ে নিয়ে কত দায় মাধু যদি বুঝত।

শেষ পর্যন্ত বিপ্রটিকুরী পৌঁছোন গেল। জয়ন্ত রাস্তাতেই মতিলালের বাড়ির খবর নিতে গিয়ে জানল, ওরা ওখানকার জমিদার বাড়ির বৌ। জমিদারি যাবার পর সব এখানে ওখানে ছিটকে পড়েছে। দু-চার শরিক এখনো আছে—জয়ন্তর এ যেন আর এক তেলেনাপোতা আবিষ্কার। সে পরিচয় দিতেই একজন তরুণ বের হয়ে এল। বেশ ছিমছাম যুবক। গালে দাড়ি সবে উঠেছে। চেহারা বেশ মার্জিত। গাঁয়ে এইরকমের চেহারা বড়ো একটা দেখা যায় না। আসলে অভিজাত পরিবারের ছেলে। জয়ন্ত তার পরিচয় দিলে সে বলল, ভেতরে আসুন!

জয়ন্ত এখানে তেলেনাপোতা আবিষ্কারের মতো এক যুবতীকেও আবিষ্কার করে ফেলল। দোতলা বাড়ি, ভাঙা ঘর-দালান, পলেস্তারা খসা, চুন-সুরকি ঝুর ঝুর করে খসে পড়ছে। কোথাও দেয়ালের সামান্য রসটুকু নিঠুর বটের চারা শুঁষে নিচ্ছে। বাড়িতে ঢুকতে তার ভয় করছিল। দোতলায় উঠে বুঝল, সে হাঁটলে বাড়িটা কাঁপে। ভাগীরথীর খবর এদের কাছ থেকেই তার জেনে নেবার কথা। যুবতী গা ঢেকে বারান্দায় এসে উঁকি দিয়ে চলে গেল। প্রৌঢ়া মহিলা এসে বললেন, আমার জা হয়। দারিদ্র্য এবং হতাশা আড়াল দেবার জন্য শাড়ি-সায়া পালটে এসেছেন বোঝা যায়। কিন্তু মুখে-চোখে দুশ্চিন্তার আভাস টের পাওয়া যায়।

জানলা দিয়ে গ্রামটা দেখা যায়। এককালে বর্ধিষ্ণু গ্রাম ছিল বোঝা যায়। এখন চারপাশে ছোটো ছোটো সব কুঁড়েঘর, দূরে স্কুলবাড়ি, পিছনে দাওয়া। কোনো ভগ্নস্তূপের ভিতর থেকে সে একটা মন্দিরও দেখতে পেল।

সে বলল, বসব না। ভাগীরথীর চিঠিটা সে দেখাল।

তরুণের নাম বাদল। সে চিঠিটা হাতে নিয়ে উলটেপালটে দেখল। তারপর বলল, ওর তো বিয়ে হয়ে গেছে।

—বিয়ে! তবে যে চিঠি লিখল।

—হ্যাঁ। বিয়ে মানে—বলে আমতা আমতা করতে থাকল। প্রৌঢ়াই বললেন, ও আর বিয়ে। ওর মা-বাবা ওকে আসলে বেচে দিয়েছে। হপ্তাখানেক আগে এলে পেতেন।

—কী বলছেন!

—এদিকটায় হামেশা এমন হচ্ছে। অভাবের তাড়না!

জয়ন্ত হতবাক। সে তাকিয়ে আছে।

—কী করবে! বড়ো গরিব। খেতে পায় না। বেচে না দিয়েও উপায় ছিল না। একসঙ্গে এত টাকা কে দেয়!

—কিন্তু।

—কিন্তু আর কী! আপনি তো কাগজের লোক। গ্রামটা ঘুরে দেখে যান না। লিখুন। গরিব চাষাভুষো মানুষের কী অবস্থা দেখে যান।

জয়ন্ত সহসা কেমন ক্ষিপ্ত হয়ে গেল। আপনারা থাকতে—সে তোতলাতে থাকল, একটা নিরীহ মেয়েকে, না আমার মাথায় আসছে না। এখানে পার্টির লোকেরা কিছু বলে না?

—কী বলবে? এটা তো গণতান্ত্রিক ব্যাপার। বাবা-মা তার মেয়েকে বিয়ে দিচ্ছে, তার কী বলার আছে!

—বিয়ে?

—ওই শো একটা। তারপর মেয়েগুলির আর খোঁজ পাওয়া যায় না।

ইস সে যে কী ভুল করেছে! প্রথম চিঠিটাতেই ছিল—মেসোমশাই, আমাকে নিয়ে যান। বিয়ে-টিয়ে কিছু না। এলে জানতে পারবেন। তাড়াতাড়ি আসবেন। কাউকে দিয়ে সে চিঠিটা লিখিয়েছিল। জয়ন্তর এখন নিজের হাত কামড়াতে ইচ্ছে হচ্ছে। কোথায় কে নিয়ে গেল ভাগীরথীকে। আসলে পাঁচ-সাত বছরে ভাগীরথী তার বাড়িরই কেউ হয়ে গেছিল। ঘরে কুকুর-বেড়াল থাকলেও মায়া পড়ে যায়, আর এ তো মানুষ। তার চোখ সহসা ঝাপসা হয়ে গেল। সে সারা রাস্তায় শুধু নিজেকে নিয়ে ভেবেছে। ভাগীরথীর কথা একবারও মনে হয়নি তার।

সারা রাস্তায় নিজের অস্তিত্ব নিয়ে দুশ্চিন্তায় ছিল, ভাগীরথীর অস্তিত্ব নিয়ে তার কোনো দুশ্চিন্তা ছিল না। সেই ভাগীরথী বিক্রি হয়ে গেছে। রাস্তায় নেমে এবার বোলপুরের বাস

ক-টায় কাউকে তার জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হল না। সে হেঁটে যাচ্ছে। রোদের ভেতর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। কেমন বেহুঁশ।

চারপাশে খাঁ খাঁ মাঠ। গাছপালাহীন এক দাবদাহ ক্রমে তাকে গ্রাস করতে থাকল। সে নিজেকে এই প্রথম নির্যাতন করে যেন সবার উপর প্রতিশোধ নিচ্ছে। যে জানেই না কোথায় যাচ্ছে—কেন যাচ্ছে। ক-টায় বাস, কখন ট্রেন, তার যেন আর জানার দরকার নেই। গরমে সে হাঁসফাঁস করছিল। কোটটা ছুঁড়ে ফেলে দিল, মাফলার ছুঁড়ে ফেলে দিল, জলের বোতল—সব। তারপর সে হাঁটতে হাঁটতে কখন ক্লান্ত হয়ে গাছের ছায়ায় ঘুমিয়ে পড়েছিল জানে না। জেগে দেখল, আকাশে অজস্র নক্ষত্র। এই নক্ষত্রের ভেতর সে শীতের রাতে আবার কোনদিকে রওনা হয়ে গেল। সে এত আত্মপর এই প্রথম টের পেয়ে কোনো নিষ্ঠুর জীবনের স্বাদ গ্রহণের ইচ্ছায় উন্মত্তের মতো হাঁটছে। তার এ আর-এক যাত্রা—কে জানে এ-যাত্রার শেষেও আবার কোনো বিপ্রটিকুরী তার জন্য অপেক্ষা করছে কিনা।

সাদা বিছানা

সুদক্ষিণা মুখে ক্রিম ঘসছিল। জানালা খোলা। চৈত্রের ঝড়ো হাওয়া কদিন থেকেই বেশ জোর বইছে। কেমন সব অগোছালো করে দেয় গাছপালা, জানলার পর্দা, বিছানার চাদর। সকালের দিকে থমকে থাকে। বেলা যত বাড়ে হাওয়ার জোর তত বাড়ে। মাঘ-ফাল্গুনে মশার উৎপাতাটা ঝড়ো হাওয়ায় এক সময় উড়িয়ে নিয়ে যায়। সন্ধ্যায় বারান্দায় বসে আকাশ দেখার অবসর মেলে। কনকেন্দু বিছানায় শুয়ে সুদক্ষিণার ক্রিম ঘসা দেখছিল। সুদক্ষিণার এগুলো সহবাসের আগেকার প্রস্তুতি। ভোজে বসার আগে কলাপাতা ধুয়ে নেওয়ার মতো। শরীরে তার এখন কেমন জ্বর জ্বর লাগছে। বোধ হয় সুদক্ষিণা আগে থেকে এ-সব করে জানিয়ে দেয়, আমি কিন্তু রেডি হচ্ছি। তুমি নিজেকে ঠিকঠাক করে নাও। আজ আমার পৃথিবী আবার নতুন হয়ে গেছে।

কনকেন্দু হাসল।

অফিস থেকে তার ফিরতে আজ একটু দেরিই হয়েছে। রাস্তাঘাট ভালো না। সে ফিরে না আসা পর্যন্ত বাড়িটা কেমন অস্বস্তির মধ্যে থাকে। সে ফিরলেই একটা রাতের মতো সুদক্ষিণা কেমন হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। যাক কারো জন্য আর আশঙ্কা নিয়ে বারান্দায় পায়চারি করতে হয় না, অথবা খুট করে গেট খোলার আওয়াজের জন্য তাকে বসেও থাকতে হয় না। সুদক্ষিণা তখন যেন বাড়ির সব কাজ বড়ো নিখুঁত ভাবে সেরে ফেলতে পারে।

আয়নায় মুখ দেখছিল সুদক্ষিণা।

পর্দা সরিয়ে পাপু ডাকল, মা।

তোমরা এখনও ঘুমাওনি! বিছানা থেকে নেমে এলে কেন!

পাপু পর্দা সরিয়ে মাকে দেখছিল।

পেছনে আর একটা মুখ। ঝুমকি।

মা, দাদা আমার বালিশ দিচ্ছে না।

সুদক্ষিণা নিজেকে সামলাচ্ছিল। এবং যেন একটু ক্ষোভও সৃষ্টি হয়েছে সুদক্ষিণার ভেতর। এটা কার উপর কনকেন্দু জানে। মা বুড়ো মানুষ, সুদক্ষিণা বোঝে না এই দুটো

দৈত্যকে সামলানো কত দায় একজন বুড়ো মানুষের পক্ষে।

কনকেন্দু বলল, চল দেখছি। সে পাপুকে বলল, তোরা শান্তিতে তোর মাকে একটু ঘুমোতে যেতে দিবি না! ওর বালিস দিচ্ছিস না কেন!

ও আমারটা নিয়েছে। নিজেরটা কী করেছে কে জানে!

বারান্দা পার হয়ে ডানদিকের ঘরটায় দুটো খাট। একটাতে মা, পাশেরটাতে পাপু আর ঝুমকি। মার চোখে চশমা, সামনে বই। বোধ হয় কোনো ধর্মগ্রন্থ হবে। রাত করে মার এ-সব পড়ার অভ্যাস। সাদা থান, সাদা বিছানা, সাদা বালিসে মার বিছানাটা তার আজ কেন জানি সহসা আদ্ভুত ঠেকল। সে ডাকল, দেখ মা এদের কাণ্ড।

কখন নেমে গেলি! কী হয়েছে!

কনকেন্দু দেখল, তার মা উঠে বসেছে। তারপর বইয়ের ভাঁজে চশমাটা রেখে নীচে নেমে এল। দরজা থেকে দুজনের হাত ধরে টেনে নেবার সময় বলল, তোদের চোখে ঘুম নেই! কখন থেকে খটাখটি করছিস। বিছানায় ওঠ।

পাপু উঠে গেল। ঝুমকি উঠল না।

ঝুমকি বলল, আমার বালিশ পাচ্ছি না ঠাকুমা। দাদা কোথায় লুকিয়ে রেখেছে।

মারব, আমার নামে মিছে কথা বললে।

কনকেন্দুর দিকে তাকিয়ে মা বলল, তুই যা। দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে যাস। আমি দেখছি।

কনকেন্দুর কেমন লজ্জা লাগছিল মার দরজা বন্ধ করে দেওয়া দেখতে। দরজাটা খোলাই থাকে। ও-ঘর দিয়ে রাতে বাথরুমে যেতে হয়। বাবা প্ল্যানে ওই একটা মস্ত ভুল করেছিলেন বাড়িটা করার সময়। তখন অবশ্য বাড়িতে দুই কাকা থাকতেন। জ্যাঠামশাই থাকতেন। এক একটা ঘর ছিল এক একজনের জন্য। এ-ঘরটা খাবার ঘর হিসাবে ব্যবহার হত। ওরা বাড়ি করে উঠে যাবার পর, নীচের তলাটা বাবা ভাড়া দিয়ে দেন। এতগুলো ঘরের সত্যি দরকার হয় না। ওপরে তিনখানা ঘর। একটা বসার। ওটা সিঁড়ির মুখে পড়ে। মার ঘরটা কড়িডোরের মুখে। তাদের ঘরটা একেবারে দক্ষিণ ঘেঁষে। জানলায় দাঁড়ালে আগে বড়ো মাঠ দেখা যেত। এখন মাঠও নেই—সেইসব গাছপালাও নেই। কেমন ঘিঞ্জি। মাঝে মাঝে মনে হয় এটা আর বড়ো শহরের উপকণ্ঠ নয়। বরং মূল শহরটাই যেন এখানে উঠে এসেছে।

কনকেন্দু করিডোর ধরে হাঁটার সময় এ-সব ভাবছিল। কারণ কনকেন্দু জানে মা দরজায় ছিটকিনি তুলবে না। রাতে বাথরুম যেতে হলে মাকে ডেকে তুলতে হবে। এ-সব

কারণে মা আর দরজায় ছিটকিনি তুলে দেয় না। সে বলতেও পারে না, আজ তুমি ছিটকিনি তুলে দাও। নীচের তলায় আলগা একটা বাথরুম আছে। বাড়িতে লোকজন বেশি হলে ওটা খুলে রাখা হয়। এমনিতে বন্ধ থাকে। নীচের তলায় ভাড়াটেরা নাহলে সেটাও দখল করে নেবে। এই একটা ভয় আছে কনকেন্দুর।

সুদক্ষিণার মাঝে মাঝে কী হয়। সহবাসের ব্যাপারে কেমন ওর শরীরে এক ধরনের জোয়ারভাটা আছে। সুদক্ষিণা আসার পর তার এটা মনে হয়নি। কিন্তু সাত-আট বছরের অভিজ্ঞতায় এটা মনে হচ্ছে তার। মাসখানেক সুদক্ষিণার জোয়ার থাকে, মাসখানেক ভাটা চলে। পুরুষ মানুষের বোধ হয় এটা থাকে না। তার কাছে একজন নারী সব সময়ই উষ্ণতা ছড়িয়ে রাখে। তবে একই ভাবে কতদিন আর এক জানলায় বসে গভীর নীল আকাশ দেখা যায়। মাঝে মাঝে ইচ্ছে হয় জানলাটা বন্ধ থাক। কিন্তু জোয়ারের সময় সুদক্ষিণা, জানলাটা নিজেই খুলে দেবে। তার ভালো লাগা মন্দ লাগা নিয়ে যেন সুদক্ষিণার কিছু আসে যায় না। তখন এক ধরনের ক্লান্তিকর আকাশের নীচে সে বসে আছে এমন মনে হয়। পাশ ফিরে চুপচাপ শুয়ে থাকার চেষ্টা করেও পারে না। সুদক্ষিণা, ঠিক এক সময় না এক সময় তাকে অস্থির করে তুলবেই।

ঘরে ঢুকতেই সুদক্ষিণা বলল, দরজাটা বন্ধ করে দাও।

দরজাটা বন্ধ করে দিতে কনকেন্দুর অস্বস্তি হচ্ছিল। পাপু কিংবা ঝুমকি যে-কোনো সময় এসে দরজা ধাক্কাতে পারে। কারণ ওরা যে একটা বালিশ নিয়ে পড়েছে, সেটা মার পক্ষে বের করা কতটা কঠিন সুদক্ষিণা বোঝে না। ঝুমকি ও-ঘরে এমনিতেই শুতে চায় না। সে ফাঁক পেলেই উঠে এসে মার পাশে শুয়ে থাকে। বছর খানেক আগেও ওকে ঘুমোলে মার ঘরে তুলে দিয়ে আসতে হত। এখন অবশ্য বুঝেছে, কী বুঝেছে জানে না, তবু আর মার সঙ্গে শোবে, বাবার পাশে শোবে এমন বায়না ধরে বসে থাকে না।

সুদক্ষিণা এ বাড়িতে বেশ কম বয়সেই এসেছিল। কুড়িও পার হয়নি। কনকেন্দু বাবার একমাত্র সন্তান। পাসটাশ করে বাবার দৌলতে সে দামি চাকরিও পেয়ে গেছিল। ওকে বেকার থাকতে হয়নি। একদিনও। বাবা কম বয়সে ছেলের বিয়ে দিয়ে যেন একটা জীবনের বড়ো কাজ করে ফেলেছেন—যেটা অনেক বাবাদের পক্ষেই সম্ভব হয় না, এ-কারণে সে, দেখেছে, বাবার যাদুবিদ্যা আছে কোনো, কিংবা বাবা ঠিক টের পেয়েছিলেন, কম বয়সে বিয়ে দিলে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে প্রগাঢ়তা বাড়ে। তা না হলে, সে এই বয়সেই এত সংসারী হয়ে উঠবে কেন। যেন সুদক্ষিণাকে খুশি রাখা ছাড়া পৃথিবীতে তার আর অন্য কোন দায়িত্ব নেই।

কনকেন্দু দেখল, সুদক্ষিণা নতুন পাট ভাঙা শাড়ি পরছে। সে যে দরজাটা বন্ধ করেনি, সাজগোজের বহরে সুদক্ষিণার সেটা খেয়াল নেই। নাকে নথ পরেছে। নথ পরলে সুদক্ষিণার কাছ থেকে সে আর কিছুতেই দূরে সরে থাকতে পারে না। কিংবা, শাড়ি পেঁচিয়ে পরার সময় স্তন আলগা, সুদক্ষিণা তখন চুমো খাবার বড়ো আগ্রহ বোধ করে। চুমোর সঙ্গে রোজকার সেই অভ্যেসের কথাটাও বের হয়ে আসে—তুমি সুদক্ষিণা এখনও সুইট সিকসটিন। কবে টুয়েন্টি হবে।

সুইট সিকসটিন বললেই যেন এক ঝড় উঠে যায়—চোখ অলস হয়ে আসে। সারা আকাশময় ঘন গভীর বিদ্যুতের ছটা মুহুর্মুহু জ্বলে ওঠে। নারী বড়ো সুধাময়ী, এত সুধাময়ী যে সে তখন আর স্থির থাকতে পারে না। সুদক্ষিণার কাছে ধীরে ধীরে এগিয়ে যায়, হাত ধরে। দুজন হাঁটে পাশাপাশি। এবং আঁচল খসে পড়ে। চোখের কাজল চিক চিক করতে থাকে। সারা শরীরে সুঘ্রাণ ওঠে। সুদক্ষিণার নারী মহিমা বড়ো রহস্যজনক হয়ে উঠে তখন।

দরজাটা বন্ধ করলে না।

কনকেন্দু বলল, দিচ্ছি।

সুদক্ষিণা ব্লাউজের নীচে এবং বগলে পাউডার ছড়াচ্ছে।

কনকেন্দু বলল, আমার ঘুম পাচ্ছে।

সুদক্ষিণা বলল, শুয়ে পড় না। কে তোমাকে জেগে থাকতে বলেছে।

এ সময় কনকেন্দু একবার সকালের সুদক্ষিণাকে ভাবল। সকাল হলে কে বলবে, এই সুদক্ষিণা রাতে যাত্রার সখির মতো সহবাসে যাবার জন্য সাজতে বসেছিল। সংসারে সে মা, তার আর তখন কোন পরিচয় থাকে না যেন। এই পাপু ওঠো। এই ঝুমকি ওঠ মা। হাত মুখ ধুয়ে নে। স্কুলের গাড়ি চলে আসবে। ওঠ ওঠ। এক মুহূর্ত বিশ্রাম নেই। বাথরুমে যাবার আগে কনকেন্দুর চা, বাথরুম থেকে এলে কনকেন্দুর দাঁত মাজার ব্রাশ, আবার চা, ছেলেমেয়ের জলখাবার, সুদক্ষিণা কোন সকালে ওঠে তার স্নান বাথরুম কখন সব শেষ, কেউ টের পায় না। স্নান সেরে কাজের মেয়ের হাতে সব কাচাকাচির ভার দিয়েই রান্নাঘরে এবং এক হাতে তখন সে অতি আয়াসে সব করে যাবে।

সুদক্ষিণা পর্দাগুলো ভালো করে টেনে দিচ্ছে। বিকালে আলতা পরেছে।

কনকেন্দু জানে এমন তার মাসখানেক কী দু-মাস। কনকেন্দু তখন রাজার মতো। নিজেকে যাত্রার সখা সাজতে হয় না। সে নিজে থেকে কিছু না বললেও দেখা যায় এ সময়টায় সুদক্ষিণার মধ্যে প্রবল বাতাস যেন সব উড়িয়ে নিয়ে যেতে চায়। কনকেন্দু ইচ্ছে করলে বলতে পারে, শরীর ভালো নেই। যেমন, ভাটার সময় সুদক্ষিণা প্রায় এমন কথা

বলেই এড়িয়ে যায়। ভাটার সময়টাও মাস দু-মাসে। একবার তো মাস চার পাঁচ। তখন সে কিছুতেই সুদক্ষিণার শরীরে হাত দিতে পারে না। তখন অভিমান এবং যতরকমের ভালোবাসাবাসির কথা। কিন্তু সুদক্ষিণার এক কথা, পেটের নীচটায় ব্যথা।

ডাক্তার দেখালে হত না।

না, আর না। যা সব ডাক্তার—হাত দিতে পারলেই বাঁচে। আর ও-মুখো হচ্ছি না। এমনিতেই সেরে যাবে।

ঠিক যায়ও সেরে। জোয়ার এলে রক্তকোশে কোনো কীট বাসা বাঁধলে তার আর নিস্তার নেই বুঝি। দু-পার ভাঙার মতো, নতুন দ্বীপ সৃষ্টি করার মতো, অথবা সবুজ বনভূমি—যা কিছুই হোক না, সুদক্ষিণা তখন সহজেই নিজে থেকে আরোগ্য লাভে উন্মুখ হয়ে ওঠে। অবেলায় সে খোঁপা বাঁধে। উচ্ছল হয়ে পড়ে অতি সহজে। এসব দেখলেই কনকেন্দু টের পায়, নদীর দু-পাড় আবার ফুলে ফুলে ভরে উঠবে। তখন সেও কেমন সকাল সকাল অফিস থেকে ফিরে আসতে বড়ো বেশি আকর্ষণ বোধ করে। দু-চার দিন, তারপর একজন পুরুষ মানুষের যা হয়, ক্লান্তিকর। কারণ তার শরীরে যে রক্ত প্রবাহ সেখানে বোধ হয় অত শুক্রকীটের জন্ম হয় না। অথবা রোজ রোজ সরবরাহ করা একটা বড়ো রকমের শারীরিক দায় হয়ে ওঠে।

সুতরাং কনকেন্দুর কেন জানি ইচ্ছে হল, আজ সে সুদক্ষিণার ডাকে সাড়া দেবে না। সুইট সিকসটিন, কিংবা টুয়েনটিও বলবে না। তোমার ইচ্ছে সব আমি পূরণ করে যাব, আমার উষ্ণতার দাম দেবে না। দীর্ঘকাল এটা চলতে পারে না। সে এ ভাববার সময়ই দেখল, সুদক্ষিণা নিজেই দরজা বন্ধ করে দিচ্ছে।

এই বাড়িতে সিঁড়িতে ওঠার মুখে দোতালায় কলাপসিবল গেট আছে। মাত্র তারা পাঁচজন মানুষ। মা তাদের ঘরে কখনোই আসে না। তাদের ঘরটায় মাত্র দুজন আসে। পাপু আর ঝুমকি। তার ঘরটায় আছে বড়ো ড্রেসিং টেবিলের আয়না। সুদক্ষিণা চায় না তার এই ঘরে কেউ এসে বসুক। সে যত নিজের আত্মীয় কিংবা মা-মাসি হোক। কনকেন্দু বুঝে উঠতে পারে না সুদক্ষিণার এত জেদ কেন। পাপু ঝুমকি বাদে কেউ তার ঘরে ঢুকলেই রাগ করে। এই ঘরটায় কী আছে? একটা লকার, বড়ো একটা ড্রেসিং টেবিল এবং তার চেয়েও বড়ো বেলজিয়াম কাচের আয়না। ঘরের যে, কোনো জায়গায় দাঁড়ালেই আয়নাটা প্রতিবিম্ব ভাসিয়ে রাখে। আসলে কী সুদক্ষিণা জানে এই দর্পণে তার এবং কনকেন্দুর নগ্ন শরীরের নানারকম ভঙ্গিতে ডজন ডজন অ্যালবাম রাখা আছে। আত্মীয়-অনাত্মীয় যে কেউ আসুক বড়ো আয়নাটা দেখলেই টের পায়, অথবা খুলে দেখতে পারে নরনারীর মধ্যে বীজ বপনের ক্ষেত্রটি কত সরস।

অবশ্য কনকেন্দু সুদক্ষিণার এই গোপন নিষেধাজ্ঞা নিয়ে কোনোদিন কোনো প্রশ্ন করেনি। প্রশ্ন করে জানতে চায়নি, এই বেডরুমে কেউ ঢুকলে সে এত রাগ করে কেন। ছোটো শ্যালক এলে একদিন কনকেন্দু তাকে নিয়ে এসে এই ঘরে বসিয়েছিল। সেই নিয়ে সুদক্ষিণার কী মুখ ভার। বলেছিল, তোমার বড়ো বুদ্ধিসুদ্ধির অভাব। আর কোনোদিন কাউকে এ-ঘরে এনে বসাবে না।

কী বলছ! সানু তোমার ছোটো ভাই।

সে যাই হোক। বসাবে না বলেছি। শুধু এইটুকু মনে রেখো।

এসব সহস্যের সে কিনারা করতে পারত না। বলত, বসালে কী হয়।

কী হবে আবার। তুমি বুঝবে না, তোমাকে বোঝাতেও পারব না।

সেই জন্যই তো বুঝিয়ে বলার দরকার।

বারে, ঘরে ঢুকলে টের পাবে না।

কী টের পাবে।

তোমার মুণ্ড। তারপর খিল খিল করে হেসে দিয়েছিল। বড়ো আয়নাটায় দুজনের প্রতিবিম্ব ভাসছে। চোখ ছিল সুদক্ষিণার সে-দিকে। দেখ তোমার হাত!

হাতে কী আছে!

কী লোম হাতে।

তাতে কী হয়েছে।

আয়নায় বড়ো বেশি প্রকট।

প্রকট কথাটাই সুদক্ষিণা বলেছিল। কেমন সাধু বাংলায় কথাটা বলে যেন বোঝাতে চেয়েছিল, আয়নাটা বড়ো নির্লজ্জ। কোনো কিছু গোপন করতে জানে না।

অ এই! কনকেন্দু বুঝতে পেরে বলল, সত্যি এটা মনে হবার কথা। শচীন বিশ্বাসের বাড়িতে এক রবিবার তারা দুজনই আমন্ত্রিত হয়েছিল। আলাদা বসার ঘর তাদের নেই। শচীন তাকে এবং সুদক্ষিণাকে টেনে নিয়ে একেবারে নিজেদের বেডরুমে বসিয়েছিল। সুদক্ষিণা দেখেছিল তেমনি ওদের ঘরে একটা বড়ো আয়না। মুচকি হাসছিল। শচীনের বৌ বলে উঠেছিল, না ভাই তুমি কেন মুচকি হাসলে বলতে হবে। এমন করে ধরেছিল যে সুদক্ষিণার চোখ মুখ কেমন সব গোপন করতে গিয়ে লাল হয়ে গেছিল।

বাস-স্টপে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করেছিল, কী হয়েছিল বলতো? শচীনের বৌ তোমাকে এমন করে জানতে চাইল কেন?

বোঝ না!

কী বুঝব!

দেখলে না শচীন ঠাকুরপো উঠে চলে গেল। ঘরে লোকে এত বড়ো একটা আয়না কেন রাখে সবাই বোঝে। মা-বাবারা তো বোঝে সব। সঙ্গে আর কিছু না দিন আসবাব পত্রের মধ্যে এই একখানা বড়ো আয়না দরকার।

বা, সাজগোঁজ করতে হলে মেয়েদের তো বড়ো আয়নার দরকার হতেই পারে।

বেডরুমে তাই বলে থাকবে কেন?

কোথায় থাকবে! সাজগোজ তো সবাই বেডরুমেই করে থাকে। কার কটা আলাদা ঘর আছে। এটা অজুহাত। আসল উদ্দেশ্য অন্য।

সুদক্ষিণা খোলামেলা কথা বলতে ভালোবাসে না। আড়ালে আবডালে সব বুঝিয়ে দিয়েছিল। সানুকে কেন, সে আর এখন নিজেকেও এই ঘরে নিয়ে আসতে সংকোচ বোধ করে।

সুদক্ষিণা বুঝিয়ে দেয়, এই দর্পণে যে প্রতিবিম্ব আছে তা নরনারীর স্বপ্নের পৃথিবী। অথবা রাজকন্যার সেই ভ্রমরের কৌটার মতো। একমাত্র কোনো রাজপুত্রই তা খুলে দেখতে পারে।

তারপর বলেছিল, তবে বল, অন্য কেউ এলে তোমার লজ্জা হয় না। আমার তো হয়।

কনকেন্দুর মনে হয়েছিল, সুদক্ষিণার এই ভাবনা মিছে নয়। তারও হয়েছে। বিয়ের আগে সম্পর্কে এক দাদার বাড়িতে গেলে ঠিক এমনি একটি দর্পণের মুখোমুখী হয়েছিল। দর্পণে সে উলঙ্গ ছবি দেখেছে। মানুষের মগজে যে তরল পদার্থ থাকে তার মধ্যে কত আড্ভুত সব ছবি যে ভেসে বেড়ায়। দর্পণে বৌদি এবং অন্য কেউ, বৌদিটি তার সমবয়সী, সুন্দরী, ছিমছাম, ঠিক অতসী ফুল ফুটলে যে লাবণ্য থাকে, তার গায়ে ছিল সেই লাবণ্য। সে আয়নার দিকে যতবার তাকিয়েছে এমন ছবি ভেসে উঠেছে। সে মনে করেছিল, এমন সে শুধু একলাই ভাবে। সানু কিংবা যে কেউ ভাবতে পারে এটা তার মনে হয়নি। সুদক্ষিণার কথায় টের পেয়েছিল, বাথরুমে কিংবা বেডরুমে আয়না সত্যি বড়ো অশোভন। অথচ এটা সরিয়ে ফেললে কোথায় যেন জীবনের প্রতি একটা বড়ো অবিচার করা হয়।

কনকেন্দুর এই হয়—একটা থেকে আর একটা। সুদক্ষিণা বিছানায় উঠে হাত-পা ছড়িয়ে শুল।

কনকেন্দু বলল, জান শরীরটা ভালো নেই। ঘুম পাচ্ছে।

ঘুমোও না। পাশে শুয়ে ঘুমোও। আমিতো কিছু করছি না।

পাপু যদি এসে ডাকে।

আমরা ঘুমিয়ে পড়েছি। ডাকবে কেন!

জান আমার কেন জানি মনে হচ্ছে, আজ ওরা ডাকবে।

ডাকলে উঠবে না। দরজা খুলবে না বলছি।

কেন দরজা খোলা যাবে না কনকেন্দু বোঝে। আলোটা না নিভিয়ে শুয়ে পড়েছে যখন তখন তার নিস্তার নেই। নিস্তার কথাটাই মনে এল। কারণ, ক-দিন থেকে রোজ রোজ এই যাত্রার সখিটি তাকে নিয়ে উঠেপড়ে লেগেছে। রোজ সাজা এবং মঞ্চে উঠে আসা। তারপর সায়ার দড়ি আলগা করে রাখা। তার কপালে বড়ো টিপ, সিঁথিতে চওড়া সিঁদুর—সতীলক্ষ্মী কিংবা সীতা-সাবিত্রীর মতো মুখ। সায়ার দড়ি টেনে খোলার একটা বিশেষ শব্দ হয়। কনকেন্দু তখন যতই অন্যমনস্ক থাকার চেষ্টা করুক, শব্দ রক্তের মধ্যে সহসা ঝড় তুলে দেয়। সে দেখেছে, কখনও যদি আগে শুয়ে পড়ে এবং ঘুম লেগে আসে, বিছানায় ওঠার নামে তাকে ডাকবে।—এই একটু পা দুটো সরাও না। আমি উঠব।

এইসব কথা বলে তাকে জাগিয়ে দেওয়া এমন সব অজুহাতে তাকে সতর্ক করে দেওয়া —যেন যতই ঘুমাও আমি তোমাকে রেহাই দিচ্ছি না।

কনকেন্দু বলল, জান আজ অফিসে একটা কাণ্ড হয়েছে।

কী কাণ্ড!

আমাদের রাধাবাবুর বিরুদ্ধে নালিশ দিয়েছে নীলিমা।

সুদক্ষিণা দুজনকেই চেনে। বিবাহ বার্ষিকীতে একবার তারা এসেছিল। মুখরোচক একটা খবর তখনই সুদক্ষিণা পেয়ে গেছিল।

সুদক্ষিণা পাশ ফিরে শুল। অফিসের কোনো মজার খবর তার এখন শুনতে ভালো লাগছে না। পাশ ফিরে শুয়ে কনকেন্দুর বুকের উপর হাত রাখল।

কনকেন্দু বলল, নীলিমার নালিশ..........

সুদক্ষিণা ধীরে ধীরে কনকেন্দুর হাতটা তুলে নিচ্ছে।

কনকেন্দু আয়নায় দেখছে, সুদক্ষিণা হাতটা নিয়ে খেলা করছে। উঠে বসেছে। চোখ অলস।

ঝুমকি তখনই দরজায় হুমড়ি খেয়ে এসে পড়ল, ডাকল—মা মা! দাদা আমাকে বিছানায় উঠতে দিচ্ছে না।

সুদক্ষিণা তাড়াতাড়ি শাড়ি দিয়ে শরীর ঢেকে বলল, এই রা করবেন না।

মা শুনছ।

সুদক্ষিণা কনকেন্দুর হাত চেপে ধরছে।

ঝুমকি দরজা ধাক্কাচ্ছে।— মা মা।

কনকেন্দু কী করবে বুঝতে পারছে না। একটা চাদর টেনে সুদক্ষিণার শরীর ঢেকে বলল, কী হল তোদের!

মার গলা তখন, দেখ, পাপু ঝুমকি কী শুরু করেছে!

ঝুমকি বলছে, দাদা আমাকে মেরেছে। আমি দাদার সঙ্গে শোব না। কিছুতেই শোব না।

কনকেন্দু উঠে প্রথমে আলোটা নিভিয়ে দিয়ে দরজা খুলল। অন্ধকার ঘরে কনকেন্দু ফিস ফিস করে বলল, চিৎকার করে না। মা ঘুমোচ্ছে। তোমাদের মাকে কত সকাল সকাল উঠতে হয়—এমন করলে চলে। আসলে কনকেন্দু মজা পাচ্ছে। প্রতিশোধটা জববর নেওয়া হচ্ছে। কারণ সুদক্ষিণা এখন কূট কামড়ে পাগল। শরীর তার অলস হয়ে পড়ে আছে। রাগ দুঃখ ক্ষোভ অভিমান সব একসঙ্গে নড়ে চড়ে বেড়াচ্ছে শরীরে। কনকেন্দু মজাটা উপভোগ করতে থাকল। আমার বেলায় একই কষ্ট যেন বলতে চাইল। তখন তুমি অনায়াসে পেট ব্যথা কিংবা ঘুম পাচ্ছে—কখনও হাই তুলে, ইমা—কত রাত হয়ে গেছে, ঘুম না আসতেই সকাল হয়ে যাবে, হাজারটা তোমার অজুহাত। হাত দিলেই তখন তোমাকে বিরক্ত করা হয়। আমার শরীরে তখন এই একই হাজার জোনাকি দপ দপ করে জ্বলে। তুমি সেটা কিছুতেই বুঝতে চাও না।

মা বৌমাকে এ-ব্যাপারে খুব ভয় পায়। বৌমাটির কাঁচা ঘুম ভেঙ্গে গেলে সংসারে সেদিন নানা রকমের অনর্থ সৃষ্টি হয়। মাথা ধরে। বমি পায়। মা তার নাতনিকে বগলদাবা করে, এই চুপ, তোমাদের মা ঘুমোচ্ছে—কথা বলিস না, লক্ষ্মী সোনা বলে টানতে টানতে দরজার ভেতরে ঢুকিয়ে নিতেই কনকেন্দু ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখল, কেমন বেপরোয়া ভঙ্গি পাপুর।—না আমার সঙ্গে শোবে না।

কোথায় শোবে।

আমি কী জানি। আমাকে ও লাথি মারে। ঘুমোতে দেয় না।

কী সব বাজে বকছিস কনকেন্দু ধমকে উঠল।

ওর আলাদা বিছানা করে দাও। আমার সঙ্গে ও শোবে না। ও শুলে মাটিতে শুয়ে থাকব আমি।

কনকেন্দু অন্য সময় হলে কড়া ধমক দিতে পারত। কিন্তু ওর মা তো ঘুমোচ্ছে না। ওর মা সোনার কৌটা খুলে শুয়ে আছে। সে পাপুর সঙ্গে মিছে কথা বলছে—মা ঘুমোচ্ছে, আস্তে

কথা বল। সবটাই বানানো—নিজের দুর্বলতা টের পেয়ে কনকেন্দু কেমন ছেলের সামনে অসহায় ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকল। এবং নিজের মধ্যে যেন কোনো অনুশোচনা, অনুতাপ—সন্তানকে এত ছোটো বয়েস থেকে আলগা করে দিলে বোধ হয় ব্যবধানটা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে যায়। সে দেখল মা, ঝুমকিকে নিজের খাটে তুলে নিচ্ছে তখন। তার দিকে তাকিয়ে মা বলছে, ঠিক আছে, ঝুমকি আমার সঙ্গে শোবে।

মার সাদা বিছানা, মার শরীরে সাদা থান, ধর্মগ্রন্থের মাঝখানে নিকেলের চশমা—মা কি টের পায়, বৌমা ঘুমোয়নি। বৌমা মটকা মেরে শুয়ে থাছে। নিজের সন্তানের কথাও তার এখন মনে পড়ে না! কেমন বিচলিত হয়ে পড়ছে কনকেন্দু।

ঘরে এসে ঢুকতেই সে সুদক্ষিণার ফিসফাস গলা পেল।—এই এস। দরজাটা বন্ধ কর।

বদলা নেবার কথা কনকেন্দুর আর মনে নেই। সুদক্ষিণার আচরণে কেমন এক বেহায়া মেয়েমানুষের আভাস পাচ্ছে। শরীরে কেমন তার বমি বমি ভাব। শরীরটা যে সত্যি মুহূর্তে চুপসে যাচ্ছে। মার সাদা বিছানা, সাদা থান, ধর্মগ্রন্থের মাঝখানে নিকেলের চশমা। মা ঝুমকিকে বুকে জড়িয়ে শুয়ে আছে। তার কিছু ভালো লাগছিল না। ঝুমকিকে বুকে নিয়ে শুতে পারলে আজ যেন তার বেশি আরাম বোধ হত।

কী হল দরজাটা বন্ধ করলে না।

করছি।

সে দরজা বন্ধ করে জল খেল। তারপর খাটে উঠতেই আবার সুদক্ষিণার আবদার, লক্ষ্মী আলোটা জ্বেলে নাও।

কনকেন্দুর চিৎকার করে উঠতে ইচ্ছে হল। না না, আলো না, আমার ভাল্লাগে না রোজ রোজ। কিন্তু সে কিছু বলতে পারে না। যেন বললে সুদক্ষিণাকে অপমান করা হবে। নারী মহিমাকে অপমান করা হবে। নারীর যে আসল রহস্য এবং সরস উর্বরা জমি সে তো কটা বছর—তারপর, সাদা বিছানা, সাদা থান, ধর্মগ্রন্থের মাঝখানে নিকেলের চশমা। সে এসব ভেবেও জোর পাচ্ছে না। তার কোনো ইচ্ছে জাগছে না। আলোটা জ্বালতেও দ্বিধা করছে। যেন আলোটা জ্বালালেই সুদক্ষিণার শরীর বড়ো কুৎসিত দেখাবে। সে কিছুতেই আজ সেটা দেখতে চায় না। সে শুয়ে পড়ে বলল, আজ থাক।

মুহূর্তে সুদক্ষিণা কেমন ক্ষেপে গেল। সে উঠে বসল। নিজে উঠে আলোটা জ্বেলে, জল খেল। শরীর ঢেকে ঢুকে বলল, আমিতো তোমার কেউ না। আমার জন্য আর তোমার টান নেই। সব বুঝি। আমাকে তুমি একদম ভালোবাস না।

ভালোবাসব না কেন!

না, না, তুমি আমাকে একদম ভালোবাস না!

কনকেন্দু আয়নায় সুদক্ষিণার মুখ দেখতে পাচ্ছে। ফুঁসছে সুদক্ষিণা।

কনকেন্দু পাশ ফিরে শুয়ে বলল, আস্তে মা শুনতে পাবে। আয়নায় নিজেকে দেখ।

কী দেখব!

দেখই না।

সুদক্ষিণা আয়নায় নিজেকে দেখতেই কেমন ঘাবড়ে গেল। বাইজি মেয়ের মতো তার সাজ গোজ। কনকেন্দুর ঠাট্টা বুঝতে পেরে তার মাথা কেমন আরও গরম হয়ে গেল। সে কাঁপছে। তাকে এত নীচ ভাবে কনকেন্দু। সে ক্ষোভে দুঃখে অপমানে জলের গ্লাসটা পাগলের মতো আয়নায় ছুঁড়ে মারল।

ঝন ঝন শব্দ। কনকেন্দু হকচকিয়ে উঠে পড়ল। এসে জড়িয়ে ধরল সুদক্ষিণাকে। এই ছিঃ কী করলে! কী হয়েছে তোমার। মা, ঝুমকি পাপু ছুটে এসেছে—বাবা বাবা!

মা মা!

কনকেন্দু বলল কিছু হয়নি। হাত থেকে পড়ে কাচের গ্লাসটা ভেঙ্গে গেল। জল খাচ্ছিলাম।

কনকেন্দু যখন টের পেল দরজার ও পাশে কেউ নেই, তখন হাত ধরে বলল, ছি এই পাগলামি করার অর্থ কী বলত! তোমার কী হয়েছে।

আমার কিছু হয়নি। আমি তো বাজারে মেয়ে। আমার কী হবে। বলে হাউ হাউ করে কেঁদে দিল।

কনকেন্দু আহাম্মক। সে এত বুঝে কিছু করেনি। জড়িয়ে ধরে বলল, এস। ভেতরে তুমি এত ভেঙে পড়বে সত্যি বুঝতে পারিনি।

ছাড় তুমি আমাকে। বাজারে মেয়েকে ছুঁলে তোমার পাপ হবে।

সে এবার নিজেই সুদক্ষিণার বসন আলগা করে দিতে থাকল। জড়িয়ে ধরে বলল, তুমি আমার সতী লক্ষ্মী। তারপর সহবাসে মগ্ন হবার সময় ভাঙা আয়নায় দেখল, তাদের শরীর বড়ো তেড়া-বেতেড়া। এ শরীর যেন কোন এক কালে সুঠাম থাকে—ধীরে ধীরে কাল তাকে এক সময় হরণ করে নেয়।

সকালে ভাঙা আয়নাটা আজ প্রথম সুদক্ষিণা একটা কালো পর্দায় ঢেকে দিল। তারপর চলে গেল মার ঘরে। ঝুমকিকে বুকে জড়িয়ে নিয়ে এল বাথরুমে। হাত মুখ ধুইয়ে দিল। মুখ মুছিয়ে দিল। যেমন করে একজন মায়ের স্বভাব পড়তে বসানো, টাসক দেখা, চা,

দাঁত মাজার ব্রাশ সব ঠিক ঠাক করে দেওয়া, দিনমানের কাজ এ ভাবে সকাল থেকে সুদক্ষিণার শুরু হয়ে গেল।

নারীর অন্য আর এক রূপ আছে। সে জননীই হোক, আর চটুল বাজারে মেয়েই হোক। এটুকু আছে বলেই কনকেন্দুর মনে হয় নারী পুরুষের কাছে এত রহস্যময়ী। চা দিতে এসে সুদক্ষিণা ভাঙা আয়নাটার দিকে তাকাল না আজ। চোখ টেনে শুধু বলল, তুমিই তো আমাকে ক্ষেপিয়ে দিয়েছিলে। আমার কী দোষ। কেমন সংকোচে এবং লজ্জায় কথাটা বলে বের হয়ে গেল সুদক্ষিণা!

আয়নার কালো পর্দাটা তুললেই যেন কনকেন্দু আজ এই ঘরে একটা সাদা থান, সাদা বিছানা, ধর্মগ্রন্থের মাঝে নিকেলের চশমা দেখতে পাবে। কনকেন্দুর কেমন একটা ভয় ধরে গেল।

ঝুমির দুঃখ

সকালবেলায় যে কী হয়, কিছুতেই ঘুম থেকে উঠতে চায় না ঝুমি। বিরক্ত বিরজা সুন্দরী। গজগজ শুরু সক্কালবেলাতেই।

নে ঝুমি। যত পারিস ঘুমিয়ে নে। বেলা কত হল টের পাস না। জীবনেও পাবি না। দ্যাখ তোর কপালে কী লেখা আছে। সোমও মেয়ে, ঘুম তোর ভাঙে না। কবে ভাঙবে। আমি মরলে!

ঝুমি লেপ-কাঁথায় মুখ ঢেকে পড়ে আছে। বুড়ির চোপা শুরু হয়ে গেছে। সে কিছুতেই সাড়া দেবে না। চেঁচাক, চেঁচিয়ে বাড়ি মাথায় করুক তবু সাড়া দেবে না।

বিরজা সুন্দরী সাতসকালে উঠে কে কী করছে, সে চোখ বুজেও টের পায়। আকাশ পরিষ্কার না হতেই উঠে পড়ার অভ্যাস। এক সঙ্গে এক তক্তপোশে শোয়। কাক ডেকে গেলেই, দুগগা দুগগা শুরু হয়ে যায়। উত্তুরে হাওয়ায় দরজা খুললেই ঠান্ডায় টাল মেরে যায় ঘরটা। দরজা খুলে কখন বের হয়েছেন তাও সে জানে। উঠোনে নেমে হাত জোড় করে সূর্যপ্রণাম। তারপর ঘটি নিয়ে কলতলায়। তারপর একখানা বালতিতে গোবর জল। সারা বাড়ি গোবর ছড়া। ঘর থেকে এঁটো বাসন কলতলায় নিয়ে যাওয়ার সময় একবার ডেকে গেছেন, ঝুমি ওঠ। হাত মুখ ধো। তোর মেসোর বাড়ি যেতে হবে। গোছগাছ করে না দিয়ে গেলে এক হাতে পারি। সে সাড়া দেয়নি।

চালাঘরটা গোবর জলে লেপে দেওয়ার সময় আবার ডেকেছে, কত বেলা হল। একটু চা করে আমাকে দে! তুই খা। সাইকেলটা মেরামত না করলে যাবি কী করে। অধরকে বলেছি, ঝুমির সাইকেলটা পানচার হয়ে গেছে। মেরামত করে দিস, খোকার টাকা এলে দিয়ে দেব। ও ঝুমি, কী বলছি, কানে কী যাচ্ছে তোর!

ঝুমি সারা দেয়নি।

সে বলতে পারত, এত সকালে উঠে কী করবটা শুনি। রোজ একই কথা কাঁহাতক ভালো লাগে। কিছুই করতে দেবে না। হাত-পা নোংরা হবে। শরীরে গোবরের গন্ধ লেগে থাকবে। সকালবেলায় জল ঘাঁটাঘাঁটি করলে হাতে, পায়ে হাজা হবে। পাত্রপক্ষ দেখতে এলে পছন্দ হবে না।

ঝুমির তখন মরে যেতে ইচ্ছে হবে। পাত্রপক্ষ দেখতে আসবে শুনলেই তার মাথা গরম হয়ে যায়। কাল রাত থেকেই পাত্রপক্ষর আসা শুরু হয়েছে। সকালে উঠতে হবে। বড়ো মাসিকে খবর দিতে হবে। কত কথা বুড়ির পারব না। তার এক কথা।

তোর ঘাড় পারবে। পারবে না। ঘরের খুঁটি হয়ে থাকতে চান। বলবি, কৃপানাথ খোঁজ দিয়েছে পাত্রের। লেবুতলায় বাড়ি। পাত্রের বাজারে চালের দোকান আছে। একটু বয়স বেশি, দোজবর। তাতে কী কিছু কমতি থাকে পুরুষ মানুষের?

আমি কোথাও যেতে পারব না। খুঁটি হয়ে থাকি আর বাঁশ হয়ে থাকি, পারব না।

এত ভালো পাত্র হাতের কাছে কোথায় পাব। কৃপানাথ বলেছে ঝুমি মাথা পাতলে হয়ে যাবে।

দিদা, তুমি চুপ করবে।

আমি চুপ করব কেন। কী খারাপ কথা বলছি। পাত্র কী খারাপ কথা!

আবার পাত্রপক্ষ চেঁচিয়ে দ্যাখ কী হয়।

বিরজা সুন্দরী ঘাবড়ে গিয়ে বলেছিলেন, পাত্রপক্ষ বললে তোর এত মাথা গরম করবার কী আছে বুঝি না। চেষ্টা তো কম করছি না। কাকে না ধরেছি। কেউ মাথা পাতে। তোর মামারা তো হাত ধুয়ে বসে আছে। বাপের খবর নিতে গেলে গোপের বাগে যেতে হয়। কে যায়! তার কী মাথায় আছে, মা মরা মেয়েটার হিল্লে করা দরকার। সে কী মানুষ! মরেছি, কী বেঁচে আছি তারও খবর নেয় না।

ঝুমি চুপচাপ চা না খেয়ে বের হয়ে যেতে পারে। মদনের বউর ঘরে গিয়ে বসে থাকতে পারে, কথায় কথায় খাওয়ার ওপর এত রাগ যে, দিদা তখন জলে পড়ে যায়। সে গুম মেরে গেলে তাকে বেশি ঘাঁটায় না।

এই সেদিন ফের আর এক নতুন পাত্রপক্ষ হাজির। সাঁজবেলায় কোথা থেকে হন্তদন্ত হয়ে ফিরে এসেই বলেছিলেন, ছেলেটার সঙ্গে তোর যদি হয় রাজযোটক হবে। বি এ পাস। কিছুদিন মাথা খারাপ ছিল। কেবল বসে বসে কাগজ ছিঁড়ত। থুতু ছিটাত। খুব মেধা। বি এ পাস সোজা কথা। পড়তে পড়তে মাথা খারাপ। শহরে কোঠাবাড়ি আছে। টাকাপয়সা বাপ যা রেখে গেছে তোদের চলে যাবে। ছেলেটি দেখতেও বেশ। লম্বা দশাসই চেহারা। তোর সঙ্গে মানাবে ভালো। তারপর কেন যে বলেছিলেন, এক গ্লাস জল দে। এতটা রাস্তা, হেঁটে কী আসা যায়! রিকশাওয়ালারা সব নবাব। এটুকু রাস্তা বলে কী পাঁচ টাকার কমে হবে না দিদিমা। তোদের মুণ্ডু, দ্যাখ বুড়ি পারে কী না। হাঁটতে হাঁটতে চলে এলাম। কৃপানাথ নিয়ে গেছিল—শহরে কাজ আছে বলে সঙ্গে ফিরতে পারেনি।

জল সে দেয়নি। তার মাথা গরম। পাগল ছাগল বা যা পাওয়া যায়। ভেবেছে কী! সে গুম হয়ে বসেছিল কিছুক্ষণ। তারপর বলেছিল, জল নিয়ে খাও। কে বলেছিল যেতে।

ঝুমির সঙ্গে পাত্রপক্ষের কথাবার্তায় বিরজা সুন্দরী কখনও মাথা গরম করেন না। অনেক সময় ঝুমির সামনে পাত্রপক্ষের কথা তুলতেও আতঙ্ক বোধ করেন। কত যে সম্বন্ধ এল। ঝুমি সামান্য প্রতিবন্ধী। একটু খুঁড়িয়ে হাঁটার স্বভাব। বিরজা সুন্দরী আর কী খুঁত আছে বোঝেন না। লোক আসে, দেখেও যায়, কী সুন্দর চোখ ঝুমির। হাতে পায়ে লাবণ্য ঝরে পড়ছে। সেই ঝুমি এক গ্লাস জল না দিলে যে পাপ হবে, তাও বোঝে না। বিরজা সুন্দরী সব সয়ে গিয়ে, নিজেই জল ভরে খেয়েছিলেন। ঢকঢক করে জল খেয়ে বলেছিলেন, মাথাখান তার তো ঠিকই আছে দেখলাম। আমার সঙ্গে কী সুন্দর কথা বলল। মাথার দোষ সেরে গেছে। একটাই দাবি—আইন পাস করলে বিয়ে।

ঝুমি চৌকাঠে হেলান দিয়ে শুনছিল। ঘরে একখানা হ্যারিকেন জ্বলছে। দাওয়ায় কুকুরটা শুয়ে আছে। চালাঘরটায় একটা কুপি জ্বলছে। বাড়িটা অন্ধকারে ডুবেছিল। তারকের মার গলা পাওয়া যাচ্ছে। দিদার খবর নিতে এসে সেও বসে গেছে। ঠিক, বুড়ি পাত্রের খবর নিতে যাওয়ার সময় সাত কাহন করে সবাইকে বলে গেছে। সম্বন্ধ এলেই বুড়ির যেন বেশি দুটো হাত-পা গজায়।

তারকের মা এক মুখ জর্দা মুখে পান চিবাচ্ছিল। আর চবর চবর কথা বলছিল।

কথা হল!

হল রে মা! আমার হলে তো হবে না। ওর মেসো মামারা দেখুক, বিয়ে বলে কথা, সাত মণ ঘি না পুড়লে হয়!

কোনো দাবি দাওয়া!

দাবি দাওয়া আর কী করবে? বললাম, মা মরা মেয়েটাকে উদ্ধার করেন। ঝুমি আমার শরীর দিয়ে পুষিয়ে দেবে।

থামবে! চেঁচিয়ে উঠেছিল ঝুমি।

শরীর দিয়ে পুষিয়ে দেবে কথাটা কত অশ্লীল, দিদা বোঝেন না। ঝুমার জ্বালা ধরে যায়। তারকের মা সুবিধের নয়, সম্বন্ধ না হলে কেচ্ছা ছড়াবে। দিদা কেন যে বোঝেন না। তার ঘর থেকে বের হয়ে যেতে ইচ্ছে হচ্ছিল। কোথায়ই বা যাবে। মদনদা বউকে নিয়ে বেথুয়াডহরি গেছে। দুই মামির বাড়ি জমি পার হলে। ইলেট্রিকের লাইট এয়েছে এই গরিমাতেই মামিদের পা পড়ে না মাটিতে। সেজমামি টিভি কিনেছে, আগে সন্ধ্যা হলেই ছুটে যেত। এখন আর তার তাও যেতে ইচ্ছে করে না।

তুই ঝুমি ফোঁস মনসা—কোনও কথা বলা যায়! কথায় তোর এত বিষ, ওঝার খোঁজে আছি, আসুক, বিষ কী করে নামাতে হয় তখন টের পাবি।

সে উঠে পড়েছিল। উঠোনে কাঁঠালগাছ, তার ছায়ায় একা দাঁড়িয়ে ছিল কিছুক্ষণ।

তুই আবার কেথায় গেলি! আলো নিয়ে উঠোনে বের হয়ে এসেছিলেন বিরজা সুন্দরী। তারকের মাও বের হয়ে এসেছে। তারকের মা বলল, যা ঘরে যা। অশান্তি করিস না। খোঁজখবর না নিয়ে তো আর কথা পাকা হচ্ছে না।

ছেলে কী করে কাকিমা?

বিরজা সুন্দরী বললেন, কিছু করে না। আইন পড়তে চায়। একটাই দাবি কলকাতায় রেখে আইন পড়াতে হবে। তা আমার খোকাকে লিখলেই হবে। দুটো তো বছর, দেখতে দেখতে কেটে যাবে। আইনটা পাস করিয়ে দিতে লিখব। খোকা আমার কথা ফেলতে পারবে না।

তারকের মা সব খবরই নিয়ে চলে গেল। মাঝে মাথা খারাপ ছিল। এখন ভালো আছে। সুস্থ আছে। বি. এ. পাস। ঝুমি কিছু পাস না করা মেয়ে, বি. এ. পাস ছেলে পাওয়া কত কঠিন, তাও স্বীকার করে চলে গেল!

দেখুন মেয়েটার ভাগ্য যদি খোলে। নিয়তি বলে কথা। উঠোনে দাঁড়িয়েই বিরজা সুন্দরী আর তারকের মার কথা হচ্ছিল। ঝুমি ঘরে ঢুকে, ঠাকুরের ফটো থেকে ফুল বেলপাতা সরিয়ে সিল্কের কাপড় দিয়ে তারকেশ্বরের ফটো ঢেকে দিল। এই কাজগুলি করলে মনে সে শান্তি পায়। জ্বালা থাকে না। কে কী বলছে শুনতেও তার ভালো লাগে না। রাতে সামান্য ভাত করে নিলেই হয়। দিদা দুধ রুটি খান। সে চালাঘরটায় ঢুকে আটা মাখতে বসে গেল।

বিরজা সুন্দরী তারকের মাকে কিছুটা রাস্তা এগিয়ে দিতে গেছেন। কুকুরটা দিদার পিছু নিয়েছে। সে একা। পাটকাঠি জ্বেলে খড়কুটো আখায় ঢুকিয়ে দু-হাঁটুর মাঝে মুখ গুঁজে দিয়েছিল।

বিরজা সুন্দরী ঢুকতেই সে টের পেল, দিদার কথা শেষ হয়নি। নিজে নিজেই বকছেন। বয়স হলে এই বুঝি হয়। সারাদিন প্যাচাল ছাড়া থাকতে পারেন না। তা রাজি হয়ে এলাম। বলে এলাম, আমার বড়ো পুত্র খুবই বিবেচক মানুষ, মার কথা ফেলতে পারবে না। আপনার ছেলে আমাদেরও ছেলে। একটা চিঠি লিখতে হবে, তোর মেসোকে দিয়ে। বুঝলি ঝুমি, সকালে তোর বড়ো মাসিকে খবর দিবি। ওরা দুজনে যেন চলে আসে। তোর সেজমামাকেও আসতে বলবি। সবাই পরামর্শ করে একখানা চিঠি লেখা দরকার। আমার বড়ো পুত্রের কোনও অভাব আছে! ঠাকুর চাকর, মেলা ঘর। দোতলার একখানা ঘর না

হয় ছেড়ে দেবে। দুটো তো বছর। বুঝিয়ে লিখলে ও মাথা পাতবে। ওর তো এক কথা, সব করব মা, কিন্তু পণ দেব না। আরে বাবা, পণ ছাড়া বিয়ে হয়! পণ না দিলে মেয়ের ইজ্জত থাকে—তা তুই তোর কথাও রাখ, মার কথাও রাখ। পণ চায়নি, আইন পড়তে চেয়েছে। পরের ছেলেকে পড়ালে পুণ্য হয়। খোকা নিজেও তো পরের বাড়িতে মানুষ। তোর রাঙাকাকা না নিয়ে গেলে, তোর রবরবা থাকত কোথায়! পরের ছেলে লোকে মানুষ করে না! ঝুমির ভবিষ্যৎ বুঝবি না।

ঝুমি কোনও কথা বলেনি। যার কথা ফুরিয়ে যাওয়ার কথা, তারই এখন কত রাজ্যের কথা। সকালে ঘুম থেকে উঠেই শুরু হয়েছে, সকালে উঠে সাইকেলটা অধরের দোকানে নিয়ে যাবি। পানচার ঠিক করে নিবি। আমার হাতের কাজ এগিয়ে চলে যাবি মেসোর কাছে। থেকে যাস না আবার। বড়ো মাসির কী! বোঝে, আমার কষ্ট বোঝে। আদর করে পাঁচ পদ খাওয়ালে, এটা ওটা দিয়ে ভরে রাখলেই কী শরীর বোঝে!

ঝুমি আর পারে!

সে লেপ কাঁথা সরিয়ে কথা এড়িয়ে উঠে গেল। কলপাড়ে গিয়ে হাতমুখ ধুল। র্যাপার গায়ে জড়িয়ে বারান্দায় নেমে বলল, দিদা তুমি কী আরম্ভ করলে সকালে উঠে বলত!

কী আবার আরম্ভ করলাম!

এমন মুখে তাকিয়ে থাকলেন বিরজা সুন্দরী যে ঝুমি কী বলবে আর ভেবে পেল না। চোখে এক অপার্থিব শূন্যতা—যা দেখলে বড়ো কষ্ট হয় তার। কতদিন থেকে সে যেন সত্যি দিদার গলার কাঁটা হয়ে আছে। এত উচাটনে থাকে যে, মাঝে মাঝে মনে হয়, বুড়ির না শেষে মাথা খারাপ হয়ে যায়। হয়ে যে যায়নি তাই বা কে বলবে—তা না হলে বড়ো মামাকে চিঠি লিখবে ভাবতে পারে! কে না কে—তার স্বভাব চরিত্র কেমন, সেখানে গিয়ে ফের পাগলামি শুরু হতে পারে। মামি পছন্দ করবেন কেন! কোনও অপরিচিত লোককে, কেউ বাড়িতে রেখে জামাই আদরে খাওয়াবে দিদাই ভাবতে পারে।

তা দিদার কথা ভেবে হাসিও পাচ্ছিল, আবার কেন যে কান্না পাচ্ছে।

সে আখায় খড়কুটো জ্বেলে চা করে দিল দিদাকে। চা খেয়ে দিদার মাথা ঠান্ডা হয়। ঠান্ডায় কুঁকড়ে আছে। আগুনের পাড়ে বসে বিরজা সুন্দরী তার স্বপ্নের কথা শুরু করে দিল।

তোর দাদু, বুঝলি, তোর দাদুর বাবা, মানে আমার শ্বশুর, আমাকে কোথায় দেখেছিলেন জানিস?

কোথায়!

আমাদের এক শিষ্য বাড়ি। দেখেই পছন্দ। বাবা আমার সেকেলে মানুষ, শিষ্য বাড়িতে দেখলে তো হবে না। বাড়ি গিয়ে দেখতে হবে। শ্বশুরমশাই তাতেও রাজি। কোনও বরপণ দিতে পারবেন না, তাতেও রাজি। আমার গরিব বাবার কন্যাদায়, কী বুঝে যে তোর দাদুর বাবা বলে ফেললেন, দেখুন বেয়াইমশাই, কন্যাটি আমাদের রত্ন—যদি দোষ না ধরেন বলি, তুলে নিয়ে না হয় স্বগ্রামে নিয়ে যাব। সেখানেই বিয়ে হবে। ব্যাণ্ড পার্টি বাজিয়ে একটা মিছিল বুঝলি, পালকিতে আমি আর আমার ছোটো বোন সরণি। অচেনা জায়গা, অদেখা মানুষ তারাই তো শেষে নিজের হয়ে গেল! তুই এত ঘাবড়ে যাস কেন বল তো, খোকাকে বুঝিয়ে বললে, ও বুঝবে না মনে করিস।

আমি কিছু জানি না।

এটা তোর রাগের কথা ঝুমি। ইস চায়ে মিষ্টি দিসনি! মাথা দেখছি তোরও ঠিক নেই।

তোমার পাল্লায় পড়লে কারও মাথা ঠিক থাকে! তুমি কৃপাদাকে নিয়ে চলে গেলে। বড়োমাসি বলেছে না, ও একটা ঠক জোচ্চোর—ঘটকালি করে খায়, ওর পাল্লায় পড়বে না।

আরে নিজ চোখে বাড়িঘর দেখে এলাম, মিছা কথা হবে কেন।

সে যা ভালো বোঝ করো।

তুই তবে চলে যা। কল থেকে দু-বালতি জল তুলে রেখে যাস। সাইকেলে চলে যাবি। এক ক্রোশ রাস্তা কতক্ষণ লাগে বল। তোর ঠেঁটা স্বভাব, যেখানে যাবি উঠতে চাস না। আসার সময় বাজার হয়ে আসিস। ভালো মাছটাছ পেলে আনবি। কৃপানাথকে খেতে বলেছি। গরিব মানুষ, এক ডাকে সাড়া দেয়। আমার আর কে আছে বল! সত্যি দিদার কেউ নেই। শেষে সেই পালকি সুন্দরী আজকের বিরজা সুন্দরী। সবাই উড়ে চলে গেছে। খোঁজখবরও বড়ো একটা কেউ রাখে না। দুই মামা, পাশেই বাড়ি করে আলাদা থাকে, তাদের যে দিদা পেটে ধরেছে এখন দেখলে, তাও মনে হয় না। তাকেও উড়িয়ে দেবার মতলবে কত ফন্দি মাথায় নিয়ে যে ঘুরছে।

বড়োই কাতর অনুরোধ। যা দুটো রুটি করে দিচ্ছি, খেয়ে চলে যা। আমার কী কষ্ট আর কেউ বোঝে।

ঝুমি এখানটাতেই বড়ো দুর্বল বোধ করে। কিন্তু তার তো ইচ্ছে হয় না যেতে। কোনো মেয়ে কবে তার পাত্রপক্ষের খবর দিতে মাসির বাড়ি যায়, সে জানে না।

সে সাইকেলে বড়ো মাসির বাড়ি রওনা হলেই টিটকারি, কী রে ঝুমি মাসির বাড়ি যাচ্ছিস!

সে সাড়া দেয় না।

কী রে ঝুমি কোনও খবর বুঝি এসেছে!

সে সাড়া দেয় না।

সাইকেল চালিয়ে যায় ঠিক, সবাই জানে সে মাসির বাড়ি যাচ্ছে পাত্রপক্ষের খবর দিতে।

দিদা বোঝেই না, একটা মেয়ের পক্ষে এটা কত অসম্মানের কথা! লজ্জার কথা।

সে সাইকেলে উড়ে যেতে থাকলেই টের পায়, দিদা খবর দিয়ে বেড়াচ্ছে।

ও ঠানদি ঝুমি কোথায়!

আর কোথায় রে ভাই। পাত্রপক্ষের একটা খবর পেলাম। ওর মাসি-মেসোকে খবর দিতে বললাম। সেখানে গেছে। আমার আর কে আছে, যাবে। তার তখন শুধু কান্না পায়। সাইকেলে সে যায় ঠিক, তবে সে গোপনে কাঁদেও। আজ তার কী যে মনে হল, সে কিছুতেই খবরটা দেবে না ঠিক করল। দিদার মাথা খারাপ হতে পারে, তার তো মাথা খারাপ হয়নি।

কিছুটা রাস্তা গিয়ে মনে হল, না গেলে অথর্ব শরীর নিয়েই বুড়ি হাঁটা দেবে। সে আর কী করে। মাসি-মেসোকে খবর দিয়ে সোজা চলে এল। বড়ো মাসি গেল, মেসো গেল পাত্রপক্ষের বাড়ি। তারাও ঝুমিকে দেখে গেল।

খুবই পছন্দ।

তার কিছু ভালো লাগে না। সে যে কী করে!

চিঠিটাও লেখা হয়ে গেল। ইনল্যান্ডে ইনিয়ে বিনিয়ে দিদা বড়ো মামাকে লিখেছে, এটা আমার শেষ কাজ বাবা। অমত করিস না। চিঠিটাও ঝুমিকে ডাকবাক্সে ফেলে দিয়ে আসতে হবে। ক্ষোভে দুঃখে তার চোখে জল এসে যায়।

চিঠিটা পেলেই মামির মুখ গোমড়া হয়ে যাবে। চিঠিটা পড়লেই ক্ষেপে যাবে মামি। মামা বেচারা মুখ গোমড়া করে বসে থাকবে। কিছু বলতে পারবে না।

গাছপালার ছায়া পার হয়ে অন্তহীন এক পথ চলে গেছে মনে হল তার। চিঠিটা দুবার বের করল ব্লাউজের ফাঁক থেকে। মনটা তার ভার হয়ে আছে। মামিমা ঠিকই টের পাবে, চিঠি ঝুমিই ডাকবাক্সে ফেলেছে। এত বেহায়া মেয়ে—ভাবতেই পারে। তার জন্য দিদা খাটো হয়ে যাবে। সে চিঠিটা দেখল। চারপাশে তাকাল। খালি মাঠ। স্কুল ছুটি। অদূরেই আছে ডাকবাক্স। ফেলার আগে কেন যে মনে হল, এ চিঠি মরে গেলেও ডাকবাক্সে

ফেলতে পারবে না। দিদার করুণ মুখখানিও ভেসে উঠল। চিঠিটা ছিঁড়ে হাওয়ায় উড়িয়ে দিতেই তার সমস্ত ভার যেন লাঘব হয়ে গেল।

বাড়ি ফিরে এলে দিদার এক কথা, ঠিকমতো ডাকবাক্সের ভিতর ফেলেছিস তো। ঠিকমতোই তো ফেললাম। ঠিকমতোই যাবে। এক গ্লাস জল দাও। খুব তেষ্টা। মিছে কথা বললে কী জলতেষ্টা পায়। তার এত তেষ্টা কেন!

দিদা যত্ন করে এক গ্লাস জল দিল। সে জলটা খেতে গিয়ে বিষম গেল। সারা ঘর জলময় হয়ে গেল। সে শুধু কাশছে। এত প্রবল কাশি যে মুখ ফুটে আর একটা কথা বলতে পারল না। সরল সাদাসিধে এই বৃদ্ধাকে মিছে কথা বলতে গেলে এত কষ্ট হয়, আগে জানত না। আজই সে তা টের পেল। তার চোখ ফেটে জল আসছে। কী নিশ্চিন্ত মুখ। প্রশান্ত চাউনি দিদার। সে সহ্য করতে না পেরে উঠোনো বের হয়ে গেল। মাথার ওপর আকাশ। না হলে দিদার কাছে ঠিক ধরা পড়ে যাবে।

উষ্ণতার ঐশ্বর্য

প্রকাশকরাও কম বড়ো মাপের মানুষ নয়—

শ্রাবণীর এমন বলায় নরেন্দু কিছুক্ষণ বুঁদ হয়ে বসে ছিল। শ্রাবণী মাসে-দুমাসে অন্তত এক-দু-বার তার দোকানে ঢুঁ মারবেই।

বই-এর খোঁজে আসে নতুন পুরোন। আজকাল প্রবন্ধ, সমালোচনা লেখার লেখকই মেলে না। ঠ্ঠউপন্যাসের কালান্তরঠ্ঠ বইটি খুঁজতে এসেই প্রথম তার আলাপ নবেন্দুর সঙ্গে।

শ্রাবণী বইটির পৃষ্ঠা উলটে দেখার সময় বলেছিল, আপনাদের এ-রকম আর কী বই আছে?

নবেন্দু তাদের একটি পুস্তক-তালিকা দিয়ে বলেছিল, দেখুন আপনার পছন্দমতো আর কোনও বই পান কি না।

শ্রাবণী প্রবন্ধের তালিকাটি দেখে তাজ্জব। এত বই। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোটোগল্পের উপর সমালোচনার বইটি দেখতে চাইলে বলেছিল, ওটা নেই। আউট অব প্রিন্ট।

আউট অব প্রিন্ট!

আজ্ঞে। ছাপতে গেছে।

তা হলে আবার এলে পাব।

তা বলতে পারি না।

মানে!

মানে ওই একটাই। কালই যদি আসেন পাবেন না। দেরি হবে ছাপতে। কাজেই আবার

এলেই পাবেন, কথা দিতে পারছি না সেটা কবে কত দিন পরে আসছেন জানতে পারলে ভালো হয়।

এই সব কথার মধ্যে কিছুটা কৌতুক লুকিয়ে থাকায় শ্রাবণী হেসেছিল।

হাসছেন যে!

শ্রাবণী বলেছিল, আপনার রসবোধ আছে।

সাধারণত কাউন্টার পেরিয়ে ভিতরে ঢোকার অনুমতি থাকে না। শ্রাবণী কাউন্টারে দাঁড়িয়েই তার সঙ্গে যেন কিছুটা মজা ছুড়ে দিয়েছিল।

দেখুন না যদি কোনও স্পৃয়েলড কপিটপি থাকে।

স্পয়েলড কপি?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

ভিতরে এসে খুঁজে নিন। প্রসন্ন দেশে গেছে—তিনি বলতে পারতেন। থাকলেও আমার পক্ষে খুঁজে বের করা কঠিন। কাল আসুন না।

কাল হবে না।

কেন? কোনও অসুবিধা আছে?

আমি তো পাঁচটার ট্রেন ধরব। ওটাই আমার লাস্ট ট্রেন।

কী ভেবে নবেন্দু বলেছিল, ভিতরে এসে বসুন। সুধীর আসুক। দেখি। পাঁচটা বাজতে অনেক দেরি। কাছেই স্টেশন। ট্রেন ধরতে অসুবিধা হবে না।

নবেন্দু ফের বলল, কোথায় থাকেন?

থাকি তো দূরে, মাঝে মাঝে কলকাতায় এলে কলেজ স্ট্রিটে ঢুঁ মারতে না পারলে পেটের ভাত হজম হয় না।

সুধীর দোকানে ঢুকে দেখেছিল, ছিমছাম লম্বা এবং ভারি সুন্দর একজন যুবতী ভিতরের দিকের চেয়ারে বসে কী একটা বই উলটে পালটে দেখছে।

কোথায় ছিলি এতক্ষণ! একবার বের হলে ফিরতে চাস না।

সুধীর কাঁচুমাচু গলায় বলল, ধীরেনবাবু যে বললেন, বসতে হবে। উপন্যাস সংকলনের কভারের কিছু কাজ বাকি। বসে, করিয়ে নিয়ে এলাম।

উদ্ধার করেছিস। যা চা নিয়ে আয়। আপনি কিছু খাবেন? পাঁচটায় ট্রেন, কখন পৌঁছবেন? আপনার জন্য কিছু খাবার নিয়ে আসুক।

প্রকাশকরাও কম বড়ো মাপের মানুষ নয় মেয়েটির এমন মন্তব্যে সে কিছুটা সত্যি বিগলিত।

ঘুরে ফিরে একই রকমের ভাঙা।

প্রকাশকরা ঠগ জোচ্চর, বেশি বই ছাপে, গাড়ি-বাড়ি করে, লেখকরা খেতে পায় না। প্রাপ্য রয়েলটি ফাঁকি দেবার নানা ধান্দা—কি শ্রাবণীর কাছে প্রকাশকরাও বড়ো মাপের

মানুষ রেকর্ডের মতো কানে বাজছিল তার।

প্রকাশকরা অবশ্য সবাই সাধু নয়, শ্রাবণীর জানা উচিত। অসাধু প্রকাশকেরও অভাব নেই। তবে সবাই অসাধু এটাও বলা যায় না। নরেন্দুও এমন ভাবল।

লেখকের দুঃসময়ে প্রকাশকই ভরসা। বিপদে-আপদে ছোটাছুটি যতটা পারা যায়—লেখককে ভারমুক্ত করার ঘটনাও বিরল নয়। কত প্রকাশকের ভালো বই প্রকাশের নেশা হয়ে যায়। পেশার চেয়ে নেশা প্রবল হলে যা হয়, কেউ আবার সর্বস্বান্তও হয়—বই-এর বাজার সব সময়ই খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলে—বিশেষ করে গল্পউপন্যাসের ক্ষেত্রে বাজার ধরে গেলে পয়সা, সে আর কটা বই!

তার বাবা তো নানা দিক ভেবেই তাঁর দোকান চালু রাখার জন্য গল্প-উপন্যাসের সঙ্গে স্কুল-বইও করতেন। এতে খুব একটা মার নেই। ঠিকমতো বই ধরাতে পারলে দুটো পয়সাও হয়। তবে ভালো গল্প-উপন্যাসের বই না থাকলে প্রকাশক জাতে ওঠে না, তার বাবা এটা ভালোই বুঝেছিলেন—আর অপরিসীম ধৈর্য—লেখককে খুশি রাখা, কাগজ আনা থেকে বাইন্ডার কাকে না খুশি রাখতে হয়! এক-একটা বই ছেপে বের হবার পর সে দেখেছে, বাবা কী নিশ্চিন্ত। বই-এর প্রোডাকশান—মলাটের ছবি থেকে ব্লক, সর্বত্র তাঁর সতর্ক নজর।

বাবার মাথায় বই ছাড়া কিছু থাকত না।

দোকানে এসে বসতে পারলেই তাঁর মুক্তি। এই ব্যবসাটি বাবা প্রায় পুত্রস্নেহে যেন লালন-পালন করছেন। অসুখে-বিসুখেও বাড়িতে বসে থাকার লোক ছিলেন না তিনি। এই নিয়ে তার মায়ের সঙ্গে তিক্ততাও সৃষ্টি হত।

আরে, এই শরীর নিয়ে তুমি দোকানে যাবে।

কী হয়েছে আমার।

কী হবে আবার! জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে, বলছ কী হয়েছে তোমার।

এমন এক-আধটুক সবারই শরীর খারাপ হয়। দোকানে বসলে দশটা লোকের সঙ্গে দেখা হবে, কথা হবে, বই-এর কাস্টমারদের সঙ্গে কথা বলারও আনন্দ আছে জানো। সমস্ত জীবন প্রাণ নিয়ে আট বাই দশ ফুটের ঘরটি যে আমার অস্তিত্ব। দোকানে ঢুকলেই আমার শরীর হালকা, মন হালকা, তুমি ঠিক বুঝবে না।

অগত্যা যাবেই।

নবেন্দু তখন কলেজে পড়ে।

যা তোর বাবার সঙ্গে। এই শরীর নিয়ে একা যাওয়া ঠিক হবে না।

আরে না না, আমি একাই যেতে পারব। নবেন্দু তুই আমাকে একটা ট্যাক্সি ডেকে দিয়ে যা। শ্রাবণীর কথায় মনে হল সত্যি তো, প্রকাশকরাও কম বড়ো মাপের মানুষ না, শ্রাবণী যেন বাবার সম্পর্কে তার চোখ খুলে দিয়েছে।

শ্রাবণী এলে বই নিয়েই বেশি আলোচনা হত। মোহিতলাল মজুমদারের সব বই-ই আছে দেখছি। একসঙ্গে কিনতে পারব না। সারের বইও করেছেন।

সার মানে।

অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়।

হ্যাঁ আছে, তাঁর কিছু বই আমরা করেছি।

তিনি এখানে আসেন!

এ পাড়ায় এলে ঢুঁ মেরে যান।

আরও সব প্রিয় লেখকও এখানে আসে শুনে, যদি দেখা হয়ে যায় এই আশাতেই শ্রাবণী বইপাড়ায় এলে এই দোকানে ঢুঁ না মেরে যাবে না।

একদিন নবেন্দু না বলে পারেনি, আপনার এত প্রবন্ধের বই কেনার আগ্রহ কেন বলুন তো! সমালোচনার বইও কেনেন দেখছি। কত প্রিয় কবির দেখা হবে ভেবে এখানে ফাঁক পেলেই আসেন। গল্পের বইও তো আমাদের কম নেই, কখনও গল্প-উপন্যাস কিনতে দেখলাম না। আপনি কী থিসিস নিয়ে ব্যস্ত আছেন। থিসিস যারা করেন, তাদের দু-একজনের সঙ্গে তার আলাপ আছে বলেই এই ধারণা। তারা শুধু প্রবন্ধের বই কেনে।

ওই আর কী।

প্রাবণীর অভ্যাস সব বই দেখেটেখে মাত্র একটি দুটি বই কিনবে।

ঘরের সংলগ্ন পেছনের ঘরটায় শ্রাবণী আজকাল এলে নিজেই ঢুকে যায়। ঘরটা নিরিবিলি। সুদেববাবু প্রুফের বাণ্ডিল জড়ো করে বসে থাকেন। সে তার পছন্দমতো বই নিয়ে কিছুটা পড়ে—কারণ তার পাঁচটায় ট্রেন বলে ছাত্রীদের বই কেনার পর অথবা নিজের দরকারি বই সংগ্রহ করার পর নবেন্দুর দোকানে এসে বসে। মাঝে মাঝে কথা হয়।

এবং কিছুটা যেন নবেন্দুর উপর সে নির্ভরও করতে শিখেছে।

দেখুন তো এই বইটা পেলাম না। যদি পান।

আপনি বসুন, দেখছি।

এ-ভাবে নবেন্দুর সঙ্গে পরিচয়।

ট্রেনে কত দূরে যান?

বহরমপুর।

সেখানে বাড়ি?

তা বাড়িই বলতে পারেন। কলেজে দিদির কোয়ার্টারে থাকি।

বহরমপুর গার্লস কলেজ।

ওই আর কী।

কলেজের মণিদাকে চেনেন?

শ্রাবণী কিছুটা যেন চমকে গেল। মুখেচোখে তার কেমন একটা অপরাধবোধ জেগে যাওয়ায় মাথা নীচু করে ফেলল। নবেন্দু কাজ করে আর কথা বলে।

বই দেখুন ঠিক আছে কিনা। পাঁচ খণ্ড অবিরাম জলস্রোত, তিনটে দুঃখিনী মা, দুটো সোনার মহিমা—এবং রসিদ কেটে টাকা গুনে নেবার সময়ই তার যত কথা।

শ্রাবণীর সঙ্গে কথা বলতে তার ভালোই লাগে।

আপনি কি কলেজে পড়ান?

বাংলা পড়াই।

আজকাল তো স্লেট না নেট কীসব পরীক্ষা দিতে হয়।

শ্রাবণী ঘড়ি দেখছিল।

আরে সময় হয়নি। সুধীরকে পাঠিয়ে দিয়েছি।

এবং শ্রাবণী বোঝে নবেন্দু তার সুবিধা-অসুবিধা খুব বোঝে।

সুধীর শুধু টিকিটই কেটে দেয় না, ট্রেন এলে সিটে বসে থেকে শ্রাবণীদির জন্য প্রায় সিট রিজার্ভ করে রাখে। শ্রাবণীদি দীর্ঘাঙ্গী বলে প্ল্যাটফরমে সহজেই তাকে আবিষ্কার করা যায়। সে জানালা দিয়ে মুখ গলিয়ে চেঁচাবে, শ্রাবণীদি, এদিকে, এদিকে। এই যে আমি, সে জানালার বাইরে হাত গলিয়ে চেঁচায়।

কথায় কথায় নানা কথা হত। অবশ্য নবেন্দুর আদ্ভুত স্বভাব। সে কখনও তার মুখের দিকে তাকিয়ে কথা বলে না। ওই প্রথম দিনই যা চোখ তুলে বলেছিল, কী বই বললেন? মেয়েদের দিকে তাকালে কি কোনও অপরাধবোধ কাজ করে? কিংবা মেয়েদের সম্পর্কে খুবই লাজুক—শ্রাবণী মনে মনে না হেসে পারে না। সে তো নবেন্দুর নাড়ি-নক্ষত্রের সব খবরই রাখে।

হাটেবাজারে।

এটা আমাদের বই নয়।

চিরকুট দিলেও নবেন্দু তাকাত।

ও আপনি!

সে কাউন্টারের কাঠ তুলে তাকে ঢুকতে বলত।

ওই একবারই, তারপর সে কখনও দেখে না, নবেন্দু তার মুখের দিকে তাকিয়ে কথা বলছে। কাজের ভিড়ে বেশি কথাও হয় না।

নবেন্দু কি মেয়েদের পছন্দ করে না! স্ত্রী মণিকা তাকে ছেড়ে যাওয়ায় কি সে মেয়েদের ঘৃণা করে!

নবেন্দু খুবই চাপা স্বভাবের মানুষ। খুব বেশি দিলখোলা নয়। সেটুকু কাজ তার বাইরে কোনও কথাই হত না। তবু দেখেছে, দেয়ালের ফটোটি খুঁটিয়ে দেখলে নবেন্দু বোধহয় খুশি হত। একজন প্রৌঢ় মতো মানুষ, কেমন দুশ্চিন্তাগ্রস্ত চোখমুখ—

আপনার বাবা।

আজ্ঞে।

পরিচয়ের প্রথম দিকে এন্তসব কথা হত।

আপনার বাবা খুব রাশভারি মানুষ ছিলেন!

মোটেও না। দিলখোলা মানুষ সব সময়।

মানুষজন নিয়ে থাকতে ভালোবাসতেন। বিপদে আপদে তিনি সবার বেলাতেই আপ্রাণ চেষ্টা করতেন, কোথায় কার কাছে গেলে কাজ উদ্ধার করা যাবে—দরকারে হাসপাতাল পর্যন্ত ভর্তি করে দিতেন।

তার পরই থেমে বলত, বাবার মাথায় অবশ্য বই ছাড়া কিছু থাকত না। দোকানেও বই, বাড়িতেও থলে ভর্তি প্রুফ। এক দণ্ড বসে থাকতেন না।

শ্রাবণী বোঝে নবেন্দু তার বাবা মানুষটির জীবন সম্পর্কে ভারি অহংকারী।

সে দেখেছে, বাবার কথা উঠলেই নবেন্দু তার নিজের কাজের কথাও ভুলে যেত। এত বড়ো প্রকাশনের মালিক, অথচ এক সময় তার বাবাকে বই ফিরি করতে হত—সেই ফেরিওয়ালা এই বইপাড়ায় জাতে উঠতে কত না পরিশ্রম করেছেন। আসলে অপরিসীম ধৈর্য—প্রুফরিডারদের হাতেই তিনি সব ছেড়ে দিতেন না। প্রিন্ট অর্ডারের আগে নিজে খুঁটিয়ে পড়তেন—কোথায় না আবার ছাড় যায়। বানান নিয়েও ঝামেলা কম না—এক-একজন লেখক এক-এক রকম বানান পছন্দ করেন। সে তার বাবার উদয়াস্ত পরিশ্রম

দেখে ভেবেছিল, আর যেই আসুক সে অন্তত বই-এর লাইনে আসছে না। কলেজে কাজটাজ নিয়ে, অথবা অন্য কোনও ব্যবসায় নেমে যাবে।

হল কই।

বাবা বলতেন পরের গোলামি নাই করলে। বই-এর ব্যবসায় সৃষ্টির আনন্দ আছে।

নবেন্দু দোকানে বসত, তবে কোনও আকর্ষণ বোধ করত না। কী আছে। দিনরাত তাগাদা। এখানে যাও, ওর সঙ্গে কথা বলো। অমুক লেখক রাজি হয়েছেন বই দেবেন। যাও তার কাছে। সে তখন এক ধরনের হীনম্মন্যতায় ভুগত। সবার কাছে জো-হুজুর হয়ে থাকা কাঁহাতক ভালো লাগে। লেখকরা কেউ কেউ এমনও বলত, হবে না। তোমরা বই ভালো চালাতে পারো না। ঠিকঠাক হিসাব পাচ্ছি কোথায়।

সে এসে ক্ষোভে দুঃখে বলত, আমাকে আর পাঠাবেন না। আপনি ইচ্ছে হয় যান। ঠিকঠাক হিসাব দিয়ে আসুন গে।

বাবা বালকের মতো হেসে ফেলতেন।— আরে কান ভাঙানোর লোকের তো অভাব নেই। তাঁরা বলতেই পারেন। উপন্যাস গল্প লেখা কি চাট্টিখানি কথা। তুই পারবি, না আমি পারব। প্রতিভা না থাকলে হয় না। ওরা হলেন দেবী সরস্বতীর বরপুত্র। ওদের গালাগাল খেলেও পুণ্য হয়, বোঝো।

শ্রাবণী এই আসা যাওয়ায় কত কিছু যে জেনেছে। যত জেনেছে তত দিব্যেন্দু এবং তার পরিবারের প্রতি আকর্ষণ বোধ করেছে। আজকাল মাঝে মাঝে কাজ না থাকলেও এই বইপাড়ায় চলে আসে। কোনও পারিবারিক উৎসবে অনুষ্ঠানে কাছাকাছি, এই যেমন বেলেঘাটা কিংবা সোদপুর, কখনও টিটাগড় এলে কোনও না কোনও অজুহাতে নবেন্দুর দোকানে ঢুকে যেত। কলেজ লাইব্রেরির জন্য বাজারে ভালো বই বের হলে সংগ্রহ করত। কখনও বই কেনে, আবার কেনেও না—দরকারে চিঠি লিখলেই নবেন্দু কারও হাতে বই পাঠিয়েও দেয়। বই কিনতে যারা দোকানে আসে তাদের বলে দিলেই হল, এই অজিত শোনো। তারপর অজিতকে বই-এর প্যাকেটটি এগিয়ে দিলেই হল, অজিত বুঝে নেয়, লালদিঘির পারে মেয়েদের কলেজের শ্রাবণীদির প্যাকেট। শ্রাবণীদিও আদ্ভুত, কী করে যে জানাজানি হয়ে গেছে, তাকে দিলেই কমিশনে বই আনিয়ে দিতে পারে। স্কুল-বইয়ের বেলায় সে মাঝে মাঝে নবেন্দুর হয়ে নানা স্কুলে চিঠিও লিখে দেয়, আট-দশ বছর হয়ে গেল সে কলেজে পড়াচ্ছে, তার ছাত্রীরা শহরের স্কুলে কিংবা গাঁয়ের স্কুলে অনেকেই শিক্ষয়িত্রীর কাজ পেয়ে গেছে, নবেন্দুর লোক তার কাছে গেলেই বোঝে সিজনের সময়, নিশ্চয় নবেন্দুর হয়ে চিঠি লিখে দিতে হবে—স্কুলে বইটি যদি পাঠ্য করা যায়।

তা ছাড়া নবেন্দুর কিছু গল্প-উপন্যাস হটকেক—নবেন্দু বলে এগুলি আমার সোনার খনি। বাবার দূরদৃষ্টিতে সব হয়েছে।

আমাদের দুটো উপন্যাসের যে চাহিদা হয়েছে, এবং নানা পত্রপত্রিকায় বই দুটোর সম্পর্কে লেখালেখি বলুন, লেখকের পুরস্কৃত হওয়া—সবই মণিদার কল্যাণে। মণিদা বাবার হিতৈষী। অথচ মানুষটা কোথায় যে হারিয়ে গেল। মণিদার কথা উঠলেই শ্রাবণী কেমন অতল জলে ডুবে যায়। কতকাল পর একজন পুরুষমানুষকে তার ভালো লাগছে—সেই মানুষটা যদি জেনে যায় সব। যদি সে ধরা পড়ে যায়।

তবু আজ অনেক সাহস সঞ্চয় করে শ্রাবণী বলল, উনি তো শহরে থাকেন না। পার্টির কাজে গাঁয়েগঞ্জেও ঘুরে বেড়ান শুনেছি। তিনি কি এখানে আসেন?

আদ্ভুত মানুষ, আমরা আশা করতাম তিনি আসবেন— কি আর আসেননি। শুধু একবার বাবাকে চিঠিতে জানিয়েছিলেন, পাণ্ডুলিপি তিনি পাঠিয়ে দেবেন। লেখক নিজেই যাবেন।

এবং লেখক পাণ্ডুলিপি জমা দিয়ে গেলে বলতে গেলে চোখ বুজেই বাবা প্রেসে দিয়েছিলেন ছাপাতে। বাবা পরে ধন্যবাদ জানিয়ে একটি চিঠি দিয়েছিলেন জানি, তবে তার উত্তর পাওয়ার আগেই—

উত্তর আর আসেনি?

না।

আপনি মণিদাকে চেনেন?

শ্রাবণী চা খাচ্ছিল। কোনও জবাব দিল না।

হঠাৎ নবেন্দু কেন যে বলল, এবারের বুক সিজনে ভাবছি ও দিকটা আমি নিজেই একবার ঘুরে আসব। পুরনো এজেন্টদের সঙ্গে যোগাযোগ না থাকলে হয় না— কিছু পারিবারিক বিপর্যয়ে প্রকাশনার কাজ থিতিয়ে এসেছিল। এখন আপনাদের সবার সহযোগিতায় মনে হয়েছে, এই প্রতিষ্ঠানটিকে ঠিক চালিয়ে যাওয়াই আমার বড়ো কাজ।

মন বসেছে।

না বসে তো উপায় নেই। বাবা আমার জন্য ভেবে ভেবেই মরে গেলেন।

কী বলছেন।

ঠিকই বলছি।

তার পরই নবেন্দু কেমন সতর্ক হয়ে গেল। পারিবারিক বিপর্যয় কথাটা বলা ঠিক হয়নি। শ্রাবণী এলে তারও ভালো লাগে। বাড়িতে মা এবং মাসি মামারা বারবার বলেছে,

একবার বাড়িতে আসতে বল না। আত্মীয়তা তৈরি করতে হয়। মানুষের সম্পর্ক কী হবে একমাত্র মানুষই ঠিক করতে পারে। একজনকে দিয়ে সবাইকে বিচার করিস না।

অতটা দুঃসাহস তার নেই নবেন্দু ভালোই জানে। বরং শ্রাবণীর আর কে কে আছে, আজকাল মেয়েদের বোঝা মুশকিল, বিবাহিত বা কুমারী। কারণ অনেক আধুনিকাই শাখা-সিঁদুর নারী স্বাধীনতার নামে বিসর্জন দিয়েছেন।

শ্রাবণী না এলে নবেন্দু টেরই পেত না, একজন প্রকাশকও লেখকের প্রতিটি হরফের প্রতি সতর্ক নজর রাখে। লেখকরা লেখক হয় প্রকাশকের পরিশ্রমের গুণে। শ্রাবণী কী টের পেয়েছিল এই থরে থরে সাজানো বই-এর ঘ্রাণ তার বাবা না থাকলে সে বুঝতে পারত না। কতটা গভীর মনঃসংযোগ থাকলে, এটা হয়, টের পেয়েই হয়তো তার বাবাকে এত বড়ো কথা—প্রকাশকেরাও কম বড়ো মাপের মানুষ ভাবেন কী করে। প্রকাশনার কাজ যথেষ্ট গৌরবের। বাবার বই-এর দোকান নিয়ে এতটা অবহেলা দেখানো আপনার উচিত হয়নি। আর কণিকা বইয়ের মর্মই বুঝল না। এটা কোনও ব্যবসা!

আসলে সেই থেকেই কি নবেন্দুর এত টান জন্মে গেল প্রকাশনার প্রতি। শ্রাবণী এলে যেন বুঝতে পারে, তার বাবার মতোই সে এই প্রকাশনের শ্রীবৃদ্ধির জন্য আপ্রাণ খাটছে।

সেই থেকেই তার কি শ্রাবণীর প্রতিও টান জন্মে গেল।

সে তো নিজে গিয়ে বইতে শ্রাবণীর প্রিয় লেখকদের অটোগ্রাফ নিয়েছে।

সপ্তাহ শেষ হতে না হতেই চিঠিও দিয়েছিল।

শ্রাবণী আপনার অনুরোধ রক্ষা করা গেছে। সুযোগসুবিধা মতো বইগুলি নিয়ে যাবেন। রেফারেন্স সংক্রান্ত বই দুটো বাজারে পাওয়া যায়নি। তবে কিছুদিনের মধ্যেই আশা করি বই দুটো সংগ্রহ করতে পারব। আশা করি একা একা দিনগুলি বই আর ফুল নিয়ে বেশ কেটে যাবে। আপনি যে বলেছিলেন বই আর ফুলের মতো এত পবিত্র আর কিছু হয় না।

তার পর লিখে ভাবল, না এসব লেখা ঠিক না। সম্পর্কের জোর চাই। এমন কোনও ঘটনা ঘটেনি যে সে সম্পর্কের জোরের ওপর কোনও দাবি করতে পারে।

কোনো সম্পর্কই ছিল না।

এতদিন পরও কোনও সম্পর্ক তৈরি হয়েছে বলে সে তেমন কিছু ভাবতে পারত না। কি চিঠি লিখতে গিয়ে বুঝল, সম্পর্কের জোর না থাকলে এত বড়ো কথা অনায়াসে চিঠিতে লিখতে পারত না। জীবনের অন্তরালে কখন যে কীভাবে নতুন জীবন তৈরি হয় সে জানেই না।

সে যাই হোক নবেন্দু শেষ পর্যন্ত শেষ লাইন দুটো কেটে দিল। তার দুর্বলতা ধরা পড়ে গেলে সে খাটো হয়ে যাবে।

তারপর মনে হয়েছিল, কাটাকুটিও সংশয়ের উদ্রেক করতে পারে। নবেন্দু কী লিখল— আবার কেটে দিল—কেন কেটে দিল— কৌতূহল হতে পারে এবং লেখা উদ্ধারের প্রাণান্তকর চেষ্টায় এক সময় যদি ভেবে ফেলে—লোকটা সুবিধের নয়। বাজে লোক।

ফের নতুন করে চিঠিটা লিখেছিল।

সাদামাঠা চিঠি। কোনও কাটাকুটি নেই।

তারপরই মনে হয়েছিল সে তো খারাপ কিছু লেখেনি।

বোকার মতো কাটতে গেল কেন!

একা একা দিনগুলি বই আর ফুল নিয়ে বেশ কেটে যাবে। কবিতার মতো শুনতে। ভালোবাসলে কবিতা আসে। তবে চিঠিতে একজন পরিচিত নারীকে কবিত্ব প্রকাশ করলে সে অন্য রকম ভাবতেই পারে।

শেষে ভেবেছিল, সম্পর্কের জোর না থাকলে দোষের হতে কতক্ষণ!

ঠোঁটে বিদ্রুপের হাসিও ফুটে উঠতে পারে।

চিঠিতে আবার কবিত্ব ফলানো হয়েছে। না, কেটে দিয়ে সে ঠিকই করেছে। তাকে কেউ উজবুক ভেবে মনে মনে মজা পাক— সে তা চায় না।

শ্রাবণী চিঠির উত্তরে লিখেছিল, অনেক ধন্যবাদ। কষ্ট করে লেখকদের অটোগ্রাফ সংগ্রহ করার জন্যও ধন্যবাদ। আপনার চিঠি পেয়ে খুব ভালো লাগল। তবে নিজে যেতে পারছি না। অফিসের সন্ধ্যাদি যাবে। ছুটিতে দেশে গেলে আপনার সঙ্গে দেখা করবে। আগরপাড়ার দিকে থাকে। তাকে একটা হাতচিঠি দিয়ে দেব। বিশ্বাসী এবং নির্ভরযোগ্য।

চিঠি পেয়ে নবেন্দু খুব হতাশ হয়ে পড়েছিল। চিঠিতে যেন বিন্দুমাত্র আকুলতার ছাপ নেই।

চিঠি পেলে সঙ্গে সঙ্গে ছুটে আসবে এমন মনে হয়েছিল। লেখকদের সম্পর্কে শ্রাবণীর দুর্বলতা যে যথেষ্ট, তাদের অটোগ্রাফ পেলে সে যে বর্তে যায়, অথচ বইগুলি সম্পর্কে তার এখন যেন বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই। ছুটিতে সন্ধ্যাদি যাবে, তার হাতে দিলেও হবে। কিছুটা অপমানজনকও মনে হল।

শ্রাবণী চিঠি পেলেই চলে আসবে এমন ভেবে নিজের ড্রয়ারে যত্ন করে বই কটা রেখে দিয়েছিল। মেলা বই-এর মধ্যে হারিয়ে গেলে খুঁজে পাওয়া কঠিন।

তারপর মনে হল কাউন্টারে কিংবা ড্রয়ারে যেখানেই প্যাকেট থাকুক গোলমাল হবার কথা না, তার লোকজন এতটা কেউ নির্বোধ নয়। শ্রাবণীর বেলায় এতটা ত্রাস কেন মনে চেপে বসেছিল এতক্ষণে যেন হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে।

ত্রাস ছিল শ্রাবণীর এই দুর্মূল্য বইগুলি না আবার হারিয়ে যায়।

শ্রাবণী না আবার রাস্তা হারায়।

শ্রাবণী না আবার তাকে ভুল বোঝে। তার এত বেশি আগ্রহ শ্রাবণীর কাছে বাড়াবাড়ি মনে হতে পারে।

সে যে কী করে।

বাজার খারাপ, কাউন্টারে ভিড় কম।

সে সুধীরকে ডেকে বলল, এই অসীমবাবুকে ও-ঘর থেকে ডেকে আন।

অসীমবাবুকে ও-ঘর থেকে ডেকে আন।

অসীমবাবু এলে নবেন্দু বলল, আমি কাল পরশু আসছি না।

কেন! শরীর খারাপ?

শরীর ঠিকই আছে।

তবে!

আমার আর কিছু ভালো লাগছে না। বলতে পারত— কি তার পক্ষে একজন কর্মচারীর কাছে নিজের দুর্বলতা প্রকাশ করা ঠিক না। শ্রাবণী মাঝে মাঝে এসে তার মাথা ঘুরিয়ে দিয়েছে, শ্রাবণী যদি তার জীবনের বিপর্যয়ের কথা জেনে ফেলে তবে তাকে অ্যাভয়েড করতেই পারে। কেমন সরল সুন্দর এক যুবতীর আকর্ষণে সে বোধহয় ফের আবার এক বিপর্যয়ের মুখে পড়ে গেল।

তুচ্ছ কারণে শ্রাবণী তার—বই-এর দোকানে ঢুকে নানা আবদার করত।

সে চেষ্টা করেছে সব আবদার রক্ষা করার—শ্রাবণীকে দেখে কেমন এক মর্যাদাবোধে দিন দিন আক্রান্ত হয়ে পড়ছিল—

চাপা স্বভাবের বলেই মুখ ফুটে কিছুই প্রকাশ করতে পারত না। সে নিজে সঙ্গে যেত, স্টেশনে দাঁড়িয়ে গল্পও করেছে। কোনও রেস্তোরায় দুজনে সামনাসামনি বসে অকারণে কত কথা বলেছে, শ্রাবণীর স্বভাব জোরে হাসার, আবার দেখেছে, কথা বলার সময় তাকে সামান্য ঠেলে দিয়ে হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়েছে।

একদিন না বলে পারেনি, শ্রাবণী, তোমার ফোন নেই?

শ্রাবণী মুচকি হেসেছে।

কারণ শ্রাবণী জানে, এইটুকুই যথেষ্ট, কোয়ার্টারে ফোন আছে, কখনও সে ফোনে কথা বলেনি—ফোনে কথা বললেই যেন শ্রাবণী ধরা পড়ে যাবে।

কারণ শ্রাবণী জানে পুরুষমানুষের আপাত এই মিষ্টি ব্যবহার বিয়ের পর কত রুক্ষ হতে পারে এবং এক অপ্রিয় কর্কশ জীবন তৈরি হয়ে যায়, তারপর পুরুষমানুষের নানা বিকৃত যৌনতারও সাক্ষী সে। মণিকে সে চিনতে পারেনি। মণিদা তাদের পরিবারের বন্ধু, মকরিও সে মণিদার অনুগ্রহে পেয়েছে—এবং সেই মানুষটিই ক্রমে এক দৈত্য হয়ে তার ইচ্ছা-অনিচ্ছাকে উড়িয়ে দিয়ে উপগত হয়েছে।

আমার লাগছে।

আমি পারছি না। ছাড়ো।

তখনই সংশয় এবং মণি জোরজারই শুধু করেনি, বিকৃত কামনায় তার সর্বস্ব লুণ্ঠন করতেও চেয়েছে। ফোনের নম্বর সে দেয়নি। কারও ফোন এলে কিছুটা দৌড়ে গিয়ে ফোন ধরবেই। ইচ্ছে করেই গোপন করে গেছে। কারণ কোয়ার্টারে মা-বাবা-দিদি আর প্রাণের চেয়ে অধিক এক অস্তিত্ব নিরন্তর তার এক উৎকণ্ঠার বিষয় ছিল।

মণিদাকে নবেন্দু চেনে, তার কাছে যদি সব খবর পেয়ে যায়—আরে কী করছ, আবার ভুল করবে। এত ঠান্ডা বরফ যে তাকে উষ্ণ করে তোলাই কঠিন।

বিয়ের মাধুর্য রক্ষা করতেও যৌনতার শিল্পবোধ না থাকলে হয় না, মণি তা বুঝতই না।

যাই হোক সে আর নবেন্দুর কাছে যেতে চায় না। আসলে সে যে ভালোবাসার কাঙাল। তার শরীরকে ব্যবহার করবে, অথচ, ভালোবাসবে না! এ তো ফুল ফোটার মতো, মনোরম কুয়াশায় ফুল তার পাপড়ি মেলে, সেই কুয়াশার রহস্যটি যে পুরুষ বুঝতে চায় না, শুধু স্ত্রীর অধিকারে শরীর ব্যবহার করতে চায়, তার প্রতি যে ঘৃণা জন্মায়—নিপীড়িত মনে হয় নিজেকে, একটাই জীবন, তখন মনে হয় এই রাহুগ্রাস থেকে আত্মরক্ষা না করতে পারলে তার জীবন অর্থহীন। মণি কাছে এলেই সে তার মুখে দুর্গন্ধ পেত।

এত সব চিন্তায় ক্লিষ্ট হয়ে সন্ধ্যাকে একটি চিঠি লিখেছিল। সে জানে নবেন্দু এতে অপমানিত বোধ করবে। কারণ সে তো জানে, প্রতিদিনই কোনও না অতর্কিত মুহূর্তে কোনও সুন্দর মুখ দেখার প্রত্যাশায় নবেন্দু বসে থাকে। সে যদি না যায় তখন ব্যাজার মুখ। এই যে নবেন্দুর মহাবিশ্ব তার কাছে এক অশরীরী চৈতন্য হয়ে বিরাজ করছে, মুহূর্তে দেখামাত্র সব ম্লান অন্ধকার দূর হয়ে যায়। সে যায়, মাসে ছ-মাসে যায়, তবে নবেন্দুর কাছে এই যাওয়া আবির্ভাবের সামিল।

সেও তো কম ছলনার আশ্রয় নেয়নি।

সে তো বলতেই পারত, আপনার সব খবরই আমি রাখি। আপনার মণিদা আমাকে সব বলেছে, কথায় কথায় এত প্রশংসা করলে কার না রাগ হয় বলুন তো। বারবার এক প্রশ্নে আহত। এতই যদি গুণবান—তবে জীবনে তার এত বড়ো বিপর্যয় নেমে আসে কেন!

আসলে ওর বাবা মহেশবাবুরই ভুল, গুরুদেব বলেছেন এক কথায় রাজযোটক। মেয়েটি যে মানসিক অসুস্থতার শিকার বিয়ের পর মহেশবাবু হাড়ে হাড়ে টের পেলেন, তারপর যা হয়, শত হলেও গুরু বাক্য—সুতরাং বছর দুই চেষ্টা করেছেন পুত্রের দাম্পত্যজীবন রক্ষা পাক। কথায় কথায় ভয় দেখাত, গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করবে।

চিকিৎসা করাতে পারত।

কণিকার বাবা রাজি না। কণিকা মানে নবেন্দুর স্ত্রী—তার বাবা বধূ-নির্যাতনের অভিযোগ তুললেন, আদালতে গেলেন। স্বেচ্ছায় ডির্ভোস নেওয়ালেন, তারপর পূর্ব প্রণয়ীর সঙ্গে বিয়ে দিতেও বাধ্য হলেন।

মহেশবাবু খোঁজখবর নিলেন না পাত্রীর?

ওই তো গুরুবাক্য। গুরুর আশীর্বাদে তার এত জয়ময়, তাঁর পক্ষে সম্ভব গুরুবাক্য লঙঘন করা!

ইস এভাবে একটা জীবন নষ্ট হয়ে গেল।

মহেশবাবু সেই যে বিছানা নিলেন—

থাক আর বলতে হবে না।

সেই মণিদা, অর্থাৎ মণিমোহনেরই বা কী পরিণতি। নবেন্দুর কষ্টের কথা ভাবলেই তার শরীরে জ্বর আসত। শরীর গরম হয়ে উঠত। আর মণিমোহন কাছে এলে শীতল হয়ে যেত শরীর। নবেন্দু সুন্দর, সুপুরুষ, দীর্ঘকায়, পাত্র হিসেবে দুর্লভ। অথচ দ্যাখো কী দুর্ভাগ্য এক পুত্রবধূর পাল্লায় পড়ে গোটা সংসারটা তছনছ হয়ে গেল মহেশবাবুর। নারী হল গিয়ে পুরুষের মুক্তি।

সেই মুক্তির স্বাদ মণিমোহনের কাছ থেকে এভাবে সম্ভোগ করবে শ্রাবণী জীবনেও চিন্তা করেনি। আসলে এক অন্তর্গত খেলা, একজন অদৃশ্য যুবক অদৃশ্য না বলে বলা যায় সেই কবে মণিমোহন কোনও বইমেলা কিংবা জেলার বইমেলায় তাকে নিয়ে গেলে বলত চলো আলাপ করবে। সে যায়নি। ভিড়ের মধ্যে নবেন্দুকে দেখেছে— সত্যি বেচারা। মুখ দেখলেই ওর ভিতরের কষ্ট সহজেই বোঝা যেত। যৌনতার স্বাদ পাওয়া একজন পুরুষের

পক্ষে নারী বিহনে থাকা যে কত কঠিন—দূরাগত কোনও মিউজিকের মতো সেই কষ্টের মুখ তাকে সর্বদা অনুসরণ করত। পাগল পাগল লাগত।

এ ভাবেই সে কলকাতায় এলে একবার সেই দোকানটি আবিষ্কার করে ফেলেছিল। দোকানের মালিককেও—সুপুরুষটিকেও।

সে ছলনার আশ্রয় নিল।

উপায় ছিল না, মণিমোহন তার জীবন থেকে কিছুতেই নিশ্চিহ্ন হবে না। কারণ মণিমোহন তার পুত্রের দাবি করেনি, একটি শিশুকে বড়ো করতে গেলে সুবিধা-অসুবিধা অনেক। সে কিছুটা বাউণ্ডুলে স্বভাবের। আর শ্রাবণীরও ইচ্ছা নয়, সে একেবারে নিঃস্ব হয়ে যাক। শিশুটি তার যে প্রাণের চেয়ে অধিক। সে শুধু ডিভোর্সি নয়, সে জননীও। জননী হলে যে সমাজে ব্রাত্য হতে হয়। অথচ শরীর মানে না। তার পাগল পাগল লাগত। এবং নবেন্দুকে সে নানা ভাবেই ছলনা করেছে। কী নবেন্দু ভালোবাসার জন্য পাগল। তার প্রতি বিশেষ অনুরক্ত, তারও নবেন্দুকে নিয়ে কম স্বপ্ন তৈরি হয়নি।

এইসব দোলাচলে সে যখন কাহিল, তখনই পুত্রের মুখের দিকে তাকিয়ে স্থির সিদ্ধান্ত নেয়, নবেন্দু যদি ছুটে আসে তার কাছে, এবং এত দিন যে ছলনার আশ্রয় নিয়েছে, তা নিমেষে দিনের আলোর মতো স্পষ্ট হয়ে যাবে। সে শ্রাবণীর প্রকৃত সচিত্র পরিচয়টি তুলে ধরতে চায়।

আমি শ্রাবণী।

আমার প্রাক্তন স্বামী মণিমোহন দাস।

আমি জননী। এই আমার খোকা, তাকে এবারে নার্সারিতে ভর্তি করাতে হবে। ছেলের প্রিপারেশানে ব্যস্ত আছি। ভালো স্কুলে ভর্তি করানো যায় কি না দেখছি। ফর্ম পূরণে তার বাবার নাম না দিয়ে উপায় নেই। এসব কারণে যাওয়া হচ্ছে না। সন্ধ্যাদিকে পাঠাচ্ছি। কত কিছু চিন্তা করে যে সন্ধ্যাদিকে পাঠাচ্ছে—মানুষটাকে অন্ধকারে রেখে এই লুকোচুরি তার আর সহ্য হচ্ছে না।

সন্ধ্যাদি রাতে হাজির। সকালের ট্রেন ধরবে। সন্ধ্যাদিকে তার ছাপানো কার্ডটি দিয়ে বলল, এটি দেবে বাবুকে। আর কিছু বলতে হবে না। তিনি বই-এর একটি প্যাকেট দেবেন। ওটা নিয়ে সোজা আবার ট্রেন ধরবে। কোনও প্রশ্ন করলে বলবে, আমার শরীর ভালো না। ফোনে যোগাযোগ করতে বলবে।

তুমি তো শ্রাবণীদি ফোনেই বলে দিতে পারো।

কী বলব?

তোমার শরীর ভালো না।

তিনি জানেনই না আমার বাড়িতে ফোন আছে। কার্ডটা কি যত্ন করে নেবে।

আসলে এত বেশি হ য ব র ল হয়ে যাবে জীবন, শ্রাবণী ভাবতেই পারেনি। যতই দুজনের মধ্যে টান তৈরি হোক, যতই নবেন্দুর কথা ভাবলে পাগল পাগল লাগুক, এত সব ছলনা শ্রাবণী এখন নিজেই সহ্য করতে পারছে না। কেন যে মরতে দোকানে ঢুঁ মেরেছিল।

শ্রাবণী তুমি এলে না। সন্ধ্যাদিকে পাঠালে। কত আশা করেছিলাম তুমি আসবে। মাকে তোমার কথা বলেছি।

এত দিনে! কী বললেন।

খুব খুশি। মা দিদি সত্যি খুব খুশি। কবে আসবে?

দেখি।

একটি কথা বলব শ্রাবণী। তোমার কার্ড দেখে বুঝতে পারলাম, ফোনে তোমার সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়। অথচ ফোন সম্পর্কে তুমি নীরব থাকতে। ফোন নম্বর চাইলে অন্য প্রসঙ্গে চলে যেতে। কেন? আমাদের দুজনেরই যথেষ্ট বয়েস হয়েছে।

শ্রাবণী চুপ করে আছে।

কী হল, কথা বলছ না।

ভাবছি। জানো তো সব স্বামী-স্ত্রীই চায় বিয়ের পর স্বপ্নের রেলগাড়িতে উঠে যেতে। এক সময় স্বপ্নটাই থাকে। রেলগাড়ি থাকে না, কখন যে এক তুষার-ঝড় এসে সব লণ্ডভণ্ড করে দেয়। তাই আমার স্বপ্নের রেলগাড়িতে উঠতে ভয় লাগছে। আমারই দোষ, তোমার মণিদাকে ভালোবাসতে পারিনি। কাছে এলেই শরীর শীতল হয়ে যেত। তবু মানুষটি শরীরে দাগ রেখে গেছে। জননদাগ—চিতায় না উঠলে দাগ মিলাবে না। ইমনের স্বভাব দৌড়ে গিয়ে ফোন ধরা—কে আপনি? মা, দাদুমণির ফোন। মা বড়ো মাসির ফোন। আপনি ফোনে কথা বললে ধরা পড়ে যেতাম। আমি ডিভোর্সি, নবেন্দুবাবু।

আমি সব জানি শ্রাবণী। তুমি আসছ না শুনে কেমন ঘাবড়ে গেলাম। পাগলের মতো কিছু করে ফেললাম, আমাদের গোরাবাজারের এজেন্টকে তোমার খবর নিতে বললাম। সাত-আট বছর ধরে একা। ন্যাড়া বেলতলায় যেতে আর রাজি না বলে মা-র সঙ্গে কথা বন্ধ। সংসার ঘরবাড়ি সব অর্থহীন। অন্ধকার। মাকে সব কথা বলেছি। রাজি। বাড়িটায় আবার আলো জ্বলবে।

নবেন্দুবাবু, আমি একটা খারাপ মেয়ে—

কী বাজে বকছ বলো তো? তোমার স্বপ্নের রেলগাড়িতে আগে উঠে বসি, কত দূর যাওয়া যায় দেখি। যেতে যেতে ঠিক হবে খারাপ না ভালো। ভালো না লাগলে সামনের কোনও স্টেশনে নেমে গেলেই হবে। আমি নিজেও কম খারাপ না। কণিকা আমাদের গোটা পরিবারের মাশয় কলঙ্ক চাপিয়ে চলে গেছে। আজ রাতের ট্রেনেই তোমার কাছে যাচ্ছি।

এবং জ্যোৎস্নায় রেলগাড়িই ছুটছে। নবেন্দু জানালায় বসে আছে। আকাশ নক্ষত্র এবং শস্যক্ষেত্র পার হয়ে গাড়িটা ছুটছে।

অনাবৃতা

জতুর আজও ঘুম ভেঙে গেল। কোথাও থেকে চাপা কান্নার আওয়াজ—কেউ কাঁদছে। মাথার দিকের জানালা খোলা। গন্ধরাজ লেবুর পাতা ডাল হাওয়ায় দুলছে। তার কেমন ভয় করছিল।

পাশের খাটে মা শুয়ে আছেন।

মা বোধহয় ঠিকই টের পান।

কী হল জতু? ঘুমিয়ে পড়। ও কিছু না।

কেমন ভূতুড়ে মনে হয়, মা কি বোঝেন, জতু ঠিক টের পেয়ে গেছে মধ্য রাতে কেউ কাঁদে। মা কি চান না, জতু জেগে থাক, বিছানায় উঠে বসুক, ভয়ের কী আছে, দুপুর রাতে কেউ কান্নাকাটি করলে কী করা! তোর না ঘুমানোর কী আছে বুঝি না। মা এমন ভাবতেই পারেন।

জতু তার মায়ের সঙ্গে পুবের ঘরে থাকে। বাবা প্রবাস থেকে এলে এই ঘরে থাকেন। জেঠিমা কাকিমাদের আলাদা ঘর। উঠোনের চার ভিটিতে চারটি আটচালা। দক্ষিণের ঘরে আত্মীয়-কুটুম এলে থাকেন। মাষ্টারমশাই আর নিমাইদা রাতে আত্মীয়-কুটুম না এলে ও ঘরটায় থাকে। উত্তরের ঘরে ঠাকুরমা ঠাকুরদা, বিশাল বাড়িতে এদিক ওদিক মেলা শরিক, গোয়ালবাড়ি, রান্নাবাড়ি—অন্দরে পুকুরও আছে একটা। বড়ো একটা তেঁতুলগাছ আছে ঘাটে। বৃষ্টি হলে ঘরবাড়ির জল গাছটার শেকড়বাকড় পার হয়ে পুকুরে গিয়ে নামে। কতকাল থেকে বর্ষায় এই জল নামছে জতু ঠিক জানে না। গাছটার শেকড়বাকড় আলগা, বর্ষার মাটি ধুয়ে নিলে শেকড়বাকড় আলগা হবারই কথা। এত বড়ো গাছ, আর তার কুমিরের মতো শেকড়বাকড় এলোমেলোভাবে জড়িয়ে আছে বলে, সকালে ঘাটে গেলে জতুর দাঁড়িয়ে থাকতে কিংবা বসে থাকতে অসুবিধা হয় না। গাছের শিকড়বাকড়ে উঠে বসে থাকে। বউটি জলে নামে, সে দেখে। জলে ডুব দেয় সে দেখে। সে না বললে বউটি জল থেকেও উঠে আসতে পারে না।

কেন যে মা সকালেই তাকে ডেকে দেন, ও জতু ওঠ। কমলবউ উঠোনে দাঁড়িয়ে আছে। ওঠ বাবা। সঙ্গে যা। তুই না গেলে পুকুরে ডুব দিয়েও শান্তি পাবে না।

জতুর উঠতে ইচ্ছে হয় না। মাঝরাতের চাপা কান্নায় তার মগজ গরম হয়ে থাকে। শীতল হতে সময় নেয়। ভোররাতের দিকেই প্রগাঢ় ঘুম চোখে। মা ডাকাডাকি করলে, চোখ মেলতে তার কিছুতেই ইচ্ছে হয় না।

সে এক রাতে ঘুম থেকে উঠে বসেছিল।

কেউ কাঁদছে ফুঁপিয়ে।

সে বলেছিল, মা তুমি কিছু শুনতে পাও না।

কী শুনতে পাব?

বারে, শুনতে পাচ্ছ না?

মা কেমন অস্বস্তিতে পড়ে যান। খাট থেকে নেমে মাথার জানলা বন্ধ করে দেন। মাথার জানলা বন্ধ করে দিলে হাওয়া ঢোকে না। গরমে খুব কষ্ট হয় জতুর। ঘরে হ্যারিকেন জ্বলে। মা যে কেন জানলাটা বন্ধ করে দিলেন। সে হাঁসফাঁস করতে থাকে। তবে জানলা বন্ধ করে দিলে চাপা কান্নার আওয়াজ থাকে না। অবশ্য গাছে একটা প্যাঁচা ডাকছিল। রান্নাবাড়ির দিকটায় প্যাঁচাটা থাকে। জামগাছের মাথায় এক জোড়া প্যাঁচা কবে থেকেই আছে।

আরও শব্দমালা সে শুনতে পায়। কীটপতঙ্গের আওয়াজ তো আছেই। রাতে পাখিরা বিল থেকে উড়ে যায়—তার পাখার শব্দ এবং ভরা বর্ষার সময় বলে চারপাশের জলমগ্ন জায়গায় শাপলা শালুকের সবুজ পাতায় টিট্রিভ পাখিদের বিচরণ—তার কলরবও কানে আসে। বাড়ির দক্ষিণে সদর পুকুর, চারপাশে চালতাগাছের ছায়া। দুটো খেঁজুরগাছ এবং ছোটো বিশাল শিমূল গাছও আছে। বাড়ির পিছনে মোত্রাঘাসের জঙ্গল। ডাহুক পাখিরাও গভীর রাতে মারামারি শুরু করে দিলে কোলাহল ওঠে। বর্ষায় জলে জঙ্গলে দেশটা ভেসে থাকে।

মা বললেন, তুই শুয়ে পড় জতু। বসে থাকলি কেন? গরম লাগছে। জানলাটা খুলে দি। তুমি জানলা বন্ধ করলে কেন?

জতু তুই বড়ো জ্বালাস!

জতু মার জন্য অপেক্ষা না করে, নিজেই জানলাটা খুলে দিল। কান্না আর শোনা যাচ্ছে না। পাশের বাড়িটা যতীন দাসের। দেখতে কদাকার মানুষটি কুশঘাটে শাড়ি বিক্রি করতে যায়। ঘরে দুটো তাঁত, দুজন তাঁতি, সকাল বিকাল চরকার ববিনে সুতো পরানো হয়, তানা। হয়, মাকুর খটাখট শব্দে কান পাতা যায় না। কমলবউ নিজেও তাঁত বুনতে পারে।

মিষ্টি সুন্দর মতো বউটাকে যতীন দাস গেল বছর বিয়ে করে এনেছে। আগের পক্ষের বউটি আত্মহত্যা করায় যতীন দাসের বিয়ে না করেও উপায় ছিল না।

নে শুয়ে পড় জতু।

জতু জানে শুয়ে পড়লেই তার ঘুম আসবে না। ঘুম এলেও মা-ই আবার তাকে জাগিয়ে দেবেন ওঠ জতু। যা উঠোনে কমলবউ দাঁড়িয়ে আছে।

এত সকালে সে না উঠলে কমলবউ উঠোন থেকে নড়বে না। মাকে জ্বালাবে। পাড়াপড়শিরা জেগে যাবার আগে পুকুরঘাটে তার সঙ্গে যেতে হবে।

রোজ কাঁহাতক ভালো লাগে। তার উঠতে ইচ্ছে হয় না। কিন্তু বউটি যে তার প্রায় সমবয়সি, সমবয়সি না হোক, কিছু বড়ো হলেও ক্ষতি নেই। জতু ক্লাস এইটে পড়ে। তার দাদারা কলেজে পড়ে। তিন ক্রোশ সাইকেল চালিয়ে দাদারা কলেজ যায়। দত্তদের বাড়ি বললে এ-অঞ্চলে সবাই এক ডাকে চেনে। তার জ্যাঠামশাই ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট। বাড়ির বাইরে একটা নীল রঙের ডাকবাক্সও আছে।

তাছাড়া বাড়িটা তাদের খুবই ছিমছাম। দক্ষিণের ঘর পার হলেই বাইরের উঠোন, বিকেলে সেও দাদাদের সঙ্গে নেট টানিয়ে ব্যাডমিন্টন খেলে। জ্যাঠামশাই ঘোড়ায় চড়ে তখন রোগীর বাড়ি থেকে ফেরেন। জ্যাঠামশায়ের ডিসপেনসারি ঘরের মেঝে শান বাঁধানো। বড়ো বড়ো বয়েম। উদখল আরও বড়ো। নিমাইদা এ-বাড়িতে এসেছে কবিরাজি শিখতে। দেশ ভাগ হয়ে যাওয়ায় বন্যার জলের মতো রিফুজিতে ভেসে যাচ্ছে দেশটা। কমলবউ রিফুজি মেয়ে সে জানে। ভালো নাম কমললতা।। নাকে নথ করিয়ে দিয়েই যতীন দাস তাকে বাড়িতে তুলে এনেছে।

একদিন রাতে জতুর কী হল সে জানে না। চুপি চুপি দরজা খুলে বের হয়ে দেখল, বাগানের দিকটায় কেউ জ্যোৎস্নায় দাঁড়িয়ে আছে। এত রাতে মানুষ বাইরে থাকলে চোর ডাকাত ভাবাই যায়। কিন্তু সে দেখল, লোকটা বাগানের গাছ থেকে ফুল তুলছে। ঠিক নিমাইদা, নিমাইদা এত রাতে বাগানে ঢুকে কী ফুল তুলছে সে জানে না। তবে জ্যোৎস্নায় নিমাইদা গাছ লতা পাতা ফুল ভালো চেনে, সে এটা জানে।

বাড়িতে কবিরাজি ওষুধে লাগে। এমন অনেক গুল্মলতাই ঠাকুরদার আমল থেকে বড়ো হয়ে উঠেছে। বাড়ির এই বাগানটায় একটি দারুচিনি এবং এলাচের গাছও আছে। তেজপাতার লতাও আপন মহিমায় নিজের মতো একটি কয়েদবেল গাছ জড়িয়ে বেঁচে আছে।

নিমাইদাকে রাতে উঠতে হয়, কারণ রাত থাকতেই কাজকাম শুরু হয়ে যায়। গাছ থেকে পাতা, ফুল এবং শেকড়বাকড় তুলে পুকুরঘাটে ধুয়ে তারপর শান বাঁধানো বারান্দায়

ছড়িয়ে রাখতে হয়। জ্যেঠামশাইয়ের নির্দেশ মতোই সে কাজ করে থাকে। রাত থাকতে তুলে না নিতে পারলে, জীবনদায়ী ওষুধ বোধ হয় তৈরি করা যায় না। শেকড়বাকড়ে, পাতায় এবং ফুলে সকালের রোদ না খাওয়ালে চলে না।

তারপরই মনে হল সে উঠোনে নেমে এসেছিল, সেই এক কুহকে। চাপা কান্নার উৎস খুঁজতে বের হয়েছে, তার মনে পড়ে গেল। তবে নিমাইদা বাগানে ঘোরাঘুরি করায় বুঝতে অসুবিধা থাকল না, রাত আর বেশি নেই। রাতে চাপা কান্না শুনলে কার না অস্বস্তি হয়।

তার মতো সবারই অস্বস্তি হতে পারে। কিন্তু কেউ কিছু বলে না। অথবা কারও কোনও কৌতূহলও নেই। কিংবা সে এবং তার মা ছাড়া রাতের এই অস্বস্তি এত বেশি বোধ হয় কেউ টের পায় না। কারণ যতীন দাসের ঘরটি ডেফল গাছটা পার হয়ে গেলেই । বড়ো সংলগ্ন ঘর। ঘরে যতীন দাস আর কমললতা রাতে শোয়। তারপর আরও ঘর আছে যতীন দাসের। তাঁত, তানা সুতোর ডাঁই ঘরগুলোতে। দক্ষিণের দিকে সুপারি বাগান, পিছনের দিকে বেতের জঙ্গল এবং একটা বিশাল গাবগাছ। তারপরই বুক সমান বর্ষার জল—যত দূর চোখ যায়।

শেষ রাতের জ্যোৎস্নায় জতু এত গাছপালা এবং ঘরবাড়ির মধ্যে হেঁটে বেড়ালে শুনতে পায় ঠাকুরদা কাশছেন। আর কোনও আওয়াজ নেই। নিমাইদা বাগান থেকে ঝুড়ি নিয়ে বের হয়ে গেল। সদর পুকুরের দিকে হেঁটে যাচ্ছে। যতীন দাসের লেবুর ঝোপে জোনাকি ওড়াওড়ি করছে। কিন্তু কোনও চাপা কান্নার আওয়াজ নেই।

সে হয়তো ভুল শোনে।

সে আবার সতর্ক পায়ে দরজা ঠেলে ঘরে ঢোকে এবং দরজা বন্ধ করে দেয়। খাটে উঠে শুয়ে পড়ে। পাশ ফিরে শোয় না। চিৎ হয়ে শুয়ে থাকে। কান খাড়া করে রাখে। তার ঘুম আসে না।

সকালে সে আজ নিজেই উঠে পড়ল। দরজা খুলে দেখল কমললতা দাঁড়িয়ে আছে। একটা ডুরে শাড়ি পরনে। হাতে পেতলের একটা ঘটি। তাকে বের হতে দেখেই অন্দরের পুকুরের দিকে হাঁটা দিল কমল। অলগাভাবে হাঁটছে যেন সে এখন যেখানে পা বাখবে সবই অসুবিধে হয়ে যাবে। কমল তাকে ছুঁয়ে দিলেও জতুর যেন জাত যাবে।

জতু জানে তার কাজটা কী।

বউটি পুকুরের জলে ডুব দেবে। গভীর জলে ডুব দিয়ে ভেসে উঠবে। বলবে, জতু আমার কিছু ভেসে ছিল না তো। ঠিক ডুবে গেছি তো।

কিছু তো ভেসে থাকে। যেমন শাড়ির আঁচল, অথবা চুল, এত ঘন লম্বা চুল খোঁপা না ডুবে গেলে হয় না। আবার ডুব।

জতু আগে বেশ মজা পেত এই নিয়ে।

না ডোবেনি।

কী ডোবেনি।

তোমার ঘোমটা।

কমলবউ ঘোমটা খুলে শাড়িটা দুহাতে জড়িয়ে ডুব দিলে, কিছুই ভেসে থাকে না। একেবারে যতটা পারা যায় নীচে কাঁকড়ার মতো বিচরণ করতে থাকে। চোখ লাল, এতক্ষণ শ্বাস বন্ধ করে থাকাও কঠিন। কিছু ভেসে থাকার আতঙ্কে জলের নীচ থেকে উঠেই আসতে চায় না।

জতু না বললে, কমল জল থেকেও উঠে আসত না।

এই এক খেলা যে জতুকে ক্রমে আকৃষ্ট করে তুলেছে। বউটি জলে নেমে যায়, শাড়ি ভিজতে থাকে, কোমর জলে নেমে শাড়ি দু-হাতে বুকে জড়িয়ে রাখে, তারপর খোঁপা খুলে চুল ছড়িয়ে দেয়। খোঁপা বাঁধা থাকলে, জলে সব চুল ভেজে না, রাতে অশুচি হয়ে থাকে শরীর। জলের নীচে ডুব দিলে কমল, পুণ্যতীর্থ গয়া গঙ্গা আছে টের পায়। না হল না চুলের ডগা ডোবেনি।

কমল পড়ে যায় মহাবিভ্রাটে। তার কেবল মনে হয় বারবার ডুব দিয়েও সে তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ধুয়ে সাফ করতে পারেনি।

আবার ডুব?

কীরে জতু কী হল!

আঁচল ভেসে আছে।

কমল নিজের মধ্যে বোধ হয় থাকে না। সে তার সায়া শাড়ি খুলে সব বুকের মধ্যে জড়িয়ে ডুব দেয়। সেমিজটিও খুলে ফেলে। কীভাবে যে শাড়ি সায়াতে বাতাস ঢুকে থাকে এবং ডুব দিলেও শাড়িসায়া ভেসে ওঠে জলে। জতু কমলকে শুধু দেখে।

কখনও মনে হয় মাছের মতো পাখনা মেলে দিয়েছে জলে। অন্দরের পুকুর, তায় বর্ষাকাল, জল টলমল হয়ে আছে, জলের নীচে নুড়ি পাথর পর্যন্ত স্পষ্ট। স্ফটিক জলে কমল নেমে গেলে সবই দেখতে পায়। সুন্দর শরীর এবং স্তন, সবই অবাধে কমল জলের নীচে নগ্ন সৌন্দর্য সৃষ্টি করতে পারে।

জতু হাঁটছে।

কমল হাঁটছে।

ঘুম থেকে কেউ ওঠেনি। কিছুটা অন্ধকার মতো হয়ে আছে—সূর্য উঠলেই এই অন্ধকার কেটে যাবে। কমল তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে হাঁটছে। ইঁদারা পার হয়ে, বাড়ির পাঁচিল বাঁশঝাড় পার হয়ে কমল পিছন ফিরে তাকাল।

এই আয়।

যাচ্ছি তো।

কমল ঘাটে এসেই এক কাণ্ড করে বসল আজ। চারপাশে সতর্ক নজর তার। পুকুরের পাড়ে সব আম জাম নারকেল গাছ। তারপর বিশাল জলাভূমি যতদূর চোখ যায়। অন্দরের পুকুরে পুরুষমানুষদের আসার নিয়ম নেই। জতু পুরুষমানুষ কি না সন্দেহ আছে এখনও। ক্লাস এইটে পড়লে পুরুষমানুষ হওয়া যায় না। অন্দর সদর সব সমান তার কাছে। কমল এটা ভালো করে জানে বলেই সেজমামিকে বলে জতুকে সহজেই বিছানা থেকে তুলে আনতে পারে। জলের নীচে ডুবে গেছে কি ডোবেনি কেউ বলে না দিলে তার জলে ডুবে তৃপ্তি হয় না।

জতু দেখছে, আবার থুতু ফেলছে কমল।

সে ডাকে, কমলবউ।

আমাকে কিছু বলবি।

কমলবউ তুমি এত থুতু ছিটাও কেন?

কমলবউ বলল, শরীর। শরীর কী আগে বুঝতে শেখ। শরীরে যে বিষ আছে। জতু দেখেছে, কমলবউ সারাক্ষণ থুতু ফেলে। উঠোনে দাঁড়িয়ে ছিত করে থুতু ফেলার অভ্যাস। হাঁটার সময়ও। মুখে এত থুতু জমে কী করে। সকালে পুকুরে ডুব দিতে যাবার আগে এটা তার হয়। জতু কিছুটা বোকার মতো তাকিয়ে থাকে কমলের দিকে। শরীরে এত বিষ, কেন হয়, বিষের কি মা বাপ নেই, কিংবা ঘৃণা কখনও মানুষের মধ্যে জেগে গেলে থুতু জমে উঠতে পারে মুখে। জতু অবশ্য থুতু মাড়িয়ে হাঁটে না। হাঁটার নিয়ম নেই। কমল ঠিক মনে রাখতে পারে কোথায় কখন সে থুতু ছড়িয়েছে। পুকুর থেকে পবিত্র হয়ে ফেরার সময় ঘটির জল ছিটিয়ে বসুন্ধরাকেও পবিত্র করে নেয়। সে দেখেছে, ঠিক যেখানে কমল আসার রাস্তায় থুতু ছিটিয়েছে—ঠিক সেসব জায়গায় জল ছিটিয়ে চলে যাচ্ছে। থুতুতে পা পড়ে গেলে কমল বোঝে। এই এত আতঙ্ক থেকে জতু, কমল যে রাস্তায় হাঁটে, তার থেকে কিছুটা আলগা হয়ে হাঁটে।

মা একদিন জতুকে কেন যে বলেছিল, তোমার এখানে কী? যাও।

কমলবউ বসে আছে মেঝেতে। ঠাকুমা মা জ্যেঠিমা সবাই ঘাটে বসে আছেন। কমলবউ পিঠের শাড়ি সরিয়ে ওঁদের কী দেখাচ্ছিল।

সে ঘর থেকে বের হয়ে গেছিল ঠিক, তবে কাছাকাছি এবং জানলার পাশে দাঁড়িয়েছিল।

আমাকে মারে।

ঠাকুমা বললেন, মারবে না, সোহাগ করবে। তুই কম যাস না। পুরুষমানুষ সারাদিন খাটাখাটনি করে, তার আর আছেটা কী! গোয়ার্তমি করলে চলে।

আমার যে ইচ্ছে করে না ঠাইনদি।

মেয়েমানুষের আবার ইচ্ছে কী! তোর মুখে খেতা পুড়ি।

মা বলেছিলেন, তাই বলে মারধর করবে!

করবে না। মাথা না পাতলে সে বেচারাই বা যায় কোথায়!

জতুর কষ্ট সেই থেকে। যতীন দাদা মানুষ তো খারাপ না। তবে বেঁটে, বেঢপ, দেখতে আবলুস কাঠের মতো রং। চোখ দুটো চামড়ার ভাঁজে দেখা যায় কী যায় না। ব্যাঙের মতো নাকটা সারা মুখ জুড়ে বসে আছে। কানে বড়ো বড়ো লোম, নাকের ভিতরে থেকে লম্বা গোঁফ এবং বিসদৃশ্য এই চেহারা কমলবউয়ের খারাপ লাগতেই পারে।

শেষে জ্যাঠামশায়ের কানেও কথাটা উঠেছিল।

সেদিন জ্যাঠামশাই সবে রোগীর বাড়ি থেকে ফিরে এসেছেন। জনার্দন কাকা তাঁর ঘোড়া নিয়ে আস্তাবলে বেঁধে দিচ্ছে। তিনি স্নানটান সেরে বৈঠখখানায় বসে নিমাইদাকে ডেকে কী একটা ফর্দ ধরিয়ে দিয়েছেন। বাসবলেহর ওষুধের দরকার। বর্ষাকাল, সর্দিজ্বরের প্রকোপ বেড়েছে, ওষুধটি না হলে চলে না। তখনই বাবা গিয়ে নালিশ দিলেন, আর তো ও ঘরে থাকা যাচ্ছে না।

কেন রে?

যতীন বউটাকে রাতে মারে।

মারে কেন?

সে আমি কী করে জানব।

তারপর কেন যে তিনি কী বলেছিলেন, কারণ না থাকলে কেউ মারে!

একবার জিজ্ঞেস করুন ডেকে।

জ্যাঠামশাই হেসে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, তুমি বোঝ না, কেন মারধর করে? যতীন তো আর অমানুষ নয়। মাথায় তার রক্ত উঠে যায় কেন? তুমি হলে কী করতে!

বাবা আর কোনও কথা না বলে যেন পালাতে পারলে বাঁচেন।

জতু ঠিক বোঝে না সব কিছু। তবু সে জানে সারারাত কমলবউকে যতীন দাদা ঠ্যাঙায়। এমন সুন্দর মেয়েটা, বালিকা স্বভাবের, তার মুখে থুতু উঠলে যে কিছু না কিছু গর্হিত কাজ হয়ে থাকে বুঝতে তার কষ্ট হয় না। কমলবউ ডাকলেই সে সাড়া না দিয়ে পারে না।

এমনকী জলে ডুবিয়ে, বার বার ডুবিয়ে, না হল না, আবার ডুব দাও, হল না, ভেসে উঠলে কেন, পায়ের পাতা ভেসেছিল, না হল না, তোমার হাতের আঙুল জলের ওপরে থাকলে হবে কেন, নিশ্বাস বন্ধ করে, একেবারে তলিয়ে যেতে পার না, তোমার শরীরে শাড়ি আলগা হয়ে জলে ভেসে থাকে কেন, এভাবে অজস্র ডুব আর ডুব, বালিকা বউটির বয়সি স্বামীর তাড়া থেকে মুক্ত থাকার জন্য ডুব দিতে দিতে হাত পা অবশ হয়ে আসে। ঠোঁট সাদা হয়ে যায়। ঠান্ডায় থরথর করে কখনও কাঁপে।

জতুর কষ্ট হয়। মিছে কথাও বলতে পারে না। পাপ হবে। তাকে দিব্যি দিয়েছে, জতু, আমি ঠিক ডুবে না গেলে, কখনও বলবি না, ডুবে গেছি। বলবি না, আর জলে ডুব দিয়ে কাজ নেই। বললে, তোর পাপ হবে। মিছে কথা বললে, পাপ হয় জানিস!

জতু আজ আলগাভাবেই তেঁতুলগাছের শেকড়ে বসে পড়ল। কতক্ষণে জল থেকে উঠে আসবে কে জানে!

কিন্তু আজ এটা কী করল কমলবউ।

সে তাকাতে পারছে না।

কমলবউ আঁচল শরীর থেকে নামিয়ে দিল।

সেমিজ টেনে খুলে ফেলল শরীর থেকে। তারপর সায়ার ফসকা গেরো টেনে দিতেই, থর থর করে পড়ে গেল পায়ের কাছে। কমল বউ পা দিয়ে সায়াটা তুলে জলে ছুড়ে দিল। শাড়ি ব্লাউজ পা দিয়ে ঠেলে দিল জলে।

কোনও হুঁশ নেই কমলবউয়ের। হাঁসের মতো ঘাটলা থেকে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। ডুব দিল। কী একটা ঘোরের মধ্যে আছে যেন।

ডাকল, জতু ধর।

সে চোখ মেলে দেখছে, কমলবউ বুক জলে দাঁড়িয়ে সব সায়া শাড়ি সেমিজ ভালো করে জলে ডুবিয়ে ঢেউ দিচ্ছে জলে।

ধর, বসে আছিস কেন!

জলের নীচে মাছরাঙা পাখি হয়ে ঘোরাঘুরি করছে। এক অতীব আশ্চর্য শিহরণ খেলে গেল জতুর শরীরে।

কী, বসে আছিস কেন। এগুলো তুলে রাখ। জলে ভালো করে ডুবিয়ে দিয়েছি। এবং এমনভাবে জলের মধ্যে কমল ঢেউ খেলিয়ে ভাসিয়ে দিল কাপড় জামা যেন এ শাড়ি সেমিজের সঙ্গে তার কোনও সম্পর্ক নেই।

জতু অগত্যা কী করে। লাফ দিয়ে শেকড় থেকে নেমে ভেজা সায়া শাড়ি তুলে রাখল ঘাটলায়।

জতু দ্যাখ, আমি ঠিক ডুবে যাচ্ছি কি না।

কমলবউ ডুব দিল। জলের নাচে তার নগ্ন ফর্সা শরীর সাপের মতো কিলবিল করে এগিয়ে যাচ্ছে।

কমলবউ ডুব সাঁতারে-চিৎ সাঁতারে বড়ো পটু। তার হাত পা পিঠ দেখা যাচ্ছে। জলে ডুব দিচ্ছে, ভেসে উঠছে। সাঁতার কেটে মাঝপুকুরে চলে যাচ্ছে।

মাঝপুকুর থেকেই চিৎকার করছে, জতু আমি ঠিক ডুবে যাচ্ছি তো! হ্যাংলার মতো জতু চিৎকার করে উঠল, তুমি কোথায়?

ঠিক টের পেয়েছে কমলবউ, জতু ভয় পেয়ে গেছে।

আমি এখানে। বলে কচুরিপানার ভেতর থেকে ভুস করে ভেসে উঠল কমলবউ। কমলবউ তুমি মাঝপুকুরে চলে যাচ্ছ কেন! আর যেও না। ওদিকে বড়ো বড়ো কচুরিপানা, শ্যাওলা, আটকে গেলে ডুবে যাবে। দূরে নদীর জল, জোয়ার, সেখানে পড়ে গেলে ভেসে যাবে।

কমলবউ, ফের কচুরিপানার ভিতর থেকেই হাত তুলে বলল, আমি ঠিক ডুবে যাচ্ছি তো?

তুমি ফিরে এসো কমলবউ। আর যেয়ো না।

কমলবউয়ের আর সাড়া পাওয়া গেল না। কচুরিপানার ভিতর থেকে, হাতও তুলে দিল না। কোমর সমান উঁচু কচুরিপানা পার হয়ে যাওয়াও সম্ভব নয়। সম্ভব হলেও পুকুরের শ্যাওলা-দামে কিংবা লতাগুল্মে আটকে যাবে। জলে ডুবে মরে যাবে। লাশ হয়ে ভেসে উঠবে। জতু যে কী করে! জতুর কান্না পাচ্ছিল।

পুকুরের ওপাড়ে যাবে তারও উপায় নেই। জল আর জল, গভীর জল—সামনে যত দূর চোখ যায় জলাভূমি নদী আর তার জলরাশি বেগে নেমে যাচ্ছে। ঘাটলায় শাড়ি সায়া

সেমিজ পড়ে আছে—জতু কাউকে ডাকতেও পারছে না। কেবল মাঝে মাঝে চিৎকার করছে, কমলবউ আমার ভালো লাগছে না।

আমি চলে যাচ্ছি। পড়ে থাকল তোমার জামাকাপড়। কী আরম্ভ করলে!

জলের উপর দিয়ে দুটো ফড়িং উড়ে গেল। নিস্তরঙ্গ জলে ঢেউ উঠল। কিন্তু কমলবউ হাত তুলে, কিংবা ডুব সাঁতারে পায়ের কাছে এসে ভেসে উঠল না।

জতু ছুটছে। জতু চিৎকার করছে কমলবউ জলে ডুবে গেছে। যতীন দাস পাগলের মতো ছুটে বের হয়ে এল। মা জ্যেঠিরা সবাই। খবর ছড়িয়ে পড়লে পুকুর পাড়ে ভিড় বেড়ে গেল। কিন্তু এই জলা জায়গায় খুঁজে দেখাও অসম্ভব। কোথায় পড়ে আছে কে জানে! জলে নেমে গেল কেউ কেউ। কচুরিপানা টেনে তুলে দেখা হল, লগায় খুঁচিয়ে কিংবা জলে ডুবে যতটা পারা যায় তাও দেখা গেল।

মাস্টারমশাই শুধু বললেন, নিমাইকে দেখছি না। সে কোথায়? সে কি বাসবলেহর খোঁজে শহরে গেছে?

না হয় জলা জায়গায়, লাশ হলে ভেসে উঠবে। কাকপক্ষী তাড়া করবে। শকুনের ওড়াওড়ি শুরু হবে। জলে ডুবে গেলে ফুলে ফেঁপে ভেসে উঠবেই। না, কিছুই হল না। কেউ বলল, জলে ডুবেছে না ছাই, ভেগেছে। খোঁজো নিমাইকে। কোথায় গেল নিমাই, খোঁজো তাকে। থানা-পুলিশেও বাদ গেল না। জতুকে ডেকেও জিজ্ঞাসাবাদ চলছে। ভেগে যাবে তো সায়া শাড়ি ফেলে যাবে কেন? লাজলজ্জা আছে না। জতুর এক কথা, আমি জানি না, আমি কিচ্ছু জানি না।

জ্যাঠামশাই বললেন, তোর সামনেই সায়া সেমিজ খুলে ফেলল। তুই পুরুষমানুষ না! কমল তো আচ্ছা বেহায়া মেয়ে দেখছি।

জতু দেখল, মা ক্ষোভে ফুঁসছে ঘরের মধ্যে। সে তার মাকে এতটা রেগে যেতে কখনও দেখেনি। কদিন থেকে মা খেতে বসেও খেতে পারেনি। বমি উঠে আসছে। জ্যাঠামশাইর মুখের উপর মা কথা বলে না, আজ কেন যে এত রেগে গেল!

শহর থেকে নিমাইদা আর ফেরেনি। শহরে খোঁজাখুজি হয়েছে, সেখানেও সে নেই। যতীন দাস ভেজা সায়া শাড়ি তুলে নিয়ে গেছে। রোদে শুকিয়ে জায়গারটা জায়গায় রেখে দিয়েছে! জলা জায়গার স্বভাবই এরকম, কিছুদিন উত্তেজনা—তারপর সব থিতিয়ে যায়। যতীন দাস ফের নতুন একটি বউ ঘরে তুলে এনেছে। ভুরিভোজের আয়োজন যথেষ্ট। যে খেয়েছে সেই বলেছে, বউটি বড়ো সুন্দর হে যতীন। নজর আছে তোমার!

পুষ্পবতী

সে চুপচাপ বসে থাকে। তার কিছু ভালো লাগে না।

চৈত্র মাস। জল নেই। সেই কবে শীতে বৃষ্টিপাত, তারপর আর মেঘের দেখা নেই। আকাশ তামার বাসনের মতো চকচকে হয়ে আছে। দিন যায়, মাস যায়, আকাশ আর ঘোলা হয়ে উঠে না। মাঠ খা খা করছে, কিছু শকুন উড়ছিল। দূরে সব বাঁশের জঙ্গল, নিশীথে কোথাও থেকে বিশ্রী শব্দ ওঠে। কে যেন হেঁকে যায়, তোমার সব যাবে হে বিপ্রদাস, তুমি অবেলাতেই রওনা হয়ে যাও, আশায় আশায় আর বসে থেকো না।

আসলে তার কী মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে!

দু-দিকের সব মাঠ ফেলে পাকা রাস্তাটা চলে গেছে কতদূর। বাস যায়, সাইকেল যায়, আর বাঁশ বোঝাই হয়ে যায় গোরুর গাড়ি। মানুষজন মানে ওঠে। রাস্তার পাশে কোথাও টালির কারখানা আবার দূরে গেলে মাছের ভেড়ি আরও দূরে গেলে ইটের ভাটা। ভাটাগুলির পাশ দিয়ে পাকা রাস্তার মেলা ডালপালা বের হয়ে গেছে। কোনওটা হাসনাবাদ যায়, কোনওটা বারাসতের দিকে—আবার বসিরহাটের রাস্তাও তার চেনা। কিংবা সাইকেলে কিছুটা গেলেই হাসনাবাদ যাবার রেলে উঠে পড়া যায়।

এইসব রাস্তায় বিপ্রদাসকে যাওয়া-আসা করতেই হয়। বাধা মাইনের কাজ নেই। রাস্তার মোড়ে দোকান নেই। চা কিংবা মুদিখানার যে কোনও দোকান থাকলেও সে বসে বসে তার রুজি রোজগারের ধান্দা বের করতে পারত। আসলে একটা ছ্যাঁচড়া জীবন তার। সে ঠেক খেটে খায়। কখনও মাছের ভেড়িতে কখনও বাঁশের জঙ্গলে, অথবা ইটের গাড়িতে উঠে তেঘরিয়া, বাগুইহাটি, জ্যাংড়া। এমনকি মহিষবাথানের দিকেও সে যায়। চুন সুরকি বালি সুযোগ পেলেই ফেলে দিয়ে আসে। আর আছে তার কাঠা দুইয়ের মতো জমি সম্বল। সেচ পেলে ধান হয়, সবজি হয়, ফুল হয়, না পেলে উরাট থাকে।

পুষ্পবতী বারান্দার খুঁটিতে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। সেই মানুষটা কোন সকালে বের হয়েছে, ফেরার নাম নেই।

ঘুরে আসছি বলে বের হল।

কিন্তু ফিরছে না।

সকাল গেল। দুপুর গেল ফিরে এল না!

কোথায় গেল মানুষটা! বলেও গেল না, তবে এমন যে হয় না, কতবারই দেখেছে, অনেক রাত হয়ে গেছে ফিরতে। তবে কেউ না কেউ খবর দিয়ে গেছে, কাকা হাসনাবাদের রেলে উঠে গেল, খবরটা দিতে বলল। চিন্তা করবে না কাকি। রাত হবে ফিরতে। কেউ না কেউ দেরি হলে খবর দিয়ে যায়।

বিকেল হয়ে গেল, ফিরছে না। কেউ কোনও খবরও দিয়ে যায়নি।

কত কাজ, অনুর স্কুল থেকে ফেরারও সময় হয়ে গেছে। বাসে যায়, বাসে ফেরে। সারাদিন একা একা, দুপুরে খেতে বসে কিছুটা খেয়ে জল ঢেলে দিয়েছে পাতে। কলতলায় বাসন পড়ে আছে—সামনে যতটুকু চোখ যায় উরাট মাঠ। মাঠে ফুলের চাষ হয়। সেচের জল পাওয়া যায়নি, গাছগুলো বড়ো হয়েছে, তবে ফুল ফোটেনি—চাষি মানুষদের সম্বল এই জমি, জমির চাষ থাকলে চাষি মানুষ কখনও একা হয়ে যায় না।

সেই চাষই নেই।

জমিও থাকবে না, কারণ সরকার সেই কবে নোটিস দিয়েছে।

সেই লোকটা কী যেন নাম, তাকে দেখলেই মানুষটা তার খেপে যায়। লোকটাকে দেখলে মানুষটা তার কেবল থুতু ফেলে।

থু থু। লোকটা নেমকহারাম, পঞ্চায়েতের বাবু, প্রভাবশালী মানুষ, কখনও একা হাঁটে না। দু-চারজন সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে হাঁটে। পাজামা-পাঞ্জাবি গায়ে, ভোটের বাবুও হয়ে যায় মাঝে মাঝে। এবং এলাকার ঘরবাড়ি ছড়িয়ে ছিটিয়ে— এই যেমন কিছু ঝোপজঙ্গল— একটা টালির বাড়ি। এই যেমন কিছু বাঁশ ঝাড় পার হয়ে দুটো কাছারি ঘর। মুরগির ওড়াউড়িও আছে— দাওয়ায় বসে থাকে কোনও অথর্ব মানুষ। লাঠি ভর দিয়ে, হাঁটে কখনও। হালের বলদ গোয়ালে বাঁধা, জোয়াল তোলা যায়নি। চাষ না থাকলে হালের বলদেরও কাম থাকে না— অথবা মানুষটি পাকা রাস্তায় লাঠি ভর করে চলে যায়। তারপর জমিতে নেমে যায়, থাবড়া মেরে ধুলো ওড়ায় জমির। এটা যে খেপামি পুষ্পবতী ভালোই জানে। কারণ, এভাবে জঙ্গলে কিংবা ফলের বাগান পার হয়ে যত ঘরবাড়ি সবারই ত্রাস— জমি যাবে, জমি থাকবে না। সরকার নোটিস ঝুলিয়ে যাচ্ছে। পুষ্পবতী অবশ্য চুপচাপ থাকে, কারণ সে দেখেছে, মানুষটা কোনও কথা বললেই বিরক্ত হয়।

কিন্তু কথা ত বাতাসে ভাসে।

এই যেমন ভাদু বলে গেল, তুমি কি গ কাকি তুমি জান না—রেজিস্ট্রি বন্ধ, জমি হাত ফেরতা করতে দেবে না। সরকার যে এখানে একটা পেল্লাই শহর বানাবে। তুমি কিছু জান না।

বিপ্রদাস একদিন বাড়ি থেকেই বের হল না। অবেলায় ঘাটে শুয়েছিল। ভাদু উঠোনে দাঁড়িয়ে যেন সতর্ক করে দিয়ে গেল কাকিকে—সময় ভালো না, গবরমেন্টের শহর— সব মানুষ উৎখাত হবে। গেঁরাপি হবে এখানটায়। একশো কুড়ি ফুট রাস্তা যাবে। ঘরবাড়ি ইমারত দেখবে বাহার— ধানের জমি ফুলের জমি বেহাত হয়ে যাবে। চাষি মানুষেরা হায় হায় করবে কপাল থাবড়াবে, তবু গরিবের সরকার গেঁরাপি করবেই। রক্ষা নাই।

সরকার বড়োই ধুরন্ধর। ভাদু তার গামছাখানা মাথার উপর ঘোরাচ্ছে। যেন মশামাছি তাড়াচ্ছে, কিংবা রাতে যখন সব নিশুতি হয়ে থাকে, তখনও সে মাঠের উপর দিয়ে নানা কথা বলতে বলতে, কখনও ঘুমেঙ্গি, নাচেঙ্গি, গায়েঙ্গি— যেন এই সব শব্দমালার মধ্যে সে বড়োরকমের সুখ পেয়ে যায়। তার মাথায় থাকে হাড় মুড়মুড়ির টিন, পিঠে ঝুলে থাকে একটা কুপির শিসওঠা আলো। পায়ে তার ঘুংগরো। সে পা হ্যাঁচড়াতে হ্যাঁচড়াতে হাঁটে— ঘুংগরোতে শব্দ হয়— ঘুমেঙ্গি ফিরেঙ্গি, গায়েঙ্গি।

সেই খবর দেয় সব। কাগজের খবরও দেয়। বিপ্রদাস সব জেনেও চুপচাপ থাকে। পুষ্পবতী কিছু বললে পাত্তাই দেয় না।

তবু যখন পারে না, অনু পড়ছে দুলে দুলে, বারান্দায় মাদুর পেতে দুলে দুলে পড়ছে। ওর চুল ওড়ে, বাতাসে ফ্রক ওড়ে— ভাদুদা এক প্যাকেট হাড়মুড়মুড়ি বারোভাজা দিয়ে গেছে— বড়ো তাজা এবং সুস্বাদু খেতে, খড় খড় করে খাচ্ছে তার মাধ্যমিকের অঙ্কের বইটা কোলে, সে খাতা পেনসিল নিয়ে বসে থাকলে পুষ্পবতী স্বপ্ন দেখতেই পারে।

হ্যাঁগা, ভাদু কী সব বলে গেল শুনছ।

বিপ্রদাস খাট থেকে লাফিয়ে উঠল, কী ভ্যাজর ভ্যাজর করছ।

আরে শুনলে না, কথাটা কী ঠিক?

রাখো ত, গরমেন্টের বাপের জমি, ও কত উড়ো কথা ভাসে।

উড়ো কথা বলছ। কাগজে বড়ো বড়ো খবর বের হয়েছে।

ও বের হয়। আবার উবেও যায়। ধাদধারা গোবিন্দপুর— এখানটায় হবে গেঁরাপিঁ।

সরকারের খেয়েদেয়ে আর কাজ নেই।

গেঁরাপিঁ কী বস্তু জান তুমি?

বিপ্রদাস লুঙ্গি কোমরে খিঁচে বারান্দায় বের হয়ে এসেছিল— তারপর জলচৌকিতে বসে বলেছিল, চা হবে একটু।

চিনি আনতে হবে।

এই অনু, দ্যাখ না বদনের দোকানে, দুধ চিনি খাতায় লিখে নিয়ে আয়। মুখ করতে পারে, বলবি শেখরপুরের—

তার আগেই ঝামটা।

আমি পারব না।

তোরা কিছুই পারিস না। দুশো গ্রাম চিনিও ধারে আনতে পারিস না। তারপর পুষ্পবতীর দিকে তাকিয়েছিল—সরু কোমর, পিঠের ভাঁজ থেকে নিতম্বের কাছাকাছি চলে গেছে শরীরের কানামাছি। আরও নীচে হাত দিলে ভয়ংকর করাল গ্রাস— এই গ্রাসই তাকে এতকাল যে আচ্ছন্ন করে রেখেছে, সে তাও বোঝে। জমি, মেয়েমানুষ ছাড়া হয় না। সংসারে তার কথার দাম নেই।

তারপরই ভাবল, অনু তুই বড়ো হয়েছিস, সংসারের অভাব অনটন বুঝবি না! ভাদু আসে যায়, ব্যাটা ইজারা নিয়েছে, বাস্তুজমি, চাষের জমি সব যাবে। চারপাশে কোপের রাজত্ব। সরকারের কোপ আরও প্রখর। গায়ের রক্ত মাথায় উঠে যায়, তার উপর পুষ্পবতীর গোঁরাপিঁ। গেঁরাপিঁ কী বস্তু তার ব্যাখ্যা না পেলে সে যেন অনশনে বসে যাবে।

আসলে শেখরপুরের কাজটার কথা সে বলতে চেয়েছিল— ধান্দায় ঘুরে বেড়ায়, যখন সে কাজ, দু-হাজার ইট ফেলে দাও বিপ্রদাস, বিপ্রদাস ইটের ভাটায় গিয়ে বলবে— দু-হাজার ইট ফেলে দাও, সে শুধু অর্ডার দিয়েই খালাস— ভাটার কারবারি কমিশনে পঞ্চাশ একশো ধরিয়ে দেয়, এটাই তার পারিশ্রমিক। এই যেমন সে প্লাম্বারের ঠিকে মিস্ত্রিরও কাজ করে। শেখরপুরের মোহনবাবুর কাজটা সে পেতে পারে— সে ঘুরেও এসেছে। জল উঠছে না।

হাতুড়িতে সে পাইপে ঘা মারে, এটা খোলে, ওটা খোলে, তারপর নিদান দেয় পাম্প খারাপ, নতুন পাম্প লাগাতে হয়। আসলে সব কাজেই সে হাফ মিস্ত্রি। আসলে পাম্প গস্ত করার মতলবে। মোহনবাবু নতুন পাম্প কিনলে পুরোনো পাম্প বাতিল, তা বিপ্রদাস, ফেলে রেখে কী হবে. তুমি নিয়ে যাও। দামদর করে বিক্রি করে দাও। আমি আবার লোক কোথায় খুঁজব। কাজটা করতে পারলে চার-পাঁচশো টাকাও হয়ে যেতে পারে। টাকা ত আর ওড়ে না, খুটে খুটে তুলতে হয়। পাম্পের টাকা গস্ত করতে পারলে বদনের দেনা একদিনে শোধ। এরা কী সে বোঝে। সোজা কথার গেঁরাপিঁ হল গে ঘুঘু চরবে উঠোনে।

বাস্তু জমি শালি জমি কিছুই বাদ যাবে না। দৌড়ালে রাস্তার কুকুরে কামড়াবে, গাছের ছায়ায় বসে থাকলে মাথায় হাগবে।

পুষ্পবতীকে এমন কঠিন কথা বলে কী করে। সোহাগি মেয়েছেলে বুঝে ফেললে বিলাপ শুরু করে দিতে পারে। তবে কথাখানা যে উড়ে বেড়ায়, দশকান হয়ে এই টালির ঘরটাতেও চাউর হয়ে যায়। অনু বাসে যায় আসে। সেও শোনে সব। সেও পুষ্পবতীকে এসে সব যে বলে তাও নয়। তবে বিপ্রদাস নিজে মুখে কুলুপ এঁটে রেখেছে। তার মাথায় কাগে বসে হেগে যাবে, সে কিছুতেই রাজি না।

তার এক কথা, আমার জমি আমি বুঝব। জমি দখল করতে আসুক না, ঠ্যাং ভেঙে দেব।

সে শুনতে পায়, বিপ্রদাস, সবাই যাচ্ছে, তুমিও চলে যাও। সরকার দোকান খুলে বসে গেছে, দলিল দস্তাবেজ, অর্থাৎ যা আছে তোমার গুপ্তখাতা, যার নজির দেখিয়ে তোমার এই রোয়াবি, না গেলে শেষে পস্তাবে ।

সে একবার তেড়েও গিয়েছিল, কী বললে, আবার কথাখান বল, বলে দ্যাখ, মুণ্ড ছিঁড়ে ফেলব। গাছপালা সব আমার ভগমান হয়ে আছে জানো। বাপ-ঠাকুরদা লাগিয়ে গেছে, দিনমান একটা ল্যাংড়া কুকুরের মতো এখানে সেখানে ছুটি, গন্ধ শুকে বেড়াই, বাঁশের পাইকার, ইটের ভাটা, ভেড়ির মাছ, সব খবরাবর রাখার কাজ।

বাঁশের জঙ্গলের খোঁজ দিতে পারো বিপ্রদাস?

তা খবর আছে।

কথা বলিয়ে দাও।

কত করে।

দশ হাজার টাকা।

হবে। আমার কী থাকবে?

তোমার কী থাকবে মানে?

তহরি আছে না, খবর দেব, আর বাঁশ বোঝাই গাড়ি যাবে, আমি কী কলা চুষব!

কার বাঁশ, কোন জঙ্গলের বাঁশ, কাঁচা না পাকা ঘুনি, যাত্রাগাছির সব বাঁশ সাফ। আটঘরায় শরিকের এত বড়ো বাঁশের জঙ্গল, সেও শেষ। রাতকানা হয়ে ঘুরছি বিপ্রদাস। পাকা বাঁশের খোঁজ পাচ্ছি না।

পাকা বাঁশের অভাব, কী যে বলেন!

এক পা সাইকেলে, আর এক পা রাস্তায়—

যা হোক করে বাঁশের পাইকার একখানা পাকড়ানো গেছে। পাকা বাঁশের খোঁজে আছে। জমি জলের দরে বিক্রি, যে যা দর পাচ্ছে তাতেই খালি করে দিচ্ছে— বেহাত হয়ে গেলে ছালাও যাবে, আমও যাবে।

সারাদিন তার টো টো করে ঘুরে বেড়ানো। কোথায় না যায়—যাত্রাগাছি, কদমপুকুরেও যায়, আরও দুরে আছে শুলংগুড়ি। বর্ডার পার হয়ে শুধু চলে আসছে মানুষজন। যাত্রাগাছি শুলংগুড়িতে ঠাঁই নিচ্ছে। প্রথমে বাঁশ পাতা কাঠ যা পাওয়া যায়, তাই দিয়ে ঝুপড়ি বানিয়ে মাথা গোঁজার ঠাঁই খোঁজে। কেউ কলের মিস্ত্রি, কেউ জোগাড়ের কাজ করে পয়সা কামাবার ধান্দা। অবশ্য তারুলিয়া, আটঘরা, বেকজোয়ানিতে অনুপ্রবেশ নেই বললেই হয়। গাঁয়ের মানুষজন তার খুবই চেনাজানা, সে যে বিপ্রদাস, সে যে এলাকার খোঁজখবর কেটু বেশি মাত্রাতেই রাখে তারা ভালোই জানে। শুলংগুড়ি, যাত্রাগাছির ঝুপড়ির পাশ দিয়ে হাঁটলে কেউ তাকে যে চেনে না, সেও কাউকে চেনে না—দেশকালের যখন এই অবস্থা, তখন সে বাঁশের পাইকার হরমোহন বাসুইকে কিছুতেই হাতছাড়া করতে রাজি নয়।

কী বাঁশ চাই? পলতা বাঁশ, না মুলি বাঁশ, পলতা বাঁশের জঙ্গল শেখরপুরের দিকে মেলা, রাস্তার দু-পাশে তাকালেই বোঝা, যায়, ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ঘরবাড়ি, পাকা ইমারত থেকে বাবুদের বাগানবাড়ি সবই আছে। আবার মাঠ কিংবা চাষের জমি পার হয়ে উরাট জমিতে আছে বাঁশের জঙ্গল। গভীর জঙ্গলে ঢুকে গেলে বিঘের পর বিঘে শুধু বাঁশঝাড়।

পাতলা বাঁশের দর কী যাচ্ছে? বাসুই মশাই পাঞ্জাবির হাতা গুটিয়ে কপালের ঘাম মুচতে মুছতে প্রশ্ন না করে পারে না।

দর কী যাচ্ছে আপনি জানেন না হারমোহনদা? আসলে পাইকার মানুষ। ভি আই পি, রাস্তাখানাও ভি আই পি, দু-পাশের ধানের মাঠ শেষ, প্রলয়ঙ্করী সব কাণ্ড। আকাশ সমান উঁচু সব পেল্লাই হাউজিং— আপনার এতদিনের কারবার, সব জানেন, সব বোঝেন বাকডোবা, মাছিডাঙা, পাথরকাটায় বাঁশঝাড় সাফ হয়ে গেছে বলে আতান্তরে পড়ে গেছেন —পঞ্চাশটা টাক হবে?

কেন, পঞ্চাশ কেন?

দিন, দেখি, বাজিয়ে দেখা যাবে না, তবে শুনে দেখলে বলতে পারি, কোনদিকে গেলে আপনার কারবারে ঘূণ ধরবে না। আমার পায়সাও হবে, আপনার কারবারও হবে। তবে বলতে পারি ঠকবেন না। টাকাটা আপনার বাঁশ বাগানখানা দেখলেই উসুল হয়ে যাবে।

পঞ্চাশ কী গাছে হয়?

আজ্ঞে না। গাছে হয় না জলেও হয় না, তবে হয়, না হলে আপনিই বা হন্যে হয়ে বাঁশের খোঁজে বের হয়ে পড়েছেন কেন, আর আমি ল্যানছুইরাই বা হাত পেতে চাইব কেন? হয় বলেই চেয়েছি। এটা আমার হকের টাকা।

নাও। বলে হরমোহন দশটা টাকা জ্যাব থেকে টিপে টিপে বের করে দিয়েছিল।

আগাম থাকল।

আমি কিছু জানি না, বাঁশের খবর কিছুই জানা নেই। বিপ্রদাস চোখ উল্টে দিল।

এই যে বললে,বাকডোবা না কোথায়?

আজ্ঞে ওটা দশ টাকায় হয় না। পঞ্চাশ না হলে কোথায় বলা যাবে না।

লোকটা যে বড়ই ত্যাঁদর, কী করা! কুড়ি টাকা রাখ।

আজ্ঞে না। কুড়ি টাকায় দেড় কেজি চাল হয় না। তিনটে প্রাণীর কী করে চলে বলুন!

বাঁশ না হলে ভারা হয় না, দালান কোঠা হয় না, এক বাঁশ সাপ্লাই করে হাতিয়াড়ার মোড়ে দুখানা পেল্লাই বাড়ি। কুনজুস, ভটভটি চড়ে না, সাইকেলে মাঝেসাঝে বের হয়, যখন আকাল বাঁশের, কাজের লোক হারামি, ঠিক খবরাখবর পাওয়া যায় না, তখনই নিজে বের হয়ে পড়া। চিনতে বাকি নেই। বিপ্রদাস মনে মনে কথাগুলি আওড়াল।

ঠিক আছে,তোমার কথাও থাক,আমার কথাও থাক। ধরো আর দশ খুশি মনে নিয়ে যাও। এটা ত তোমার ফাউ টাকা। ঘোরাঘুরি করলে খবর পাব না হয়।

তা পাবেন। দেখছেন কেমন লু বইছে—গরম বাতাস। রোদে ঘুরে সর্দিগর্মি হলে সব রসাতলে। ফাউ টাকার ভাও তখন ভাসানে। বউঠানের কথাখান ভাবনে—একলা ফেলে চলে গেলে হুজ্জোতির শেষ থাকবে না।

হরমোহন কেমন কাতর হয়ে পড়ে। রোদে মাথার চাঁদিফাটছে। বড়ো জলতেষ্টা বোধহচ্ছিল। সর্দিগর্মি মারাত্মক ব্যামো। ঠাস করে পড়ল ত, মরল।

হরমোহন বলল, তা হলে পঞ্চাশই নাও। তবে সবটাই গচ্চা। কীযে দিনকাল শুরু হয়ে গেল। তারপর ঢোক গিলে বলল, অর্থই যত অনর্থের মূল, এই যে গেঁরাপিঁ না কী হচ্ছে, সবটাই পচা টাকার খেলা—এটা বোঝ?

বিপ্রদাস জবাবে বলেছিল, সেই পচা টাকায় এক ধুন্দুমার কাণ্ড শুরু হয়ে যাবে। ঘরবাড়ি রাস্তা বেবাক লাল হয়ে যাবে। মানুষ-জন, ঘরবাড়ি জমি বাঁশবাগান গচ্চা দিয়ে হাওয়া খেয়ে বেড়াবে। বেশি কথা বললে বেস্মতালু জ্বলে,আপনে যান—কীসে কী কাণ্ড হবে বোঝা মুশকিল।

বিপ্রদাসের সেই থেকে বেহ্মতালু জ্বলছে। সে ঘরে বসে থাকতে পারে না। কারও সঙ্গে দেখা হলেই এক কথা—যাও, সময় থাকতে চলে যাও বিপ্রদাস। জমি ভেস্টেড হয়ে যাবে শেষে—বেলাবেলিতে রওনা না হলে নদী পার হতে পারবে না, জলে ডুবে মরবে।

ভাদু আর এক কাঠি উপরে। ব্যাটা সারাদিন মাদুরে পড়ে থাকে, বিধবা জননী তার বালিতে ডাল ভাজে, মাষকলাই ভাজে, লঙ্কা জিরে ভাজে, আর সারাদিন বসে বসে ডালমুট বানায়, ব্যাটা ভাদু বিকেলে সেই নিয়ে তার কারবারে বের হয়। পোশাকেরও কম বাহার থাকে না। ভূসোকালির রং জোববায়। আপাদমস্তক জোববায় শরীর ঢাকা, মাথায় লালরঙের ফেটি, কোকড়ানো চুলেদস্যি চেহারা, বাবুদের বাগানের কোনাখামচিতে ঝুপড়ি বানিয়ে থাকে। দায় নেই অদায়ও নেই, কেবল সে সুযোগ পেলে তার বাড়িতে এসে বসে থাকে। আর জপায়, বোঝলা কাকি, মারকাটারি বই চলছে। দেখায় বাসনা থাকলে বলবে, টিকিট কেটে আনব। অনু ত এক খ্যাপ মেরে এসেছে। আর এক খ্যাপ দেবারও বাসনা।

তারপরই যত ফস্টিনস্টি, এই অনু এক গেলাস জল দে।

এই অনু, চা বানা। পয়সা রাখ। বদলকে বলগে, ভাদু বসে আছে। যা লাগে নিয়ে আয়।

শুয়োরের বাচ্চা। তুই ভাবিস বিপ্রদাস কিছু বোঝে না। অনু কার সঙ্গে খ্যাপ মারে ব্যাটা। তুই উসকে দিয়ে নিয়ে যাস, হলের ঘুপচিতে ব্যাটা কামড়াকামড়ি তোর। শেষ হয়ে যাবি বলে দিলাম। আমার দশটা না পাঁচটা, একটা মেয়ে, তারে তুই গস্ত করতে চাস। তোর আছেটা কী! বাবুদের বাগান পাহারা দিস, লপ্তমত বাগানে থাকিস খাস, আজ এক ডালে বসে আছিস, উড়িয়ে দিলে কাল আর এক ডালে। তোর আছেটা কী। পায়ে ঘুংগরো পরে সং সেজে ডালমুটের নাম কাচ্চা বাচ্চার মতো পরমাসুন্দরীকে নিয়ে খাবলাখাবলি!

দুই

পুষ্পবর্তীও জানে, তার মানুষটার দু-পাশে দুই পরমশত্রু গজিয়ে গেছে। এক গেঁরাপিঁ, আর এক ঘুংগুর কথা জানতে চাইলেই মানুষটা খেঁকিয়ে ওঠে।

ভাদুই ঠিক বলেছে, গেঁরাপিঁ হলগে কাকি, বাবুদের গ্যারাকল। সব হেঁজিপোজি তাড়িয়ে দাও, প্রশস্ত রাস্তা বানাও, অট্টালিকা বানাও, আমরা বাবুরা গিয়ে নিশ্চিন্তে বসবাস করি। গাড়ি ঘোড়া চড়ি। হাওয়া খাই।

আমরা যাব কোথায়!

সে ত বাবুদের জানার কথা নয়। বাবুরা মেলা টাকা দেবে, তাই নিয়ে যাব। একসঙ্গে এত টাকা জীবনে দেখেছে! বলো কাকি, এত মাথা গরম হলে চলে। যাও, জায়গার ত

অভাব নেই, বাবুদের যখন পছন্দ, টাকাও মেলা, যেতে এত আপত্তি কীসের বুঝি না কাকি।

কিন্তু কাকা তোমার কিছুতেই মাথা পাতছে না, কোথায় যে সকালে বের হয়ে গেল, বেলা পড়ে আসছে, ফেরার নাম নেই, তোমাকে কি কিছু বলে গেছে।

আমাকে? তুমি জানো না, বাক্যালাপ বন্ধ। আমাকে শাসিয়েছে, ভাদু সাবধান, কেউটের গর্তে হাত ঢোকাবি না।

অমা! সে কবে! তোমার কাকার মাথা ঠিক নেই। কিছু মনে কোরো না।

ওই ত সেদিন, কাকা আমাকে হলের সামনে তোড়পাল। অনু ফুচকা খাচ্ছিল, দমাদম সাঁচাচ্ছিল—পারমিশান থাকলে যা হয়, আর কাকি তুমি ত জানো, কেউ খেতে চাইলে আমি বারণ করি না। অনু যখন ফুচকা খায় কী যে সমুধুর দৃশ্য কাকি! নুয়ে যাচ্ছে, কনুই তুলে ওড়না সামলাচ্ছে, শালপাতার ঠোঙা ঠোঁটের কাছে, ফতুর হয়ে যেতেও রাজি, আমি কিছুতেই অনুকে বলতে পারি না, এই আর খাস না। তোর বাপ রাস্তায় দাঁড়িয়ে আমাকে তড়পাচ্ছে। আচ্ছা আমার কী দোষ বলো।

যখন পছন্দ করে না।

আমি পছন্দ করার কে? পছন্দ যার, তাকে তোমার জিগাও, সে একদণ্ড আমাকে না দেখলে পাগল হয়ে যায়—তারপরই থেমে জিভ কেটে বলল, ছিছি তোমাক এ-সব কথা বলা আমার উচিত হয়নি। এই অনু, অনু আছিস। যা বদনের দোকানে, এক ঠোঙা মুড়ি আন, কাকি তেলমুড়ি মেখে দাও, তোমরাও খাও, আমিও খাই। কাকার আজ মনে হয় ফিরতে রাত হবে।

আমার খেতে ইচ্ছে করছে না ভাদু। তোমার কাকা সেই কখন কিছু মুখে না দিয়ে বের হয়ে গেল? এখনও ফেরার নাম নেই।

তখনই অনু ঘর থেকে বের হয়ে এল। ফ্রক গায়ে, গামছা জড়ানো শরীরে। কারণ উঁচু স্তন খুবই তার পরিপুষ্ট, বাড়ে দিনে দিনে। এ-বছরের ফ্রক ও বছরে টাইট হয়ে যায়। একজন ছাঁচড়া মানুষের সে কন্যা, চাইলেই দেবে কোত্থেকে। ফলে গামছাখানা সম্বল। গামছাখানা গায়ে জড়ানো, শরীর ঢাকা থাকে, অথবা বলা যায় আব্রু—সে বের হলেই এক লাফে উঠোন তারপর বলল, টাকা দাও। আমি নিয়ে আসছি—মা না খেলে, আমরা খাব না হবে কেন। আমার খিদে পেয়েছে।

ভাদু বলল, খিদের আর দোষ কি? উঠতি বয়সে খিদে বেশিই থাকে। তোর বাবা মোটেই বোঝে না। বলে ভাদু একটা পাঁচটাকার নোট বের করে দিতেই খপ করে ধরে ফেলল অনু। কী সুঠাম শরীর। যেন অঙ্গ তার সোনার হরিণ। পায়ের গোড়ালি থেকে জানু

পর্যন্ত মসৃণ এবং পাকা বেলের মতো রং। আর জানুর ঊর্ধ্বে কী থাকে—ভাদু ভালোই টের পায়। উঠতি বয়েস যে পরমান্ন। খেতে ভারি সুস্বাদু। মেয়েটার দৌড়ে লাফিয়ে চলে যাওয়ার মধ্যে থাকে এক যেন অনন্তের ইশারা—সামনে জলাজমি তারপর সড়ক এবং সড়কের পাশের ঘরবাড়ি পার হয়ে বদনের দোকান, সেখান থেকে এক ঠোঙা মুড়ি।

ভাদু বলল, দ্যাখো কাকি, মেয়েটার দিকে তাকিয়েও তোমাদের ভাবা উচিত। দালাল ঘুরছে, বল ত, আমি কথা বলিয়ে দিতে পারি, বেশিই দাম পাবে। একশো কুড়ি ফুটের রাস্তা— ভাবা যায়, তার পাশে জমি। গেঁরাপিঁ শুরু হলে জমির দর হুহু করে বাড়বে। পাকা মাথার বাবুরা লপ্তে লপ্তে জমি কিনে রাখছে, সরকারকে না দাও, ওদের দিতে আপত্তি কোথায়! দ্বিগুণ দাম দেবে—দশ কাঠায় কত টাকা হয় সহজেই বুঝে নিতে পার। না বুঝলে কন্যেতির কাছে বুঝে নিতে পার। অঙ্কে চৌকুস তোমার কন্যা, না হলে ভাদুকা বলতেই অজ্ঞান হয় কেন বোঝো না।

পুষ্পবতী সেই যে বাঁশে ঠায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, মানুষটার ফেরার অপেক্ষায় রাস্তার দিকে তাকিয়ে আছে, তা থেকে তার একবিন্দু নড়চড় হচ্ছে না। কেমন উদাস গলায় তবু না বলে পারল না, জমি ত সরকারের, ওরা নিয়ে কী করবে! জমি বেহাত হলে সরকার ছাড়বে কেন?

আরে সেটা তোমার ভাবার কথা না। পাকা মাথার লোক তারা, সবরকমের অঙ্ক জানে, তারা ঠিক করলে সরকারের জমি কলমের এক খোঁচায় বেসরকারি হয়ে যাবে। বোঝলা না সরকার হল জনগণের। তোমরাও জনগণ। পাকা মাথার লোকেরাও জনগণ। জনগণ চাইলে সরকারের সাধ্য কী মাথা না পাতে?

পুষ্পবতীর মাথায় কিছুই ঢোকে না। ডবল দাম পাওয়া যাবে। সোজা কথা।

ভাদু বিকাল হলেই চষা মাঠ পার হয়ে যায়, তারপর গাঁয়ের উপর দিয়ে হাঁটে। রাস্তায় হাঁটে, বাড়ি বাড়ি হাঁটে, হাঁটে আর হাঁটে। মুখে চোং—চাই হাড় মুড়মুড়ি ভাজা। আর ঘুংগরো ছ্যাঁচরায়—যে যেখানে থাকে, কোঠাবাড়ি, বাগানবাড়ি, কিংবা চাষবাসের মানুষজন, তাদের কাচ্চাবাচ্চা সব মিলে ভিড় করলে ভাদুর বিক্রি বাড়ে। পুষ্পবতীর মনে হয় ভাদু মানুষের রহস্য টের পায়। অন্ধকার রাস্তায় দু-পাশের ঘরবাড়ি ফেলে সে হাঁটে— তার কাছে মোড়া কুপির আলো থেকে শিস উঠে। তার পায়ে ঘুংগরো বাজে। আর মাঝে মাঝে চোং মুখে হাঁক ডাক—চাই হাড়মুড়মুড়ি সাড়ে চোদ্দ ভাজা। খেলেও মজা, না খেলেও মজা।

সে তারুলিয়া আটঘরা নবাবপুরেও যায়। সে অন্ধকার রাতে মাঠ ভাঙে। দূর থেকে সচল একটা আলো দেখলেই অনু টের পায় ভাদু ফিরছে। উঠোনে দাঁড়িয়ে পুষ্পবতীও দেখেছে, অনেক দূরে, যখন রাত নিশুতি হয়ে যায়—ভাদু মাঠ ভেঙে বাড়ি ফেরে। এই

ফেরার মধ্যে ভাদুর নানা মজা থাকতেই পারে। সে শহরেও যায়। মানুষজনের সঙ্গে তার আলাপ পরিচয়ের শেষ নেই—দামালেরা শকুনের মতো উড়ছে চারপাশে—ভাদু খবর পেতেই পারে। ডবল দামে বিক্রি করতে পারলে—যে করে হোক কোথাও গিয়ে তিনটে পেট চলে যাবে। আর তিনটা পেটই বা ভাবে কেন, মেয়ে সোমত্ত হয়ে গেছে, আজ আছে, কাল নেই, বলতে গেলে দুটো প্রাণীর জমি ঘরবাড়ি বেচা টাকায় হেসে খেলে চলে যাবে।

ভাদু খবর রাখে। সব খবর।

মানুষটা ফিরলে ভাদুর পরামর্শ যে খুব একটা খারাপ না বুঝিয়ে বললে শুনবে। কী দরকার জমি নিয়ে হুজ্জোতি করার। বিনা পয়সায় ত আর নিচ্ছে না। ভাদু ঠিকই বলে, কাকি, বাগুইহাটি, জ্যাংরা, কেষ্টপুর হয়ে গেলে কী ভালো হবে। সেদিনও সেখানে সব ধানের জমি, যেদিকে তাকাও, ধানের জমি, আশেপাশে গরিব মানুষের ঘরবাড়ি জোতদার জমিদারও ছিল—এখন যাও, দেখো গে কী একটা মস্ত কারবার— গলিঘুঁজি ভর্তি। কাঁচা নর্দমার গ্যাস। আসলে মুখে বিস্ফোরণের কথা উচ্চারিত হয় না। সে বলে, জনবিচ্ছুরণে প্রাণবায়ু ওষ্ঠাগত—যেখানে সেখানে কাঁচা রাস্তা, পিল পিল করে মানুষজন বাসে উঠছে নামছে। মারুতি গাড়ি ঝাঁকে ঝাঁকে, শুধু একটা অকল্পিত শহর—আসলে ভাদু বলতে চায় অপরিকল্পিত শহর। যার মাথা মুণ্ড কিচ্ছু নেই। ধানের মাঠও নেই, টালির ঘরও নেই। সব লোপাট। যতদূর চোখ যায় হাউজিং আর হাউজিং। চোখে দেখলে পিলে চমকে যাবে জানো!

তোমার কাকা কি সেটা বোঝে?

বোঝাতে হবে। এতো চরণবাবাজি বলল, ভাদু, কাল বড়ো মহাকাল। সে শুধু গিলে খায়। বলে বিশুবিয়স।

সেটা আবার কী!

এই অনু, বিশুবিয়স কীরে!

আমি জানি না।

কী কচু পড়িস বুঝি না! ধুম উদগীরণ করে। তপ্তলাভা উদগীরণ করে। বুঝতে পারলি!

না।

ইস্কুলে যাস কেন? ঘাস কাটতে যাস। চরণবাবাজির কথা কখনও মিছে হয়! উত্তপ্ত লাভা নেমে আসছে। গ্রাম মাঠ ভেসে যাবে। কেউ রুখতে পারবে না। জনবিচ্ছুরণে এই হাস। আমার কথাখান বুঝতে পারলি!

আমার বুঝে দরকার নেই। মাকে বোঝাও, বাবাকে বোঝাও।

শুনলে ত কাকি, তোমার মেয়ের কথা। আসলে কাকি, ওই সে হাউসিং-এর পাল্লায় পড়ে আমরা যে তাড়া খাচ্ছি, কেউ কি আটকাতে পেরেছে! সরকারের সাধ্য আছে—তুমি জমি বেচলেও আটকাবে না, না বেচলেও আটকাবে না। গাছের শেকড়বাকড়ের মতো ছড়িয়ে পড়বে। আজ অথবা কাল। ধানের মাঠও থাকবে না, জমিও থাকবে না। যাও না আটঘরা তেঘরিয়ার দিকে, ওটা ত তোমার বাপের বাড়ি ছিল, যাও না, চিনতে পার কি না দেখে এসো সরকার ত আর কাউকে ঠেলে দেয়নি, তবে তোমার বাপ-কাকারা জমি বেচে দেশান্তরী হল কেন? এক দেড় হাজার টাকায় বিক্রি—আর এখন জমির দাম কত জানো, এক দেড় লাখ। টাকা যতই দাও, জমি ত আর বাড়ে না। সব বাড়ে, শুধু জমি বাড়ে না।

ভাদুর কথাবার্তা পুষ্পবতীর খুবই মনে ধরে। ভাদু বলেই চলে, আজ না হয় কাল—তোমাকে জমি ছাড়তেই হবে। চলে যেতে হবে, দূরে আরও দূরে। তবু সরকার ন্যায্য দাম দেবে, বড়ো বড়ো প্রাসাদ, রাস্তা প্রশস্ত, পার্ক ময়দান, এক ময়দানবের যজ্ঞও শুরু হয়ে যাবে—চরণবাবাজিরও যজ্ঞ হয়, চরণবাবাজির যজ্ঞ হলে কেষ্টপুর হয়, একবাড়ির পেচ্ছাব আর এক বাড়িতে পড়ে, আর ময়দানবের যজ্ঞে যার যার পেচ্ছাব তার তার বাড়িতে। তারপর পাতালে ঢুকে যায়। বোঝো তার কাণ্ডকারখানা? শহরের মানুষজন ঘরবাড়ি ঠেলেঠুলে এই এলাকায় ঢুকে যাবেই—কেউ আটকাতে পারবে না। কাকাকে সেটাই বোঝাতে পারে না, দিতে হয় জমিটা ময়দানবের হাতেই তুলে দাও। চরণবাবাজিকে দিয়ে তেঘরিয়া কেষ্টপুর জ্যাংরা বাগুইহাটি করে দিও না।

পুষ্পবতীর মনে হয় খুবই ন্যায্য কথা, ভাদু কিছুটা খ্যাপা গোছের মানুষ, তবু তার কথায় যেন কোথায় একটা সূত্র খুঁজে পায়। বাপ-কাকারা কেন, সেও তেঘরিয়ায় গেলে ধরতেই পারবে না, বসতবাড়ি, দুটো জামরুলের গাছ, কিছু কলাগাছ, লাউয়ের মাচান কোথায় হারিয়ে গেছে। বাপ-কাকারা বসিরহাটের দিকে মদনপুরে উঠে গেছে। সস্তায় জমি ঘরবাড়ি সব হয়েছে, দাদারা ট্রাক চালায়, তারাও দূরে আরও দূরে হয়তো একদিন চলে যাবে। পুষ্পবতীর চোখে জল চলে আসে।

ভাদু কখন উঠে চলে গেছে তাও টের পায়নি।

চৈত্রমাস, গরমে গা জ্বলে যাচ্ছে। তপ্তখোলার মতো এই টালির ঘরে পুষ্পবতী তবু কী যে আরাম পায়—সে দেখল সদরের ওপারে বাঁশবাগানে সূর্য অস্ত যাচ্ছে, ছায়া নেমে এসেছে ঘরবাড়িতে। মানুষটার তবু ফেরার নাম নেই।

সে ডাকল, অনু, অনু রে।

অনু ভেজা একখানা গামছা জড়িয়ে গা ধুয়ে এসেছে—এই অবেলায় যখন তখন কলপাড়ে গিয়ে বসে থাকে—পাইপে জল ওঠে না, জল সেই পাতালে এখনও মনে হয়

মাঝে মাঝে। সেটুকু ওঠে, তাই দিয়ে তপ্তশরীর ঠান্ডা করতে হয়—জং ধরা পাইপ, কার কখানা বাতিল পাইপ নিয়ে এসে সেই করে টিউকলটি করেছে, তারপর থেকে বলা চলে নিজের টিউকল, তা ঘোলা জল উঠলেও নিজের টিউকল, খাবার জল দু-বালতি বদন মুদির বাড়ি থেকে নিয়ে আসতে হয়—এখন মেলা কাজ, বাসন সব কলপাড়েই পরে আছে। কাক শালিখের উপদ্রবও নেই, এঁটো কাটা কিছু আর না থাকলে কাক শালিখ উড়বে কেন, ঘর ঝাঁট দিতে হয়। অনুটা যে আবার কোথায় গেল।

এই অনু, অনু বাসন কটা, ধুয়ে রাখ।

পারব না।

সব কথায় এক রা। না, পারব না। কী করছিস! তারে জামাকাপড় মেলা, তুলে রাখ।

সাড়া নেই।

পুষ্পবতী ঘরের ভিতর উঁকি দিয়ে দেখল মেয়ে তার ভাঙা আর্শিতে প্রসাধনে ব্যস্ত। সব যেতে বসেছে, কোনও যদি হায় আপশোস থাকে। মেয়ে এখন নিজের মর্জিমতো চলে। বাবাকেও ডরায় না।

এই অনু তোর কি মায়াদয়া নাই! মানুষটা কোন সকালে কিছু মুখে না দিয়ে বের হয়ে গেল, একবার খোঁজখবর নিবি না! হেমাঙ্গর সঙ্গে যদি দেখা হয়, কলের কাজ করতে যদি চলে যায়, হেমাঙ্গ জানতেই পারে। হেমাঙ্গ ওস্তাদ মিস্ত্রি, কলের কাজ থাকলে হেমাঙ্গর পরামর্শ ছাড়া করে না—তুই যা, যদি হেমাঙ্গ ফিরে আসে!

অনু অর্থাৎ অনুপমা আর্শিতে দাঁত দেখছে। দরজায় ঝুঁকে আছে যে মহিলাটি, সে যে তার মা, তাও যেন মনে হয় না। কী সংসারের ছিরি, সে শালোয়ার কামিজ পরে এখন যে রাস্তায় ঘুরে বেড়াবে। তার কী সময় আছে বাপকে খোঁজার। বাপের খোঁজে কোথায়ই বা যাবে! বাপের মাথায় আগুন জ্বলছে, যা কিছু একটা করে বসতে পারে, খেপে গেলে এখনও ত্রাসে ফেলে দেয়! সেই বাপকে খোঁজা তার কম্ম নয়। মুখ খিঁচিয়ে কথা বললে কাঁহাতক সহ্য হয়!

তার এক কথা, আমি পারব না। কতদিনই ত যায়, ফিরেও আসে। তোমার আবার বেশি বেশি! এত উতলা হলে চলে! মেয়েটাও চোখের সামনে ওড়না উড়িয়ে বের হয়ে গেল। কোথায় যাবে কিছুই বলে গেল না। এই আসছি বলে সেও চলে গেল। হতচ্ছাড়া জীবন হয়ে যাচ্ছে, জমি বাড়িঘর কিছুই থাকবে না টের পেয়ে মেয়েটাও কেমন দজ্জাল হয়ে গেল।

পুষ্পবতী কী যে করে! তবু কিছুটা জলা পার হয়ে গেলে মানুষজনের দেখা পাওয়া যায়। চেনাজানা কাউকে দেখলেও বলতে পারে, আপনার দাদাকে দেখলেন! সেই কোন

সকালে বের হয়ে গেল, কিছু বলেও গেল না, এই আসছি বলে বের হয়ে গেল, এখন কী যে করি?

আর তখনই দেখল তার মানুষটা বাস থেকে নামছে। দু-হাতে দুটো ব্যাগ। ব্যাগ ভর্তি বাজার, এই যেমন চাল ডাল তেল নুন, তরি তরকারি, ব্যাগ দেখেই পুষ্পবতী দৌড়ে গেল রাস্তায়, সারাদিন একটা মানুষ নিখোঁজ হয়ে থাকলে, যা হাহাকার শুরু হয়! কাছে গিয়ে বলল, দাও, আমি নিচ্ছি।

পারবে না।

কোথায় গেছিলে! একটা খবর নেই! তুমি ত না বলে না কয়ে কোথাও যাও না। আমার কী চিন্তা!

বিপ্রদাস কোনও কথা বলল না। হাতের ব্যাগও পুষ্পবতীকে দিল না। নিজেই টেনে নিয়ে যাচ্ছে। রাস্তা থেকে জলার পাড়ে পাড়ে বাড়িতে উঠে ডাকল, অনু, অনু, ধর মা।

অনুর কোনও সাড়া নেই।

দরজা হাট করে খোলা।

বিপ্রদাস তাকাল পুষ্পবতীর দিকে। আপশোসের গলায় বলল, আমার সব যাবে। তারপর বারান্দায় ব্যাগ রেখে ডাকল, এই অনু, তুই কোথায়?

মেয়ে তোমার কোথায় উড়তে গেল। আমার মানা শুনল না। এইসব বলতে গিয়ে পুষ্পবতীর মুখ গোমড়া।

টিভি, বুঝলে টিভি। সব খাবে। বাবুরাও খাবে, টিভিও খাবে। ধিঙ্গি নাচ। কোমর বাঁকিয়ে নাচ, লাইরে লাপ্পা গান—সিরিয়েল, কত মজা। বাপ ফিরেছে কী মরেছে, কিছুই যায় আসে না। ঠিক চাঁদুদের টিভির সামনে বসে পড়েছে।

তখন দুটো একটা নক্ষত্র আকাশে ভাসমান—এদিকটায় আলো আসেনি। পুষ্পবতী হারিকেন জ্বেলে দাওয়ায় রেখে দিল। হাতমুখ ধোওয়ার জন্য এক বালতি জল তুলে রাখল। দড়িতে গামছা রেখে দিল। বিপ্রদাস মেজাজ ঠিক রাখতে পারছে না, সে ঠায় খুঁটিতে হেলান দিয়ে বসে আছে। কিছু বলছে না। গুম মেরে আছে।

তারপরই চিৎকার করে বলল, তোর মেয়ে, টিভি বের করছি! বলেই পাগলের মতো ছুটে গেল উঠোন পার হয়ে। পুষ্পবতী তাকিয়ে আছে। বড়ো চণ্ড রাগ মানুষটার। সারাদিন পর বাড়ি ফিরে মেয়েকে না দেখে মাথা গরম—এবং দুটো ব্যাগে কী এনেছে বোঝার চেষ্টায় সব টেনে নামাল—এক প্যাকেট চাউমিন পর্যন্ত এনেছে। মেয়েটা চাউমিন খেতে ভালোবাসে, দিতে পারে না, আজ তাও এনেছে, কোথায় ব্যাগের সব গোছাতে গিয়ে

মেয়েটা তার উল্লাসে ফেটে পড়বে, কোথায় পুষ্পবতীর সঙ্গে সবকিছু গোছগাছ করতে বসবে—তা না, কোথায় টিভির সামনে গিয়ে বসে আছে। আসলে মানুষটা যে তার সর্বস্ব দেবে বলে কথা দিয়ে কিছু টাকা ধার করেছে পঞ্চুবাবুর কাছ থেকে পুষ্পবতী জানে না। যখন চারপাশে ঠাঠা রোদ্দুর, ঝিম মেরে আছে প্রকৃতি, তেষ্টায় বুক ফাটছে, তখনই মোটর সাইকেলে পঞ্চুবাবু দেবতার মতো হাজির—বিপ্রদাস কী ঠিক করলে, হন্যে হয়ে ঘুরছ, মেজাজ ঠিক নেই মনে হয়। ধরো দুশো টাকা, পরে কথা হবে। বিনা মেঘে এই জল যে তার সবকিছু গস্ত করার অছিলা বিপ্রদাস ভালোই বোঝে। তবু তার নিরুপায় জীবন তাকে হাত বিস্তার করে দিতে সাহায্য করল।

বদনদের বাড়ি ঢুকে বিপ্রদাস ডাকল, বদন আছ, বদন!

ও তো দোকানে আছে। বদনের দিদি বের হয়ে বলল, দোকানে যাও না, পাবে।

অনু এসেছে।

না ত।

টিভি দেখতে আসেনি!

না ত!

দেখো না কাউকে জিজ্ঞেস করে। যদি আসে।

বদনের দিদি হেসে ফেলল, বিপ্রদাস আমি ত টিভির সামনেই বসে আছি।

অঞ্জলি কোথায়?

টিভির সামনে।

বদনের বউ?

টিভির সামনে।

সবাই টিভির সামনে, কেবল তার মেয়েটা টিভির সামনে বসে নেই। কোথায় গেল। কার বাড়ি গেল! নিতাইদার বাড়ি ঢুকে বলল, অনু এসেছিল?

না ত।

সবারই এক কথা। সুখদা বলল, দ্যাখ বাসে উঠে চলে গেল কি না! সিনেমার নেশা। যে নিয়ে যায় তার সঙ্গেই চলে যায়।

কথাটার মধ্যে ভারি অশ্লীল কটাক্ষ, তবে বিপ্রদাসের সময় খারাপ, তার সব যেতে বসেছে, পুষ্পবর্তী আর মেয়েটা ছাড়া তার কেউ নেই। কোথাও দূরে চলে যাবে, আর এমুখো হবে না, ময়দানবের ইন্দ্রপুরী তার হাড়গোড় চুষে ছিবড়ে করে ছেড়েছে।

সে বাড়ি বাড়ি খুঁজল। রাস্তায় খুঁজল। ভাদুর সঙ্গে যদি যায়, ভাদু ফুচকা খাওয়াবার লোভ দেখিয়ে যদি আরতি সিনেমা হলে নিয়ে যায়, কিংবা যদি দুষ্ঠজনেই উড়ে যায়—গোপনে কী ঠিক করা আছে সে কিছুই জানে না, ভাদু ইচ্ছে করলেই এক ডাল থেকে আর এক ডালে উড়ে যেতে পারে—যত ভাবছে, তত মনে হচ্ছে পায়রার বকম বকম শব্দ তাকে গোলমালে ফেলে দিচ্ছে। সে বাসস্ট্যাণ্ডে গেল—নেই। চায়ের দোকান এবং মনিহারি দোকানে গেল—যদি দাঁড়িয়ে থাকে। ওই তো মনে হয়, কাছে গিয়ে দ্যাখে সুরধনী, নবীন চ্যাটুজ্যের মেয়ে, হেলে দুলে হাসি মসকরা করছে তার নাগরের সঙ্গে।

কী নির্লজ্জ চেহারা—রাস্তায় লোকজনের তোয়াক্কা করছে না। বিপ্রদাসের কেমন আঙুলগুলো শক্ত হয়ে উঠছে। পায়রার বক বকম, দু আঙুলে গলা ছিঁড়ে ফেলবে। সে শক্ত হয়ে যাচ্ছে আর ছুটছে। ভাদু ছাড়া কারও কাজ নয়, মেয়েটাকে ফুসলে ফাসলে গায়েব হয়ে গেছে।

পুষ্পবর্তী বারান্দা থেকে সব তুলে নিয়ে যাচ্ছে ঘরে, তখনই বিপ্রদাস ছুটে এসে বলল, মেয়ে তোর ভেগেছে হারামজাদি, নচ্ছার মেয়েছেলে, কিছুই দেখিস না, মাথায় রক্ত উঠে গেলে তুই তুকারি করার স্বভাব—আর রক্ত ফুটতে থাকলে, তেড়েও যায়, কিন্তু পুষ্পবর্তী খুবই কোমল স্বভাবের, কী করবে, এত যে গালাগাল, তাও মনেদর ভালো, রাগ পড়লে ঠান্ডা হয়ে যাবে, পুষ্পবতী ঠান্ডা মাথাতেই বলল, কোথাও গেছে। চলে আসবে।

আর আসছে। তারপরই দেখল মুড়ির ঠোঙা ওড়াউড়ি করছে উঠোনে।

ঠোঙা উড়ছে কেন?

ভাদু এসেছিল।

তা হলে সেই ঠোঙা উড়িয়ে দিয়ে গেল।

যা হয় মাথা খারাপ হয়ে গেলে যা হয়, সে একদণ্ড দেরি করল না। ভাদুর ডেরায় গেল—ভাদুর জননী বলল, ভাদু হাড়মুড়মুড়ি বারো ভাজা নিয়ে গাওয়াল করতে বের হয়ে গেছে। কোথায় কতদূরে গেছে, কারণ রাস্তায় দাঁড়িয়ে সামনে মাঠ, কোথাও ভেরি, রাস্তার দু-পাশে কত গ্রাম কত জনপদ, ভাদু বাড়ি বাড়ি চোং মুখে যদি সত্যি ঘুরে বেড়ায়, আবার নাও বেড়াতে পারে। ভাদু এক মাঠ ভেঙে আর এক মাঠে হেঁটে যায়, তার কাছে ঢাকা কুপিখানার কারিকুরিও মেলা। তার পিঠে টিনের মাথায় সাপের মতো ফোঁস করে থাকে কুপিখানা। ঝড়ে বাতাসে নেভে না—সে মাঠের যত দূরেই থাক, নিশীথে তার চলন্ত কুপির আলো দূর থেকেও দেখা যায়। কাছে এলে পায়ে তার ঘুংগরো বাজে, বেটা যদি গাওয়ালে যায় তবে পালাবার পথ নেই। কোথাও যদি অনুকে তুলে দিয়ে আসে—অনুরে তোর এক

ফুচকা খাবার লোভ, বাপের কথা ভাবলি না, তর মার কথা ভাবলি না, তুই উফড়ে গেলি কোথায়—কাকে বলি! বলতে যে তোর কলঙ্ক, তোর মা-বাপের কলঙ্ক। কাকে বলে।

অন্ধকারে মাঠ ভাঙছে বিপ্রদাস। কাশবন পার হয়ে যাচ্ছে। ধুবির বিল এসে পড়তেই মনে হল, আকাশ ক্রমে আরও নেমে আসছে। সে ডাকছিল, অনু রে অনু। আসলে সে অন্ধকারে ভাদুর আশায় দাঁড়িয়ে আছে। এই মাঠ ভেঙে সে ফেরে। আরও ফিরবে। এবং ভাসমান নক্ষত্রমালার ভিতর কোনও নক্ষত্র সচল হয়ে উঠলেই বোঝে, ভাদু ফিরছে। এই ফেরার মধ্যে ভাদু এক আশ্চর্য রহস্যময়তায় যেন মগ্ন হয়ে যায়—তার কুপির আলো বাতাসে কাঁপে, এবং ক্রমে এগিয়ে আসতে থাকলে কখনও আলেয়ার মতো মনে হয়। চারপাশে কীটপতঙ্গের আওয়াজ—ময়দানবের ইন্দ্রপূরীর নির্বাসিত মানুষজন সে—কেউ জানেই না, সে একটা খুন করবে বলে প্রতীক্ষায় আছে। যেন জীবনের সব জ্বালা, এবং জীবনের সব হাড়গোড় বের করা এক ভয়ংকর দাহ্য পদার্থ হাতে নিয়ে সে ঘুরছে। তখনই ভাদু তার মাথার কুপি নিয়ে সামনে উদ্ভাসিত—পায়ের ঘুংগরো ঝন ঝন করে বেজে উঠতেই বিপ্রদাস লাফিয়ে পড়ল, গলা টিপে ধরল, বল শুয়োরের বাচ্চা, অনু কোথায়।

আমি কী করেছি, আমি জানি না কাকা—আমাকে মেরে ফেলো না। অনু কোথায় আমি জানি না।

বিপ্রদাস থমকে গেল। কুপিতে আলোতে দেখল, সত্যি বড় নিরীহ গোবেচারা মুখ ভাদুর। তার এই সংশয়ের পীড়ন যে তাকে উন্মাদ করে দিচ্ছে। তার দু হাঁটু ভেঙে আসছে, অবশ হয়ে যাচ্ছে শরীর—কেমন কাতর গলায় বলল, ভাদু অনু কোথায় চলে গেল?

ভাদু কেমন নির্বাকল্প গলায় বলল, কেউ কোথাও যায় না কাকা, যে যার মতো জায়গা বদল করে নে। ওঠো। বসে থাকলে হবে। চল একসঙ্গে না হয় খুঁজে বেড়াব।

অন্তকাল আরও বাড়ে। দক্ষিণের হাওয়া বয়—ময়দানবের ইন্দ্রপুরী থেকে দুষ্ঠজন নির্বাসিত মানুষ এক নারীর অন্বেষণে অন্ধকালে হাঁটে। অন্তকালে মাঠ ভাঙে।

আর পুষ্পবর্তী লণ্ঠন হাতে উঠোনে দাঁড়িয়ে আছে, মানুষটা কখন ফেরে সেই আশায়।

গির্জার সিঁড়িতে সারারাত

আমরা আশা করছিলাম জাহাজ এবার দেশে ফিরবে। সেই প্রায় মাস এগারো আগে সফরে বের হয়েছি—কত কাল আগে যেন, নতুন জাহাজিরা দেশে ফিরতে চাইবেই। কারণ রক্তে নোনা জলের নেশা এখনও ঢোকেনি। তা-ছাড়া একটানা, শুধু নীল জল, নীল আকাশ, কতদিন ভালো লাগে! বন্দরে এলে দিনগুলি তবু কোথা দিয়ে যে শেষ হয়ে যায়। তখন মন খুব একটা খারাপ থাকে না। টাকা থাকলে ফুর্তি-ফার্তার অভাব হয় না।

তবে সবাই একরকমের হয় না। জাহাজিরা প্রায় সবাই সংসারী মানুষ। টাকা উপার্জনের জন্য ঝড়তুফান ঠেলে পরিবার পরিজন থেকে হাজার হাজার মাইল দূরে—যত দিন যায় তত দেশে ফেরার জন্য উন্মুখ। কোম্পানির ঘরে কত টাকা জমল, কলকাতায় ফিরে কত টাকা নিয়ে ঘরে ফেরা যাবে এসব হিসেব-নিকেশও শুরু হয়ে গেছে। এগারো-বারো মাসের সফর খুবই লম্বা সফর।

মুশকিল ব্যাংক লাইনে নিয়ম বালাই কম। একবার জাহাজ কলকাতা থেকে ছাড়লে, আবার কবে খিদিরপুরে কিংবা জর্জ ডকে ফিরবে কেউ বলতে পারে না। লম্বা সফর হলে বিশ-বাইশ মাসও হয়ে যায়। কখনও তারও বেশি।

আমি একেবারেই নতুন। ভদ্রা জাহাজের ট্রেনিং শেষ করে মাস দুই লেগেছে সি ডি সি পেতে। তারপরই এক ভাঙা লজঝরে কয়লার জাহাজে বের হয়ে পড়েছি। প্রথম দিকে সে কি অবস্থা গেছে। ফার্নেসে টন টন কয়লা বয়ে নিয়ে যাওয়া, ছাই ফেলা—আট ঘন্টার ওয়াচ কখনও দশ বারো ঘন্টায়ও শেষ হত না। যখন স্টকহোলড থেকে সিঁড়ি ধরে বোট-ডেকে উঠে আসতাম, মনে হত এবার হয়তো বেঁচে গেলাম, পরের ওয়াচে ঠিক পড়ে যাব। জাহাজ দুলছে, সামনে পিছনে কিংবা ডাইনে বাঁয়ে ঠিক হয়ে দাঁড়াতে পারছি না। মাথা ঘুরছে। খেতে গেলে ওক উঠছে, খেতে পারছি না। সারেঙ সাব পই পই করে বলেছেন, দেখ পারবি কি না। কয়লার জাহাজ, বয়লারগুলো রাক্ষসের মতো কয়লা খায়—পেরে উঠবি না। রক্তবমি হবে। মাথা ঘুরে পড়ে যাবি—এমন সব সাংঘাতিক কথাবার্তার পরও ঠিক করে ফেলেছি যাবই। তা-ছাড়া উপায়ও নেই। একটা কাজ না হলে চলছে না, ভাই বোন বাবা মা সব আশায় আছে। বন্দরে জাহাজ আসে, চলেও যায়, মাস্তারে দাঁড়িয়ে থাকি,

আমাকে নেয় না। দাড়ি-গোঁফ ভালো করে ওঠেইনি, পারবে কেন জাহাজের ধকল সামলাতে। আমিও নাছোড়বন্দা, কয়লার জাহাজ, তাই সই। উঠে পড়েছি। তারপর দিন যত যায়, কেমন মনমরা। যত দূরে যাই, তত আমায় বাড়িঘর গাছপালা টানে।

আশা এবারে ঠিক খবর পেয়ে যাব, জাহাজ দেশে ফিরছে।

জাহাজে ফসফেট বোঝাই। নিউপ্লাইমাউথ বন্দরে ঢুকছি। মাল এখানে খালাস হবার পর গম নিয়ে হয়তো দেশের দিকে ফিরতে পারব। এখন থেকে না হোক অস্ট্রেলিয়ার কোনও বন্দর থেকে গম বোঝাই হবে। সবাই এমনই যখন ভাবছি তখনই ডেক সারেঙ খবর দিল, এখনও বাড়িয়ালারা খসাচ্ছে না।

জাহাজের বাড়িয়ালা মানে কাপ্তান। সেই বলতে পারে সব। এনজিন সারেঙের কাছে গেলাম। আমি বঙ্কু দেবনাথ—আমরা বাঙালিবাবু, কারণ সেই ত্রিশ-বত্রিশ বছর আগে জাহাজি বলতে চিটাগাং নোয়াখালির মানুষজনদেরই বোঝাতো। দেশ ভাগ হয়ে যাবার পর তাদের উপর ভরসা করে থাকা চলে না। দলে দলে আমরা ঢুকছি। জাহাজে ডেকজাহাজি আর এনজিন-রুম জাহাজির সংখ্যা প্রায় পঞ্চাশের কাছাকাছি। আমরা মাত্র তিনজন বাঙালিবাবু, বাকি সবাই সন্দীপ নোয়াখালির লোক।

বঙ্কু, দেবনাথের এটা নিয়ে পাঁচ-সাতবার সফর হয়ে গেছে। আমার প্রথম সফর। একঘেয়ে সমুদ্র, শুধু জল আর জল কাঁহাতক ভালো লাগে। নিজের গরজেই এনজিন সারেঙের ফোকসালে ঢুকে গেলাম। বললাম, চাচা, কোনো খবর পেলেন?

তিনি বয়লার স্যুট পরে উপরে উঠে যাবার জন্য ব্যস্ত। সহসা কেমন ক্ষেপে গিয়ে বললেন, কত বলেছি, ভেবে দ্যাখ, ব্যাংক লাইনের সফর করবি কি না! এখন মনমরা হয়ে থাকলে চলবে কেন? বাড়িয়ালা কী বলবে? তিনি কি জানেন! এজেন্টের অফিস থেকে খবর আসবে। খবর না এলে রা খসাবে কী করে! আল্লার বান্দাও জানে না, জাহাজ কবে ফিরবে!

বুঝতে পারছি, আমার কষ্ট তাঁকে পীড়া দিচ্ছে। মনমরা দেখলে তিনি আরও ক্ষেপে যান। হয়তো জাহাজ বন্দরে নোঙর ফেলেছে, বিকেলে সেজেগুজে জাহাজিরা কিনারায় নেমে যাচ্ছে, আমি যাচ্ছি না, ফোকসালে নিজের ব্যাংকে শুয়ে আছি—শুনেই ক্ষেপে যেতেন। ঝড়ের বেগে ঢুকে যেতেন আমার ফোসকালে, এই ওঠ, ওঠ বলছি। বঙ্কু দেবনাথের সঙ্গে কিনারে ঘুরে আয়। ভালো লাগবে।

আমার কখনও মনে হত আর হয়তো দেশেই ফেরা হবে না। আর হয়তো কখনও আমি আমার প্রিয় বাদশাহি সড়ক ধরে বন্ধুদের সঙ্গে ঘুরতে বের হতে পারব না, কিংবা

রেললাইন পার হয়ে লালদীঘির ধারে বসে সেই গাছগাছালির ফাঁকে দূরের স্টেশন দেখতে পাব না। চোখ জলে ভার হয়ে আসত।

কত বন্দরে গেছি, কত নারীর মুখ দেখেছি, ইশারায় কেউ ঘরে নিয়ে যেতে চেয়েছে, অবলীলায় আমাদের কেউ কেউ চলে গেলেও আমি যেতে সাহস পাইনি। নারী রহস্যময়, বড়ো টানে। কিন্তু জাহাজিদের মারাত্মক ব্যাধির কথা আমার জানা হয়ে গেছে। যৌন-সংসর্গ এড়িয়ে যতটা থাকা যায়। এসব কারণে দেবনাথ কখনও ক্ষেপে যেত, বলত তুই বেটা মরবি। জাহাজের কাজ তোকে দিয়ে হবে না। একেবারে ঈশ্বরের পুত্র সেজে বসে আছিস। তুই কি মানুষ না!

এত সব অভিযোগ সত্ত্বেও কোনও কার্নিভেলে গেছি, কোনোদিন পানাহার, এই পর্যন্ত। তার বেশি নয়। একদিন শুধু ব্রাজিলের ভিক্টোরিয়া পোর্টে বেসামাল হয়ে পড়েছিলাম। জাহাজের সিঁড়ি ধরে উপরে উঠতে পারছিলাম না। আমাকে চ্যাংদোলা করে তুলে নিয়ে গেছিল সবাই। সারেং আমার সঙ্গে প্রায় এক মাস কথা বললেন না, তুই শেষে এই! তোর মা-বাবার কথা মনে হয় না! টাকা নষ্ট করতে কষ্ট হয় না!

না পেরে আমিও খেঁকিয়ে উঠেছিলাম, বেশ করেছি। আরও করব। আপনি যা পারবেন করবেন। আসলে আমি যে বাটলারের রসদের খাতাপত্র লিখে উপরি রোজগার করছি। হাতে কাঁচা টাকা থাকলে যা হয়, নতুন বাটলার, কাপ্তান-বয়ের কাজ করত, ডারবানে অসুস্থ হয়ে বাটলার চলে গেলে, কাপ্তান-বয়কেই দায়িত্বটা দেওয়া হয়েছিল। পার্কসার্কাসের ইব্রাহিম বাটলার হয়ে গেল। উর্দুভাষী মানুষ। সামান্য লেখাপড়া আছে। কিন্তু এ-বিদ্যায় রসদের জমাখরচের খাতা রাখা তার পক্ষে কঠিন। জাহাজিদের মধ্যে আমিই লেখাপড়া জানা, কলেজে গেছি—এত যার বিদ্যার বহর তারই শরণাপন্ন হওয়া সুবিধাজনক, সে এসে আমায় ডেকে নিয়ে গেছিল কেবিনে, কাজটাতে সাহায্য করলে সে কাপ্তানের একটা সার্টিফিকেট পেয়ে যাবে। পরের সফরে সে বাটলার হয়ে জাহাজেও উঠে যেতে পারবে। আমাকে খুশি করার জন্য নিউপোর্টে নেমে নতুন কালো রঙের এক জোড়া স্যুট করিয়ে দিয়ে বলেছিল, একেবারে ইংরাজের বাচ্চা। বহুত সুন্দর এবং এমন সব বলার পর, বন্দর এলেই কাঁচা টাকা পেয়ে যেতাম। স্যুট পরে বের হয়ে বাটলার একদিন আমার সঙ্গে ছবিও তুলল। সত্যি চেনা যায় না বাঙালিবাবুকে।

যা বলছিলাম, আসল কথাটাই বলা হল না এখনও। ডেকে সারেংই খবর দিল, জাহাজ দেশে ফিরছে না। নতুন চুক্তি হয়েছে। ওসানিকা, কাকাতিয়া আর নেরু দ্বীপগুলো থেকে খোল ভর্তি ফসফেট নিয়ে অস্ট্রেলিয়ার উপকূলে ফেলতে হবে। মেলবোর্ন, ফ্রিমেন্টাল, সাউথ ওয়েলসের উপকূলে ঘোরাঘুরি করবে জাহাজ।

ক-মাসের চুক্তি তা অবশ্য জানা গেল না।

জাহাজিরা কেউ মনমরা, কেউ খুশি। মনমরা আমার মতো অনেকে। একসময় টাকা উপার্জন মুখ্য হয়ে দাঁড়ায়, আবার একসময় ঘরে ফেরার জন্য পাগল হয়ে যেতে হয়। আমরা এই ঘরে ফেরার দলের জাহাজিরা সারেঙের ঘরে ঢুকে যথেচ্ছ গালাগাল করলাম। তিনি বললেন, নসিব। তাঁর কিছু করার নেই।

আমার নিজেরই খারাপ লাগল বুড়ো মানুষটার কথা ভেবে। সাদা দাড়ি, সাদা চুল, বড়ো অমায়িক এবং ধর্মভীরু। মানুষটিকে আমি একদিনও কিনারায় নামতে দেখিনি। অবসর সময়ে ধর্মগ্রন্থ পাঠ ছাড়া তাঁর আর কিছু করণীয় আছে দেখলে বোঝা যায় না। মনকে প্রবোধ দিই সবারই পরিবার পরিজন আছে। দেশের চিঠি এলে বার বার করে পড়ে। চিঠিটা শিয়রে রেখে দেয়। যারা পড়তে পারে না, তারা পড়িয়ে নেয়।

আমার কাছে এভাবে একই চিঠি নিয়ে কতবার যে তারা আসে।—এই পড়ে শোনাই।

—সকালে তো পড়ে শোনালাম।

—আবার পড়।

—না পারব না। নতুন কী আর আছে।

—পড় না। লক্ষ্মী ছেলে। পড় শুনি।

ওদের মুখ দেখলে আমার কষ্ট হত। আমারও চিঠি আসে। মা চিঠি দেন, বাবা দেন সব উপদেশ, যেন নষ্ট হয়ে না যাই, আভাসে বাবা এসবই চিঠিতে লিখতে চান। কে কেমন আছে, বাড়ির কোজাগরি লক্ষ্মীপূজায় আমি নেই বলে মা নাকি চোখের জল ফেলেছে। একই চিঠি আমিও বার বার পড়তে ভালোবাসি। যেন চিঠি তো নয়, মায়ের হাতের স্পর্শ। সব চিঠিই আমার বালিশের নীচে জমা থাকে। একই চিঠি কতবার যে পড়া হয়ে গেছে—মুখস্থ হয়ে গেছে, তবু পড়ি। বাড়ির চিঠি হাতে নিয়ে বসে থাকি। সমুদ্রের নীল জলরাশি, কিংবা কোনো দ্বীপের একটি নিঃসঙ্গ ফার্ন গাছের চেয়ে চিঠির জাদু যে কত অধিক টের পাই, যখন কেউ জাগিয়ে দিয়ে বলে, এই ওঠ। ওয়াচে যাবি। দেখি বুকের উপর চিঠি পড়ে আছে, যেন হৃৎপিণ্ডটার উষ্ণতা নিচ্ছিল চিঠিটা।

আমাদের দেশে ফেরা সুতরাং অনিশ্চিত। কবে ফিরব জানি না। মানসিকভাবে খুব ভেঙে পড়েছি। জাহাজ বন্দরে বাঁধাছাদা হচ্ছে। ভারি সুন্দর শহর। নীল সবুজ হলুদ রঙের কাঠের বাড়ি পাহাড়ের উপত্যকার পাহাড়ের ঠিক নীচে বিশাল জলাশয়। সমুদ্রে নুড়ি পাথর ফেলে দুটো পাড় গড়ে তোলা হয়েছে। একদিক খোলা। জাহাজ ঢুকবার পথ। ছোট্ট বন্দর। সাত আটটা জাহাজ জেটিতে বাঁধা। জেটি পার হয়ে সমুদ্রের বালিয়াড়ি। অজস্র নারী-পুরুষ প্রায় উলঙ্গ হয়ে সাঁতার কাটছে কিংবা চেয়ারে ছাতার নীচে বসে বই পড়ছে। এসব দৃশ্য

চোখে সয়ে গেছে। কাজ এখন কম। বিকেল চারটে বাজলে ছুটি। কাজের ফাঁকে ফাঁকে ডেকে উঠে রেলিঙে ঝুঁকে দাঁড়ালেই কেমন অন্যমনস্ক হয়ে যাই। কিছু ভালো লাগছে না।

কিছু তো করার নেই, নিয়মকানুনের বান্দা, লম্বা সফর হলে অনেক টাকা, যারা টাকাই জীবনে সব ভেবে নিয়েছে, তারা খুশি। অবশ্য বেচারাদেরও দোষ নেই, তারা তো চায় লম্বা সফরে বেশি টাকা নিয়ে ঘরে ফিরতে। অসুবিধা আমাদের মতো জাহাজিদের, কিংবা সদ্য বিয়ে করে আসা জাহাজিদের। দু-চার বছর হয়ে গেলেও কষ্ট—কিন্তু একটা সময়ে অনেকেই লম্বা সফর পছন্দ করে। আমাদের মতো বাড়িঘরের টানে কাহিল না। ফলে বিক্ষোভ আংশিক।

তবু রক্ষে এই বন্দর এবং শহরে গাছপালা আছে। বিকেল হলেই যেমন সেজেগুজে নেমে যাওয়া তেমনি সাজগোজের পালা চলছে। আফটার-পিকে বাথরুম। স্নানের হুড়োহুড়ি। তেল কালি বার্নিশের কাজ এখন বেশি। মাত্র একটা বয়লার চালু রাখা হয়েছে। একজন করে ফায়ারম্যান ওয়াচে। আর সবার সাফ-সুতরোর কাজ। কাজ সেরেই সবাই যে যার গরম জল নিয়ে ছুটছে বাথরুমে। ঝোড়ো শীতের হাওয়ায় মাস্তুলের দড়িদড়া ঠিক রাখা যাচ্ছে না।

আমরা নেমে গেলাম।

আমি দেবনাথ বঙ্কু।

জেটি পার হয়ে ডানদিকে সি-ম্যান মিশন। ওখানে ঢুকে সস্তায় দু-মগ বিয়ার খাওয়া গেল প্রথমে। আসলে শীতের ঠান্ডা থেকে আত্মরক্ষা করা। আমাদের ওই হয়েছে ঝামেলা —এখন এ-দেশে গ্রীষ্মকাল, অথচ গ্রীষ্মের শীতেই কাবু, শীতকালটা তবে কি ভয়াবহ, অবশ্য বরফের শীতও আমরা পেয়ে এসেছি, হামবুর্গ বন্দরে। যতদূর চোখ যায় শুধু সাদা বরফ, তার উপর দিয়ে হেঁটে যাও, ইচ্ছে করলে সাইকেল, চালিয়েও যাওয়া যায়—লেদার জ্যাকেট ওভারকোট থেকে শুরু করে হাতে সাদা দস্তানা পরে বরফের উপর দিয়ে হেঁটে যাবার মজাই আলাদা।

সমুদ্রে ঘুরে ঘুরে এখন মজা পাই না। বিকেলে হয়তো বেরই হতাম না—কিন্তু বঙ্কু দেবনাথ এমন সব সুন্দর বাড়িঘরের কথা বলল যে, আর চুপচাপ শুয়ে থাকা গেল না। মাউরি মেয়ে-পুরুষরা একেবারে বাঙালিদের মতো দেখতে। দেখলে নাকি ভুল হবার কথা, ভুলে বাংলায় কথাও বলে ফেলতে পারি। গাউন স্কার্ট না পরলে শাড়ি পরলে বাঙালি ললনা। লম্বা চুল, বেণী বাঁধে। এসব শোনার পর ঠিক থাকি কী করে! মাউরি উপজাতিরাই এই দ্বীপের আদি বাসিন্দা। বড়ো গরিব। যা হয়ে থাকে সব দেশেই। পুরুষরাও একসময় লম্বা চুল রাখত, এখন রাখে না, তারা সাধারণত ফলের বাগান পাহারা দেয়, অথবা

খামারবাড়ি আগলায়, চাষ-আবাদ দেখে। দোকানে কেউ কাজ করে। অবশ্য পয়সাওয়ালা লোকও আছে। তবে শহরে বিশেষ তাদের দেখা যায় না।

বন্দরের মুখেই ট্রাম পেয়ে গেলাম। ছোট্ট পাহাড়ি শহর। এক বগগা ট্রামে চড়ে পাহাড়ের চড়াই-উৎরাই ভাঙার সময় দেখলাম, সুন্দরী বালিকা কিংবা যুবতীরা হেঁটে যাচ্ছে। ট্রামেও আছে তারা। আমরা জাহাজি, তারা ঠিক চিনতে পারে। শহরে কোথায় কী আছে দেখবার, এরা ঠিক বলে দেয়। তবে বন্ধু দেবনাথ আগের এক সফরে এখানটায় এসেছিল বলে সব জানে—আমাদের শুধু ঘোরা, দোকানে ঢুকে এর ওর সঙ্গে আলাপ করা, আসলে নারীসঙ্গ, কারণ কাউন্টারে সুন্দর সব মেয়ে দাঁড়িয়ে থাকে খদ্দের ধরার জন্য। আমরা কী কিনব নিজেরাও ঠিক বুঝতে পারি না। এখানকার বিখ্যাত গির্জা দেখতে যাওয়া যায়, কিংবা উপত্যকা পার হয়ে কোনো আপেলের বাগানে ঢুকে গেলে ঝরা পাতার খেলা দেখা যেতে পারে।

ঠিকই বলেছে ওরা, মাউরি মেয়ে দেখলেই চেনা যায়। শ্যামলা রং, মুখের গড়ন ভারি কোমল, চোখ টানা। শহরের একদিকটায় মার্কেট। দু-তিন ফার্লংয়ের মতো পথ আমরা হেঁটে এসেছি ট্রাম থেকে নেমে। বাসে ওঠা যায়, কিন্তু বাসে উঠলে দু-পাশের বাড়িঘরের ঠিক উত্তাপ পাওয়া যায় না। বাড়ির লাগোয়া বাগান, লাল সাদা গোলাপের ঝড় বয়ে যাচ্ছে যেন বাগানে, ক্ষণিকের জন্য আমাদের দাঁড়িয়ে থাকা, বড়ো ঝকঝকে লাল নীল কাঠের পাটাতন করা বাড়ি। দালান কোঠা আছে, তবে কম। বাড়িগুলির পেছনে কমবেশি সবারই পাইনের অরণ্য। অনেকটা জায়গা নিয়ে বাড়িঘর। বোঝাই যায়, লোকজন কম। জমির ফলন ভালো, এ-দেশ থেকে রপ্তানি করার জন্য ফলের চাষ, গমের চাষ আর পাল পাল ভেড়া উপত্যকায় ছড়ানো ছিটানো। এক উদার পৃথিবীর সামনে দাঁড়িয়ে গেলে যা হয়—আমরা একটা বড়ো টিলার উপরে উঠে এসে পেছনে অনেক দূরে এগমন্ট হিল দেখতে পেলাম। সূর্যাস্ত হচ্ছে। পাহাড়ের মাথায় যেন অগ্নিকাণ্ড শুরু হয়ে গেছে। লাল হয়ে গেছে উপরের আকাশ। অনেকক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে সেই দৃশ্য দেখছিলাম—পাখিরা উড়ে যাচ্ছে দূরে অদূরে—আকাশে এক বিন্দু মেঘ নেই—যেন এই শহরে যদি কোনো আলোর ব্যবস্থা না থাকত এগমন্ট হিলের সোনালি রংই যথেষ্ট। এমন দৃশ্য দেখে মুহ্যমান না হয়ে পারা যায় না, চুপচাপ নেমে এসেছিলাম টিলা থেকে—এবং শহরে আলো জ্বলে উঠেছে, কী করে যে চোখ গেল সেই যুবতীর দিকে জানি না, যুবতী না বালিকা, কত যেন চেনা আমার—নেশা ধরে গেল। ফলের কাউন্টারে সে দাঁড়িয়ে। ঢুকতেই মিষ্টি হাসল মেয়েটি। এমন হাসি দেখতে পেলে সারাদিন কেন, সারা জীবন মেয়েটির পাশে বসে থাকা চলে।

বললাম কত দাম?

মেয়েটি ফ্রক সামান্য তুলে বাউ করল। দাম বলল। খোঁপায় ফুল গোঁজা। সোনালি ফ্রক গায়। আমি যেন চিনি তারে—এই কি সেই মেয়ে, সে নীলনদের পাড় ধরে হেঁটে যায় কিংবা মিসিসিপির বনেজঙ্গলে সে কুঁড়েঘর বানিয়ে থাকে—অথবা শীতলক্ষ্যার পাড়ে আম জাম গাছের ছায়ায় বড়ো হয়। মুগ্ধ চোখ তার পৃথিবীর রহস্য বয়ে বেড়ায়।

কী হল কে জানে! এক ঠোঙা আপেল কিনে পয়সা দিলাম।

মেয়েটি আমায় বাউ করল, ঠোঙাটা হাতে দিয়ে মিষ্টি হাসল। যেন বলল আবার এস।

বন্ধু বলল, তুই কি পাগল, এগুলো কিনলি কেন? কে খাবে?

বের হবার সময় পেছন ফিরে তাকালাম—ঠোঁটে সেই রহস্যময় হাসি। আমাকে দেখছে। একেই মরণ বলে কী না জানি না।

পরদিন একা বের হচ্ছি দেখে, সারেঙ সাব বললেন, কোথায় যাবি?

বললাম, চার্চে।

চার্চ।

দেবনাথ পাশ থেকে বলল, মিছে কথা বলতে মুখে আটকায় না। তুই ঠিক সেই মেয়েটার কাছে যাচ্ছিস।

সুবোধ বালকের মতো বললাম, না চাচা! আমি গির্জা দেখতে যাচ্ছি।

এই শহরের প্রেসবেটেরিয়ান চার্চের খ্যাতি আছে। দেয়ালে নিপুণ কারুকাজ, বিশাল এলাকা নিয়ে চার্চ। পাইনের জঙ্গলে সহজে সেখানে হারিয়ে যাওয়া যায়। তবে এ-পাইন সে পাইন নয়। কৌরি-পাইন। বিশাল তার কাণ্ড, ডালপালা আকাশ ছুঁয়ে দিতে চায়।

গির্জা আমি দেখতে যেতেই পারি, কিন্তু একা বের হচ্ছি দেখেই সারেঙ সাব প্রমাদ গুনলেন।

প্রশ্ন করলেন তিনি, বন্ধু দেবনাথ যাবে না?

দেবনাথ বলল, না, আমাদের সঙ্গে বের হবেন না তিনি।

আমি দেরি করতে পারছি না। পরে কী কথা হয়েছে জানি না। ঠিক সাঁজ লাগার মুখে দোকানের সামনে হাজির। মেয়েটি খদ্দের সামলাচ্ছিল। আমাকে দেখতে পায়নি। ভিতরে ঢুকলে, আবার সেই মিষ্টি হাসি। এ-যেন সেই আমাদের রাজকুমারীর গল্প, হাসলে মুক্তা ঝরে, কাঁদলে হিরে।

সে যে ব্যস্ত এটুকু বোঝানোর জন্য কাউন্টারের পাশের একটা চেয়ারে বসতে বলল। ও কি টের পেয়েছে, অকারণ আমি গণ্ডা দুয়েক আপেল কিনে নিয়ে গেছি। ও কি আজ

বলবে, তুমি তো আপেল কিনতে চাওনি, আমাকে খুশি করার জন্য আপেল বাধ্য হয়ে কিনেছ! অমন খদ্দের আমি চাই না। বলতে গেলে কেমন একটা অজানা আতঙ্কে ডুবে গেলাম—আমাদের দেশে দোকানে কোনো নারী কিছু বিক্রি করছে ভাবতেই পারি না। কেনার জন্য না, তাকে দেখার জন্য যাই—বুঝতে পারলে খুব ছোটো হয়ে যাব।

মুখ ব্যাজার আমার। এ-ভাবে একা সত্যি আসা ঠিক হয়নি। অপরিচিত জায়গা, কার মনে কী আছে কে জানে! এখন মানে মানে চলে যেতে পারলে বাঁচি।

আমার দিকে সে তাকাচ্ছে না। খদ্দের সামলাচ্ছে। এ-সময়টায় ভিড় বোধ হয় বেশি হয়। আগে আগে চলে এসেছি। চেয়ারে বসে অস্বস্তি হচ্ছিল।

বললাম, আমারটা দাও।

সে হাসল। বলল, বোস।

আবার বসে থাকা। আমি যে আপেল কিনতেই এতদূর এসেছি, তাকে দেখতে নয়, এটা যেন প্রমাণ না করতে পারলে ইজ্জত থাকবে না। এত সস্তা যদি ভাবে তবে মানুষের অহংকারে ঘা লাগে।

উঠে দাঁড়ালাম। ঘড়ি দেখলাম, যেন আমার তাড়া আছে। ওকে বেশ গম্ভীর মুখে বললাম, আমি কি খদ্দের না! সবাইকে দিচ্ছ, আমাকে বসিয়ে রাখছ?

মেয়েটির মুখে সেই হাসি। একটু হালকা হয়ে কাউন্টারে ঝুঁকে বলল, তুমি জাহাজি, ইণ্ডিয়ান।

অবাক, এত জানে কী করে?

বললাম, হ্যাঁ।

—দেখেই বুঝেছি। না হলে এতদূর কেউ আপেল কিনতে আসে।

আমি কী কাল ওর সঙ্গে কোনো নির্লজ্জ আচরণ করেছি। ইণ্ডিয়ানদের সম্পর্কে কি ওর কোনো ভালো ধারণা নেই। কিন্তু তেমন আচরণ তো করিনি। অথবা আমার মুগ্ধতা থেকে কি টের পেয়েছে, আমি যতদিন এ-বন্দরে আছি, একবার অন্তত তার দোকানে ফল কেনার ছলে তাকে দেখতে আসবই।

দোকানটা যে তার নয় পরে জেনেছিলাম। সে কাজ করে। মালিক রাতের দিকে এসে সব হিসাব মিলিয়ে ক্যাশ গুনে নিয়ে যায়। তার বাঁধা মাইনের কাজ। তার দাদু আছে। শহর থেকে এগমন্ট হিলের দিকে যে বড়ো সড়ক চলে গেছে, দু-পাশে চড়াই উৎরাই ভেঙে, তারই কোনো টিলায় সে থাকে।

সেদিন ওকে আমি পাত্তা দিতে চাইনি। আপেল কিনে বের হয়ে আসছিলাম, সে আমাকে ফের ডাকল। ফিরে গেলে বলল, আপেল কেনার জন্য এতদূরে আসার তোমার দরকার নেই। পোর্টের কাছে ওয়াগাদের অনেক বড়ো ফলের দোকান আছে। ট্রাম গুমটির ঠিক পাশে। সস্তায় আপেল পাবে। তোমার টাকার দরকার। অযথা এতদূর এসে সামান্য ফলের জন্য টাকা নষ্ট করবে কেন? যাওয়া আসার ভাড়াতে তোমার ফল কেনা হয়ে যাবে।

মেয়েটির এই ঔদ্ধত্যে আমি হতবাক। যেন সোজাসুজি বুঝিয়ে দিতে চাইল, আর আসবে না।

মুখ ব্যাজার করে ফের বের হয়ে আসতেই আবার ডাকল, কি খারাপ পেলে? আমি মাউরি নই। ইন্ডিয়ান। আমার নাম লতা বুচার। তোমরা ঠকলে কষ্ট হয়।

নামটা আদ্ভুত।

লতা বাংলা নাম। বুচার! বুচার কি পদবি।

বললাম, তোমরা বুচার। কসাই।

মেয়েটি হেসে বলল, না কসাই নই। বুচার আমার দাদুর বাবা খ্রিস্টান হবার সময় পদবি নিয়েছিলেন। আমার দাদু ওয়াগাদের আপেল বাগান পাহারা দেয়। বুড়ো হয়ে গেছে বলে সাঁজবেলাতেই ঘরে ফিরে যায়। ওয়াগা কোম্পানির বিশ্বাসী লোক। আমার দাদু ঠকেছে সারাজীবন, আমার বাবা মা ঠকেছে। আমার ঠাকুরদার বাবা এদেশে বিয়ে করে থেকে যান। তিনি জাহাজি ছিলেন। তিনিও ঠকেছেন। মনে হয় তিনি না এলে আমি ইন্ডিয়ার লোক হতে পারতাম। আমার ভালো লাগে না, কাজটা ছেড়ে দেব।

এত সব শোনার ধৈর্য আমার ছিল না। তবু দাঁড়িয়ে সব শোনার পর বললাম, ধন্যবাদ। আর আসছি না। আমি জান গির্জা দেখতে বের হয়েছিলাম, এখন দেখছি গির্জায় সহজে কেউ যেতে পারে না, ইচ্ছে থাকলেও না। আমার মোহ ভেঙে দেবার জন্য অনেক ধন্যবাদ।

—গির্জা!

—কাল সারারাত গির্জার স্বপ্ন দেখেছি। তারপর কেন যে মুখ ফসকে বের হয়ে গেল, গির্জার সিঁড়িতে তুমি আমি সারাক্ষণ বসেছিলাম স্বপ্নে। বিকেলে বের হয়ে পড়েছিলাম, আবার যদি সিঁড়িতে বসার সুযোগ পাই।

লতা বুচার আমার কথায় কী ভাবল কে জানে। সামান্য সময়, দূরে কী দেখল। তারপর বলল, তুমি এমনি আসতে পার। এলেই ফল কিনতে হবে কেন? ফল কেনার জন্য যদি আস তবে বোকামি করবে।

মেয়েরা এত সহজে এমন কথা বলতে পারে আগে জানতাম না। তার অকপট কথাবার্তায় আমার টান আরও বেড়ে গেল। সে কী বোঝাতে চাইল জানি না, একবার ভাবলাম জাহাজে ফিরে বন্ধু দেবনাথকে সব বলব—এ কথা বলল কেন! এমনি আসতে পার। ফল কেনার জন্য যদি আস তবে ঠকবে।

কেন যে বলতে গেলাম, তুমি কাউকে ভালোবাস? এও যেন মুখ ফসকেই বের হয়ে গেল। এত কথা মেয়েদের সঙ্গে বলার আমার অভ্যাস নেই। দেশে এই বয়সের কোনো অনাত্মীয়া নারীকে এমন বলতে পারি দূরে থাক, কথা বলতে গেলেই বুক কাঁপত। কে কী ভাববে! আমার কো-এডুকেশন কলেজে ছাত্রীদের আগলাতেন অধ্যাপকরা।

লতার সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠ হবার পর, আমার কলেজ জীবনের কথা শুনে সে হেসে লুটিয়ে পড়ছিল!—বল কী! মেয়েদের জন্য আলাদা কমন রুম! অধ্যাপকদের পেছনে তারা আসে। ক্লাস হয়ে গেলে অধ্যাপকদের পেছন পেছন আবার চলে যায়। ভাবা যায় না।

আমি বললাম, সত্যি।

ত্রিশ-বত্রিশ বছর আগে আমাদের কলেজ জীবনের কথা ভাবলে এখন আমারও হাসি পায়। লতার কথা ভাবলে মন আমার এখনও খারাপ হয়ে ওঠে। কী সুন্দর মেয়েটা, শেষে কী না......

লতা সেদিন বলেছিল, কাউকে ভালোবাসি না। কাউকে না। ওর চোখ মুখ কেমন জ্বলছিল ক্ষোভে অপমানে। লতা আর আমার সঙ্গে একটি কথা ও বলেনি। সে তার কাজ করে যাচ্ছিল। পালকের ঝাড়ন দিয়ে থাক থাক ধুলো বালি ঝাড়ছিল। ঝুড়ি থেকে বের করে আপেলগুলো নেকড়া দিয়ে মুছে সাজিয়ে রাখছিল। আমি বলেছিলাম, উঠি।

সে বলেছিল, কাল আসছ?

—বলতে পারব না।

চলে আসছিলাম। সে ফেল ডাকল—শোনো।

আমি ফিরে গেলে বলল, গির্জার সিঁড়িতে বসে থাকব দুজনে। এখানেই অপেক্ষা করব। দোকান বন্ধ থাকবে কাল। এলে এমনিতেই পেতে না।

কাল আমারও ছুটি। কাল রবিবার। সবার ছুটি। লতা বুচারেরও। আমি কেন জানি সিঁড়িতে বসার লোভ সামলাতে পারলাম না।

পরদিন গেলে দেখলাম সে আমার জন্য সত্যি অপেক্ষা করছে। সে আমাকে নিয়ে হেঁটে গেল। গির্জার সিঁড়িতে বসে থাকল। তার দাদুর গল্প, মা-বাবার গল্প করল। মা-বাবা কেউ

বেঁচে নেই। কাজটা না করলে, সে আর তার বুড়ো দাদু খুব অসহায়, খেতে পাবে না, আশ্রয় থাকবে না এমন সব বললে, টান আরও বেড়ে গেল।

জাহাজ আমাদের বিশ বাইশ দিন বন্দরে এমনিতেই থাকার কথা, কিন্তু ধর্মঘটের জন্য, কবে মাল খালাস শুরু হবে কেউ বলতে পারছে না।

কবে জাহাজ ছাড়ছে জানা নেই।

বিকেল হলেই আমার মন উতলা হয়ে উঠত। দোকানে গিয়ে বসে থাকতাম। সে খদ্দের সামলাত। আমি নিজেও তার হয়ে অনেক কাজ করে দিতাম। টাকা পয়সা গুনে দেওয়া পর্যন্ত। সে তার টিফিন বের করে খেতে দিত। না খেলে রাগ করত। কোনোদিন সে একটা আপেল দিয়ে বলত, খাও। জাহাজ তোমার কবে ছাড়ছে?

বলতাম, জানি না। সে টের পেত জাহাজের খবরে বিষণ্ণ হয়ে পড়েছি। বাড়ি না থাকায় আমার মা কোজাগরি লক্ষ্মীপূজায় চোখের জল ফেলেছে মন থেকে কেমন সব মুছে গেছে। এক অনাত্মীয়া এমন নিজের হয়ে যায়, এই প্রথম টের পেলাম।

এক রবিবারে সে আমাকে তাদের ট্যুরিস্ট স্পটে নিয়ে গেল। বিশাল বনভূমি, হ্রদ, পাহাড় টিলা, ঝোপ-জঙ্গল এবং এমন গভীর জঙ্গলের ভিতর কেন ঢুকে যাচ্ছে বুঝতে পারছি না। আমি কেমন কাতর হয়ে পড়ছি। বলছি, কোথায় নিয়ে যাচ্ছ?

সে শুধু বলল, এস না!

সে কি আমাকে আজ জীবনের আরও কোনো গভীর বনভূমির খবর দিতে চায়! ও পরেছে, নরম উলের জ্যাকেট, পায়ে সাদা জুতো, নাইলনের মোজা, পায়ের রঙের সঙ্গে মিলে গেছে। হাত পা এত পুষ্ট, স্তন এত ভারী যে সে নড়চড়া করলে তারাও লাফিয়ে ওঠে। আমার মধ্যে এক অতর্কিত বাঘের আক্রমণ ঘটছে টের পেলাম। সে আমাকে নিয়ে পাশে বসল। জনহীন। দূরে কোনো পাখির ডাক শোনা যাচ্ছে। বিশাল গাছ সব চারপাশে। টিলার ছাদে উঠে এসে আমি হাপাচ্ছিলাম। ছোট্ট সবুজ উপত্যকা। সে আমার হাত টেনে শরীরের উষ্ণতা দেখল। ফ্লাকস থেকে কফি, ব্যাগ থেকে স্যাণ্ডউইচ, কিছু গ্রিন পিজ সেদ্ধ, চিজ এ-সব বের করে খেতে দিল—কিন্তু আমি টের পাচ্ছিলাম, তার শরীর আমাকে প্রলুব্ধ করছে। অতর্কিতে বাঘের আক্রমণ ঘটলে যা হয়ে থাকে, হঠাৎ সে আমার চোখে কী আবিষ্কার করে সব ফেলে দৌড়োতে থাকল।

আমি ডাকছি, সব ফেলে চলে যাচ্ছ কেন?

সে নেমে যাচ্ছে। বাঘের মতো আমাকে যেন ভয় পাচ্ছে।

আবার চিৎকার করে ডাকলাম, তুমি আমাকে ফেলে চলে যাচ্ছ কেন? ফ্লাকস, ব্যাগ তুলে নিয়ে পিছনে ছুটছি। ওর কি মাথা খারাপ আছে! এ কিরে বাবা, নিয়ে এল আর এখন কিনা আমাকে ফেলে, ফ্লাকস ব্যাগ সব ফেলে ছুটছে।

আমি রাস্তা হারিয়ে ফেলতে পারি। ভয় ধরে গেল। ডাকলাম, ল...তা...আমাকে একা ফেলে কোথায় চলে গেলে। ল......তা.....।

কোনো সাড়া পেলাম না।

আমি যেন আরও গভীর বনভূমিতে ঢুকে যাচ্ছি। ওকে আর দেখা যাচ্ছে না!

আর পারলাম না, চিৎকার করে বললাম রাস্তা হারিয়েছি।

আর তখন দেখি নীচে, অনেক নীচে, হ্রদের পাড়ে দাঁড়িয়ে সে হাত তুলে দিচ্ছে।

ক্ষোভে অভিমানে নীচে নেমে ওর সঙ্গে আর একটা কথাও বললাম না। ব্যাগ ফ্লাকস দিয়ে সোজা এসে বাসে ওঠে পড়লাম। চেয়ে দেখি, সেও কখন আমার পাশে এসে বসে পড়েছে। চোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়ছে।

— কী হল!

লতা কিছু বলল না।

জাহাজে ফিরে সারারাত ঘুমাতে পারলাম না। এমন বিচিত্র মেয়ে কে কবে কোথায় দেখেছে। তার গির্জায় বসে থাকা, আমার সংলগ্ন হয়ে বসে থাকার মধ্যে এক আশ্চর্য নরম উষ্ণতা যে টের পেত, সে কেন আমাকে এত ভয় পেয়ে নীচে নেমে গেল!

আমার আর যাওয়া ঠিক কিনা ভেবে জাহাজ থেকে কদিন নেমে গেলাম না। এক রবিবারে দেখি লতা নিজেই হাজির। যে ফিরিয়ে দেয়, সে ভয় পায়, সে যদি যেচে আবার নিজেই চলে আসে ঠিক থাকি কী করে! আগের মতোই নিয়মিত আবার যাওয়া আসা। বন্ধু দেবনাথের সঙ্গেও লতার বন্ধুত্ব হয়ে গেছে। অনেক দিন আমরা একসঙ্গে ওর দোকানে গেছি। সে বাড়ি থেকে আমাদের জন্য কোনোদিন নিজের হাতে রান্না করা খাবার উপহার দিত। খেতে যে খুব ভালো লাগত তা না, তবু নিতাম এবং তৃপ্তি করে খেতাম। কোনোদিন জাহাজে টিফিন ক্যারিয়ারে নিয়ে আসতে হত খাবার। পরদিন বিকালে ফিরিয়ে দিতাম। রাতও হয়ে যেত।

এমনি একদিন টিফিন ক্যারিয়ার ফিরিয়ে দিতে গিয়ে টের পেলাম—বেশ রাত হয়ে গেছে। আটটায় দোকানপাট সব বন্ধ হয়ে যায়। দেবনাথ বন্ধুর রাতে ওয়াচ আছে। পাহাড়ের নীচে বসে লতাকে নিয়ে গল্প জমে উঠেছিল। একবার ওর বাড়ি যাওয়া দরকার।

কোথায় থাকে এটাই জানা হয়নি। আমার অভিজ্ঞতার কথাও বললাম। ওদের এক কথা, পাগলি!

এমন কথায় আমি যে কষ্ট পাই ওরা বোঝে। ওকে ছোটো করলে যেন আমাকে ছোটো করা হয়—এই ধরনের নানা কথাবার্তায় রাত হয়ে গেলে, ওরা বলেছিল, তুই দিয়ে আয়। আমরা জাহাজে ফিরছি। ঘড়ি দেখে বলল, ইস, দেরি হয়ে গেল।

গিয়ে দোকান বন্ধ দেখব বুঝতে পারিনি। কিন্তু ভিতরে আলো জ্বলছে! আলো জ্বলায় নিশ্চিত হলাম। দরজার বেল টিপলে, কিংবা ঠেলে দিলে তাকে দেখতে পাব। ভেবে সিঁড়ি ভাঙতে গিয়ে মনে হল ধস্তাধস্তি হচ্ছে। ফলের ঝুড়ি ছিটকে পড়ছে। ওর গলা পেলাম। সে স্তিমিত গলায় আর্তনাদ করে উঠছে, ছেড়ে দাও। পারছি না। লাগছে! মা মেরির দোহাই।

আর পারলাম না। লতাকে কি কেউ মারধোর করেছে। ধস্তাধস্তি কেন!

দরজা ঠেলে দিতেই ঘরটা হাঁ হয়ে গেল। উত্তেজনায় মাথায় কিছু ঠিক থাকে না। দরজা লক করতে ভুলে গেছে। দোকান বন্ধ থাকলে দরজা ঠেলে কারও ঢোকার নিয়ম থাকে না। দেখছি লতার উপর একটা বিশাল লোক ফলের কাউন্টারের প্ল্যাটফরমে বাঘের মতো হামলে পড়েছে। লতা দু-হাতে বাধা দিচ্ছে। ওর শরীরের বেশবাস আলগা।

এত উন্মত্ত যে, একটা লোক ভিতরে ঢুকে গেছে তাও টের পায়নি। লতা শুধু আমাকে দেখে ফেলেছে।

আমি সঙ্গে সঙ্গে বের হয়ে এলাম। দৌড়ালাম।

হাত-পা কাঁপছে। কসাই লোকটা! লতার মালিক লোকাটা। লতাই পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল একদিন। আমি সেদিন রাতে জাহাজে ফিরতে পারিনি। গির্জার সিঁড়িতে শুয়ে আকাশ পাতাল ভেবেছি। এক অনাত্মীয়া নারীর জন্য চোখে এত জল আসে আগে জানতাম না। শীতে আমি জমে যাচ্ছিলাম। তবু মানুষের এক পাপ আমাকে তাড়া করছে। সকালে জাহাজে ফিরলে সবাই অবাক। সারেঙ সাব বললে, তুইও নষ্ট হয়ে গেলি!

বললাম, হ্যাঁ চাচা। জাহাজে কাজ করলে কে কবে নষ্ট চরিত্রের হয়নি বলুন! নষ্ট হয়েছি বেশ করেছি। বেশ করেছি।

বিকালে দোকানে গেছিলাম। মালিক লোকটি আজ নিজেই খদ্দের সামলাচ্ছে। মুখে অমায়িক হাসি।—আসুন।

শালা খচ্চর। বললাম, লতা আসেনি?

—না।

পরে প্রতিদিন বিকেলে গেছি।—লতা আসেনি?

—না।

একদিন লোকটা বিরক্ত হয়ে বলল, আর আসবে না। না বলে কয়ে কোথায় সে চলে গেল। পুলিশে ডাইরি করেছি। টাকা তছরুপের।

আজব বাতি

দেবনাথ ডেক ধরে হেঁটে যাচ্ছিল। প্রবল ঝোড়ো হাওয়া সমুদ্রে। টলতে টলতে সে হেঁটে যাচ্ছিল। তার কেন জানি, এ সময় ফের লাইটার জ্বেলে সিগারেট ধরাবার ইচ্ছে হল। ফোকসালে সে ইচ্ছে করলে সিগারেট ধরাতে পারত। কিন্তু সবাই যা করছে। বঙ্কু, প্রেমা, রাজু সবাই যেন টের পেয়ে গেছে ব্যাটা কিছু লুকাচ্ছে। এমনকি তাকে গোপনে অনুসরণ পর্যন্ত করতে পারে! সে টুইন-ডেকে উঠে ঘাড় ফিরিয়ে দেখল, না, কেউ এদিকটায় আসছে না। ডেক-টিণ্ডাল তার সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে বোট-ডেকে জল মারছে। তার কাজ গ্যাঙওয়ের পেছনটাতে। হাতে রঙের টব। চিপিং করার হাতুড়ি পকেটে। সে রং করতে যাচ্ছে। সকালে চা-চাপাটি খেয়ে একটা সিগারেট মৌজ করে খেতে কার না ইচ্ছে হয়। কিন্তু ফোকসালে প্রেমা রাজুর উপদ্রবে সে লাইটার জ্বেলে সিগারেটটা পর্যন্ত ধরাতে পারল না। রোজ এক উপদ্রব।

আরে দেখি দেখি! কবে কিনলি?

সঙ্গে সঙ্গে সে লাইটার ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে দেয়। পকেটে ঢুকিয়ে ফেলে।

দেখি না! কত দিয়ে কিনলি?

দেবনাথ রা কাড়ে না। তাড়াতাড়ি উঠে সিঁড়ি ধরে কোথাও পালিয়ে গিয়ে যেন বাঁচে। ওরা ধাওয়া করে। সেও ডেক ধরে দৌড়ায় এবং একসময় জোরজার করে চেপে ধরলে দেবনাথ হাত তুলে দেয়।—দ্যাখ, দ্যাখ না। নেই।

কোথায় রেখেছিস?

ফোকসালে।

আসলে এভাবেই লাইটারটা নিয়ে ওদের চারজনের মধ্যে বেশ একটা রহস্যময়তা গড়ে উঠেছে। লাইটারটা দেখলেই ঝাঁপিয়ে পড়তে চায়। পোর্ট অফ সালফার থেকে জাহাজ ছাড়ার পরই ওরা পেছনে লেগেছে। সে কিছুতেই লাইটারটা হাতছাড়া করতে চায় না। ওরাও দেখবেই। ছাড়বে না।

এই দে না, সিগারেট ধরিয়ে নি।

না।

শালা তোমার লাইটারে কী আছে? আমরা খেয়ে ফেলব? তুই কী রে! আমাদের কাপ-ডিশ ধরে দেখিস ব্যাটা, কী করি! প্রেমা, লকারে চাবি দিয়ে রাখবি তো। জাহাজে উঠে এসেছে—নিজের কাপ-ডিশ পর্যন্ত আনেনি! ব্যাটা হাড়কেপ্পন!

দেবনাথ চুপচাপ থাকে। তা সে সামান্য কিপ্টে স্বভাবের। তার মতো মানুষের পক্ষে কোনো শৌখিন জিনিস কেনা সম্ভব রাজু প্রেমা ভাবতেই পারে না। পলকে সিগারেট ধরিয়েই নিভিয়ে দেয়। তখনই ওরা দেখে ফেলে, বস্তুটি সত্যি শৌখিন। আকারে একটু বড়ো—কাচের আবরণ, এক পাশে সোনালি জলের দাগ, কিছু সবুজ লতাপাতার চিত্রমালা কাচের গায়ে। এইটুকু দেখেই বুঝেছে, দেবনাথ তবে টাকা খরচ করতে শিখেছে। প্রথম দিকে জাহাজে ওঠে, সে বন্দর এলে নামতই না। নতুন জাহাজিও নয়। এই নিয়ে পাঁচ সফর। সিটি লাইনেই তার পর পর তিন সফর হয়ে গেল। ডারবান, কেপটাউন, স্যান্টিস —কোথাও সে নামেনি। বুনোসাইরিসে এক বিকেলে নেমে সস্তায় কিছু আপেল কিনে এনেছিল— এই যা। তারপর পোর্ট অফ জামাইকাতে মাঝে মাঝে দল বেঁধে নেমে গেছে। কিন্তু কোনো সওদা করেনি।

দেবনাথ পকেট থেকে লাইটার বের করে এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখল, না কেউ অনুসরণ করছে না। মেজ মালোম দু-নম্বর ফল্কায় দাঁড়িয়ে বড়ো মালোমের সঙ্গে কথা বলছেন। জাহাজ যাচ্ছে হাইতি দ্বীপে। সেখান থেকে সোজা বিশ-বাইশ দিনের যাত্রা। রসদ নেবার জন্য জাহাজটা দ্বীপে কয়েক ঘন্টা থামবে। সাত আট মাস হল ওরা সফরে বের হয়েছে—একঘেয়ে সমুদ্রযাত্রা কাঁহাতক ভালো লাগে।

দেবনাথ জাহাজে উঠলেই বাড়িঘরের কথা ভেবে বিষণ্ণ থাকে। কিনারায় কাজ পেলে সে কিছুতেই জাহাজে মরতে আসত না—এমন সে কতবার আক্ষেপ করেছে। সেই দেবনাথ বেশ হাসিখুশি। শিস দিয়ে একদিন হিন্দি গানের কলিও ভাঁজছিল দেখে রাজু এমনকি সারেঙ পর্যন্ত অবাক। আরে দেবনাথ শিস দিচ্ছে।

সত্যি শিস দিচ্ছিল দেবনাথ!

লাইটারটা জ্বালাবার আগে দেবনাথ আশ্চর্য এক উত্তেজনা বোধ করে। সে হাত দিয়ে বার বার দেখে পকেট আছে তো—এই এক ভয় নিরন্তর। কেউ না মেরে দেয়। মেরে দিলে নির্ঘাত সে পাগল হয়ে যাবে। সামান্য একটা লাইটারের প্রেমে পড়ে যেতে পারে কেউ, এই প্রথম দেবনাথ টের পেল। সে সিগারেট বের করে লাইটার জ্বালাতে গিয়ে দেখল বারবার নিভে যাচ্ছে। ঝাপটা হাওয়া নিভিয়ে দিচ্ছে। সমুদ্রের বিশাল ঢেউ এবং অসীম অনন্ত আকাশ ছাড়া তাকে দেখবার কেউ নেই। সে আড়ালে-আবডালে কাজ করতে

ভালোবাসে। আসলে কেউ জানেই না লাইটারটা জ্বালিয়ে সে অপলক দেখে কিছু। লাইটারের কাচের মধ্যে তার দৃষ্টি আবদ্ধ হয়ে যায়। কেমন এক ঘোর তৈরি হয়। সে জাহাজের কাজকর্মের ব্যস্ততার কথা পর্যন্ত ভুলে যায়।

এই যে দেবনাথ! বসে কেন?

না স্যার, মানে...। সে তাড়াতাড়ি লাইটার নিভিয়ে মাস্তুলে রং লাগাতে শুরু করে। ধরা পড়তে পড়তে কতদিন বেঁচে গেছে। সবচেয়ে নিরাপদ জায়গা ফোকসাল, কিন্তু একদণ্ড খালি থাকে না। যখন-তখন যে-সে ঢুকে যায়।

আরে তুমি লাইটার জ্বালিয়ে কী দেখছ!

সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠে। তাড়াতাড়ি লাইটার নিভিয়ে দিয়ে হেসে ফেলে।

না দেখছিলাম?

কী দেখছিলে?

সে কী দেখছিল বললে জাহাজে মারামারি পর্যন্ত শুরু হয়ে যেতে পারে। বলা যায় না, খুনটুনও।

সে বলে, না, কিছু না।

দেবনাথ সবসময় সতর্ক থাকে। ঘুমাবার আগে লাইটারটা কোথাও লুকিয়ে রাখে। নিজস্ব লকার থাকে না। দুজনের জন্য একটা লকার বরাদ্দ। কাজেই চাবি দিয়ে যে নিশ্চিত থাকবে তার উপায় নেই। লকারের ডুপ্লিকেট চাবি রাজুর কাছে। সে পেলেই ওটা মেরে দেবে। এবং যদি টের পায়, কোনো অলৌকিক ছবি লাইটার জ্বাললে দেখা যায় তবে তো কথাই নেই।

লাইটারটা কেনার পর থেকেই তার বিচিত্র শখ জন্মেছে। সে নীল রঙের টাই পরে সাদা প্যান্ট সাদা শার্ট গায়ে দিয়ে বোট-ডেকে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে। কাজের সময় ছাড়া কোনো জাহাজি এদিকটায় বড়ো আসে না। বোট- ডেকের মাথায় কাপ্তানের কেবিন। ব্রিজে উঠে যাবার সিঁড়ি। পাশে চার্টরুম। বোট-ডেকের পাশে কিছুটা আড়াল আছে। দুটো বোটের মধ্যবর্তী জায়গা ফাঁকা। আফটার-পিক কিংবা ব্রিজ থেকে জায়গাটা দেখা যায় না। কেবল ওয়াচ বদলের সময় ফায়ারম্যানরা উঠতে নামতে দেখতে পায়, দেবনাথ চুপচাপ বোট-ডেকে বসে আছে।

আরে এখানে!

এই এমনি। সে আবার কিছু লুকিয়ে ফেলে।

সে তার বিছানার চাদর বালিশের ওয়াড় সব পাল্টে ফেলেছে। ফোকসাল আর কেবিনের তফাত আকাশপাতাল। ফোকসালে চারটে বাঙ্ক। ম্যাট্রেস। কোম্পানি থেকে দুটো নীল প্যান্ট, নীল শার্ট, একটা গরম কালো রঙের সোয়েটার পায় জাহাজিরা। সেও পেয়েছে। বাড়তি জামা প্যান্ট যতটা দরকার—এই যেমন সে কার্ডিফের সেকেন্ডহ্যান্ড মার্কেট থেকে একটা কোট কিনেছিল প্রথম সফরে—শীতের দেশে এখনও সেই কোটই সম্বল। সে আর কিছু কেনাকাটা করেছে বলে কেউ জানে না। কারণ একঘেয়ে সমুদ্রযাত্রায় বের হলেই মন খারাপ হয়ে যায়। মা বাবা ভাই বোন ফেলে সমুদ্রে ঘুরতে তার ভালো লাগে না।

বিচিত্র শখ। এজন্য যে, সাদা চাদর সাদা ওয়াড় যেমন কেবিনে ধোপদুরস্ত, ছিমছাম পাতা থাকে সব কিছু, তেমনি তার, বিছানায় সাদা চাদর বালিশের সাদা ওয়াড়—স্টুয়ার্ডের সঙ্গে বন্দোবস্ত করে নিয়েছে। এমনকি বন্দরে এলে মেসরুম মেট ফুলও রাখে ফ্লাওয়ার ভাসে—স্টুয়ার্ডের সঙ্গে বন্দোবস্ত করে তার বাঙ্ক, বিছানা অফিসারদের মতো করে নিয়েছে। সে দামি গন্ধ সাবান মাখে। গায়ে বিদেশি আতর দেয় আজকাল।

স্বাভাবিক কারণেই একজন সামান্য জাহাজির এই ধরনের শৌখিন জীবনযাপন বিচিত্র শখের পর্যায়ে পড়ে। জাহাজিরা অফিসারদের মতো কে কবে শোখিন হয়!

হাইতিতি দ্বীপ থেকে জাহাজ যাচ্ছে অকল্যান্ডে। এ সময় দরিয়ায় ঝড়-ঝাপটা লেগে থাকে বলে ডেকে বের হওয়া যায় না। বলতে গেলে মাত্র পাঁচ-সাতদিন সমুদ্র শান্ত ছিল। তখন দেখা যেত দেবনাথ একা একা বোট-ডেকের দিকে উঠে যাচ্ছে। ডেক-জাহাজিদের পাঁচটার পর ছুটি। জাহাজের স্টাবোর্ড-সাইডে থাকে ডেক-জাহাজিরা। সুখানিরাও থাকে। তিন সুখানি এক ফোকসালে। পাশের ফোকসালে থাকে ডেক-টিন্ডাল আর ডেক-কর্মীরা। সিঁড়ি ধরে নেমে গেলে দুদিকের ফোকসালে থাকে এনজিন-সারেঙ আর ডেক-সারেঙ। স্টাবোর্ড-সাইডের জাহাজিদের রাতে পালা করে দুজনকে অবশ্য ওয়াচ দিতে হয়। ফরোয়ার্ড-পিকে ডিউটি থাকে। অন্ধকারে অস্বাভাবিক কিছু চোখে পড়লে ঢনঢন করে ঘন্টা বাজাতে হয়।

দেবনাথের আদ্ভুত আগ্রহ রাতে ফরোয়ার্ড-পিকে ওয়াচ দেওয়ার। সাধারণত এই ওয়াচ ডেক-জাহাজিরা পছন্দ করে না। পুরো চার ঘন্টা একটানা দাঁড়িয়ে দূরের সমুদ্রে লক্ষ রাখা খুবই কঠিন কাজ। এ-কাজে উৎসাহ কেন এত দেবনাথের কেউ বুঝতে পারছে না। যেন সে যদি রোজ এই ওয়াচের কাজটা পায় বর্তে যায়। এটাও রাজু, প্রেমাকে হতবাক করে দিয়েছে। কোথায় সারাদিন খাটুনির পর পড়ে ঘুমাবে, না তিনি চললেন ফরোয়ার্ড-পিকে ওয়াচ দিতে।

তারা আরও আশ্চর্য হল, অকল্যান্ড বন্দরে তাকে থ্রি-পিস-স্যুট করাতে দেখে। আরে শালা যে জাহাজের সব টাকা খতম করে যাবে বলে ঠিক করেছে! অবশ্য ইচ্ছে করলেই এটা হয় না। জাহাজিরা সমুদ্রের মাইনের এক-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত তুলতে পারে। তবে বেশি পারে না। কিন্তু দেবনাথের টাকায় কুলোচ্ছে না বলে সে ফালতু কিছু কাজ স্টুয়ার্ডের করে দেয়। সে হিসাবপত্র রাখতে ওস্তাদ। কিছু টিপসও নিয়েছে স্টুয়ার্ডের কাছ থেকে। যেমন পানামা থেকে কম্বল কিনে নিতে পারলে বেশি দামে বিক্রি করা যায়। ঘড়ি কিনে নিলেও বেশি দাম পাওয়া যায়। সে রেডিও পর্যন্ত কিনে নিয়েছিল বিক্রি করবে বলে। তবে দাম পায়নি বলে বিক্রি করেনি। সে এখন অবসর পেলেই রেডিওতে বিদেশি সংগীত শুনতে শুনতে কেমন মজে যায়।

একটা সামান্য লাইটার তাকে এমনকি প্রেমে ফেলে দিল বুঝতে পারছে না তারা!

শালা ফুটানি করতে গিয়ে ধনে জনে যাবে এবার। এবং সত্যি সে একদিন রাজুকে বলল, এই, দু-ডলার ধার দিবি।

রাজু বলল, আর কি কেনার থাকল বাবা! তুমি তো ফোকসালে থাক না মনে হয়। কেবিনে থাক, ফুল কিনে আনছ কেন গুচ্ছের! ফুলের ভাস! দরিয়ায় সব শালা উলটে পড়ে ভাঙবে।

দেবনাথ রা কারে না।

এরপর তারা ভাবল, দেখা যাক ব্যাপারটা কী!

জাহাজ আবার সমুদ্রে। যাবে তাসমানিয়ায়। দেবনাথ আবার ওয়াচ দেবার জন্য রাত বারোটায় ফরোয়ার্ড-পিকের দিকে হেঁটে যাচ্ছে।

আগে থেকেই ঠিক করা ছিল সব। তারা তিনজনেই জেগে ছিল। কেন এত আগ্রহ। এমন একটা একঘেয়ে কাজের। পালা করে দেবার নিয়ম। ডেক-সারেঙকে ভজিয়ে সে এখন একাই রাতের ওয়াচ দেয়।

ওরা ডেকে উঠে দেখল, দেবনাথ কানের কাছে রেডিও নিয়ে শুনছে। থামছে। আবার হাঁটছে। সে গেলে ওয়াচের পরীদার চলে আসবে। সে একটু বেশি আগে যাচ্ছে। রাত এগারোটা না বাজতেই দেখলাম ওয়াচ দিতে যাচ্ছে আচ্ছা লোক মাইরি! পারলে যেন দুটো ওয়াচ তাকে একা দিলে সে আরও বেশি খুশি হতে পারে। লাইটারটা আর তারা দেখেইনি। ওটাও কি বিক্রি করে দিল! কী জানি কীসে যে মজে যায় কখন মানুষ বোঝা কঠিন। লাইটারটা আর তারা দেখতে পায় না। সে সিগারেট খাওয়াও কি ছেড়ে দিল শেষ পর্যন্ত।

সমুদ্রে জ্যোৎস্নার আলাদা একটা রূপ আছে। অন্ধকারেরও। আকাশে বেশ বড়ো গোল চাঁদ। ঢেউ নেই বলে স্থির দেখাচ্ছে। ঢেউ থাকলে জাহাজ টলত। চাঁদও মাতলামি শুরু করে দিত আকাশে। তবে মজা, জাহাজ যেদিকে যায়, চাঁদও সেদিকে ভেসে চলে। যেন দুই সঙ্গী নির্জন সমুদ্রে এবং এই নীরবতা কখনও মানুষকে অনেক দূর ভাসিয়ে নিতে পারে। বিশেষ করে মধ্যরাতে সমুদ্র আরও নিথর। এনজিনের শব্দ ছাড়া আর কোনো শব্দ কানে আসে না। মাঝে মাঝে ওয়াটার ককের ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ শোনা যায়। নতুন রং হলে রং বার্নিশের গন্ধ। মাস্তুলে আলো জ্বালা থাকে। ডেকে, টুইন ডেকে এবং আফটার-পিকে আলো জ্বালা থাকে। অস্পষ্ট আলো অন্ধকার সারা জাহাজ ডেকে ভেসে বেড়ায়। শুধু ব্রিজে জেগে থাকে সুখানি, সেকেন্ড মেট, এনজিন রুমে ফায়ার ম্যান, টিণ্ডাল। খুব দূরবর্তী মনে হয় তখন ডাঙার জীবন। যেন অনন্তকাল জাহাজটা সমুদ্রে ভেসে বেড়াবে বলেই বের হয়ে পড়েছে। সামনে পেছনে, আকাশ-নক্ষত্র এবং প্রপেলারের জল ভাঙা শব্দ ছাড়া আর কিছুর অস্তিত্ব থাকে না।

এমন জ্যোৎস্নারাতেই রাজু, বঙ্কু, প্রেমা খুব সতর্ক পায়ে হেঁটে যাচ্ছে। এনজিন থেকে ওয়াচের লোকজন উঠে এলে ঘাবড়ে যেতে পারে। গ্যালি থেকে চা করে নিয়ে যাবার জন্য উঠে আসতেই পারে। অথবা তেষ্টা পেলে জল। দেখলে বলবে, কে? কে?

কারণ জাহাজে এই মধ্যরাতে ডেকে বেড়াবার কারও কথা নয়। তাছাড়া সব জাহাজেই নানারকম ভৌতিক কাণ্ডকারখানা ঘটে থাকে এমন বিশ্বাস থাকে জাহাজিদের। কারণ জাহাজের দীর্ঘ সমুদ্র সফর কখন কাকে যে অবসাদগ্রস্ত করে তুলবে বলা কঠিন। অবসাদ থেকে আত্মহত্যা—আরও নানা কারণে এসব ভৌতিক ঘটনা প্রাচীন নাবিকেরা এত বেশি বিশ্বাস করে থাকে যে, তারা যেন নিজের চোখে দেখেছে এবং এভাবেই পল্লবিত হয়ে যায় সব খবর। জাহাজে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে রটে যায়, বরফ-ঘরে মাঝে মাঝে প্রায় বড়ো আস্ত ছাল-ছাড়ানো গোরু ভেড়ার ভিড়ে কোনো নারীর লাশ ঝুলে থাকতে দেখা যায়। স্টুয়ার্ড রসদ আনবার জন্য বরফ-ঘরে কখনও একা ঢোকে না। সিঁড়ি ধরে নেমে যেতে হয়। আলো নিভে গেলে রাস্তা খুঁজে উপরে ওঠাই দুঃসাধ্য।

সুতরাং এই দুই ছায়ামূর্তি প্রায় আড়ালে উঠে যাচ্ছে ফরোয়ার্ড-পিকে। টুইন-ডেকে উঠেই মাস্তুলের পাশে আড়াল করে দাঁড়াল তারা। এলিওয়ে ঘরে যেতে পারে না। অভিসাররা ওদিকটায় থাকে। এলিওয়েতে কার্পেট পাতা। বেশ উজ্জ্বল আলো জ্বলছে। ওদিক ধরে গেলে ওদের দেখে ফেলতে পারে কেউ। পরদিন সকালে সারেঙ-এর কাছে নালিশ উঠতে পারে—ওরা এত রাত্রে ডেকে কী করছিল? জাহাজে চোরাইমাল কে কীভাবে নিয়ে যায় বলা যায় না। এসব ভয়ও আছে তাদের। ফরোয়ার্ড-ডেকে এসে ওরা আরও সতর্ক হয়ে গেল। কারণ ব্রিজে সেকেন্ড মেট ওয়াচ দিচ্ছে। দেখে ফেলতে পারে।

স্টাবোর্ড-সাইড ধরে গেলে দেখতে পাবে সে। যে কোনও কারণেই হোক ওদিকটায় অন্ধকার না থাকলেও নিজেদের আড়াল করার মতো যথেষ্ট সুযোগ আছে।

রাজু ফিসফিস করে বলল, আরে দেবনাথ কোথায়!

সত্যি তো, দেবনাথ ফরোয়ার্ড-পিকে নেই। নোঙর ফেলবার আই-হোলের পাশে তার দাঁড়িয়ে ওয়াচ দেবার কথা।

কিন্তু চার নম্বর ফল্কা পার হতেই ওরা টের পেল, দুটো উইন্ডসহোলের মাঝখানে দেবনাথ। ওরা আরও আশ্চর্য—দেখল সামনের উইন্ডসহোলের মুখটা সে উলটো মুখে ঘুরিয়ে নিয়েছে। বাতাসের ঠিক বিপরীত দিকে। আর উইন্ডসহোলের মুখের ভিতর ঝুঁকে কী দেখছে।

কেমন আলো জ্বলছে, আলো নিভছে উইন্ডসহোলের মুখে। আলো জ্বললে আবছা মতো মুখটা ভেসে উঠছে, আলো নিভে গেলে মুখ অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে।

বেটা কী দেখছে ঝুঁকে!

ওরা হামাগুড়ি দিতে থাকল। কারণ এখন উঠে দাঁড়ালেই ব্রিজ থেকে সেকেন্ড মেট তাদের দেখে ফেলবে। নোঙর-ফেলার উইনচ ম্যাসিনের কাছে হামাগুড়ি দিয়ে উঠে যেতেই টের পেল, আসলে দেবনাথ ঘোরে পড়ে গেছে। ঘোরে পড়ে না গেলে এমন বাহ্যজ্ঞানশূন্য কেউ হয় না তারা এত কাছে, একবার রাজুর খুকখুক করে কাশি—এইরে ধরা পড়ে গেল। তোরা! বলতেই পারে। কিন্তু হুঁশ নেই। ওরা পেছন থেকে ঝুঁকে দাঁড়াল সন্তর্পণে আর দেখল, দেবনাথ তার অলৌকিক লাইটার জ্বালিয়ে বার বার মজা পাচ্ছে। তারা লাইটারটা দেখতে পাচ্ছে না। কারণ গোটা উইন্ডসহোলের মুখ ওর মাথা আড়াল করে রেখেছে। ডান হাতটা বাতাস থেকে লাইটারের আগুন বাঁচাবার জন্য উইন্ডসহোলের ভেতরে ঢোকানো।

ওরা পেছনে দাঁড়িয়ে আছে, দেবনাথ টের পাচ্ছে না। এমনকি নিশ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দও খেয়াল করছে না। না করারই কথা। জাহাজ জল ভেঙে এগিয়ে যাচ্ছে, তার কলকল ছলছল শব্দ আরও গভীর হতে পারে।

ওরা তিনজনই এই রহস্যকে ছুঁতে চায়।

কী আছে লাইটারে!

বার বার জ্বলছে, আবার নিভিয়ে দিচ্ছে।

যেন এক বালক খেলাচ্ছলে কাজটা করছে।

ওরা দেখছে, লাইটার জ্বললে ওর মুখ অধীর হয়ে উঠছে। মুখের সবটা দেখা যাচ্ছে না। আংশিক। ওতেও বুঝতে পারে, কিংবা মাস্তুলের আলোয় ওর মুখের অধীরতা কিংবা শরীরে আশ্চর্য ধ্বনি খেলা করে বেড়াচ্ছে টের পাওয়া যায়। ওদের ছায়ামূর্তি তাকে ঘিরে রেখেছে। উইন্ডসহোলের থেকে মুখ এবং হাত বের করে আনলেই জাপটে ধরবে। যা পাগল, ক্ষিপ্ত হয়ে গিয়ে যদি উইন্ডসহোলের ভেতর ফেলে দেয়, তবে আজকের মতো আর লাইটারের রহস্য ধরা যাবে না। ফল্কার কাঠ না খোলা পর্যন্ত দেখা কঠিন। গুঁড়ো সালফার বোঝাই। উইন্ডসহোলে গলিয়ে দিলে হাজার হাজার টন ফসফেটের ভিতর থেকে লাইটারটা খুঁজে বার করাও শক্ত। কারণ তারা ধরে নিয়েছে, দেবনাথ অপ্রকৃতিস্থ। না হলে এমন আচরণ জাহাজে ভাবা যায় না। বাড়ির জন্য যে এত বিষণ্ণ হয়ে থাকত, সে-ই লাইটারটা কেনার পর আশ্চর্যরকম ভাবে পালটে গেল। শৌখিন, কেতাদুরস্ত নাবিক।

আর এ সময়ই দেখল, দেবনাথ মুখ বের করে এনে লাইটারটা ঝাঁকাচ্ছে। আসলে বোধ হয় আর জ্বলছিল না। তেল উঠে আসার পথে কোনো বিঘ্ন সৃষ্টি হয়েছ। সঙ্গে সঙ্গে শিকারি ঈগলের মতো রাজু লাইটারটা ছিনিয়ে নিয়ে গেল। আর প্রেমা ওকে ঝাপটে ধরে রেখেছে। কারণ তারা জানে, সেও দৌড়োবে রাজুর পেছনে।

জায়গাটার একটা বিশেষ সুবিধা আছে। পাঁচ-সাতটা উইন্ডসহোলের মুখ উপরে উঠে সাপের ফণার মতো মুখ বাঁকিয়ে রেখেছে।

প্রেমা চিৎকার করতে পারছে না। দেবনাথ নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার জন্য ধস্তাধস্তি শুরু করে দিয়েছে।

হইহল্লা হলে ব্রিজ থেকে সেকেন্ড মেট ছুটে আসবে। এমনকি জাহাজের সাইরেনও বেজে উঠতে পারে। ধড়ফড় করে সবাই জেগে যাবে। মধ্যরাতে সাইরেন কেন।

ফলে দেবনাথ হল্লা জুড়ে দিতে পারছে না।

কিন্তু এ কি, রাজু লাইটারটা জ্বেলে কী দেখছে। যেন তারও হুঁশ নেই।

প্রেমা দেবনাথকে ছেড়ে ছুটে গেল—এই, কী দেখছিস?

রাজু ছুটতে থাকল। সে কিছুতেই হাতছাড়া করবে না।

আরে এ তো ভারি বিপজ্জনক খেলা! মধ্যরাতে স্তব্ধ আকাশের নীচে কজন নাবিকের মধ্যে মহামারি কাণ্ড। কে বিশ্বাস করবে! রাজুর হাত থেকে লাইটারটা কেড়ে নিল প্রেমা।

সেও হতবাক। কেমন ঘোরে পড়ে যাচ্ছে।

জ্বাললে এক নগ্ন সুন্দরী নাচে। নিবিয়ে দিলে নগ্ন সুন্দরী অদৃশ্য হয়ে যায়। আগুন বাতাসে কাঁপলে নাচের বাহার একরকম, বাতাস না থাকলে সেই নগ্ন নারী সোজা মাথার

উপর হাত তুলে দাঁড়িয়ে থাকে। তার শরীরের সব ভাঁজ এত স্পষ্ট যে-কোনো মানুষ মুহূর্তে কামুক হয়ে উঠতে পারে। আসলে কাচের ভিতর কোনও মজা আছে অথবা আগুনের প্রতিবিম্ব কোনও মায়াবি নারীর শরীর নিয়ে ভেতরে ঘোরাফেরা করে। এখন এই আজব বাতিটা কে যে কব্জা করবে। এবং যখন ডেক জুড়ে এভাবে মারামারি হাতাহাতি চলছিল, তখনই ছিটকে কোথায় পড়ে গেল লাইটারটা। কাচ ভেঙে গেল।

দেবনাথ এই দৃশ্য সহ্য করতে না পেরে হাউ হাউ করে কেঁদে দিল। সে চিৎকার করে উঠল, কেন, কেন তোরা আমার এত বড়ো সর্বনাশ করলি! আমি তোদের কী ক্ষতি করেছি? বল বল! বলে ছুটে গিয়ে সে একটা রড তুলে এনে রাজুকে খুন করতে গেলে প্রেমা ধরে ফেলল।

দেবনাথ সত্যি কেমন হয়ে গেল! সে কারও সঙ্গে আর কথা বলত না। চুপচাপ একা মধ্যরাতে ডেকে ঘুরে বেড়াত। পকেটে ভাঙা লাইটার নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। কথা বলে নিজের সঙ্গে। তারপর এক রাতে সে আর ডেক থেকে ফিরে এল না। অজানা সমুদ্রে সে হারিয়ে গেল।

চিনেমাটির পুতুল

শেষরাতে তিনি আজও কান খাড়া করে রাখলেন। কে গায়! কোনো দূরবর্তী মাঠে উদাস গলার স্বর—কাছাকাছি তো কোনো মাঠ নেই, শস্যক্ষেত্র নেই! কে গায়! আগে মনে করতেন স্বপ্ন, ভেঙে গেলে মনে হত স্বপ্ন নয়, সত্যি। নদীর ওপারে দাঁড়িয়ে কেউ তাঁকে ডাকছে। কে সে? ইদানীং ভয়ে ভয়ে আগেই ঘুম ভেঙে যায়। আজও ঘুম ভাঙলে টর্চ জ্বেলে ঘড়ি দেখলেন, ঠিক চারটে। শেষ রাত। জানালা খোলা থাকে। রাস্তার আলো জ্বালা থেকে বলে, রাত কত গভীর বোঝা যায় না। শুধু নিঝুম একটা ভাব থাকে, তার তারতম্য থেকে আন্দাজ করতে পারেন রাত নিশুতি, না আরও গভীরে কিংবা শেষের দিকে। জানালা খুলে তিনি দেখতে পান সেই বিশাল আকাশ, আর কিছু নক্ষত্র। যা তার জন্মেও এক ছিল, শেষ রাতেও এক আছে।

কে গায়!

গায়, না তিনি নিজের মধ্যেই কোনো উদাস গানের সুর সঞ্চার করেন। শুনতে পান যেন সে আর কেউ নয়, তিনি নিজেই।

জানালা খুললে কিছু গাছপালা নজরে আসে। সামনে পাকা রাস্তা। ছিমছাম সব কিছু। সামনে বড়ো স্কুলবাড়ি। স্কুলবাড়ির মাঠটায় কেউ দাঁড়িয়ে গাইছে না তো! না সেখানে কেউ নেই। গানের কোনো শব্দ স্পষ্ট নয়। অদ্ভুত এক ব্যঞ্জনা সেই সুরের। যেন বলে যায় কেউ, এক অন্ধকার থেকে আর এক অন্ধকারে যাত্রা!

আসলে বয়স হলে মানুষের বুঝি এমনই হয়। তিনি ভয় পাচ্ছেন। এক অন্ধকার থেকে আর এক অন্ধকারে যাত্রা কেন?

শেষ রাতের দিকে এইসব বাড়ির জানালায় বেশ একটা ঠান্ডা হাওয়া বয়ে যায়। পাখা চালাতে হয় না। তিনি নিজে অন্তত ঘুম ভাঙলে পাখা বন্ধ করে দেন। পাখার আওয়াজে তাঁর মনে হয় তিনি বিভ্রমে ভুগছেন। পাখাটা বন্ধ করে দিলে চরাচরের গোপন সত্য ধরতে পারবেন তিনি—কিন্তু কে গায়, কোথায় গায়, গানের অস্পষ্ট শব্দমালায় হতচকিত হয়ে নিদারুণ বিভ্রান্তির মধ্যে যান। তখন নিজেই মনে করে নেন, আসলে কেউ তাঁকে

সতর্ক করে দিচ্ছে—নিজের একাকিত্বে এতে বিচলিত কেন! সারাজীবন খড়কুটো সংগ্রহ করেছ, এখন তোমার ছুটি। তোমার অপেক্ষায় কেউ আর বসে নেই।

বুকটা তাঁর এত খালি কখনও হয়ে যায়নি। স্ত্রীর মৃত্যুর সময়েও না। তিনি পুত্র-কন্যাদের মুখের দিকে তাকিয়ে বল ভরসা খুঁজেছিলেন, শক্ত ছিলেন। কদিন থেকে তাও কে যেন হরণ করে নিয়েছে।

বালিশের পাশ থেকে চশমাটা তুলে নিলেন। চোখে ভালো দেখতে পান না। চশমাটা কত বল ভরসা না পরলে বোঝা যায় না। তিনি যে অক্ষম নন, চশমাটা পরলে টের পান। আগে এদিকটায় ফাঁকা মাঠ ছিল। বাড়িটা করার সময় সবাই তাঁকে কিছুটা মাথাখারাপ লোক ভেবেছিল। যামিনীকে জমিটা দেখিয়ে তিনি বোকা বনে গেছিলেন। বাসস্ট্যান্ডে উঠে হাউহাউ করে কান্না—এ-কেমন জায়গায় জমি কিনলে। অঘ্রাণ মাসে হাঁটু জল।

বেশ নীচু জায়গায় জমি। কিছুদূর দিয়ে ট্যাংরার দিকে একটা খোয়ার রাস্তা চলে গেছে। তিনি বলেছিলেন, এত কম টাকায় কলকাতার কাছাকাছি আর কোথায় জমি পাবে যামিনী!

যামিনী কোনো কথা বলেনি আর।

জমিটা কেনার পর মনে হয়েছিল, জীবনে এমন শখ না জন্মালেও পারত তাঁর। যা আয়, নিজের সংসার, মা-বাবা সবাই মিলে বড়ো টানাটানি যায়। তবু কি যেন থাকে মনে। দারিদ্র্য বড়ো ক্ষোভের বস্তু। আজীবন ছুটিয়ে মারে। আজীবন ভাবনা, বাসাবাড়ি, চাকুরি, মৃত্যু এবং অক্ষমতার যে-কোনো একটা তাঁকে অপদস্ত করলে তিনি ফুটপাথের মানুষ। নিজের জীবন দিয়ে যে দুর্ভাগ্য ভোগের অধিকারী তিনি ছিলেন, পুত্র-কন্যাদের জীবনেও তা ঘটবে ভাবলে তাঁর হাঁটু কাঁপত। কেমন নিরুপায় মানুষের মতো তখন পুত্রকন্যা এবং স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে থাকতেন।

সেই নিরাপত্তা বোধের অভাবই তাঁর বোধহয় সহায় ছিল শেষ পর্যন্ত। একটা জমি, বাড়িঘর, এবং ছাদের নীচে আশ্রয় পাবার জন্য কী না অমানুষিক পরিশ্রম গেছে তাঁর। কী না ব্যাকুলতা!

এ-সময়ে মুখে মৃদু হাসি খেলে গেল তাঁর! ফাঁকা বাড়িতে একা মানুষের এই হাসি বড়ো নির্জীব।

কেন হাসলেন?

মনে পড়ল শ্রীমানের জন্মদিনের কথা। ঝড় জল ভেঙে হাসপাতাল। মফস্বল শহরে বাস তাঁর তখন। এমনি আশ্বিনে তাঁর বড়ো পুত্রের জন্ম। এমনি শেষ রাতে তিনি আজকের মতো উদবেগে পায়চারি করছিলেন। কান্না—কোথাও তিনি নবজাতকের কান্না শুনতে

পান। দুহাত দুমড়ে মুচড়ে বলছে, আমি এসেছি। আমি খাব। আমার জায়গা চাই। আসলে যে যার জায়গার খোঁজ পেয়ে গেলে সংসারে তখন কেউ আর কারো না।

জায়গা তিনি সবার জন্য করতে পেরেছেন। শুধু এ-বয়সে দেখছেন, নিজের জায়গাটা ফাঁকা হয়ে গেছে।

জানালার পাশে এক গ্লাস জল থাকে। জলের গ্লাসটা তুলতে গিয়ে হাত কাঁপছিল। জীবনটা পোকা-মাকড়ের মতো মনে হচ্ছিল।

দোতলার জানালায় দাঁড়ালেই দেখা যায়, কত সব ঘরবাড়ি। এইসব ঘরবাড়ির মধ্যে লুকিয়ে থাকে হাজার রকমের সুখ-দুঃখ। বাইরে থেকে বোঝাই যায় না, এক অতি নিরন্তর নিঃসঙ্গতা অন্তরালে কাজ করে যায়। সব একদিন কেমন অর্থহীন মনে হয়।

আকাশে কিছু মেঘের ওড়াউড়ি চলছে। এই জানালাটা তাঁর ভারি প্রিয়। যামিনী বেঁচে থাকতে সব লক্ষ রাখত। ইজিচেয়ার পাতা থাকত। এখানে বসে, সকালের সূর্য ওঠা থেকে পাখি ওড়া সব দেখতেন। খাল পার হয়ে যে বড়ো উপনগরী তৈরি হচ্ছে, সেখানে তখন ঘরবাড়ি ছিল না। শুধু নিরন্তর মাঠ আর কাশবন। অনেক দূরে দেখা যেত একটা সাদা মতো বাড়ি। কেমন রহস্যময় লাগত বাড়িটাকে। ঝাউগাছের গ্রিন ভার্স তৈরি হচ্ছে তখন। আর খালের এপারে সব জলাজমি ধানের খেত। দেখতে দেখতে সব কোথায় কবছরে হারিয়ে গেল।

এগুলো তিনি কেন ভাবছেন। কিছুই তো ভাবার কথা নয়। সব ঘরগুলো ফাঁকা। মেয়েদের বিয়ে হয়ে গেল। বড়ো ছেলে চলে গেল বাইরে। ছোটো ছেলে ছিল, বউমা ছিল। আর ছিল বাপ্পা। কতদিন থেকে সেই ছোটো শিশুটি তার একাকিত্বের সঙ্গী ছিল। তারাও ফ্ল্যাট কিনে চলে গেল। এই চলে যাওয়াটা যে কী করুণ কেউ বুঝল না।

আমি দাদু যাব না।

না, যাও। তোমার স্কুল কাছে হবে।

আমি তো এখান থেকেই যেতাম।

যেতে। এখন যেতে কষ্ট হবে।

কে বলে!

কে যে বলে বুঝি না!

বাপ্পা বায়না ধরেছিল। ছোটো বলল, আপনি বুঝিয়ে বলুন। ও তো বোঝে না, এতদূর থেকে কত অসুবিধা।

সেই।

কে যেন মনের কোণ থেকে উঁকি দিয়ে বলল, কী বুঝছ!

কিছু না।

বুঝতে চাও না। সব করলে কার জন্য!

সেই।

ছোটোর সেই এক কথা, আপনার বউমার কষ্ট হয় এতদূর থেকে রোজ ট্রেনে যেতে।

তিনি শুধু বলেছিলেন, আমার জন্য ভেব না। আমার চলে যাবে।

ওরা চলে যাবার পর কদিন খুব উতলা হয়েছিলেন। কিছু আর করার নেই। কারো জন্য আর ভাবতে হবে না। ঠিকঠাক সবাই বাড়ি ফিরে এল কি না, বারান্দায় দাঁড়িয়ে আর অপেক্ষা করার দরকার নেই। মুক্তি। মুক্তি। এ সময়ে তাঁর চোখে জল দেখা দিল।

সেই পাখির বাসার মতো, নিরন্তর ঝড়-বাদলায় খড়কুটো সংগ্রহ করা—বাসা তৈরি করা। ডিম ফুটলে ছানাপোনার আহার সংগ্রহ করা। তারপর তাদের উড়ে যাওয়া। পাখির কোনো নিঃসঙ্গ বেদনা থাকে না। মানুষের কেন যে থাকে।

তখনই মনে হল কে ডাকে, দাদু, আমি!

কে!

আমি! চিনতে পারছ না, তোমার ছোটো আমি।

ছোটো আমি বলে কী বলতে চায়!

কেউ যেন দৌড়ে বড়ো উঠোন পার হয়ে যাচ্ছে। ঠাকুরদা লাঠি নিয়ে বের হচ্ছেন। তাঁর সেই ছোটো আমি সঙ্গে। সকালবেলায় ঠাকুরদা গোপাট ধরে হাঁটেন। তারা কভাই। কখনও ঠাকুরদা গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে থাকেন। তারা ছুটে বেড়ায়। চোখে দেখতে পান না—অথচ অভ্যাস এতকালের, কোথায় কী গাছ, কোন বৃক্ষলতা বড়ো হয়ে উঠেছে টের পান। কী জমজমাট! উত্তরের ঘরে ঠাকুরদা, ঠাকুমা, দক্ষিণের ঘরে বৈঠকখানা, পূবের ঘরে বড়ো জেঠি, পশ্চিমের ঘরে সোনা জেঠি, কামরাঙা গাছের নীচের ঘরে ছোটো কাকি থাকেন—বড়োরা মিলে সারাদিন ঠাকুরদার চারপাশে উত্তেজনা ছড়িয়ে রাখে। দাদুর শেষ জীবনটা ছিল ভারি বর্ণাঢ্য। মৃত্যুর সময় ঘোড়ায় চড়ে এসেছিল অবিনাশ কবিরাজ, উত্তর-দক্ষিণে যত আত্মীয়স্বজন সবার বাড়ি বাড়ি লোক গেল, খবর দিল কর্তার সময়কাল উপস্থিত। শেষ দেখা দেখে আসুন। ঠাকুরদা নিজেও বুঝেছিলেন, সাদা বিছানায় সাদা চাদরে শুয়ে। সবাই আসছে—দাদু বলছেন, কে?

আমি হেমন্ত।

কে তুমি?

আমি নন্দ।

তরমুজের জমি, চাষ আবাদ সব ঠিকঠাক আছে তো!

আছে কর্তা।

বিলের জমি হাতছাড়া শুনলাম।

মামলায় সাক্ষী পেলাম না কর্তা।

দাদুর মুখে সরল হাসি। যে বোঝে সে বোঝে।

এক অন্ধকার থেকে অন্য কোনো অন্ধকারে হারিয়ে যাওয়ার আগে ডানা ঝাপটানো। ঘোড়ার পায়ের শব্দ কোথাও। কবিরাজ এসে দেখেছিল, বাড়িতে অতিথি অভ্যাগতে ভর্তি। বড়ো জেঠিমা, সোনা জেঠিমা হেঁশেলে। সিংবাড়ির অন্নদা কুয়ো থেকে কেবল জল তুলছে। দাদুর ইহলোক ত্যাগের আগেকার ছবিটা কেমন ঝুলে থাকল কিছুক্ষণ চোখের উপর। হরিনাম সংকীর্তন, নাপিতবাড়ির হরকুমার খোলে চাঁটি মারছে। করতাল বাজাচ্ছিল গৌর সরকার। দাদু সাদা চাদর গায়ে সব শুন ছিলেন, আর মাঝে মাঝে বলছিলেন, সবার খাওয়া হল! যেন কত সোজা একটা রাস্তায় রওনা হয়েছেন। বরবেশে কোথাও যাত্রা! সবার খাওয়া হলেই পালকিতে চড়ে বসা। দুই পুরুষ আগেকার এমন মৃত্যুর ছবি এই শেষ রাতে জানালায় দাঁড়িয়ে তিনি মনে করতে পারছিলেন। সঙ্গে অভ্যাসবশে কাজ করে যাওয়া। সব ঘড়িগুলোতেই আগে দম দিতেন। এখন একটাতে এসে ঠেকেছে। হাতে নিয়ে দুবার চাবি ঘোরালেন, তারপরই মনে হল, হাতটা তাঁর অসাড় লাগছে। ঘড়ি মিলিয়ে এ-বাড়িতে আজ আর কারো স্নান আহার করার দরকার নেই। নীল রঙের বাসে তুলে দেবার জন্য কারো হাত ধরে আজ হাঁটতে হবে না। অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলেন। চাবি দিতে ভুলে গেলেন। ঘড়িটা হাফ দম খেয়ে বিছানায় পড়ে থাকল।

সারারাত জল পড়ার শব্দ আজ তিনি শুনতে পেয়েছেন। যেন বাপ্পা রোজকার মতো দাদুকে রাগিয়ে দেবার জন্য চৌবাচ্চার কল খুলে রেখেছে। তিনি ছুটে গেছেন। না কেউ কল খুলে রাখেনি। কেউ অন্যমনস্কভাবে, কলটা বন্ধ করতে ভুলে যায়নি। তাঁর নজর এত তীক্ষ্ণ হয়ে গেছিল শেষ দিকটাতে কিংবা শ্রবণশক্তি, যে কোথাও বিন্দুমাত্র দাগ ধরলে দেয়ালে, ঘুনপোকা বাসা করলে ঠিক টের পেতেন। বউমা বউমা, দেখ এসে দেখ, কার আঙুলের ছাপ।

কার আবার হবে! আপনার নাতির।

এবাড়িতে সবাই জেনে গেছিল, বাপ্পার সাতখুন মাপ। সবাই নিজের দোষ বাপ্পার উপর চাপিয়ে রেহাই পাবার চেষ্টা করত।

লক্ষ্মণের কাজ।

লক্ষ্মণ বাড়ির কাজের লোক। সকালে আসে। রান্নাবান্না করে দিয়ে চলে যায়। বউমা লক্ষ্মণের উপর চোটপাট হবে ভয়ে কত সহজে মিছে কথা বলত, না না, লক্ষ্মণ জানে দেয়ালে হাত দিলে ছাপ ধরে যায়। সে করবে কেন। আসলে বউমা ভয় পায় চোটপাটের ঠেলায় লক্ষ্মণ না আবার পালায়। এরা মিছে কথা আজকাল কত সহজে বলতে পারে। আসলে বাড়িটার চেয়ে লক্ষ্মণ তাদের কাছে বেশি মূল্যবান।

মিথ্যা অজুহাত দেখিয়ে ছোটো সহজে এজন্য চলেও যেতে পারল। এই ছোটো একবার দেরি করে ফেরায় কী হাউহাউ কান্না। তখন ছোটো কলেজে পড়ে। বড়ো নির্ভরশীল ছিল তারা পরস্পরের। ধরে ধরে বড়ো হওয়া অথবা বলা যায় কালাতিপাত করা। দায় কারো না। নিজেরই। এই দায় বহন করতে পারার মধ্যে একটা গৌরববোধ কাজ করত। আমি এবং আমার, আমি এবং আমার পুত্র, আমি এবং আমার পুত্রকন্যা, কেউ বি-এ বি-টি, কেউ ডাক্তার, কেউ ইঞ্জিনিয়ার—আমি এবং আমার অস্তিত্ব এম-এ বি-টি পাশ। তার সঙ্গে বাড়িঘর। উপর নীচ মিলিয়ে ছটা শোবার ঘর। টাইল বসানো, ফ্লোরেসেন্ট বাতি, দেয়ালে প্লাস্টিক কালার। সোফাসেট, বাতিদান—কারুকার্য করা জীবনপ্রবাহ। জানালায় ভেলভেটের পর্দা দক্ষিণের বাতাসে দোলে। সিঁড়ি সাড়ে তিন ফুট। চার ফুট করার ইচ্ছে ছিল। কাজকর্মের বাড়িতে সরু সিঁড়ি অসুবিধার সৃষ্টি করে। তিনতলায় ঘর করার দরকার নেই। উপরে সামিয়ানা টাঙিয়ে এক লপ্তে দুশো জন খাওয়ানো যাবে। সবটাই আমার, আমার অস্তিত্বের শিকার। ওরা এখন বাপ্পাকে দিয়ে এম-এ বি-টি হতে চায়। এম-এ বি-টি পাস, সোজা কথা না। প্রধানশিক্ষক নীলরতন বসু। কাঁধে পাটভাঙা চাদর, করিডরে হাঁটার সময় দৃপ্ত ভঙ্গি। জেলা বোর্ডের প্রেসিডেন্ট। কত কিছু অস্তিত্বের শিকার—এখন শুধু সামনে ফাঁকা মাঠ। একটা ঘড়িতে তাঁর চাবি দেবার কথা। তাও দিতে গিয়ে হাত অসাড়।

মনে হল ঘড়িটা থেমে গেছে। তিনি শেষ রাতের আলোতে বুঝতে পারছেন না। তবে ঘড়ির বুকে শব্দ হয়—শব্দটা থেমে গেছে। আলো জ্বেলে বুঝলেন, ঘড়িটার স্বভাব ইদানীং বেয়াড়া রকমের। চাবি দিয়ে কিছুক্ষণ কানের কাছে না ঝাঁকালে বাবুর কাঁটা নড়ে না। হাফ দম দিয়ে ফেলে রাখলে ঘড়ি শুনবে কেন! ঘড়িটা আরও বেয়াড়া হয়ে উঠছে।

তিনি বললেন, বেটা তুইও শোধ তুলছিস।

ঘড়িটার কাঁটা দুবার নড়ল। আলো জ্বালা বলে মাকড়সার ঠ্যাংয়ের মতো মনে হচ্ছে। কতকাল দম দিয়ে ঠিক রেখেছেন। অয়েলিং করেছেন কতবার। আবার তেল-গ্রিজ খেতে

চায়। ঘড়িটা নিজেও কবার খুলে কারিগরি করেছেন। ঘড়িটা নিয়ে আবার কেন জানি তাঁর বসতে ইচ্ছে হল। কারণটা তিনি ঠিকই জানেন, কিছু নিয়ে পড়ে থাকা অভ্যাস মানুষের। এককালে, প্রকৃতি, তার উদাস মাঠ, বিদ্যালয়, এককালে বাবা-মার গ্রাসাচ্ছাদন, ভাই-বোনেদের বড়ো করা—সোজা কথায় কর্তালি করার মধ্যে জীবন অতিবাহিত করা এবং পরে যামিনী, পুত্রকন্যা সব নিয়ে আবার ঠেলে উজানে নৌকা নিয়ে যাওয়া—সারাজীবন একজন মাঝি আর নৌকার সম্পর্ক যেমন থাকে আর কী!

ঘড়িটা নিয়ে বসার আগে তাঁর কেমন চা খাবার বাসনা হল। বাসনাগুলো আছে বলেই রক্ষা। যদি না থাকত, তিনি আছেন, অথচ তাঁর আর কোন বাসনা এই, তবে তো মৃত ঘোড়া। এখনও কতটা টগবগে ভাবার জন্য বেশ দ্রুত সিঁড়ি ভেঙে নীচে নামলেন। অন্ধকারে পায়ের মধ্যে কী একটা ঠেকল। সিঁড়িটার এদিকটায় তিনি হাঁটেন না বড়ো। ছোটো এ-ঘরটায় থাকত—পড়ত। ডাক্তারি পড়াটা এত বিদঘুটে তিনি যদি জানতেন। আস্ত মানুষের কঙ্কাল একটা না হয় থাকলই ঘরে! তাই বলে মানুষের আলগা সব যন্ত্রপাতি এনে ঘরটাকে ভরে ফেলা কেন! মানুষের ভিশেরা এবং লিভার দেখতে এমন কদাকার! আর উৎকট ফরমেলিনের গন্ধে ঘরে ঢোকাই দায়। বছর দুই এ-সব ঘরটায় জাঁকিয়ে ছিল। ফাইনাল ইয়ারে ওঠার আগে সব বিদেয় করে দেওয়া হল। কিন্তু মনের খুঁতখুঁতানি যায় না। দক্ষিণা কালীর পূজা এবং চণ্ডীপাঠ। দ্বাদশ ব্রাহ্মণ ভোজন। সন্ধ্যায় মনে হয়েছিল তাঁর বাড়িটায় আবার তিনি শুচিতা ফিরিয়ে আনতে পেরেছেন। এবং রাতে চাদরের নীচে কী একটা শক্ত কিছু লাগতেই উঠে বসেছিলেন। কী লাগে! হাত দিয়ে মনে হয়েছিল একটা শক্ত কিছু। চাদর তুলে মনে হয়েছিল স্পঞ্জের মতো কী যেন—নরমও নয়, খুব শক্তও নয়। ছোটোকে ডেকে বলেছিলেন, এটা এখানে কী দেখতো!

ছোটো দেখে বলল, নাকের হাড়!

সব যে তোর কাছ থেকে কে কিনে নিয়ে গেল! এটা এখানে এল কী করে!

সেই তো।

তিনি জানেন ছোটোর স্বভাবটা বড়ো এলোমেলো । কঙ্কালটা সে নিয়ে এসেছিল একটা বড়ো বেতের ঝুড়িতে। দু-দফায় আনতে হয়েছে। এক জায়গায় বসে এক নাগাড়ে পড়তে পারে না বলে, এখানে ওখানে সব ঘরে, কেবল ঠাকুরঘর আর রান্নাঘর বাদে। কীভাবে যে কঙ্কালটার অজস্র হাড় এখানে সেখানে পড়ে থাকত! মানুষের মধ্যে কত হাড় থাকে তার হিসাব ছোটো রাখে। কলেজের নতুন ছেলেটি যখন ঝুড়িটা সহ হাড়গোড়গুলি কিনতে এল, বার বার তিনি বলেছিলেন, মিলিয়ে নিও। ছোটোর কিছু ঠিক থাকে না। কোথাও কিছু পড়ে থাকল কী না......।

ছোটো, ছেলেটিকে বলেছিল, সবই আছে। এদিক ওদিক দু-একটা পড়ে থাকলে তোমায় খবর দেব।

সেই থেকে তিনি প্রায়ই প্রশ্ন করতেন, আর নেই তো!

ছোটো বলেছিল, নেই।

তারপর বছর না ঘুরতেই বিছানার নীচে কী করে যে একটা নাকের হাড় ভেসে ওঠে!

সেই থেকে কখনও অন্ধকারে কিছু শক্ত মতো পায়ে ঠেকলে ভাবেন, ছোটোর সেই কঙ্কালের হাড়। সে কবেকার কথা—অথচ সেই আতঙ্কটা তাঁর এখনও আছে। নীচের ঘরের জানালা বন্ধ থাকে বলে কিছু বোঝা যাচ্ছে না। এখনও এ-বাড়িতে কঙ্কালটা তবে আছে! আসলে প্রেতাত্মা এবং কঙ্কাল, সংসারে নানাবিধ সংস্কার মানুষের—সবই কিন্তু তকিমমাকার। আলোটা জ্বালাতেও ভয় পাচ্ছেন। কাউকে যে ডাকবেন তারও উপায় নেই। এমন একটা বুড়োমানুষ খালি বাড়িতে প্রেতাত্মার ভয়ে ছোটাছুটি করছেন ভাবতে গেলেও লজ্জা। বরং উপরে উঠে যাওয়া যাক। বাড়িটা ফাঁকা বলে তেনার উপদ্রব বাড়তেই পারে। কোনোরকমে তবু আলোটা জ্বালালেন। বড়ো ঘাম হচ্ছে। দেখলেন পায়ের কাছে পড়ে আছে বাপ্পার একটা চিনেমাটির কড়ে আঙুলের মতো পুতুল।

পুতুলটি হাতে নিতেই মনে হল তিনি আর একা নন। তাঁর দোসর বাপ্পার পুতুল। সুতরাং পুতুলটি তিনি রান্নাঘরে নিয়ে গিয়ে একপাশে দাঁড় করিয়ে রাখলেন—চা করলেন গ্যাসে। তারপর এক হাতে পুতুল অন্য হাতে চায়ের কাপ। তিনি পুতুলটিকে সামনে বসিয়ে ঘড়ি মেরামত করতে বসলেন। কথাবার্তা পুতুলটার সঙ্গেই হচ্ছে।—বাপ্পা তোমাকে আদৌ ভালোবাসে বলে মনে হয় না।

পুতুলটা বলল, হ্যাঁ ভালোবাসে।

ভালোবাসলে ফেলে যাবে কেন।

ওর কত কাজ। স্কুলের পড়া আছে না। বাপ্পাকে মা তো আমার উপর রেগে সব সময় টং হয়ে থাকত।

তিনি ঘড়িটা একটা ছোটো ছুরি দিয়ে খুলে ফেললেন এ-সময়। কাপ তুলে চা খেলেন। তারপর যেন কিছু বলা—বলতে হয় বলে বলা—তুমি বাপ্পার সঙ্গে সব সময় খেললে রাগ তো করবেই।

বাপ্পার মাও তো খেলে। ওই তো বাপুকে নিয়ে গেল—কেবল সারাদিন পেছনে লেগে থাকবে। পড় পড় বলবে। এটা খেলা না!

কখনও না। সকালবেলা আর সন্ধ্যায় পড়বে। আমি বলে দিয়েছি, বিকেলে ওকে খেলতে দিও। দেবেই না। একগাদা টাসক দিয়ে বসিয়ে রাখবে। এখানে এসব পারতো না বলেই তো চলে গেল।

মিছে কথা । স্প্রিংটাসহ ঘড়িটা তিনি কানের কাছে ধরে তখন বললেন।

সত্যি কথা। তোমার উপদ্রবে বাপ্পার মা চলে গেল। তুমি না কিছু বোঝ না!

আমার উপদ্রবে!

তা ছাড়া কী। তুমি এত আসকারা দিলে ও মানুষ হবে কী করে?

পুতুলটির এত কথা শোনার পর তিনি কেমন আরও গুম মেরে গেলেন। সকালে বাপ্পা এসে দুষ্টুমি করত। তা করবে। না করলে বাড়িটা বাড়ি বলে মনে হবে কী করে! চশমটা নিয়ে দৌড়াত। দু-হাতে ভর করে চশমা চোখে দিয়ে বিছানায় উবু হয়ে শুত। কখনো তাঁর বাঁধানো দাঁত লুকিয়ে মজা করত। সকালবেলাতে প্রায় দাদু নাতি এই নিয়ে উপর নীচ ছোটাছুটি চলত। বউমার মেজাজ তখন ভারি অপ্রসন্ন হয়ে থাকত। বউমা যত অপ্রসন্ন হত তিনি তত মজা পেতেন। বাপ্পাও। আমার বাড়ি, আমার নাতি, তুমি কোথাকার কে হে—ওর ভালোমন্দ তুমি আমার চেয়ে বেশি বোঝ!

নাও এবার। শুধু নিজে গেল না, ঘটিবাটি শুদ্ধ নিয়ে চলে গেল। একা থাকার কী মজা বোঝ এবার!

তিনি কেমন মিইয়ে গেলেন। তারপরেই কী মনে হতে বললেন, এই একটা কাজ করবে?

কী কাজ?

আমার নাতি তুমি। সকালবেলাটায় ঠিক আগের মতো উপর নীচ ছুটোছুটি করবে। কে বন্ধ করে দেখি!

সেই ভালো।

তারপর নিজেই বোকার মতো হেসে ফেললেন। কী যে পাগলামি করছেন বাপ্পার পুতুলটার সঙ্গে। তারপরেই মনে হল, পুতুল, না সেই কঙ্কালটার বুড়ো আঙুলের হাড়। আলোর কাছে নিয়ে উলটে পালটে দেখতে থাকলেন। কখনও মনে হচ্ছে বুড়ো আঙুলের হাড়, অথবা কখনও চিনেমাটির পুতুল। বেঁচে থাকার পক্ষে কোনটা এখন বেশি দরকার। একটা মরা মানুষের বুড়ো আঙুলের হাড় না, বাপ্পার চিনেমাটির পুতুল! কোনটা? কোনটা! টিনেমাটির পুতুল। এটা সত্যি চিনেমাটির পুতুল! বুড়ো আঙুলের হাড় না। না—না না। এই তো কথা বলছে, আচ্ছা তুমি নীচে সিঁড়ি ধরে নেমে যেতে চাও। বাপ্পার মতো আমাকে

উপর নীচ হয়রানি করতে চাও। সেই ভালো। তুমি আর যাই হয়ে যাও একটা কঙ্কালের হাড় হয়ে যেও না। হ্যাঁ হ্যাঁ যা বলবে শুনবো—এই তো যাচ্ছি। আরও জোরে। ছুটছি তো।

লাফিয়ে লাফিয়ে নামো। আমি কেমন সিঁড়ি ধরে লাফিয়ে নামছি দেখো। কতকাল, কতবার সিঁড়ি ধরে নামব উঠব, তুমি পারবে না কেন।

হ্যাঁ, আমি পারব। বাপ্পার সঙ্গে পেরেছি, তোমার সঙ্গেও পারব। তিনি হাতে পুতুলটা নিয়ে নীচে উপরে দ্রুত নামতে উঠতে থাকলেন। যেন কথা না শুনলে চিনেমাটির পুতুলটা বায়না ধরেছে, কঙ্কালের বুড়ো আঙুলের হাড় হয়ে যাবে।

লক্ষ্মণ এসে দেখল সদর বন্ধ। অন্যদিকে খোলা থাকে। সকালে বুড়োকর্তার জলখাবার, দুপুরের খাবার করে দিয়ে যেতে হয়। সন্ধ্যায় এসে আর এক প্রস্থ কাজ। রাত্রে ডাক্তারবাবুর ফ্ল্যাট পাহারা।

সদর খোলা নেই কেন! বুড়োমানুষটা বারান্দাতেও নেই। সে বেল টিপল। লোডশেডিং হতে পারে। সে কড়া নাড়ল। একবার, দু-বার। পরে জোরে, খুব জোরে। দরজাটা আজ কেউ খুলে দিল না।

দরজা ভাঙলে দেখা গেল সিঁড়ি ধরে নেমে আসার পথে তিনি দুহাত বিছিয়ে পড়ে আছেন। স্ট্রোক, অথবা দুর্ঘটনা সবাই দেখল হাতের মধ্যে কিছু একটা আছে। কী ওটা! হাত দিতেই ছোটো টের পেল, মানুষের বুড়ো আঙুলের হাড়। মানুষের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠটিকে সোজা রাখে হাড়টা। সে, হাড়টা গোপনে বাবার হাত থেকে তুলে নিল। কঙ্কালের হাড়টা সব বাড়িতেই শেষ পর্যন্ত কেন যে থেকে যায়!

কামড়

না নেই।

কোথাও নেই।

মহীতোষ এ সময় নিজের ঘরে বসে থাকে। তার নিজস্ব কাজকর্মে ডুবে থাকে। চা দিতে এসে সুর দেখল ঘর খালি। বাথরুমে যদি যান। সকালে ঘুম থেকে উঠে চা না খেয়ে তিনি প্রায় নড়েন না। বাথরুমে যাবেন কেন! কিংবা ছোটোবাবুর ঘরে। ছোটোবাবুর ঘরটা খালি থাকলে তিনি সকালে কখনও কখনও সে ঘরে যান। দোতলার একপাশে ঘরটা। পাশে বারান্দা। কদিনের জন্য ছোটোবাবু এসেছিলেন, সকালে উঠেই ছোটোবাবুর ঘরে গিয়ে ডাকতেন, ওঠ। কত বেলা হল। আসলে যেন ছোটোবাবুর জন্যই মহীতোষ উপরে উঠে যান। কথা বলার মতো ওই একজনই আছেন—দেরি করে উঠলে তিনি কেমন ফাঁপরে পড়ে যেতেন।

ছোটোবাবু কালই গেছে। যাবার সময় বাবাকে বার বার বলে গেছে, তুমি আর এসব নিয়ে ভেব না। ওদের ভালোমন্দ ওরা বুঝবে। নির্বিকার থাক। তোমার তো অনেক কাজ। নিজের কাজে ডুবে যাও।

সিঁড়ি ধরে নামছেন। সুর জানে কে নামছেন। বছর খানেক হয়ে গেল, সে এ বাড়িতে আছে। কার পায়ের শব্দ কী রকম সে জানে। বৌমা নামছেন—তার নামার শব্দ একরকমের, বড়ো দাদাবাবুর পায়ের শব্দ একরকমের। ওপরে মাসিমা থাকেন। সকালে স্কুল, পাঁচটায় বের হয়ে যান।

এখন এবাড়িতে বৌমা সিঁড়ি ধরে নামছেন। বাসি সায়া-শাড়ি-চাদর, ভিজালে এক বালতি। ঠিকা কাজের মেয়েটা চুপি চুপি বাবুর কাজ থেকে মাইনে গোপনে দ্বিগুণ করে নিয়েছে। মাসিমা জানলে অশান্তি করবে ভেবেই চুপি চুপি তাঁকে গোপন অনেক কাজ করতে হয়—যেন যুদ্ধক্ষেত্র। অথচ সুর ভেবে পায় না, এত বেলা করে কেউ ঘুম থেকে উঠতে পারে! তার খারাপ লাগে। শত হলেও বাড়ির বউ!

বৌমা বাবু নেই!

নেই তো আমি কী করব?

না, কোথায় গেল! তিনি সকালে চায়ের জন্য নিজের ঘরে বসে থাকেন।

দেখ ওপরে আছে কী না?

না ওপরে নেই।

সুর কিছুটা ফাঁপরে পড়ে গেল। মানুষটা কোথায় গেল? সে সিঁড়ি ধরে উপরে উঠে গেল। তিনি তো সকালের চা না খেয়ে ঘর থেকে কোথাও যান না। ছোটোবাবুর ঘর দেখল, ফাঁকা। বারান্দার ইজিচেয়ারে যদি বসে থাকেন— না নেই। মাসিমা স্কুলে, কোথাও যাবার কথা থাকলে রাতেই সুরকে বলে দেন, উনি সকাল সকাল বের হবেন। তাও বলে যাননি। এত সকালে তো কোথাও যাবার কথা না। বুধ-শনি বাজারে যান। আজ তো বুধও নয় শনিও নয়।

সুর একতলা-দোতলা সব জায়গায় খুঁজল। চা ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে। নীচে নেমে চায়ের কাপ, প্লেট দিয়ে ঢেকে দিল। বছর খানেক থেকেই বুঝেছে, এ বাড়িতে একটা চাপা অশান্তি আছে। মহীতোষ যেন পুত্রবধূর সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারছেন না। মাসিমাও কথা কম বলেন। সারা সংসারে দাপাদাপি শুধু বৌমার। এই সে বাড়ি, তার ঘর, তার আসবাবপত্র সব কিছুই যেন বড়ো বেশি খোলামেলা। বৌমার আত্মীয়স্বজনরা এলে সমারোহ বেড়ে যায়। সুর দেখেছে, বাবুর আত্মীয় স্বজন এলে বৌমা পছন্দ করেন না। কিন্তু বৌমাটি বুদ্ধিমতী, বুদ্ধিমতী না ধূর্ত সে ঠিক বোঝে না। যতক্ষণ বাবুর আত্মীয়স্বজন থাকে খায়, তাদের নিয়ে সাধ আহ্লাদের শেষ নেই। চলে গেলেই মেজাজ গরম।

বাবুর আত্মীয় স্বজনরা যে খুবই গরিব তারা এলে সে তা টের পায়। বাবুকে দেখেছে, একে ওকে লুকিয়ে টাকা দিতে। যেন কেউ না জানে। মাসিমাও পছন্দ যে খুব করেন বাবুর আত্মীয়স্বজনকে মনে হয় না। মাসিমার এক কথা ঠকত টাকা দিলে?ঠ বাবুর সোজা এক কথা, দিইনি।

সব চেয়ে বোধহয় বাবু কষ্ট পান ছোটো ভাই মনতোষের জন্য। বাবুর সঙ্গে চেহারার কোনও মিল নেই। এলে কেমন চোরের মতো চলাফেরা। যেন বাড়িটায় ঢোকা তার মতো মানুষের পক্ষে শোভা পায় না। বাবু বাড়ি এলে, হাঁফ ছেড়ে বাঁচেন। সারাক্ষণ বড়দার পাশে বসে থাকবেন। মুখ কাঁচুমাচু করে কথা বলেন—কী বলেন, কান পেতে শোনার কারও আগ্রহ না থাকলেও বৌমাটির আগ্রহ খুব। সে দেখেছে, দরজার আড়ালে দাদা ভাই কী বলাবলি করছে দাঁড়িয়ে শোনার আগ্রহ খুব। তারপরই মুখ কালো করে দুপদাপ সিঁড়ি ভাঙা। এবং নিজের পাঁচ বছরের পুত্রটিকে অকারণ পেটানো—কী হচ্ছে! একদম পড়ায় মন নেই। কে খাওয়াবে? তিনি তো দানছত্র খুলে বসে আছেন।

মাসিমারও একই অভিযোগ—দানছত্র।

বাবু শুধু শোনেন। ক্ষোভে মুখ লাল হয়ে যায়। সংসারে অপচয় দেখলে মাথা ঠিক রাখতে পারেন না। তখন নিজের উপরই কেমন এক তাঁর প্রতিশোধ স্পৃহা জেগে ওঠে।

কী খাবে না?

না। শরীর ভালো নেই।

কাল একটা চিঠি নিয়ে বসেছিলেন। বোধহয় বাবুর অফিসের ঠিকানায় চিঠিটা এসেছে। বাবুর মা লিখতে পারেন, ছোটোভাই লিখতে পারে—যেই লিখুক বাবু চিঠিটা বার বার পড়ছিলেন।

কী লেখা আছে কে জানে!

সুর সামান্য লেখাপড়া জানে, ইচ্ছে করলে সে গোপনে চিঠিটা পড়তে পারত। কিন্তু বাবু কেন যে বাড়ির চিঠি এলে সতর্ক হয়ে যান সে বোঝে না। হয়তো জানাজানি হয়ে গেলে মাসিমার অশান্তি বাড়বে, পুত্রবধূরও নির্যাতন শুরু হয়ে যাবে পুত্রের উপর। বাবুর বড়ো পুত্রটি তো গোবেচারা—সেও কেমন অকলে পড়ে যায়— মাঝে মাঝে যখন লাভা উৎক্ষেপণ শুরু হয়, সুর বোঝে, কী নিয়ে অশান্তি। বড়ো দাদাবাবুর এক কথা বাবার টাকা যা খুশি করবেন। তাঁর তো দায় শেষ। তিনি যদি টাকা দেন আমরা বলার কে? তারপর স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বলবেন, তুমি কি কিছুর অভাব বোধ করছ? এত টাকা কী করো!

সুর-এর এটাই প্রশ্ন। বড়ো দাদাবাবুর সরকারি চাকরি। মাস গেলে গুচ্ছের টাকা, মাসিমার মাস গেলে মাইনে, বাবু দু-হাতে রোজগার করেন এখনও। ছোটো দাদাবাবুও কম যায় না। অথচ সংসারে বাবুকে দেখলে তার কষ্ট হয়।

সুর কাল দেখেছিল, চিঠিটা পড়তে পড়তে কেমন অনামনস্ক হয়ে গেছেন। ফোন বাজছে, সেটা যে উঠে গিয়ে ধরা দরকার, তাও যেন খেয়াল নেই। বড়ো দাদাবাবু নীচে নেমে ফোন ধরলেন। বাবা, তোমার ফোন।

কে ফোন করছে?

কী জানি! নাম পার্থ বলছে। কাগজ থেকে।

বাবু উঠে গিয়ে ফোন ধরে বললেন, পার্থ? শোনো ভাই— আজ থাক। না, আজ না। বলেই দরজা বন্ধ করে বসে থাকলেন।

যেন তিনি ভিতরে ভিতরে খুবই ভেঙে পড়ছেন। বৌমা পাশের ডাইনিং স্পেসে মোটামুটি যুদ্ধ করছে পুত্রটিকে নিয়ে। কিছুই খাবে না। বৌমাও না খাইয়ে ছাড়বে না।

পাঁচ বছরের শিশু পুত্রের জেদ দেখে সুর মাঝে মাঝে ভাবে—গোল্লায় কেন যায় এই শিশুর জীবন প্রকৃষ্ট উদাহরণ। বুঝতে শিখে গেছে তার জেদের কাছে সবাই কাৎ। সকাল থেকেই একচোট শুরু হয় খাওয়া নিয়ে। স্কুলের বাস না আসা পর্যন্ত তা চলে।

খাও বলছি। খাচ্ছ না কেন! না খেলে বাঁচবে কী করে? দু-পিস পাউরুটি, ডিমের পোঁচ, সন্দেশ। খুঁটে খুঁটে খাচ্ছে।

মহীতোষ রোজই দৃশ্যটা দেখেন। কিছু বলেন না। মুখ তাঁর গম্ভীর। তিনি বেসিনে মুখ ধোয়ার সময় চোখে জলের ঝাপটা দেন কেন এত সুর বোঝে না।

কাল সকালে চিঠিটা পড়ার সময় কেমন থমথম করছিল মুখ।

শিশুটির মা, পেট ভরবে কী করে, বাঁচবে কী করে—বলে উঠে যান। ফ্রিজ থেকে কলা, আম, লিচু, আঙুর সাজিয়ে দেন শিশুটিকে। তাও কেমন আধখ্যাঁচড়া করে খায়। ভাত, মাছ ভাজা, মাখন দিয়ে আর এক প্রস্থ চেষ্টা। কিছু খায় কিছু ফেলে।

মহীতোষ একদিন ক্ষোভে দুঃখে বলেছিলেন, বৌমা খিদে পেলে ঠিকই খাবে। জোর করতে যেও না।

খিদে পেলে ঠিকই খাবে কেন বলছেন মহীতোষ— বৌমাই বোঝে। অর্থাৎ এটা বাড়াবাড়ি। মহীতোষ যেন আভাসে তা জানিয়ে দেন।

সুর চিঠিটা খুঁজল। বৌদি ছেলেকে বাসে তুলে দিতে গেছে। বড়ো দাদাবাবু অফিসে বের হয়ে গেছেন। মহীতোষ কোথায় কেউ জানে না। কারও দায় নেই জানার। লোকটা মরল কী বাঁচল—এক মাসিমা ফিরে এলে ত্রাসের মধ্যে পড়ে যাবে। যদি তিনি সত্যি নিখোঁজ হয়ে যান!

সুর দেখল, চিঠিটা দেরাজের মধ্যেই আছে। বাবুর ছোটো ভাইয়ের চিঠি। সে চেনে মনতোষদা লিখেছে, দাদা আগুনের হলকা বইছে। সব জতুগৃহ। কাজ কম্ম নাই। তুমি যে টাকা পাঠাও ওতে চালের দাম হয় না। পাঁচটি মুখ, আগুনে পুড়ে মরছি। সারাদিন খাটলে বারোটা টাকা। যদি এ-মাসে কিছু বেশি টাকা দাও ভালো মাঠঘাট আংড়া, কাজ নাই। কোনোদিন হয়, কোনদিন হয় না।

হঠাৎ মনে হল সিঁড়িতে পায়ের শব্দ।

তাড়াতাড়ি চিঠিটা রেখে দিয়ে দরজায় উঁকি দিতেই দেখল মহীতোষ নেমে আসছেন। সারা শরীরে ঘাম। মুখ পুড়ে গেছে। ছাই রঙের হয়ে গেছে।

আপনার চা, ঠান্ডা হয়ে গেছে। খোঁজলাম। কোথায় ছিলেন।

ছাদে।

ছাদে! সুর অবাক হয়ে গেল। বৈশাখের দাবদাহে সব পুড়ছে। বৃষ্টি নেই। গাঁয়েগঞ্জে আকাল। তেষ্টার জল নেই—নদী খুঁড়ে বালি তুলে দুক্রোশ দূর থেকে জল নিয়ে যাচ্ছে মাটির ঘড়ায়—সে কাগজে এমন ছবি দেখেছে। খাওয়া দাওয়ার পাট চুকলে সুর টানা দু-তিন ঘন্টা হাতে সময় পায়। তার আলাদা ঘর আছে—সেখানে সে তখন কাগজ পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়ে। তার কোনও অসুবিধা না হয়, সবার এটা যেন দায়িত্ব। সে জানে বাড়ির চাকাটা সচল রাখার দায় তার। সে বেগড়বাই করলেই সব যাবে। তাকে তুষ্ট করার চেষ্টা সবার।

যেন সুখের মধ্যে ফেলে দিয়ে আটকে রাখা। তার দেশে ঝুপড়ি মতো ঘরে মা আছেন। দুই লায়েক ব্যাটা আছে। সেখানেও জলের আকাল, ভাতের আকাল—চাষ আবাদ না থাকলে গাছের মরা ডাল। মট করে যে কোনও সময় ভেঙে পড়তে পারে।

এই রোদে ছাদে! অসুখে পড়ে যাবেন।

মহীতোষ জানে, কাজের মেয়েটি একটু বেশি বাচাল। সে নিজেকে বাড়ির একজন ভাবে। তার দাপট আছে। যে গোরু দুধ দেয় তার লাথি খেতে কষ্ট হয় না। মহীতোষকে এত প্রশ্ন করার স্বভাব সেই সাহসেই।

ছাদে কী করছিলেন?

দাঁড়িয়েছিলাম।

দাঁড়িয়ে থাকলেন! রোদে কেউ এমনি এমনি দাঁড়িয়ে থাকে? তাও খালি পায়ে। ছাদে কী তাপ। পা রাখা যায় না।

মহীতোষ কোনও কথারই জবাব দিচ্ছে না। চুপচাপ নিজের ঘরে ঢুকে একটা চিঠি লিখল— মনতোষকে। মনি অর্ডার ফর্ম তার দেরাজে থাকে— সে এ-মাসে টাকা বেশি করে পাঠাল। মাকেও টাকা পাঠায়—এই দায় তার এখনও আছে। ঝুমির বিয়ে পাকা, শুধু সে ঘাড় পাতলেই হয়ে যায়। পাত্রপক্ষ পনেরো হাজার টাকা নগদ চেয়েছে। মুদি দোকান আছে। চার ভাই। বিধবা মা, শহরের কাছে টালির বাড়ি।

মহীতোষ ইদানীং কিছু কিছু ব্যাপারে ফেঁসে গেছে। তার আয়কর বাবদ বড়ো অঙ্কের টাকা সরকারের ঘরে জমা দিতে হবে। পাঁচ সাত বছর তার চাকরি আছে। কোম্পানির অবস্থা খারাপ—গো স্লো, ইউনিয়নের হুমকি ধর্মঘটের। কোটি টাকার উপর বাকি প্রভিডেন্ট ফান্ড—এল আই সি, ই এস আই বাবদ। ধারদেনা, কোম্পানির লোন ব্যাঙ্কের কাছে— তার ঋণ শোধ দিতে মালিক পক্ষের নাভিশ্বাস উঠে গেছে। তার বাইরে সে কিছু টাকা আয় করে থাকে—বই বিক্রি হয় তার বেশ ভালো। স্কুলের বই। এখন বাজারে টেক্কা দেবার মতো তার বই-এর সমকক্ষ আরও বই বের হয়ে গেছে। স্কুলগুলি নানাভাবে উৎকোচপ্রিয়

হয়ে গেছে। বই ধরাবার জন্য সবাই হন্যে হয়ে ঘুরছে। সঙ্গে টাকার থলে, হয় টিভি নয় গোদরেজের লকার—কিছু একটা উপহার হিসাবে দিলে, দু-পাঁচটা বই প্রকাশকের লেগে যায়। মহীতোষ আর আগের মতো টাকা উপার্জন করতে পারে না। সে এইসব নানা ঝামেলায় ত্রস্ত হয়ে পড়ছে।

মহীতোষ আজ সকালে ছাদে দাঁড়িয়ে দেখেছিল, রোদের তাপ কত প্রখর হতে পারে। একজন মানুষ এই কড়া রোদে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে পারে।

এটা তার এখন এক ধরনের মজা।

যেমন একদিন সবাই দুপুরে ঘুমিয়ে আছে। সে ছাদে খালি পায়ে দাঁড়িয়েছিল। সে ফ্রিজের ঠান্ডা জল খায় না। সে শুধু ডাল দিয়ে ভাত মেখে খায়। সকালে মুড়ি চিবোয়। আগে তার সকালের খাবার ছিল চার পিস টোস্ট, ডিমের পোচ, দুটো মিষ্টি এবং একটি মর্তমান কলা।

এক দুপুরে সে স্ত্রীর কাছেও ধরা পড়ে গেল!

ওমা কী সর্বনাশ! তুমি রোদে দাঁড়িয়ে আছ! কী হয়েছে! কেন দাঁড়িয়ে আছ! তোমার মাথা ঠিক নেই। আমাকে আর কত জ্বালাবে। নামো বলছি।

মহীতোষ নেমে এসে বলল, আমি বাড়ি যাব।

যাও যেখানে খুশি যাও। এই গরমে তুমি বাড়ি যাবে! আলো নেই, পাখা নেই। মাটির ঘর, জানালা নেই। অসুখ বিসুখ হলে কে দেখবে!

কাউকে দেখতে হবে না। এবং পরদিন সকালে সে সত্যি এক জামা কাপড়ে বের হয়ে গেল—কাউকে কিছু না বলে!

সুর দেখল, ঘরে তিনি নেই। তবে ছাদে গিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। রোদে ঠায় দাঁড়িয়ে থেকে কী যে মজা পান—না মাথার গোলমাল, কে জানে—সে ছাদে গিয়ে দেখল, নেই।

নেই। নেই।

ঝুমি সকালে উঠে দেখল গাছতলায় কে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। এত সকালে ঝুমি ঘুম থেকে ওঠে না। এবারের সমন্দ ভেঙে যাওয়ায় ঠাকুমা খুবই ভেঙে পড়েছে। চোপা করেছে, শাপ-শাপান্ত করেছে বৌদের। ঝুমি বিরক্ত হয়ে বলেছে, ঠাম্মা চুপ করবে কি না বল!

কাকাকে চিঠি লিখতে বলেছিল, মহীতোষকে বাড়ি আসতে বল। সে নিজে গিয়ে যদি একবার চেষ্টা করে।

ঝুমির এক কথা, আমি পারব না। কাকাকে দেখছি তোমরা সবাই মিলে মেরে ফেলবে। কাকা এসে কী করবে! আমি তোমার গলার কাঁটা। যাব যেদিকে চোখ যায় বের হয়ে।

ঝুমির বয়েস হয়ে গেছে। দেখতে খারাপ না। কাকা তো বলবেন ঝুমি আমাদের প্রতিমার মতো দেখতে। রংটা শুধু চাপা। কাকা নিজে চেষ্টা করতে পারতেন, কাকিমার ভয়ে চুপ। কী নিয়ে অশান্তি শুরু হবে সে জানে। কাকিমার এক কথা, মানুষটাকে সবাই মিলে মেরে ফেলবে। ঝুমি বোঝে কাকিমার অভিযোগ খুব মিছে নয়। বাড়ির আর সবাই বাবা এবং অন্য কাকারা তার কথা খুব ভাবে বলে মনে হয় না। বাবা তো বলেই দিয়েছে, আমি রিটায়ার করেছি। পেনশনের টাকায় চলে না। ঝুমির নীচে আরও পাঁচ বোন। তারা সবাই বাবার কাছেই থাকে। কেবল সে থাকে ঠাকুমার কাছে।

আগে সংসারটা এমন ছিল না। দাদু বেঁচে থাকতে বাড়ির চারপাশে যেন আশ্চর্য সমারোহ ছিল। কাকা টাকা পাঠাতেন, দাদু আড়তে কাজ করতেন—জমিজমা চাষ-আবাদ মিলে বারো মাসে তেরো পার্বণ। গৃহ-দেবতার পূজার আয়োজন তাকেই করতে হত। ফুল তোলা থেকে, ঠাকুরের বাসন-কোসন মাজা সব। বড়ো পিসির টিউসিনি করে টাকা উপার্জন। ছোটো কাকার পাটের দালালি, তাতেও দু-পয়সা—এই করে সংসারে কোনো টান ছিল না। দাদু মরে যেতেই সংসারটা কেমন আলগা হয়ে গেল। সেজ কাকা, ছোটো কাকা ভিন্ন হয়ে গেল। ঠাকুমার খবর নেয়, তবে টাকাপয়সা দিয়ে কেউ সাহায্য করে না। কাকা দাদুর কাজ হয়ে যাবার পর ভাইদের ডেকে বলেছিলেন, মার জীবিতাবস্থায় বাবার সামান্য জমি-জমা, গাছপালা বাগান যা আছে তিনিই ভোগ করবেন। তোমরা হাত দেবে না।

ছোটো কাকাকে দু-দুবার দোকান করে দিল—ফেল। এখন তো দোকান বন্ধ। ছোটো কাকার জন্যও তার কষ্ট হয়। তবে কাকিমাটি যা একখানা, এত মুখ করে আর এমন সব লাগানি ভাঙ্গানি চলে যে কষ্টটা কেন যেন মাঝে মাঝে বুক খালি করে উবে যায়। তখন তারও রাগ, বোঝো এবার— ঠাকুমাকে তড়পে এসেছিলে, গাছ বিক্রি করতে দেবে না বলেছিলে, বোঝো এবার।

গাছ বিক্রি করলেই মনতোষ মা-র উপর ক্ষেপে যেত। তার এক অভিযোগ, দাদা ফল খেতে বলেছে, গাছ বিক্রি করতে বলেনি। তুমি গাছ বিক্রি করে কী কর বুঝি না। ঝুমির নামে ব্যাঙ্কে টাকা রাখছ। দাদাকে মিছে কথা বলে বেশি টাকা আনাচ্ছ। দাদাকে দাঁড়াও সব লিখব।

ঝুমি তখন আর সহ্য করতে পারে না। মাটির ঘর। টিনের চাল। চারপাশে টালির বারান্দা। বাঁশের খুঁটি। নড়বড়ে হয়ে যায়! কী দিনকাল! কাকা দুজনের ভরণপোষণের

বাবদ যা দেয় তাতে চলে না। ঠাকুমা গাছ বিক্রি করে, বাঁশ বিক্রি করে বাড়তি কাজগুলি সেরে নেয়। তুই পেটের ছেলে! সহ্য হয় না!

সামনের দিকে মনতোষ তার ঘর তুলে আছে। একখানাই মাটির ঘর। সামনে সঙ্গের বারান্দা, পেছনে বাঁশের খুঁটি দিয়ে গোয়াল। গোরুটা অভাবে পড়ে বিক্রি করে দিয়েছে। মনি অর্ডার এলে মনতোষের দৌড়ে যাওয়ার স্বভাব। দাদা তার নামে যদি মাসোহারা পাঠায়।

এই একটা আশায় সে বসে থাকে। মাঝে মাঝে আসে। আবার কোনো মাসে আসে না। চিঠি আসে। আগামী মাসে পাঠাবার প্রতিশ্রুতি থাকে। মনতোষ বোঝে, দাদার কাছে আবার না গেলে চলবে না। পাঁচ-পাঁচটা মুখ। পুত্র সন্তান দুটি তার স্কুলে পড়ে। ঠিক পড়ে না, বলতে গেলে টিফিনে পাউরুটি পাওয়া যায়। দু-ভাই মিলে পাউরুটি নিয়ে এলেও কিছুটা যেন পেটের দায় মেটে।

তার এক কথা, ও নলিনী, দাদা মাকে কত পাঠাল?

যা পাঠায়।

তুমি মনে রাখতে পার।

তা পারব না। এ-মাসে বেশি দেয়নি।

বেশি দিলেই মনতোষ গড় গড় করবে। —মা নাতিনকে আর দুটো হিন্দি সিনেমা বেশি দেখাতে পারবে। নিজের থান না কিনে ঠিক নাতনিকে শাড়ি কিনে দেবে। আমরা তো সব কলাগাছ ফুঁড়ে হয়েছি। একবার দ্যাখে, তারপরই লাঠি নিয়ে তাড়া, এই তারক আবার যদি ওদিকে যাস ঠ্যাং ভেঙে দেব। ধীরু তোর ছাল চামড়া তুলে নেব। বুড়ি তোদের কেউ হয় না। আমার কেউ হয় না। তারপরই লাফিয়ে গাছে উঠে যায়। ডাল কাটতে থাকে।

মনতোষের কেমন মাথা ঠিক থাকে না। অভাব অনটনে মনতোষ মাঝে মাঝে আগুন জ্বালিয়ে দিতে চায়।

সেই মনতোষ মাকে বলে গতকাল সারা উঠোন কুপিয়েছে। হাতে কাজ নেই। ইটের ভাটায় কাজ নেই। আর সে পারবে কেন! কোমরে ব্যথা। এদিকে ঘরে এক মুষ্টি আটা পর্যন্ত নেই। সে যে কী করে! তখনই বুঝি ফন্দিটা কাজ করেছিল মাথায়।

সে ডালিম গাছটার কাছে নীচু হয়ে বসে কী দেখল।

আজকাল সে কিছু তুকতাক শিখেছে, তার গুরু নাদুঠাকুর। নাদুঠাকুরকে মা-ও মানে। এই যে এবারেও সমন্দ ভেঙে গেল, কোন গুণের প্রভাবে। কিন্তু সেটা কীভাবে চাল দেবে

সারারাত ভেবেছে। জল পড়া, চাল পড়া কত রকমের তুকতাক আছে। মা-র বোকনা হাফিজ। কে নিল।

ঝুমি তখন কলকাতায় কাকার কাছে। পাশের কুমোরদের মেয়ে পাতিকে শুতে বলে গেছে রাতে। তা পাতি আরও কয়েকবার থেকেছে। ঝুমির জন্য পাত্রপক্ষের খবর এলেই দিনক্ষণ মাসখানেক বাড়িয়ে দেওয়া হয়। মাস দেড়মাস ঝুমি কাকার কলকাতার বাড়িতে থেকে এলেই শহুরে মেয়ে। লাবণ্য জমে যায় শরীরে। রং খুলে যায়। বাধা জায়গায় থাকলে যা হয়। কলকাতার জলের গুণটা টের পেতেই মা বছরে এক দু-বার ঝুমিকে মহীতোষের বাড়িতে পাঠিয়ে দেয়। সাওয়ারের জল, গন্ধ সাবান, স্যাম্পু কত কিছুর ব্যবস্থা স্নানের ঘরে। পাত্রপক্ষ দেখে পছন্দ করে ঠিক। তারপরই পাকা কথা দেবার সময় হলে আর কোনো খবর দেয় না। কে যে কানে তুলে দেয়, যা খোলতাই দ্যাখলেন দু-দিনের। তবে কি পাত্রপক্ষ টের পায় কলকাতার জল হজম না হলে বোঝা যাবে না। হজম হতে বেশি সময়ও বোধ হয় লাগে না। পাঁচ দশদিন যেতে না যেতেই কেমন শরীর চিমসে মেরে যায়। গাল বসে যায়। চামড়া পুড়ে যায়।—গাঁইয়া চেহারা, কে নেবে। স্কুল ফাইনালটা পাস করলেও হত। কিছুতেই মই বেয়ে উপরে উঠতে পারল না ঝুমি। বার বার হড়কে পড়ে গেল।

সেই ঝুমির বিবাহ এবারে পাকা।

বয়স নিয়ে পাত্রপক্ষের সঙ্গে মিছে কথা বলতে হয়। এবারের পাত্রটির খবর নিয়ে এসেছিল বড়োপিসি। বড়োপিসি ভাইঝিকে ছোটোবেলা মানুষ করেছে। পায়ে পায়ে ঘুরেছে। এখন পিসিরও সংসার হয়েছে। ছেলেরা বড়ো হয়ে গেছে। বড়োটা এবার ইস্কুল ফাইনাল দেবে।

আসলে ঝুমি বোঝে সে এখন তিনজনের গলায় কাঁটা হয়ে ফুটে আছে। একনম্বর ঠাকুমা, দু-নম্বর বড়োপিসি, তিন কলকাতার কাকা। লোকজন বাড়ি এলে মহীতোষের নাম আর করে না। বলে কলকাতার ছেলে চিঠিপত্র দেয় তো! ঝুমিকে বলে তোর কলকাতার কাকা পূজায় কী দিল!

সবই গোপনে করতে হয়। লাগানি-ভাঙানি হচ্ছে দেখে ঝুমিকে এবার পিসির শহরের বাড়িতে দেখানো হয়েছে। সবে দু-দিন হল কলকাতা থেকে এসে ঝুমি শুধু পড়ে পড়ে ঘুমিয়েছে। পিসির এক কথা, তোকে কে বলেছে, কলকাতায় যেতে। ঝুমি কাজ ছাড়া থাকতে পারেনা। আর স্বভাব টিভি দেখা। পিসির বাড়িতে আছে, কলকাতার কাকার বাড়িতেও আছে। টিভির বিজ্ঞাপনের মতো জীবন যে নয়, সে হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছে।

ঠাকুমার এক কথা, কম সমন্দ এল! ঝুমির বয়সি পাড়ার সব মেয়ে কবেই সাফ হয়ে গেছে। কপাল মন্দ না হলে হয়!

এত গোপন, এবং পাত্রপক্ষের সব দাবি মেনে নিয়েছে কলকাতার পুত্র তাঁকে ঠিক আপৎকালে রক্ষা করবে।

কলকাতায় এই বুড়ো বয়সে ছোটাছুটি।

মহীতোষও ভেবেছিল, এবারে তবে হয়ে গেল। বলেছে—যথাসাধ্য চেষ্টা করবে। তারপর কী না চিঠি, না পাত্রপক্ষ পাকা কথা দিতে আসেনি। হাত থেকে এবারেও ডিম ফসকে চড়াৎ করে ভেঙে গেল।

মনতোষ মনে মনে খুশি—খুশির কারণ এই বাড়ি, বাগান, গাছপালা সব সাফ করে দিচ্ছে মা। দাদাকে ইনিয়ে বিনিয়ে লিখছে—আর দাদাটিও মাতৃআজ্ঞা শিরোধার্য—বোঝে না, ঝুমি ছাড়া তার আর কারও প্রতি কোনো টান নেই। অন্য নাতি নাতিনরা কী সব জলে ভেসে এসেছে! একটা ফল পাকুড় পর্যন্ত ধরতে দেয় না। বলে কি না, ঠাকুমা দেখ ধীরু আবার গাছতলায় ঘুর ঘুর করছে। ঠাকুমা দেখ ছোটোকাকা আম পাড়ছে। আর তখন চোপা ঠাকুমার—নির্বংশ হবি, ধনেজনে যাবি। মরবি। গোলাম তুই আমার গাছে না বলে কয়ে উঠলি, ডাক শিবতোষকে। শিবতোষ, আলাদা বাড়ি করেছে—তার অভিযোগ, মনতোষ মানুষ নেই। অমানুষ হয়ে গেছে। বৌটা দজ্জাল। সে মাকে এক ধমকে তাড়িয়ে দেবে। বলবে, আমি কিছু জানি না, যাও।

শিবতোষ তেড়ে যাবে!

কেন, এখন কেন! কার জন্য বাড়ি ছাড়লাম। তোমার ছোটোপুত্র—আহা বোঝো ছোটোপুত্র, সে তেড়ে এসেছিল কেন। গলা টিপে ধরেছিল কেন—বল! আমাকে উৎখাত করে ছাড়লে। তোমরা সবাই। মেজদার মুখের দিকে তাকিয়ে মেনে নিয়েছি। আমাকে এখন লাগে কেন। ছেলেদের বলে দিয়েছি, আম খেতে হয় সাবর্ণদের বাগানে ঘুরবি—মরতেও বাড়ির আমবাগানে ঢুকবি না।

সুতরাং বুড়ো বয়সে মরণ!

মনতোষ জানে, এবারে একটা মোক্ষম সুযোগ এসে গেল তবে। সে ডালিম তলায় বসে ঘরে কী কথা হয় শুনছিল।

কী বলে!

ঝুমির গলা।

—ঠাকমা টোকা তুলতে গেছ তো আমি বাড়ি থেকে বের হয়ে যাব।

ঠাকমার কেমন চোখ বিবর্ণ হয়ে যায়। দুটো কচুর লতি তুলে এনেছিল সকালে। মেজাজ খারাপ বলে দুপুরে সেদ্ধভাত খেয়েছে। কচুর লতির উপর জল ছিটিয়ে চালে রেখে দেবে। ঘরবাড়ি গরমে জতুগৃহ—ঘরে টেকাই যায় না। মনে হয় আগুন, হলকা বইছে। আর তখনই কিনা বড়ো পিসি বলল, টোকা পোতা আছে কে বলল!

—ঝুমি ঠোঁট উলটে চোখ ট্যারচা করে দিল।

বড়োপিসি বুঝল মনা মানে মনতোষের পরামর্শ। কিন্তু নাদুঠাকুরের তুকতাকে তারও বিশ্বাস আছে। মনার সঙ্গে কথা বলতেও ঘৃণা হয় তার। তবে আপদকাল বলে কথা। মনা বাড়ির সবটা গ্রাস করবার তালে আছে। মাঝে মাঝে সে বলতেও ছাড়ে না, বাড়িতে কি আর লক্ষ্মী আছে। গাছের ডালে সব শকুন বসে আছে—বুড়ি মরলে উড়ে এসে জুড়ে বসবে। দাদাকে সব না লিখে জানাচ্ছি তো, মুনিষ খাটছিস, দ্যাখ তোর আরও কত অধঃপতন হয়। ঠাকুর বাড়ির নাম ডোবালি। চুরি চামারি পর্যন্ত করতে শুরু করেছিস। মা-র নালিশ থেকেই দু-তিন সাল হল বুঝেছে কে নেবে—নেয় তোমার গুণধর ছোটোপুত্র। আচার্য বলেছিল না, ঠাউরকর্তা আপনেরে ছোটো পোলায় খাওয়াইব। খাওয়াচ্ছে না! গাছে নারকেল থাকে না—লিচু সাফ, আম, কাঁঠাল কিছু রাখতে পারছ!

কিন্তু আপদকাল বলে কথা। বড়োপিসি ঘরে বসেই ডাকল, মনা, মনারে!

উঠোনের সামনে রাস্তার ধারে মনার ঘর। মনা তো আর ঘরে নেই। সে ডালিমতলায় বসে। ঝুপড়ি আছে। শরীর আলগা করে বসেছিল। দিদির ডাকে, সে তাড়াতাড়ি নুয়ে গুড়ি মেরে নিজের ঘরে ঢুকে গেল।

আবার ডাকছে, মনা বাড়ি আছিস।

সাঁজ বেলা। ঘরে লম্প জ্বেলে দিয়েছে তারকের মা। সে দেখল, তিনটে মুখেই প্রত্যাশা—বাবা রাতে কিছু আনবে। সারাদিন এ-বাগানে সে-বাগানে ঘুরে বেড়িয়েছে। এঁচড় চুরি করেছিল—জঙ্গলে রেখে এসেছে। কাল সকালে বাজারে যাবে না শহরে যাবে ঠিক করতে পারছিল না। যদি ধরা পড়ে যায়। এসব সাত-পাঁচ ভাবনা মাথায়—দিদি ডাকছে, ডাকুক। মজা। কারণ সে জানে দিদি এল বলে। উঠোনে আমার মুততেও আসবে না। বোঝো এখন।

মনা আছিস!

লুঙ্গিটা উপরে তুলে বাঁধল মনতোষ। গায়ে হাড় ছাড়া কিছু নেই। পেট তালপাতার পাখার মতো ঠান্ডা মেরে পড়ে আছে। লুঙ্গি খুলে যায় বার বার।

কী হল! ডাকছি। সাড়া দিচ্ছিস না।

সে উঠোনে বের হয়ে বলল, বল।

বাড়িতে নাকি টোকা পোঁতা আছে!

নাদুঠাকুর তো তাই বলল।

কে পুঁতেছে।

কে জানে!

শরিকি ঝগড়া যেমন হয়ে থাকে। টোকা যদি মনা নিজেই পুঁতে রাখে। অভাবে বুদ্ধিনাশ। পুঁতে রাখতেই পারে। ঝুমিরও হয়েছে, বাড়ি বাগান বাঁশঝাড়ে কেউ ঢুকলেই তাড়া। ঠাকুমার কাছে নালিশ। ঠাকুমার চোপার চোটে ভূত ভাগে। টোকা নিয়েও চেষ্টা করেছে দিনমান— আমার আবাগী নাতিনের উপর তোদের কেন এত নজর রে ড্যাকরার বাচ্চা। ওলাওঠা হয়ে মরবি। কিন্তু পরে বুঝেছে বিধান মেনে না চললে ঝুমির উদ্ধার হবে না। বিকালেই খবর পাঠিয়েছে, বড়োমেয়েকে। শিবতোষ শুনে বলেছে, রাখ তোমার টোকা! টোকায় কী আছে!

মনা যে বলল, কালো ছাগলের নাদি আছে, ধনেশ পাখির পালক আছে। কুমারী মেয়ের রজস্বালার তেলকানি আছে। টোকা তুলতে না পারলে ঝুমির গতি করা যাবে না।

শিবতোষও তুকতাক বিশ্বাস করে। ওই তো গ্রীষের বৌটা জলে ভার হয়ে গেল। নাদু ঠাকুরের টোটকায় আরোগ্য লাভ করেছে। কী ভেবে বলেছিল, যা ভালো বোঝো করো।

তার নিজেরও কাচ্চাবাচ্চা আছে। কে কোথা থেকে তুক তাক করবে, গুণ করবে—যা দিনকাল, চালের কেজি পাঁচ টাকা। রেশনের চাল খাওয়া যায়ে না। সকালে উঠে গোরু সেবা, দুধ দোহানো—বাজারে দুধ বিক্রি, রোজের দুধ দিয়ে আসা, তারপর বগলে গামছা ফেলে ডোবার তলানি জলে ডুব—শেষে পড়িমরি করে আহার এবং সাইকেলে সরকারি অফিস। ফেরে পাঁচটায়। চারপাশে বনজঙ্গল, সাপখোপ, ইঁদুর বাদুর কত কিছুর উপদ্রব—বাড়তি উপদ্রবের ভয়েই সে বলেছিল, টোকা যখন পোঁতা আছে কিছু আর করার নেই। টোকা পুঁতে রাখলে তো সমন্দ ভেঙে যাবেই।

টোকাখান তুলতেই হয়।

তা মনা টোকা কোনখানে পোঁতা আছে জানস!

কী করে কই। বলল ত নৈঋত কোণে বড়ো চাঁপা গাছের নীচের দিক থেকে মাটি কোপাতে শুরু করতে হবে। না পেলে মরণ। কার কিছু করার নেই! পেলেও মরণ। আর একখান টোকা মন্ত্র তন্ত্র তালপত্র ভূর্জপত্র আরও কী সব মোক্ষম চালান দেবে, বাঙ্গ-বাক্স

করে টোকা পোঁতা বের হয়ে যাবে। গলগল করে রক্ত ওগলাবে। তা ম্যাও লাগে। ম্যাও নিয়ে কথা।

কত ম্যাও লাগব।

মনা মাথা ঝাঁকায়। আর বলে মায়রে কও, আমার পুত্ররা গাছতলায় গেলে আগুন জ্বলে তেনার নাতিন এখন বয়স পার করে দিয়ে কুড়িতে বুড়ি। আর তুই দেড় কুড়ি বয়স—বিয়ার আর দরকারটা কী।

মনা ভালো হবে না। তুই আবার ঝুমিকে নিয়ে পড়লি। ঘর শত্রু বিভীষণ।

সববাই দিচ্ছি। তুমি নও! নাও আমি জানি না কত লাগব। নাদু ঠাকুরের কাছে যাও। তার মর্জি।

নাদু ঠাকুরের কাছে গিয়ে বড়ো পিসি শুনল, কোনো এক আমবাগানের বাবু ধরে নিয়ে গেছে। খুবই গুপ্ত কথা। বাবু নাকি কোনো পরস্ত্রীর জন্য পাগল। হিল্লে করতে গেছে। সারা সকাল এই করে গেল, নাদু ঠাকুর, ফিরল না। বড়ো পিসির মুখ ভার। এক কথা তার এই কী ফ্যাসাদে ফেলালিরে মা। তর নিজের ভাইঝি—তুই কইতে পারস না!

কইতে পারি।

তবে ক।

একশো এক টাকা টোকা তুলতে একশো এক টাকা পালটি টোকা পুঁততে। টোকা তুলে দিলেই হবেখন! পালটি মারতে হবে না। নাহলে, আবার টোকা যদি পোঁতে ফের একশো এক টাকা। পুঁতলেই একশো এক টাকা!

ঝুমি দেখল ছোটো কাকার উঠোনে পিসি কপালে হাত দিয়ে বসে পড়েছে।

টাকা দিব কে?

ক্যান দাদা। মায় লিখলেই হয়ে যাবে। টোকা পুঁততে তুলতে পুঁততে।

মনা!

মনতোষ এবার ঠাণ্ডা মাথায় বলল, দশটা টাকা দে দিদি। পুত্ররা কিছু খায় নাই। দাদা টাকা পাঠায় নাই। দে। দাদার টাকা এলে দিয়ে দেব। দে দিদি। কাল সকালে উঠে টোকা তুলে দিলে বাকি টাকা দিতে বলবি মাকে।

বড়োপিসি আর কী করে। অতিকষ্টে দশটাকার নোট বের করে বলে, টোকা খুঁজে না পেলে, ফেরত দিবি।

তা দেব না! আমি মাগনা কারো কাছে কিছু চাই না।

সেই টাকায় চাল ডাল নুন— খিচুড়ি মহোৎসব। সকালে মনতোষ, একজন যোগলদার সঙ্গে নিয়ে কোপাতে থাকল। সারা উঠোন কুপিয়ে ফালা ফালা করে দিল। কোথায় টোকা পোঁতা আছে! সে গড় গড় করছিল। নাদু ঠাকুর তুমি তো জায়গাসোন দেখিয়ে গেলে পারতা। তা টৌকা-তো মেলে না। সারা উঠোনে মনা হম্বিতম্বি করে বেড়ায়। অদৃশ্য তবে। এত বড়ো বেশি ওজনদার গুণিন—পাশের বাড়ির দিকে চোখ মট মট করে তাকায়। নারানের দিদির বাড়ি ওটা। একা বিধবা মানুষ, তিন পুতের মাথা খেয়ে দিব্যি যাত্রা দেখতে যায় মিলের গেটে। তারই কাজ। অন্তত নাদু ঠাকুর এমনই বলেছে।

মনতোষ আসল রহস্য ভাঙছে না। টোকা তোলার নামে সে এক এলাহি ব্যাপার শুরু করে দিতেই ঝুমির মাথা খারাপ। তার মাথা কুটতে ইচ্ছে হচ্ছে। ছোটোকাকার বুজরুকি—এবং সত্যি যখন টোকাখানা দিনের শেষে তুলে আনল, তখন পাড়াপড়শির ছোটাছুটি—পাওয়া গেছে। ডালিম গাছের নীচে কে পুঁতে রেখেছিল। পাওয়া গেছে।

পাওয়া গেছে, পাওয়া গেছে, টোকা পুঁতে রেখেছিল কে? ডালিম তলায় চুপিসারে কে কাজ সেরে গেছে—কবে কখন, ওই মাল আসে—তা বলতে পারছে না। সবাই হামলে পড়ছে টোকাখান উপুড় হয়ে দেখার জন্য—মানা মানে মনতোষের এক রা না—টোকা তার মতো থাকুক—সে কলাপাতায় মুড়ে টোকাখান দিব্যি মাথায় নিয়ে নাচানাচি করছিল। ঠাকুমা বারান্দায় ছোটো পুত্রের নাচ দেখছে, টাকা, বাকি টাকা গস্ত করতে পারলেই সে টোকাখান গঙ্গার জলে বিসর্জন দিয়ে আসবে। বাকির কারবার সে করে না।

সবাই বলল, কী আছে।

মনা বলল, কী নেই। কী না লাগে বশীকরণ করতে যারা মন্ত্রতন্ত্রে বিশ্বাস করেন তাদের কাছে বলি, টোকার ভেতরে আছে মধু, প্যাঁচার কান, প্যাঁচার চোখ, প্যাঁচার মাংস। চটক পাখির চোখ, সাপের খোলস।

আছে কাকজংঘা।

আমার টাকা কই। লাফ মনার।

লোকের ভিড়। ঝুমি চোরের মতো ঘরের কোণায় বসে। পাত্রপক্ষ এবারেও উধাও। ঝুমির কান ঝা ঝা করছে । হঠাৎ সে বের হয়ে চিৎকার করতে থাকল, ঠাম্মা টাকা দিলে আমার মরা মুখ দেখবে। ঝুমির বিশ্বাস কাকার ছলচাতুরি সব, ঠাকুমার কাছ থেকে টাকা হাতাবার ধানদা।

মনা বলছে, রাক্ষসী তন্ত্রের বিধান। না মানলে চোখ অন্ধকার। সে টোকা মাথায় নিয়ে নাচছে। নেচে বেড়াচ্ছে। টাকা, বাকি টাকা চাই।

মাঝে মাঝে শুধু হাঁকছে, টাকা কই।

তার লুঙ্গি খসে যাবার উপক্রম। সে কোনোরকমে এক হাতে লুঙ্গি সামলাচ্ছে আর জয় রাক্ষসীতন্ত্র। তর তন্ত্রে তরে যামু।

আসারনাম মনা ঠাকুর। নাদু ঠাকুর গুরুকাকা।

তারপরই হাঁকছে—বিপরীত লিঙ্গের মানুষকে বশীভূত করার জন্য চাই কিংবা চিরদাসত্বে বন্দি করার জন্যও বিধান আছে। আমার ভাইঝিরে পছন্দ না। দ্যাখ ব্যাটারা কী হয়!

তারপরই হাঁক, টাকা কই!

বড়োপিসি আর না পেরে বলল, মা টাকা দাও শিগগির। তোমার পোলা এখন নাদু ঠাকুর।

কী বিধান ঠাকুর?

বিধান আছে, বামনহাটি, বচ, পিপুল পায়রার বিষ্ঠা সৈন্ধব লবণ, প্রিয়ঙ্গু তণ্ডুল, খঞ্জন পাখির মাংস শোল মাছের চোখ মধুর সঙ্গে মিশিয়ে যৌনাঙ্গে লেপন। বাস। কাম ফতে! পাত্র বল, স্বামী বল পরস্ত্রী বল সব শ্রীচরণের দাস। টোকাখান এবারে কী করমু কন!

তাড়াতাড়ি ঠাকুমা অর্থাৎ মোক্ষদা বুড়ি গুনে গুনে টাকা দিয়ে বলল, তুই আমার শ্রাদ্ধের অধিকারী বাপ। পেটের নাড়িতে আর টান নাই, শুকাইয়া গ্যাছে। গঙ্গায় যা, আমার শেষ আদ্যাশ্রাদ্ধের কাম সাইরা আয়।

লাফাতে লাফাতে মনা চলে গেল। সঙ্গে এক পাল কাচ্চা বাচ্চা। কাঁকুড়ি থেকে গঙ্গাযাত্রা শুরু। কপালে রক্ত চন্দন লেপে, মনা রওনা হয়ে গেল।

তারপর ফিরে এল মনা বড়ো সাত্ত্বিক হয়ে। এসে ঘরে কাচা ধুতি পরল। এতদিনের ক্ষোভ জ্বালা ঝুমির উপর যেন নেওয়া গেল। প্রতিশোধ যারে কয়। গাছের ফল-পাকুড় খা এবার। লাগানি ভাঙ্গানিতে কী হয় দ্যাখ! এর বিয়া হইব। দাদার টাকার দাম নাই। পুত্রগণ আমার উপবাসে থাকে, হাত ওঠে না। ঘরে ঢুকলে দূর দূর ছাই ছাই। এই ধীরু আবার এয়েছিস! আবার! ঠাকুমা খাবে না!

আর এক গরাস দিদি।

হাঁ-মুখ করে মোক্ষদা বুড়ির পাশে বসলে না দিয়ে পারা যায়! তুই ঝুমি নাতনি, পিণ্ডদানের কোনো অধিকার আছে তোর। কেবল পালন করে বুকের মধ্যে দুঃখ জমা হয়ে আছে। আমি ছোটোপুত্র—সারাদিন মায় আমারে শাপ-শাপান্ত করে—কয়, মর। নির্বংশ হয়ে যাবি। আমার কাঁঠাল কে নেয়! আমার গাছে আম থাকে না। তুই জোর করে দু-খানা গাছ

বিক্রি কইরা দিলি! বাপের দোহাই মানলি না। দাদার চিঠি পড়ে উলঙ্গ হয়ে নাচলি—এই করবে। আসুক মহী না বলেছি তো আমার নামে কুত্তা পুষিস।

মনা এবার মোক্ষদা বুড়ির বারান্দায় এসে বসল। ঝুমির ইচ্ছা হচ্ছে এক কোপে গলাখান কেটে দেয়। ইতর। তার জীবন নিয়ে মজা করছে সবাই। কে বলেছে, পাত্র খুঁজে বেড়াতে। কেউ নেই। বাপ থেকেও নেই। মাও না। অপমান লজ্জায় ঘৃণায় ঝুমি কী করবে বুঝতে পারছে না। তখনই সে দেখল, ঠাকুমা দরজা ধরে বারান্দার দিকে এগোচ্ছে। চোখে কম দ্যাখে। হাতে লাঠি না থাকলে চলাফেরা করতে পারে না—কে যেন ডাকল।

আমি মা। তোমার ছোটো পুত্র। মনা। চোখে দেখতে পাওনা, তবু বাঁইচা থাকতে চাও। নাতনির ঠাই না করতে পারলে মরতে পারবা না কও। মাঝে মাঝে বাবায় রাতে আইসা শিয়রে বইসা ডাকে—তোমার এক কথা, স্বগগ সুখ! স্বগগ সুখ ভোগ কর একলা একলা, ঝুমিরে বিয়া না দিয়া যাইতে পারমু না।

তুই আমারে ডাকলি মনা।

হ মা। বস।

শোন আর একবার চেষ্টা কর। বলে মনতোষ একটা বিড়ি ধরাল।

আমি রোহিণী নক্ষত্রে বটগাছের পরগাছা নিয়ে আসব। বুঝলে। কী বললাম! সে বিড়িটা ফুক ফুক করে টানছে।

বটগাছ বললি!

বটগাছ না, বটগাছের পরগাছা।

কী হবে!

হবে। সব হবে। রোহিণী নক্ষত্রে বটগাছের পরগাছা নিয়ে হাতে রাখলে রাজা থেকে শুরু করে, দুষ্টা স্ত্রী, লম্পট স্বামী, প্রভু, পতি, পশুপাখি পর্যন্ত বশীভূত থাকে। এই একটা উপায় মাথায় খেলছে। আর ভূর্জপত্রে ষড়যন্ত্র এঁকে একটি করোটির মধ্যে ঢুকিয়ে দিতে হবে। ওটি এবার পুঁতে দেব। তুমি খোঁজ কর পাত্রের।

দিদি, দিদি। মনতোষ জানে দিদি ঘরের ভিতরেই আছে।

ভিতরে ঝুমির বড়োপিসি মুখ গোমড়া করে বসে আছে। আজই ভেবেছে, দাদাকে সব জানিয়ে চিঠি লিখবে! কী আরম্ভ করেছে মনা। তুই কিছু বলবি না দাদা! এভাবে ঝুমিকে নিয়ে কেলেঙ্কারি করলি। টাকা নিলি! মেয়েটার মুখের দিকে তাকানো যায় না!

দিদি হঠাৎ বের হয়ে চিৎকার করে বলল, তোর মুখ দেখলেও পাপ। তারপর হন হন করে হেঁটে গেল। বড়ো রাস্তায় রিকশা ধরে শহরে চলে যাবে, না হয় বাসে।

মনা বলল, যা বাববা। যার জন্য করি চুরি সেই বলে চোর। এত অধর্ম সইবে! কলিকাল।

আর তখনই দুজন পুলিশ আমগাছ তলায় দাঁড়িয়ে কাকে খুঁজছে। পুলিশের সঙ্গে পঞ্চায়েত মেম্বার প্রবোধ দাস। প্রবোধ দাসই ডাকল, মনা ঠাকুর আছ!

পুলিশ দেখলে মনতোষের আজকাল বুক গলা শুকিয়ে যায়। উঠে চম্পট দেবে ভাবল,

কিন্তু সঙ্গে প্রবোধ দাস— নিশ্চয়ই অন্য কোনও কার্যকারণ আছে। সে এগিয়ে গিয়ে বলল, দাদা আপনি!

থানা থেকে এসেছেন। তোমার কলকাতার দাদা দু-দিন হল নিখোঁজ। কাগজে দ্যাখনি!

না তো!

আর কাগজ! মনে হল চড়াৎ করে মাথায় কাগে হেগে দিল—দাদা নিখোঁজ! তার মানে দাদা কোথায়! দাদার সংসারে অশান্তি চোখের উপর দেখে এসেছে। দাদা নিজেই বাড়িতে তস্করের মতো হাঁটাহাঁটি করত। সন্ত্রাস। সন্ত্রাসে পড়ে দাদা চোখে মুখে বোধহয় আর পথ দেখতে পায়নি। বৌদিও সারা জীবন ঘোড়ার মতো ছুটিয়েছে। মনে হল এক নারী অশ্বপৃষ্ঠে বসে কেবল চাবুক মারছে।

সে সহসা চিৎকার করে উঠল! আরে তোরা কে কোথায়? মা মা। ওগো শুনছ সরলা। দাদা নিখোঁজ।

আর সঙ্গে সঙ্গে বাড়িতে বজ্রপাত যেন। মনতোষ তন্ত্রমন্ত্র ভুলে গেল। মাসোহারা বন্ধ। কী করবে! সে দেখল, মা লাঠি ঠুকতে ঠুকতে কোপানো উঠোনের উপর দিয়ে ছুটে আসতে গিয়ে পড়ে গেল। ঝুমি কান্নাকাটি শুরু করে দিয়েছে। শিবতোষ খবর পেয়ে ছুটে এসেছে।

পুলিশ বিশেষ কিছু বলতে পারল না। যদি এখানে চলে আসে— তারবার্তায় খবর।

পুলিশ আর কী খবর নেবে বুঝল না।

তখনই ঝুমি গাছতলায় ছুটে এসে বসে পড়ল। বলল, কাল সকালে, ফর্সা হয়নি, দেখি কে আমগাছটার নীচে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। এত সকালে কাকা কী করে আসবে! চোখের ভুল—পরে দেখি সত্যি নেই।

মোক্ষদা ছুটে এসে বিলাপ শুরু করে দিল, বাবারে—কার কাছে রেখে গেলিরে! আমার কী হবে। আমাকে কে দেখবে— ঝুমির বিয়ে কে দেবেরে বাবা!

শিবতোষ বলল, কবে থেকে নিখোঁজ?

ওরা কাগজ বের করে সব দেখল। বলল, দু-দিন হল। সকালে বাড়ির কাজের মেয়ে দেখে তিনি নেই। অফিসের কোনও কাজেও বাইরে যায়নি। কেউ কিছু জানে না।

শিবতোষ মাকে এক ধমক লাগাল।

থামবে! কী আরম্ভ করলে তোমরা!

সব চুপ।

বাড়িটার চারপাশে গাছপালা জঙ্গল, বাঁশঝাড়—দাদা এলে কী আর জঙ্গলে লুকিয়ে বেড়াবে। হয় কখনও! ঝুমি দেখেছে। তবে দাদা বেঁচে নেই। শেষবারের মতো তার প্রিয় ঘরবাড়ি দেখার জন্য বিদেহী আত্মা স্বরূপ ধারণ করে দাঁড়িয়েছিল। দাদার কোনো অর্থাভাব নেই, কিন্তু অশান্তির চোটে ইদানীং খুবই কম কথা বলতেন। বছর তিনেক হল বাড়িমুখো হয়নি। বাড়িতে মাটির ঘরে কষ্ট। মা তালপাতার পাখায় হাওয়া করলে বলত, না, না আমার কোনো কষ্ট হচ্ছে না। বলত, বাড়িতে এলে আমার পরমায়ু বাড়ে। সেই দাদা নিখোঁজ।

দাদাকে বৌদি কিছুতেই বাড়ি আসতে দিত না। শিবতোষের চোখ ফেটে জল বের হয়ে এল। ভাই বোন-অন্ত প্রাণ। সেই দাদা বৌদিকে বাড়ি যাবে বললেই ক্ষেপে যেত। অশান্তি করত। ওটা বাড়ি না জঙ্গল। গরমে মরে যাবে না। শীতের দিনে বলত, ঠান্ডা লাগিয়ে অসুখ বিসুখ বাধালে আমি জানি না। কে করে? আসবে কেউ—কেউ এসে সেবা করবে? টাকা ছাড়াতো তারা কিছু বোঝে না। সব ঘাড়ে চাপিয়ে মুক্ত পুরুষ। দাদা বৌদির কথায় অতিষ্ঠ হয়ে উঠলে বলত বুঝছ না, আমি সেখানে ভাই বোনদের সঙ্গে বড়ো হয়েছি। আমাদের কী দিন গেছে! গাছপালা মাঠ আমার কত প্রিয় বোঝ না। আমার শেকড় উপড়ে ফেলছ কেন?

তখন মহীতোষ হাঁটছে। গালে বাসি দাড়ি। পাজামা পাঞ্জাবি ময়লা। সে দু-রাত কিছু খায়নি। নিজেকে এই কষ্ট দেওয়ার মধ্যে সে যেন কোনো আনন্দ পাচ্ছে। নিজের সঙ্গে কথা বলছে— কী মহী কোথায় যাবে বলে রওনা হয়েছিলে—জঙ্গলে রাত কাটাতে মন্দ লাগে না! সাপ, খোপের আতঙ্কে তোমার বৌ তো গাঁয়ের বাড়িতে আসতেই দিত না। কবজা করে ফেলল। বাড়িতে কী দেখলে! কার জন্য দৌড় শুরু করেছিলে।

এখানটায় চুপচাপ বসা যাক কী বল!

মহীতোষ দেখল সড়ক থেকে অনেক দূরে একটা কবরখানায় সে হেঁটে যাচ্ছে। ভাঙা পাঁচিল, মিনার মসজিদ, একটা লম্বা শান কবরের উপর। আহা কী আরাম, সে নিশ্চিন্তে শুয়ে পড়ল। ক্ষুধা তৃষ্ণা নেই। দাহ ভিতরে ছিল— এই গভীর বনের মধ্যে ঢুকে গিয়ে তার মনে হল, ভালোই আছে। তার ঘুম পাচ্ছিল।

সে শুয়ে আছে।

আদ্ভুত সব দৃশ্য ভেসে উঠছে।

সে বড়ো হবার মুখে বড়ো অভাবের সময়। মনতোষকে কোলে নিয়ে সে ঘুরছে। মাঠে নেমে গেছে—মনে মনে পরীক্ষার পড়া ঝালিয়ে নিচ্ছে। মনতোষ তার পুত্রবৎ বয়সে। সেই মনতোষ এখন মনা ঠাকুর হয়ে গেছে। বারান্দায় খেতে বসলে মনতোষ তার পাশে বসত। সে খাইয়ে না দিলে মনতোষ খেত না। ওর দুই পুত্রের কথাও মনে হল। নাতির কথা মনে হল, সন্দেশ কলা পাউরুটি ডিমের পোচ দিয়ে শুরু— আঙুর দিয়ে শেষ। খেতে চায় না। খাবার নিয়ে পুত্রবধূর অশান্তির ছবিও ভেসে উঠল। কত রকমের বাহানা।

দুই উলঙ্গ শিশু।

বাড়িতে গেছে। ধীরুর তখন বছর তিনেক বয়স।

সে বাড়ি গেলেই ধীরু তারক সামনে। কত কথা।

যেমন বলত, জান জেঠু আমি রসগোল্লা খাই।

সে বলত, আর কী খাও!

পাউরুটি খাই। ইস্কুলে জান পাউরুটি দেয়। তারপর আবার বলেছিল, আমি রসগোল্লা খাই।

আর কী খাও?

আমি ভাত খাই ডাল খাই পাউরুট খাই। রসগোল্লা খাই।

আসলে যেন বড়োলোক জেঠুকে খবর দেওয়া সে রসগোল্লা খায় না এমন কেউ বললে মিছে কথা হবে।

মহীতোষ এক হাঁড়ি রসগোল্লা আনিয়ে ভেবেছিল, ভাইপো ভাইঝিদের পেট ভরে রসগোল্লা খাওয়াবে।

ধীরুকে বলেছিল সে।

ধীরু সব সময় দু-হাত পেছনে রেখে দাঁড়ায়। পেট শ্রীঘটের মতো। অপুষ্টিজনিত এই শরীর। সে বোঝে। কিন্তু যা কিছু করে গোপনে— এমনকী একবার খবর পেয়ে তার চাবি সিজ করে ফেলল। সে অশান্তিকে বড়ো ডরায়।

ধীরু এক হাতে রসগোল্লা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল।

মহীতোষ ভেবেছিল, একটা করে খাবে, একটা করে দেবে। আশ্চর্য ধীরু কিছুতেই হাতের রসগোল্লা খেল না।

মহীতোষের মধ্যেও ছেলেমানুষি প্রবল হয়ে উঠেছিল। বলেছিল, খা আবার দেব।

ধীরু ডান হাত পেতে বলেছিল, দাও।

আরে ওটা খা, খেলে তো দেব।

ধীরু কিছুতেই জেঠুকে বিশ্বাস করতে পারছিল না। সবাইকে দিল, টপাটপ খাচ্ছে। কিন্তু ধীরুকে আর একটা না দিলে হাতেরটা খাবে না। সত্যি খেল না। রসগোল্লার হাঁড়ি শেষ। পাঁচ-সাতজন ভাইপো ভাইঝি—কতক্ষণ লাগে। ধীরু ওই রসগোল্লাটি নিয়ে, গাছের ছায়ায় ঘুরে বেড়ালো। চিমটি কেটে মুখে দিচ্ছে। ফুরিয়ে গেলে তো আর পাবে না। ঘন্টাখানেক পরেও মহীতোষ দেখেছিল, সবাইকে দেখিয়ে দেখিয়ে চিমটি কেটে রসগোল্লার স্বাদ নিচ্ছে ধীরু। মহীতোষ কত বড়ো অমানুষ সেদিনই টের পেয়েছিল। সে তার স্ত্রী এবং পুত্রদের স্বার্থে—নিজের পৃথিবী থেকে কখন যে অজ্ঞাতবাসে চলে গেছে সেদিনই টের পেয়েছিল।

মহীতোষ বুঝতে পারছে জীবনে বেঁচে থাকার সব রহস্যই তার মুছে যাচ্ছে। বুঝতে পারছে বয়সের তাড়না শুরু হয়ে গেছে জীবনে। সবাই যে যার মতো আত্মসর্বস্ব, স্বার্থপর।

কিছুই আর তার ভালো লাগে না।

কোনও ঋতুই আর তার জন্য নতুন খবর বয়ে আনে না।

সে নদীর পাড়ের মানুষ। একা একা হেঁটে যাচ্ছে।

আকাশে মেঘ, কখনও বজ্রপাত অথবা নীল আকাশ এবং নক্ষত্রমালা—কিছুই চমক সৃষ্টি করে না আর। যেন এ-ভাবেই মানুষের জন্ম হয়, মৃত্যু হয়, শেষ হয় সব। তবু শৈশব এক রকমের, যৌবন এক রকমের। প্রৌঢ় বয়সে সে বোঝে ভারি একা। নদীর পাড়ের মানুষ হয়ে যায়। ঘরে মন টেকে না, কেবল বের হয়ে পড়তে ইচ্ছে হয়। কেমন ঘোরের মধ্যেই সে ঘর ছেড়ে পালিয়ে এসেছে।

তবে কোথায় সে যাবে জানে না।

সবকিছু অর্থহীন, জীবন এবং বেঁচে থাকা। মৃত্যুর অধিক বেঁচে থাকা আহাম্মকের প্রলাপ।

এই সব তাড়নায় যখন সে পাগল, তখনই চকিতে মনে হয় কে তাকে খণ্ড খণ্ডভাবে রেখে এসেছে নদীর চরায়, কাশফুলের মাঠে, গয়না নৌকার পাটাতনে। কিংবা দূরে মামার বাড়ি যাবার পথে কোনো বুড়ো নিমের ছায়ায়।

তার চোখ জলে ভেসে যায়।

আর তখনই মনে হল দূরে হল্লা।

সে শানের উপর উঠে বসল। এদিকটায় তবে কোনো গ্রাম আছে। সে হেঁটে যেতে থাকল। ঘাস বনজঙ্গল মাড়িয়ে সে যাচ্ছে। সে যে মহীতোষ, সে যে কৃতী মানুষ, সে যে কলকাতায় তার ভোগের সর্বস্ব ফেলে চলে এসেছে দেখলে মনেই হবে না। সামনে পুকুর, পরে রেল লাইন, দূরে কোনো স্কুলবাড়ি। আরও দূরে স্টেশনে সিগনাল। সে হেঁটে গিয়ে দেখল পুকুর পাড়ে তারই মতো একটা লোক শুয়ে আছে। খবর পেয়ে মানুষজন ছুটে আসছে। স্টেশনের কাছাকাছি এলাকা, দূরে ধুধু মাঠ ছাড়া সামনে আর কিছু চোখে পড়ে না। সে লোকটার পাশে গিয়ে দাঁড়াল। গাঁয়ের কিছু মানুষ লোকটাকে চ্যাংদোলা করে নিয়ে যেতে চাইছে। কেন বুঝছে না। আর তখনই দেখল, হাতে একটা বিশাল কাঁকড়া থাবা বসিয়ে দিয়েছে। আঙুলের দু-পাশে সাঁড়াশির মতো চেপে বসেছে কাঁকড়ার বিশাল ঠ্যাং। গোরু চরাতে এসে পুকুরের তলানিতে শামুক গুগলি খুঁজতে গিয়ে এই মরণ।

আঙুল থেকে চুঁইয়ে রক্ত পড়ছে।

এই মাধা, কী বলছে ব্যাটা। কাঁকড়াটা মার।

মাধা বলছে, না লাগবে।

মাধা বলছে, ওয় থাক, আমমো থাকি।

কাঁকড়ার কামড় হজম করছে মাধা। ভিড়ের মধ্যে মহীতোষকে কেউ পাত্তা দিচ্ছে না। স্টেশনে নানা কিসিমের বেওয়ারিশ লোক ঘুরে বেড়ায়। মহীতোষ তাদের একজন হয়ে গেছে।

ইস কী কষ্ট।

হাত ছাড়িয়ে নিচ্ছে। কাউকে কাছে আসতে দিচ্ছে না। কাঁকড়ার কামড়!

মাধা কেবল বলছে, ওয় থাক, আমমো থাকি। মেঘ না ডাকলে কামড় ছাড়বে না। মহীতোষ ভাবল, ওয় থাক, আমিও থাকি, ভারী সার কথা বলছে তো লোকটা!

কাঁকড়াটা মেরে ফেললেই হয়!

না বাবু। বড়ো কামড়। মরে গেলে শেষ কামড় বসাবে। হাড় ফুটো করে দেবে।

মহীতোষ এ-দৃশ্য দেখেনি। জানে না, তাহলে কাঁকড়ার কামড় মেঘ গুড়গুড় না করলে খোলে না। সে কেমন আহাম্মকের মতো দেখল শুধু।

কে একজন বলল। শালো ব্যাটা কাঁকড়ার গহ্বরে হাত! বোঝ। ধরতে জানিস না!

মাধার এক কথা, না ধরবে না। কাছে আসবে না। আর যেই না পাঁজাকোলে করে তাকে নিয়ে যাবার চেষ্টা—তখনই দৌড়। মাঠের উপর দিয়ে দৌড়োচ্ছে। আগুনের হলকা রোদে। খরায় জ্বলছে সব। মাঠ ঊষর হয়ে আছে। ফাটল বড়ো বড়ো মাটির পিঠে।

কুমিরের চামড়ার মতো উঁচুনীচু জমির উপর দিয়ে ছুটছে। মেঘ না ডাকলে আঙুল থেকে কাঁকড়া খুলে পড়বে না। মরে গেলে কাঁকড়ার ঠ্যাং-এর সাঁড়াশি-দাঁত হাড় ফুটো করে বসে যাবে। সেই ত্রাসে মাথা ছুটছে।

মহীতোষ দেখল, গামছা, জ্যালজ্যালে গামছা পরনে একজন মানুষ হাতে কাঁকড়া ঝুলিয়ে চড়া রোদের ভেতর দিয়ে ছুটছে। দিগন্তের দিকে ছুটে যাচ্ছে। কোনোও গাছতলায় শুয়ে থাকবে আবার। মেঘবৃষ্টির জন্য এই নিরন্তর অপেক্ষা বুঝি সব মানুষের।

মহীতোষ বুঝল লোকটা আসলে সে নিজে।

তারও এখন দরকার কোনো গাছের ছায়ায় চুপচাপ বসে থাকা। কিংবা শুয়ে থাকা। গাছের ছায়ার জন্য সে হেঁটে যেতে থাকল। সঙ্গে একটা বেহালা থাকলে বড়ো ভালো হত। সুমার মাঠে কেন যে তার ইচ্ছে হল বেহালা বাজাতে বাজতে চলে যায়।

তার এই ইচ্ছের কথা ভেবে সে আর মুহূর্ত মাত্র দেরি করল না। লোকটা যেদিকে গেছে সেদিকটায় ধাওয়া করল। পারল না। হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল। আর উঠল না।

মাঠচরার দল ঝড়বৃষ্টি ভেঙে বাড়ি ফেরার পথে দেখল, একজন মানুষ সুমার মাঠে হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে আছে।

বাজ পড়ে মারা যেতে পারে।

গাঁয়ে তারা খবরটা পৌঁছে দিল শুধু।